GIFT
VOL-36
No - Jan - Dec
1407

ভাণ্ডার

জানুয়ারি ১৯৯৪

নেতাজি সংখ্যা

B ভাণ্ডার
059.9144
B409

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ
২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ
ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ
ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

নিবাঃ ও সান্ধ্য শাখা ঃ
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

P 10,243

আয়ন্তু সর্বত স্বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শৃণ্বন্তু বিশ্বে : শুনুক বিশ্বের লোক। বেদাহম্ : আমি জানি।

B
059.9144
B409

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি ১৯৯৮

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	:	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	:	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	:	সদস্য
সুভাষ রাহা	:	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	:	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	:	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	:	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি
প্রচ্ছদ : দেশনায়ক

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়			৩
নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও মূল্যবোধ-চর্চা	:	বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দেখে ভাল লাগলো	:	অসীম রায়	৭
নেতাজি কি সত্যই তাইহুকুতে মারা গিয়েছিলেন?	:	শেখর চ্যাটার্জি	১১
সপেদা : স্বল্প মূল্যে মিষ্টি ফল	:	ড. দুলালচন্দ্র সেন	১৩
প্রসঙ্গ : সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা	:	ধনঞ্জয় মিত্র	১৫
সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ির ডোকরা শিল্প	:	সমীর বসুঠাকুর	১৯
পুরানো সেই দিনের কথা	:		২০
সমবায় সমাচার	:		২৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

"যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয় — সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

— সুভাষচন্দ্র বসু

সেই গ্রাম আজও আছে
এবং সংস্কৃতি মেখে। যে
পাখা না থাক
হাত পা আছে,
সৌখ পায়ের আছে
আছে দিষ্টি।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপা: সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

কবিতা

চিরকালীন নেতাজি

মধুছন্দ দাশগুপ্ত

ভারতের ইতিহাসে সেই এক যুগসন্ধিক্ষণে
নেতাজি তোমার আবির্ভাব
অবিচার অত্যাচারে ক্লিষ্ট ছিল স্বদেশ প্রতিমা
মুখে তার করুণ বিলাপ
দীপ্তকণ্ঠে সেইদিন তুমি বললে-'শপথ নিলাম
রক্ত দাও, আনব স্বাধীনতা —
জীবনের সব সুখ জলাঞ্জলি এখনই দিলাম
মুক্তি চাই - এই সার কথা।'
তোমার প্রেরণা থেকে জন্ম নিল হাজার সৈনিক
'দিল্লি চলো' 'চলো দিল্লি' ধ্বনি দিল যেন বিশ্বজিৎ

আমাদের স্বাধীনতা সে তোমার সুতীব্র সংগ্রাম
আমাদের স্বাধীনতা সে তোমার ত্যাগের মহিমা
এবং তোমারই জন্যে ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষ
এত স্নিগ্ধ রূপময়ী ভুলবে না সুভাষের নাম
চিরদিন চিরকাল তোমাকে তো জানাবে সম্মান
আসমুদ্র হিমাচল গেয়ে যাবে চিরকাল গান।

কমন ক্যাডার বিলোপ হ'ল

প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার প্রয়াস বিগত ত্রিশ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত আছে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম থেকেই ম্যানেজারের দক্ষতার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সে-সময় ম্যানেজারের বেতন সমিতিকেই সংস্থান করতে হ'ত। যদিও সরকারি অনুদান প্রথম কয়েক বৎসর হ্রাসমান (Tapering scale) হারে দেওয়া হ'ত।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ প্রকল্পে বকেয়া পড়ার প্রবণতা এখনও দূর করা যায়নি। এখনও বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রাথমিক সমিতিগুলি স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ সরবরাহের মধ্যেই নিজেদের কর্মসূচি সীমিত রেখেছে। ফলে ঋণের বকেয়া পড়ার ঝুঁকি থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। বহুক্ষেত্রেই সমিতিগুলি সে-কারণে কোন গুণাত্মক ফল দেখাতে পারে না।

ম্যানেজারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য **Common Cadre Scheme**-*র মধ্যে তাদের আনা হয়েছিল। কিন্তু তা-ও কাঙ্খিত ফল প্রদর্শন করতে পারেনি। বরং পরিচালকমণ্ডলী ও* **Common Cadre Authority** *এই দুই-এর টানাপোড়নে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।*

সম্প্রতি রাজ্য সরকার ২৭ নভেম্বর '১৭-র এক আদেশে **Common Cadre Authority**-*র বিলোপ সাধন করেছেন। আশা করা যায় যে, উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়-এই আদেশ সমিতিগুলিকে তাদের কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।*

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713 204
Phone : 0343/56-2393. 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি
ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও মূল্যবোধ-চর্চা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে আমাদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। বড়ো মনুষ্যত্বকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুগে যুগে চলতে থাকেই। এটা স্বাভাবিক। নেতাজির ক্ষেত্রে নতুন যা, তা হল তাঁর অন্তর্ধান-রহস্য। তাঁর মতন এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তির কথা ঠিক ঠিক জানা গেল না - যে কোন জাতির পক্ষেই এ এক দুর্বিষহ বেদনার কথা। এ-বেদনা আমরা যেমন মর্মে অনুভব করি, পাশাপাশি কৌতূহলও। তাঁর রহস্যঘন অন্তর্ধান বিষয়ে কোন আলোচনা দেখতে পেলে আমরা সাগ্রহে তা পড়ে ফেলি এবং মনের মধ্যে আশা-নিরাশার একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। দুঃখের কথা এই, আলোচনাগুলি প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট অথবা যুক্তিবিরোধী। কোন কোন আলোচক বেশ জোরের সঙ্গে বলেন, এটাই ঠিক। সেই মুহূর্তে মন আনন্দনেয় অবশ্যে ভরে ওঠে। এ আনন্দ আবিষ্কারের, নিজেকে তথা দেশ ও জাতিকে জানার। কিন্তু কিছুদিন কাটতে না কাটতেই দেখা যায়, সে-আবিষ্কারের ভিত্তি বেশ দৃঢ় নয়। ফলে মন আবার বিষণ্ণ ও আহত হয়ে ওঠে।

তাঁর জন্মশতবর্ষেও এই সব ক্রীড়া-কৌশল দেখা গেছে। এতে নেতাজি-চর্চা কতখানি অগ্রসর হয়েছে তা জানতে পারি না, তবে নতুন নতুন দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়েছে। একপক্ষ নিশ্চিত যে, নেতাজি লোকান্তরিত। অপরপক্ষ মনে করেন, তিনি জীবিত। আর এক পক্ষের ধারণা, এখন তিনি সশরীরে না থাকলেও অন্তত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। এই দুর্ঘটনার ব্যাপারটি ছিল সাজানো এবং নেতাজি নিজেই নাকি ঐ ঘটনা অনুমোদন করেছিলেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন, সাইবেরিয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কারো ধারণা চিনদেশে তিনি চলে যান এবং এখনও সেখানেই আছেন। এক সাধুবাবা (!) তো ঘোষণাই করেছিলেন, নেতাজির সাথে তাঁর রীতিমতো কথাবার্তা হয়।

এই যায়। ব্যক্তিটি নেতাজির স্থলে অন্য কেউ হলে আমরা বলতে পারতুম, কেস বাবা! কথা হোক। যুগযুগান্ত ধরে কথা হোক। কিন্তু নেতাজি আমাদের রক্তে এমন মিশে আছেন যে, তাঁর সম্পর্কে ভালোমন্দ, সত্যমিথ্যা কোন কথাকেই আমরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি না। তবে জাতি হিসাবে আমাদেরও সহ্য ও সৌজন্যের একটা সীমা আছে। নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য বা নেতাজির শরীরী অস্তিত্ব বিষয়ে তাই যে কোন ধরনের অসমর্থিত ও তথ্য-সংক্ষেপ আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর অধিকার আমাদের থাকবে এবং প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ এবং বাস্তবতাও। বাজার অর্থনীতির যুগে নেতাজি রহস্যকে একটি মুনাফাশীল প্যাকেজ হিসাবে বাজারে ছাড়ার অপচেষ্টা ভারতবাসী কখনই অন্তরাত্মা অনুমোদন করেন না।

নেতাজি জন্মশতবর্ষে আমাদের পক্ষে যা আজ প্রয়োজন, তাহল নেতাজি-চর্চার অনুষঙ্গে দেশ ও জাতির কাছে আত্মোৎসর্গ। বর্তমান সময়কালে দেশের সর্বস্তরে দুর্নীতি যেভাবে কায়েম হয়ে বসেছে, সেই পরিস্থিতিতে নেতাজি-চর্চার অধিকারও অর্জন করা যায় কী-এসব বিষয়ে আলোচনা করা সহজ। কিন্তু যে সততার ভিত্তিভূমিতে তাঁর অভিষেক, দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল ধারাবাহিকতায় তিনি সমৃদ্ধ-সেই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর অবদানের সূত্র অনুসরে ভারতীয় জাতিরও একটি নৈতিক ভিত্তিভূমি থাকা দরকার। সেই ভূমিটি এখন হেরফের বিপর্যস্ত, নেতাজি-চর্চার অধিকার প্রসঙ্গে তাই ওঠে সেখানে স্বাভাবিক।

আমাদের অনেকেই এখনও এক ভুল বুঝের বসিয়ে যে, নেতাজি ফিরে এলে জাতির পক্ষে নব-উদ্দীপন সম্ভব হবে। তাঁকেই দেশের হাল ধরতে দেওয়া হবে, অসামান্য দৃঢ়তায় দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবেন তিনি এবং ভারত আবার এক আদর্শ ভূমিতে রূপান্তরিত হবে। এ-হেন ভাবনার পিছনে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আত্মনিবেদন কাজ করছে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় ভাবনাটি অযৌক্তিক। প্রথমত, নেতাজির ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা বা সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে তাঁর প্রত্যাগমন বার্তা আকাশে বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলেও অর্থনীতির বিশ্বায়নের বর্তমান জটিল সময়ে কোন নীতিবান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, তাঁর নিজের কথাতেই 'নেতা জন্মায় না, তৈরি হয়'-এই বক্তব্যের অনুসূত্রে বলা যায়, নেতাজির মতন কোন নেতাকে মাথার ওপর বসিয়ে দিলেই দেশের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে-এই ধারণা বাতুলতা মাত্র। পরিস্থিতিগত অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে নেতা আপনি উঠে আসেন এবং জনসমর্থনের সততা, ঐকান্তিকতা এবং সক্রিয়তা থেকেই কর্মী জন্মে নেতার রূপান্তরিত হন।

কার্লমার্কস যেমন একটি রাজনৈতিক দর্শন রেখে গেছেন, গান্ধীজি এবং আরও কেউ কেউ-নেতাজি সেভাবে নিজস্ব কোন রাজনৈতিক দর্শন রেখে যাননি। তিনি দেশকে ভালবেসেছেন, দেশের মুক্তির জন্য ঝাঁইয়েছেন যাতে মুগ্ধ করেছেন, দেশের জন্য ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন সম্পূর্ণত। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য তিনি কোন রাজনৈতিক মতবাদ বা দর্শন পরিকল্পিতভাবে রেখে যাননি। তাই 'সুভাষবাদ' নামক কোন মতবাদকে আশ্রয় করে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখা গঠন করা সম্ভব নয়। তাঁর লেখা নানা মূল্যবান প্রবন্ধ থেকে তাঁর ভাবনা-চিন্তার একটি পরিচয় পাওয়া যায়, সেই চিন্তনের প্রগতিশীল অংশ সৃষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহার করা যেতেও পারে-কিন্তু সার্বিকভাবে 'সুভাষবাদ' আশ্রয় করে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ গঠনের কথা এগিয়ে চলা বাস্তবোচিত নয়।

তবু উঠতে পারে, নেতাজি-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা তবে কোথায়? এর উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর সততা ও দেশপ্রেম। যে অসামান্য দৃঢ়তায় তিনি ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ করে দেশের জন্য জীবন পণ করেছেন তা অনুসরণ করা, অন্যরও তবু উত্তরে, বর্তমান সময়কালে এমন অটল সততা ও দেশানুরাগ সম্ভব কি না। পরিস্থিতিগত বিচারে তা সত্যিই সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক ব্যক্তির সমাজেরই একটি অংশ। সমাজ সর্বস্তরে দুর্নীতিযুক্ত হলে রাজনীতি দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে না। তবে যা করা সম্ভব তা এই যে, পেশাগত সততার ভিত্তিতে পেশাগত চর্চা করে দুর্নীতির ভাগ কমিয়ে আনা। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বা তাঁর আমলের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ যেভাবে আপোষহীনতে দেশপ্রেম, সততা, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও দেশ গঠনের চিন্তা করেছেন, তা এখন আশা করা সম্ভব হবে না।

যতঃ কিম্? একটি জাতি যখন সার্বিক সংকটে জর্জর হয়, সে-সময় মূল্যবোধ-চর্চা অত্যন্ত জরুরি। নেতাজিকে অবলম্বন করে আমরা এই মূল্যবোধ-চর্চার অনুশীলন করতে পারি এবং তা বাস্তবায়নে সমষ্টিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, নেতাজি-চর্চা আসলে মূল্যবোধ-চর্চারই নামান্তর। সে-কারণে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। জন্মের একশ' বছর পরেও মূল্যবোধের নিরিখে একজন মানুষকে জাতি অন্তর দিয়ে স্মরণ করছে — এটি যে এক মহান চিত্র, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ❑

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills — even poultry hatcheries and fisheries — offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দেখে ভাল লাগলো

অসীম রায়

সাতাশে নভেম্বর (১৯৯৭) সকাল এগারোটায় মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের হেড অফিসে বেশ গরম করছিল। ডেপুটি ম্যানেজার তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য আমার অবস্থা দেখে পাখার সুইচ দিতে বললেন। ওখানে তখন জেনারেল ম্যানেজারের পদটি খালি। শ্রী ভট্টাচার্যের ওপরই দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিনাটি দেখার দায়িত্ব। ব্যাঙ্কের আইনানুগ প্রধান হিসাবে সভাপতি মৃগাঙ্কশেখর কর ব্যাঙ্কের সার্বিক কাজকর্মে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছেন। মেদিনীপুর সদর (উত্তর ও দক্ষিণ), ঝাড়গ্রাম ও তাঁথি মহকুমা নিয়ে বর্তমানে ৩৪টি শাখায় শাখান্বিত বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এঁদের দুজনের সাথে যা কথা হল তা থেকে বোঝা যায় ব্যাঙ্কের এই বিশিষ্টতা শুধু আর্থিক সাফল্যে ও আর্থিক সমৃদ্ধিতে আর সদস্য এবং গ্রাহক পরিষেবাতেই সীমাবদ্ধ নয়। অবিভক্ত বাংলার সমবায় কৃষি ঋণ আন্দোলনের মজবুত বনিয়াদ তৈরিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও এই ব্যাঙ্কের ঐতিহ্যের একটা সুদূর বিস্তারিকতা আছে।

ব্যাঙ্কের সাফল্যের সাম্প্রতিক অবদান নিয়ে আলোচনার আগে ঐতিহাসিক অবস্থানটি একটু দেখে আসা যাক। বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যে তিনটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তারা হল খড়গপুর শহর কেন্দ্রিক খেলাড় বলরামপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ঝাড়গ্রাম শহর কেন্দ্রিক বেলিয়াবেড়্যা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও মেদিনীপুর শহর কেন্দ্রিক মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। এদের মধ্যে ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত 'খেলাড় বলরামপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন' প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। ১৯১২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা দুটিকে কার্যকর এলাকা করে বেলিয়াবেড়্যা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নিবন্ধিত হয়। মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কও ১৯১২ সালেই নিবন্ধিত হয়েছিল। মৌলিক (পিওর টাইপ) ও মিশ্র (মিক্সড টাইপ) ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে বক্তব্য রাখার সময়ে অবধারিতভাবে খেলাড় বলরামপুরের কথা "পিওর টাইপ" প্রসঙ্গে আর মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কথা "মিক্সড টাইপ" প্রসঙ্গে বলতে হয়।

খেলাড় বলরামপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নের সদস্যপদ কেবল সমিতিসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই হিসাবে এটিকে মৌলিক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে এ ধরনের মৌলিক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে বলা হয় "খেলাড় টাইপ" যেহেতু খেলাড় গ্রামেই প্রথমটি গঠিত হয়েছিল। ম্যাকলাগান কমিটির (১৯১৪-১৫) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সেই সময় অবিভক্ত বাংলায় মোট ছয়টি মৌলিক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে ২৪১টি সমবায় সমিতি সদস্যভুক্ত ছিল।

১৯১২ সালেই প্রথম মিশ্র (মিক্সড) ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক পাবনা, দাইবাড়া ও মেদিনীপুরে গঠিত হয়। মিশ্র ধরনের ব্যাঙ্কের সদস্যপদ সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যেই উন্মুক্ত ছিল। ব্যবসায়ে উদ্যোগী আর শিক্ষিত মানুষজনের আনুকূল্য পাওয়ার জন্যেই মিশ্র ব্যাঙ্ক আসে বিবর্তনের পথ বেয়ে। এ ধরনের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অবশ্য প্রথমে বিহারের গয়া জেলায় মোয়ারাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। সেখান থেকেই আসে কলের পাবনায়। তাই মিশ্র ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চিহ্নিত করা হত "পাবনা টাইপ" হিসাবে। এদিক থেকে অবিভক্ত বাংলায় মিশ্র ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সময়ানুক্রমিক তালিকায় মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের স্থান তৃতীয়। ম্যাকলাগান কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে সেই সময় অবিভক্ত বাংলায় ২৪টি মিশ্র ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সদস্যভুক্ত সমিতির সংখ্যা ছিল ৯১২টি। মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অবসরী সদস্যগণ বাবলা গাছের কাটা সংগ্রহ করে অলসিনের কাজ চালাতেন বলে শোনা যায়।

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাচীনতম শক্তিশালী স্তম্ভ বেলিয়াবেড়্যা কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১৯১২ সালে নিবন্ধিত হওয়ার সময় থেকে ১৯৪৩ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত "পিওর টাইপ" ব্যাঙ্ক হিসাবেই ছিল। ২২ জুলাই থেকে ব্যাঙ্কটি মিশ্র কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। অবশ্য তার আগে ১৯২৮ সালের ১৮ জুন বেলিয়াবেড়্যা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বেলিয়াবেড়্যা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে নামান্তরিত হয়। তখনও তার নিজের বাড়িতে আসর মেলেনি। মিলনো ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে যেদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) বেলিয়াবেড়্যা গ্রামে গিয়ে ব্যাঙ্কের নতুন তৈরি বাড়ির উদ্বোধন করলেন। ব্যাঙ্কটির মহকুমা শহর ঝাড়গ্রামে আসতে আরও বছর চারেক লাগলো। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে ঝাড়গ্রামে যখন এল তখন সঙ্গে আনলো তার জন্মস্থানের সেই পুরনো নাম "বেলিয়াবেড়্যা"। ঝাড়গ্রামের পুরো মহকুমা জুড়ে কর্মক্ষেত্র আর শহরটিতে প্রধান কার্যালয় হলেও নামের সাথে কোথাও ঝাড়গ্রাম থাকল না।

১৯৫৪ সালে নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (১৯৫১-৫৪)-র প্রতিবেদনে বলা হল একটা জেলায় মাত্র একটা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থাকবে। মেদিনীপুর জেলায় তখন সাতটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কাজ করছে। সকলেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আগ্রহী কেউই মিলনের প্রত্যাশী নয়। পরিশেষে সমবায়ের মন্ত্রে মিলনের মন্ত্রে তিনটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে দাঁড় করানো গেল ১৯৬৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ মেদিনীপুর-খেলাড়

বলরাম ও বেলিয়াবেড়্যা-এই তিনটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে আইনানুগ পদ্ধতিতে একীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হিসাবে নিবন্ধিত করা হল। তখন মেদিনীপুর এক নম্বর রেঞ্জের সহকারী নিবন্ধক ছিলেন অহিভূষণ মিশ্র। ব্যাঙ্ক তিনটির একীকরণ হল বটে তবে কেউই নিজের অস্তিত্ব একেবারে মুছে ফেলতে চাইলো না। "মেদিনীপুর-খেলাড় বলরামপুর-বেলিয়াবেড়্যা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ" এই বিশাল নামটিই ঘরে বাইরে সবখানে অবিরত ব্যবহৃত হতে থাকে। এতে অনেকের বিস্তর-বিস্তু বিরক্তিও স্বাভাবিকভাবে জমা হতে থাকে। পরিশেষে স্বাতন্ত্র্যের দরজায় শেষ আঘাতটি দিলেন বিদ্যাসাগর অর্থাৎ আধুনিক ভারতে সমাজ আন্দোলনের উদ্গাতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। সীমাহীন সাগরের চেউয়ে স্বাতন্ত্র্যের অবসান হল। ১৯৭৫ সালের ১৮ অক্টোবর বিদ্যাসাগরের এক ঢেউয়ে "মেদিনীপুর-খেলাড় বলরামপুর-বেলিয়াবেড়্যা" লীন হয়ে বেরিয়ে এল "বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ"। কাকতালের মানুষ বিকুপদ হাজরা ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসাবে তখন অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এখন আর পিছনে তাকাবো না। ফিরে আসি, ঠিক এখন যেখানে ব্যাঙ্কটি আছে। ১৯ জন পরিচালকের পরিচালন পর্ষদ ব্যাঙ্কটির প্রধান কার্যালয় মেদিনীপুর শহরে সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এদের মধ্যে ১২ জন নির্বাচিত। ৩ জন সরকার মনোনীত পরিচালকদের মধ্যে থেকেই এসেছেন বর্তমান সভাপতি বৃন্দাবনশেখর কর। এছাড়া অর্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে একজন-মুখ্য কার্যনির্বাহক একজন-কর্মচারী প্রতিনিধি একজন তার একজন এসেছেন জেলা পরিষদ থেকে মনোনয়নের মাধ্যমে। পরিচালন পর্ষদের বৈঠক নিয়মিত বসে। শেষ বার্ষিক সাধারণ সভাও গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৭) অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

পরিচালন পর্ষদের সুনিপুন পরিচালনায় ব্যাঙ্কটি যে বহুমুখী কাজ করে থাকে তাদের ফিরিস্তি করেকটির উল্লেখ করা হল : যেমন (১) স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন : - (ক) আমন, বোরো, রবি, ইক্ষু ও পান প্রভৃতির ওপর কৃষিঋণ, (খ) ব্যবসা উন্নয়নে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও ফসল সংরক্ষণে ক্যাশ ক্রেডিট, (৬) নন-ফার্ম খাতে দাদন (ক) বিভিন্ন নন-ফার্ম খাতে, (খ) কনজিউমার্স ডিউরেবলসে (গ) যানবাহন খাতে (ঘ) গৃহ নির্মাণ ঋণ সিকিউরিটিসে, (৩) অন্যান্য পরিকল্পনা খাতেও এরা ঋণ দিয়ে থাকেন : যেমন (ক) দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ (হাউজো), (খ) তন্তুবায় সমিতিগুলিতে ঋণদান (৪) ক্ষুদ্র সেচকার্য, কৃষি যান্ত্রীকরণ, মাছ চাষ পানের বরোজ প্রভৃতি কৃষি খাতে মধ্যমেয়াদি ঋণ যেমন দেওয়া হয় তেমনি (৫) (ক) বিভিন্ন কর্মচারী সমিতিকেও (খ) সোনা বন্ধক রেখে অকৃষি খাতেও মধ্যমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এছাড়া আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্যে (ক) কর্মচারী সমিতির মাধ্যমে ও অন্যান্যদের (খ) ব্যক্তিগত পর্যায়েও এই ব্যাঙ্কে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। সর্বস্তরে মোট ২৬৪ জন কর্মচারীর মাধ্যমে সার্বিকভাবে যে পরিষেবা এরা প্রসারিত করে দিয়েছেন তা হল (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের ওপর বেশি সুদ, (২) ৩৪টি শাখা অফিস ও ২ টি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যকর্ম, (৩) ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ, (৪) মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে লকারের সুবিধা, (৫) সান্ধ্য বিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর শহরের নাগরিকদের পরিষেবাও এই ব্যাঙ্ক দিয়ে থাকে।

সমবায় প্রশিক্ষণের পরিষেবা বিস্তারেও এই ব্যাঙ্ক এগিয়ে এসেছে। ১৯৯৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দিঘায় আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে সমবায়ীর উদ্বোধনকালে রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মইনুল হাসান এবং ১৫-১৬ বর্ষে ভারতের বর্ষশ্রেষ্ঠ সমবায়ী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে রাজ্যের অন্যতম প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য এবং নাবার্ডের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করার কথা বলেন।

ব্যাঙ্কের সার্বিক আর্থিক চালচিত্র (লক্ষ টাকায়)

খাত	বৎসর	বৎসর
	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
নিজস্ব তহবিল	১৪৮২.২৭	১৭৫৬.৩০
আমানত	৮০৭৭.৭৫	৯২৫১.২৬
কর্জগ্রহণ	১৪৯৬.২৯	১৫৪০.৯৯
বিনিয়োগ	৪৫৮১.৫৬	৫০৮৩.৬১
কর্জদান	৬১৪৭.৯৩	৬৯৪৭.৩২
নিট লাভ	২২২.৯৫	২৭৮.৪১
সরকারসহ সব সদস্যদের লাভাংশ বন্টন	৬%	৬%
আমানতের গড়করা হার	১০.৮১%	১৪.১৯%

১৯৯৫-৯৬ সালের অডিট অনুসারে নিট লাভ হয়েছে ২,২২,৯৪,০১২.৪০ টাকা। তা নিম্নলিখিতভাবে বন্টিত হয়েছে : -

		টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	১৫%	৩৩,৪৪,১০২
মূ-ধন তহবিল	৭৩%	১,৬৬,০৫,৮০৯
সমবায় শিক্ষা তহবিল		৭,৪০০
দাবো তহবিল		৩৩,১০০
প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির উন্নয়ন তহবিল		১৩,৮০৩
লাভাংশ বন্টন	৬%	২৭,০৮,৮৬৪
		২,১৭,৯৪,২৭৯
অবন্টিত লাভ		৪,৯৮,৭৩,৩৪০
		২,২২,৯৪,০১২.৪০

পূর্বের অবস্থিত লাভের খাতে মোট জমার পরিমাণ ৪,৬৮,৬৭,০০০ টাকা।

ব্যাঙ্কটির অগ্রগতি অব্যাহতভাবে অধিকতর উন্নয়নের দিকে চলেছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ী ও সমপ্রভাবে সমবায় আন্দোলনের কাছে অবশ্যই একটি সুখকর সংবাদ। তবে এদের যে কোন দাবি নেই তা নয়। দাবির মধ্যে মূলত তিনটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেগুলি হ'ল —

(১) সকল প্রকার শস্যের জন্য শস্য বিমা চালু করতে হবে।

(২) শস্য বিমা প্রকল্পে এলাকাকে ব্লকভিত্তিক না রেখে মৌজাভিত্তিক করতে হবে।

(৩) জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড) কর্তৃক জারি করা 'মিনিমাম্ ইনভলমেন্ট' নিয়ম তুলে দিতে হবে।

পরিশেষে অর্থনীতির এই বিস্তারণের যুগে সমবায় আন্দোলনকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে-বেকার সমস্যার সমাধানে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ব্যাপক বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষকে যেমন ব্যাঙ্কের আরও কাছে যেতে হবে তেমনি ব্যাঙ্ককেও হতটা সম্ভব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ-জন্যে ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তার সভাভুক্ত সমিতিসমূহের সদস্যবর্গের জন্যে উপযুক্ত সময়ে শিক্ষা-কর্মচারিবৃন্দের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায় বিষয়ক প্রচারের ব্যবস্থা ও জনমতকে সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে আনার আরও ব্যাপক প্রয়াস চালাতে হবে।

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিশীলিত পরিবেশে এ প্রত্যাশা আপনা থেকেই পুঞ্জীভূত হয়। ব্যাঙ্কটির কোথাও এতটুকু মালিন্য চোখে পড়লো না। লোহার বিশাল হল ঘরের দুপাশে সারি সারি সাজানো পরিচ্ছন্ন চেয়ার-টেবিল। বেলা ১১টায় একটাও চেয়ার খালি ছিল না। প্রত্যেকেই কাজে ব্যস্ত। এরজন্যেও বিশ্রাম নিতে-গল্প করতে-খবরের কাগজ পড়তে দেখলাম না। কাজের সময়ে ফাঁকি দেওয়া কর্মী অপেক্ষা কাজে ব্যস্ত কর্মীকে যে অনেক সুন্দর দেখায় তা প্রত্যক্ষ করলাম। কর্তব্যপরায়ণতা বোধহয় একটা আলাদা সৌন্দর্য ফেলে দেয়।

সরকারি অফিসে ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ বিরল হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে বাস্তবতার জরুরী মাখা সুন্দর মুখের সমাবেশ। বিদ্যাসাগরে যেন অন্য ছবি। সমবায় ব্যবস্থা যে রাষ্ট্রায়ত্ত অবস্থা থেকে বেশ ভালো এটা এখানে আরো বেশি করে মনে হল। ❑

মধুসূদন দত্ত কখন থেকে মাইকেল!

উনিশ শতকের বিখ্যাত কবি মধুসূদন দত্তের জন্ম ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের বিখ্যাত উকিল ছিলেন। মা জাহ্নবী দেবীর কাছেই তাঁর বাল্যশিক্ষার শুরু। সাত বছর বয়সে কলিকাতায় আসেন। হিন্দুস্থিপুর স্কুলে দু' বছর পড়াশোনার পর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। বিলাতযাত্রার সুযোগ গ্রহণে তিনি ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে স্বজন ও সমাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এ সময় থেকেই তিনি "মাইকেল"। তিনি নীলকর সাহেবের কন্যা রেবেকা ম্যাক্টাভিসের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়ে হেনরিয়েটা সোফিয়াকে তিনি বিবাহ করেন এবং পরে সস্ত্রীক কলকাতায় ফিরে আসেন। পিতা-মাতা উভয়েই তখন মৃত। এই সময় একদিন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে তিনি অবতীর্ণ হলেন নাট্যকার রূপে।

জীবন সায়াহ্নে তাঁকে চরম দারিদ্রের মধ্যে কাটাতে হয়। তবে মেদিনীপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)-এর অকৃপণ সাহায্য তাঁকে সাহিত্যের অঙ্গনে নতুন করে ধরে রাখে। বাংলা সাহিত্য-চর্চায় অধ্যাপিন যুক্ত থাকলেও তাঁর সাহিত্যসম্ভার শাশ্বতসম্পদ হয়ে থাকবে। শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, মেঘনাদবধ- প্রভৃতি তাঁর সার্থক রচনা। তাঁর বারোখানা বাংলা গ্রন্থ ও পাঁচখানা ইংরেজি গ্রন্থ আছে। তাঁর আর এক শ্রেষ্ঠ অবদান, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার।

প্রভূত অর্থাগম সত্ত্বেও অমিতাচারের পরিণামে কবি ঋণগ্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অকালে (২৯শে জুন, ১৮৭৩) মাত্র ৪৯ বছর বয়সে জীবন-রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

❑ অশোককুমার গিরি

স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৬৩, ১২ জানুয়ারি	কলকাতার সিমুলিয়া দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম
১৮৭১	গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়
১৮৭৭	স্কটিশ চার্চ স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ।
১৮৮০	ব্রিটিশদের পক্ষে।
১৮৮৩, ৩১ মে	জেনারেল অসেম্বলি।
১৮৮৩, ১১ সেপ্টেম্বর	জেনারেল বুকলকাটার ক্রিকেটে শহরে বর্ষবরণের আগে।
১৮৮৩ থেকে ১৮৮৬	জেনারেল বুকলকাটার প্রায় সমস্ত প্রশ্নে প্রশ্ন ও পরিচয় কেন্দ্রের বাণী প্রচার।
১৮৮৬	জেনারেল কেন্দ্রে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৭	চলতে (প্রত্যেক) প্রত্যাবর্তন ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ।
১৮৯৮, মে	জেনারেল ফ্রেন্স বেল্ট রেখে নিবে ব্রহ্মবর্ষের অনুরোধ।
১৮৯৯, জানুয়ারি	বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা ও মঠ কাজ শুরু।
১৮৯৯, মার্চ	মায়াবতীতে (আলমোড়া) অদ্বৈত আশ্রম কাজ শুরু।
১৮৯৯, জুন	প্রথম থেকে আবার পশ্চিমে পাড়ি।
১৯০০, আগস্ট	ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে জেনারেল থেকে প্যারিসে আগমন।
১৯০০, ডিসেম্বর	চলতে প্রত্যাবর্তন ও বেলুড় মঠে আগমন।
১৯০২, ৪ জুলাই	বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের তিরোধান।

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য :

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ ইত্যা, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাভুক্ত দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। বৈদেশিক মুদ্রা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। বামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

নেতাজি কি সত্যই তাইহুকুতে মারা গিয়েছিলেন?

শেখর চ্যাটার্জি

সরকারিভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু ১৮ অগস্ট ১৯৪৫ সালে তাইপের তাইহুকু (বর্তমানে তাইপেই) নামক স্থানে হয়েছিল বলে বলা হচ্ছে। মৃত্যুর কারণ — জাপানি তিন ইঞ্জিন বিমানের ভেঙে পড়া। বলা হয়েছে যে ঐ বিমানে নেতাজি ছিলেন এবং বিমান দুর্ঘটনার ফলে গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন। ঐদিন রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে তিনি একটি জাপানি সৈনিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর কাহিনী সাদামাটা ভাবার আর পাঁচটা মৃত্যুর মতোই প্রচারিত হয় দিল্লি রেডিও কেন্দ্রে ১৯৪৫ সালের ২১ অগস্ট।

ব্রিটিশ ভারতের অধিকাংশ মানুষই নেতাজির এই মৃত্যুকাহিনী সত্য বলে মেনে নেননি। তদানীন্তন ভারতে ব্রিটিশ সরকারও এই কাহিনীকে সত্য বা অসত্য প্রমাণ করার কোন চেষ্টাও করেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবে নানারকম মতবাদের জন্ম হয়েছিল এবং অনেকে একে নেতাজিরই সৃষ্ট কোন কৌশল বলে ধরে নিয়েছিল। কারণ নেতাজির প্রকৃত অবস্থান গোপন রাখার জন্য যে কোনও কৌশল তখন জনমানসে স্বীকার্য ছিল। অতএব ব্যাপারটা নিয়ে কেউ তখন মাথাও ঘামায়নি। তবে যে প্রশ্ন এখনও ঘুরে ফেরে, তা এই যে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যে বিমানটি যাত্রার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল, সেটি একটি দুর্ঘটনার শিকার, না একটি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার?

এর ঠিক মুখরক্ষের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারপক্ষী গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অধীনে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে জওহরলাল নেহরুকে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা তুলে দেয়। এরপর চলতে থাকে নেতাজির মৃত্যুরহস্য বা অন্তর্ধান রহস্যজনিত নানাপ্রকার গল্পকথা। নানাপ্রকার স্বার্থান্বেষীমহল থেকে বিভিন্ন প্রকারের গল্পকথা চলতে থাকে। কেউ বলে নেতাজি বেঁচে আছেন, কেউ বলেন উনি এখন সন্ন্যাসীরূপে অজ্ঞাতবাসে আছেন, আবার কেউ বলেন উনি নাকি সোভিয়েত সাইবেরিয়ান জেলে বন্দি আছেন।

এ ধরনের কল্পকথা নেতাজির মৃত্যুর সত্য কারণকে চাপা দিতে সরকারি বয়ানের পক্ষকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে হত্যাকারীদের চক্রান্তকে সাহায্য করেছিল। তবুও জনমতের প্রচণ্ড চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ২৮ বছর পর স্বাধীন ভারত সরকারকে নেতাজির মৃত্যু নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। "নেতাজি তদন্ত ব্যুরো" নামক একটি বেসরকারি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ২১ অগস্ট থেকে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত-যাবতীয় গল্প, তদন্ত কমিশন, গবেষণা সবই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। অতএব নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য বা মৃত্যু রহস্য আজও আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। সুতরাং নেতাজির মৃত্যুসংক্রান্ত সরকারি কাহিনী আজও বহাল আছে।

এটা ধরে নেওয়া হত যে সরকারি তথ্য অনুযায়ী নেতাজি বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও স্পষ্ট নয়। স্বাভাবিক, দুর্ঘটনাজনিত না সুপরিকল্পিত হত্যা? ওঁকে হত্যা করা হয়েছিল কি না এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একটা পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে যে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার কোনও হাতে-নাতে প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও এমন কিছু প্রমাণিক তথ্য এখনও অবশিষ্ট আছে যা থেকে আমরা এই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে তাইহুকুর বিমান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কাহিনী মিথ্যে কল্পনাপ্রসূত এবং বন্দীদশায় তাঁকে দিল্লির লালকেল্লায় সুপরিকল্পিতভাবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্টের শূন্য মুহূর্তে (ডিক্রে আওয়ার) হত্যা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে মেজর হাসান চৌধুরি লিখিত "দ্য ডিসিশিভ টাইমস" বইটি পড়তে হবে। খোসলা কমিশন চৌধুরি'র তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তা প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মানেননি এবং অ্যাটলি ও মাউন্টব্যাটেন কেন নেতাজির হত্যা দিবসকেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তারও একটা গুঢ় তাৎপর্য আছে। মনে রাখতে হবে যে নেপোলিওনের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ২০০ বছর সময় লেগেছিল।

সত্যে উপনিত হতে পক্ষপাতমুক্ত হয়ে জানতে হবে নেতাজির রাজনৈতিক চিন্তাধারা, দর্শন ও তাঁর লক্ষ্যের সামগ্রিক ভিত্তি। গান্ধীজি মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। অন্যদের মধ্যে গান্ধী, নেহরু, মাউন্টব্যাটেন ও তদানীন্তন মুখ্য সচিব সিসিল গ্রাসনের সঙ্গে সুভাষবিরোধী ব্রিটিশ সম্পর্কে। জানতে হবে কারা ১২[illegible] সংগঠিত আন্দোলনে প্রবেশ থেকে শুরু করে গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনে পদে পদে বিরোধিতা করে গেছিল! প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজের সঙ্গে নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কিত সরকারি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসে নেতাজি বিরোধী অন্যান্য নেতাদের কার্যকলাপের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবেই আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো যে নেতাজিকে হত্যা করা কেন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে, নেতাজির জীবন বর্তমানকালের সকল বিপ্লবীদের কাছেই একটি জীবন্ত নিদর্শন। চার্চিলের একটি উক্তি উল্লেখ করে নেতাজি রেঙ্গুন থেকে বেতার ভাষণে বলেছিলেন "এতবড় শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধিকারী ইংরেজ যদি জিব্রাল্টার ঘুরিয়ে বিশ্বের দুয়ারে ঘুরে বেড়তে পারে, তবে আমাদের মত লাখ লাখ শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরস্ত্র একটি জাতির বাইরের থেকে কল খারাপ সাহায্য গ্রহণে দোষ কিসের?" এটা অনস্বীকার্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আজও বহাল আছে। সুতরাং যে স্বাধীনতার যুদ্ধ ২০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল, তার লক্ষ্য আজও পূরণ হয়নি। তাই নেতাজির ঐতিহাসিক স্লোগান-"দিল্লি চলো" আজও যৌক্তিকতা হারায়নি।

তাই আজ আকুল হয়ে বলতে ইচ্ছে করছে - 'তোমার কীর্তির চেয়ে/তুমি যে মহৎ/তাই আজ জীবনের রথ/পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার'। ❑

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

সবেদা ঃ স্বল্প মূল্যে মিষ্টি ফল

ড. দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)

সবেদা নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই মনে একটা খটকা দেখা দিল। কথাটা "সবেদা" না "সবেধা"? নিশ্চিত হতে সংসদের বাঙ্গলা অভিধান দেখি। কিন্তু সেখানে ওই শব্দ দুটির কোনওটিরই সন্ধান মেলে না. ভাবি, তুলনামূলক শব্দটি হয়ত বাদ পড়ে গেছে, তাই বাধ্য হয়ে দেখি অক্সফোর্ডের বঙ্গীয় শব্দকোষ। কিন্তু না, সেখানেও হতাশ হই। এইভাবে চলতিকা, অভিধান ও শব্দকোষ মিলিয়ে হাত ভজন বই ঘাঁটার পরও ওই শব্দদ্বয়ের একটিরও হদিস পেলাম না। তবে কি শব্দটি আনা কিছু? এই নিয়ে মনে সন্দেহ দানা বাঁধে, অতএব, প্রথম থেকে আবার নতুন করে বিস্তারিতভাবে খোঁজা শুরু করি। অবশেষে মিলল। কিন্তু এ কি! আমার সন্দেহই দেখি যথার্থ। কথাটি তো ওই দুটির একটিও নয়। শব্দটি আসলে "সপোটা"। অনেকটা এর ইংরেজি নাম "Sapota"-র ন্যায়। হিন্দিতে একে "চিকু" বা "ওড়ামু" বলা হয়। এই সপোটাই সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের মুখে ঘুরতে ঘুরতে অপভ্রংশ হয়ে আমাদের কাছে এখন "সবেদা" বা "সবেধা" নামেই বেশি পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই রচনার পরবর্তী পর্যায়ে তাই অধিক প্রচলিত সবেদা কথাটিই ব্যবহার করা হয়েছে। যাই হোক এ-সব তো গেল ব্যাকরণের কচকচি। এবার আসা যাক মূল বিষয়ে।

সবেদা আমাদের নিকট অতি পরিচিত এক মরসুমি ফল। বাজারে এই ফল সাধারণত মার্চ-এপ্রিল বা অগস্ট-সেপ্টেম্বরে বেশি ওঠে। নানা জাতের সবেদা বাজারে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে "ক্রিকেট বল" "ক্যালকাটা রাউণ্ড" ও "বাদামালোবা" জাতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা অন্যদের তুলনায় আকারে বড়, মিষ্টি ও রসাল হয়। সবেদার আদি নিবাস সেই মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চলে। এর পোশাকি নাম *Achras sapota*। ভারতে সবেদা চাষের প্রবর্তন কবে থেকে হয়, সঠিকভাবে সেটি বলা মুশকিল। বাড়ির আশেপাশে, খালি জমিতে বা বাগানে এই গাছ সহজেই বেড়ে ওঠে। এই ফলের ৮০ শতাংশ আহার্য।

খাদ্য গুণ ঃ গোল বা অর্ধ ডিম্বাকৃতি, বড়, ধূসর, মিষ্টি, শাঁসাল এবং বিচি কম সবেদা সবার এক প্রিয় ফল। স্বল্প দামে, সবেদা স্বাদে এবং খাদ্য গুণে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। সবেদা কার্বোহাইড্রেটস, আয়রণ ও পটাসিয়ামের এক ভাল উৎস। প্রতি ১০০ গ্রামে এই তিন উপাদানের পরিমাণ যথাক্রমে ২১.৪ গ্রাম, ২.০ মিলিগ্রাম এবং ২৬৯ মিলিগ্রাম। এত বেশি মাত্রায় কর্বোহাইড্রেটসের উপস্থিতির জন্যই সবেদা খেতে মিষ্টি লাগে। এ-ছাড়া স্বল্প পরিমাণ ফ্যাট, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যারোটিনও এতে বর্তমান। এই ফলের ত্বক পর্যন্ত আহরণীয় এবং খাদ্য গুণে শাঁসের থেকেও উত্তম।

ভেষজ গুণ ঃ সবেদার বিচি মৃদু মূত্র বৃদ্ধিকারক এবং মৃদু রেচক (mild laxative)। এই গাছের ছাল থেকে টনিক ও জ্বর কমানোর ভাল ওষুধ প্রস্তুত হয়। ডায়ারিয়া বা উদরাময় নিরাময়েও এই গাছের বল কাজে লাগে। ভাল পাকা এবং মিষ্টি সবেদাকে কীভাবে বিভিন্ন রোগ সারাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারই কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল। তবে সবেদা যেভাবেই খান, খাওয়ার পর খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেওয়া ভাল।

● **শারীরিক দুর্বলতায়** ঃ অল্পতেই যাদের রক্তের চাপ কমে যায় সেই সঙ্গে বুক ধড়ফড় করতে থাকে। তাদের ক্ষেত্রে পাকা সবেদা খুবই উপযোগী। সবেদার খোসা এবং বিচি ছাড়িয়ে, এমনি খেতে পারেন অথবা ১৫০ গ্রাম সবেদা, পরিমাণ মতো জল চটকে, অল্প লবণ মিশিয়ে সরবৎ বানিয়েও খেতে পারেন ; যেমনটি ইচ্ছে। মাস খানেক, এই ভাবে খেতে পারলে চমৎকার উপকার পাওয়া যাবে।

● **অপুষ্টিতে** ঃ যে-সব শিশু অপুষ্টি রোগের শিকার, তাদেরকে যদি বেশ কিছুদিন পাকা সবেদা (৫০ গ্রাম) করে খাওয়ানো যায় এবং ধীরে ধীরে ওই মাত্রা বাড়ানো যায়, তা হলে দেখা যাবে বাচ্চাটির আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। দিনে দু-বার করে খাওয়াতে পারলে বেশি ভাল হয়।

● **ক্লান্তিতে** ঃ অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ শরীরে ক্লান্তি বোধ হলে ১৫০ গ্রাম মতো পাকা সবেদা নিয়ে, বেশ চটকে এক গ্লাস জল মিশিয়ে সরবৎ বানিয়ে খেলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তি দূর হবে।

● **মায়ের দুধ বাড়াতে** ঃ বাচ্চা হওয়ার পর মায়ের দুধ বাড়াবার জন্য মাকে যদি পাকা সবেদা (১৫০ গ্রাম মতো করে) ২ মাস খাওয়ানো যায়, তা হলে বাচ্চাকে অন্তত বাইরের দুধ খাওয়ানোর হাত থেকে রেহাই পাবেন। সেই সঙ্গে মা ও বাচ্চা দুজনেই সুস্থ থাকবে।

তবে যারা ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন, তাদের সবেদা একদম না খাওয়াই ভাল

বাণিজ্যিক গুণ ঃ পাকা সবেদা থেকে জ্যাম, জেলি, স্কুকোজ, পেকটিন, ফ্রুট স্যালাড, মিল্ক কেক, প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। এ-ছাড়া নানাবিধ মিষ্টি এবং হজমি তৈরিতেও সবেদার শাঁস ব্যবহৃত হয়। কাঁচা সবেদা থেকে দুধ সাদা এক রকম রস নিঃসৃত হয় যেটাকে "চিকলি" বলে। এই চিকলি চিকলেট ও চুয়িং-গাম তৈরির মূল উপাদান। বিদেশেও চিকলির চাহিদা ভাল। সুতরাং বাণিজ্যিক দিক থেকেও এর মূল্য অনস্বীকার্য। উপরন্তু, কাঁচা সবেদার মধ্যে "সাপোটেক্সিন" নামে হেতো এক রকমের উপাদান থাকে, যেটা ওষুধ উৎপাদনেও ব্যবহার হয়। অতএব, সার্বিক বিচারে সবেদাকে অল্প দামে এক সুস্থ ও উপকারী ফল বলা যেতে পারে ❑

'উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিনিয়োগের দ্রুতগতি, ক্রমবর্ধমান বেকারি এবং নজুরি হ্রাসের প্রবণতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দিতে না পারলে তার বিরুদ্ধে প্রবল রাজনৈতিক প্রত্যাঘাত অনিবার্য, যা মুক্তবাজার নীতির প্রতি মানুষের আস্থাকে বিসর্জন করবে।'

— আঙ্কটাড রিপোর্ট, ১৯৯৭

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

প্রসঙ্গ ঃ সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনা

ধনঞ্জয় মিত্র

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যে কোন উল্লেখেই বাঙালি তথা ভারতীয় জনের নন্দনতন্ত্রী সত্তাসুরে বেজে ওঠে — আঘাত করে তার জাতীয়তাবাদী সত্তায়, তার রোমান্টিক সত্তায়। সুভাষচন্দ্রের বর্ণময় জীবনালেখ্য যেমন, তাঁর মেধাবী ছাত্রজীবন, কিন্তু ছাত্র অবস্থাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ, মি ওটেনের ভারতনিন্দার প্রতিবাদ, পরিণতিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার, স্যার আশুতোষের মধ্যস্থতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক, আই সি এস পরীক্ষায় সফল কিন্তু চাকুরি পরিত্যাগ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, গান্ধীবাদের বিরোধিতা, কংগ্রেসের ভিতরে থেকে বামপন্থী আন্দোলন, আর পরিশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করা — আমাদের প্রবলভাবে কিলিত করে, মুগ্ধ করে।

সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন — সুভাষের শৃঙ্খলিত, অবনমিত মানুষের প্রতি ভালবাসা তথা দেশপ্রেম হয়তো জন্ম নিয়েছিল স্বামীজির বহুশ্রুত সেই বাণী থেকে — "জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অন্তত প্রথম জীবনে একটি দ্বৈতসত্তা ছিল, তাঁর অধ্যাত্মপ্রেম, আর তাঁর দেশপ্রেম। তবে সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেশপ্রেমই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অধ্যাত্মপ্রেম হয়তো তাঁর জীবনে ছিল সুপ্ত — সুভাষ হয়তো ছিলেন গৃহী-যোগী। হয়তো ইতিহাস প্রমাণ করবে এর সত্যতা।

যাই হোক, এই প্রবন্ধের অবতারণা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক ভাবনা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মুখবন্ধেই পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন — সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা তাঁর স্বতন্ত্র দেশপ্রেমের থেকে আলাদা কিছু নয়, বরং বলা যায় তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুটিরই যা উদ্দেশ্য তা হল সাধারণ মানুষের মুক্তি, শুধুমাত্র ব্রিটিশ প্রভুদের শোষণ-শোষণের থেকে নয়, অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনেও সুভাষচন্দ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে মোটেই আগন্তুক বা অনধিকারী ছিলেন না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তাঁকে রীতিমত অর্থনীতি অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, মাত্রপঁচিশ সুভাষচন্দ্র সেই ১৯২১ সালেই উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনের ভূমিকা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ ঘোষ ছাড়াও সুভাষচন্দ্রের উপর প্রভাব ফেলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। আই সি এস পরীক্ষার পর ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে দেশে ফেরার সময় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক। বিজ্ঞান তথা যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় আমরা পাই এরই প্রতিধ্বনি। সুভাষচন্দ্রের উপর আরেকজনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি হলেন বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা। ১৯২২ সালে সুভাষের বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হলেন। বিজ্ঞানী সাহা স্বপ্ন দেখতেন আধুনিক যন্ত্রশিল্প আর শিল্পায়নের সাহায্যে ভারত ইউরোপের দেশগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠছে। তিনি তাই এই সম্মেলনে "জাতীয় উন্নতির উপায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। মনে রাখতে হবে, সোভিয়েত রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহু আগে থেকেই বিজ্ঞানী সাহা এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন।

এল ১৯৩৮ সাল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে গুজরাতের হরিপুরাতে সুভাষচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৩৮ সালেরই মে মাসে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির (ওয়ার্কিং কমিটির) এক বৈঠক ডাকলেন। কংগ্রেসের অধীন সাত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য আহ্বান করলেন। আবার এই বছরের জুলাই মাসেই কার্যনির্বাহক সমিতির আর একটি সভায় আঞ্চলিক শিল্পনীতির পরিবর্তে সর্বভারতীয় স্তরে শিল্পনীতির ঘোষণা করলেন। এই সভাতেই কংগ্রেসের অধীন প্রদেশসমূহের শিল্পমন্ত্রীদের আলাদা এক সম্মেলন আহ্বান করা হল, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দিল্লিতে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে। এই সম্মেলনে এক জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল কংগ্রেস সভাপতিকে। শিল্পায়নের ভাবনা সুভাষচন্দ্রের ছিল খুবই স্বচ্ছ। অধ্যাপক সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে ১৯৩৮ সালেই তিনি বলেন, 'ভারতের পুনর্গঠন শিল্পবিপ্লব ছাড়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এখন বিচার্য, এই শিল্পবিপ্লব কি গ্রেট ব্রিটেনের মত ধীরগতিতে হবে, না সোভিয়েত রাশিয়ার মত দ্রুতলয়ে বাধ্যতামূলকভাবে অগ্রগতি হবে? (সুভাষের ভাষায় Forced march)। আমার মতে ভারতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই প্রযোজ্য।'

এখন দেখা যাক, সুভাষচন্দ্রের শিল্প-বিপ্লবের ধারণা কি ছিল। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, সুভাষের এই শিল্পায়নের প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চরম বিরোধিতার সৃষ্টি করে। কেননা ওঁরা আধুনিক সভ্যতার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে ছিলেন, যেমন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, হাসপাতাল, এমনকি ডাক্তারি এবং ওকালতির বিরুদ্ধেও। ওঁদের ধারণা ছিল এগুলো সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনবে। ওঁরা তাই প্রাচীন ভারতের রামরাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাইতেন। চরকা আর গরুর গাড়ির

রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন।) সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, শিল্পায়নের সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক, সুভাষের এই শিল্পপ্রস্তাবের প্রধান ধারা দুটি। যেমন,

(ক) ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, (খ) মোটর গাড়ি, মোটর বোট ইত্যাদি তৈরি করা, (গ) ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি তৈরি করা, (ঘ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কৃষি-সার তৈরি করা, (ঙ) বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করা এবং (চ) তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা।

প্রয়োজনমত দেশি-বিদেশি ঋণ গ্রহণেও সুভাষচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। সুভাষচন্দ্র এই প্রসঙ্গে টেনেছিলেন আমূল ভূমিসংস্কার ও জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ। আরও টেনেছিলেন জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার বিস্তার। টেনেছিলেন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য চাইলেন সমবায় প্রথার বিস্তার। চাইলেন কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। আরও চাইলেন, স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমস্ত দেশের অর্থনীতির রাশ মুষ্টিমেয়র হাতে না রেখে এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে যাতে রাষ্ট্র তথা জনগণের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে। একটি পরিকাঠামো রচনা করতে যাতে স্বাধীনতা অর্জনের পর অবিলম্বে জনসাধারণের উন্নতির কাজ শুরু করা যায়। পরিকল্পনা রচনার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল জনগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করতে সাহায্য করা, যাতে তারা বুঝতে পারে ব্রিটিশ প্রভুরা তাদের কি দীনহীন অবস্থায় রেখেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি টেনেছিলেন আগে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি, পরে অর্থনৈতিক উন্নতি। তিনি আরও টেনেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শুধু স্বাধীনতা অর্জনই নয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও তার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন-প্রকৃতি কীরকম হওয়া প্রয়োজন তার রূপরেখা সুভাষচন্দ্র দিয়েছিলেন ১৯৪২ সালে জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভারতে উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্র এমন কিছু অভিনবত্ব ও স্বকীয়তা থাকবে যা থেকে সারা বিশ্ব লাভবান হতে পারবে।'

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা অবশ্যই মার্কসীয় দর্শন তথা লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে প্রভাবিত হয়েছিল। তবে আক্ষরিকভাবে সুভাষচন্দ্র কোনদিনই কমিউনিস্ট ছিলেন না। এই সুযোগে লেখে নেওয়া যাক, সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত কেমনভাবে তাঁর উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে বলি, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে নিপীড়ন-নিষ্পেষণের দিক থেকে মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর চিন্তাশীল মনে এটাও প্রতিভাত হয়েছিল যে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই, রাশিয়া নয়। তাই ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসীয় দর্শনের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। তিনি তাঁর সমাজবাদকে আখ্যা দিয়েছিলেন সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদ সোভিয়েত ধারানুবর্তী নয়, স্বামী বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত। যাই হোক, সুভাষের অর্থনৈতিক ভাবনা সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে ছিল মোটামুটিভাবে চার রকমভাবে আলাদা। তিনি বলেছিলেন, "ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার নকল সংস্করণ হবে না।" এবার দেখা যাক কিভাবে আলাদা। এক, সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ দেশের যা কিছু উন্নয়ন তা হত কেন্দ্রের নির্দেশে। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন অর্থনীতির বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চ বা পঞ্চায়েত স্তরে। দুই, সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পায়ন ছিল একদেশে, ভারী আর সামরিক শিল্পের উন্নয়ন ছিল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন কৃষি ও শিল্পের সমান উন্নতি। তিন, সোভিয়েত রাশিয়ার জমির মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের — বদলে সুভাষ চেয়েছিলেন সমবায় প্রথা। চার, সোভিয়েত গণতন্ত্রে অর্থনীতির পরিচালনা করতেন রাজনৈতিক শক্তি — সুভাষচন্দ্র এখানে বিশ্বাস করতেন গণশক্তিতে। তিনি চেয়েছিলেন দেশের জনগণের মধ্যে উৎপাদিত সম্পদ যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন জহরলাল নেহরু। যেহেতু সুভাষচন্দ্র চাইতেন সবরকম শিল্পই, অর্থাৎ ভারী, মাঝারি এবং কুটিরশিল্প বিকশিত হোক, তাই তিনি এই কমিটিতে বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, অধ্যাপক, অর্থমন্ত্রিকারী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, প্রাদেশিক শিল্পের, প্রাদেশিক সরকারের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া। অতঃপর ১৯৩৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বোম্বাইতে প্ল্যানিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল। তবে কাজ খুব একটা এগোলো না। আর সেটা বোধহয় গান্ধী অনুগামীদের অসহযোগিতার জন্য। অবশ্য সুভাষ প্ল্যানিং কমিটি গড়ার দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তার মূল বক্তব্য ছিল হাস্যকর। যেমন, বামপন্থীদের সংসর্গ রাখা, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গড়ে গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেওয়া, আর তৃতীয়ত, কেন সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম অবিলম্বে শুরু করার পক্ষে ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরস্কার আরও পেলেন সুভাষচন্দ্র। শুধুমাত্র কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে তিনি অপসৃত হলেন তাই নয়, দল থেকেও তিনি বহিষ্কৃত হলেন।

তারপর ১৯৪১ সালে ঘটল তাঁর মহানিষ্ক্রমণ। বাকি ইতিহাস। ১৯৪৪ সালে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "আমি মানুষের উপর বিশ্বাস রাখি। একজন যদি নীতিবান হয়, নিঃস্বার্থ হতে পারে, তাহলে সমগ্র জাতি কেন সেই উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারবে না তার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না।"

সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত দেশপ্রেম সহজকে উদ্বুদ্ধ করেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সুভাষ নিজে শুধুমাত্র দেশপ্রেমের আবেগে ভেসে যাননি, তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা, তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। আজ সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণগুলি, সিদ্ধান্তগুলি অনেকেই বিস্মৃত। কিন্তু সময় এসেছে বোধহয়, সুভাষের কর্মপন্থাগুলি কাজে পরিণত করতে। সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এই হোক না আমাদের ব্রত। ❑

'.... ভারতের চিরপদদলিত
শ্রমজীবী! —
তোমাদের প্রণাম করি।'

❑ স্বামী বিবেকানন্দ

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Business of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ির ডোকরা শিল্প

সমীর বসুঠাকুর

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক বিকাশ ও স্বনির্ভর হবার লক্ষ্যে 'ডোকরা' শিল্প প্রকল্প আজ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলেছে। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার উৎসাহে জেলার বিভিন্ন ব্লকের নিম্ন আয় বিশিষ্ট ১০ থেকে ১৫ জনের গ্রুপ করে নানাবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আই আর ডি পি স্কিমে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি সমবায় প্রশিক্ষণ তথা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে প্রধ্যক্ষ অনুপকুমার ঘোষের ব্যবস্থাপনায় জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষিত হয়ে গত ১৯৯০-৯১ সাল থেকে বিভিন্ন ব্লকের মহিলারা আজ তাদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, বিভিন্ন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার নানা পরামর্শ তাদের যথেষ্ট উপকৃত করেছে।

সম্প্রতি জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার বদান্যতায় জেলার বিভিন্ন সকল ডোকরা গ্রুপগুলির সাথে সরেজমিনে তাদের উৎপাদিত ক্রিয়াকর্মের ধারা দেখার সুযোগ হয়েছিল। জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পূর্বে নাগরাকাটা ব্লকের ওলকাপাড়া গ্রামের বাড়ি এলাকায় মনতাজ বেগমের নেতৃত্বে কাজ চলছে মাশরুম চাষ, নাইলন ব্যাগ তৈরি, মৌমাছি পালন, মুরগি পালন ও সামাজিক বনসৃজনের উল্লেখযোগ্য কাজ। কথা প্রসঙ্গে মনতাজ জানালেন, ১৯৯২ সালে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে ১৫ জনের গ্রুপ ভালো ভাবে কাজ করে চলেছে। আই আর ডি পি ১৫,২০০ থেকে টাকা প্রথম কিস্তি ও পরে ১০ হাজার টাকা দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে বর্তমানে তাঁরা কাজ করে চলেছেন এবং মাসে প্রায় ৩৫০ টাকা সদস্যরাপ উপার্জন করছেন অনেক সময় এরও বেশি আয় হয়ে থাকে। তাঁদের উৎপাদিত পণ্য দুয়ার্স ছাড়া অসম ও সিকিমেও পাঠানো হয়ে থাকে। এই ব্লকেরই জয়ন্তীপল্লীতে দেখা গেল লক্ষ্মী সরকারের নেতৃত্বে ১৫ জন মহিলা তাঁত বুনে গামছা, রুমাল তৈরি করছেন। এদেরও বাজার বেশ ভালো, তাছাড়া ফল নিয়ে তাঁরা গাড়ী কিনে দূর যোগান দিয়ে থাকেন। আরেকটি গ্রুপের নেত্রী গীতা দেবনাথ জানান, তাদের ১০ জন মহিলা সদস্যা মাশরুম চাষ করছেন। এই ব্লকের সুভাষপল্লীতে ইন্দিরা ডোকরা প্রকল্প গড়ে তুলেছেন রূপালী বসুরা। তাঁর সদস্যাদের মধ্যে অধিকাংশই আদিবাসী উপজাতি শ্রেণীর। এঁদের মাশরুম চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এত সুন্দর যে দেখে খুব ভালো লাগে। অসম, সিকিম ও দুয়ার্সে এঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত হচ্ছে। মাশরুম চাষের বিশেষ প্রশিক্ষক রণজিৎ বিশ্বাসের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা তাদের সুন্দর প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। তার বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৫ জন। মাশরুম চাষ ছাড়াও তারা কয়েকটি পুকুরে মৎস্যচাষ করছেন জেলা মৎস্যচাষ উন্নয়নে সংস্থার উদ্যোগে।

ময়নাগুড়ি ব্লকের বাগড়াবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে টেংটুলি গ্রামে চাষ হচ্ছে রেশম। পঞ্চায়েত — তখন নিরঞ্জন সরকারের সহযোগিতায় গ্রুপ নেত্রী উষারানী রায় ১৫ জন সদস্যাকে নিয়ে চাষ করে চলেছেন ৫০০ একর জমিতে, রেশম চাষ টিকাটুলি, বাশিলার ভারা, নরেন্দ্রপুর ও ধর্মকোমারি গ্রামে গত ৪ বছর ধরে চাষ করে চলেছে। তাদের রেশমগুটি মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মেদিনীপুরে পাঠানো হচ্ছে এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তারা কাজ করে চলেছেন বলে উষারানী জানিয়েছেন। তাছাড়া সুদূর চিন থেকে তারই স্বামী গত বছর নভেম্বর মাসে এই চাষের উপযুক্ত শিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। তিনি ফিরে এসে উন্নতমানের ধারায় এদেরকে সহযোগিতা করে চলেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে রেশম ভালো বিক্রয় হবার সুবাদে ১৯৯৬ সালে রাজ্য সরকার এই ডোকরা গ্রুপকে পুরস্কৃত করেছিলেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। গ্রাম-প্রধান নিরঞ্জন সরকার জানিয়েছেন গত অক্টোবর মাসে এই ব্লকে রেশম বিক্রি হয়েছিল ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। নাগরাকাটা শহরে স্বপ্না চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১০ জন সদস্যা তৈরি করেছেন প্রগতি ডোকরা গ্রুপ। এরা বাজার থেকে মশলা কিনে গুড়ামশলা তৈরি করে ব্যবসা করেছেন। এদেরও বিক্রি বেশ ভালো বলে জানা গেল।

নাগরাকাটা ব্লকের এক্সটেনশন অফিসার, (সমাজ শিক্ষা বিভাগ) শ্রীমতি সীমা চৌধুরী জানান এই ব্লকে ৩০টি গ্রুপ আছে, তবে মাত্র ১২টি গ্রুপ অত্যন্ত ভালো কাজ করছে। জলপাইগুড়ি জেলার অন্য ব্লকেও ডোকরা শিল্প বেশ ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা উৎসাহের সাথে দুঃস্থ মহিলাদের এ জাতীয় প্রকল্পে যুক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ❑

"আজ আমার কাজ হলো বাইরের জগতকে ভারতবর্ষের ঘটনা জানানো এবং ভারতবর্ষের প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করা। ভারতবর্ষের এই মহাসংগ্রাম সম্পর্কে ভারতবর্ষের বন্ধুরা যেসব সংবাদ প্রচার করছে তা যদি আপনারা নিজের চোখে দেখতেন এবং কানে শুনতেন তাহলে আপনারা বুঝতেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষ কতটা সহানুভূতি পায়।"

সুভাষচন্দ্র বসু

(বের্লিন থেকে বেতার বক্তৃতা, ৩১ অগাস্ট ১৯৪২)

পুরানো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সমবায় বছরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরানো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে এই আশায়]

জানুয়ারি

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
১	১৮০১	ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়
	১৮১৪	পদার্থবিদ বিজ্ঞানাচার্য ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন
	১৭৫৭	রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে বন্দরটির পুনরাধিকার করেন। কলকাতা ক্লাইভের হাতে আসে।
	১৯১২	ন্যাশনাল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট গঠিত হয়।
	১৯৭৮	ইন্দিরা গান্ধীকে প্রেসিডেন্ট করে কংগ্রেস (আই) গঠিত।
	১৭৯৯	লর্ড ওয়েলেসলির আদেশ অনুসারে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের হাউস ভেঙে বর্তমান রাজভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়।
	১৯৬৭	কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্কসিস্ট) মুখপত্র "গণশক্তি"র প্রকাশ।
	১৮৫০	মধুসূদন রায়ের অর্থানুকূল্যে তাঁরই প্রেস থেকে "হিন্দু পেট্রিয়ট" প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
	১৯০৬	প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
	১৯০৪	কলকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড-এর মধ্যে প্রথম ক্রিকেট টেস্ট শুরু।
	১৯৭৮	ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত।
	১৯৪৭	ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
	১৯৭১	বাবু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (পি সি) সরকারের দেহত্যাগ।
	১৮৯৭	বি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বাংলা সরকারের অনুমোদন পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার নাম সি ই এস সি লিমিটেড।
	১৯১৪	বিনা বেসরকারিকরণের অনুকূলে রাম মনোহর কমিটির সুপারিশ দাখিল। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে একাধিক সদস্য সংক্রান্ত বিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি।
	১৬৪২	"পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে" - এই মত পোষণ ও প্রচারের অপরাধে গ্যালিলিও গ্যালিলিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
	১৯৭২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি।
	১৯৭৬	সিংহল প্রধানমন্ত্রী সি-এন-বন্দরনায়কের মৃত্যু।
	১৭৫৭	রবার্ট ক্লাইভ বজবজ ও কলকাতা অধিকারের পর হুগলি অধিকার করেন।
	১৯১৫	দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজির ভারতে প্রত্যাবর্তন।
	১৬৯৩	কলকাতার প্রাণপুরুষ জোব চার্নক কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।
	১৮৩৪	৮৮, বেলগাছিয়া রোডে হেয়ার স্কুলের স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালীন নাম কলেজ হাইস্কুলিয়েট ডেটেনশাস্ট্রি স্কুল।
	১৯৬৬	হরিয়ানা রাজ্য গঠন। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দে চুক্তি। ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু।
	১৮৬৩	কলকাতার সিমলায় দত্ত পরিবারে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯০৪	সূর্যসেন (মাস্টারদা) চট্টগ্রামে ফাঁসিতে প্রাণত্যাগ করেন।
	১৯৭২	শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।
	১৯২০	"লিগ অফ নেশনস্"-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা।
	১৯৫৭	এশিয়ার বৃহত্তম ৪৮০১ ফিটের দীর্ঘ ইস্পাতসেতু (উদ্বিদ্যাদ) বাঁধ উদ্বোধন।
	১৯০৮	রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের এবং পরমহংসদেবের মর্মরমূর্তির উন্মোচন করা হয়।
	১৯৪৮	বর্মার স্বাধীনতা লাভ।
	১৯৫৪	স্বাধীনতা সংগ্রামী অক্রূরচন্দ্র বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।
	১৭৮৪	স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর প্রথম সভাপতি এবং ওয়ারেন হেস্টিংসে প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
	১৯১৯	সিমফারোপোল সমাজতন্ত্রী লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) সমসাময়িক ও সহযোগী রোজা লুক্সেমবার্গের (১৮৭১-১৯১৯) হত্যা। পোলাণ্ডের ইহুদি পরিবারের এই মহিলা জার্মানি তথা ইউরোপের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর সংগঠক ছিলেন। জেরিজিয়াম জেসুইটদের তত্ত্বাবধানে বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওস্তাদী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পার্ক নার্সিংহোমে রবিবার সকাল ১০-১০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। পাঞ্জাবের কমিনদের মেয়ে যার আমেরিকান ব্লাড: ইনস্টিটিউট জী সিদের হ্যারিসন'র জীবন সঙ্গিনী কল্পনা চাওলাকে মহাকাশচারী হিসাবে আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (নাসা) 'মিশন এস টি এস- ৮৭' এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য নির্বাচন। সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানিতে পৌঁছবার জন্য সলস্ত প্রস্তাবে কাঁকরি দিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে অন্তর্ধান।

059 · 9144/BANG

তারিখ	সনের	স্মরণীয় ঘটনা
১৮	১৯০৩	নবনির্মিত দ্য স্টেটসম্যান-হাউস-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাংলার গভর্নর স্যার জন উডবার্ন।
১৯	১৯০৫	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেহত্যাগ করেন।
	১৯৫৬	অধ্যাদেশের মাধ্যমে জীবন বিমার জাতীয়করণ।
	১৯৭৫	চিন কর্তৃক নতুন সংবিধান প্রবর্তন।
	১৮১৭	আপার চিৎপুর রোডের সোরাটাঁস বসুবংশের বাড়িতে মাসিক ৮০ টাকা ভাড়ায় মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে হেয়ার হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ) অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।
	১৯৭২	ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণমর্যাদা, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য স্বীকৃত। নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম গঠিত।
	১৯৮৮	সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফর খাঁনের মৃত্যু।
	১৯২৪	বিপ্লবাত্মক মহাবিপ্লবী ভট্টাচার্য্য ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন)-এর মৃত্যু।
	১৯৫৫	বিপ্লবী রাসবিহারী বসু টোকিয়োয় দেহত্যাগ করেন।
	১৮৫১	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন
	১৮৯৭	নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৬৯	শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে অশ্বারোহী সুভাষচন্দ্রের মূর্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মোলাইয়ের ব্যবসায়ী দ্বারকা নাথ ইরাজলকার ১৫ ফুট উঁচু ৮ টন ওজনের ব্রোঞ্জের এই মূর্তিটি দেড় লাখ টাকায় তৈরি করেন।
	১৯৭৫	নেতাজি ইণ্ডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।
	১৯৭৭	জনতা পার্টি গঠন।
	১৮৫৭	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
	১৯৫০	"বন্দেমাতরম" ও "জনগণমন"-গান দুটি ভারতীয় ডাইনে সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয়।
	১৯৬৫	প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন লিওনার্দ স্পেনসর চার্চিল পরলোক গমন করেন।
	১৯৬৬	ওলহারিলাল নেহরুর নিকট থেকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ।
	১৮২৪	মাইকেল নবসূদন দত্ত হুগলির জেলার কপোতাক্ষ নদী ঈশ্বরী সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৫৪	বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) দেহত্যাগ করেন।
	১৯৭১	ত্রিমাচল প্রদেশ পূর্ণ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত।
	১৯৫০	পরাধীন ভারতে প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।
	১৯৫০	ভারতকে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে সংবিধান কার্যকর হয়। হেস্টিংস্যাল গার্ডেন-এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'ইণ্ডিয়ান মোটনিস্যাল গার্ডেন', এবং লাটভবনের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'রাজভবন'।
	১৮৬৫	কলিকাতা-ইউরোপ টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়।
	১৯২১	ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে ও ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ যুক্ত হয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। এই 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' ১৯৫৫ সালে জাতীয়করণ হওয়ার পর পরিচিত হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া হিসাবে।
	১৮৮২	কলকাতা-বোম্বাই ভূগর্ভে যুক্ত হয়। 'ওরিয়েন্টাল টেলিফোন কোম্পানি', নাম নিয়ে কলকাতা টেলিফোনের ইতিহাসে শুরু।
	১৮৯৮	স্বামী বিবেকানন্দ মিস মার্গারেট নোবেলকে কলকাতায় অভ্যর্থনা জানান।
	১৭৮০	কলকাতার প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। ইংল্যান্ডে 'দি টাইমস' প্রকাশিত হয় এরও অনেক বছর পর। জেমস অগাস্টাস হিকি ছিলেন বেঙ্গল গেজেটের সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশক।
		'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার' প্রতিষ্ঠিত হয়
৩০		বড়লাট লর্ড কার্জন পুস্তক বন্ধু মৌলবাক হলে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি' উদ্বোধন করেন। প্রথম গ্রন্থাগারিক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জন ম্যাকফারলেন, পরে স্যার হরিনাথ দে।
		'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি'কে ন্যাশনাল লাইব্রেরি' হিসাবে স্বীকৃত এবং নাথুরাম গডসের গুলিতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।
		সমাজ সেবক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নিরদচন্দ্র পাণ্ডী জন্মগ্রহণ করেন।
		মরুর-জাতীয় পক্ষি হিসাবে স্বীকৃত হয়।
		হাওড়া স্টেশনে মূল সাবওয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

(এ. মাস)

ভ্রম সংশোধন : ডিসেম্বর '৯৭ সংখ্যা

পৃষ্ঠা	তারিখ	আছে	হবে
২	১৬		১৯৭১
৪	২৯		১৮৪৪

ভারতীয় ভাণ্ডার '৯৭ সংখ্যায় উৎপল চক্রবর্তীর লেখা "পরিকল্পনার পাঁচ দশক : দারিদ্র্যমোচন ও প্রাথমিকশিক্ষা" নিবন্ধটির ১৫২ পৃষ্ঠার সারণি - ২-এ তামিলনাড়ুর সাক্ষরতার মোট হার ভুলবশত ২২.৬৬ শতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ হার ৬২.৬৬ শতাংশ হিসাবে পড়তে হবে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক

P 10,243

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

দি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৫৪-৪৯৩১/৩৫৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ মাতৃত্বিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য নেদিমীপুর ও সল্টলেক কলোনাইজেশন ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ইহা, ফেডারেশন বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক উন্নয়নে গঠিত একটি একনিষ্ঠশীর্ষ সংস্থা।

সমবায় সমাচার

জেলায় জেলায় সমবায় সপ্তাহ পালন

কলকাতায় সমবায় সপ্তাহ

১৪-২০শে নভেম্বর সারা দেশের সাথে কলকাতা শহরেও ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হল।

সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিন (১৪ নভেম্বর) কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের অফিস প্রাঙ্গণে কলকাতার বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি নিরুপম চক্রবর্তী। তিনি এ শহরে সমবায়ের প্রসারের কাজে কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের আন্তরিক প্রয়াসে সবরকমের সহযোগিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির প্রতি আহ্বান জানান। প্রবীণ সমবায়ী বাসুদেব চ্যাটার্জি সমবায় সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য ও সাতরঙা সমবায় পতাকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এদিন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড স্ট্রিটে তাঁদের পুনর্নির্মিত নিজস্ব সমিতি ভবনে সমবায় পতাকা উত্তোলনের ও আয়োজন করেন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি বাসুদেব চ্যাটার্জি।

কলকাতা আর্মড পুলিশ (২য় ব্যাটেলিয়ন) কনজিউমার্স কো-অপঃ সোসাইটির বি টি রোডের কার্যালয়ে এদিন সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সম্পাদক প্রভাস দাস। এবং বিকালে ফুলবাগান দি আই টি স্কিমের পূর্বাশা সমবায় আবাসন সমিতিতে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির চেয়ারম্যান বাসুদেব রায়চৌধুরী।

সমবায় সপ্তাহের চতুর্থদিন ১৭ নভেম্বর, ক্যালকাটা টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে ক্যালকাটা টেলিফোন রিক্রিয়েশন হলে একটি সভার আয়োজন করেন প্রধান অতিথি এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আবাসন সমবায় ফেডারেশনের প্রশাসনিক পর্ষদের সভাপতি শঙ্কর দত্ত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পার্থ সেনগুপ্ত, বলরন ভাদুড়ি এবং সমিতির সম্পাদক শুভেন মুখোপাধ্যায়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বাচরণ দুবে।

পঞ্চম দিনটি ছিল "সমবায়ের মাধ্যমে স্থিতিশীল মানবউন্নয়ন দিবস"। এদিনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ আবাসন ফেডারেশনের যৌথ অনুষ্ঠানে বহু সমবায়ী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণীয় কর্মসূচি ছিল সমিতির প্রাক্তন সদস্যদের জন্য বার্ষিক একক্যালীন চিকিৎসা ব্যয় অনুদান ও মৃতদের মৃত সদস্যদের পরিবারের জন্য দশ বছরের জন্য মাসিক পেনশন দান প্রকল্প চালুর সূচনা। দুইটি ভাগ্যহত পরিবার এবং একশর বেশি সংখ্যায় উপস্থিত প্রাক্তন সদস্যদের হাতে অনুদানের চেকগুলি তুলে দেন সমিতির অবসরপ্রাপ্ত সংগঠক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান শুভাস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অমিয়ভূষণ নন্দী।

সমবায় সপ্তাহের ষষ্ঠদিন, ১৯ নভেম্বর — 'মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সমবায় বিভাগ' হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এই দিন কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ এবং পোস্টাল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাই টি অফ ক্যালকাটার যুগ্ম উদ্যোগে কলকাতা জি পি ও ভবনে একটি সভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুনীল ঘোষ। বর্তমান ভারতের অর্থনীতিতে সমবায় ক্ষেত্রের অবস্থান তিনি ব্যাখ্যা করেন। সভার বিশিষ্ট অতিথি বরদা ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থের বাধাগুলি দূর করা এবং মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রামের পরিপূরক আন্দোলন হিসাবে সমবায় ক্ষেত্রকে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। অন্য দুই বক্তা ছিলেন আরতি ভট্টাচার্য, নিরুপম চক্রবর্তী।

সমবায় সপ্তাহের শেষ দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদিকী হলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমাবেশে শহরের বিভিন্ন সমিতির তিন শতাধিক সমবায়ী রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সভাস্থল পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

❑ তপন ভাদুড়ি

উত্তর ২৪ পরগণায় সমবায় সপ্তাহ

৪৪তম সমবায় সপ্তাহটি উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন প্রান্তে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনটি উদ্‌যাপিত হয় উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়ন কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন তালপুকুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির সভানেত্রী শিখা মুখার্জি।

সমবায় সপ্তাহের অপর দিনগুলি পালিত হয় যথাক্রমে বসিরহাট -১নং ব্লকের পাইকপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে, বনগ্রাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে, বরাহনগর মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে, নর্থ সুবর্বন হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের নর্থ ইউনিটে (বারাসতে) এবং হাড়োয়া ব্লকের কাসবাকাশা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে।

বিভিন্ন দিনের নির্দিষ্ট বিষয়সূচির উপর বক্তব্য রাখেন কালিদাস বিশ্বাস, পৌরোহিত্য সুকুমার দাস, অধ্যক্ষ সন্তোষ সরকার, বিদ্যুৎ বিশ্বাস, চঞ্চল চ্যাটার্জি, সি ডি ও নিত্য বসু, বিশেষজ্ঞ অমর চৌধুরী, ডাঃ মৃণাল বিশ্বাস, রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, সুভাষ বাহা, প্রভাত ভট্টাচার্য, শ্যাম ভেওয়ারি, যুগ্ম-নিবন্ধক মানস রায়, ভোলানাথ দত্ত, দীপালি ঘোষ, অশোক ঘোষ প্রমুখ সমবায়ী নেতৃবর্গ। চঞ্চল চ্যাটার্জি তাঁর বক্তব্যে বলেন ভারতের ইতিহাসে অকৃষি ক্ষেত্রে যা শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। অধ্যক্ষ সন্তোষ সরকার বলেন সমবায়ে সততা, সমতা ও একতার সমবায়ী মনোভাব নিয়ে সবাইকে কাজ করতে। প্রসঙ্গত তিনি সমবায় শিক্ষা ও চেতনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সুনীল ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, সমবায়ের মূল্যবোধগুলি মানুষকে সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে পেরেছে। সমবায় আন্দোলনে শুধু সমস্যা পরিবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না জনসমক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের অজুহাতে নানাভাবে ব্যয় সংকোচন বেড়েই চলেছে। এগুলি ক্রমাগত খণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্থিকভাবে উচ্চবিত্তরা সেই সুযোগ নিতে পারবে কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও সেটা সম্ভব হচ্ছে না কারণ অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকার। প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাজার অর্থনীতির ডামাডোলে সমবায়কে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্ব ও সংগঠন। তিনি সমবায় শিক্ষা ও পরিকাঠামোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। মানস রায় বলেন, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেঁচে থাকতে হলে তাদের লক্ষ্যতা বাড়াতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ম্ভর হতে হবে। দীপালি ঘোষ বলেন, সমবায় আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, মর্থ ইউনিটের ম্যানেজার অশোক ঘোষ বেকার সমস্যা দূরীকরণে ও স্বনির্ভর প্রকল্পে সমবায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নীলিমা সমাদ্দার, স্বপ্না ধর, সুভাষ ধারা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি কালিদাস বিশ্বাস।

সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বলেন, যোগ্য এবং সঠিক নেতৃত্ব সমবায় ব্যবস্থাপনার পক্ষে যেমন প্রয়োজন তেমনি আন্দোলনের পক্ষেও অত্যন্ত অপরিহার্য। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নলিন দাস, নুরুল আমিন প্রমুখ। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে জেলার সমবায়ীদল বিভিন্ন সাফল্যে যোগদান করেন।

❑ সুভাষ চাটার্জি

কোন্নগর ব্যাঙ্কে সমবায় সপ্তাহ

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক তাদের ব্যাঙ্কভবনে পালন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্কের সভাপতি গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সমবায় দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন শংকরপ্রসাদ সরকার, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভার শুরুতে ব্যাঙ্কের সম্পাদক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯১৭-১৯২৯ সাল পর্যন্ত সমবায় দিবস জুলাই মাসে পালিত হত। কিন্তু নানান অসুবিধার জন্যে পরবর্তীকালে নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবারে পালন হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে সমবায় সপ্তাহ পালন শুরু হয়। সমবায় সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সেবা করে চলেছে এই সমবায় ব্যাঙ্ক। শংকর সরকার সমবায়ের সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন যাকে বলে বিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন ভালো লাগে না।

সমবায় সম্পর্কে অন্যান্য বক্তাগণ বলেন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সমবায়কে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার অবমূল্যায়ন যাতে আর না হয় তার দিকে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশি শিল্পপতিদের আগমনে ভারতীয়রা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

সভাপতি ব্যাঙ্কের বলেন, ১৯২৩ সালের ১লা এপ্রিল কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ও অমীগোপাল বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরা বহুপরিশ্রম করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কোন সহযোগিতা না পেয়েও এই প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বর্তমান পরিচালন পর্ষদ তার ঐতিহ্য এখনও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ৭৫ বছরে এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতির নিম্নরূপ:-

	১৯২৪	১৯৯৬
সভ্য	১৫ জন	৩,৮৭৮ জন
মূলধন	১২৫ টাকা	২৩,৯৩,৬২০ টাকা
লাভ	৮৩ টাকা	১০,২৬,৬৯৬ টাকা
ডিভিডেন্ড	৬.২৫%	১১%

তিনি বলেন, ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাছে দেশের সমবায়ীগণ খুবই আশাবাদী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন - বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সহ সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ।

পরিশেষে এই ব্যাঙ্কের সহ-সম্পাদক দুলালচন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিবারের মতন এবারও সমবায় সপ্তাহ পালন উপলক্ষে কোন্নগরের কৃতি নিম্নলিখিত ছাত্রী-ছাত্রীদের সম্মান জানিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

ছাত্র : ১) মহম্মদ হাসিম, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় — ১ম স্থানাধিকারী। ২)অনিমেষ দাস, কোন্নগর নগেন্দ্র কৃত বিদ্যামন্দির — ২য় স্থান ৩) পরিতোষ পাল, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় — ৩য় স্থান

ছাত্রী ১) পারমিতা ঘোষাল, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় — ১ম স্থান, ২) মৌতুরী গুপ্ত, কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ — ২য় স্থান, ৩) দেবলীনা গাঙ্গুলি, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় — ৩য়, ৪) সহেলী মিত্র কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় — ৩য় স্থান

এছাড়া শ্রীরামপুর চেম্বার হোম ও কোন্নগর উওমানন্দ মাতৃ আশ্রমের দুঃস্থ বাসীন্দাদের আর্থিক অনুদান মারফৎ সম্মানিত করা হয়।

❑ গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়

পুরুলিয়ায় সমবায় সপ্তাহ পালন

সারা ভারতের সাথে সঙ্গতি রেখে সমবায় সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলি পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে এবারের ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালিত হয়।

প্রথম দিনটি পালিত হয় জেলা সমবায় ইউনিয়নে। পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি তরুণ সরকার। বক্তব্য রাখেন সৌম্যনাথ মল্লিক, গৌর বসু, প্রভাকর মাজি, বুদ্ধদেব গুপ্ত, ভূতনাথ মিশ্র প্রমুখ। সকলের মূলবক্তব্য বিষয় সমাজে ব্যক্তি মালিকানার প্রভাব বেড়েছে, একে নির্মূল করতে সমবায় আন্দোলন বিশেষভাবে

কার্যকরি। দ্বিতীয় দিনটি পালিত হয় পুরুলিয়ার কুড়ুকতোপা ও বানসা সমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগে কুড়ুকতোপা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। নির্ধারিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন দিলীপকুমার বসু ও তরুণ সরকার। এছাড়া মানবাজার -১নং ব্লকের ঠিকারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতেও এই দিনটি পালিত হয়। তৃতীয় দিনটি পালিত হয় কালদা সমবায় কৃষি বিপণন সমিতিতে। সমবায় পতাকা উত্তোলন করে শিশির গুপ্ত। বক্তব্য রাখেন অশোক চৌধুরী, ত্রাণমন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো, সৌম্যনাথ মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কালদা থানার অন্তর্গত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে কালদা ব্লকের ৮টি সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৬,৭৫১ টাকা দান করা হয়। এছাড়া ঝড়া সমবায় বিপণন সমিতিতেও সমবায় দিবস পালন করা হয়।

মহিলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে সমবায় সপ্তাহের চতুর্থদিন পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন মহেশ্বর কুইরি। প্রধান অতিথি সৌম্যনাথ মল্লিক। বিশিষ্ট অতিথি শিশির গুপ্ত, বিশেষ অতিথি বাসুদেব থাওরাস, পুষ্প মাহাতো, মধু কুইরি, নিত্যরঞ্জন কুইরিসহ উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক মহিলা ও পুরুষ।

সুইসা ও ঝলিঘাটি কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে ১,৫০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হয়।

৫ম দিনটি পালিত হয় নিতুড়িয়া ল্যাম্পস্ সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে। আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণ করেন স্বপন দত্ত, দিগম্বর মাহাতো, শঙ্কর নন্দী, অজয় গিরি, কমলাকান্ত বাড়ৈ, রঘুনাথ মাঝি এবং আরও অনেকে।

৬ষ্ঠ দিনটি পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অশোক হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতি কুইরি। বক্তব্য রাখেন পুষ্প মাহাতো, কেশোরাম মাহাতো, সনৎ সরকার, সৌম্যনাথ মল্লিক, তরুণ সরকার ও শিশির গুপ্ত। উপস্থিত বিরহোড় সম্প্রদায়ের মহিলাগণ। হাতের কাজের কিছু নমুনা দেখান।

শেষ দিনটি পালিত হয় এ আর সি এস অফিস প্রাঙ্গণে। সভাপতিত্ব করেন সভাপতি, জেলা সমবায় ইউনিয়ন। বক্তব্য রাখেন সমন্বিতামক অজয় গিরি ও সমবায় উন্নয়ন আধিকারিকগণ এবং সমিতির পক্ষে কাঞ্চন টুডু, বীরেন মাহাতো প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকে সমিতির তাৎপর্য ও তার কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে তরুণ সরকার সমবায় আন্দোলনকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিয়ে সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

❑ জয়দীপ রায়চৌধুরী

মুর্শিদাবাদে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন্

মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়ন ৪৪তম সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের যথাযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৪ নভেম্বর জেলা সমবায় ইউনিয়ন প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পূর্তি দিবসটি পালন করে। পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি সমরেন্দ্র দাস ও ৪৪টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সপ্তাহের শুভ সূচনা করেছেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মহেশচন্দ্র দাস।

এছাড়াও ১৯ নভেম্বর "মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবসটি" এই ইউনিয়নের অফিসগৃহে পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন সুজনকৃষ্ণ মিস্ত্রী ও সমরেন্দ্র দাস।

অন্যান্য দিনগুলিও জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে যথাযথ ভাবে ও মর্যাদার সহিত পালিত হয়েছে।

❑ অসীমকৃষ্ণ চক্রবর্তী

বর্ধমান ও -এ সমবায় সপ্তাহ পালন

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ বর্ধমান ৩ নং ব্লক সমবায় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ও এলাকার সমবায় সমিতির উদ্যোগে সমবায় সপ্তাহ পালন করা হয়।

১৪ নভেম্বরের দিনটি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল স্টাফ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটিতে শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বার্নপুরস্থিত স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগান এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি ও সেল এমপ্লয়িজ কমন হাউসিং কো-অ. সোসাইটি, দুর্গাপুর, আন্তরিকতার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে দিনটি পালন করে। এছাড়া বার্নস্টোয়ার্ড ও রাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

১৫ নভেম্বরের দিনটি ডি এস পি এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি ও দুর্গাপুর স্টিল পিপিলস্ কো-অ. ব্যাঙ্ক লিমিটেডে পালন করা হয়। ১৬ নভেম্বরের দিনটি অমৃতনগর কোলিয়ারি ও বাঁশরা এমপ্লয়িজ কো-অ. সোসাইটি, রাণীগঞ্জে উদ্‌যাপনের সাথে উদ্‌যাপন করে।

১৭ নভেম্বরের দিনটি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল স্টাফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধকরূপে মেয়র বানাপদ মুখোপাধ্যায় ও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মানিক মালাকর, পবিত্রোষ ভট্টাচার্য। এছাড়াও রানীগঞ্জ ১নং ব্লক এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটিতে এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়।

১৮ নভেম্বরের দিনটি সোনালিকা এস কে ইউ এস ও বাঁকোলা কোলিয়ারি এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি ও এলাকার অন্যান্য সমিতিগুলির দ্বারা যৌথভাবে উদযাপিত হয়। ১৯ নভেম্বর দিনটি বর্ধমান ৩ নং ব্লক সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে সহযোগিতায় দুর্গাপুর তথ্যকেন্দ্রে পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন শীলেন গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন মইনুল হাসান, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক : নিখিলানন্দ সর, অজিত মুখার্জি, আজাদি প্রসাদ, মুখ্যসমবায়ি সমবায়। নিখিলানন্দ সর বলেন, প্রকৃত দারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ যথা বেকার যুবক-যুবতী, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পী তাদেরকে সমবায়ের আওতায় আনতে হবে, শুধুমাত্র ধান চাষ ছাড়াও যাতে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপন ও ফুলচাষ করা যায় তার দিকে নজর দিতে বলেন বন্ধ কল-কারখানাগুলিকে নিয়ে যদি সমবায়ের মাধ্যমে খোলা যায় তার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফিসারি, পিগারি, পোলট্রি, ডেয়ারি ইত্যাদি সমবায় গঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থা করতে হবে।

মইনুল হাসান বলেন, সমবায় সপ্তাহটি আন্তর্জাতিকভাবে স্থিরিকৃত হয়েছে। তিনি ১১ তারিখের দিনটিকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিবস হিসাবে উল্লেখ করেন। কারণ মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণীদের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে

ওজন্ব দিনি সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষণ করার মাধ্যমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেন। মহারাষ্ট্রে মহিলাদের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কে ৩০% সংরক্ষণ করা হয়েছে যেটা এখানেও করা প্রয়োজন। নাবার্ডের দ্বারা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ সর্বত্র করতে হবে। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন এদেশে কোটি কোটি বেকারদের বসিয়ে রেখে এত বিপুল মানবসম্পদ বসে করা হচ্ছে তা পৃথিবীর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের মানুষ কি পেয়েছে একদিকে টিভির পর্দায় বহুজাতিক সংস্থার ফাস্টফুডের বিজ্ঞাপন, অপরদিকে বাস্তবে আজও কালাহান্ডি অসংখ্য মানুষ অপুষ্টি, অর্ধাহার, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সমবায় আইন তৈরি না হওয়ার জন্য তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন চিন বলছে কৃষিতে বিভিন্ন দিকে সমবায়ের বিকাশ ঘটাতে হবে, এদেশেও সমবায়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছে। জাতীয় আয় বাড়লেই দেশের উন্নতি বোঝায় না, পানীয় জল, বিদ্যুৎ স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতি ঘটতে পারলেই তবেই প্রকৃত উন্নতি হবে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) শ্রী সুব্রত বসু বর্ধমান ৩৫নং ব্লক এলাকার আশানুরূপ আলোচনাকে তুলে ধরতে না পারায় কথা বলেন। এখানে মহিলাদের সমবায় এবং ইন্ডিনিয়ার্স ও দেবার কো-অপারেটিভ চলছে বলে উল্লেখ করেন এখানে প্রেসনওটি চাষ ও সয়াকিন চাষ কিছু হচ্ছে বলে জানান - ঔষধের, জারুরিয়া, পাওবেশ্বর এগুলিতে চেষ্টা চলছে। অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর-মহিলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অ. ও বাঁকুড়া এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি ও ডি এস পি এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি যথাক্রমে সভাধিপতি বর্ধমান জেলা পরিষদ ও সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থ প্রদান করেন।

২০ নভেম্বরের দিনটি ডি পি এল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ও মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কো-অ. সোসাইটি ও এলাকার অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির সহযোগিতায় ডি পি এল ক্রেডিট সোসাইটির নবনির্মিত অফিসগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

❑ বিমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়

সাগরব্লকে সমবায় সপ্তাহ

গত ২৪ পরগনা সাগরব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ব্যোমকেশ মণ্ডল।

❑ প্রবীরানন্দ বেরা

ক্যানিং-এ সমবায় সপ্তাহে মহিলা দিবস উদ্‌যাপন

১৮ নভেম্বর ক্যানিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের হলে ক্যানিং মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, ক্যানিং মহিলা কনজুমার্স সমবায় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা সমবায় মহাসংঘ ও প্রভাবতী বাটিক শিল্প সমবায় সমিতির উদ্যোগে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রতন গায়েন, ক্যানিং শাখার অমূল্যরতন বানার্জি, মহিলা সমবায় মহাসংঘের সি ই ও দেবজ্যোতি চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ও এস ডি দীপালি ঘোষ, মহিলা মহাসংঘের সম্পাদিকা শংকরী ওঝ, প্রভাবতী বাটিক শিল্প সমবায়ের অতনী সরকার ও ক্যানিং ১নং ব্লকের সমবায় পরিদর্শক অনিত সিনহা সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্যানিং মহিলা ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটির সহ-সভানেত্রী বীণা নস্কর। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনুরূপা সরকার ও অরুন্ধতি সিনহা। উদ্বোধনী সঙ্গীত "সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, প্রগতি" গানটিতে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ রূপ প্রতিফলিত হয়।

সভানেত্রী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। ক্যানিং-এর পিছিয়ে পড়া মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে যা গড়ে তুলেছেন তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াবার জন্য সবাইকে আবেদন জানান।

মহিলা মহাসংঘের সম্পাদিকা শংকরী ওঝ উপস্থিত সবাইকে মহাসংঘের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলে মহিলারা চতুর্দিকে নির্যাতিত হচ্ছে। এখনও পণ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা যায়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও মহিলারা প্রকৃত স্বাধীন নয়। এই অবস্থার একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই কিছু উপার্জন করে মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। শ্রী গায়েন বলেন, মহিলাদের পুরুষ নির্ভরশীলতা এখনও ভীষণভাবে আছে। তিনি মাও-সে-তুং-এর উক্তি দিয়ে বলেন — "নারী যুগ আকাশে অর্ধেক তারা"। এই নির্ভরশীলতা কাটাবার জন্য তিনি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি ৫-৬ জন মিলে একটি করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করতে বলেন। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অথবা কম সুদে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারে।

শ্রী চৌধুরী বলেন, সমবায় সমিতি পরিচালনায় যেসব ভুল ত্রুটি আছে তা শোধরানো যায়। মুক্ত অর্থনীতির জন্য শিল্প সমবায়গুলির অবস্থা ভালো নয়। এই অবস্থায় নতুন ধরনের সমবায় তৈরির জন্য তিনি বলেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি শহরাঞ্চলে ক্রেশ তৈরির সম্ভাবনার কথা বলেন।

সমবায় পরিদর্শক শ্রী সিনহা মহিলা সমবায়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোনরকম প্রশাসনিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দীপালি ঘোষ বলেন, স্বাধীনতার পর ৫০ বছর পার হয়েছে। কিন্তু এখনও মহিলাদের দুর্বলতর শ্রেণীতে ফেলা হচ্ছে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে মহিলারা বঞ্চিত, কারণ সেগুলো সম্বন্ধে তাঁরা সঠিকভাবে অবহিত নন। দুটি ব্যাপারে তিনি মহিলাদের সতর্ক করে দেন। প্রথমত মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে নির্যাতনের থেকে মুক্ত হতে। দ্বিতীয়ত, তাঁদের শিক্ষাক্ষেত্রে আরো অগ্রসর হতে হবে। সমবায় সমিতিগুলি সঠিক পরিচালনার জন্য যে সমস্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে সেই সুযোগগুলি কিভাবে পাওয়া যাবে তা "ভাণ্ডার" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন — "Co-operation among Co-operatives" এই নীতি মেনে চলতে হবে। শেষে তিনি বলেন শুধুমাত্র সাতদিন সমবায় সপ্তাহ পালন করেকোনো সমস্যার সমাধান হবে না। এ ব্যাপারে প্রতিটি সমবায়বর্ষ তথা আর্থিকবর্ষ শুরে তিনি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোবার পরামর্শ দেন।

এলাকার বিশিষ্ট সমবায়ী নারায়ণচন্দ্র হালদার সময়োচিত বক্তব্য রেখেছিলেন। সভায় যোগ দিয়েছিলেন আদি বালিসন্ধ শিল্প সমবায় সমিতির পক্ষে প্রতিভাদেবী এবং ক্যানিং মহিলা গ্রামীণ শিল্প সমবায় সমিতির পক্ষে সন্ধ্যা বিশ্বাস ও আরো অনেকে।

সব শেষে তরুনা ঘোষ এক আবেগময় ভাষণে সমস্ত মহিলাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি শুধু মহিলাদের নিয়ে গঠিত একটি সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের কথা বলেন যা এই অঞ্চলে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। সমাপ্তি সঙ্গীত "আগুনের পরশমণি" পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

❑ অজিত সিনহা

সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনে কাঁথি সমবায় ইউনিয়ন

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সূচনা হল, কাঁথি সমবায় ইউনিয়ন অফিস প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি ব্লকের ভারপ্রাপ্ত সহ নিবন্ধক মুক্তেশ্বর পাণ্ডা, ইউনিয়নের সহ-সভাপতি অনিল মাইতি ও ডিরেক্টর গিরিবারী দাস। এছাড়াও ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি মুরারীমোহন মাল্লা, সি ই ও গৌরসুন্দর জানাসহ বিভিন্ন সমবায়ী আধিকারিক ও বহু বিশিষ্ট সমবায়ী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমবায় সপ্তাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন কন্টাই কো-অ. ব্যাঙ্কের সভাপতি ও বিধায়ক শৈলজা দাস, বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের সভাপতি সমরেশ দাস। সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি এবং সাফল্যের চালচিত্র নিয়ে গঠিত একটি সুসজ্জিত ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন বিধায়ক শৈলজা দাস।

দক্ষিণ পাইকবাড় সমবায় সমিতির প্রশাসনিক ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন সাংসদ সুধীর গিরি এবং দেহ ডিপোজিট লকার উদ্বোধন করেন কাঁথি সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি জ্যোতির্ময় কর।

সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিন এগরা মার্কেটিং সমিতি ও ইফকোর যৌথ উদ্যোগে এগরা বাঙালাল হাইস্কুলে উদ্‌যাপন হয় এবং একটি চক্ষু অপারেশন শিবিরও করা হয়। এই শিবির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সিন্‌হা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাঁথি মহকুমা শাসক বিপদভঞ্জন বিশ্বাস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইফকোর সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার নৃসিংহ দে এবং ইউনিয়নের সভাপতি।

সমবায় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনটি উদ্‌যাপন করে কন্টাই কো-অ. ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ব্যাঙ্কের সভাপতি, বিধায়ক শৈলজা দাস। প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন এডিও বিপদভঞ্জন বিশ্বাস এবং বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের সভাপতি। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তেশ্বর পাণ্ডা ও বিশিষ্ট সমবায়ী নেতৃবর্গ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী মৌমিতা মিত্র। মহকুমা শাসক শ্রী বিশ্বাস কাঁথির ঐতিহ্যময় সমবায় আন্দোলনের উল্লেখ করে হিজলি ট্রান্সপোর্ট সোসাইটিকে আবার চালু করা যায় কি না সে ব্যাপারে সমবায়ী নেতৃবৃন্দকে ভেবে দেখতে বলেন। এদিন ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশনের ট্যাবলো পথ পরিক্রমা করে এবং মহকুমা শাসক হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল, দুধ বিতরণ করে। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সম্পাদক মধুসূদন দাস অধিকারী।

সমবায় সপ্তাহের তৃতীয় দিনটি উদ্‌যাপিত হয় মুগবেড়িয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও গড়বাড়ি ইউনিয়ন সি এ সি এস-এর যৌথ উদ্যোগে। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন মুগবেড়িয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার কানাই সামন্ত, আধিকারিক হরনারায়ণ শীট, অজিত নন্দ, অনিল মাইতি, মধুসূদন দাস অধিকারি সহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

সমবায় সপ্তাহের চতুর্থ দিনটি পালিত হয় কাঁথি কার্ড ব্যাঙ্কের উদ্যোগে পটাশপুর শাখায়।

পঞ্চম দিন উদ্‌যাপন করে কাজলা সমবায় সমিতি এবং খয়রাগা সমবায়-কৃষি উন্নয়ন সমিতি। কাজলা সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতিত্ব করেন বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের সভাপতি। অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এরপর সমবায় সপ্তাহে সফলতম অনুষ্ঠানটি রামনগর থানার খয়রাগা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি উদ্‌যাপন করে। সভাপতিত্ব করেন সমরেশ দাস, প্রধান অতিথি অধ্যাপক জ্যোতির্ময় কর। সমবায়ের গান, আবৃত্তি ইত্যাদি পরিবেশনার গুণে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সমবায় সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটি পালিত হয় কাঁথি টাউন হলে বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-ব্যাঙ্ক আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে, সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি বরেন পাত্র। প্রধান অতিথি জ্যোতির্ময় কর। ও দিন কাঁথি মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির উদ্যোগে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। সমবায়ের আদর্শ ও সমবায়ে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন সমিতির সদস্যাগণ। আলোচনাটি পরিচালনা করেন চেয়ারপার্সন রেনুকা গিরি। এদিন ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশনের সদস্যরা কাঁথি পুর এলাকায় ও রসনাবীপুর গ্রামের রাস্তা সাফাই অভিযান চালায়। নেতৃত্ব দেন মধুসূদন দাস অধিকারী।

সপ্তাহের শেষ দিনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সভায় এলাকার সমবায়ী নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এদিন কন্টাই সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অ. অর্গানাইজেশন-এর উদ্যোগে সরস্বতীতলার অফিস প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শরদিন্দু পড়িয়ারী।

❑ বিবেকানন্দ পড়া

বর্ধমান-১-এ সমবায় সপ্তাহ

এবারের সমবায় সপ্তাহের প্রথমদিনটি পালিত হয় বংশগোপাল টাউন হলে। সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন বর্ধমান- ১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সৈয়দ রহমান খাদিম। এবারে ৫০টি মটর বাইকের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় এবং সমবায় ট্যাবলো সহযোগে পথপরিক্রমা সমবায় সপ্তাহকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল, আইনমন্ত্রী নিশীথরঞ্জন অধিকারি, বিধায়ক শ্যাম বোস, বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের

সভাপতি অজিত মুখার্জি ও সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি, পশ্চিমাঞ্চলের উপনিবন্ধক প্রতীক ব্যানার্জি প্রমুখ। এই উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করা হয়। সেবোর বর্ধমান ইউনিটে ৫৫ জন সমবায়ী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বিকালে অপর অনুষ্ঠানটি হয় জামাড় এস কে ইউ এস -এ।

সমবায় সপ্তাহের অপর দিনগুলি পালিত হয় যথাক্রমে দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে, হাটসলুই বাজার শস্য উৎপাদন ও বিপণন সমবায় সমিতিতে, জামালপুর ব্লকের পাচরা ইউ সি এ সি এস-এর ব্যবস্থাপনায় পাচরা উচ্চ বিদ্যালয়ে, শ্যামসুন্দর ইউ সি এ সি এস-এর ব্যবস্থাপনায় রাজনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির ইনফরমেশন সেন্টার হলে এবং আউসগ্রাম-১ ব্লকের চরকৃষ্ণপুর-শ্রীকৃষ্ণপুর প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গ্রামপ্রধান আবদুল জাকের, গঙ্গাধর পাল, ইফকোর আঞ্চলিক অধিকর্তা ড. ডি বি পাত্র, জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক তরুণ সাহা, তারাপদ দে, সুধাকর কোঙার, বিধায়ক শ্যামাপ্রসাদ পাল, অরিন্দম কোঙার, কার্তিক ঘোষ প্রমুখ।

মানবসমাজে সমবায়ের ভূমিকা, উপকারিতা এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে সমবায়ের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনায় সংশ্লিষ্ট সকলেই খুব উপকৃত হন।

❑ তপন মুখার্জি

মালদহে সমবায় সপ্তাহ পালন

৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি পালিত হয় মালদহ টাউন হলে। স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন ও ফেডারেশন অব লেবার কো-অপারেটিভ মালদা শাখার সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি সন্তোষ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি নইমুল হাসান। অনুষ্ঠানে জেলাস্তরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমবায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলি পালিত হয় যথাক্রমে হরিয়ো এস কে ইউ এস -এ, গাজোল লার্জসাইজ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিতে, এ আর ডি বি-এ হরিশ্চন্দ্রপুর লার্জসাইজ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিতে, সেচেলদর অঞ্চল এস কে ইউ এস-এ এবং বামুনপুর অঞ্চল এস কে ইউ এস সি-এ।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সমবায়ের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের আধিকারিক ড. এস ডি মুখার্জি, মালদহ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অমল ব্যানার্জি, জগদীশচন্দ্র চৌধুরী, কে পি যাদব, হরিশ্চন্দ্রপুরে বিডিও নন্টুলাল কর্মকার, মালদহ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুধীররঞ্জন চৌধুরী, মালদহের সহকারী নিবন্ধক, অঞ্জন প্রামাণিক, তপন দাস প্রমুখ।

❑ সুব্রতকুমার দাস

কোচবিহারে সমবায় সপ্তাহ

কোচবিহার জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়।

সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপিত হয় জেলা সমবায় ইউনিয়ন অফিসে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ইউনিয়নের সভাপতি জয়ন্তকুমার দে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, পরিচালক, হেডকোয়ার্টারের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, শিক্ষা নির্দেশক প্রমুখ।

পরের দিনটি পালিত হয় কোচবিহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নরেশচন্দ্র শর্মা। সমিতির সম্পাদক বিমলচন্দ্র দাস সমবায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিনটি উদ্‌যাপিত হয় দক্ষিণ কোচবিহার এল এস কো-অপারেটিভ এগ্রিঃ মার্কেটিং সোসাইটিতে। পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন ইফকোর ফিল্ড অফিসার ও আরো অনেক।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা নির্দেশক বলেন সমবায় হিসাবরক্ষক ও মার্কেটিং সমিতি বেশি সংখ্যায় স্থাপিত করতে হবে। এর জন্য গ্রামের কৃষকভাইদের আহ্বান করেন এই কাজে।

চতুর্থ দিনটি উদ্‌যাপিত হয় তাজিরাওড়ি বিলাইডাঙ্গা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্থানীয় গ্রামপ্রধান কেশবচন্দ্র দে। তিনি সমবায় ঋণ, আবাসন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক উক্ত দিনটির গুরুত্বের কথা আলোচনা করেন। ইউনিয়নের সভাপতি সমিতি থেকে অল্প সুদে টাকা নিয়ে গৃহহীনদের বাসস্থান তৈরি করার কথা বলেন এবং কৃষকবন্ধুদের সমবায় সমিতিতে সদস্য হয়ে সমিতি থেকে কৃষি ঋণ নেওয়ার কথাও বলেন।

পঞ্চম দিনটি উদ্‌যাপিত হয় হাঁসখাওয়া ফেরিঘাট সমবায় সমিতিতে। বক্তব্য রাখেন সদস্য জীবন দে। শিক্ষা নির্দেশক বলেন সমবায়ের মাধ্যমেই স্থিতিশীল মানবউন্নয়ন সম্ভব। ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক তাদের কাজকর্মে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ষষ্ঠ দিনটি উদ্‌যাপিত হয় টাঙ্গাগাছ, রাজারহাট মহিলা কল্যাণ কেন্দ্রে শিল্প সমবায় সমিতিতে। উপস্থিত ছিলেন ইফকোর ফিল্ড অফিসার, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, সভাপতি এবং ইউনিয়নের কর্মচারিগণ।

সমবায় সপ্তাহের শেষ দিনটি উদ্‌যাপিত হয় বক্সীরহাট ভানুকুমারী গ্রামীণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, স্থানীয় বিধায়ক, তুফান-গঞ্জ ১ ও ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমুখ।

❑ নিবারণচন্দ্র দাস

জলপাইগুড়িতে সমবায় সপ্তাহ

জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও জেলার বিভিন্ন ব্লকের সমবায় সমিতিগুলির ব্যবস্থাপনায় প্রতিবারের মতো এবারও মর্যাদা সহকারে সমবায় সপ্তাহ (১৪-২০ নভেম্বর) পালিত হয়।

সমবায় সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলি পালিত

হয় যথাক্রমে জেলা সমবায় ইউনিয়নে, ধূপগুড়ি ব্লক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনায় লাভ হ্রাসে, জলপাইগুড়ি বিপণন্ সমবায় ব্যাঙ্কের রানীরহাট শাখায়, ময়নাগুড়ি ব্লকের পূর্বদহ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে, সদর ব্লকের জলপাইগুড়ি থানা কৃষিজ বিপণন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় বেরুবাড়ি সমিতি প্রাঙ্গণে এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে।

বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা এবং সমবায় সপ্তাহের নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী ভিন্ন বিষয়গুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন সত্যজিৎ বসু, অধ্যক্ষ অনুপ ঘোষ, প্রদীপ গাঙ্গুলি, শ্যামসুন্দর হক, নরুল ইসলাম, প্রাণগোপাল ভাওয়াল, দেবাশিস ঘোষ, গ্রামপ্রধান অমর পাল, পঞ্চায়েত সভাপতি শৈবাল ভট্টাচার্য, চা-শ্রমিক নেতা তিলক ছেত্রী, বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, বিমল রায়, শাশ্বত বসু, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, নীরেন রায় ও অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

❑ সমীর কর্মকার

হুগলিতে সমবায় সপ্তাহ

যোগ্য মর্যাদায় হুগলি জেলায় এবারের সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় বিভিন্ন প্রান্তে।

প্রথম দিনটি পালিত হয় মগরা ব্লকের তালাণ্ড এস কে ইউ এসে। বাদল কর সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন ও বক্তব্যে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় দিনটি পালিত হয় হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়ন, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আরামবাগ এ আর ডি বি-র যৌথ উদ্যোগে হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কামারপুকুর শাখায়। ব্যাঙ্কের সভাপতি মনীন্দ্র জানা সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন। বক্তাগণ বলেন সারা জেলায় যে চাষ হয় তার অর্ধেক ভাগ সমবায়ের মাধ্যমেই হয়। আমাদের জেলায় ২০০টি প্যাকস আমানত সংগ্রহ করেছে ১৫ কোটি টাকার মতো। এইসব টাকায় বিভিন্ন রকম উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।

১৬ নভেম্বরের দিনটি পালিত হয় কানগোই দোগেছিয়া এস কে ইউ এসে। অনুষ্ঠানে সভেব দত্ত বলেন সমবায় আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসর হলেও বিপণন, প্রকল্প এবং কনজিউমার্সের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না থাকায় এই বিষয়গুলি এখনও ব্যক্তি উদ্যোগের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমিতিগুলিকে বি ডি সি-র মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে হবে।

১৭ নভেম্বরে দিনটি পালিত হয় তারকেশ্বর ব্লকের বিবেকানন্দ এস কে ইউ এস-এ। সভাপতিত্ব করেন গোপাল হাটি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র সামন্ত, গৌরমোহন আদক, নগেন্দ্রনাথ প্রোডেল ও সম্পাদক দেবাশিস দে প্রমুখ। এই দিনের শেষ অনুষ্ঠানটি হয় সপ্তর্ষি রায় ভবনে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল মুক্ত অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে কত দিক দিয়ে কিভাবে আসছে তা বর্ণনা করেন। বর্তমানে তৃণমূল স্তরে সমবায় গড়তে সার্বক্ষণিক সমস্যাপন জোরদার করা হচ্ছে। বাজেটে বরাদ্দ কিছু বেড়েছে। তিনি তাঁর দপ্তরের সাম্প্রতিক অভিযানের কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ১৯৯৮ সালে নতুন সমবায় আইন বলবৎ হবে।

১৮ নভেম্বরের দুটি অনুষ্ঠানের একটি উদ্‌যাপিত হয় যথাক্রমে আই সি ডি পি-র উদ্যোগে ডি আর ডি এ সভাগৃহে। চণ্ডীতলা লেবার কো-অপ: সোসাইটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চণ্ডীতলা শাখায়। ১৯ নভেম্বরের দিনটি পালিত হয় দিগসুই ইউনিয়ন এল/এস এগ্রিকালচারাল কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটি তে এই উপলক্ষে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় সমিতি প্রাঙ্গণে। জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বলাই সাঁবুই তাঁর বক্তব্যে ইউনিয়নের কার্যক্রম বর্ণনা করেন। সভাশেষে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি দিলীপকুমার ঘোষ।

২০ নভেম্বরের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে জেলার হুগলি কো-অপ. ক্রেডিট ব্যাঙ্ক, ধনিয়াখালি সমবায় মার্কেটিং ও দিগসুই ইউনিয়ন এল/এস কো-অপ. এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি ৯৬-৯৭ সালে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কৃত হন।

❑ সন্তোষ ভট্টাচার্য

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রম

২৪ নভেম্বর আউশগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির অডিটোরিয়ামে আউশগ্রাম-১, ২ এবং ভাতার ব্লকের ২২টি কর্মচারি ক্ষলপন সমবায় সমিতির ৪৬ জন পরিচালকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ পাঁচ দিনের ইন-হাউস লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্সের উদ্বোধন করেন। ব্যবস্থাপনায় ছিল বর্ধমান জেলা-১ জেলা সমবায় ইউনিয়ন। মোট ১২টি বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহসচিব বাসুদেব মুখার্জি নেতৃত্ব বিকাশ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীধর মল্লিক তাঁর সাক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন এটা গর্বের বিষয় যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে কৃষক ও সকল মানুষের সাথে সব ব্যবস্থাই আমাদের সমবায়ে আছে। তিনি রাজ্যের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অসহযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে এই ব্লকগুলিতে এই ধরনের সমবায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিদের কাছে উপযোগী হয়েছে। প্রতিনিধিদের হাতে সংশাপত্র তুলে দেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহ সচিব, সহ শিক্ষা আধিকারিক (পশ্চিমাঞ্চল), বর্ধমান-১ এর সহনিয়ামক, আউশগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির অর্থানুকূল্যে শিক্ষাক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্ধমান জেলা-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক নবকুমার ঘোষ পরিশেষে শিক্ষা-শিবিরের অভিজ্ঞতা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে সমবায়কে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন আউশগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও।

❑ তপন মুখার্জি

এন সি ইউ আই-র মালদা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদ্যোগে বনসৃজন কর্মসূচি

ভারতীয় জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন সমবায় শিক্ষা কেন্দ্রীয় প্রকল্প মালদার বিশেষ উদ্যোগে ও মালদা জেলা পরিষদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত তিনটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে বনসৃজন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তারই অঙ্গস্বরূপ

গত ১৪ নভেম্বর সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি মিলকি-নবরিয়া-উইয়ন এই তিনটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির প্রায় ৩০০ সদস্যের হাতে শিমুল, শিউ, জলপাই, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতি চারাগাছ বিতরণ করা হয় ও সমিতিপ্রাঙ্গণে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের দিয়ে সমবায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। মালদা প্রকল্পের প্রকল্প আধিকারিক অঞ্জন প্রামাণিক এই তিনটির বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ও সদস্যদের অনুরোধ করেন চারাগাছগুলির সঠিক যত্ন নিতে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রকল্পের কৃষি সহায়ক নির্মলেন্দু সিনহা।

❑ গৌতম তালুকদার

সমবায় সভা

২৫ নভেম্বর জলপাইগুড়ি জিলা পরিষদ সভাকক্ষে জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ ব্যবস্থাপনায়। 'সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রাজ্যের রাজস্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো বলেন, সমবায়ে বিপণন ব্যবস্থা আগের তুলনায় নিম্নগামী। কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে কিন্তু বিপণন ব্যবস্থা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ। পাট বিক্রয় সমবায়ের হাতে থাকছে না, আলু চাষীরা দাম পাচ্ছে না। সুতরাং শক্ত হাতে মোকাবিলা না করলে সমবায় আন্দোলন অগ্রগতিতে সার্থক হয়ে উঠতে পারবে না। উদ্বোধনী ভাষণে প্রদীপকুমার গাঙ্গুলি বলেন, দক্ষ নেতৃত্ব সমবায়ের অগ্রগতির মূল কথা। তাই সততা ও দক্ষতার সাথে জেলার সর্বত্র সমবায় সমিতিগুলিকে সমবায়ের নীতি ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে যেতে হবে-এর জন্য চাই উপযুক্ত ও দ্রুত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। বিশেষ অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মধুসূদন ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গের মহিলা সমবায় সমিতির অবস্থা খুবই সঙ্গীন, আজকের সভায় মহিলাদের সংখ্যা দেখে বিষয়টা প্রতীয়মান হয়। মহিলা সমবায় সমিতি সংগঠিত করে গ্রাম শহরের দুর্বলতর শ্রেণীদের সরকারি ও বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ বসু, দেবাশিস ঘোষ, তপু ভট্টাচার্য, বতন দে ও সুনীলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

❑ সমীর কুমার মজুমদার

পরিচালকমণ্ডলীর প্রশিক্ষণ শিবির

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মসূচি অনুসারে গত ১০-১২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার জেলায় কোচবিহার ১নং ব্লকে ১০টি কৃষি সমবায় সমিতির মোট ৩২ জন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও ম্যানেজারদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। শিবিরটি কোচবিহার ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে ও কোচবিহার ১নং ব্লকের শিল্প প্রশিক্ষণ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের ২য় দিনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কোচবিহার ইউনিটের ম্যানেজার এবং ইউকোর ফিল্ড অফিসার। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহনিবন্ধক ও অডিটরগণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমবায় পরিদর্শক, কোচবিহার ব্লক-১নং পরিচালক, জেলা সমবায় ইউনিয়ন, ব্লক সুপারভাইজার, বিডিও, সিডিও প্রমুখ

❑ গৌতম ভট্টাচার্য

পুরুলিয়ার সমবায় প্রশিক্ষণ শিবির

জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের আর্থিক অনুকূল্যে ২-৩টা সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া ১নং ব্লকের আটটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার ও বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের নিয়ে একটি শিক্ষামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। জেলা সমবায় ইউনিয়নের সেমিনার হলে। কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। যেমন : ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা, আনানত ব্যবসা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবসা, বিপণন ও ক্রেতা সমবায়ের ব্যবসা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিধি নিয়মাবলী এবং সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন : অমল দত্ত, ফালারাম মুখার্জি, দিগম্বর মহান্তো এবং নিবা দাস।

কার্যক্রমের সূচনা করেন তরুণ সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শঙ্কর নন্দী ও হেমন্ত ব্যানার্জি।

❑ জয়দীপ রায়চৌধুরী

ধামাসিন মূলটি কৃষি সমিতির ব্যাঙ্ক ভবন ও অফিস কার্যালয় উদ্বোধন

যে সমিতি মরেই যাচ্ছিল তা মরার বদলে নবজীবন লাভ করে ছুটতে শুরু করেছে। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া ব্লকের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত ধামাসিন মূলটি এস কে ইউ এস গত ২১-৮-৯৭-এ জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের সুদৃশ্য ভবন উদ্বোধন করিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁরাও ছেলের প্রতিযোগিতায় সামিল। অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচনা করেন সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিমাই মাল ভবন উদ্বোধনের পর বলেন সমবায় উদ্যোগে গ্রামগুলির আজ পরিবর্তন আসছে। গ্রামে অতীত ও বর্তমানের চাহিদার মধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মনীন্দ্র জানা বলেন টাকা শুধু জমা দিলেই হবে না। খাটাতে হবে গ্রামেই।

আই সি ডি পি প্রধান কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন এই অনুষ্ঠান সকলের উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। তিনি জেলায় আই সি ডি পি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি গোবিন্দ ব্যানার্জি নিজের গ্রামের এই অনুষ্ঠানে বলেন এই এলাকা কিছুদিন আগেও দারিদ্র্য কবলিত ছিল। আজ অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন ও পাবেন। সমবায় কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল আদিম বলেন বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম সমবায়কে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। প্রচার হচ্ছে শুধু নিজে করো ও নিজের জন্য ভাবো। আজ পাণ্ডুয়া ব্লকের বিভিন্ন সমিতিতে ৭/৮ কোটি টাকা জমা

পড়েছে। তবুও স্বাগত জানাবে কর্মীদের সৌজন্যে বসু '৬১ সালে তৈরি এই সমিতির ব্যবস্থাপনা ও সভ্যদের বেতনের ক্ষেত্রেও ৮/১ হাজার টাকা জমিয়েছে। ব্রক সমবায় পরিদর্শক তপতী সরকার ও উন্নয়ন অধিকর্তা (ডেপুটি ডি ডি সি) সুব্রতবাবু সমস্ত বক্তব্য রাখেন। এলাকার বিশিষ্ট নির্মল চাঁদ ঘোষের সম্মানে সভা শেষ হয়। নির্মলবাবু এই উপলক্ষে ৫০হাজার টাকা অনুদান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার দেওয়া হয়।

বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের ৫৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নাবার্ড প্রশংসিত

১৯৯৬-৯৭ সমবায় বর্ষে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য হাওড়া জেলার ২৮টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি 'নাবার্ড'-এর প্রশংসা লাভ করেছে। প্রতিটি সমিতিকে প্রদত্ত ক্রেডিট ইনসেনটিভ জমা নাবার্ড থেকে ৫হাজার টাকা করে পেয়েছে। এর এক তৃতীয়াংশ দিতে হবে প্রাথমিক সমিতিকেই বাকি দু-তৃতীয়াংশ দেবে নাবার্ড। এই প্রাথমিক সমিতিগুলির মধ্যে ২৪টিই বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অধীন। স্থানীয় বঙ্গ প্রতিবেশ মুখোপাধ্যায় পরিবারের সভাপতি সমরেশ বসু এই সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, ডুমুরদহ প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে নির্বাচিত ১২জনের নাম পাঠানো হয়েছিল। মধুর কলাকন্দ থেকে নাবার্ড এই সমিতিগুলিকেই তালিকাভুক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য, সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে বলাগেড়িয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বর্ষসেরা সমবায় হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে — ইহা অর্থের সমান বিভাগ জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।"

১৯শে অক্টোবর, ১৯২৯ -এ পঞ্জাবের লাহোরে ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে নেতাজির অভিভাষণ।

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা ঃ ৭০০ ০০২

ফোন নং ঃ ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ৩য়ে স্থান ও পরিবেষার প্রথম। কলকাতা শতবর্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম বিশিষ্ট ভবনে সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিবেচ্যিত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় সফল ও মডেলাদে বিকাশী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে

হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটি কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশ মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.২৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৬১১/৬২৭৫৯/ ৬২৪১৭/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমাদের উপর আস্থা রাখুন।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরপেক্ষতা ও দ্রুত পরিষেবাই

আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর

চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম রায় কর্তৃক ২৫৫, নেতাজী সুভাষ রোড (৩য় তলা) কলিকাতা ৭০০ ০০১ , ফোন নং : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং আরতি প্রিন্টার্স, ১২০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যা পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

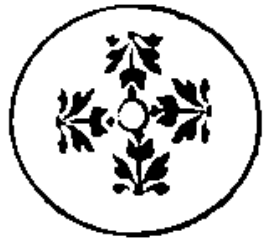

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১.৫% বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

ওয়াটগঞ্জ স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

অবশ্য শর্ত যদি থাকে : সবকিছু অসুক
সবকিছু ঠিক থেকে

ভাণ্ডার

সুস্থ বিশ্বে : অসুক বিশ্বের মোড়ে।
বেরহন : অনি ভবি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

সবকিছু পরিবর্তনের তারিখটি থেকে - ৩ — [illegible]

আওয়েলের ধর্মচিন্তা — [illegible]

[illegible] : সুবর্ণ রেখার ত্রিভুজ : ৪ — [illegible]

সুন্দরবন : [illegible] কর্মসূচির নবীকরণ — [illegible]

সমবায়ী বৃদ্ধাবাস তৈরি হোক — [illegible]

পুরনো সেই দিনের কথা

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুহ	সহ-সভাপতি
রাজা রায়	সদস্য
সুভাষ বাহা	সদস্য
ক্ষীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

ভোটের অধিকার

কারুর কথায় কান দিও না
এখন থেকে আর,
সবার মতো তোমারও আছে
ভোটের অধিকার।
ভয় পেয়ো না এগিয়ে এসো
ভোট দিয়ে যাও,
দেশের ভালো করার মানুষ
নিজেই চিনে নাও।

(এ কে ঘি)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ. নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে আপনি
ভোট দিচ্ছেন তো?
ভোট অবশ্যই দেবেন।

মনে রাখবেন
ভোট দেওয়া শুধু আপনার গণতান্ত্রিক
অধিকারই নয়, আপনার পবিত্র
নাগরিক কর্তব্যও।

* * * * * * * * * * *

কারো দ্বারা প্রভাবিত হবেন না,
কোনোভাবেই প্রলোভিত হবেন না,
নিজের বিচার-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী
আপনার পছন্দমত প্রার্থীকেই ভোট দিন।

* * * * * * * * * * *

আরও মনে রাখবেন
দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সরকার ও
পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলতে
এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, গণতান্ত্রিক ও
যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র বজায় রাখতে
আপনার ও আপনার পরিবারের প্রত্যেকের
ভোটের মূল্য অপরিসীম।

সম্পাদকীয়

সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি পি), বি ডি পি, সি এ ডি সি, আই আর ডি পি, এন সি ইউ আই-এর প্রজেক্ট প্রভৃতি উদ্যোগগুলি মূলত সুসংহত বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে ভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। স্থানীয়ভাবে আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে উন্নয়নের কর্মসূচি তৈরি হচ্ছে। কর্মসূচির মধ্যে আছে কৃষিকাজ, কৃষির সহায়ক ব্যবস্থাদির পরিকাঠামো উন্নয়ন, মূলধনের যোগান ; তন্তুজীবী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জীবিকার মানুষের জন্য মূলধন এবং উৎপাদিত বস্তুর বিপণনের ব্যবস্থাদি। উদ্দেশ্য একটাই — গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মানোন্নয়ন।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা মানবসম্পদ বিকাশের দিকে নজর আছে এবং গুরুত্বও দেওয়া হচ্ছে। মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত হওয়া দরকার। আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকটাও মাথায় রাখতে হবে। সমিতির প্রতিটি পরিবারের শিশু ও বালক-বালিকাদের মধ্যে যে মানবসম্পদ বিকশিত হচ্ছে তার উন্নয়নের জন্য সমিতির তরফ থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সমিতি তার নিজ এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলা, অঙ্কন, আবৃত্তি, রচনা, ক্যুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে ছেলেমেয়েরা সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হবে, অভিভাবক সহ সকলের মিলিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে, নিজ নিজ সন্তানের গুরুগমনায় সমিতির সাথে পিতামাতার একটা আত্মিকযোগ গড়ে উঠবে। সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবক নাচগানের হাতেখড়ি হতে পারে সাপ্তাহিক নাচগানের ক্লাস প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। উপযুক্ততা, দক্ষতা ও প্রতিভা অনুযায়ী একদিন সমিতির এলাকার এই শিশু ও বালক-বালিকারা উচ্চ জীবনের সন্ধান পাবে।

কর্মসংস্কৃতির সাথে শিক্ষা ও শিল্পকলার মেলবন্ধন ঘটলে প্রকৃত অর্থে সুসংহত বিকাশের সার্থকতা আসবে। এই ভাবধারা থেকেই একদিন গড়ে উঠেছিল শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞের পাশে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও শিল্পকলা।

সমবায় শিক্ষা তহবিল বাজেটে ১৯৯৭-৯৮ সালে বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়ণ খাতে বরাদ্দকৃত অনুদানের তথ্য

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	৯৭-৯৮-এর জন্য বরাদ্দ (টাকা)	৯৬-৯৭ সালে প্রকৃত ব্যয় (টাকা)
	রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন।		
২।	সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য এবং পরিচালক সদস্যদের শিক্ষা প্রকল্প NCUI Field Project সহ		
	সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ও বিভাগীয় কর্মচারিদের জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রকল্প		১,২৮,২৬৮
	জেলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে সমবায় সম্মেলন ও আলোচনাচক্র		৭৫,৮৩৭
	ব্লক, জেলা, রাজ্যস্তরে সমবায় কর্মশালা		৩৮,৫৮৭
	'ভাণ্ডার' এবং জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলি থেকে প্রকাশিত পত্রিকা প্রকাশনা খাতে অনুদান		
	রাজ্য এবং জেলাস্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায়ের উপর বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা		
	মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদলকে পুরস্কৃত করা এবং সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির ডিপ্লোমা প্রাপকদের জন্য সমবর্তন অনুষ্ঠান খাতে অনুদান		
	স্থানীয় গোষ্ঠী গঠন পরিকল্পনা রূপায়ণে জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশকগণ কর্তৃক প্রাথমিক সমবায় সমিতির উন্নয়নের জন্য অভিপ্রহণ প্রকল্প	৪৪,১৫০	৪,৮০৩
	স্থানীয় সমবায় ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষার্থীদলের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা খাতে অনুদান	১৭,২০০	—
	দৈনিক সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্রিকা মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার	৩৫,০০০	২৬,২০২
	সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গৃহনির্মাণের জন্য অনুদান	১৫,০০,০০০	—
	জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলির গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে অনুদান	২,০৩,০০০	

❑

- সমবায়ের মজবুত ভিত তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে মুখ্যত সমবায় বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং মানসিকতা সৃষ্টির জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়।
- প্রতিটি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বাৎসরিক লাভ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে সময়মত জমা দেওয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইনে বাধ্যতামূলক।
- অধিকন্তু ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলীর ৭১ নং ধারায় বর্ণিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হওয়া এবং সেজন্য সদস্যপদভুক্তি ও সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের নির্ধারিত চাঁদা সময়মত জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
- ১৯৯৬-৯৭ সালে সমবায় শিক্ষা তহবিল থেকে অনুদানের সাহায্যে সমবায়ী এবং সমবায় ক্ষেত্রে কর্মচারিগণের জন্য ২২টি প্রশিক্ষণ প্রকল্প, তাছাড়া বিভিন্ন সমিতির ১৭,৭৩৬ জন সাধারণ সদস্য ও ১৯৮১ জন পরিচালক পর্ষদ সদস্যের জন্য সমবায় শিক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়।
- প্রতিটি জেলায় সমবায় শিক্ষা তহবিলের আনুকূল্যে স্থানীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সমবায় বিষয়ে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ছাত্রসমাজকে উৎসাহিত করুন। সমবায় মুখপত্র মাসিক 'ভাণ্ডার'-এর গ্রাহক হোন। সমবায় ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক রচনা ভাণ্ডারে প্রকাশের জন্য পাঠান। ভাণ্ডার প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং সাধারণ মানুষের সুস্থ সাবলীল জীবন যাপনের ব্যবস্থাপনায় সমবায় একটি শক্তিশালী সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে - ৩

বনানী দাস

পিঠান-দিদা। সাদা কাপড়, ওটনি খোঁপা, মুখের চামড়ায় দারুণ মজাদার ভাঁজ। সর্বজয়া পিঠান-দিদাকে আগে দেখেনি। পিঠে-পুলি বানাতে দারুণ পোক্ত এই প্রৌঢ়ার নামের আগে পিঠান বসে যাবার 'মিথ' পর্যন্তই ওনেছিল সে। দিনাকে প্রথম দেখল যেদিন ভবু বি সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য তাঁর শিবপুরের বাড়িতে এসে উঠেছিল সে। তখন দুই ছেলে, দুই নাতি আর ছেলের বৌদের নিয়ে পিঠান-দিদার ভরা সংসার। নতুন বড়সড় বাড়িতে থাকেন ওঁরা সবাই। দিদা থাকেন বেশির ভাগ সময়েই পুজোর ঘরে। তখন তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই একুশে বিধবা হওয়া এই মহিলা তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে বর্ধমানের ভাদুকা নামক গণ্ডগ্রামে কষ্টকার্কীর্ণ জীবন যাপন করেছেন। সম্পত্তি অধিকাংশ আত্মসাৎ করেছেন জ্ঞাতিজন। ঘরে বাইরে একচুল অনাচারের চিহ্ন দেখলে নিন্দার বাষ্পে চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে পরিজনরা। এসব পর্বের শেষে জন্ম পিঠান-দিদা শুধু নিদারুণ হাসামুখী এক চ্যালেঞ্জিং গৃহবধূ নন, তিন ছেলেমেয়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে হাওড়ার সম্পর্কে উঠে আসা এক লড়াকু মানুষ।

শিবপুরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে প্রথমবার ঢুকে সর্বজয়া রঙীন টিভির সামনে আটা মাখতে ব্যস্ত পিঠান-দিদাকে দেখেছিল। তার লম্বা চুল সে-রাতে টানটান করে বেঁধে দিতে দিতে দিদা বলেছিলেন ভাদুকা গ্রামের আধো অন্ধকার পুরনো গল্প। পরিচয় হয়েছিল পিঠান-দিদার মেয়ে গীতা মাসির সঙ্গে। নিঃসন্তান বোন নিদারুণ অপরাধে স্বামীপরিত্যক্তা হবার পর যিনি নিজের চেষ্টায় স্কুল ফাইনাল থেকে বি এ পর্যন্ত পাস করে তখন শিবপুরের ভবানী গার্লসের জুনিয়রের দিদিমণি। এই দুই মহিলার সঙ্গে বসবাস করে ভবু বি সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য সর্বজয়া যখন স্বচ্ছন্দে কলকাতায় যাতায়াত করত পিঠান-দিদা বলতেন, 'মেয়ে তো নয় মেয়ে-মক্কানি'।

সর্বজয়া জানত শব্দটির মানে হল পুরুষের প্রকৃতা যুক্ত মেয়ে। অর্থাৎ প্রায় ঘোড়ার প্রকৃতা যুক্ত গাধা বা নেকড়ের প্রকৃতা যুক্ত ছাগলের মত ব্যাপার। ছেলেদের ক্ষেত্রে অবশ্য মেনে নেয়া আছে যে মেয়েরা দুরকোলে নমস্য, শান্তভাবে অবস্থান করবে, সেক্ষেত্রে বহির্জগতে বিচরণশীল মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলেই হয়ত। সর্বজয়া কিন্তু ভাল করে চেয়ে দেখেছিল একটা মজার ভাঁটা চিকচিক করছে দিদার চোখে। বুদ্ধুর্ধে কিছু বোঝে সে। সোজা তাকিয়ে বলে, 'কলকাতায় অনেকদিন পড়াশুনা করেছি বলে এটুকু পারমিট দিবা, তোমার কুড়িতে তো আরও অনেক বেশি। সেই গণ্ডগ্রাম থেকে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছ।'

পিঠান-দিদা লড়েছিলেন অনেকটা রূঢ় বাস্তবের বাজায়, অনেকটাই অসচেতন অবস্থায়। চারদিক ধনসম্পত্তির মত সামান্য জিনে নিতে ওছিয়ে তিনি কখনো ভাবতে বসতে পারেননি জন্য মেয়েদের বিশাল একমুখী স্রোতটার মধ্যে তিনি কিভাবে আলাদা, কতটাই বা স্বতন্ত্র। কিন্তু গীতাদাসি ছিলেন সচেতন বা সুচেতনা। যা হাতে মহিমানের অন্ত মুক্ত তন হাতকে তিনি মুক্ত করেছেন একটি একান্ত নিজস্ব ভুবন তৈরির ব্রতে। গীতাদাসি বলতেন, 'বাইরের জগৎটা তোমাও। সেখানে পুরুষের আধিপত্য থাকতে পারে, তবে তা কখনই একচেটিয়া নয়। দুই মোগাতায় সেখানে ঢুকে পড়, তোমেও জমি চড়তে বাধ্য ওরা।'

বলটায় ভবু বি সি এস পরীক্ষায় বসতে সর্বজয়াকে বেরুতে হত সেই সকাল সাতটায়। জানুয়ারির কাঁপানো শীতে গরম জল থেকে ওঠ করে দু-তিনটি বাঞ্জনসহ গরম এক থালা ভাতও তার সামনে তখন এগিয়ে দিতেন দু'জন মামিমা এবং অবশ্যই গীতাদাসি। কিভাবে তখন এই তিনজন নদী গরম ছেয়ে তার ওপর স্থাপন করেছিল জন্য, প্রত্যাশা তা মনে নেই, কিন্তু গৃহবধূ মন্ত্রিমানের দিকে কৃতজ্ঞতায় তাকিয়ে সে বুঝত 'মেয়েরা মেয়েদের উন্নতির প্রতিবন্ধক' এসব কথা মিথ্যে আর সাজান। সুখ আর সুন্দর বাতাবরণে মেয়েরা নারী পুরুষ উভয়েরই পরম বন্ধু হতে পারে।

পরীক্ষায় পাস করেছিল সে। তবে সি গ্রুপে। সর্বোচ্চত এ-গ্রুপে যেতে পারেনি। বাবা খুশি হলেও চাপা দুঃখিত হয়েছিলেন। মা অবশ্যই ভয়ংকারা হয়ে গেছিলেন অনেকদিন ধরে। তখন সর্বজয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। পরীক্ষা দেবার প্রায় একবছর বাদে পাশের খবরে তার নিদারুণ আনন্দ হয়েছিল। না হোক গ্রুপ, একটা চাকরি তো মিলবে। পত্রের বাদে আছে বাক্তিত্ব পরীক্ষা অর্থাৎ পার্সোনালিটি টেস্ট। পিঠান-দিদা অসন্তুষ্ট খুশিতে বলেছিলেন 'তুই মেয়ে-মক্কানি বটে। ঠিক পাস করে যেদি বাপু।'

সর্বজয়া চোখ গোল করে বলেছিল, 'আবার ঐ কথাটা।'

দিদা চকচকে চোখে মজার হাসি হেসে বলেছিলেন, 'তোদের ঐসব সাংঘোয়াং-টাংঘোয়ের পরা, ট্রামে বাসে ঝুলাঝুলি করা, কঠিন কঠিন পরীক্ষায় পাস করা দেখে বাপু বড় আশ্চর্যি লাগে। আবার অনন্দও হয়। মনে হয় তোরা তো ঘাটছেলেরই সমিল।'

গীতাদাসি বলেছিলেন, 'শুধু পুরুষের সমিল হয়ে নয় না, মেয়েরা সুযোগ সুবিধা পেলে নিজেদের মত করেই ঐসব ফর্টলেস আয়ত্ত করে নিতে পারে। সেটা করতে গিয়ে আচার, ব্যবহার, পোশাক থেকে কিছু কিছু পুরনো উপাদান ঝরে যাবেই'

পিঠান-দিদা আসলে হারতে ভালবাসতেন। সর্বজয়ার লম্বা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে এযুগের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এই বলে, 'তা না হেরা এগিয়ে অনেক। আমারতো ক-অক্ষর গোমাংস ছিলাম। হাত কষ্ট করেছি সব এক হাত ঘোমটার নিচে। মুখ খোলালেই দুর্নামের ভয়। এতদিন অবশ্য ঘাটছেলেদের সঙ্গে তোদের তুলনা করব না। তোদের গায়ের জোর না থাকুক, কলমের জোর তো আছে।'

কলমের জোরটুকু নিয়ে একটি মেয়ের পথ হাঁটা। যেভাবে সংরক্ষণ করে পাইয়ে দেওয়া সুবিধের নয়, সে যোগ্যতায়, বাক্তিত্বে, দৃঢ়তায় আদায় করে নেবে তার প্রাপ্য। যদিও ভবু বি সি এস পরীক্ষা এবং তার পরবর্তী ধাপগুলোতে খুব সূক্ষ্মভাবে চোখে আঙুল দিয়ে আলাদা করা হল তার নারীত্ব। তার রোল নম্বরের আগে আটকানো ছিল 'এফ'। আর এই এফ-যুক্ত

মানুষদের জন্য রাখা হয়েছিল পৃথক কয়েকটি পার্সোনালিটি টেস্টের তারিখ। টালিগঞ্জ ব্রিজের কাছের বহুতল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা দিতে গিয়ে সর্বজয়া আবিষ্কার করেছিল, সবাই মেয়ে। কেন ছেলে নেই কেন — এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেছিল, 'হয়ত ছেলের সঙ্গে মেয়েদের ব্যক্তিত্ব বিচার করা অসুবিধেজনক।' কেন অসুবিধে তার উত্তরে একজন মেয়ে তো তড়বড় করে বলেই ফেলল, 'ভালই হয়েছে বাবা, ছেলেরা যা স্মার্ট আর আউটস্পোকেন ওরা থাকলে আমরা অনেকেই হয়ত নার্ভাসলেট হয়ে যেতাম পরীক্ষকদের কাছে।'

এইসব কথার সত্যি কোন ভিত্তি কিছু আছে কি না সর্বজয়া জানে না। তবে একথাতো জলের মত পরিষ্কার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েদের ব্যক্তিত্ব আজও অনুপাতিক হারে ছেলেদের তুলনায় সুগঠিত। আবার একথাও নির্মম সত্য যে পিছিয়ে থাকা মানুষকে অন্যায় সহানুভূতি দেখান কারুর কথা নয়। ফলপ্রসূ দানে কারো সম্মান বৃদ্ধি হয় না। তাই সর্বজয়া কোনকালের মহিলা সংরক্ষণকে সমর্থন করতে পারে না কখনই। তবু বি সি এস-এ আজ অবধি মহিলাদের জন্য কোন সংরক্ষণ নেই। ছেলে মেয়ে সমানভাবেই সেখানে লিখিত পরীক্ষায় বসে। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষাতেও ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আলাদা ভাবিধের ব্যবস্থা করা যুক্তিহীন। সেদিন সর্বজয়ার মনে এই স্বাধীন চিন্তে যে অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করেছিল, আজও তা সমানভাবেই জেগে আছে।

ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা খুব মন্দ হয়নি তার। সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনের ছবির মত ধাঁচাদি আক্রমণ নয়, জনাপাঁচেক যথেষ্ট যোগ্য ও বিজ্ঞ মানুষ তাকে রাজনীতি, অর্থনীতি, তার নেশা-পেশা, পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে খুব ধীরেসুস্থেই প্রশ্ন করেছিলেন। অতিরিক্ত কথা বা প্রসঙ্গের উত্থাপন করবে না, এই পরিকল্পনা নিয়েই সর্বজয়া বেশ স্বচ্ছন্দে তার কথার উত্তরগুলো দিয়েছিল। সবলেই তাকে সহযোগিতাই করেছিলেন। সর্বজয়ার অবাক লেগেছিল পরীক্ষকদের জ্ঞানের গভীরতা দেখে। তার প্রশ্নের মাথা নিচু হয়ে এসেছিল যখন রাজনীতির জটিল প্রশ্নকর্তা পরীক্ষক সর্বজয়ার অবসরের নেশা 'কবিতা' শুনে অনর্গল বলে চললেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন। সে উপলব্ধি করেছিল পরিশীলিত চর্চায় মানুষের মস্তিষ্ক বয় বিষয়েই হয়ে উঠতে পারে পারঙ্গমী। হয়ত এই চর্চারই অভাব থেকে গেছে মেয়েদের মস্তিষ্কের। জগদ্দল এই সামাজিক ব্যবস্থা করেক যুগ ধরে তাদের মুখ বেঁধে ঘুরিয়েছে 'রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধার' বৈচিত্র্যহীন চক্রে।

পার্সোনালিটি টেস্ট মন্দ না হলেও ভাল হয়নি। সর্বজয়া প্রায় বছরখানেক অপেক্ষা করে জানতে পেরেছিল যে আর সি-গ্রুপের নয়, তার স্থান নেমে এসেছে ডি-গ্রুপে। নিতান্ত মুষড়ে পড়েছিল বাড়ির লোকেরা। এমনিতে একবছর রেজাল্ট বেরতে দেরি হওয়ায় প্রতিবেশী পরিজনরা প্রায়নিক ধাক্কা হজম করে বলতে শুরু করেছিল, 'ও চাকরি আর মিলবে না। ওনুকের তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসে গেছে।' ইত্যাদি। আসলে তবু বি সি এস পরীক্ষার নামটি এত সম্মানজনক আর বলোবর্ধক যে সর্বজয়া বিনা ভূমিকায় ওতে চান্স পেয়ে যাওয়ায় নিকটজনেরা বড় বিস্মিত হন। সে ভেবে দেখেছে এই বেকারত্বের যুগে একটি দিনও তাকে বেকার থাকতে হবে না এই সম্ভাবনাই প্রতিবেশিদের প্রতি কম (শব্দটির জন্য এর স্রষ্টা নাট্যকার অস্তিত্বেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ স্বীকার করছি - লেখিকা) ক্ষত তুলেছিল।

আরও একটু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল তার নিয়োগ-এর পদটিতে। সর্বজয়া সাধারণভাবে জেনেছিল সি-গ্রুপে ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা আছে, ডি-গ্রুপে নেই। অথচ সমবায় পরিদর্শকের পদটিতে তার ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার নম্বরও তাকে সাহায্য করেছে, যদিও পদটি ডি-গ্রুপে। এই ব্যবস্থার কারণ কি সে বোঝেনি। কেন তবে সমবায় পরিদর্শকের পদটিকে রাখা হয়নি সি-গ্রুপে, কেনই বা পরিদর্শকরা পাবেন না সি-গ্রুপের উঁচুতে বেতনক্রম তাও একটি বিস্ময় তার কাছে। সমস্ত দেখে ও বুঝে সর্বজয়ার মনে হয়েছে সমবায় পরিদর্শকের পদটি আসলে বিচিত্র একটি অবস্থানে ঝুলে আছে প্রহসনময় একটি স্বাক্ষর পুরস্কার হয়ে।

তবু সেই পুরস্কার গ্রহণ না করবার কথা সর্বজয়া ভাবেনি, সর্বজয়ার মত হাজার হাজার ছেলেমেয়েও কেন্দ্র ভাবেনি। কারণ যে সমাজে, যে সমাজে তারা জন্মেছে সেখানে চাকরি হল জীবনের মোক্ষ। এই মোক্ষলাভের মন্ত্র নিয়ে মানুষ পেতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ততার সৌরভ। যদিও বাস্তবত সর্বজয়া দেখেছে এই স্বাচ্ছন্দ্য ও নিশ্চিন্ততা অত্যন্ত আপেক্ষিক সত্য। যে কোন কিস্তুতেই মানুষকে তাড়িত করছে অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্থিরতা। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ করেই সর্বজয়া মূলত বেঁচে গিয়েছিল চাকরিটি পেয়ে তা অস্বীকার করা যাবে না।

ছুটি পর্ব তখনও বাকি ছিল। হাসপাতাল এবং মেডিকেল টেস্ট। দৃষ্টিশক্তি, রক্তপরীক্ষা এবং স্টেথোর মামুলি ব্যবহারেই যে একজনের যথার্থ সুস্থতা মাপা যায় তা জেনে যারপরনাই আনন্দ হয়েছিল তার। বয়স্ক কলকাতা মেডিকেলের ডাক্তারটি ছিলেন যথেষ্ট লঘু বিশেষত মেয়েদের প্রতি। বধু টেস্ট করেছেন হয়ত লম্বা জীবনে। প্রথমেই বাড়ির ঠিকানা দেখে জেরার ঢালবায় বলেছিলেন, 'কোন্ এন পি-র এরিয়া যেন আপনাদের ওদিকটা?'

ডাক্তারের কাছ থেকে হঠাৎ এ-জাতীয় প্রশ্ন আশা করেনি বলেই একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সর্বজয়া।

'সে কি! বি সি এস পাশ করেছেন, আর এটুকু জানেন না। সইফুদ্দিন চৌধুরী। কি ঠিক তো!' ডাক্তার বেশ রসিয়ে হাসেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে আড়াল তৈরি করে বলেন, 'আপনাদের আর কী চেকআপ করব! সেটা ভালও দেখায় না। সার্টিফিকেট দিয়ে দেব, ১৬ টাকা দিয়ে যান।

স্তব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল সর্বজয়া। টাকাটা ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে। ডাক্তারের লঘু হাসির দিকে তাকিয়ে আর ভরসা পায়নি পরবর্তী চেকআপের। তাকে মনে রাখতে হয়েছিল সে নারী। কেউ তাকে অপমান করে, কেউ অপমানের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখে।

পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিষয়টি আরও কৌতুককর। নিকটবর্তী থানায় তাকে ডাকা হয়েছিল। সম্ভবত নেজবাবুর সামনে পাতা বেঞ্চে বসে তখন কেঁদে কেঁদে স্বামীর অত্যাচারের কথা বলে ডাইরি করাচ্ছিলেন এক মহিলা ও তার মেয়ে। শুধু ধমক দিতে দিতে নেজবাবু যান্ত্রিকভাবে কিসের সংকেত লিখে মহিলাটির সই করিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন। সর্বজয়ার আসবার উদ্দেশ্য জেনে তিনিই আবার প্রবল শক্তির করলেন তাকে। চা ইত্যাদি অনুরোধ শেষে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করলেন, 'আপনি বাড়ি যান। ঠিকঠাক রিপোর্ট চলে যাবে।'

রিপোর্ট সত্যিই ঠিকঠাক দিয়েছিল। খুব অন্যায় কথা, একটি প্রশ্নও তাকে করা হয়নি। অথচ ছেলেদের পুলিশ ভেরিফিকেশনে যথেষ্ট খোঁজখবর নেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুরা বলেছিল, 'মেয়েদের ক্ষেত্রে, কলকাতার দুষ্কৃতচক্রে কোন জটিলতা থাকতেই পারে না এই বিশ্বাসেই বামপন্থী পুলিশমন্ত্রীরা সর্বজয়াকে বিনা দ্বিধায়ই অব্যাহতি দিয়েছিলেন।'

সর্বজয়া তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। স্বদেশি আমলে বা সত্তরের দশকে কোনদিন মুখের বন্ধ আওনখেকো মেয়েকে পুলিশের কাছে নাজেহাল হতে দেখা গেছে। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি মোটেই। আর ইতিহাস ও ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্প-উপন্যাসের দিকে তাকালে তো মেয়েদের পুলিশ, প্রশাসন, রাষ্ট্রের খুব একটা নিশেষে বিশ্বাসযোগ্য মনে হবার কারণ নেই। লঙ্ক শিবির থেকে লাবণ্যময়ী সীতেরা খবরাখবর এনে দিত নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে। আনন্দমঠ উপন্যাসে লাস্যময়ী বৈষ্ণবী মেজে শান্তি ইংরেজদের গোপন যুদ্ধ প্রস্তুতি বানচাল করে দেয়, এমনকি জেলের এক প্রধানমন্ত্রীকে বোমা বিস্ফোরণে হত্যা করতে ব্যবহৃত হয় পুষ্পবিলাসিনী এক তরুণী। তাতেই 'সব যুদ্ধই আসলে মেয়েদের জন্য' এই সার্বেক্ষি প্রশ্নাত্মক প্রবাদটির পরিবর্তে বলা উচিত সব যুদ্ধেই মেয়েরাও অংশ নেয়, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে। যুদ্ধের বীজ নিহিত থাকে সমরের গভীরে। আর এই নই-এর দশকের যুদ্ধহীন আলোকোজ্জ্বল সময়ই পুলিশকে এমন নিশ্চিন্ত, নিঃসন্দেহ করে রেখেছে।

অবশেষে আসে চাকরিতে জয়েন করবার দিনটি। সময়ের সম্বন্ধে তখন সর্বজয়ার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে মূলত দুটি মানুষ তাকে অফিস-কাছারি, আইন-কানুন, পরিবেশ পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে অনেকটা চলনসই বানিয়েছিলেন। একজন ট্রাম কর্তৃপক্ষের জেনারেল অফিসার তার আজন্মের বন্ধু বাবা, অন্যজন সমবায় দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসার ও পারিবারিক বন্ধু, সাহিত্যরসিক বেবতীরঞ্জন বিশ্বাস। এই দু'জন এবং পরিবারের সকলের মিলিত উষ্ণ সহযোগিতায় চাকরিতে জোয়ানের ভিড়িতে সর্বজয়া ছিল আত্মবিশ্বাসী কিন্তু উৎসুক ও বিনয়ী। জোয়ানের স্থানটি একটি প্রাচীন ব্লক। আসলে একে বলা যায় সেখানকার পরিবেশ ও নিয়মসমূহ। কিন্তু সর্বজয়া শুধু মেয়ের মধ্যে নিজেই চলতে চায় না, সে চায় মেয়ের সমবয়সরা আরও মানবিক একটি বিকাশ-উন্মুখ স্রোতের অনুসারী হবে। প্রয়োজনে নতুন স্রোতটির প্রচলন শুরু করতেও সে তৈরি। তাই তখন বিন খদ্দরের মোটা কাপড়ের একটি বস্ত্র কুল কামিজ পরেছিল সে। তার ওপরে ছিল কাশ্মীরের কারুকরা হালকা জ্যাকেট। নভেম্বরের শীত সেবার সবে ছেঁকে ধরছে। বাসে করে এক ঘণ্টা যেতে যেতে সর্বজয়া দেখেছিল সবে জয় রবিবারের ছেড়ে। তার সঙ্গি মামাতুতো দাদা (যিনি ঐ একই স্রোতের স্থল-পরিদর্শক বলে তার সঙ্গি) বলেছিল, 'ওটা কিন্তু প্রাক্তন, বি ডি ও তোকে বলবেন না তো এখানে শাড়ি পরাই নিয়ম। এইসব গোলাপ চলবে না।'

সর্বজয়া চিন্তিত হয়েছিল। প্রথম দিনেই কি তাকে এইরকম তুচ্ছ কোন ব্যাপারে ধমক পিঠে কথা চালাতে হবে? আসলে চাকরি পাবার উত্তেজনা যে মনটাকে ছাপিয়ে তখন তার ভেতরে কোন একটা ধম্ ধরা বিষণ্ণতা জমা হচ্ছিল। কারণ সে জানত না। তবে সব মিলিয়ে সর্বজয়া চঞ্চলিত খুব নিরুপদ্রব, শান্ত করেকটা আগামী ঘণ্টা। খুব ভেতর থেকে একটা নিস্তব্ধতা ছেয়ে ফেলছিল তাকে।

না, মেয়েকে কোন পোশাক প্রসঙ্গত ওঠেনি। সেদিন বি ডি ও কোথাও টুরে থাকায় সর্বজয়াকে অপেক্ষা করতে হয় প্রায় দেড় ঘণ্টা। কেন ছোট খণ্ডের যাবার ব্লক অফিসে এসে স্কুল থেকে ফেরবার পথে বসে থাকত সে। তখন থেকেই পিওন, অফিসার, ক্লার্ক ইত্যাদি ভেদাভেদে গড়া ব্লক অফিসের পরিবেশ তার বেশ পরিচিত। এই অফিসের পরিবেশও প্রায় সেরকমই। খুব শীতল একটা নিশ্চিন্ততা মানুষগুলোকে উত্তেজনাহীন করে রেখেছে। এখানে বক্তব্য বা আলোচনার বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সবসময়ই সময় কাটানোর জন্য কিছু রাজনীতি, কিছু দুর্নীতি, কিছু সিনেমা বা টেলিভিশনের চলতি ধারাবাহিক নিয়ে কথাবার্তা বলে। তবে বিশেষকাকে বেশির ভাগ মানুষই জীবনবহির্ভূত কিছু বলে মনে করে। সার কথা বলতে ডি এ, ইনক্রিমেন্ট, পে-কমিশন, এরিয়ার বিল, ইনকাম টাক্স ইত্যাদি সম্বন্ধে চুলচেরা বিশ্লেষণ। নভেম্বরের সেই শীতার্ত দিনে জীবনের একটি সন্ধিমুহূর্তে বসে সর্বজয়া আবছা আবছা ওনেছিল ডি ও নম্বর ওনুক নিয়ে দু'জন স্টাফের মধ্যে তুমুল তর্ক। ইনকাম টাক্স এড়াবার জন্য নতুন কায়দা নিয়ে একজন প্রাচীন চেহারার মানুষের বাকিদের তাক লাগাবার চেষ্টায় তাদল, একজন ঠিকিন কৌটো খুলনে বাকিদের 'বৌদি খুব ভাল রান্না করেন' বলে চালু রসিকতা এবং অফিসকর্তা বি ডি ও-র প্রতি জনৈক শিওনের বিরক্তিসূচক উক্তি, ইত্যাদি। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হয় সে যেন একটি ইঁদুর। বন্ধ চেম্বার ঢুকে পড়েছে শস্যভাণ্ডারে। সেখানে অবাও ঝাঁক ঝাঁক ইঁদুর চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্য বিশেষ চিন্তাভাবনা নেই, শুধু খুঁটে-খাওয়া ছাড়া। কিন্তেক সে তার চেয়ে কাজে জীবনের বিভিন্ন সময়। শিশু বয়সে ভয়ানক, ফড়িং ধরতে গিয়ে দুপুরে রোদে ঘুরি বা শিওদের সঙ্গে ঘুটে বেড়ানো, কিশোরী বয়সে খাতাই শত শত পাতা করে পরে কেন্দিং ছাড়া নিয়ে হেঁটে যাওয়া ট্রাম লাইনের ধারকরে, মনে পড়ে কলেজের বক্তৃতা প্রবন্ধতে দ্বিতিকালের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠা, অনার্স পরিচয়ে মন ঘুরে বেড়ানো স্বীনেমা, রবীন্দ্রসদন বা গড়ের মাঠ। দুটোনার থেকে সর্বজয়ার সব চেয়ে ভাল লাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকালগুলি যখন ক্লাস আরম্ভ হতে অনেক দেরি। সিগ্রেট ধোঁয়ার মত তার প্রথম আজ অতিন দূরে মেন এসে ঠাণ্ডায় এই ঠাণ্ডা অফিসে সেখানকার বাতাবরণ মনুষ্যত্বগুলোকে ঢেকে ফুল ছোট বাক্সর মতন করে ফেলেছে। সর্বজয়া জানতেও পারেনি তখন তার কখন লিখে চলেছে —

ঠাণ্ডা ইনকাম টাক্সের হিসেব নিকেশে
সব কিছু মনুষ্যী ছোটোখুটি
ঢেকে ঢেকে, ফুলে ফুলে মনুষ্য টেবিলে
বসে

নিজেকে অমৃত রেখে —
ধীরে অতিমন্থীভাবে কাজকর্ম করে
যেহেতু পয়ের কাছে বিকাশী ঢেকে
কারুরতা প্রকাশ করে দূরে লজ্জিত হয়।।

হ্যাঁ, এত শীতেও একফালি রোদ সর্বজয়ার পায়ের পাতায় এসে পড়েছিল। ঝোঁ ঝিকমিক করে হাসছিল। সর্বজয়া পা সরিয়ে নেয়। ফিসফিস করে বলে, 'আজ থেকে তোমার সঙ্গে আর কথা নেই। আজ থেকে আড়ি।'

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)

Regd. No. 139 Dt. 30-1-97

Benachity House

Durgapur - 713 204

Phone : 0343/56-2393. 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি

ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

আওয়েনের ধর্মচিন্তা

জোনাথন ব্রড

(ডিসেম্বর '১৭ সংখ্যার পর)

[রবার্ট আওয়েন এমন এক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ হবে উৎপাদন সংস্থা, যারা শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করবে আর সর্বোপরি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উৎপাদনমুখী কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির জালে প্রতিষ্ঠিত হবে রাষ্ট্র।]

আওয়েন সকল ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করতেন। তিনি মনে করতেন ধর্মের প্রমাণক দিকগুলো জীবন সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ধর্ম সেই ধর্মের মানুষের মধ্যে মৌল ও গোঁড়া ধারণা সৃষ্টি করে। ধর্মীয় অনুশাসন তাকে অসংগত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে, অভিভূতকে ভয়াবহ অবস্থায় নিয়ে যায়। ধর্মীয় ব্যবস্থায় সাধারণভাবে মানুষ দুর্বল ও বলহীন ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হয়ে পড়ে, এমনকি ক্ষুব্ধ ধর্মান্ধ, ধর্মোন্মত্ত বা ঘৃণ্য ভণ্ডে পরিণত হয়। ধর্মীয় ব্যবস্থার এই প্রভাব ব্যাপকভাবে গ্রামের মানুষের মধ্যে পড়ে, সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের স্বর্গীয় চিন্তা বা স্বর্গের ছবি তখনই স্পষ্টতর হয় না। এ যাবৎ সকল ধর্মের প্রভাব মানুষের মনের গভীরে সর্বনাশা, লোকক্ষয় অনৈক্য, বিভাজন ও বিভেদের বীজ সাধারণভাবে বপন করে থাকে যা মৌলিক বিশ্বাসকে জড়িয়ে ফেলে। সন্ধ্যাবেলার আকাশ কম্বু ধারায় মানুষের মনে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় শত্রুতার ভয়াবহ গভীর প্রভাব পৃথিবীর অতীত দিনে জনজীবনে কঠিন। কঠোর, নির্মম, হৃদয়হীন আঘাত হেনেছিল। আওয়েনের স্বপ্নের আদর্শ গ্রামের লক্ষ্যে তিনি কর্মীদের বলতেন যে, 'তোমরা গ্রামে গিয়ে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার কথা প্রচার করো। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বিভাজনের সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদের পাশবিকতার পরিবর্তে সৌহার্দ ও সভ্যতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলার কাজ করো যতক্ষণ না সামাজিক ঔশ্বর ত্রুটিগুলি সংশোধিত হয়।' তিনি আরও বলতেন যে, 'আমি তোমাদের অপরের কিছু করার কথা বলছি না, আমি জানি তোমরা কি কর বা তোমরা কি না কর। আমি তোমাদের চিন্তাভাবনা করতে বলছি যে, প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের জন্য তার আনন্দ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, বিবেকের স্বাধীনতা রয়েছে। নিজের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার অধিকার রয়েছে। আমি তোমাদের ধর্মের পক্ষে নই, পৃথিবীর কোন বহমান ধর্মের আবর্তে আমি অবগাহন করি না। আমার কাছে সব ধর্ম এক ও অভিন্ন।'

আওয়েনের এই ধর্ম ধারণা তিনি ১৮১৭ সালে ২১শে অগাস্ট লন্ডন শহরের ট্রাফালগার এক সভায় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই জনসভায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সমাগম হয়েছিল এবং শ্রোতারা নিস্তব্ধ হয়ে তার বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়েছিলেন। সভাটি উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল ও অভাবিত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। আওয়েনের বন্ধু ছিলেন হেনরী ব্রুহ্যাম যিনি লর্ড ব্রুহ্যাম হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ও ইলেকের লর্ড চ্যান্সেলার জন্য সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভার পরের দিন শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ে আওয়েনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আওয়েনকে দেখে ব্যঙ্গাত্মক সম্বোধন করলেন শয়তান হিসাবে তার বললেন যে আপনি গতকালের জনসভায় ধর্ম সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমরা যারা হাউস অফ কমন্সের লিবারাল পার্টির সদস্য যদি এর অর্ধেক বলতাম তবে আমাদের জীবন পুড়িয়ে মারা হত। আর আপনি নির্বিঘ্নে নির্লিপ্তভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন যেন কিছুই হয়নি।

ইতিহাসে এ নজির রয়েছে যে সত্যের জন্য ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানী ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে ইত্যাদি সত্য বলার জন্য গ্যালিলিওকে চার্চের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

সভায় যখন সম্প্রদায়গত ধর্মমতের কুৎসিত কুসংস্কারগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছিল তখন আওয়েনের মনে হচ্ছিল যে শ্রোতাদের অনেকে হয়তো তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। গোঁড়া ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারের প্রতিহিংসা হয়তো তাকে আক্রমণ করবে কিন্তু উক্ত আশঙ্কার প্রতিফলন ঘটেনি। সকলে তার বক্তৃতা শুনে হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল এমনকি কিছু ব্যক্তি আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন যে তারা আওয়েনের বিরোধিতা করবেন, পরে তারা আওয়েনকে বলেছিলেন যে তার বক্তৃতা শুনে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আওয়েনের বক্তৃতা ইলেক্ট্রিক শকের মত তাদের মনে কাজ করেছিল। দুর্বল মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল শ্রোতাদের তরফ থেকে বিদ্বেষ প্রদর্শিত হবে, তবে যে কিছুই ঘটেনি তা নয়। কিছু পাদ্রী সভা চলাকালে হিস্ হিস্ শব্দ করেছিল। পাশাপাশি মধ্যে মধ্যে হাততালি পড়ার ফলে পাদ্রীদের অপচেষ্টা ব্যাহত হয়েছিল, তেমন কিছুই ঘটেনি। সভা শেষে বন্ধুদের কাছে আওয়েন বলেছিলেন, বিজয় অর্জিত হয়েছে। সত্যই তাই।

আওয়েনকে প্রায়শ নাস্তিকতার জন্য অভিযুক্ত করা হত, বাস্তবে তিনি ছিলেন আস্তিক তবে তিনি বস্তুবাদীও ছিলেন। তার স্বপ্নের আদর্শ গ্রামের জন্য বিধান দিয়েছিলেন (ক) প্রত্যেকে ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে তার নিজস্ব বিবেকের আদেশ অনুসারে স্বাধীনভাবে, সমানভাবে মুক্তকণ্ঠে মতামত ব্যক্ত করতে পারবে। (খ) কেউই অপরের মতামত ও বিশ্বাসকে অবদমিত করতে পারবে না তবে যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারবে। (গ) মতামত বা বিশ্বাস প্রকাশের জন্য কোন প্রশংসা বা নিন্দাবাদ, ভুল বা ত্রুটি, পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে না। (ঘ) অপরের চিন্তায় বাধা বা আঘাত না দিয়ে, সকলের জন্য বা সকল ধর্মের জন্য সমান অধিকার থাকবে যাতে বোধোদ্দীপ্ত শক্তি যার

নির্দেশে পরমাণু চলছে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাকে সম্মান করছে, সেই শক্তিকে যে কোন পদ্ধতিতে উপাসনা করা বা বিবেকের প্রহণযোগ্য উপায় তার সাধনা করা।

আওয়েন 'যুক্তিসংগত ধর্মের' জন্য নীতি ও রীতির উপর দশটি বিধান দিয়েছিলেন যার মধ্যে মূলত তিনটি প্রধান ছিল। (১) সমস্ত ঘটনাসমূহ মানুষ যা আজ পর্যন্ত জেনেছে তাতে দেখা যায় যে সমস্ত অস্তিত্বের জন্য বহিঃ বা অন্তঃকারণ বর্তমান। তাদের অস্তিত্বের পশ্চাতে গতিশক্তির কারণ নিহিত রয়েছে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সেই বোধাতীত শক্তিকে পৃথিবীর দেশে দেশে মনুষ্যজন আল্লা, খ্রিস্ট, ঈশ্বর, জিওভা ইত্যাদি নামে ডেকে থাকে কিন্তু ঘটনা এটাই যে সেই শক্তি সম্বন্ধে মানুষ এখনও অজ্ঞ এবং সেই শক্তির সংজ্ঞা কি হবে? (২) আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতির নিয়ম অনেকাংশে সুস্পষ্ট যে পৃথিবীর উপর সৃষ্ট জীবসমূহের ভিতরের ও বাহিরের বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তাদের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এই নিয়মানুসারে মানুষের ভিতরের ও বাহিরের বৈশিষ্ট্যগুলিও মানুষের জন্য সৃষ্ট হলেও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি — এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক কল্পনা করা হয়েছে। (৩) ঘটনার জন্য জ্ঞান : সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রয়োজনীয়ভাবে প্রত্যেকের মধ্যে এক নতুন, মহান এবং পবিত্র দানের চেতনা সৃষ্টি করে যা মনুষ্যজাতির চরিত্র, ভাবাবেগ ও দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্ম দেয়। সমস্ত জীবের প্রতি মমত্ববোধ জাগরিত করে। সর্বোপরি এই বিশ্বের বিচিত্র জীব জগতের সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উৎস নিহিত রয়েছে যা মনুষ্য বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছে।

আওয়েনের সন্তানরা ধার্মিক মাতার অধীনে প্রচলিত ধর্মমতের আলোকে বড় হয়েছিলেন। আওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল আওয়েন এক সময়ে যুক্ত চিন্তার মানুষ, পিতা আওয়েনকে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমেই যিশুখ্রিষ্ট সম্পর্কে আওয়েন মতামত কি তা জানতে চান। আওয়েন উত্তরে বলেছিলেন 'তার উৎসাহমূলক শিক্ষাগুলিকে আমি পালন করি, একের প্রতি অপরের ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করাকে আমি সমর্থন করি।' এরপরে পিতাকে প্রশ্ন করেন, যিশু যে ভগবানের পুত্র তা কি তিনি অবিশ্বাস করেন? পিতা বিস্তৃতভাবে পুত্রের প্রশ্নের প্রতি বলেন, 'হে পুত্র, তুমি প্রশ্ন করছো কেন?' একটু হেসে তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করলেন যিশু কি ভগবানের পুত্র? পাশাপাশি প্রশ্ন রাখলেন, তুমি কি মহম্মদের নাম শুনেছ? প্রত্যুত্তরে পুত্র বলেছিল, 'আমি শুনেছি অনেক মানুষ আছেন যারা মহম্মদকে ভগবানের পুত্র বলেন। তারা ভগবানের পুত্র হিসাবে মনে করেন না। তারা মহম্মদের কোরানকে ভগবানের বাণী হিসাবে মনে করেন। তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন যে ক্যাথলিকরা কি খ্রিস্টান? পুত্র উত্তর দিয়ে ছিলেন-'না। তারা পোপ বিরোধী।' পিতা বলেছিলেন 'খ্রিস্টান মানে প্রটেস্টান।' অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মেরও ভাগ রয়েছে। বাইবেল অন্য ধর্মের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ❑

শারদীয় ভাণ্ডার '৯৭ সম্পর্কে

শ্রদ্ধেয় 'ভাণ্ডার' সম্পাদক মহাশয়েষু,

১৪০৪ সনের শারদীয় ভাণ্ডার পড়লাম। সংখ্যাটি এককথায় অনুপম। অতি সুসম্পাদিত, সুমুদ্রিত, সুন্দর নেক-আপ সম্বলিত পত্রিকাটির সমস্ত লেখাগুলিই — কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ সবই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তবু এরই মধ্যে কিছু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, যেমন দিবোদ লাহিড়ি, অশোকেন্দু সেনগুপ্তের গল্প ; কৃষ্ণ ধর, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবাশিস প্রধানের কবিতা ; সুনীল ঘোষ, তরুণ সান্যাল, অমীম রায়, উৎপল চক্রবর্তী, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, দীপালি ঘোষ, অজয় বসু-র প্রবন্ধ ও রমারচনাগুলি মনে দাগ রেখে যায়।

শেষের কটি কথা : স্বল্প পরিসরের সম্পাদকীয়টি অনবদ্য। প্রচ্ছদ পরিকল্পনাটি সহজ সরল, অথচ অসাধারণ। আর যেটা আমাকে বিশেষ করে নাড়া দেয়, তা হ'ল পাবনপুরের মনিষিদের সংক্ষিপ্ত জীবনাবলী। প্রসঙ্গত অন্যান্য মাসের সংখ্যাগুলিতে সংশ্লিষ্ট মাসে জন্ম এমন সাহিত্যিক, বিপ্লবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত অথচ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী (জন্ম ও মৃত্যু সহ) প্রকাশের দাবি রাখে। শারদীয় ভাণ্ডারে মানব চৈতন্যকে যে আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। নারায়ণকে সম্মান জানিয়ে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা নিয়েই সম্মানিত হ'ল।

ইতি

শ্রীমতী পুষ্প মিত্র

নেতাজিনগর

দেহরাডাঙা

উত্তর চব্বিশ পরগণা

খেজুর রস ঃ সুস্বাদু হেলথ্ ড্রিঙ্ক্

ড. মৃণালচন্দ্র সেন

ঠিলিশো বছরেরও আগেকার কথা, কিন্তু এখনও পরিষ্কার মনে আছে। তখন স্কুলে পড়ি। পরীক্ষার পর, প্রতি শীতে ৩মা-হুবড়ায় পিসির বাড়িতে দু-একদিনের জন্যে বেড়াতে যেতাম। পিসিদের বেল কয়েকটা বড় বড় খেজুর গাছ ছিল। আমার যাবার প্রধান হেতুই ছিল ওই খেজুর গাছের রস পান করা। ঠাণ্ডাশো শীতের সকালে, সদ্য গাছ পাড়া, টাটকা খেজুর রস পানের আনন্দ ও আমেজই আলাদা। মুহূর্তের মধ্যে শরীর ও মন দুই-ই যেন তরতাজা হয়ে ওঠে। খেজুর রসের ওই মিঠে স্বাদ একবার যে পেয়েছে তার পক্ষে এর অলক্ষিত টানকে উপেক্ষা করা কঠিন। আজও শীতকালে গ্রাম বাংলায় গেলে পূর্বের ন্যায় টাটকা খেজুর রসের প্রাচুর্য দেখতে না পেলেও একেবারে আকাল অবস্থাও নয়। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে নানা কারণে শহরে আজকাল এটা অমিলের পর্যায়েই চলে গেছে। শহরে শহরে নানান ইনস্টিং এর অপূর্ব স্বাদকে প্রায় ভুলতে বসেছে। খেজুর গাছ গ্রাম-গঞ্জের যেখানে-সেখানে হতে দেখা যায়। এই গাছের জন্যে তেমন কোনও যত্ন-আত্তির দরকার পড়ে না। এজন্যই বন্য বা গৃহপালিত প্রাণী এবং রোগ-ভোগ থেকেও এই গাছকে রক্ষা করতে বিশেষ কোনও ব্যবস্থাদির প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া খেজুর রস রসনায় তৃপ্তি জোগানো ছাড়াও এর পুষ্টিগুণ যে নেহাত কমতি নয়, সেটা হয়তো অনেকেরই অজানা। এই লিখছে তাই টাটকা খেজুর রসের পুষ্টি মূল্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হল।

টাটকা খেজুর রস কার্বোহাইড্রেটস ও ফসফরাসের ভাল উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম রসে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ১১ গ্রাম ও ১৪০ মিলিগ্রাম। এই কার্বোহাইড্রেটসের উপস্থিতির জন্যেই এটা স্বাদে মিষ্টি মিষ্টি লাগে এবং এই রস পান করলে চটজলদি এনার্জিও মেলে। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ গ্রাম রস থেকে প্রায় ৪৫ কিলো ক্যালরি এনার্জি পাওয়া যায়। ফসফরাস দেহে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলে হাড় ও দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে, সেই সঙ্গে শরীরে কার্বোহাইড্রেটস এবং অ্যাসিডিটারোধে অক্সিডেশনেও ফসফরাস কাজ দেয়। এ-ছাড়া স্বল্প মাত্রায় অন্য যে-সব উপাদান যেমন প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন-বি১ এবং ভিটামিন-সি ও টাটকা খেজুর রসে বর্তমান। তবে আশ্চর্যের কথা এই রস উত্তম মুহূর্তগুলো শীতকালে গ্রামের দিকে এখনও স্বল্প মূল্যে খাঁটি খেজুর রস পাওয়া যায় এবং গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে এটা এক উপাদেয় স্বাস্থ্যকর পানীয়। অতএব সর্দিকে বিদায়ে তাজা খেজুর রসকে এক নাম্বার সুস্বাদু হেলথ ড্রিঙ্ক রূপেও বোধহয় অনুমতি হবে না। ⌟

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

অন্যান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম আর এক দেশ সেবকের। সুবিখ্যাত এই দেশনায়কের জন্ম ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ সালে। ব্যারিস্টারি ছেড়ে তিনি গান্ধীজি (১৮৬৯-১৯৪৮)-র অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য তিনি স্ত্রী নেলী সেনগুপ্ত সহ কারারুদ্ধ হন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বা ওয়ার্কিং কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। গান্ধীজি হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলন তুলে নিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯২২ সালে স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং তিনি তাতে যোগ দেন। পাঁচবার তিনি কলকাতার মেয়র হন। ১৯২৫ সালে হঠাৎ চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৮-এ তিনি কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। রেঙ্গুন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্যে তিনি কারারুদ্ধ হন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি বিলাত যান এবং ফেরার পথে জাহাজে বন্দী হন। প্রথমে বরোদা জেল এবং পরে দার্জিলিং ও রাঁচিতে তাঁকে রেখেও ব্রিটিশ সরকার শান্তিতে থাকতে পারেননি। শীর্ষস্থানীয় এই জনপ্রিয় নেতাকে দেশবাসী 'দেশপ্রিয়' নামে ভূষিত করে। মহান এই দেশ প্রেমিকের মৃত্যু হয় ২২ জুলাই ১৯৩৩-এ।

⌟ *অশোককুমার গিরি*

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজী সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২১০১

(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৯৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়সহ শাখা সংখ্যা	অংশ মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নীট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-)০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০০	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+)২০.৩০
৩১-৩-৯৬	১০৭০	১১৬	১২	২২৮.৯১	৫০৩৩.৯৩	২৮৯৬.৯৮	(+)১৩৪.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দান করে থাকে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের প্রান্তীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলী জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণাল কান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্র নাথ জানা
সভাপতি

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮২ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

F NATH-0338

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচির নবীকরণ

অসিতবরণ নাথ

গ্রামাঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের প্রকৃত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানকরী সমস্যা হল দারিদ্র্য। আর সেইসঙ্গে যেসব নবীন প্রজন্ম উঠে আসছে কিংবা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের কাছে চিরন্তন যে সমস্যা তা বেকারত্ব। এই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার উপায়স্বরূপ যে যে কর্মসূচির কথা ভাবা হয়েছে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের অন্যতম। পরবর্তী লাইন বা দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবার ও তাদের উন্নয়ন নিয়ে আপাতত কিছু আলোচনা করা যাক।

সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা সংক্ষেপে আই আর ডি পি হল দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারের উদ্যোগী নারী-পুরুষকে আর্থিক স্বনির্ভরতা প্রদান করা। এই কর্মসূচি ১৯৮০ সালের থেকে সারা দেশের সমস্ত জেলার সমস্ত ব্লকেই রূপায়িত হয়ে আসছে। গরিব মানুষের স্থায়ী উন্নতি করতে গেলে এমন সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ করে দিতে হয়, যার পূর্ণ ব্যবহার করে তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের অবস্থা ফেরাতে পারে। ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারি অনুদানের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক পারিবারিক আয়ের ভিত্তিতে দরিদ্র পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) ০ থেকে ৪০০০ টাকা, (খ) ৪০০১ থেকে ৬০০০ টাকা, (গ) ৬০০১ টাকা থেকে ৮৫০০ টাকা, এবং (ঘ) ৮৫০১ টাকা থেকে ১১০০০ টাকা। সবচেয়ে দরিদ্র অর্থাৎ 'ক' শ্রেণী থেকে ক্রমান্বয়ে পরবর্তী শ্রেণী অর্থাৎ 'খ' শ্রেণী থেকে প্রকৃত উদ্যোগীদের বাছাই করে তাদের আর্থিক সহায়তা এতদিন দেওয়া হত। ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে এই শ্রেণীবিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখন থেকে দারিদ্রসীমার নীচে (পারিবারিক বার্ষিক আয় ১১০০০টাকা) থাকা যে কোন পরিবার আই আর ডি পি-তে সাহায্য পেতে পারেন।

আই আর ডি পি-র সহায়তা যারা পাবেন, তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ হবে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী পরিবারের লোক, ৩ শতাংশ পাবে প্রতিবন্ধী অথচ কর্মক্ষম উদ্যোগী এবং সাহায্য প্রাপকদের ৪০ শতাংশ হবে মহিলা।

আই আর ডি পি ঋণের ক্ষেত্রে জামানত ছাড়া ঋণের মাত্রা কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে ২৫০০০ টাকা করা হয়েছে। পঁচিশ হাজার টাকা ঋণের জন্য কোন সিকিউরিটি লাগবে না। তবে এই প্রকল্পে সহায়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তা যথাপূর্বক ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক হিসেবে রাখতে হবে।

আই আর ডি পি ঋণ পরিশোধের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে — অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের কিস্তি ৩৬ থেকে বাড়িয়ে ৬০ মাস নির্ধারিত হয়েছে।

ট্রাইসেম : দারিদ্রসীমার নীচে থাকা পরিবারের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ বেড়েছে। তারা নোট ছিনের পঞ্চাশ হাজার বা সাত হাজার পাঁচশো টাকা (যেটি কম হবে) অনুদান হিসেবে পাওয়ার অধিকারী হবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতার সর্বনিম্ন মান হচ্ছে অষ্টম শ্রেণী। এই অনুদান পেতে হলে তরুণ-তরুণীদের অবশ্যই ট্রাইসেম-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন সেই বিষয়ের উপরেই আই আর ডি পি প্রকল্প হবে।

এছাড়া, বর্তমানে দলবদ্ধভাবে (Groupwise) আই আর ডি পি প্রকল্প করতে কোন অসুবিধে থাকবে না। কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দল বা গ্রুপ তৈরি করা যাবে। এই সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আই আর ডি পি-তে প্রকল্প মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়া যেতে পারে।

একটি মূল্যবান সংযোজন হল এখন থেকে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ঋণ ও অনুদানের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে একইসঙ্গে পাওয়া যেত। নতুন নিয়মে, অনুদানের টাকা ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে দেওয়া হবে না। প্রকল্পের সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্ক ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে এবং মোট টাকার উপরেই ঋণপত্র লেখা হবে। অনুদানের টাকা ঋণগ্রহীতার নামে স্থায়ী আমানতে জমা রাখা হবে এবং সুদ দেওয়া হবে। যদি বেনিফিসিয়ারি (ক) যে স্কিম-এর জন্য টাকা পেয়েছেন এবং তা রূপায়ণ করেছেন, (খ) সময়মতো ব্যাঙ্কের কিস্তি দিয়েছেন, এবং (গ) সৃষ্ট সম্পদের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করছেন — তাহলে মূলধন স্থায়ী আমানতের টাকা পরিশোধযোগ্য ঋণের শেষ কিস্তি মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হবে। যদি ঋণের কিস্তি মেটানোর পরেও কিছু টাকা থেকে যায়, তবে তা বেনিফিসিয়ারির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে।

পরিশেষে অত্যন্তটি কথা বলা দরকার যা হল, আই আর ডি পি প্রকল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ডি আর ডি এ-এর নির্ধারিত টাকার ৯৯ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা কুড়ি ভাগ করা হয়েছে এবং পরিবারভিত্তিক সংস্থা গড়ে পনেরো হাজার টাকার উপর নিয়ে ঘোরার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়া আই আর ডি পি বা সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে যে পরিকাঠামোগত বিন্যাস ছিল, সেটাকেই এখনও সেটাই বলবৎ রয়েছে এবং অনুদান দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত জেলাতে সুষ্ঠু কর্মসূচির পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব ডি আর ডি এ বা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার উপরেই ন্যস্ত রয়েছে। ❑

আপনার ভোট
দেশের ভবিষ্যৎ

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ
এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১. সময়ে সহযোগিতের প্রসার,
২. ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা
৩. ন্যায্যমূল্যে নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বস্তু ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ভেহিকি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুমুখী লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমবায় আমানত বিনিয়োগ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পেও বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। বক্রেশ্বরপুর, রোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-6942

সমবায়ী বৃদ্ধাবাস তৈরি হোক

বাসুদেব চ্যাটার্জি

সময়ের সঙ্গে সমাজব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় আত্মকেন্দ্রিক মনস্কিতা আজ আমরা গভীর আঘাত। আজকে দেখা যাচ্ছে একান্নবর্তী যৌথ পরিবার যা এককালে ভারতবর্ষে আদর্শস্থানীয় ছিল তার পরিবর্তে ছোট পরিবার, স্বামী-স্ত্রী ও একটি কি বড়জোড় দুটি সন্তান নিয়ে গঠিত পরিবারের কর্তা বয়সবৃদ্ধির ফলে যখন কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিচ্ছেন তখন তাদের দেখাশোনা করার লোকের অভাব হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছেলে কর্ম উপলক্ষে বাইরে এবং বিয়ের পর নেয়ে অন্য পরিবারের বধূ। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ দম্পতি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

অধুনা বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতায়, বহুজাতিক ও একচেটিয়া পুঁজিপতি সংস্থাগুলির বিপণন নৈপুণ্যের যুগে মানবিক সম্পর্কগুলি দ্রব্য-বিক্রয়ের সামগ্রী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিঃসঙ্গতা ও সাহচর্যের কঠিন সমস্যা আজ একটা আন্তর্জাতিক রূপলাভ করছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এই সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয় কারণ এই ব্যবস্থায় মানবিক সম্পর্ক ও গুণাবলী শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা যান্ত্রিক ও পাশবিকরূপ পাচ্ছে।

নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই শূন্যতাবোধের সমস্যাটির সমাধানকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে 'এজেন্সি' খুলছে যাতে অর্থের বিনিময়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সময় দেওয়া যায়। তাই বিদেশের মতো ভারতবর্ষেও বার্ধক্য-নিবাস (ওল্ডেজ হোম)-এর চাহিদা বাড়ছে। জীবনের সায়াহ্নে তাই আজ বার্ধক্য নিবাসই হল সাধারণ মানুষের শেষ ভরসা ও আশ্রয়স্থল। শুধু অর্থই যথেষ্ট নয়, লোকবলেরও প্রয়োজন। যা অর্থের বিনিময়ে বার্ধক্য নিবাসের বেতনভুক কর্মচারীরা খানিকটা মেটান।

শাস্ত্রে আছে পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বানপ্রস্থ অবলম্বন। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত বার্ধক্যের আশ্রয় স্থল ছিল বারাণসী। নগর সভ্যতার আগ্রাসনের যুগে তার হারিয়েছে শান্ত-স্নিগ্ধ-আধ্যাত্ম পরিবেশের নির্জনতা। তাই বানপ্রস্থ অবলম্বনে উদ্যোক্তারা আজকের দিনে অচল এবং মূল্যহীন।

কঠোর বাস্তবকে বাঁচিয়ে করলে আজকের নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের একমাত্র আশ্রয় হল বার্ধক্য নিবাস। কিন্তু এই বিষয়ে সরকারি প্রচেষ্টা নিতান্তই অপ্রতুল এবং যেটুকু আছে তা সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। বেসরকারি প্রচেষ্টায় বর্তমানে কিছু বার্ধক্য নিবাস গড়ে উঠলেও তা সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত।

তাই বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠনগুলিকে এই বিষয়ে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আজকের দিনে অবৈধ ক্লাবগুলি যেভাবে সদস্যদের সুবিধার্থে ভারতবর্ষের দর্শনীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থানে 'হলিডে হোম' স্থাপন করেছে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে সেরকম এইদিকে নজর দিলে আরও একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হবে। আজ পর্যন্ত কোন সমবায় সমিতি বার্ধক্য নিবাস খুলেছে বলে আমার জানা নেই। বহু অলাভজনক সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বার্ধক্য নিবাস স্থাপন ও সুষ্ঠু পরিচালনায় কোন বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়। বরং অতিরিক্ত অর্থ তারা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে বিনিয়োগ করছে। যার বেশির ভাগটাই অনাদায়ে ব্যয়িত হচ্ছে এমনকি আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেও জমা রাখি না। যেখানে এই রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি জমাকৃত ৪৭ শতাংশ বিনিয়োগ করে সেইখানে সমবায় ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৭ শতাংশ। সুতরাং নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আশ্রয় স্থলে সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনায় বার্ধক্য নিবাস স্থাপনের উদ্যোগকে সমস্ত অবস্থাই স্বাগত জানাবে। বর্তমানে সমবায় নীতিগুলির অন্যতম উদ্যোগ হল 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' স্থানীয় সমস্যাগুলির উন্নয়নে সমবায় সমিতির প্রয়াস সমবায়কে ব্যাপক জনসমাজের সঙ্গে যুক্ত করবে। অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিঃসঙ্গ মানুষজন নিজেরা যদি সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে বৃদ্ধবাস তৈরি করতে পারেন, সমবায় আন্দোলনের বৈচিত্র্যের মধ্যে এটি একটি নতুন সংযোজন হবে। নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই দিক নির্দেশী হবে।

সময় সমবায় ও সমাজের কাছে সেই দাবিই করছে। ❑

ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	= ১০০০টাকা
৩য় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	= ৮০০টাকা
২য় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	= ৮০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা	= ৬০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা	= ৪০০ টাকা
ভিতরে ১/৪ অংশ পৃষ্ঠা	= ২৫০ টাকা

গ্রাহক চাঁদা

প্রতি সংখ্যা	৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	: ৩০০ টাকা

পুরনো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সম্বাদ বৎসরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছি, পুরনো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে, এই আশায়]

ফেব্রুয়ারি

তারিখ	বৎসর	স্মরণীয় ঘটনা
		প্রথম তিনটি টেস্ট ম্যাচের প্রত্যেকটিতে শতরান করায় মহম্মদ আজহারউদ্দিন ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম এ ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী হলেন।
		ও এন জি সি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত।
		এশিয়াটিক সোসাইটির শাখা হিসাবে কলকাতা মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছিল।
		শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।
		কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়কে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'লিজিয়ন ডি অনর' প্রদান করলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মিতেরঁ।
		প্রথম ভারতীয় পুলিশ অফিসার রবিদত্ত শর্মার ইন্টারপোলে যোগদান।
		বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন।
		বোম্বাই ও ঠাণ্ডলার মধ্যে ভারতের প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল শুরু।
		মৃত্যুদণ্ড অপ-প্রত্যাহার প্রতিস্থাপন আইন প্রয়োগ করা হল।
		নির্মাণের একশ দিয়াত্তর বছর পর কোর্ট উইলিয়াম প্রথম জনসাধারণের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হল।
		ভারতের প্রথম পূর্ণবয়স্ক কেলা হিসাবে কেরালস্থ এর্নাকুলাম ঘোষিত।
		শিল্পের জন্য একটি পুনরুজ্জীবন তহবিল 'ন্যাশনাল রিনিউয়্যাল ফাণ্ড' গঠিত হল।
		টায়ার আবিষ্কর্তা জন বয়েড ডানলপ প্রয়াত হন।
		ইন্ডিয়ান সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটি দুম্বিনি পার্কে তিন শয্যাবিশিষ্ট মেন্টাল হসপিটাল শুরু করে।
		কলকাতায় পুলিশি ব্যবস্থার সূত্রপাত।
		কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি রেজিস্ট্রার আইনজ্ঞ রেভারেন্ড কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৪৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জন্মলগ্নে তাঁর জন্ম হয়।
		প্রখ্যাত চিকিৎসক ও কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কর্তা ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর মৃত্যু।
		বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের জন্ম।
		চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ বসন্তকুমার চৌধুরী ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক পদ্ম বিশেষজ্ঞ সংস্থার ১৯৭২ সালের পুরস্কার পান।
	১৯১২	বিখ্যাত অভিনেত্রী ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেহত্যাগ করেন।
	১৯৬৪	কেরালস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করেন।
	১৮৪০	মিস মো-এর ওল্ড মিশনচার্চে মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। দীক্ষা দেন গির্জাধিপতি আর্চবিশপ ডিরানট্টি। সাক্ষী ছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
		বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাংলার গভর্নর জেনারেল স্যার জ্যাকসন।
		ভারতে ফ্রয়েডিয় দর্শন বার্ষিক সেমিনার শুরু।
		বিপ্লবী চারুচন্দ্র বোস (চারু বোস) পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর কোর্টে গুলি করে হত্যা করেন।
		চিত্রাভিনেতা পাহাড়ী (নগেন্দ্রনাথ) সান্যাল দেহত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং-এ।
		প্রানেফেন আবিষ্কর্তা টমাস মিলিস এডিসন-এর জন্ম।
		মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকা পুণা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।
		জরুরি অবস্থা শিথিল হয়। রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ-এর মৃত্যু।

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
	১৯৯০	নেলসন ম্যান্ডেলাকে প্রায় ২৬ বছর কারাগারে রাখার পর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার মুক্তি দেন।
	১৮০৯	আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অব্রাহাম লিঙ্কন ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন-এর জন্ম।
	১৯৬১	বেলজিয়ান কঙ্গোর মুক্তিকামী প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বার হত্যা।
	১৯৭৯	আয়াতুল্লা খোমেনিকে ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা।
	১৮৭৯	ভারতের বুলবুল সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (নইডু) হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। আমি নিবাস চরকার ব্রাহ্মণ গাঁ।
	১৯৫৮	ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ড. হো-চি-মিন একদিনের জন্য কলকাতায় পদার্পণ করেন এবং কলিকাতা পৌরসভা তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।
		কলকাতায় ভারতবর্ষের প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
		সুপ্রিম কোর্টে ষাঁড় জাতীয়করণ অবৈধ ঘোষিত। জাতীয়করণ বহাল রাখতে রাষ্ট্রপতির নতুন করে অধ্যাদেশ জারি।
		ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ দাবি মওকুফ পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে ৪৭ কোটি ডলার বা ৭১৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন কার্বাইডকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ।
		নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এস এম নন্দা গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে জাহাজ নির্মাণ ডকের ভিত্তি প্রস্তরস্থাপন করেন।
		আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধপ্রস্থান সম্পূর্ণ।
		দেশ সেবক, বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মহেন্দ্র লাল সরকার মৃত্যু বরণ করেন।
		কিউবায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সফল ভূমিকা নিয়েছেন ফিদেল কাস্ত্রো কিউবার প্রধানমন্ত্রী হন।
		শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার জন্মগ্রহণ করেন।
		কবি প্রীবিনচন্দ্র দাস বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।
		চিন কর্তৃক তিব্বত আক্রমণ।
		গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য দেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। ডাক নাম নিমাই।
	১৮৩৬	উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ধর্ম ও সমাজজীবনের সঙ্গে জড়িত পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (গদাধর চট্টোপাধ্যায়) হুগলি জেলার কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৮৩	পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দেহত্যাগ করেন।
	১৮১৮	কলকাতা কর্পোরেশন থেকে প্রথম রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়।
	১৮৯১	মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।
	১৯৫০	বিশিষ্ট ব্যারিস্টার এবং সুভাষ বসু-র অগ্রজ বিপ্লবী শরৎচন্দ্র বসু দেহত্যাগ করেন।
	১৯৭১	রাজনীতিবিদ ও দেশসেবক হেমন্তকুমার বসু কলকাতার বিধান সরণিতে নিহত হন।
	১৯৮৭	নিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশকে ২৩ ও ২৪তম রাজ্য হিসাবে ঘোষণা।
	১৯১৪	কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ২৭শতাংশ সংরক্ষণের আওতায় প্রথম কর্মী নিয়োগ করেন।
	১৯১০	কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট সামসুল আলমকে বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত হত্যা করেন।
	১৯৪৮	রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য ভারতীয় সংবিধানের খসড়া দাখিল।
	১৯৫২	বাংলা সরকারি ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন শুরু।
	১৮৪০	জার্মানিতে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা এবং মার্কস ও এঙ্গেলস্ -এর সহযোগী অগাস্ট বেবেল জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৮৫	বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও দেশসেবক ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৪০	সমাজ সংস্কারক, সম্পাদক, গ্রন্থকার, নব্যবঙ্গ কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৮১	প্রকাশ পাদুকোন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন খেতাব জিতলেন।
	১৮৭৩	প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি ছাড়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। বউবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসী স্কোয়ার, কাস্টমস্ হাউস ও স্ট্রাণ্ড রোড হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত যেত। নয়-মাস পর এটি তুলে দেওয়া হয়।
		মাদ্রাজ রাজ্যের নাম পাল্টে রাখা হয় তামিলনাড়ু।
		সংস্কৃত কলেজের নতুন ও বর্তমান ইমারতের শিলান্যাস। জন্ম এই কলেজ পরিণত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত চর্চার এক অনন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। স্বাধীনতার পরে ১৯৫১ সালে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই কলেজে স্নাতকোত্তর গবেষণার নতুন আয়োজন হয়।

তারিখ	বৎসর	স্মরণীয় ঘটনা
	১৯৬৯	পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত।
	১৯৮৬	বঙ্গ অনুবাদক ও সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের ১৩৫ তম তিরোধান (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অজিতকুমার সরকার স্মরণে করেন।
	১৮৮১	জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনীত হয়। এতে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও সরস্বতীর ভূমিকায় দশ বছরের বালক প্রতিভা (পরে আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী) ও আরো অনেকে অভিনয় করেন। প্রযোজনায় সহায়তা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
		প্রবেশ পথে ফ্লাইওভারের একটি অংশের উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রী এল উজাম।
		প্রায় সাত মাসব্যাপী ইতিহি দখল থেকে কুয়েত মুক্ত হল। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পার্শ্ববর্তী তৈল সমৃদ্ধ কুয়েতে হঠাৎ আক্রমণ করেন।
		পূর্বদিক বেড়ে অবস্থিত কয়েকটি রাস্তা বিশ্বমানের কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট উন্নয়ন করার বিশ্বমানের কর্ত সম্পন্ন হয়।
		পশ্চিমবঙ্গের কমুনিস্ট পার্টিকে আইনসঙ্গত বলে কলিকাতা হাইকোর্টের ঘোষণা।
		মনোহরপুকুর তৃতীয় উপনির্বাচনে ভোটকে পূর্ণ বিনিময়যোগ্য করা হয়। এর আগে ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারির সালেটি আংশিক বিনিময়যোগ্য করা হয়েছিল।
		হাওড়া ব্রিজের (রবীন্দ্র সেতু) উদ্বোধন। এটি তখনকার কলকাতার ভালো খুলে দেওয়া হয়।
		রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যু।
		ব্রিটিশ ইতিহাসে এই দিনে লর্ড বার্কলি ইন বলেছিলেন লর্ড ডালহৌসির কাছ থেকে গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ডালহৌসির হয় প্রধানমন্ত্রী মেরেডিথ সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।

(এ ভাব)

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং : ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে তাদের নাম ও পরিবেশের প্রথম। কলকাতা হাইকোর্টকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম বার্ষিক সভায় সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্লেষণের ভেত্তিতে বিবেচনাকৃত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং এ মনোরম পরিবেশে

হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহকপদ নিতে সমর্থ হয়েছে

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম
	কৃষকবন্ধুরতী কো-অপারেটিভ লিঃ (কৃষকবন্ধু)
	২৪৬-বি, লেক টাউন, ব্লক-বি, কলি-৮৯
	কুমারগঞ্জ ব্লক ডিলারমেন্স কো-অ. সোসাইটি লিঃ
	চক্রমরায়, গোপালগঞ্জ, পঃ দিনাজপুর
	শিশিরকুমার সেন,
	চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট
	৫১/১, শিবপুর রোড, হাওড়া-২
	কোচবিহার পি ডব্লু ডি ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ কো-অ. ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
	পোঃ ও জেলা - কোচবিহার
	কেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো-অ. ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
	১১৯, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-৮৯
	গ্রন্থাগারিক,
	স্টেট ইন্সটিটিউট অফ পঞ্চায়েত্স্ অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	কল্যাণী, নদিয়া (২নং বাজারের কাছে)
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ
	২৪এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলি-৬৯ (প্রথম কর্মচারী)
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ
	২৪এ, ওয়াটারলু স্ট্রিট, কলি-৬৯ (প্রথম মহিলা)
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (ভবানীপুর শাখা)
	২৮এ, এস পি মুখার্জি রোড, কলি-২৫
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (শ্যামবাজার শাখা)
	১৫/২বি, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলি-৪
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বেহালা শাখা)
	১৫, এস এন রায় রোড, কলি-৩৮
২৮৩	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (জেলেখাজী শাখা)
	সি-৫২, সি আই টি স্কিম, কলি-১০
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (হাজিরাগঞ্জ শাখা)
	৮৯, অরবিন্দ সরণি, কলি-৫
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (এন্টালি শাখা)
	২৭/সি, সি আই টি স্কিম, কলি-১৪
২৮৬	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (গড়িয়াহাট শাখা)
	২/২এ, নন্দী স্ট্রিট, কলি-২৯
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (গোলপার্ক শাখা)
	২৮/৩এ, গড়িয়াহাট রোড, কলি-২৯
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (নিউ আলিপুর শাখা)
	২৩/এ, নিউ আলিপুর, ব্লক-সি, কলিকাতা
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (চেতলা শাখা)
	অডিটোরিয়াম ব্লক, সি আই টি মার্কেট, কলি-৬৭
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (শিলিগুড়ি বিধা শাখা)
	হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি

২৯১ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (শিলিগুড়ি সাব্ধ শাখা)
প্রথম তল, হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (সল্ট লেক শাখা)
ই বি - ১৫৬, সল্ট লেক সিটি, কলি -৬৪

উত্তর ২৪ পরগণা ইউনিট

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (নর্থ ইউনিট অফিস)
বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বারাসাত শাখা)
বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বসিরহাট শাখা)
বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বনগাঁ শাখা)
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বারাকপুর শাখা)
এস এন বানার্জি রোড, ব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বাদুরিয়া শাখা)
বাদুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (হাবড়া শাখা)
হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (আমডাঙ্গা শাখা)
মরেখালি, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (চাঁদপাড়া শাখা)
চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ইউনিট

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (সাউথ ইউনিট অফিস)
ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (ডায়মণ্ডহারবার শাখা)
ডায়মণ্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (ক্যানিং শাখা)
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (কাকদ্বীপ শাখা)
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (কাকদ্বীপ শাখা)
কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (আমতলা শাখা)
আমতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (সাগর শাখা)
কচুবেরিয়া, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (পাথরপ্রতিমা শাখা)
পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (ডায়র শাখা)
ডায়র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (বারুইপুর শাখা)
বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৩১২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (কোচবিহার ইউনিট অফিস)
পোঃ ও জেলা - কোচবিহার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (কোচবিহার শাখা)
পোঃ ও জেলা - কোচবিহার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (মাথাভাঙ্গা শাখা)
মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (আলিপুরদুয়ার শাখা)
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (দিনহাটা শাখা)
দিনহাটা, কোচবিহার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (জলপাইগুড়ি শাখা)
জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে লিঃ (তুফানগঞ্জ শাখা)
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার
সাউথ ২৪ পরগণা কো-অপ. এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে লিঃ
২১/১ডি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-১৯
ব্যাঙ্কে অফ বরোদা কো-অপ. ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
৮, ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি - ১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্বভার নিলেন বিনয়গোপাল মিত্র

গত ১-১-৯৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পদের দায়িত্বভার নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র-স্বরূপ ও কলকাতা প্রোফেসনাল কনসিডিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র।

এই নিয়োগ তাঁর নিজ পদের অতিরিক্ত হিসাবে হলেও অতি স্বল্পকালের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রী মিত্র চিরকালই অত্যন্ত পরিশ্রমী, সৎ ও দক্ষ প্রশাসক। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও বিভিন্ন কাজে তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন চিরকালই পেয়েছে। "ভাণ্ডার" পত্রিকাতেও তাঁর লেখা প্রবন্ধ, কবিতা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। স্থান স্বল্পতা ও সময়াভাবের জন্য এই সংখ্যায় তিনি সম্পাদকীয় ছাড়া আর কিছু লিখতে পারেননি। যাই হোক পুরানো 'ভাণ্ডার' পত্রিকার পাতা থেকে তাঁর দুটি ছোট কবিতা পাঠকদের জন্য আবার পরিবেশন করা হ'ল।

সমবায়

কিন্তু কোন মত নয়, আছে শুধু পথ
নিরলস প্রয়াসের মিলিত শপথ।
সমবায় মানে নয় কোন নির্ভরতা,
এখানে সবার কাছে সবার বারতা —
লক্ষ্য যদি এক হয়, হোক এক মন
মিলিত হোক তাতে সহস্রের ধন ;
একজনের শ্রমে সাধ্যে যা কিছু বিলম
ধনে-জনে-সমবায়ে রচিবে সম্পদ।
মানিকে শ্রমিকের আছে বিবাদের ভয়
শ্রমিক মালিক হয়ে হ'ল সমবায়।

ভাণ্ডার -ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

সমবায় আন্দোলন

গরিব চাষীদের চাষে করিতে সহায়,
কৃষিকল্প আয়োজনে কৃষি সমবায়।
কৃষির জিনিস আর কৃষি উপাদান
ন্যায্যমূল্যে বিতরিছে কৃষি বিপণন।
ভোগ্যপণ্য বণ্টনের সুষম উপায়ে
করিতে নিয়ত ব্যস্ত ভোক্তা সমবায়।
আবাসন সমবায় করিছে আয়োজন
বাসহীন বিত্তহীন মানুষের লইছে সন্ধান।
অর্থকরী মানুষের যত কর্মধারা
সুষ্ঠুভাবে সাধ্য যায় সমবায় দ্বারা।

ভাণ্ডার -জানুয়ারি, ১৯৭৭। (বা মু)

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (I) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই সি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪১৫১/৩৩৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বৃত্তা মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সদস্যভুক্ত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও কলিকাতা জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের পরিধির সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, বেঙ্গলিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

সমবায় সমাচার

রাজ্যস্তরে আন্তঃবিদ্যালয় রচনা প্রতিযোগিতা

১০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য কার্যালয়ে রাজ্যস্তরে আন্তঃ-বিদ্যালয় রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সমবায় শিক্ষা তহবিলের আর্থিক সহায়তায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত ঐ প্রতিযোগিতায় ১২টি বিভিন্ন জেলা থেকে ১২ জন সফল প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। রচনার বিষয়বস্তু ছিল "জাতীয় সংহতি ও সমবায়"।

রচনা লেখার পর রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, সমবায় শুধু অর্থনৈতিক সংগঠন নয় — এর একটি তাত্ত্বিক দিকও আছে। সমবায়ের নীতি, সমবায়ের তত্ত্বের দিকটি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। তিনি বলেন তাঁর ছাত্রজীবনে সমবায়ের কথা ছাত্র-ছাত্রীরা তেমন জানত না। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সমবায় ক্রিয়াকাণ্ডের কথা আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক বেশি করে শুনছে, দেখছে এবং জানছে। তবু সমবায়ের আরও প্রচার ও প্রসার হওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন আজকের ছাত্রসমাজ আগামিকালের কর্ণধার, তাই আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবায় চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটলেই এই রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

সমবায় শিক্ষা তহবিল ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুশীলকুমার ঘোষও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তিনি বলেন, সমবায় চিন্তা-ভাবনার প্রসার হয়েছে এবং হচ্ছে — তবে সমাজের সকলের স্বার্থে সমবায় আন্দোলনের আরও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হওয়া দরকার। বিতর্ক এবং রচনা প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে — এটি আনন্দের বিষয়। তিনি প্রতিযোগী ও তাদের অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানান এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের স্মারক হিসাবে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নামপত্র ও বই তুলে দেন।

রচনাগুলি মূল্যায়ন করার পর গত ২০ জানুয়ারি, ১৮ সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার শেষে রচনা প্রতিযোগিতায় সফল প্রার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। জগদ্ধাত্রী দেবী দুর্গাদাসী চৌধুরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কুমারী নন্দিনী পরভিন, কোচবিহার জেলার জেনকিন্স হাইস্কুলের অর্পিতা দত্ত এবং জলপাইগুড়ি জেলার শোভাপুর পার্থ বসেরা হাইস্কুলের অতীক দত্ত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান লাভ করে। পুরস্কারের মধ্যে ছিল নগদ অর্থ, বই এবং নামপত্র। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের একজন অভিভাবকের যাতায়াতে খরচও বহন করা হয়।

রাজ্যস্তরে আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

গত ২০শে জানুয়ারি, ১৮ উত্তরপাড়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির আর্থিক সহযোগিতায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে রাজ্যস্তরীয় আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল " আর্থ সামাজিক সঙ্কট নিরসনে সমবায় প্রভূত সহায়তা করে।"

ঘূর্ণোপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলার সফল প্রতিযোগীদের থেকে মোট ১৬ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দর্শকপূর্ণ প্রতিযোগিতা কক্ষে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর জলপাইগুড়ি জেলার শিমুল মহাবালয় হাইস্কুলের তন্ময় ব্যানার্জি, কোচবিহার জেলার জেনকিন্স হাইস্কুলের সুব্রত সাহা এবং জলপাইগুড়ি পিরিবালা সরকার গার্লস হাইস্কুলের মেহেলিন বসু যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

এই প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরা ছিলেন সমরেন্দ্র জানা, তরুণ সান্যাল, তুলসীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অনিমেষ আচার্য।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার শেষে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুশীলকুমার ঘোষ প্রতিযোগী, তাদের সঙ্গে আগত অভিভাবকবৃন্দ এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে দু-চার কথা বলেন। তিনি বলেন সমবায় যেহেতু একটি আন্দোলন তাই এর প্রসার এবং ক্রান্তির উপরেই এর সার্থকতা নির্ভরশীল। পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমিতির সদস্য সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেড়েছে, সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে আগের থেকে অনেক বেশি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সমাজের স্বার্থেই সমবায় আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমবায় শিক্ষা তহবিল প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে বিভিন্ন সমবায় সমিতির লাভের কিছু অংশ নিয়ে এই তহবিল গঠিত হয় এবং সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সমবায় নীতির প্রচার ও প্রসার এবং কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে সমবায় তহবিল কমিটির আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বছর এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং শুধু অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী নয়, তার একজন অভিভাবকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আসা-যাওয়ার খরচ দেওয়ানো সম্ভবপর হয়েছে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করে সভাপতি অনুরোধ করেন যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত তাঁরা যেন সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রদেয় অর্থ ঠিকমত প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হন।

ভাষণ শেষে সভাপতি মহাশয় অংশ গ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীকে স্মারক হিসাবে একটি করে নামপত্র ও বই এবং সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও নামপত্র দিয়ে উৎসাহিত করেন।

বিতর্ক সভার শেষে সংক্ষিপ্ত সভাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অবসর সংযোজকুমার সান্যাল। (বা. মু)

ম্যানেজারদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

হালি জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অধীনস্থ সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছটি ব্লকের কৃষিউন্নয়ন সমিতির ম্যানেজারদের সুবল সাহু, উমেদীচাঁদ, বীরেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, মণি, পরিষদ, গাছের পুষ্টি, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর দুইটি পাঠক্রম যথাক্রমে ৫-৯ ও ১২-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র উত্তরপাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ দুইটি, সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র উত্তরপাড়া, হালি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের অধীনস্থ সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প ও ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

প্রথম পর্বের প্রশিক্ষণে ২৯ টি সমিতি থেকে মোট ২৯ জন ম্যানেজার যোগ দেন। রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ এই পর্বের উদ্বোধন করেন। শ্রী ঘোষ, উত্তরপাড়া ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করায় প্রশাসনের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানান। তিনি উপস্থিত প্রশিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ শুরু করেন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেন। সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোর ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরূপায়ণে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, পঞ্চায়েত দপ্তর নিয়ন্ত্রক বেজায়ে এগিয়ে এসেছে সেইভাবে এগিয়ে আসার জন্য তিনি অন্যান্য সংস্থা ও দপ্তরের প্রতি আহ্বান জানান। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বাড়ি তৈরির জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, জলপাইগুড়িকে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার দেওয়া নয় লাখ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা জানান। সারের পর্যাপ্ত ব্যবহারে মৃত্তিকা রক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জাপানের কৃষি সেন্সাসে যোগদানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

ট্রেনিং শুরুতে আই সি ডি পি'র পরিচালন অধিকর্তা কে পি চ্যাটার্জি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন ও প্রশিক্ষণের শুভকামনা করেন। পরে আই সি ডি পি'র বিপণন সঞ্চালক এস মুখার্জি বলেন প্রশিক্ষণের ফলে হুগলি জেলার সমিতিগুলি একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবে ও স্বাবলম্বী হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে প্রকল্পের শেষেও সমিতিগুলির কার্যধারা অব্যাহত থাকবে। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (ফাই) আঞ্চলিক অধিকারিক এন চৌধুরী, ডেপুটি আঞ্চলিক অধিকারিক এস ব্যানার্জি। অন্যান্য অধিকারিকদের মধ্যে উল্লেখ হলেন ড. এ রায়, সি আর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি মণ্ডল, এন চৌধুরী, এস কে দালাল - অধ্যক্ষ, প্রমুখ।

উদ্বোধনী পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সচরাচর প্রশিক্ষণের থেকে এই দুটি প্রশিক্ষণ ছিল স্বতন্ত্র। বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলির প্রায়োগিক দিকগুলির যথাসম্ভব " করে দেখো ও দেখো " পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচিত হয়। বিষয়সূচিতে ছিল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, কৃষি উপকরণের মাত্রা ও বাজারের চাহিদা অনুমান উপকরণ ব্যয়, বিক্রি ব্যবস্থাপনা, মাটি সমীক্ষা ও পরীক্ষা, গাছের পুষ্টি, পরিচর্যা রোগ প্রতিরোধ, উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, ব্যবহার, জৈব সার, জৈব গ্যাস, সৌর শক্তির প্রয়োগ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। প্যাকেজের সম্পদ সমন্বয় ও ব্যবস্থা উন্নয়ন ইত্যাদি যা সমকালীন প্রয়োজন ও দাবির প্রতি দৃষ্টি রেখে তৈরি হয়েছিল। হাতে কলমে সংগ্রহ, পরীক্ষা, বীজ অংকুরোদ্গম,সৌর শক্তিকে ব্যবহার করে আলো জ্বালানো ইত্যাদি দেখানো এবং প্রোজেক্টরের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন প্রশিক্ষণ সূচিকে খুবই আকর্ষণীয় করে তোলে।

উপস্থিত বিষয়গুলির উপর বক্তব্য রাখেন পঃ বঃ সরকারের প্রাক্তন কৃষি ডাইরেক্টর বি মণ্ডল, ফাই-এর আঞ্চলিক সদস্য সি আর বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. এম এন বন্দ্যোপাধ্যায়, এস এস দেব, ড. এ কে রায় (ইনাইটি), টি কে ঘোষ ডেভ রিসার্চ কনিউনিকেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার, জে সর্বা-এইচ এফ সি এল, ড. ডি কে নাথ-প্রাক্তন রাজ্য কীটনাশক বিশারদ, ড. এস চ্যাটার্জি ভ্রু বি এস এস সি, এন এন সিন্হা, পি বসবাল, অমর কে রায় - ম্যানেজার মার্কেট, অশোক চক্রবর্তী, অমর কে সান্যাল-জেনারেল ম্যানেজার-ডি আই সি-কলি, ডি পি পাল - ইফকো, এরিয়া ম্যানেজার (বর্ধমান) ড. পি কে ঘোষ, হুগলি জেলা পরিষদ প্রভৃতি। তাঁরা আলোচনা ও হাতে কলমে কাজে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ পর্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭ টা অবধি প্রশিক্ষণ পর্ব চলে।

সমাপ্তি দিবসে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র ও হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন। শ্রী মিত্র তার ভাষণে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন সাধনে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন এবং প্রকল্পের ব্যাপারে উত্তরপাড়া কেন্দ্রের প্রশংসা করেন। সভাধিপতি মহাশয়ের উপস্থিতি সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানটিতে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তিনি সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণটি হয় ১২-১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। মোট তেইশটি সমিতি থেকে ২৩ জন ম্যানেজার যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঞ্চ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন এবং অনোগ্রাহী উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি সমিতির ব্যবসা উন্নয়ন ও সম্পদ সদ্ব্যবহারের কথা বলেন। এছাড়াও হুগলি ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বি বিশ্বাস-আই সি ডি পি প্রকল্পের অধিকর্তা কে পি চ্যাটার্জি, ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সন্তোষকুমার দালাল, ফাই-এর সবস্য ও অন্যান্য পদাধিকারিকগণ সমিতির উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় পর্বের প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি প্রথমটির মত করে একইভাবে তৈরি ও অনুসরণ করা হয়। সমাপ্তি দিনে হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখার্জি উপস্থিত থেকে সমাপ্তি ভাষণ দেন।

ওপাওসের নাপকাঠিতে প্রশিক্ষণ দুটি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল খুবই সুন্দর। ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ, সমস্ত কর্মী, আই সি ডি পি'র পদাধিকারীগণ ও আমন্ত্রিত বক্তাদের আন্তরিকতায় সকলের আলা আকাঙ্ক্ষাকে প্রত্যাশিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে পেরেছে। ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের সঙ্গে সব সময় থেকে এই শিক্ষাক্রমকে সফল করতে নানান ধরনের সাংগঠনিক কাজ ও খরচের সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করেছে হুগলি জেলার সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্প।

❑ স্বপন চ্যাটার্জি

আই সি ডি পি হুগলি-র প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের কৃষি সমবায় সমিতিগুলির ম্যানেজারদের জন্য আই সি পি পি-র উদ্যোগে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২২ জন ম্যানেজার অংশগ্রহণ করেন। আই সি ডি পি-র জেনারেল ম্যানেজার কালিপ্রসাদ চ্যাটার্জি-র উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ দেন ম্যানেজার অরুণ মৈত্রিক (ক্রেডিট ও ব্যাঙ্কিং), এ কে পাণ্ডে, সুকুমার দাস (উন্নয়ন অধিকারিক)। এঁরা আমানত সংগ্রহ, মর্জিন মানি লিঙ্ক ক্যাশ ক্রেডিট অপারেশন, স্টকিং অব ফার্টিলাইজার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। ধনেখালি মার্কেটিং-এর মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক সব্যসাচী মুখার্জি ও চক সমবায় পরিদর্শন ব্লকের জানাও বক্তব্য রাখেন। শিবির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ব্লকের আই সি ডি পি উন্নয়ন অধিকারিক নন্দদুলাল চ্যাটার্জি। ধনেখালি মার্কেটিং সমবায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ পালন

২ থেকে ৭ ডিসেম্বর বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হুগলি জেলার নবগ্রাম

নন্টিপলগাস কো-অপ. হাউসিং কলোনী তাঁদের ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করলেন। যথোচিত মর্যাদায় সমবায় আন্দোলনের ওপর বক্তব্য রাখে সমিতির এলাকাভুক্ত ২০০০ পরিবার ও তার কয়েক হাজার অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমিতি ম্লাইড শোর মাধ্যমে প্রতিনিধিদের সমিতি গঠনের ইতিহাস দেখান। এ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে সমবায়মন্ত্রী অতিরিক্ত সমিতির কর্মোদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন রাজ্যে এ ধরনের সমিতি খুব কম দেখা যায়। এ ছাড়া সি এস পঙ্কজ বিশ্বাস বলেন পরিকাঠামো গঠনে সমিতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সমবায়ে জেলা অনেকটা এগোলেও আবাসনে পিছিয়ে আছে। জেলায় ৩ লক্ষ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার সদস্য আবাসনে আছে। সমিতির সভাপতি সুকুমার চক্রবর্তী আলোচনাচক্রের সূত্রপাত করেন। সম্পাদক শচীন্দ্র সরকার অতিথিদের স্বাগত জানান। তিনি আগামী দিনের সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম ঘোষণা করেন। সমিতি এ উপলক্ষে একটি পত্রিকা অতিথিদের মধ্যে থেকে সমিতির অতীত থেকে বর্তমান সব বোঝা যায়। ৩ রা ডিসেম্বরের এই সেমিনার ছাড়া অন্যান্য দিনগুলিতে পথ পরিক্রমা, সমবায় পতাকা উত্তোলন, সংগীত, নাটক প্রভৃতির আয়োজন ছিল। ছিল দাবক গোষ্ঠীর "দায়বদ্ধ" নাটক ও তনুশ্রীসহ বয় সম্প্রদায়ের স্কাল নৃত্য।

❑ সন্তোষ ভট্টাচার্য

বর্ধমান ২-এ সমবায় সপ্তাহ

বর্ধমান ব্লক-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে এবারে সারা ভারত সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি পালিত হয় ইউনিয়ন ভবনে। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আবদুল বারান, বিভিন্ন সমিতির কর্মকর্তাগণ, এই ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য মাধবী দাস এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রণজিৎ মুখার্জি।

প্রথম দিনটি পালিত হয় বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে ও এই ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে কাটোয়া রবীন্দ্র পরিষদ ভবনে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুশীল ঘোষ, বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান-২ ব্লকের সহ-নিবন্ধক উদয়চাঁদ দিকপতি, সুবোধন সরা, গদাধর পাল, শান্তি মুখার্জি, প্রাক্তন বিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শশাঙ্কশেখর চ্যাটার্জি প্রমুখ।

সমবায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলি পালিত হয় যথাক্রমে দুলুটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে, কাঁকড়ান ইউ সি এ সি এস-এ, সিঙ্গারকোল কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে, খুদুশুলী-১নং চাঁদসিঁইন তন্তুবায় সমিতিতে এবং কেতুগ্রাম সমবায় কৃষিউন্নয়ন সমিতিতে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুধীর ঘটক, গদাধর পাল ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধানগণ।

প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বর্ধমান ব্লক-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির অর্থিক অনুদানে ইউনিয়নের নিজস্ব ভবনে ২৯ নভেম্বর জেলাস্তরে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং ১৯ ডিসেম্বর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্ক :-

সভার মতে-" আর্থ-সামাজিক সঙ্কট নিরসনে সমবায় প্রকৃত সহায়তা করে"। এই বিষয় পক্ষে ও বিপক্ষে ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার মধ্যে কাটোয়া কলেজিয়েট হাই বিদ্যালয়ের নবমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী অরুনকুমার পাত্র প্রথমস্থান (পক্ষে), সৈকত রায় দ্বিতীয় স্থান (বিপক্ষে), এবং ভারতী ভবনের নবম শ্রেণীর ছাত্র দেবাশিস মণ্ডল তৃতীয় স্থান (পক্ষে) অধিকার করেন।

বিচারকগণ ছিলেন সহ নিবন্ধক উদয়চাঁদ দিকপতি হুগলীজেলা উন্নয়ন আধিকারিক বীরেশ্বর ঘোষাল কাটোয়া কলেজের লেকচারার অমিত কুমার সেন এবং তারাপদ হাজরা, রসুলপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ন্যাশনাল।

বিতর্ক শেষে বিচারকগণ ও ডি ডি সি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা মিরোজা বেগম বিষয়বস্তুর উপর ও সমবায়কে ছাত্র-ছাত্রী তথা যুব সমাজের মধ্যে প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রণজিৎ মুখার্জি।

প্রবন্ধ :- প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল "জাতীয় সংহতি ও সমবায়" বলে দেওয়া পঙ্কতিতে এ বৎসর ২২টি স্কুলের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ। তিন জন বিচারক যথাক্রমে উদয়চাঁদ দিকপতি, অমিতকুমার সেন, কেতুগ্রাম কাটোয়া কলেজ নুপুর সেন, ঐ তিনটি খাতা পরীক্ষা করিয়া ফলাফল ঘোষণা করেন।

দেবী দুর্গাদাসী চৌধুরানী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের নবমশ্রেণীর ছাত্রী কুমারী নার্গিস পারভিন প্রথম স্থান, কে ডি আই ছাত্র সৌভিক সরা দ্বিতীয় স্থান ও ডি ডি সি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী শুকন্যা পাল তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

❑ সরোজকুমার পাত্রপালি

বার্ষিক সাধারণ সভা

ইন্ডিয়ান চেম্বার কর্মচারী আবাস সমবায় সমিতির বিংশতি বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮ নভেম্বর ১৯৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতিরবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য পরিচালন সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। সমিতির রজত জয়ন্তীবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধন করে অনুষ্ঠান ক্ষারাক্ষরে পরিণত হওয়ার জন্য তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। সমিতির মূলধন ১২ লাখ টাকা অতিক্রম করা যে সমিতির পক্ষে একটি সুখবর এবং গর্বের বিষয় একথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সমিতির সম্পাদক তপনকুমার ঘোষ 'সমবায়'-এর ব্যাখ্যা এবং তার সার্থকতা বুঝিয়ে বলেন। পরে আগামী ৩ বৎসরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ড অব্ ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন।

রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, তপনকুমার ঘোষ, বিমল চ্যাটার্জি, শ্যামল দাস, দিনেশচন্দ্র চ্যাটার্জি ও দুলাল চক্রবর্তী

শেষে সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুণ্ডু সকলকে ধন্যবাদ জানান।

❑ তপনকুমার ঘোষ

বিদায় অভিনন্দন

সেন্টার ফর কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, কল্যাণী-এর কর্মী নিত্যানন্দ দাস ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে কার্যালয়ে ১৩ ই ডিসেম্বর এক সভা হয়। রাজ্য সমবায় কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায়ে সহকর্মীরা তাঁদের বড়বাবুর প্রীতিস্নিগ্ধ আচরণ ও ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক এবং আন্দোলক অন্যান্য পদ বলেন মানুষ হিসাবে নিত্যানন্দবাবু ছিলেন সৎ এবং উদারচেতা।

অনেকদিনের সাথি অনল রায় বলেন বড়বাবুর সঙ্গ ছিল এক মূল্যবান এবং শিক্ষনীয়।

এই সভায় কর্মচারিদের তরফ থেকে সামান্য উপহার অবসরপ্রাপ্ত বড়বাবু ভট্টাচার্য শ্রী সনৎ হাতে তুলে দেন।

উপস্থিত সকলে শ্রী যাদের বীরাইন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, দীর্ঘ আয়ু এবং সুস্থ জীবনের কামনা করেন।

❑ মানসকুমার বেরা

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

সেই প্রাচীন আজও আছে
প্রাচীন সংস্কৃতি মোছে। যে
নারী না থাকে
হাতে শাঁখা আছে,
সীঁথে সিঁদুর আছে
আছে পিঁড়ে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

ভাণ্ডার

* ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা পঁচিশ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
* বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে **ভাণ্ডার** একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম।
* পাঁচটি বা তার বেশি কপি **ভাণ্ডার** বিক্রয়ের জন্য ২০%কমিশন দেওয়া হয়।
* ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
* মাসিক **ভাণ্ডারে** আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
* আপনার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্যের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের মনমাতানো লেখায় সমৃদ্ধ বহৎ কলেবরে এক **'শারদীয় ভাণ্ডার'**।
* ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল 'West Bengal State Co-operative Union'-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট / চেক অথবা মানি-অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট/চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
* নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক, ভাণ্ডার

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন নং: ২২০-৮১৯৮

১৯৯৭-৯৮ সালের জন্য সমবায় শিক্ষা তহবিল বাজেটে জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলিকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী অনুদান প্রদানের বরাদ্দকৃত টাকা

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	খাতওয়ারি মোট বরাদ্দ টাকা	জেলা সমবায় ইউনিয়ন প্রতি অনুদানের হার
১।	নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন	৬৭,০০০	কলকাতা এবং পশ্চিম দিনাজপুর ইউনিয়নের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে, তার মধ্যে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপার এলাকার জন্য ২৫০০ টাকা করে নির্ধারিত। বাকি প্রতিটি ইউনিয়ন ৩,০০০ টাকা করে।
২।	পত্রিকা প্রকাশনা	৪৫,০০০	বছরে ৪টি করে ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্য ১৫টি ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন প্রতি ৩,০০০টাকা বছরে।
৩।	ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান	৫২,৫০০	ইউনিয়ন প্রতি ২,৫০০ টাকা করে।
৪।	ছাত্রদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান	৫১,৫০০	ঐ
৫।	সম্মেলন বা আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান	১,২৬,০০০	ইউনিয়ন প্রতি ৬,০০০ টাকা করে।
৬।	জেলা বা ব্লক পর্যায়ে কর্মশালার অনুষ্ঠান	৮৮,০০০	ইউনিয়ন প্রতি ৪,০০০ টাকা করে। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরে ইউনিয়ন এলাকার উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রতি ৪,০০০ টাকা করে বরাদ্দ।
৭।	অফিস ঘর ভাড়া বাবদ অনুদান	৩০,০০০	সম্পর্কিত ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রে মাসিক সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে।
৮।	কর্মচারী বেতন বাবদ অনুদান	৩,৪০,০০০	প্রতিটি ইউনিয়নের একজন কেরানি এবং একজন চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর জন্য মাসিক নির্দিষ্ট হারে অনুদান।
৯।	অফিস আসবাবপত্র ক্রয় — টাইপ রাইটার, স্টিল আলমারি	১,০০,০০০	আবেদনকারী ইউনিয়নের দরখাস্তের উপর মঞ্জুরিকৃত প্রকৃত ক্রয়মূল্য।
১০।	নিজস্ব অফিসঘর নির্মাণ বাবদ অনুদান	২,০৩,০০০	**মালদা** ইউনিয়ন এবং মেদিনীপুর ৩ নং ব্লক ইউনিয়নের জন্য পূর্ব মঞ্জুর মোতাবেক যথাক্রমে ৩৩,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা; তাছাড়া এপ্রিল, ১৯৯৭ থেকে নতুন দরখাস্ত মঞ্জুর সাপেক্ষে ইউনিয়ন প্রতি ৬০,০০০ টাকা হারে।
		মোট : ১১,০৪,০০০টাকা	

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376: Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Business of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
53-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৭৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
* ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
* ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
* মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
* সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

শিক্ষকদের পত্রিকা মনবাণ ইউনিয়নের পক্ষে রাধাপদ মুখার্জি কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অষ্টমতল), কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২১০-৮১২৮ থেকে প্রকাশিত এবং অরবিন্দ প্রিন্টার্স, ১৮৬, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

মার্চ ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১ ½ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

ভাণ্ডার সর্বত্র স্বাগত : সকলে আসুক
সকল মিত্র থেকে

ভাণ্ডার

সুহৃদ বিদ্বেষ : শত্রু বিনাশের কেতন।
বেলাহস্ত : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

১৩২৫ বঙ্গাব্দ

মার্চ ১৯৯৮

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়	
সমবায় ও বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়	রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
[illegible] শক্তি সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা	ডাঃ কে পট্টীতি
সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	বসুদেব মুখোপাধ্যায়
যাঁরা সমবায়ে শপথ	সুলিতা পণ্ডিত
একটি সুন্দর সন্ধ্যা	সন্তোষকুমার সরকার
ডেকরেটর - সমবায়ে নবীন সংযোজন	
প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অঙ্গীকার	অনুপ ঘোষ
পুরনো সেই দিনের কথা	অমীয় রায়
সমবায় চাষের পরিকল্পনা	বিশ্বজিৎ মুখার্জী
সমবায় সমাচার	

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাণী রায়	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

একটি সংবাদ

সম্প্রতি সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি একটি টেলিফোন সংযোগ নিয়েছে।

টেলিফোন নং ২২১-৯৮৮১

এই নম্বরে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি-র সভাপতি, সম্পাদক, সমবায় শিক্ষা তহবিল আধিকারিক ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

একটি আনন্দ সংবাদ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাঁদের প্রধান কার্যালয়, সবগুলি শাখা অফিস, বিভিন্ন ইউনিট ও ইউনিটের শাখাগুলির জন্য 'ভাণ্ডার' পত্রিকার আজীবন গ্রাহক হয়েছেন।

হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কও তাঁদের সবগুলি শাখার জন্য ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহক হয়েছেন।

এই পদক্ষেপ অনুকরণীয়। ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এজন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

অন্যান্য শীর্ষ সমবায় সমিতিগুলি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ, পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলিও যাতে অনুরূপভাবে তাঁদের সকল ইউনিট শাখা অফিসের জন্য 'ভাণ্ডার' পত্রিকার আজীবন গ্রাহকপদ গ্রহণ করেন সেজন্য তাঁদের সকলের কাছে আবেদন করা হচ্ছে।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সুনীলকুমার ঘোষ
সভাপতি

ভাণ্ডার পত্রিকার আজীবন গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬০০ টাকা।

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা ঃ ৭০০ ০০২

ফোন নং ঃ ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে আয়ে, মানে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা শতবার্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় সফল ও মডেলরূপে বিবেচনা।

পুরী ও দার্জিলিং এ মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন অনেকটা ক্লান্তিকর, কিছুটা স্বস্তি কোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সাংসারিক নানাবিধ দায়-দায়িত্ব পালন, অর্থ উপার্জন প্রভৃতি তো আছেই, আর আছে প্রতি পদে পদে ঠকবার ভয়। একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি তার এলাকায় চাষের ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থা করতে পারলে সমিতির সদস্যদের শোষণের হাত থেকে অনেকটা বাঁচানো যায় কিন্তু ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের জন্য বাজারে এলে শেষ হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। অথচ ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আর এইখানেই যত ক্লান্তি যত অবসাদ। ঠকতে ঠকতে ক্লান্তি আর নিঃস্বতায় অবসাদ।

বাজারে ভোগ্যপণ্য কি ন্যায্যদরে পাওয়া যায়? কেউ নিচ্ছেন এম আর পি, কেউ কেউ এম আর পি'র চাইতে একটু আধটু কম আবার কেউ বা এম আর পি'র চাইতে বেশি। কেউ ইচ্ছামত সেলস ট্যাক্স চাপিয়ে নিচ্ছেন, কেউ বলছেন সেলস ট্যাক্সের জন্য এম আর পি'র চাইতে বেশি লাগছে। এক কথায় ভোগ্যপণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার সাথে আছে নৈরাজ্য ব্যবস্থা। প্রশ্ন করলে ক্রেতা এ-রকম কিছু উত্তর পান আর নিঃশব্দে কিনে আনলে সব কিছুই ঠিক আছে, ঠিক-ঠাক চলছে। প্রাথমিক সমবায় সমিতি ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করলে দ্রব্যমূল্যের উৎপীড়ন থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়, এলাকার টাকা এলাকাতেই থাকে, স্থানীয় এক আধজনের বেকারত্বও ঘোচে। প্রাথমিক সমিতি তার কার্যক্রমের মধ্যে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে গ্রামের মানুষকে নিঃশব্দ ও বাধ্যতামূলক শোষণের হাত থেকে বাঁচানো যাবে।

সেই গ্রাম আজও জন্মে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মোছে। যে
পাখী না থাক
ছায়া পাখী আছে,
গাঁয়ে পাখনা আছে
আছে চিঠি
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য

আজ **তন্তুজ**

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপা: সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

"হে অতীত, তুমি ডুবনে ডুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপন হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।"

— রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা 'ভাণ্ডার' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। তৎকালীন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদ্‌গণের প্রবন্ধ ও লেখা 'ভাণ্ডার'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হত। সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ছাপ অতীত দিনের 'ভাণ্ডার'-এর পৃষ্ঠায় আমাদের জন্য তাঁরা রেখে গিয়েছেন। সমকালীন সমস্যার সমাধান সূত্র তাতে যেমন ছিল, তেমনি বর্তমান কালের সমবায় কর্মীদের নিকট তা আজও আলোর দিশারী হয়ে বেঁচে আছে।

বঙ্গীয় সমবায় সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। ভাণ্ডারের চৈত্র, ১৩২৬ সংখ্যায় এই ভাষণটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভাণ্ডারের বর্তমান সংখ্যায় ভাষণটি পুনর্মুদ্রিত হল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন "বঙ্গীয় সমবায় সমিতিরই" উত্তরাধিকারী।

সমবায় ও বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয়

আমাদের কার্যের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই বৎসরে আমরা কি কি কাজ করিয়াছি, তাহা আপনারা এইমাত্র শুনিলেন। আমাদের কার্যের যে যে ফল হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই ; কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে পারি, যে সাধারণের মনোযোগ এই সমিতির প্রতি আকৃষ্ট করিতে এবং তাহাদের সহযোগিতা দ্বারা সমিতির কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি করিবার যতটা ইচ্ছা আমরা করিয়াছিলাম, ততটা আমরা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা যে ভাল বীজ বপন করিয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। এই বীজ সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া ফল প্রসব করিবে। আমাদের কাজ ধীরে, কাজেই আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই, কিন্তু যে জমিতে আমরা বীজ বুনিতেছি, স্বভাবতঃ তাহা উর্বর ; ইহা জানিয়া আমরা কাজে উৎসাহ হারাই নাই। সমবায় মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ; মানুষের প্রকৃতির সহিত সমবায় নিহিত। সমবায়ের প্রথা ভারতবর্ষে নূতন নহে এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্নভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা এই সমবায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক যৌথ পরিবার একটি ছোটখাটো সমবায় সমিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমানকালের আর্থিক অবস্থার সহিত যৌথ পরিবার প্রথার সামঞ্জস্য না হইতে পারে, কিন্তু এই প্রথা যে সফল হইয়াছে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া বর্তমান আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে সমবায় আমাদের দেশে নূতন নহে এবং আমাদের দেশের লোকেরা ইহা বোঝেন। বহুদিন ধরিয়া আর এক প্রকারের সমবায় আমাদের পল্লীর কৃষকদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। দরিদ্র কৃষক রোজ মজুরি করিয়া চাষের জন্য লোক নিযুক্ত করিতে পারে না ; আর অনেক সময় সে একাকীও তাহার চাষের সমস্ত কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। তাই কতকগুলি কৃষক মিলিত হইয়া পালাক্রমে সকলের জমিতে কাজ করে এবং মজুর নিযুক্ত না করিয়া সমবায়ের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে। কৃষকদিগের মত বীবরেরাও পরস্পর মিলিত হইয়া কাজ করে এবং মজুর নিযুক্ত না করিয়া সমবায়ের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে।

শিক্ষিত লোকের মধ্যেও সমবায় সমিতি আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। যৌথ কোম্পানি, ট্রেডস্ সভা, বণিক সভা, জমিদারদিগের সভা প্রভৃতি সমস্তই সমবায় সমিতি, সকলেই তাহাদের সভ্যদিগের উপকারের জন্য কাজ করে। সম্প্রতি বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে মজুরেরা মিলিত হইয়া সমিতি স্থাপন করিয়াছে, মজুরদিগের স্বার্থ রক্ষা করাই এই সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমস্ত সমিতির কার্য প্রণালীর মধ্যে এই গলদটুকু আছে, যে ইহারা কেবল আপনাদিগের সভ্যদিগের উন্নতির জন্যই চেষ্টা করে। দেশের সাধারণ স্বার্থের বিষয় বড় ইহারা ভাবে না। তাহাতে কার্য প্রণালীর ফলে বিভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে অনেক সময় সংঘাত বাধে ; ফলে বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য এই সমস্ত বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো, যাহাতে তাহারা সকলশ্রেণীর উপকারের জন্য এবং বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা

আমাদের চেষ্টায় এই সমস্ত সমিতির সভ্যগণ যদি একটু কম স্বার্থপর হয়, পরস্পরের সাধারণ ও বিভিন্নমুখী স্বার্থ সম্বন্ধে একটু উদারভাবে ও সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করিতে শেখে, ইহারা যদি "সকলের জন্য, সকলে প্রত্যেকের জন্য" সমবায়ের এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে দুকান ও মজুর, জমিদার ও প্রজা, মালিক ও কৃষক, মধ্য শ্রেণী ও অকমর্ত শ্রেণী সকলে শান্তিতে এবং সকলের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেন কাজ করিতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি দ্বারাই সমবায় সমিতির বল বৃদ্ধি হয়। এই সদ্ভাবের দ্বারা সকলের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় হয়। আমাদের সমিতির প্রত্যেক সভ্যের সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে। সমস্ত সমাজে সমবায়ের ভাব প্রচারের জন্য এবং সমবায়ের প্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য এবং বিভিন্নমুখী স্বার্থের সমন্বয় সাধনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে।

সমবায়ের বীজ বপনের জন্য আমাদের দেশের ক্ষেত্র যে উর্বরা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের পরস্পরপ্রতি আচার ব্যবহার আমাদের চেষ্টার সফলতা লাভে সাহায্য করিবে। আমাদের দেশবাসীকে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, শিক্ষিত নির্বিশেষ সকলকেই সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেগুলিকে চালাইতে হইবে ; দেশে যাহারা অনুন্নত ও অত্যাচারপীড়িত তাহাদিগকে বন্ধুভাবে সাহায্য করিয়া টানিয়া উপরে তুলিতে হইবে এবং আপনাদিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের প্রত্যেক লোককে সমবায়ের উপকারিতা বুঝাইতে হইবে। আমাদের কাজ মহৎ প্রেম ও একান্ত নিষ্ঠা ইহার ভিত্তি। আমাদের কাজ স্থায়ী করিতে হইলে, যেভাবে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে আস্তে আস্তেই অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায়ের ফলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবেই, হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। বর্তমান আর্থিক অবস্থার ফলে আমরা সমবায়ের ছত্র বিস্তার করিতে সক্ষম হইব। আমাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। যদি আমরা আন্তরিক সহিত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে পারি, আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

নিবন্ধ

বর্তমানে শক্তি সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা

আর কে পচৌড়ি
অধিকর্তা, টাটা শক্তি গবেষণা সংস্থা, নয়া দিল্লি

বিশ্বের বুদ্ধিমেয় কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারতও ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি শক্তির নীতির মূল্যায়ন করেছিল। এটা ছিল ১৯৭৩ - ৭৪ সালে প্রথম তেলের মূল্য বৃদ্ধির ধাক্কা সামলানোর অনেক আগেকার ব্যাপার। ওই সময়ে তেলের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বের দেশগুলি বাস্তব পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং কাঠামোর সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসে তাদের জ্বালানি শক্তির নীতি পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর আগে ১৯৭০-এর দশকে উপর্যুপরি কয়েকটি ঘটনা ঘটে। সেই সময় জ্বালানি শক্তি সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্যান্য শক্তি ক্ষেত্রের যে সংযোগ আছে, সে সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা ছিল না। হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের ওপর জোর দেওয়া হত।

ব্যাপক শক্তি নীতি

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতের শক্তি সমীক্ষা কমিটির (এনার্জি সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া কমিটি) মাধ্যমে ভারতে ব্যাপক শক্তি নীতির সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রথম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টে শক্তি ক্ষেত্রে কর্ম-দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হয়। এই কমিটির উন্নত কাজ সত্ত্বেও তার সুপারিশ এ সম্পর্কিত নীতি এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি। এর কারণ তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে পরিকাঠামো ছিল তা শক্তি সরবরাহ সম্পর্কিত কল্পনা এবং সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষে উপযোগী ছিল না। এর পরে শক্তিনীতি সম্পর্কে সুপারিশ খতিয়ে দেখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এই সব সুপারিশের সমন্বয়ে সরকার তার কর্মপরিকল্পনায় খুব সামান্যই তা গ্রহণযোগ্য করেছিলেন। এর মধ্যে সম্ভবত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। এর নাম ছিল শক্তি সম্পর্কিত উপদেষ্টা পর্ষদ বা অ্যাডভাইসারি বোর্ড অন এনার্জি। এই পর্ষদ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদনও পেশ করে কিন্তু ১৯৮৭ সালে এই পর্ষদ তুলিয়ে ফেলা হয়। ওই পর্ষদ দেশে শক্তি সম্ভাব্য ব্যবহারে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি পৃথক সংস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিল।

শক্তি ব্যবহারের দক্ষতার উন্নয়ন

বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের মতো ভারতেও তেলের প্রথম মূল্য বৃদ্ধির ধাক্কার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য চারগুণ বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে তেলের অপচয়মূলক ব্যবহার কমানোর জরুরি প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো এবং তেলের পরিবর্তে যে সব জায়গায় অর্থনৈতিক প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে কয়লার মতো বেশি জ্বালানি ব্যবহার করা সম্ভব তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ইস্পাত শিল্প জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্পর্কিত ডাইরেক্টর জেনারেলের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের দক্ষতাসম্পন্ন একটি বিশেষজ্ঞ দল গড়ে তোলা হয়। যে সব শিল্পে প্রত্যেকটিতে প্রতি বছর ৩০০ কিলো লিটার থেকে ১০,০০০ কিলো লিটার পর্যন্ত জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয় সে রকম ৩০০টি সংস্থায় এই বিশেষজ্ঞ দল দ্রুত সমীক্ষা চালায়। পেট্রোলিয়াম সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য এই বিশেষজ্ঞ দল স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা সম্বলিত বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেন। এই সব সুপারিশের মূল বিষয় ছিল দেশে ব্যবহৃত পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর ২০ শতাংশের মতো বাঁচানোর ব্যবস্থা করা। এতে ২ লক্ষ কিলো লিটারের মতো পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর অপচয় বন্ধ করা যাবে। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে পেট্রোলিয়াম কনজারভেশন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন বা পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ গবেষণা সংস্থা। গত দুদশক ধরে এই সংস্থা কাজ করে চলেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সংস্থা প্রযুক্তিগত পরামর্শ, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রীর ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কাজ করলেও ব্যাপকভাবে এর উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি

১৯৭০-এর দশকের তুলনায় এখন শক্তি সংরক্ষণ খুবই প্রাসঙ্গিক স্তরে পৌঁছেছে। এখন শুধু জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণের মধ্যে এই সীমাবদ্ধ নেই, বর্তমান প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির মধ্যে জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি একমাত্র কাজ নয়। বর্তমানে সমস্ত অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং প্রকল্পে জ্বালানি ব্যবহারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হিসাবে মনে করে অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাপক পুনর্গঠন অনুভূত হয়েছে। সম্প্রতি শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছে এই কারণে যে ভারতকে জ্বালানি শক্তি আমদানির ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। এই জ্বালানি শক্তি আমদানির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতে এই শক্তি সরবরাহের নিশ্চয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই সমগ্র অর্থনীতিগত অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই অনিশ্চয়তার কিছুটা নিরসন হতে পারে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে শক্তি সরবরাহ বৃদ্ধির

জন্য মূলধনের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। জ্বালানি শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সুষ্ঠু ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করাও জরুরি হয়ে পড়েছে। যদি এ ব্যাপারে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর ব্যবস্থাগুলি ঠিক মতো রূপায়ণ করা যায় তবে শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে খরচও অনেক কমে আসবে।

জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর তার যে খারাপ প্রভাব পড়ে সেটাও লক্ষ করার মতো। স্থানীয় পর্যায়ে এই পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরিবহণ খাদ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, জৈব জ্বালানির সাহায্যে রান্না, অদক্ষতাপূর্ণ চুলা ব্যবহারের ফলে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে। সমস্ত রকমের জ্বালানির দহনে যে পরিমাণ 'গ্রিন হাউস গ্যাস' উৎপন্ন হয় তাতে সারা পৃথিবীর পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ে। জ্বালানি শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো গেলে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশের ওপর এর কুপ্রভাব অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

শক্তি সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তত গুরুত্ব দেন না। শক্তি সরবরাহ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পটভূমিতে এর ওপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শক্তি দক্ষতার প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানিকভাবে এ কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে।

জ্বালানি শক্তির মূল্য নির্ধারণ

বাজারের বিভিন্ন প্রভাব এবং শক্তির মূল্য নির্ধারণ জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা অর্জনকে বিশেষভাবে নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানির মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ হয় যাতে পরিবেশের ওপর তার প্রতিক্রিয়াকে কম রাখা হয়। ফলে গ্রাহকদের কাছে যে জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা গড়পড়তা মূল্যের চেয়ে কম। বিশেষ করে কৃষিজীবীদের কাছে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে এবং দরিদ্র গোষ্ঠীদের ব্যবহারের জন্য যে কেরোসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। কেরোসিনের মূল্য কম হবার ফলে তা অন্যান্য পেট্রোলিয়াম সামগ্রীতে ভেজাল দেবার প্রবণতা থেকে যায়। ঠিক একইভাবে কৃষিজীবীদের কাছে কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে দেখা যে বৈদ্যুতিক পাম্পসেট কাজ করে তার কর্মক্ষমতা অত্যন্ত কম। এই সব পাম্পসেটের নকশার কোনো উন্নতি না ঘটিয়েও এর উন্নত এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুতের সাশ্রয় ঘটানো সম্ভব।

জ্বালানি শক্তির নিরাপত্তা

জ্বালানি শক্তির নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি নীতি প্রণয়নে এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও এক্ষেত্রে সরকারি নীতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়। যদি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উন্নতি ঘটাতে হয় এবং ভবিষ্যৎ সরবরাহের ব্যাপারে নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে হয় তবে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। জ্বালানি শক্তির মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। শক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো থেকেই যে প্রকৃত পরিমাণ সামাজিক কল্যাণ হতে পারে তা লক্ষ্য রেখে সরকারকে এক্ষেত্রে তহবিল যোগাতে হবে। এর ফলে জ্বালানি শক্তির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, লগ্নির ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

বিশ্বব্যাপি এখনও শক্তি ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি বর্তমানে চালু রয়েছে তার সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয় অর্থনীতিতে এ-ব্যাপারে দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু কার্যত এগুলি গ্রহণ না করার ফলে জ্বালানিশক্তির মূল্য যুক্তি সঙ্গত স্তরের নীচে রয়ে গেছে। জ্বালানি শক্তি ব্যবহারকারীরা তাই দক্ষতার সঙ্গে এর ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এছাড়া সংরক্ষণের ক্ষেত্রগুলোয় যেখানে ভারতীয় শিল্পকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় না সেখানে প্রায়ই জ্বালানি শক্তি বা অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অদক্ষতা অধিকতর দক্ষ উৎপাদকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা ব্যতিরেকেই ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভারতকে জ্বালানি শক্তি ব্যবহারের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, বিশেষ করে জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানি ও জৈব জ্বালানির ক্ষেত্রে এই সচেতনতা প্রয়োজন সম্প্রতি জাপানের কিয়োটোতে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কিত পরিকাঠামো সম্মেলনের যে চুক্তি হয়েছে তাতে উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ব্যাপারে বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থান নেই। কিন্তু এই গ্যাস নির্গমনের সীমা বেঁধে দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে ক্রমাগত চাপ আসবে। তাই উন্নতিকামী দেশগুলির পক্ষে জ্বালানি শক্তি সম্পর্কিত দক্ষতা বাড়ানোর নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যাই হোক না কেন, ওই সম্মেলনে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসাবে ভারতকে ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়া সংরক্ষণের ব্যাপারে সংগতিপূর্ণ প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া এক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে দুটি প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমটি হল-জ্বালানি শক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়টি হল জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণ সম্পর্কিত একটি বিল আনা। দেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি শক্তির দক্ষতা বাড়াবার একটি উপযুক্ত পরিকাঠামো এতে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। ❑

কলকাতাস্থিত — প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো কর্তৃক প্রচারিত

শুধু আলো জ্বেলে দে রে, শুধু আলো জ্বেলে দে।
গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল;
একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার
উপায়টা করে দে বাবা। তখন আপনি দেখতে
পাবে কোনটা কালো, কোনটা ধলো।

বিশ্বভারতী আশ্রমের —
পরিচালক। শরৎচন্দ্র

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

শোষণ রোধ করে, দারিদ্র্যকে পরাভূত করে অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে গ্রামের গরিব মানুষের, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সমবায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু চিহ্নিতই বা বলি কেন- সমবায়কে অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যি কি তাই হয়েছে, সত্যিই কি আমরা সমবায়কে "হাতিয়ার" হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছি? সত্যিই কি সমবায়কে আমরা একটি আন্দোলনে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছি? একথা অবশ্যই সত্যি যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, কিছু উন্নতি হয়েছে। সমবায় বহু মানুষকে মহাজনী ঋণের কবল থেকে মুক্ত করেছে, নিরন্ন বহু মানুষের মুখে জুটেছে কিছু অন্ন, বস্ত্রহীনের বস্ত্র জুটেছে এবং কিছু মানুষ পেরেছে মাথা গোঁজার মত ঠাঁই। কিন্তু আজকের দিনে যা স্থিতি-আমরা জানি সমবায়ের ছত্রছায়ায় যে সংখ্যক মানুষ সামিল হয়েছেন দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে তাদের সংখ্যা নগণ্য, (২) নিবন্ধীকৃত সমিতিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই আজ মৃত অথবা অর্ধ-মৃত, এবং (৩) যে সমিতিগুলি চলছে তাদেরও অধিকাংশ সদস্যসমিতির কাজ-কর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। শতাব্দীর পথে পা বাড়িয়েও সমবায় আন্দোলনের কেন এই অবস্থা, কেন এই দুর্বলতা, কেন এই সমিতি-সদস্য ব্যবধান?

সমবায় আন্দোলন কেন ভালভাবে দানা বাঁধতে পারেনি এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত থাকলেও একথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে যথাযথ সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব হল অন্যতম প্রধান কারণ। কোন পুঁথিগত বিদ্যা নয় মাঠে-ঘাটে কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল প্রত্যেক সমবায় সমিতিরই যে একটি নিবন্ধীকৃত উপবিধি (বাই-ল) থাকে তা শুধু গ্রামাঞ্চল নয়, শহরাঞ্চলেরও অনেক সমবায় সদস্যই জানেন না। অথচ আমরা জানি, যে কোনও সমবায় সমিতির প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে থাকে ঐ উপবিধির মধ্যে। আসল ঘটনা হল তারা সমবায়ের সদস্য হয়েছিলেন সহজ সর্তে ঋণ পেতে অথবা বাজারে অল্পমূল্যে ভোগ্যপণ্য সহজে এবং সস্তায় কেনার সুযোগ লাভ করতে। স্বাভাবিকভাবেই সমবায় কি ও কেন, সদস্য হিসাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় সুযোগ তিনি করে উঠতে পারেননি। দোষ তাঁর একার নয় সমবায় সমিতি বা সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলনের তরফ থেকেও তাকে সমবায়ের তাত্ত্বিক দিকটি জানবার বা বোঝাবার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর নিট ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে — সমবায়ের সদস্য সংখ্যা স্ফীতির পেছে প্রকৃত সমবায়ীর সংখ্যাকে। বাকি অর্থাৎ বিরাট এ ধরনের সমবায় সমিতি এক বিরাট ছবি তুলে ধরতে পারে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে তাদের কার্যকরী প্রভাব খুবই ক্ষীণ এবং অসাফল্যের হার খুবই বেশি।

সমবায় আন্দোলনকে আমরা উন্নয়নের 'হাতিয়ার' বলে থাকি কিন্তু সেই হাতিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে কি যুদ্ধ জয় করা যায়? সমবায় শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক এইখানেই। এছাড়াও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে সমবায় সমিতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর কিছু অন্য বৈশিষ্ট্য আছে। সমবায়ের তাত্ত্বিক দিকটি উপলব্ধি করা এ কারণে বিশেষ প্রয়োজন। এই বিবিধ কারণে সমবায় শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অসীম।

সাধারণ মানুষ তাদের অপ্রতুল বিত্ত, কিছু ত্যাগ আর সম্মিলিত প্রয়াসকে সম্বল করে গড়ে তোলেন সমবায় সমিতি। এখানে উদ্দেশ্য একটাই — নিজেদের সমস্যা নিজেদের সম্মিলিত প্রয়াসে সমাধান করা, নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে আত্মনিয়োগ করা। সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হল এটি তাদের একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। এখানে উত্তমর্ণ-অধমর্ণের কোনও ভেদাভেদ নেই, এখানে জমিদার-চাষির সম্পর্ক নেই, এখানে যিনি মালিক তিনিই শ্রমিক, এখানে ক্রেতাই বিক্রেতা, এখানেই খাদ্যদাতাই হলেন 'অন্নদাতা'। এক কথায় সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হল এটি বিনিয়োগকারীদের প্রতিষ্ঠান নয় — ব্যবহারকারীদের সংগঠন। নিম্নের ছকটি থেকে সমবায়ের স্বতন্ত্র খুব সহজেই বোঝা যাবে।

ক্রমিক নং	মাপকাঠি	ধনতন্ত্র	সমবায়তন্ত্র
১.	লক্ষ্য	ব্যক্তি-ভিত্তিক একক স্বার্থ	গোষ্ঠীভিত্তিক পারস্পরিক স্বার্থ
২.	প্রকৃতি	অহংবাদী	মানবিক
৩.	প্রতিযোগিতা	মুনাফা	পরিষেবা
৪.	সাধন	আগ্রাসী প্রতিযোগিতা	মিলিত প্রচেষ্টা
৫.	প্রভাবী উপাদান	মূলধন	মানুষ (সদস্য)
৬.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া	শেয়ারভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক	সদস্যভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক
৭.	সাংগঠনিক প্রকৃতি	কেন্দ্রীভূত	বিকেন্দ্রীভূত

যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ঠিক এই কারণেই সমবায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণকে বেশি, আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সমবায় আন্দোলনের জন্ম-লগ্ন থেকেই সমবায় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমবায়ের পথিকৃৎ 'রচডেল পাইওনিয়ার্স' প্রবর্তিত নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সমবায় শিক্ষা। আন্তর্জাতিক সমবায় মহাসংঘও সমবায় শিক্ষাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও সার নিকলসনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত গঠিত সকল কমিটি/কমিশন বিষয়টির উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু কিছু প্রয়াস আগে থেকেই জারি থাকলেও প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় ১৯৫৩ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কমিটি স্থাপনের পর থেকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তদানীন্তন অখিল ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন যার বর্তমান নাম ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন। এরপর ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে জাতীয় স্তরে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, রাজ্য স্তরে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং জেলাস্তরে জেলা সমবায় ইউনিয়নগুলি সমবায় নীতির প্রচার ও প্রসার এবং সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণক্রমের দায়িত্ব বহন করছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির নাম সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র এবং মোট সংখ্যা ৬টি। ১৯৯৬-৯৭ বছরে বিভিন্ন ধরনের মোট ৮১টি শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল মোট ১৯১৪ জন। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় মোট ৪টি "ইন হাউস নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রম" পরিচালিত হয়েছে এবং যোগদানকারীর মোট সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন।

সমবায় সমস্য শিক্ষণ কর্মসূচি (সাধারণ) : এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের পদের অনুমোদিত সংখ্যা ৩০ হলেও অনেকগুলি পদ দীর্ঘদিন খালি পড়ে আছে। অবস্থাটা যেন অদ্ভুত-পদের জন্য অনুমোদন আছে আর্থিক সংস্থানও আছে কিন্তু নানা কারণে শূন্যপদগুলি পূরণ করা যায়নি। এর ফলে কোন কোন জেলা/ব্লকে নির্দেশকের অনুপস্থিতিতে সমবায় সমস্য শিক্ষণ কর্মসূচি অনুযায়ী ক্লাস/ক্যাম্পের আয়োজন করা যায়নি। যাই হোক, ১৯৯৬-৯৭ বছরে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের জন্য মোট ৬২টি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং ঐসব ক্লাসে ২৭৮টি বিভিন্ন সমিতির ১৮৯৫ জন পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য যোগদান করেন। ঐ একই বছরে সাধারণ সদস্যদের জন্য আয়োজিত ক্লাসের সংখ্যা ছিল ৪৫৩টি এবং যোগদানকারীর সংখ্যা ছিল ১৬,৩৮৭ জন। শিক্ষা নির্দেশকগণ ঐ বছর মোট ২৭৮টি সমিতি পরিদর্শন (Inspection) করেন।

সমবায় সমস্য শিক্ষণ কর্মসূচি (মহিলা) : মহিলা শাখার কাজের বিবরণ নিচের সারণি থেকে পাওয়া যাবে।

এই পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বস্তুতপক্ষে সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর যতই মৌখিক বা লিখিত গুরুত্ব আরোপ করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। প্রবন্ধটি এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু হচ্ছে না তার কারণ ঘন উপেক্ষা সত্ত্বেও আরও একবার জোর গলায় বলতে চাই যে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে বাদ দিয়ে সমবায় আন্দোলন চলে না, চলতে পারে না।

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু রাজ্যস্তরে তাই সমবায় ইউনিয়ন এবং জেলাস্তরে জেলা সমবায় ইউনিয়নের উপর নাস্ত তাই বিফলতার দায়ে সাধারণত এদেরকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার জেলাস্তরের সংস্থাগুলির মধ্যে জেলা সমবায় ইউনিয়নই দুর্বলতম সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নও সরকারি অনুদানের উপর নির্ভরশীল একটি সংগঠন। তাই সদিচ্ছা থাকলেও প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। স্বাভাবিকভাবেই এজন্য দরকার ছোট-বড় সকল সংস্থার সম্মিলিত সাহায্য ও সহযোগিতা।

শুধু সংখ্যাগতই নয়, একই সঙ্গে দরকার সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির গুণগত মানোন্নয়ন। গুণগত মানোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

১) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণক্রমের মুখ্য দৃষ্টিকোণ কি হবে এবং কোন্ বিষয়ের উপর কতটা আলোকপাত করা প্রয়োজন তা সর্বাগ্রে নির্ধারণ করতে হবে।

২) অনেক সময় উদ্যোগী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি প্রশিক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করা যায় না ; যাঁরা প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন তারাও নিজেদের তৈরি করার (Equip) সুযোগ পান না। প্রশিক্ষণক্রম রচনার কাজ সময় নিয়ে সব দিক খতিয়ে দেখে করা উচিত।

৩) সমিতিগুলিতে যেভাবে কাজ হয় আর যেভাবে কাজ হওয়া উচিত সেই ব্যবধান প্রতিক্রম করার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই ব্যাপারে নতুন

মহিলা শাখার কাজের বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যসূচির নাম	পরিচালিত ক্লাসের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১.	সাধারণ সদস্যদের ক্লাস	৩৬	৮৩৪
২.	পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের পরিচালকদের ক্লাস	২৩	
৩.	সাধারণ ক্লাস	৩৬	
৪.	স্টাডি সার্কেল	৩১	
৫.	পরিদর্শিত সমিতির সংখ্যা ১৮		
৬.	সংগঠিত স্বয়ংসেবী গোষ্ঠির সংখ্যা ৪		

চিন্তা-ভাবনা এবং সংযোজনগুলিকে -যেমন সমাজের জন্য ভাবনা (Concern for Community), সমবায় ও পরিবেশ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নতুনরা প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সংগৃহীত জ্ঞানবুদ্ধি ও দক্ষতা পুরানো ও বাতিল হয়ে যেতে পারে।

সমবায় শিক্ষা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। সমবায় শিক্ষার ফল বোঝা যাবে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সদস্যবৃন্দের আর্থ-সামাজিক উন্নতি কতটা করতে পারল তা বিচার করে। তাই প্রশ্ন জাগে, সমবায় শিক্ষা বলতে কি শুধুই সমবায় নীতি-আইন-হিসাব রক্ষণ-ব্যবস্থাপনা বোঝায়? একজন সদস্য বা সম্ভাব্যের জীবনে এর বাইরে কি আর কিছুই নেই? তার ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা বিনোদনের ব্যাপারে কি সমবায়ের কিছুই করণীয় নেই? উত্তরটা হল, অবশ্যই আছে তবে আমরা এ নিয়ে কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু সমিতি-সদস্য ব্যবধান (যা আমাদের অনেকের প্রধান সমস্যা) দূর করতে হলে এসব কথা আমাদের ভাবতেই হবে। আমি নিশ্চিত অনেকে এ প্রস্তাব মানতে চাইবেন না, অনেকে খরচের প্রশ্ন তুলবেন। উত্তরে ছোট্ট দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক - আশা করি তারা সন্তুষ্ট হবেন। সদস্যদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কিছু না কিছু গল্পের বই সম্পূর্ণ অবহেলায় অবহেলায় পড়ে থাকে। সমিতির তরফ থেকে সামান্য একটু উদ্যোগ নিয়ে ঐ বইগুলি সংগ্রহ করে একত্রিত করতে পারলে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে একটি ছোট-খাটো লাইব্রেরি এখনই চালু করা যেতে পারে। সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের অনেকেই ছবি আঁকে। এদের আঁকা ছবি নিয়ে সহজেই একটা প্রদর্শনী বা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। সমিতি-সদস্য ব্যবধান দূর করতে, সমিতির অস্তিত্ব জানান দিতে, রুচি-কাঁচাদের উৎসাহ দিয়ে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে এবং একই সঙ্গে ঐ রুচি-কাঁচাদের মনে সমবায় চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে এর চেয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

❑

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম হয় বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামে (বর্তমান কোগ্রাম) ১৮৮২খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ। কবির বাড়ি ছিল অজয় নদের ধারে। তিনি গ্রাম্য জীবনই পছন্দ করতেন। বি এ পাশ করে গ্রামের স্কুলেই তিনি শিক্ষকতা করেন এবং অবসর গ্রহণের পর বাকি জীবন নিজের গ্রামেই অতিবাহিত করেন। গ্রাম বাংলার নদ-নদী, খাল-বিল, পশু-পাখি ছিল তাঁর কাব্যের উপজীব্য। তিনি বিশ্বাস করতেন 'সমবায়' জমিদার আর মহাজনদের শোষণ নির্মূল করবে, দারিদ্র্য দূর হবে, গ্রাম-বাংলা তার হারানো শ্রী ফিরে পাবে।

কবির জন্ম-মাসে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরই লেখা দুটি কবিতা অতীতের পৃষ্ঠা (ভাণ্ডার : ভাদ্র, ১৩২৫) থেকে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

সমবায়ের পূর্বে

চালে মোর খড় নাই, চাল নাই ছাড়াবে,
দুইবেলা জমিদার পাইকের তাড়া যে।
আসলে 'বারির' 'বারি' মহাজন চাপারে,
খামারে যেবাক ধান লয়ে গেছে মাপারে।
কেঁড়ে ভরে দুধ দিত শ্যামলী যে দুবেলা,
কেড়ে নিল মহাজন আমাদের 'কবিলা'।
ছেলে মেয়ে কেঁদে মরে, কেঁদে মরে সোহাগী,
ধনীদের বুকখান লোহা দিয়া গড়া কি?
ছোটা সুদে মোটা টাকা তাগিদায় খোঁচাতে
গোটাবার খাড়ু কাঁটা হ'ল হায় যোচাতে।
দেহ ত করেছি মাটি খাটিয়াছি কত রে!
কমলা নিমরা অতি সব আশা হত রে!
আধপেটা খেয়ে আছি ছেঁড়া মোর পরণে
পরমেশ চরণেতে যাচিতেছি মরণে।

❑

সমবায়ের পরে

উঠান ভরা গোয়াল আমার, দুধই ভরা ঘর,
বুকে আমার সুখ ধরে না, বোঝেশ যাদুমণি।
শোধ করেছি ছিঁড়েছি হায় মহাজনের ঋণ,
টৈতালীতে গড়িয়ে দেবো ষোকার মায়ের নথ।
ভাবছি এবার দিন দিয়েছেন যখন জগন্নাথ
পাড়াবো হায় আমার বাড়ি নিমন্ত্রণের পাত।
খোলসা আজ পুকুর ভরি, বাস্তু বাড়ি ভর,
ধান দিয়ে হায় ছেড়ে গেছে অনেক দিনের জ্বর।
চাল ভরে মোর তরুল লয়, গাছ ভরা মোর মুই,
মাচা ভরা পুইয়ে আমার, কমল ভরা কুঁই।
সন্ধ্যাবেলা কবির দলের আখড়া দিতে যাই
পুকুর ভরা মৎস্য আমার, বুক ভরা গাই।
ধন্য আমার দয়াল রাজা ধন্য তাঁহার দান।
বুকে আমার শান্তি ভরা ধন্য ভগবান।

❑

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন ঃ ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬		১০৩			১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(-) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৩৯০৪.৫৯	(+) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

যাঁরা সলতে পাকান

মণিকা পালিত

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোটা একটা বড় কাজ। সমবায়ের প্রদীপ শিখাটি যে সব জায়গায় উজ্জ্বল প্রভা বিতরণ করছে পশ্চিমবঙ্গের সেই সব গ্রামে-গঞ্জে নিবেদিতপ্রাণ এমন কিছু মানুষের সাক্ষাৎ মিলবেই খবরের কাগজে যাঁদের নাম কোনদিন লেখা যাবে না। কোন্ সমবায় সংস্থায় আর্থিক অনিয়ম ঘটেছে, কোথায় কর্মীরা দুর্নীতিগ্রস্ত, কোন্ সমবায় ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বালার মুখে — এসব খবর কাগজওয়ালারা সাগ্রহে লুফে নেয়। এর একটা সম্ভাব্য কারণ অধিকাংশে প্রতিবেদকের ধারণা সমবায় সংস্থা মানেই সরকারি সংস্থা। অতএব এদের ত্রুটি জনসমক্ষে প্রচার করাটা কাগজওয়ালাদের মহান দায়িত্ব। সমবায়ের আলোর দিকটা আড়াল করার প্রবণতাও তাই তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রচারে অনীহা অধিকাংশ সমবায় সংস্থার তরফেও। তাই প্রদীপের ঘরলিন শিখাটি তখনও চোখে পড়লেও অনেকেই জানেন না কে সলতেটি পাকিয়েছেন।

ভাণ্ডার পত্রিকায় ডিসেম্বর '৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি আমিই ভাণ্ডারে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিন্তু ওটিকে এক প্রচার পুস্তিকা হিসাবে নিজেদের এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ঐ ব্যাংকের অন্যতম পদস্থ কর্মচারী সুদর্শনধারী দত্ত যিনি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করছেন তাঁর কাছ থেকে এক কলম লেখা বের করা অসাধ্য সাধনের পর্যায়ে পড়ে। হুগলি ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এ পর্যন্ত গঠিত ২৯১টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর প্রত্যেকটির নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। এদের সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বাক্যস্রোত থামতে চায় না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁর কাছেই শোনা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করার পর থেকে আদিবাসী মহিলারা কীভাবে খুঁজে পাচ্ছেন শুধু আর্থিক স্বাবলম্বনের পথই নয়, সামাজিক অনাচার রোধ করার শক্তিও। মেয়ের বিয়ের যৌতুক কিম্বা নিকটাত্মীয়ের চিকিৎসা কিছুই আর এঁদের সাধ্যের বাইরে নেই। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তাঁদের এটাই স্বাবলম্বী করে তুলেছে যে পুরুষের অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে উঠতে আর তাঁরা ভয় পাচ্ছেন না। সংঘবদ্ধতার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভেঙে দিয়েছেন এলাকার চোলাই এর দোকান, ঘরের পুরুষদের বাধ্য করেছেন সঞ্চয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করতে।

হুগলি জেলায় সমবায়ের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের এই প্রয়াসের তিনি নিশারী তিনি হলেন হুগলি জেলার ভারপ্রাপ্ত নাবার্ডের অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার আশুতোষ বিশ্বাস। গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতিই যে নাবার্ডের পরিকল্পিত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সে সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তাঁর। হুগলি ব্যাঙ্ককে সঙ্গী করে এই বিশ্বাসকে তিনি রূপায়িত করেছেন। কথা বললে বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের জন্য নাবার্ডের এই প্রকল্পটি তাঁকে কী গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই অনুপ্রেরণা এবং হুগলি ব্যাঙ্কের সহযোগিতার মিট ফল হল ১৮টি সমিতির সঙ্গে যুক্ত আজকের ২৯১টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী যাদের মোট সদস্য সংখ্যা ১৮১১ তার মধ্যে ১,১৩৫ জন তফসিলি/আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। পুরুষ ও মহিলা সদস্যের সংখ্যা যথাক্রমে ২২১ এবং ১৬৭৮। এই সব গোষ্ঠীর সংগৃহীত সঞ্চয় ৩,৩৮,৭৫৮ টাকা, ৩০ সেপ্টেম্বর '৯৭ পর্যন্ত এরা ঋণ নিয়েছে ৩,৪২,৫০৫, যার সবটাই আদায় হয়ে গেছে '৯৬ সালে যে প্রকল্পের জন্য '৯৮ সালের মার্চে তার এতটা অগ্রগতিও শ্রীবিশ্বাসকে প্রচারমুখর কিছু লেখার প্রণিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ওঁর কাছেও শোনা গেল গোষ্ঠীর কাজকর্ম নিয়ে অনেক গল্প।

চণ্ডীতলার মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হবে। ব্যাঙ্কের এবং স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ডাকে প্রায় ৫০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং বেশ সরবভাবে উপস্থিত। ঐ সমিতিরই একজন পরিচালক বেশ মাতব্বর গোছের ব্যক্তি যিনি ঋণ শোধ করছেন না দীর্ঘদিন। ঐ মহিলা সমাবেশের কয়েকদিনের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু অংশ শোধ দিয়ে গেছেন সমিতিতে। স্থানীয় নারী জাগরণের ভয়ে কী? কে জানে। যে সব সমিতিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে সেখানে সভা ডাকলে ভিড় বৃদ্ধি উপেক্ষা করে কিভাবে মেয়েরা জমায়েত হন, কিভাবে নিজেদের সমস্যার কথা, নিজেদের কাজকর্মের কথা সভার সামনে অসংকোচে ব্যক্ত করেন ঐ সব অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিতা মেয়েরা, বলতে বলতে একজন গর্বিত পিতার মত বিশ্বাস মহাশয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর কাছেই শোনা ধনে বিপ্লবই এর সেই সব মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর কথা যাদের নাম গঙ্গা, নিবেদিতা, প্রীতিলতা নয়তো জনম আয়ো (গরিবের মা), গান্ধারী, পার্বতী, উত্তরা। সলতে পাকাবার লোক এখানেও একজন আছেন-যাঁর নাম নিশীথকুমার ঘোষ। বিপ্লবই-এর এক নামকরা সমাজসেবী পরিবারের সন্তান নিশীথবাবু বিপ্লবই লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সভাপতি স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিশীথবাবু তাঁর পরিবারের সেবাব্রতের উত্তরাধিকার বহন করছেন। সমবায় সমিতির উদ্যোগে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের আগে নিশীথবাবু স্থানীয় এক বেসরকারি সংগঠন সাউথ এশিয়া রিসার্চ সোসাইটির হয়ে মহিলাদের গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগী হন। এদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়েই তাঁর মনে হয় একাজ তো তাঁরাও করতে পারেন। তাছাড়া ঐ বেসরকারি সংগঠনটি সম্পর্কে নানা সন্দেহও তাঁর মনে বদ্ধমূল থাকায় তিনি ওদের সংসর্গ ত্যাগ করেন। ঠিক এই সময়েই হুগলি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের পরামর্শ মত আশুতোষ বিশ্বাস যোগাযোগ করেন তাঁর সঙ্গে। বিপ্লবই লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত। নিশীথবাবুও এলাকার সবরকমের মানুষের কাছে সহজে পৌঁছতে পারেন। ফলে নিশীথবাবু, আশুতোষবাবু এবং সুদর্শনবাবুর মিলিত প্রচেষ্টা রূপ নেয় একের পর এক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে। আর বিপ্লবই এর দৃষ্টান্তে উজ্জীবিত হয়ে হুগলি জেলার অন্যত্রও সমবায় সমিতির উদ্যোগে গড়ে উঠতে থাকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী।

বিপ্লবই গিয়ে দেখে এসেছিলাম গঙ্গা, পার্বতী, নাচার জনম আয়ো, গান্ধারী, উত্তরা ইত্যাদি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের।

দিলীপবাবুর কথায় যাঁরা বহুর খানেক আগেও লোকের সামনে কথা বলতে লজ্জায় আধোবদন হতেন আজ তাঁরা দিব্যি সপ্রতিভ। বস্তুত কথা বলতে গিয়ে কোন আড়ষ্টতা আমার নজরে পড়ল না। গোষ্ঠীতে কেন এলেন, কী পাবেন, তাঁদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ। অনেকের মুখেই শোনা গেল মহাজনের কাছে সোনালদা বা ঘটিবাটি বন্ধক রেখে টাকা নেওয়ার দিন তাঁদের ফুরিয়েছে। দিলীপবাবু আমাকে দেখালেন তাঁদের সমিতির বহুকি জিনিস রাখার ঘর। একসময় হবে বাসন রাখার জায়গা থাকত না আজ অনেকটাই ফাঁকা পড়ে আছে।

এইসব স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর গড় সদস্য সংখ্যা ৮। প্রতিদিনই সবাই একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমা রাখেন গোষ্ঠীতে। সেই অঙ্ক কোথাও ১০ কোথাও ২০ বা ৫০। গোষ্ঠীর টাকা জমা থাকে সমিতিতে। রি-ইনভেস্টমেন্ট স্কিমে জানানো এই টাকায় তাঁরা ১৮ টাকা পর্যন্ত সুদ পান। গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রয়োজন মত সমিতি গোষ্ঠীতে জমা টাকার ৪ গুণ পর্যন্ত ঋণ দেয় ১২ শতাংশ সুদে। নানারকম প্রয়োজনে ঋণ নিচ্ছেন সদস্যরা। গরু-মোষ পালন, চাষ-বাস, ধান-চালের ব্যবসা, ছোট দোকান, তেরপল, ছাগল পালন, হাঁস পোল্ট, গোবরগ্যাস তৈরি যেমনটি দরকার। সকলে ঋণ নিচ্ছেন তাও নয়। যাঁর প্রয়োজন তিনি নিচ্ছেন। যাঁর বেশি প্রয়োজন তিনি আগে পাচ্ছেন। তিনি ঋণ নিচ্ছেন তিনি জানেন মাসের ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে কিস্তি শোধ দিতে হবে। দলের নেতা টাকাটা সংগ্রহ করে সমিতিতে জমা করে দিচ্ছেন। দিগসুই সমিতিতে একজন কর্মীকে শুধু এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তরুণ কর্মীটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তাদের সভায় উপস্থিত থেকে সভা পরিচালনায় সাহায্য করা, ঋণের কিস্তি ঠিক করে দেওয়া এসব করতে করতে গোষ্ঠী সদস্যদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা গড়ে উঠেছে। আওতেছবাবু, দিলীপবাবু, সুদর্শনবাবু, কিম্বা দিগসুই সমিতির এই তরুণ কর্মী এঁরা কেউই কিন্তু গোষ্ঠীর সদস্যদের কোন নির্দেশ দেন না। এঁদের হাতে কথা বলেন না বা সভা পরিচালনা করেন না। শুধু এঁদের নিজেদের সমস্যা তুলে ধরতে ও তার সমাধানের পথ খুঁজতে সাহায্য করেন। তাই '১৬-তে গোষ্ঠী গঠন করে '১৮-তে গ্রামের মোটে খাওয়া দরিদ্র পরিবারের বউ মেয়েরা আজ বাইরের মানুষের সামনে একটাই নিঃসংকোচ যে কলকাতা থেকে দেখতে যাওয়া নাবার্ডের পদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে তাঁদের পা কাঁপে না, কথা জড়িয়ে যায় না।

সযত্নে সলতে পাকিয়ে একটি একটি করে যে কটি প্রদীপ এই সব নীরব কর্মীরা জ্বেলেছেন তার আলো ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে দূরান্তরে। আজকের নারীবাদী আন্দোলনের দারুণ চকচকানির যুগে এঁদের কথা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে। ❑

একনজরে দিগসুই-এর কয়েকটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী

গোষ্ঠীর নাম	সদস্য সংখ্যা	সংগঠনের তারিখ	জমার পরিমাণ	ঋণের পরিমাণ	অনাদায়ী ঋণ
গঙ্গা		১৭-৩-১৬	৪,৬০০	১৬,৪০০	নেই
নিবেদিতা		২৯-১-১৬	৯,১৪০	২০,০০০	১২,৩৩৫
নতুন জনম আরো (তপসিলি উপজাতি)		৩১-৭-১৭	১,২৬০	*	
প্রীতিলতা (তপসিলি)					১,২৫০
পার্বতী (তপসিলি)					১০,২১৬
নাতজিনী (তপসিলি উপজাতি)					৩,৪৮০
পাঞ্জারী (তপসিলি উপজাতি)				২,০০০	নেই
উত্তরা (তপসিলি উপজাতি)			৩,৮৮০		৩,০০০

আদর্শ সম্প্রসারণ কর্মীর দ্বাদশ গুণাবলী

* যে কর্মে তিনি নিযুক্ত তাতে গভীর বিশ্বাস
* কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিপুণ কৌশল
* জনসাধারণের জড়তাকে জয় করার অসীম ধৈর্য
* সমস্তরকম বিপদ-আপদের মাঝেও ধৈর্যচ্যুত না হয়ে মধুর ব্যবহার
* যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন উপায়ই কাজে লাগছে না তখন রসকৌতুক বোধের পরিচয়
* যে কাজ করতে হবে সে সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি
* পরাজয়কে গ্লানিহীন স্বীকার করে নেওয়া এবং প্রতিটি পরাজয়কে যথোচিত শক্তিতে প্রতিহত করা
* সৎ কাজ করতে অসীম সাহস
* প্রতিটি কাজকে তার সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্প
* স্থানীয় জনগণের নেতৃত্বে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে প্রবল উদ্যম
* শত সহস্র হতাশার মধ্যেও অবিচল আশা
* জাতির সমৃদ্ধিতে গ্রামীণ জীবনের অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

একটি সুন্দর সন্ধ্যা

সন্তোষকুমার দালাল

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ভারতীয় মিউজিয়ামের আণ্ডতোষ জন্মশত বার্ষিকী অডিটোরিয়ামে যখন অতিথি বক্তা হিসাবে ঢুকলাম, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি চেনা মুখ আন্তরিকতার সঙ্গে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে হলের মধ্যে অতিথিদের বসার নির্দিষ্ট আসনে বসালেন। সুদৃশ্য অডিটোরিয়াম ও সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ রঙসজ্জা দেখে মনটা ভরে গেল। সামনের সারিতে আসনের বাঁয়ে সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, আরবান ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চল চ্যাটার্জি, ফেডারেশনের পূর্বতম সভাপতি দীনেশ গুপ্ত প্রমুখদের আলোচনা শুনে বুঝলাম ওঁরাও খুব খুশি। ১৯২৩ সালে ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সক্রিয় সভ্যদের সদযোগিতায় সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাতে গড়ে তুলেছিলেন একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি যার নাম ছিল ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি। যখন এই সমিতির জন্ম হয়েছিল তখন দেশ ছিল পরাধীন, এস বি আই তখন ছিল ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ শাসনেও পরিচালকদের অত্যাচারে কর্মচারিরা ছিলেন সবচেয়ে অবহেলিত। কোন আইন কানুনের তোয়াক্কা করত না ইংরেজ পরিচালকগোষ্ঠী, কর্মচারিদের কোন বেতন কাঠামো ছিল না। সেই সময় এখন থেকে ৭৫ বছর পূর্বে ব্যাঙ্কের একজন মহান ব্যক্তি সত্যগোপাল বোসের নেতৃত্বে এই ব্যাঙ্কের জন্ম হয়। মাত্র ৩০৩৫ টাকা শেয়ার মূলধন নিয়ে এই সমিতির জন্ম। পরবর্তীকালে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের সময় সভ্যদের মনোবল অটুট রাখতে আর্থিক সাহায্যের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থেকেছে এই ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অমিত দে সরকার উদাত্ত কণ্ঠে 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে' গানের মাধ্যমে প্লাটিনাম জয়ন্তীর ঘোষণা করে সভার ঘোষকের কাজ আরম্ভ করলেন। প্রথমে শ্রীসরকার একে একে সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রধান কার্যালয়, কলকাতা-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার প্রদীপকুমার সরকার, ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথি সুনীল ঘোষ-চেয়ারম্যান-পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও চঞ্চল চ্যাটার্জি-চেয়ারম্যান-ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফেডারেশন অফ আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ, সম্মানিত অতিথি ও প্রদাতার সম্মেলনের সভাপতি শঙ্করেশ দত্ত-সভাপতি-এস বি আই এস এ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বরণ করার আহ্বান জানান। পরে ৭৫টি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন উদ্যোক্তা প্রদীপকুমার সরকার। কুমারী বর্ণালী মিত্র 'সবারে করি আহ্বান' সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে উৎসবের পরিবেশকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন। উদ্যোক্তা শ্রী সরকার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ব্যাঙ্ক কর্মচারিদের দ্বারা পরিচালিতব্যাঙ্ক ৭৫ বছরের পদার্পণের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সবচেয়ে প্রশংসা করেন ব্যাঙ্ক কর্মচারিরাই আরেকটি ব্যাঙ্ক চালাচ্ছেন। প্রধান অতিথি ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী ভট্টাচার্য জানান, সব কথা মনে পড়ে না। দীর্ঘদিন সংগঠনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম বলে সদস্যবন্ধুদের ভালবাসা পেয়েছি প্রচুর। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তেমন কিছুই মনে আসছে না। এটুকু মনে আছে, অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ১৯৪৫ সালে কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন, সেই সময় তিনি ন্যাশনেজিং কমিটিতে আসেন এবং আসিস্টান্ট ট্রেজারির পদে কাজ করেন। পরবর্তী সময়ে সুধীর দত্ত যখন সেক্রেটারি হন তিনি দায়িত্বে ছিলেন সহ-সম্পাদক পদে। তারপরে দিবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী যখন সভাপতি হলেন তখন তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। পরবর্তীকালে সমিতির সভাপতি পদে কাজ করার সুযোগ পান। আজ সমিতি নানা বাধা বিপত্তিকে কাটিয়ে বর্তমান সভাপতির দায়িত্বে শঙ্করেশ দত্ত যিনি একজন কর্মচারী সংগঠনেরও নেতা। যাই হোক সমিতির প্লাটিনাম জুবিলি হচ্ছে এটা আনন্দের কথা।

উৎসবের সম্মানিত অতিথি সুনীল ঘোষ সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন প্রথমে প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাঙ্কের প্রকাশিত সুদৃশ্য স্মারক গ্রন্থটি উন্মোচন করে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমবায় ব্যাঙ্কের অবস্থা ও ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ব্যাঙ্ক ৭৫টি বছর অতিক্রম করেছে। হঠাৎ ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল, দীর্ঘদিন অডিট না হওয়ায় ব্যাঙ্কের সদস্যরা তাদের লভ্যাংশ পাননি। বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ, তিনি কিছুদিন আগেও ছিলেন প্রশাসক, তাঁর সক্রিয় ভূমিকায় ব্যাঙ্কের দীর্ঘদিনের অডিট কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক বিগত এক বছর কয়েক মাস আগে সাধারণ সভা করে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের হাতে ব্যাঙ্কের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন।

উৎসবের দ্বিতীয় সম্মানিত অতিথি চঞ্চল চ্যাটার্জি তাঁর বক্তব্যে সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও প্রাসঙ্গিক আইন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দ্বারা পরিচালিত এই ব্যাঙ্ক যে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে কাজ করছে তা জানান। অতিথি বক্তা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রাক্তন জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। শ্রীরায়ের বক্তব্যের পর অতিথি বক্তা হিসাবে উত্তরপাড়া সেন্টার কর ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক সন্তোষ দালাল সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, দীর্ঘ ৭৫ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই ব্যাঙ্ক প্রশিক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেননি। তবেতত বছর ২১ জন কর্মচারিদের জন্য একটা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের উপর। ব্যাঙ্কের সভাপতি তাঁর দেওয়া বার্ষিক বিবরণে স্বীকার করেন ব্যাঙ্ক এই প্রথম ২১ জন

কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরপাড়ায় পাঠিয়েছিলেন এবং কর্মচারিরা এই প্রশিক্ষণের সুফল পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

উৎসব প্রায় সমাপ্তির পথে, অবশেষে উৎসবের সভাপতি এবং ব্যাঙ্কের সভাপতি শঙ্করেশ দত্ত, যিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ারও অন্যতম পরিচালক, তিনি জানান প্লাটিনাম জুবিলি সম্পর্কে। যে সমস্ত মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আজ উপস্থিত থেকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য জানালেন, তা ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ পথের হয়ে থাকবে। ঈশ্বর জানালেন, তারা মাত্র এক বছর কয়েকমাস পরিচালকমণ্ডলীতে এসেছেন, তারমধ্যে তারা বিগত ১৪ বছরের অডিট কার্য সম্পন্ন করেছেন। কর্মচারিদের সাথে যে সমস্ত মতবিরোধ ছিল তা দূর করেছেন। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বর্তমান অফিসকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, যার মধ্যে বাড়ির মালিক ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেবেন। কম্পিউটার-এর মাধ্যমে সমস্ত হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, আগামী দিনে ব্যাঙ্ক আরও সমৃদ্ধ হবে। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সম্মেলন শেষ করার ঘোষণা করেন।

উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পরের দিন অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি, বিকেল ৪-৫০ টায় বিশিষ্ট শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর অংশগ্রহণে ও স্বাগতকমিটি দলগুলোর সঙ্গীত। সবার শেষে ব্যাঙ্কের সভা শিল্পী সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক উপসমিতির নিবেদন মুসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'হারানের নাতজামাই'। উৎসব শেষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অসীমকুমার বসু, অনারারি ডেলিগেট অনিমেষ সেনগুপ্ত, অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টার অসিত দে সরকার, ব্যাঙ্কের বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ উৎপল ভট্টাচার্য, সেবার দলগুপ্ত, অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর, যাঁরা বিগত এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যাঙ্ককে বর্তমানে একটা সুস্থির অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও সুদীর্ঘ ৭৫ বছরের বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্বন্ধে জেনে ব্যাঙ্কের উন্নতি ও হঠাৎ সামগ্রিক কার্যকলাপের অবনতির সম্বন্ধে জানা গেল।

১৯২৩ সালের সমবায় সমিতি দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে নানান অসুবিধার মধ্য দিয়ে সমবায় আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটার এগিয়ে চলেছে এবং ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাঙ্ক মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট অনুযায়ী নতুনভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে কাজ আরম্ভ করেছে। মুলত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেরণায় এবং তাদের সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সমবায় সমিতিও বেড়ে উঠেছে বর্তমানে ১৭টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের মূলধন ৪০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। প্রথম অবস্থায় এটি কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ের ইউনিয়ন ঘরের মধ্যে কাজ করত পরে ইউনিয়ন ঘর ১৩ নং ক্রুকেড লেনে নিজস্ব বাড়িতে চলে গেল, সমবায় সমিতিও ওখানে চলে আসে পরে ঘাটের দশকে ১১নং আব্দুল হামিদ স্ট্রিটে ভাড়া নিয়ে চলে আসে এবং এখনও উক্ত বাড়িতে ব্যাঙ্কের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী এই ব্যাঙ্কের দায়িত্ব নিয়েছেন ২৮ ডিসেম্বর, '৯৬ সালে। এর আগে ১৯৭৮ ও ১৯৯১ সালে দু'বার সরকার প্রশাসক নিয়োগ করেন, তাঁদের মেয়াদ যথাক্রমে ৭ বছর ও ৬ বছর। অগোট আলোচিত হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষিত হয়নি। ১২৮৫ সালে মাত্র ৮% হারে ও ১৯৭৯-৮২ সালে ইন্টারিম ডিভিডেণ্ড ঘোষণা সত্ত্বেও মাত্র অল্প কিছু অংশীদারের কাছে তা পৌঁছেছিল। বর্তমান পরিচালক সমিতির যিনি কর্ণধার অর্থাৎ চেয়ারম্যান শঙ্করেশ দত্ত, যিনি একাধিকক্রমে স্টেট ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের বেঙ্গল সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের পদাধিকারী, তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ব্যাঙ্ক ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ পর্যন্ত হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ১৯৯৭ সালে এপ্রিল মাসে বিশেষ সাধারণ সভা করে ১২% ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী বছরের ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৫-৯৪ সাল পর্যন্ত হিসাব পরীক্ষা করে বর্তমান বছরের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে ও লভ্যাংশও ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে ১৯৯৪-৯৫ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত হিসাব অডিট করার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। সমস্ত পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করলেন এই ব্যবস্থার বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ উৎপল ভট্টাচার্য-এর অবদান। ব্যাঙ্কের সদস্যদের গৃহনির্মাণ ঋণ প্রকল্পের ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। উন্নত গ্রাহক পরিষেবার জন্য কম্পিউটারের প্রয়োগ নিয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। ব্যাঙ্ক আরও পরিকল্পনা নিয়েছে সদস্যদের জন্য কম্পিউমার লোন, হলিডে লোন প্রভৃতি প্রচলন করবে। বর্তমানে যদিও ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে, আগামী দিনে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম আপ-টু-ডেট করে পুরোপুরি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চালু করবে। ১৯৯১ সালে দেশে নয়া অর্থনীতি চালু হওয়ায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ইতিমধ্যে বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিগত বছরগুলিতে বারবার নানা নির্দেশনামা পাঠাচ্ছে। বারবার সুদের হার পরিবর্তন করছে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিকাঠামো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত নয়, সে কারণে সমবায় ব্যাঙ্ক নানা অসুবিধায় পড়ছে।

প্লাটিনাম জয়ন্তীর শুভ উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থানের একটা চিত্র দেখলে ব্যাঙ্কের অবস্থান বোঝা যাবে। (পরে দেওয়া হল)

ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে সমবায়ের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এই ব্যাঙ্কের বর্তমান একটা সমস্যা হচ্ছে সদস্য সংখ্যার ক্রমহ্রাসমানতা। কারণ স্টেট ব্যাঙ্কের নিয়োগ বন্ধ। প্রচুর কর্মচারী আগামী ২০০০ সালের মধ্যে অবসর নিচ্ছেন। তারা তাঁদের প্রাপ্য তুলে নেবেন। সমবায় নতুন সদস্য নিতে পারছে না। তবে একটা আশার আলো যে নতুন পরিচালকমণ্ডলী দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় ৫০০ নতুন সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খোলা অর্থনীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য এই সমবায় ব্যাঙ্কের পরিকাঠামো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর তোড়জোড় চলছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী এই ব্যাঙ্কের পর্যায়ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। যদি ব্যাঙ্ক গ্রাহক পরিষেবার কথা চিন্তা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পায় তাহলে বিভিন্ন স্থানে শাখা খুলে উক্ত এলাকার ছোট ব্যবসায়ী ও কর্মচারি-বন্ধুদেরও সদস্য করে কল্যাণ করতে পারবে।

সারণি

টাকার হিসাব (লাখে)

বিবরণ	৩০-৬-৯৭	৩০-৬-৭৪	৩০-৬-৮০	৩০-৬-৮৭	৩১-৩-৯৪	৩১-৩-৯৭
সদস্য সংখ্যা		১৮৬০০	২১৩০০		২৪০০০	
অনুমোদিত মূলধন		৪১.৬২				
সংরক্ষিত আমানত		১৫৪.৯১				
কার্যকরী মূলধন		৮৩.৫৭				
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ					১২০৪.০০	
স্বল্পমেয়াদি ঋণ					১১৮.৯৪	
নিট লাভ		৮.৫৮			৬৫.৩০	

দুর্গাপুর সিটি প্রোজেক্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি যেমন দুর্গাপুর সিপ্লাস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে রূপান্তর ঘটিয়েছে, তেমনি আশা করা যায় আগামী দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কও স্টেট ব্যাঙ্কের মতো কাজ করবে এবং তদুপরি সদস্য নয় এমনো জনসাধারণও এর সুযোগ পাবে এবং কলকাতা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যেও এর শাখা খুলতে পারবে। আগামী শতবর্ষপূর্তী উৎসবে নিশ্চয় ব্যাঙ্কের পরিচয় কর্মচারিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়বে জনসাধারণের মধ্যে। সেই আশায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী তাদের কাজ অব্যাহত রাখবেন। ❑

বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলে

- জোসেফ প্রিস্টলে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ফিল্ডহেড শহরে এক দরিদ্র তাঁতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি গ্রিক, ফরাসি, জার্মান, আরবী ইত্যাদি ভাষা শিখে ফেলেছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত হন, যিনি প্রথম মারকিউরিক অক্সাইড থেকে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করেন। পরে তিনি প্রমাণ করেন জীবকুল এই অক্সিজেন গ্যাসটির সাহায্যেই জীবনধারণ করে। তিনি একটি বদ্ধ জারে একটি ইঁদুরকে আবদ্ধ করে রাখলেন, ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইঁদুরটির মৃত্যু হল। কিন্তু ঐ জারে একটি সবুজ সতেজ চারাগাছ রাখলে এবং জারটিকে সূর্যালোকে রাখলে জারে রাখা ইঁদুরটি বেঁচে থাকে এবং তার শ্বাসকষ্টের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এ থেকেই তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সবুজ উদ্ভিদেরা অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনে সক্ষম এবং প্রাণীরা ঐ গ্যাস গ্রহণ করে প্রাণধারণ করে। অর্থাৎ তিনি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রাণীরা তা গ্রহণ করে।
- বিজ্ঞানী প্রিস্টলে প্রথম থেকেই রসায়ন বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। মদের ভাঁটি থেকে একরকম গ্যাস বেরোতে দেখে তিনি আগ্রহে ও কৌশলে ঐ গ্যাস সংগ্রহ করে তার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করিয়ে দেখলেন কাঠিটি নিভে গেল। প্রিস্টলের ধারণা হয়েছিল ঐ গ্যাসটি সম্ভবত 'ফিক্সড এয়ার'। তখন থেকেই তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুরু। এসময় থেকে তিনি বাড়িতে বসেই খড়িমাটিকে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে 'ফিক্সড এয়ার' প্রস্তুত করেন এবং ঐ গ্যাসকে জলের মধ্যে পাঠিয়ে 'স্পার্কলিং ওয়াটার' প্রস্তুত করলেন। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি থেকে 'গোল্ড মেডেল' লাভ করেন। এই ফিক্সড এয়ার আসলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং স্পার্কলিং ওয়াটার হল 'সোডা ওয়াটার'।
- প্রিস্টলের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি হল ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এ সময় তিনি পারদের লাল সর (মারকিউরিক অক্সাইড) থেকে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুতে সমর্থ হন। তিনি এর নাম দেন 'ডিফ্লোজিস্টিকেটেড এয়ার'। পরে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার এই গ্যাসটির নাম দেন 'অক্সিজেন'।
- ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

❑ অশোককুমার গিরি

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুমুখী লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। মেল্ ডিপোজিট দ্বারা পাওয়া যায়।
৫। বৈদ্যুতিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, মহম্মদবাজার ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713 204
0343/56-2393, 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি
ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

ডোকরা — সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ অঙ্গীকার

অনুপ ঘোষ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির বছরে এই বেদনাদায়ক সত্যকে অস্বীকার করবার কোন সুযোগ নেই যে এখনও আমাদের সমাজে নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা এবং অধিকার থেকে লজ্জাজনকভাবে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। উইমেনস লিব বা নারী স্বাধীনতার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস যতই মুখর হোক আসল সত্য হল সভ্যতার শেষ লগ্নেও এদেশে নারী এখনও সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই ভীষণভাবে বৈষম্যের শিকার। কেউ কেউ বলে থাকেন নারী প্রতিযোগিতায় পুরুষের পেছনে থাকবে এ কারণে যে তারা (১) শারীরিক দিক থেকে দুর্বল, (২) পরিশ্রমসাধ্য কাজকর্ম করতে অপারগ, (৩) মেধায় তারা পুরুষের পেছনে রয়েছে, (৪) সৃষ্টির আদি থেকেই গৃহকোণেই তাদের স্থান — স্বামী-সন্তুতি পরিচর্যাতেই তাদের পূর্ণতা এবং ইত্যাদি আরও কত কি। কিন্তু এসবই যদি সত্য হত তবে এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র সবল, বলিষ্ঠ, লড়াকু পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকত এবং দুর্বল নারী প্রতিযোগিতায় পরাভূত হয়ে সৃষ্টি প্রজাতিতে পরিণত হত। কিন্তু তা হয়নি কারণ উপরোক্ত যুক্তিগুলি সবই অসার। আসলে যুগ থেকে যুগান্তরে পুরুষের প্রবল অহমিকা এবং তাদের সৃষ্ট কতকগুলি যুক্তিহীন সামাজিক নিয়ম নারীসমাজকে ক্রমাগতই বঞ্চনার ও শোষণের গভীরে ঠেলে দিয়েছে। এক বিচিত্র বৈষম্যের শিকার হয়ে নারীসমাজ চিরকাল অন্ধকারেই অবস্থান করে গেছেন। শুধু গ্রামীণ নারী সমাজেই নয় শহরের হাই প্রোফাইল সোসাইটিও তাই নারী নির্যাতন, নিধন বা কন্যাভ্রূণ হত্যার মত নির্লজ্জ ব্যাধিতে আজ আক্রান্ত।

আজ একথা অস্বীকার করবার কোন উপায়ই নেই যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের স্বপ্ন দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে পেছনের সারিতে নিষ্ক্রিয় বসিয়ে রেখে তা সফল করা সম্ভব নয়। তাই নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার ফিরিয়ে দেবার এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুরু হয়েছে।

গ্রামীণ নারী ও শিশুবিকাশ কর্মসূচি যার সংক্ষিপ্ত নাম 'ডোকরা' (DWCRA) এরকমই এক কর্মসূচি। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা বা ডি আর ডি এ-র অধীনে জেলার গ্রামাঞ্চলে এই নারী ও শিশুবিকাশ কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলে নারীসমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার সমূহের মধ্য থেকে ১০ থেকে ১৫ জন নারী নিয়ে এই ডোকরা গ্রুপ গঠন করা হয়ে থাকে। ডোকরা গ্রুপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে একারণে যে এক দে কাজ গ্রামের দরিদ্র নারীর পক্ষে করা দুরূহ এযোগে পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে এসে নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করতে করতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রচেষ্টার সুযোগ ও সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হবে। ব্যক্তির চেতনার সাথে সাথে সমষ্টিগত চেতনার উন্মেষ। একগ্রামে অনেক গ্রুপ হতে পারে, বাধা নেই। গ্রুপের সদস্যারা নেত্রী নির্বাচন করেন, গ্রুপের সভা করেন, উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরি করে কাজ করেন।

গ্রুপের সদস্যরা ১০০ টাকা জমা করলে ডি আর ডি এ থেকে প্রথমবারীর তহবিল পাবেন প্রথমে ১৫ হাজার পরে আরও ১০ হাজার ব্যাঙ্কে হিসাব খুলে ৫ টাকা জমা হবে। পরে গ্রুপগত সঞ্চয় ১২ হাজার টাকা হলে ম্যাচিং গ্রান্ট আরোও সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পাবেন।

এভাবে ডোকরা গ্রুপের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীসমাজ সংঘবদ্ধ হয়ে নানা আর্থিক প্রকল্প হাতের কাজ এসে নেবেন এবং ধীরে ধীরে তাদের রোজগার বাড়াবেন। অনেকে ভুল করে থাকেন কেবল নারী সমাজের আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্যই বুঝি এই ডোকরা। আসলে তা হয় গ্রুপের সামাজিক ও অন্যান্য দায়বদ্ধতা হয়েছে। নিজেদের বাড়ির ও গ্রামের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টি, স্বাক্ষরতা, নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নিম্নস্তরে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া এ সব কাজ করে এ গ্রুপগুলি এক একটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

বাস্তবে তা হয়েছেও। জলপাইগুড়ি জেলার হয়েরও ওপর এরকম ডোকরা গ্রুপ কাজ করছে। এদের অনেকে সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। নাগরাকাটার অপরাজিতা ডোকরা গ্রুপের, প্রগতি বা ইন্দিরা গ্রুপ কিংবা বালিনারতা ডোকরা গ্রুপের মেয়েরা সমাজ সমাজে তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছেন। মৌমাছি পালন করে, শাল বা চামর তৈরি করে, ব্যাগ ও অন্যান্য সরঞ্জাম করে, তবুও ফুট চাষ করে এরা সভা ফেলে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই এরকম আরও অনেক ডোকরা গ্রুপ বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে এক প্রদর্শনীতে দেখা গেল ডোকরা গ্রুপের তৈরি বাঁশের গৃহসজ্জার জিনিসপত্র, ব্যাগ বা চলনসই, বড়ি, মশলা কেনবার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে রীতিমত ক্রেজ তৈরি হয়েছে।

এই যে পরিবর্তনের সূচনা তা ধীরেই হোক বা সীমিত ক্ষেত্রেই হোক গ্রামীণ নারী সমাজে প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তুলেছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, সম্মিলিত শক্তির মধ্য দিয়ে এতদিনের অবিচার ও অনাচারের অবসান ঘটাতে এগিয়ে এসেছেন গ্রামাঞ্চলের অগ্রসর নারী সমাজ : আজ একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বলভরসা দিচ্ছেন, নানা রকম আর্থিকপ্রকল্প নিয়ে রোজগার করে সংসারের আয় বাড়াচ্ছেন, সাক্ষরতায় মন দিচ্ছেন, পরিবেশ নিয়ে ভাবছেন এ সবই তো ডোকরার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। অচল পর্দা নড়ছে — সেখানে প্রাণের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে।

এ বছরেই জলপাইগুড়ি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডোকরা গ্রুপ নেত্রী ও কোঅর্ডিনেটরদের ১১টি প্রশিক্ষণচক্রে তিনশ'রও বেশি নারী ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের ঐকান্তিকতা, আন্তরিকতা, কিছু করবার স্পৃহা, সব মর্যাদার সমাজ সংসারে স্বাবলম্বী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রতিজ্ঞা ও বাসনা বার বার এটাই মনে করিয়ে দিয়েছে যে দিন পাল্টাচ্ছে। সব প্রতিরোধ ভেঙে এরা এগোতে শপথবদ্ধ। ডোকরা গ্রুপের সদস্যরা গাইছেন -

"আমরা করব জয় নিশ্চয়"

পুরনো সেই দিনের কথা

[বর্তমান সম্বৎসর বছরে (১৯৯৭-৯৮) আমরা এই বিভাগটি শুরু করেছিলাম, পুরনো ঘটনার মধ্যে অনেক চূর্ণ খবর পাঠকের ভাল লাগবে এই আশায়। ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হবে ১৯৯৮–৯৯ সম্বৎসর বৎসর। এই সংখ্যাতেই 'পুরনো সেই দিনের কথা' শেষ হচ্ছে।]

মার্চ

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
১	১৮৩৬	জেনারেল লর্ড মিন্টোর দানপত্রের শর্তানুসারে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় লা-মার্টিনিয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
	১৯০৮	ভারতের প্রথম ইস্পাত শিল্প 'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
	১৯১৭	মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট খোলা হয়।
	১৯৩৭	অবাঙালি মনীষী রঁমা রঁলা কলকাতায় এক মহাসভায় বিশ্বে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর ভাষণ দেন।
	১৯৪৯	ভারতের যুগযুগ সংবেজিনী নাইটু (চট্টোপাধ্যায়) দেহত্যাগ করেন।
	১৯৬৭	পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের শপথ গ্রহণ।
	১৮৪৭	টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯০৬	অনুশীলন সমিতির মুখপত্র 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রতিষ্ঠাতা : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
	১৯৪৮	ড. রাধাগোবিন্দ কর-এর সম্মানার্থে বেলগাছিয়ার 'ভারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'আর জি কর মেডিকেল কলেজ'। হাওড়া স্টেশন থেকে বাণ্ডেল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরু করে। জে পি ওয়াকার নামে জাহাজ প্রায় দুশো জন সিপাহি বিদ্রোহের বিপ্লবীদের নিয়ে কলকাতা থেকে নতুন উপনিবেশ গড়ার জন্য আন্দামান যাত্রা করে।
	১৮৭৯	ব্রিটেনের বাইরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা কলেজ হিসাবে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা।
	১৯৯০	বহু রাজনৈতিকদলের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম নির্বাচন।
	১৮৭১	জার্মানি তথা ইউরোপের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর সংগঠক রোজা লুক্সেমবার্গ পোলাণ্ডের ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৮৩	কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁরাই ভারতের প্রথম দুই মহিলা স্নাতক।
	১৯১৫	খনি শিল্পের ক্ষেত্রে যাবতীয় সংরক্ষণ ও বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে শিল্পটি বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্যে উন্মুক্ত হল।
	১৯১৫	মহাত্মা গান্ধীর সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার।
	১৯৫৩	সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ স্টালিন-এর মৃত্যু।
	১৯৯১	প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের পদত্যাগ।
	১৭৮৫	ওল্ড কোর্ট হাউসের গৃহে প্রকাশ্য নিলামে ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আসবাবপত্র বিক্রি হয়।
	১৮৭১	বড়লাট লর্ড মেয়ো যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে 'রাজা' উপাধি দেন।
	১৯৮৭	সুনীল গাভাসকার আমেদাবাদ ক্রিকেটে দশ হাজার রান পূর্ণ করার অধিকারী প্রথম ব্যাটসম্যানের গৌরব অর্জন করলেন।
	১৮৬৫	মহা সমারোহে ডালহৌসী ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।
	১৯০১	মন্ত্রাভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু দেহত্যাগ করেন।
	১৭০৭	বেআইনীভাবে গৃহনির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়।
	১৭৯৪	কলকাতার ৬নং পার্ক স্ট্রিটে প্রথম দলিল রেজিস্ট্রি শুরু হয়।
	১৮৫৮	সম্রাট বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়) জাফরি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।
	১৯০৭	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সান্ধ্যদৈনিক 'স্বরাজ' সম্পাদনা শুরু করেন।
	১৯৫৬	ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নতুন নামকরণ করা হয় যাদু সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার।
	১৭৭৫	মহারাজ নন্দকুমার ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ কোম্পানির উচ্চ কর্মচারিদের উৎকোচ গ্রহণের কথা প্রকাশ্য জনসভায় প্রকাশ করেন এবং সার ফিলিপস্ ফ্রান্সিস তা মেনে নেন।

তারিখ	সনের	স্মরণীয় ঘটনা
	১৯১১	গ্রন্থ রচয়িত্রী বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ (রোকেয়া) তাঁর পরলোকগত স্বামীর নামে শামসুন্নাহার মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন।
		নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রদত্ত 'ভারতরত্ন' খেতাব নিতে অস্বীকার করলেন তাঁর কন্যা ড. অনিতা বোস পাফ।
		৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং সবরমতী আশ্রমের বাসিন্দাদের নিয়ে গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ডান্ডিযাত্রা শুরু করেন এবং আইন অমান্য শুরু হয়।
		কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার-এর নতুন নামকরণ করা হয় আজাদ হিন্দ বাগ।
		সেন্ট জেমস স্কোয়ারের নতুন নামকরণ করা হয় সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার।
		কলকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে সরাসরি রেডিও টেলিগ্রাফ সার্ভিস চালু হয়।
		সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার-এর উদ্যোগে নবপর্যায়ে আনন্দবাজার পত্রিকা সান্ধ্য দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয়। পরে ১লা জুন, ১৯২৬-এ এটি প্রভাতী দৈনিকে পরিণত হয়।
	১৯৯১	ভারতের রাষ্ট্রপতি নবম লোকসভা ভেঙে দেন।
	১৯৯৩	ওড়িশা সরকার মহিলাদের জন্য সরকারি চাকরিতে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ করেন।
	১৮৭৯	বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন জার্মানির উলম্ শহরের এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
	১৮৮৩	আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জার্মানির ইহুদি পরিবারের সন্তান কার্ল মার্কস লন্ডনে দেহত্যাগ করেন।
	১৯৬২	পর্তুগিজ শাসনের কবল থেকে সাংবিধানিক দিক থেকে গোয়ার মুক্তি স্বীকৃত হল। সংবিধানের ষাষ্ঠ সংশোধনে গোয়া-দমন-দিউ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে যুক্ত হয়। এই সংশোধন গোয়া, দমন ও দিউ-র প্রকৃত মুক্তির দিন (২০-১২-১৯৬১) থেকে কার্যকর হয়।
	১৯০৪	সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও প্রশাসক অন্নদাশঙ্কর রায় জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৫৯	সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে নিমতলা ঘাট স্ট্রিট পর্যন্ত সংযোজনকারী রাস্তাটির নামকরণ করা হয় বটকৃষ্ণ পাল অ্যাভিনিউ বা বি কে পাল অ্যাভিনিউ।
	১৯৮৩	দার্শনিক ড. কালিদাস ভট্টাচার্য দেহত্যাগ করেন
১৬	১৯৭০	পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়।
	১৯৯২	তিন সদস্যের অস্থায়ী কমিটি নার্সিং হোমে সত্যজিৎ রায়কে সাম্প্রতিক অস্থায় প্রদান করে।
	১৯৯৩	কলকাতার বৌবাজারে বোমা বিস্ফোরণে মৃত ৭০ জনের মৃত্যু হয়।
	১৭৬৯	ব্রিটিশ সরকার বাংলার তাঁতিদের মসলিন শিল্পে নৈপুণ্য বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের বুড়ো আঙুল কাটার অভিযান শুরু করে
	১৮৫৬	বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে বিদ্যাসাগরের এক হাজার স্বাক্ষরের (৪-১০-১৮৫৫) প্রতিবাদে ৯৭ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠান।
	১৯০১	বঙ্গিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের (তৎকালীন নাম কলেজ স্কোয়ার) ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধন হয়। প্রথম নাটক হ্যামলেট।
	১৭৮৬	প্রথম ভারতীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কলকাতার ব্যবসায়ীদের 'জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া' (অতঃপর ১৭ মার্চ) প্রতিষ্ঠা করেন।
	১৮০০	পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় এক ফাউন্ট বাংলা অক্ষর ঢালার পর কেরি সাহেব নিউ টেস্টামেন্টের সেন্ট ম্যাথুর বাংলা অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠা মুদ্রিত করেন।
	১৯৪৪	বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতে ঢুকেছিল।
	১৮১৩	আফ্রিকার আবিষ্কর্তা ডেভিড লিভিংস্টোন জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯০২	লর্ড কার্জন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।
	১৯৬৪	সঙ্গীত কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহ (কলামন্দির)-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন অন্নদাশঙ্কর দাস বিড়লা।
	১৮২৮	সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হেনরিক ইবসেন নরওয়ের স্কেইনে জন্মগ্রহণ করেন।
	১৯৮৮	সঙ্গীত শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ দেহত্যাগ করেন।
	১৯৯২	সত্যজিৎ রায়কে 'ভারতরত্ন' প্রদানের ঘোষণা করা হয়।
	১৮৭৮	চিত্তরঞ্জন দাসের পিতা ভুবনমোহন দাসের সম্পাদনায় 'ব্রাহ্ম পাবলিক অপিনিয়ন' নামে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়।
		কুখ্যাত ভার্নাকুলার অ্যাক্ট থেকে আইনত রেহাই পাওয়ার জন্যে সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এটি ইংরাজি ভাষায় রূপান্তরিত করেন।
	১৯৭৭	১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জারি হওয়া অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত।
	১৭৫৭	রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কয়েকটি কাস্তরী নিয়ে চন্দননগর আক্রমণ করেন।

তারিখ	বছর	স্মরণীয় ঘটনা
	১৭৯৩	কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়।
	১৯২৬	চিত্তরঞ্জন সেবাসদন জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৯২৬ সালের ১৪এপ্রিল-এর অনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন।
		রবার্ট ক্লাইভ বক্সবর (৩০-১২-৫৬), কলকাতা (২-১-৫৭) ও ফলি (৯-১-৫৭)-র পর আজ চন্দননগর ফরাসিদের হাত থেকে অধিকার করেন।
	১৮২৩	ইংরেজরা জেরা করে ভারতীয়দের ঘরে ডুলির কাজ করিয়ে নিত। আইন করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হল।
	১৯৩১	ভগৎ সিং, সুখদেও ও রাজগুরুর ফাঁসি হল।
	১৯৪০	পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
	১৯০২	সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতিকে 'ভারতীয় অনুশীলন সমিতি' নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উদ্বোধন করেন।
	১৯৭৭	মোরারজি দেশাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসী (জনতা) সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।
	১৯৩৪	ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকৃত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্রোঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী।
	১৯৭১	পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম শুরু করলেন।
	১৯৮১	বাংলার নতুন দৈনিক প্রজাতন্ত্রী সংবাদপত্র 'আজকাল' প্রকাশিত হল। সম্পাদক : গৌরকিশোর ঘোষ।
২৬	১৭৭৪	ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হল স্যার ইলাইজা ইম্পে।
	১৯৪৮	পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বেআইনী ঘোষিত হল।
	১৯৭২	বাংলাদেশ আজ প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করে।
	১৯০২	কলকাতায় খিদিরপুরে প্রথম বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চলতে শুরু করে।
	১৯১৪	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাবকনাথ পালিতের জমিতে সায়েন্স কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
	১৯৭২	হাওড়া স্টেশনে যাতায়াতের সুবিধের জন্য সুড়ঙ্গ পথে লোক চলাচল শুরু করে।
	১৮২২	উর্দু ভাষার প্রথম ভারতীয় সংবাদ সাপ্তাহিক জাম-ই-জাহান-নুমা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন হরিহর দত্ত।
	১৯৪১	সুভাষচন্দ্র বসু ভারত থেকে বার্লিন পৌঁছন।
	১৮৪৯	পঞ্জাবের ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপিত হল।
	১৮৫৭	৩৪তম রেজিমেন্টের নম্বল পাণ্ডে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়।
	১৮৫৫	২৬টি ওয়াগনে ১৪৭ টন কয়লা সহ প্রথম কয়লার ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছয়।
	১৮৭০	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌহিত্র বসুমতী-সম্পাদক ও গ্রন্থকার সুরেশচন্দ্র সমাজপতি জন্মগ্রহণ করেন।
	১৭৪৪	কলকাতার ডাকঘরের জন্য প্রথম পোস্ট মাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হন।
	১৮৮২	৫০ জন গ্রাহক নিয়ে কলকাতায় টেলিফোনের সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ শুরু হয়।
	১৯৮২	শিয়ালদহ উড়ালপুলের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

❑ অসীম রায়

বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর

জন্ম : ২২ মার্চ, ১৮৮৯ মৃত্যু : ১১ নভেম্বর, ১৯২৩

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) জার্মানিতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিদেশ দপ্তরের সহযোগিতায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতৃবর্গের নিয়ে যে ইন্ডিয়ান কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ কর তাতে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। স্বাস্থ্যের জন্যে ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্তান পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। পরে বার্লিনে গিয়ে 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দায়িত্বভার নেন। কিন্তু পরে বাধা পেয়ে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। ১৯২৩ এর ১১ নভেম্বর হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

⊏ *অশোককুমার দিরি*

সবজি চাষের পরিকল্পনা

কিঞ্জিৎ মুন্সারী

ইংরাজিতে একটি কথা আছে, " No food is complete without vegetables." আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সবজির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা আজ আর বোধহয় কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

বিভিন্ন শাক-সবজির মধ্যে প্রায় সমস্ত রকমের খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ, লৌহ, প্রোটিন ইত্যাদি বিদ্যমান, যা শরীর ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে যাঁরা নিরামিষাশী, সবজি তাঁদের কাছে এক অমূল্য খাদ্যোপাদান। কিছু কিছু সাধারণ স্যালাড জাতীয় সবজি যেমন ধাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, লঙ্কা, টমাটো ইত্যাদি যেগুলো খুব সামান্য অথচ রোজই প্রয়োজন হয়, চেষ্টা করলে ঐসব গাছ দু-চারটি করে মাটিতে অথবা টবে লাগিয়ে রাখলে নিত্যকার প্রয়োজন মেটে।

এছাড়া সংসারের চাহিদা মেটাতে প্রত্যহ যে পরিমাণ শাক-সবজির দরকার হয়, তা নিজেদের বাড়ির আনাচে-কানাচে পড়ে থাকা খালি জমিতে আমরা অনায়াসেই নিজেরা তৈরি করে নিতে পারি। এতে যেমন টাটকা শাক-সবজির অভাব মেটে, তেমনি নিজেদের পরিশ্রমে তৈরি সবজি নিজেরা বাগান থেকে তুলতে পারলে অনাবিল আনন্দ লাভ করা যায়। আবার বাগান করা যাদের শখ, নিজের বাড়িতে বসে সবজি বাগান করলে শখও মেটে এবং রোজ সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে শরীর ও মন ভাল থাকে।

এজন্য দরকার [illegible] উপায়ে বারো মাস সবজি চাষের জন্য একটা ছক তৈরি করে নিয়ে কাজ শুরু করা। গৃহসংলগ্ন যার যতটুকু জমি সবজি চাষের জন্য পাওয়া যাবে, সেটুকুরই সবজি চাষের কাজে লাগানোর কথা ভাবতে হবে।

পরিকল্পনা করার সময় কয়েকটি বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন

(১) বাগানের জমি উঁচু ও মাটি দোআঁশ হলে ভাল হয়। জমিতে যেন পর্যাপ্ত রোদ ও হাওয়া পাওয়া যায়। নিকাশী ও সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) জমির উত্তর ও পশ্চিম দিকে কয়েকটি স্থায়ী সবজির গাছ, যেমন পেঁপে, কলা, পাতিলেবু, সজনে ইত্যাদি লাগানোর কথা ভাবতে হবে। ঐসব গাছ কখনও পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে লাগাবেন না, কারণ ঐ গাছগুলি বেড়ে উঠে অন্য ফসলে ছায়া ফেলবে।

(৩) লতানো সবজি লাগিয়ে বাগানের চারদিকের বেড়াকে কাজে লাগাতে হবে।

(৪) বিভিন্ন সবজি এমনভাবে লাগাতে হবে যেন কোন সময় জমি খালি পড়ে না থাকে। এক রকমের সবজি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাওয়ার আগেই দুই সারির মধ্যবর্তী জমিতে পরবর্তী ফসল লাগিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এতে সবজি প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(৫) সম্পূর্ণ জমিটিকে সমান কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে নিন কোন ফসলই একই খণ্ডে বারবার লাগাবেন না। অর্থাৎ ১নং খণ্ডের সবজি পরের বারে ২নং খণ্ডে এবং ২নং খণ্ডের সবজি পরের বার ৩নং খণ্ডে লাগাতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাগালে জমির উর্বরতা ও ফসলের স্বাস্থ্য দুইই ভাল থাকবে।

(৬) বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যবর্তী আইলে মূল জাতীয় সবজি লাগান

(৭) বাগানের যে অংশটিতে কলা, পেঁপে ইত্যাদি লাগানো হবে, সেখানে দুটি গাছের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাতে ওল, আদা, অনারস, টমেটো, ধনেপাতা ইত্যাদি লাগাতে পারেন। ঐগুলির জন্য অল্প ছায়াযুক্ত জায়গা হলেও ক্ষতি নেই।

(৮) বাগানের দুই কোণে দুটি কম্পোস্ট সারের গর্ত থাকা দরকার। বাড়ির দৈনন্দিন আনাজের খোসা, মরকুনা, কচি ডালপালা, ছাই কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে ঐ গর্তগুলি ধীরে ধীরে ভরে উঠবে পরে ঐ জৈব সার প্রয়োজন মত সবজি বাগানেই প্রয়োগ করা যাবে।

(৯) সার গর্তের উপরে মাচা তৈরি করে সীম, লঙ্কা, পুইশাক, লাউ ইত্যাদি লতানো সবজির চাষ করা যাবে। এতে সারের গর্তটি যেমন ছায়ায় থাকবে, গর্তের ছাউনিটিকেও কাজে লাগানো হবে

(১০) সবজির খণ্ডগুলি পাশের মাটি দিয়ে জমি থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে নিতে হবে। দুটি খণ্ডের মাঝখানে এক ফুট নালা বা ফাঁকা জায়গা থাকবে। তাতে বাগানে পরিচর্যার সুবিধা এবং বৃষ্টির সময় জল জমে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

(১১) যেসব সবজির চারা তোলে করে লাগাতে হয়, সেইসব সবজির বীজ মূল জমিতে চারা লাগানোর ৫০-৫৫ দিন আগে বীজতলায় বীজ বুনতে হবে।

নিচে সবজি চাষের একটি তালিকা দেওয়া হল, যা থেকে নিজেদের পছন্দমত সবজি চাষের একটি ছক চোখের সামনে রেখে কাজ করা যায়।

পরিচর্যা : সবজি বাগানের সাফল্য নির্ভর করে যথাযথ পরিচর্যার উপর। সবজি নাইই ছোট ও নরম প্রকৃতির গাছ, তাই সর্বদাই সাবধানে নিড়ানি দেওয়া, আগাছা তোলা, পুরানির মধ্যের মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় রাখা, সময়মত ও পরিমাণমত সেচ ও সার প্রয়োগ প্রয়োজনমত রোগ-পোকার ওষুধ স্প্রেটানো, এগুলিই বাগানের পরিচর্যার মধ্যে আসবে।

যেসব সবজি লাগানোর আগে বীজতলায় চারা তৈরি করতে হয়, সেখানে বাগানের একপাশে উঁচু করে বীজতলা তৈরি করা দরকার, যাতে বৃষ্টিতে জল না জমে কিংবা অধিক বৃষ্টির সময় কচি নরম চারাগুলোকে বাঁচাতে পলিথিনের ঢাকনার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বীজ বোনার পর বীজতলার চারদিকে ও শতাংশ অলড্রিন বা হেপ্টাক্লোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হবে, উইপোকা, কাটুই পোকা ইত্যাদিকে দূরে রাখতে হবে।

মূল জমিতে চারা লাগানোর অন্তত ১০ দিন আগে জমির মাটি ভাল করে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে আঠারোটি প্রায় ১০০ কেজি কম্পোস্ট বা অন্যান্য জৈব সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে রাখতে হবে, যাতে বাগানের মাটি ঝোলুরে ভালভাবে শুকিয়ে যায়।

সঠিক সময়ে সেচ দেওয়া বিশেষ দরকার। একবার সেচ প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ মাটি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই পুনরায় হাল্কা সেচ প্রয়োগ করতে হবে। মূল জাতীয় ফসলে বেশি সেচ দিলে শুধু পাতা ও গাছের বৃদ্ধি বেশি হয়, মূলের বৃদ্ধি কম হয়, এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

সবজি	ভাল জাত	কখন লাগাবেন	বীজের পরিমাণ (প্রতি কাঠা)	কতটা দূরত্বে	কিভাবে লাগাবেন
বেগুন	মুক্তকেশী, পুসা পার্পল, ব্লাক বিউটি	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র-কার্তিক	৪ গ্রাম	সারি-সারি ২½ ফুট গাছ-গাছ ২ ফুট	চারা রোপণ
ঢেঁড়স	পুসা শাওনী, মখমলী, সাতশিরা	মাঘ-ফাল্গুন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১০০ গ্রাম	১½ × ১ফুট	সরাসরি বীজ বপন
লাউ	প্রলিফিক, পুসা সমর মঞ্জরী	ফাল্গুন-আষাঢ়	৩৫ গ্রাম	৬ × ৬ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
কুমড়া	অর্কচন্দন, চৈতালী, বর্ষাতি	ফাল্গুন-আষাঢ়	৩৫ গ্রাম	৬ × ৬ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
ঝিঙ্গে	পুসা নসধব, সতপুতিয়া	ফাল্গুন-আষাঢ়	৩৫ গ্রাম	৪ × ৪ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
করলা	কোয়েম্বাটর, মৌসুমী	ফাল্গুন-আষাঢ়	৩৫ গ্রাম	৬ × ৫ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
ফুলকপি	পাটনাই, স্নোবল, কেনারস, দালিয়া	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	৪ গ্রাম	১½ × ১½ ফুট	চারা রোপণ
বাঁধাকপি	প্রাইড অফ্ ইণ্ডিয়া, গ্রামফ্রেন্ড	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	৪ গ্রাম	২ × ২ ফুট	চারা রোপণ
মূলো	পুসা চেতকি, জাপানি সাদা, রকটাই রেড	অক্টোবর-অগ্রহায়ণ	৮৫ গ্রাম	১ ফুট × ৫ ইঞ্চি	সরাসরি বীজ বপন
গাজর	পুসা কেশর, তোরদেস	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	৪০ গ্রাম	১ ফুট × ৪ ইঞ্চি	চারা রোপণ
বীট	ডেট্রয়েড, ক্রীমসেন গ্লোব	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	৪০ গ্রাম	১ ফুট × ৪ ইঞ্চি	চারা রোপণ
শালগম	পুসা কাঞ্চন, স্নোবল	আশ্বিন-অগ্রহায়ণ	৪০ গ্রাম	১ ফুট× ৬ ইঞ্চি	চারা রোপণ
টমাটো	পুসা রুবি, আর্লি ডোয়ার্ফ, হাইব্রিড (নবীন)	ভাদ্র-কার্তিক	৪ গ্রাম	২½ × ২ ফুট	চারা রোপণ
পালং	অলগ্রীন, বারমুডিস জায়েন্ট	আশ্বিন-মাঘ	৩৩৫ গ্রাম	৬ × ৬ ইঞ্চি	সরাসরি বীজ বপন
লঙ্কা	সূর্যমুখী, এল-সি-৪১, এল সি-৪৬ এ	আশ্বিন-অগ্রহায়ণে	১২ গ্রাম	১½ × ১ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
বরবটি	পুসা ফাল্গুনি, পুসা বর্ষাতি	আষাঢ়-মাঘ	১২৫ গ্রাম	২ × ১ ফুট	সরাসরি বীজ বপন
পেঁয়াজ	পুসা রেড, পাটনাই	কার্তিক-পৌষ	৪০ গ্রাম	৬ × ৪ ইঞ্চি	চারা রোপণ

বিভিন্ন সবজির জন্য সার প্রয়োগের পরিমাণের তারতম্য থাকে। মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রতি কাঠায় ২.২ কেজি ইউরিয়া, ৩ কেজি মুপার ফসফেট এবং ১০০ গ্রাম মিউরিট অফ পটাশ অথবা ২ কেজি ইকোজ এম পি কে ১০:২৬:২৬ এবং ১.২৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগপোকার আক্রমণ থেকে সবজি ফসল বাঁচাতে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ডাইথেন-এম ৪৫ অথবা ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন এবং পোকার জন্য প্রতি লিটার জলে ২ মিলি নুভাক্রন অথবা ম্যালাথিয়ন স্প্রে করা যেতে পারে। প্রয়োজন ছাড়া ওষুধপত্র স্প্রে না করাই ভাল। বাগানের চারদিকের পরিচ্ছন্নতা রোগ-পোকার আক্রমণ কমিয়ে রাখে।

সবজি ফসলে ওষুধ প্রয়োগ করার আগে প্রয়োজনমত সবজি তুলে নেওয়া এবং ওষুধ প্রয়োগের ৫-৬ দিন পরে পুনরায় সবজি তোলা উচিত। ❑

সমবায় সম্বন্ধে জানতে হলে

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের একমাত্র মাসিক পত্রিকা

ভাণ্ডার পড়ুন

* সমবায় নীতি, আদর্শ এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচারে * দেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে
* জনমানসে আর্জিত কৃষি ও বিজ্ঞানমুখী চেতনা সৃষ্টি করতে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত

ভাণ্ডার সর্বদা সচেষ্ট

সমবায়মূলক প্রবন্ধ, সফল সমবায়ের কাহিনী, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, চাষবাস, গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিষয়ক রচনা, সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর সংশোধন, সমবায় বিভাগীয় সার্কুলার এবং সমবায় নিবন্ধকের নির্দেশ, ইস্যুহোর, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এবং শারদীয় সংখ্যায় জীবনমুখী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ইত্যাদি ভাণ্ডারে ছাপা হয়।

হাইব্রিড ধানবীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ শিবির

এখন সবকিছুতেই হাইব্রিড। হাইব্রিড যুগ চলছে। হাইব্রিড গুরু, খরগোশ, ছাগল, কফি, বেগুন, ঢেঁড়স, মুলো, লঙ্কা। উৎপাদনের হাইব্রিডে নেশিন। অধিক ফলন কম সময়ে পাওয়ার হাইব্রিড কম্পিউটার। মানুষ উৎপাদনের হাইব্রিড চাই নাকি। নিশ্চয়ই। তবে সংখ্যায় নয়, গুণে। কারণ দিনে দিনে এটাই বেড়ে যাচ্ছে। আর দরকার হাইব্রিড ধান। কারণ আজও এটা চালু করা যায়নি মাঠে মাঠে। তা যাতে করা যায় সেজন্য একটি ৬ দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন হালিশহর ব্লকের দিশারী ইউনিয়ন এল/এস পি সি এ সি সি লিঃ-এ গত ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শিবিরের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী নরেন দে বলেন, ২০০২ সালের মধ্যে যদি খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব না আনা যায় তবে বিশ্বের একটা বড় অংশে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে। এর প্রতিরোধে বিজ্ঞানী ও কৃষকদের একযোগে সচেষ্ট হয়ে উচ্চফলনশীল ধানবীজ সৃষ্টির কাজে নেমে পড়তে হবে। বিশিষ্ট বক্তা ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ডি এস কালোরে, সচিব, কৃষিবিভাগ ; নিত্যানন্দ ত্রিবেদী, কৃষি অধিকর্তা ; অধ্যাপক এম পি বান্দার্জি, প্রাক্তন ডিন এগ্রিল ফ্যাকাল্টি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রভাত সরকার, চুঁচুড়া নগর পঞ্চায়েত সমিতি ; নিত্যি চ্যাটার্জি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রাজ্য বীজ নিগম ; ডাঃ গুরুদেবের চ্যাটার্জি, জেনারেল ম্যানেজার, রাজ্য বীজ নিগম ; ডাঃ শিবনারায়ণ সেন, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (চাল উন্নয়ন) অসীমকুমার মিনহা, মুখ্য কৃষি আধিকারিক, হুগলি ; রুনুচন্দ্র দত্ত, মহকুমা কৃষি আধিকারিক; বিদ্যুৎ বিশ্বাস, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কৃষি বিশেষজ্ঞগণ।

বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে বলেন যে, ধানে হাইব্রিড গবেষণা ৫০ বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু গবেষণা পরীক্ষাগার থেকে মাঠে আনা যায়নি। এনেও সাফল্য পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৯৫ থেকে জেলার আদিসপ্তগ্রাম ও দিশারী এলাকায় বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর গবেষণার পর। প্রজননের ক্ষেত্রে নাথান আছে যেমন ফল, বাতাস, পতঙ্গ। এদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা চলছে। ধানেও আইস ও আমনের সংকর সৃষ্টি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে চুঁচুঁড়া থেকে প্রথম স্থানে তুলতে হবে বলে উৎসাহদেন। প্রশিক্ষণে সহযোগিতা দেন চাউল গবেষণা অধিকার (ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্ষদের) হাইব্রোজেন ও কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দুটি কৃষক সংস্থা ডঃ বিনয়েন্দু ঘোষ দুটি কৃষক সঙ্ঘ ও নেতাজি কৃষক সঙ্ঘের থেকে ১৫০ জন তরুণ কৃষক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নেন। সমাপ্তি ভাষণে সমিতির সভাপতি নিরীশ ঘোষ স্বাগতসূচক বক্তব্যে বলেন ১৫টি গ্রামের লোক নিয়ে গঠিত এই সমিতি এলাকার মাতব্বরের মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চিন্তা, বিজ্ঞানীদের কর্মস্থল, ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের উদ্যোগ এখানে চারটি কৃষক ক্লাব আছে যার একটি বোর্ডের পুরস্কার এনেছে। আমরা বিভিন্ন গ্রামে হাইব্রিড চর্চা ছড়িয়ে দিতে চাই।

সেকো-র রাজ্য সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের সমবায় সমিতিসমূহের রাজ্য সংগঠন সেকো-র পঞ্চম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর কলিকাতা রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে দ্বিতীয় ও শেষ দিনে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে স্বনিযুক্তি কর্মসূচি রূপায়ণে ভারতের সমবায়ের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ এই সভাপতিত্বে এই আলোচনাচক্রে পৌর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, সমবায়ের সাফল্য এই ক্ষেত্রে। সারা পৃথিবীময় নির্মাণ গতি প্রচণ্ড বাড়ছে। কিন্তু মানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাহীন লোকের আনাগোনা হচ্ছে। সমিতিগুলির ক্ষেত্রে মুনাফাগত অভিযোগ নেই। আগামী দিনে সুযোগ প্রচুর। প্রতিযোগিতার লড়াই করতে হবে। দেশীয় প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে চাই। আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করলে অনেক সমস্যা দূর করা যাবে। প্রত্যেক সদস্য বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ না হলেও এদের অনেক কিছু করার যা কোন অংশে কম নয়।

হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বলাই সাহুই এ-ধরনের সেমিনার আরও নীচু স্তরে করার উপর জোর দেন। সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে তাঁর এলাকার প্রশাসনিক সাক্ষাৎকার কথা সভাকে জানান। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, ইউনিয়নের সমিতিগুলি যাতো ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করছে। সভাপতির ভাষণে সুনীল ঘোষ প্রশাসনিক সংস্কারে সরকারি স্তরে হওয়া বেশকয়টি মহলের প্রয়াসের কথা বলেন। তাছাড়া ইউনিয়নে পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে আগামী নির্বাচনের পর একটি বিশেষজ্ঞ কনভেনশনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান তিনি বলেন, কেন্দ্রে সমবায়কে অবহেলা করার যে প্রতিযোগিতা চলছিল মন্ত্রিসভার পতনে তা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি জানান বিভিন্ন উন্নয়ণ খাতে বকেয়া কেন্দ্রীয় টাকা আদায়ে তিনি সমবায় মন্ত্রীদের কাছে দাবি জানিয়ে তিনি সমবায় মন্ত্রীদের কাছে কম্পিউটার প্রবর্তনের পরামর্শ দেন যাতে তাঁরা দেশ জোড়া সমবায় সম্পর্কিত নথিপত্র রাখতে পারেন। পরবর্তী কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন দীপক ঘোষ ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে

[ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট এক্সটেনশন অফিসারদের ক্লেত্রে সোসাইটির বক্তব্যটুকু]

খুব গরিব হয়েও মনের দুঃখে এমন প্রার্থনা শোনা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। একটা সময় ছিল সাত পদের অভাব হলেও সন্তানের দুধেভাতের জোগান দেওয়া মানুষের চাহিদা বলে গণ্য হত।

৬৪/৬৯ বেলগাছিয়া রোডের সেন্ট্রাল ডেয়ারিতে অবশ্য তাদের নয়, গুদুমের দুধের জোগান দেওয়া হয়। একেবারে নিজস্ব

নিয়মে। দিনে-রাতে মিলিয়ে শিফটিং ডিউটি, শনি, রবি, ছুটি ছাটা জ্যাম, বন্ধ, ধাই হোক না কেন দুধের গাড়ি তৈরি এলাকায় এলাকায় তাদের পাতে দুধের ব্যবস্থা করতে। শিশু বৃদ্ধ রোগী, সকলেই দুধের অপেক্ষায়, প্রস্তুতি তাই সারা রাতের। না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না কর্মকাণ্ডটা কত বিশাল আর কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

একাজে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন অফিস ও সেন্ট্রাল ডেয়ারি মিলিয়ে, এই কর্মচারী কল্যাণ সমবায়ের সদস্য। দিনে দিনে তাঁরা ঋণনির্ভরতার আগিয়ে নিজেদের সংগঠনকে শক্তপোক্ত করে গড়ে তুলেছেন, আর পায়ে পায়ে একদিন রজত জয়ন্তী বর্ষে পা দিয়েছেন, অতিক্রমও করেছেন বহু অকাঙ্খা সেই মিলটি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত এই সমবায়ের উৎসব অনুষ্ঠান বা আনোদ আহ্লাদ করা সহজ নয়। সারি দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে সময়মত দুধ নিয়ে নানা জায়গায় ছুটতে সময়মত সবকিছুর অভ্যাসত থাকতে

এরই ফাঁকে সবাই মিলে অনুষ্ঠান সূচনা করেছেন: পতিপটি প্রদীপ জ্বেলে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেছেন সমিতির সভাপতি প্রভাংশু ঠাকুর।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মইনুল হাসান থেকে শুরু করে প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, তাছাড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বর্তমান ও প্রাক্তন, পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চলীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট সোসাইটিস ফেডারেশনের চঞ্চল চ্যাটার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট সমবায় নেতা ও ব্যক্তিত্বের সমাবেশে রজতজয়ন্তী উৎসবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়।

সভান্তে লোকরঞ্জন শাখা পরিবেশিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান সকলের প্রশংসা অর্জন করে নেয়।

এই উপলক্ষে সমিতির প্রকাশিত বিবরণ থেকে কিছু তথ্য উল্লেখের দাবি রাখে

অনেক সময় ধৈর্য সহকারে সামাজিক দায় বহনের সামাজিক আকাঙ্খা থেকেই এই সমিতি সম্প্রতি রজতজয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করেছে। আমরা সমবায়ের ও সমিতির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
সদস্য সংখ্যা	২৮৫৮	২৮৮১	২৯০১	২৯১২	২৮৪৫
অনুমোদিত মূলধন	৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০০	১০০,০০,০০০	১০০,০০,০০০	১০০,০০০
অবশোধ মূলধন	৪৭,৯৯,২৬০	৫৮,৪৯,৪২০	৬৩,৫৬,৫৫০	৬৬,৭১,৭৬০	৬৭,১৬,২৪০
নিট লাভ	৩,৮৪,৩০৩	৪,৮৫,৪৩০	৫,৬২,৮৩৪	৮,৩১,৮০২	৭,৯১,৩৭৪.৬৩
কর্মচারি কল্যাণ তহবিল	৭,০০০	৯,০০০	১২,০০০	১৫,০০০	১৮,০০০
সদস্য কল্যাণ তহবিল	১০,০০০	১২,০০০	২২,০০০	৪২,০০০	৬২,০০০

❑ দীপালি ঘোষ

ভারতবর্ষ কোন দিকে ?

ভদুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল।
বলিলাম — ভদুমতী, কখনও কোন শহর দেখেছ?
— না বাবুজি।
— দু-একটা শহরের নাম বল তো?
— গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।
— কলকাতার নাম শোননি?
— হু বাবুজি।
— কোন্ দিকে জান?
— কি জানি বাবুজি।
— আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?
— আমরা গয়া জেলায় বাস করি।
— ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?
ভদুমতী মাথা নাড়াইয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্রবকিটোলা ছাড়িয়া।
ভারতবর্ষ কোন দিকে?

আরণ্যক : বিভূতিভূষণ

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায়ভিত্তি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** **&** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses. Spices Groceries. Sugar. Salt. Edible Oils. Baby Food. Provisions. Cosmetics. Stationeries. Exercise Books. HMT Watches. Pressure Cookers.Crockeries. Stainless Steel Utensils. Soaps & Detergents. Shoes. Travelling Kits. Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A. HAZRA ROAD. CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Business of

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit 64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

বি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪৯৩১/৩৩৪-৩৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বিমা প্রকল্প ◆ মফস্বলে মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ফিসারমেন কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এফ সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এফ সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, ফেডারেশন বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
53-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ March -98 ■ Vol XXXVI ■ Postal Regd. No WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* *বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।*
* *৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।*
* *ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।*
* *মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।*
* *সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।*

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর

সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম রায় কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অচিলো), কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং আরডি প্রিন্টার্স, ১৮০, সি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

এপ্রিল ১৯৯৮

এই সংখ্যায় লিখেছেন —

সমবায় হিমঘর * শম্ভুনাথ বসু

প্রসঙ্গ : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন * ধনঞ্জয় মিত্র

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ইতিকথা * অরুণোদয় সরকার

ও

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :

ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আয়ন্তু সর্বত স্বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শৃন্বন্তু বিশ্বে : শুনুক বিশ্বের লোক।
বেদাহম্ : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

এপ্রিল ১৯৯৮

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		৩
সমবায় হিমঘর	: শম্ভুনাথ বসু	৫
প্রসঙ্গ : পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন	: ধনঞ্জয় মিত্র	১১
বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ইতিকথা	: অরুণোদয় সরকার	১৫
স্বাগতম ১৯৯৮-৯৯ সমবায় বর্ষ	: বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	২৩
আওয়েনের অর্থনীতি	: ভোলানাথ দত্ত	২৫
সমবায় সমাচার	:	২৯

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	:	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	:	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	:	সদস্য
সুভাষ রাহা	:	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	:	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	:	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	:	সম্পাদক

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

একটি সংবাদ

সম্প্রতি সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি একটি টেলিফোন সংযোগ নিয়েছে।

টেলিফোন নং ২২১-৯৮৮১

এই নম্বরে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি-র সভাপতি, সম্পাদক, সমবায় শিক্ষা তহবিল আধিকারিক ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ভাণ্ডার

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস্ (সেন্ট্রাল) রুলস্ ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে

প্রকাশস্থান	: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন, ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা-১
প্রকাশকাল	: মাসিক
প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম	: অসীম রায়
নাগরিকত্ব	: ভারতীয়
ঠিকানা	: ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা-১
সম্পাদকের নাম	: বিনয়গোপাল মিত্র
নাগরিকত্ব	: ভারতীয়
ঠিকানা	: ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা-১
যেসব ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং অংশীদার	: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
অথবা যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি	(পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)
শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা	২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল, কলিকাতা-১

আমি, অসীম রায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

অসীম রায়
প্রকাশক

২৫ মার্চ, ১৯৯৮

একটি আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সদস্য-শুল্কের চাঁদার হার অতি অল্প। এছাড়া সদস্য সংখ্যাও সন্তোষজনক নয়-কমই বলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই সদস্য-চাঁদা সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব আয় যৎসামান্য। অথচ এই নিজস্ব আয় থেকে বিভিন্ন খরচের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যেমন : গত এপ্রিল '৯৭ থেকে সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলিতে সমবায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রমে যোগদানকারীদের প্রতি মাসে অতিরিক্ত ১০০ টাকা মাসিক ভাতা (স্টাইপেণ্ড) প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে বিষয়টি ইতিপূর্বে বহুবার বহু মঞ্চে আলোচিত হয়েছে। সদস্যপদের চাঁদার হার নির্ধারিত হয় প্রায় এক যুগ আগে ১৯৮৭ সালের পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীতে। বর্তমান পরিস্থিতিতে চাঁদার ঐ হার অবিলম্বে বাড়ানো দরকার। চাঁদার ঐ হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের (১৯৮৭) প্রয়োজনীয় সংশোধন করার অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক মহাশয়কে ইতিমধ্যে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন-সংশোধনের বিষয়টি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের গত ১০-২-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সদস্যবৃন্দকে বৈশাখ ১-৪-৯৮ তারিখে থেকে প্রস্তাবিত বর্দ্ধিত হারে চাঁদা প্রদান করার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ অন্যান্য বারের মত এবারেও এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করতে তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন। এই প্রসঙ্গে সদস্য সমিতিগুলির ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত বকেয়া চাঁদা, যদি কিছু থাকে, অবিলম্বে জমা দেওয়ার জন্যও আবেদন জানানো হচ্ছে।

১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে বেজ্যায় প্রস্তাবিত বর্দ্ধিত হারে সদস্যপদের চাঁদা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই মাননীয় সদস্যবৃন্দকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং প্রস্তাবিত চাঁদার হারও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁদের আরও কিছু জানার থাকলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুশীলকুমার ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

সম্পাদকীয়

তারপর যে কী হ'ল ! কাজটা শুরু হয়েছিল ভালই কিন্তু কিছুতেই যেন টানা গেল না, দানা বাঁধল না, ভাবনাটা অপরিণত থেকে গেল। আজ গ্রামের মানুষের কাছে উন্নয়নের দিকগুলি খুব স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। কৃষির পরেও যে জীবনের একটা বৃহৎ চাহিদা আজ সচেতনভাবে তাদের মনে ক্রিয়াশীল তা বেশ মালুম হয় তাদের সাথে একটু আলোচনায় বসলে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে গ্রামে যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ও অস্বস্তির অবস্থা মানুষের মনে সব সময়ই কাজ করছে তা সকলেরই জানা। স্বাস্থ্য সমবায়ের কথা নতুন করে শোনা যাচ্ছে। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা এই ভাবনাটি রূপায়ণের জন্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। স্বাস্থ্য সমবায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠলে ভালই। যেখানে স্বাস্থ্য সমবায়ের কাজ শুরু করতে সময় লাগবে সেখানে প্রাথমিক সমবায় সমিতিতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা আও প্রয়োজন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে গ্রামের দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল। শ্রীনিকেতনে শুরু হয়েছিল কর্মযজ্ঞ। অনেক স্বাস্থ্য সমবায় গড়ে উঠেছিল, সফলভাবে কাজও করেছিল অনেকদিন। তারপর ! তারপর আমরা আর টানতে পারিনি, ভাবনাটা আমাদের মধ্যে দানা বাঁধেনি। নির্দিষ্টহারে বার্ষিক চাঁদা এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে যৎসামান্য ফি দিয়ে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়ার মাধ্যমে সমস্ত সভ্যকে একত্রিত করে স্বাস্থ্য সমবায় গড়ে উঠেছিল। পদ্ধা পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করে সময়োপযোগী ব্যবস্থা নিয়ে আমরা সুস্বাস্থ্যের আয়োজনে অংশ নিতে পারি। উদ্যোগটা সরকারি হবে এ-আশায় দিন গুণলে ভাবনাটা অঙ্কুরেই বিনাশ হবে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ছিল এত গভীর যে তিনি এই বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে আসার জন্য প্রখ্যাত কর্মী কালিমোহন ঘোষ-কে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে আমরা আরও একবার ভেবে দেখতে পারি।

সেই গ্রাম আজও আছে
এবং সংস্কৃতি মেখে। যে
পাড় না ধরে
হাতে শাখা আছে,
সীঁথে সিঁদুর আছে
আছে পিঠে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
প্লট ডি ডি নং ১১/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

সমবায় হিমঘর

শঙ্খনাথ বসু

অবিভক্ত ভারতের প্রথম হিমঘরটি ১৮৯২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিশের দশকেও খুব একটা বেশি হিমঘর ছিল না। স্বাধীনতার পর থেকে হিমঘরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবু ১৯৪৫ সাল নাগাদ মাত্র ৮৩টি হিমঘর ছিল যাদের কাঠামোগত সম্পত্তি ছিল ৪২,৯৬৫ মেট্রিক টন। আস্তে আস্তে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে থাকল। বিশেষ করে আলুর চাষে বিস্তৃতি ঘটায় হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা খুব বেড়ে গেল। এই বৃদ্ধির সাথে সম্পত্তি রাখতে ভারতের মোট হিমঘরের সংখ্যাও বেড়ে এখন হয়েছে ৩২৫৩টি। সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোগত সম্পত্তি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন। এদের অধিকাংশ রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশে। ভারতের ১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এখন আলুর ফলন হয় ১৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানত আলু রাখার জন্যেই ভারতের হিমঘর গড়ে উঠেছে। তাদের প্রসারিত পরিষেবা সম্ভবহারের ক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন কৃষিপণ্যের শতকরা ভূমিকা নিম্নরূপ :

পণ্য	লক্ষ মেট্রিক টন
আলু	৮৭.৭৬
বিভিন্ন উদ্দেশ্যে	৮.৫৬
ফল ও শাক সব্জি	১.৯৮
মাছ ও সামুদ্রিক পণ্যাদি	০.৭৫
অন্যান্য সামগ্রী	০.৯৫
	১০০.০০

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯২-৯৭) পরিকল্পনাকালে ভারত সরকারের গঠিত স্টেয়রেজ ও ওয়ার হাউজিং সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বক্তব্য ছিল যে প্রয়োজনের তুলনায় হিমঘরের প্রসারিত পরিষেবা খুবই কম। তাই অবিলম্বে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে যার শতকরা ২০ ভাগের সম্প্রসারণ হবে সমবায় ক্ষেত্রে। নবম পঞ্চবার্ষিকী (১৯৯৭-০২) পরিকল্পনাকালে কৃষিপণ্য-শাক সব্জি ও ফল পুষ্পাদির বর্ধিত জীবনদান ও বিপণনকাল সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আগ্রহী। সমবায় আন্দোলনের সৃষ্ট হিমঘর সম্প্রসারণের কৃতিত্ব কিন্তু ভারত সরকারের জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের। এই সংস্থার প্রসাবিত তারিগরী ও আর্থিক সহায়তার সুবাদে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি উপকৃত হয়েছেন। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছর পর্যন্ত এন সি ডি সি সারা ভারতে সমবায় হিমঘর নির্মাণে ৭৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার সহায়তা দিয়েছে। হিমঘর নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ও ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রকরণ মন্ত্রক ও জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের সহযোগে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেছেন।

সমবায় হিমঘরের সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। প্রথমে উত্তরপ্রদেশ আর তৃতীয় স্থানে আছে বিহার। ১৯৯২ সালের ৩১ মার্চ নাগাদ ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের অধীন কৃষি ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে অঙ্কের যে বিবরণ দেওয়া আছে তা নিম্নরূপ :

রাজ্যের নাম	সমবায় হিমঘর সংখ্যা	কার্যকর সম্পত্তি লক্ষ টন
উত্তরপ্রদেশ		
পশ্চিমবঙ্গ		
বিহার		
সারা ভারত		

১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি সমবায় সমিতির ৪৬টি হিমঘরের মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা ১ লক্ষ ৮১ হাজার মেট্রিক টন। সংরক্ষিত হয়েছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ধারণ ক্ষমতার প্রায় শতকরা ৯২ ভাগ। জেলাওয়ারী হিসাবে বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সমবায় হিমঘর আছে, মোট ১২টি। দ্বিতীয় স্থান হুগলির, সেখানে আছে ৮টি। আর তৃতীয় স্থানাধিকারী বীরভূমে আছে ৪টি সমবায় হিমঘর। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় হিমঘরগুলির ধারণ ক্ষমতা সর্বত্র একরকম নয়। সাধারণত ৩ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১১ হাজার মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতার সমবায় হিমঘর এরাজ্যে আছে। ভারতের মোট সমবায় হিমঘরের সংরক্ষণ ক্ষমতার এক-চতুর্থাংশ মত পশ্চিমবঙ্গের সমবায় হিমঘরের রয়েছে। কিন্তু সদ্ব্যবহারের শতকরা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার ওপরে। গত ৬ বছর ধরে সংরক্ষণ ক্ষমতার ৮৪ শতাংশেই গড়ে সদ্ব্যবহার হয়েছে। রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় হলেও রাজ্যের সব রকম হিমঘরের মোট ধারণ ক্ষমতার মাত্র শতকরা ৮ ভাগ সমবায় হিমঘরের হাতে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় হিমঘরের সার্বিক অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়। এদের অধিকাংশই লোকসানে চলে। সমস্যাও তাদের অনেক। দূর থেকে দেখলে সমস্যাকে খুব বড় দেখায়। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে সমস্যার সামনা-সামনি বসলে তার তীব্রতা অনেকটাই কমে যায়। আর সমাধান সূত্রও বেরিয়ে আসে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় অধিকার-এর বিপণন শাখা কেন কিছু প্রত্যয়ী পদক্ষেপ নিয়েছে। সমবায় হিমঘর সংক্রান্ত দুটি প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কর্মশালা কল্যাণীর রিফ্রিজারেশন ইন্সটিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। একটি হয়েছে ১৯৯৭ সালের ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি আর দ্বিতীয়টি পরিচালিত হয়েছে এই বছরেই (১৯৯৮) ১৪ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন বিভাগীয় আধিকারিক, বিভিন্ন সমবায়

হিমঘরের কর্মাধ্যক্ষ-কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ। দুটি কর্মশালারই বিষয়বস্তু ছিল তিনটি, যেমন (১) সমবায় হিমঘরের প্রতিটি ফলনাতে যন্ত্রাদির কার্যকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিবায় নিয়ন্ত্রণ, (২) বহুমুখী কর্ম সম্প্রসারণ কৌশলের মাধ্যমে সমবায় হিমঘরের স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং (৩) সমবায় হিমঘরে সমস্যা ও সমাধানের উপায়। তিনটি আলোচনা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করে ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৭) ও ১৬ জানুয়ারি (১৯৯৮) অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন গঠনমূলক সুপারিশ রাখেন। গোষ্ঠী ভিত্তিক সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্মশালার অন্তিম দিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়। সেগুলি সার্বিক অবগতি ও আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উত্থাপন করা হল।

বিষয়-১ "সমবায় হিমঘরের প্রতিটি ফলনাতে যন্ত্রাদির কার্যকরণ ও রক্ষণা-বেক্ষণের পরিবায় নিয়ন্ত্রণ":-

(১) হিমঘরের হিমায়নের জন্যে ডিফিউসার ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যাঙ্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এতে বিদ্যুতের পরিবায় অনেক কমে যাবে। তাতে লাভের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। তবে ডিফিউসার পদ্ধতি অনুসরণ করেও লাভ করেছে এমন সমবায় যেমন আছে তেমনি ব্যাঙ্কার ব্যবস্থা রূপায়িত করে লোকসানে চলা সমবায় হিমঘরের নজিরও আছে। কাজেই পদ্ধতি পরিবর্তন করার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের ৪৬টি সমবায় হিমঘরে মধ্যে যে ২২টি সমবায় হিমঘরে এখনও ব্যাঙ্কার পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই সেখানে ব্যাঙ্কার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে সমস্ত অন্তরায় দূর করতে হবে।

(২) হিমঘরের তাপমাত্রাকে যুক্তিসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। তাপমাত্রা কম-বেশি হলে পণ্য সামগ্রীর যেমন ক্ষতি হয় তেমনি বেশি তাপমাত্রায় অপব্যবহারে খরচও বেশি হয়। তাই সঠিক তাপমাত্রা পরীক্ষা করার জন্যে ড্রাই অ্যাণ্ড ওয়েট বাল্ব থার্মোমিটার ব্যবহার করা উচিত।

(৩) বিদ্যুৎ চলে গেলে জেনারেটর চালিয়ে হিমঘরের সব ঘর ঠাণ্ডা রাখতে হয়। খরচ কমাতে ডিজেল চালিত জেনারেটরের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ডিজেল জেনারেটরের খরচের টাকা তর্তুকির আকারে সরকারকে বংসরান্তে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যুৎ খরচের ওপর সরকারি তর্তুকির ব্যবস্থা বা সমবায় হিমঘরগুলিকে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন করতে হবে।

(৪) দক্ষ কারিগর দিয়ে প্রতিনিয়ত হিমঘরের মেশিনারি, ওয়্যারিং, ইনসুলেশন, ঠাণ্ডা করার যন্ত্রাদির পরীক্ষা করতে হবে। যদি দক্ষ কর্মচারি সমিতির না থাকে তাহলে বাইরের কোন দক্ষ ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(৫) জনসাধারণের মঙ্গলের স্বার্থে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমবায় হিমঘরে সঠিক ভোলটেজে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৬) সমবায় হিমঘরে সস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাব্য পথ বের করা দরকার। ডিজেলে তর্তুকির মত বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও তর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া সমবায় হিমঘরের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সাবচার্জ প্রথা তুলে দিতে হবে।

(৭) সমবায় হিমঘরের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যে সমস্ত কর্মি নিযুক্ত থাকেন তাদের নামি প্রশিক্ষণ সংস্থায় নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৮) হিমঘরের জন্যে আয়োজিত প্রতিটি কর্মশালায় সমবায় দপ্তর ছাড়াও শক্তি দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের কারিগরী সহায়তা, পথ নির্দেশ ও পরিষেবা পেতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

(৯) হিমঘর সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে করতে হবে। তার যাবতীয় খরচ খরচা রাজ্য সরকার ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে বহন করতে হবে।

(১০) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কে একজন রেফ্রিজারেশন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করতে হবে যাতে এই ব্যাঙ্ক তার সাহায্য পুষ্ট হিমঘরের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করতে পারে। এছাড়া এই ব্যাঙ্কের ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সংশ্লিষ্ট হিমঘরের নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

(১১) হিমঘর পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের ঘুচরা যন্ত্রপাতি মাঝে মধ্যে কিনতে হয়। ন্যায্য দামে সঠিক মান ও গুণ সম্পন্ন অনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বিক্রয়কারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা যাতে রাজ্য সরকার সব সমবায় হিমঘরে জানান তার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিক্ষেত্রে টেণ্ডার ডাকা-কোটেশন্ নেওয়ার সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়াটা এতে এড়ানো যায়।

(১২) বিমার যে অংশ সমবায় হিমঘর আদায় করতে পারে না অথচ হিমঘরকে নির্দিষ্ট মেয়াদে দিয়ে যেতে হয় (যেমন প্ল্যান্ট, মেশিনারি, বিল্ডিং প্রভৃতি বাবদ প্রিমিয়ামের ব্যয়) তা সরকারকে তর্তুকি হিসাবে দিয়ে যেতে হবে।

(১৩) সমবায় হিমঘরের সম্পত্তি ও তার সদ্ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের একটি স্বীকৃত মাপকাঠি স্থির করতে হবে। এ বিষয়ে আসল লক্ষ্য হবে যাতে সমবায় হিমঘরের আর্থিক সামর্থের অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ না হয়। স্বয়ম্ভরতা অর্জনের অন্তিম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই মাপকাঠির সর্বাদি কঠোরভাবে রূপায়িত করতে হবে। স্বয়ম্ভরতার আবশ্যিক পূর্বশর্ত যে পরিবায় নিয়ন্ত্রণ তা সব সময়েই খেয়াল রাখতে হবে।

বিষয়-২ : "বহুমুখী কর্ম সম্প্রসারণ কৌশলের মাধ্যমে সমবায় হিমঘরের স্বয়ম্ভরতা অর্জন":—

(১) সমবায় হিমঘর ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ নেয় তার সুদ কম হওয়াই দরকার। আবার ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল ও সুদ সমহারে (৫০:৫০) জমা নেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। পরিশোধের সব টাকাটাই শুধু সুদে উশুল করার মহাজনী মানসিকতা জনস্বার্থেই ত্যাগ করার সময় হয়েছে।

(২) একটি হিমঘর সমিতি নিবন্ধনের পর আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার মারফৎ জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের (এন-সি-ডি-সি) কাছ থেকে পর্যায়ক্রমে টাকা পেতে শুরু করে। নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হতে প্রায় ৫/৬ বছর কেটে যায়। ঐ সময় সুদ গুণতে হয় ব্যবসা শুরু না করেই। আবার ব্যবসা শুরুর পর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপযোগী আস্থা ও সুনাম অর্জন করতে করতে আরও বছর দুই মত কেটে যায়। এই সময় ৭/৮ বছরের সময়কালকে বলা যায় প্রারম্ভ-ব্যবসা কাল (জেস্টেশন্ পিরিয়ড)। এই সময়কালের

জন্যে কোন সুদ আদায় না করার নিয়ম চালু করতে হবে। তার জন্যে অবশ্য একটা সর্বোচ্চ সময়কাল নির্ধারণ করে রাখা যেতে পারে। একটি সমবায় হিমঘরের প্রকল্প ব্যয়ের ৪৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম ঋণ হিসাবে উক্ত সমবায় সমিতিকে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে দিয়ে থাকে, যার সুদ বার্ষিক শতকরা ১০.১/২ টাকা।

(৩) সমিতির নিজস্ব মূলধনের বনিয়াদে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে অতিরিক্ত অংশগত মূলধনের জন্যে অভিযান চালাতে হবে। বর্তমানে একটি সমবায় হিমঘরের নির্মাণ বা প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ৪৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ উক্ত সমবায় সমিতির শেয়ার বা অংশ ক্রয়ের মাধ্যমে দিয়ে থাকে। ঐ টাকা ১০ বছর পর থেকে ১২টি সমান কিস্তিতে ফের দিতে হয়। আর সমবায় সমিতি তার সদস্যদের কাছ থেকে প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ সংগ্রহ করে শেয়ার বা অংশ বিক্রয়ের মাধ্যমে। এই শেয়ার সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানোর দিকে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে।

(৪) সমিতির হিমঘরে শুধু আলু সংরক্ষণের কাজ না করে সরাসরি আলু কেনা-বেচার ব্যবসায় ব্যাপকভাবে সমিতিকে নামতে হবে। এতে লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আলু কেনার জন্যে যে টাকার প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তার ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ ঋণ দিয়ে থাকে যদি সমিতি বাকি টাকার সংস্থান করতে পারে।

(৫) সমবায় হিমঘরে শুধু আলু না রেখে অন্যান্য পচা সামগ্রী যেমন ফল, ফুল, সব্জি, দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে চলতি হিমঘরের মধ্যেই আলাদা কক্ষ বা নতুন একাধিক কক্ষবিশিষ্ট হিমঘর নির্মাণ করার বিষয় ভাবতে হবে। তাছাড়া সম্ভাব্য অন্যান্য ব্যবসা যেমন আলু-বীজের ব্যবসা, সারের ব্যবসা প্রভৃতি পরিচালনার জন্যে সরকারকে আনুষঙ্গিক অনুমোদন ও সহায়তা দিতে হবে। প্রাসঙ্গিক আইনগত সমস্যা সমাধানের জন্যে সরকারি আইন প্রয়োগ করতে হবে। পরিকল্পভিত্তিক নতুন নতুন কাজ আরম্ভ করে একদিকে যেমন আয় বাড়াতে হবে তেমনি অন্যদিকে ব্যয় কমানোর প্রয়াস যে [illegible] হিমঘরকে [illegible]

(৬) সরকারি অনুমোদন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে এবং ঋণের আদান-প্রদান ও সুদের ক্ষেত্রে পদ্ধতিসমূহের বিশেষ সরলীকরণ প্রয়োজন।

(৭) সরকারি শিল্প বিভাগ থেকে যন্ত্রপাতির সুযোগ সুবিধা পেতে সরকারের হস্তক্ষেপ দরকার। সমবায় হিমঘরকে জেলা শিল্প কেন্দ্রের (ডি-আই-সি) আওতাভুক্ত করতে হবে।

(৮) সমবায় হিমঘরগুলিকে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ঋণ ও সুদের ছাড় পাওয়ার জন্যে প্রয়োজনে সরকারি অনুদান মঞ্জুর করতে হবে।

(৯) বিদ্যুৎ, ডিজেল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান মূল্য সূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলু ও অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণের হিমঘর ভাড়া স্থির না রেখে মাঝে মাঝেই পরিবর্তন করতে হবে।

(১০) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশেও আলু রপ্তানির জন্যে সরকার তথা বিভাগীয় দপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। ১৯৫১ সালে দার্জিলিঙের কিছু এলাকায় আলুতে ব্যাপক হারে রোগ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের আলু রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন্ন রাজ্য ও অন্য দেশে আলু পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা গত ১০ বছর (১৯৯৭) থেকে প্রত্যাহৃত হয়েছে। এ রাজ্য থেকে গুজরাট, উড়িষ্যা ও দক্ষিণের রাজ্যে আলু পাঠানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। ভিন্ন রাজ্যে আলু পাঠালে ট্রাক ভাড়ার ২৫ শতাংশ ভর্তুকির টাকাও রাজ্য সরকার দেবে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

(১১) আলুকে শুধু শস্য হিসাবে ব্যবহার না করে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে তার সম্ভাবনা প্রসারিত ও সম্প্রসারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। প্রয়োজনে বেসিস প্রযুক্তির সাথে বিদেশি প্রযুক্তির সংমিশ্রণও ঘটাতে হবে।

(১২) রাজ্যের সমস্ত হিমঘর নিয়ে একটি রাজ্য ভিত্তিক সমবায় হিমঘর ফেডারেশন গঠন করা দরকার। এতে সমবায়-বিস্তার-প্রযুক্তি-প্রকরণ প্রভৃতি বিষয় থেকে যেমন সুবিধা তেমনি [illegible] সময়ে [illegible] আলাপ-আলোচনা-অনুসন্ধান ব্যবস্থা গ্রহণ-আইনগত বাধা নিরসন প্রভৃতিও অনেক সহজ ও আয়াসসাধ্য হবে।

(১৩) পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪৬টি হিমঘরের মধ্যে ১৬টি লাভে চলছে। কি কি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে তারা এ লাভ করতে পারছে তা অন্যান্য সমবায় হিমঘরের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা রূপায়নের আয়োজন করতে হবে।

(১৪) রাজনীতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করে। তার বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও করে। সমবায় আন্দোলন তথা সমবায় হিমঘর উদ্যোগের অনুকূলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন আদায় ও জনমত সৃষ্টির ব্যবস্থা নিতে হবে। ১৯৯৭ সালের মার্কামারি সাংসদদের নিয়ে সমবায়ে "প্রেসার গ্রুপ"-এর প্রথম অধিবেশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। লোকসভার স্পিকার পি সাঙ্গমা তার উদ্বোধন করেছিলেন। সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলের মাথে মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করা দরকার। সমবায়ের প্রতি "রাজনৈতিক সদিচ্ছা"র যে রকম ঐতিহ্যিক প্রতিফলন না থাকলেও প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলেরই আছে। উদার অর্থনীতির মুক্ত পরিমণ্ডলে সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে এই রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে প্রবৃত্তই কাজে লাগানোর জন্যে সমবায়ের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টির সদিচ্ছা বিভিন্ন স্তরের সমবায় নেতৃত্বকেই নিতে হবে।

বিষয়-৩ : "সমবায় হিমঘরের সমস্যাবলী ও সেগুলি সমাধানের উপায়" :

(১) অধিকাংশ সমবায় হিমঘরের লোকসানের অন্যতম কারণ হল সীমিত ঘরের ক্ষমতা। তা বাড়াতে পারলে আয় বৃদ্ধির তুলনায় পরিচালন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কমই বাড়বে। তাছাড়া এলাকার ব্যাপক জনসাধারণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা উপকৃত হবেন। তাতে সমবায় আন্দোলনেরও ব্যাপ্তি ঘটবে। বহু চাষিরাই তাদের উৎপাদিত আলু সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারছেন না। আলু ওঠার সময় আলু অল্প দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য ৪/৫ হাজার মেট্রিক টনের সমিতি বিশিষ্ট সমবায় হিমঘর লাভজনকভাবে চালান যায় তবু ১০ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতার ঘরকে লক্ষ্য হিসাবে রাখতে হবে।

(২) বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যাধিক ব্যয় সমবায় হিমঘরের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে যদি ডিফিউজার ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যাঙ্কার পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায়। ডিফিউজার ব্যবস্থায় ঠাণ্ডা করার কয়েলগুলি ঘরের নিচের তলায় বা একতলায় বসানো থাকে। সেখান থেকে ব্লোয়ারের সাহায্যে হাওয়া চারতলায় পাঠানো হয়। চারতলা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একতলা থেকে চার বা পাঁচতলায় হাওয়া পাঠানো হয় ডাকটিং-এর মাধ্যমে। অ্যালুমিনিয়াম সিটের বক্সের মাধ্যমে ঠাণ্ডা হাওয়া চারতলায় যায়। সেখান থেকে বিভিন্ন পকেট দিয়ে শীতল হাওয়া ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একতলা থেকে চারতলায় পাঠাতে ১০ হর্সপাওয়ার করে ৩টি মোটরের প্রয়োজন হয়। ৬০ হর্সপাওয়ার মোটর সব সময় চালানোর জন্যে বিদ্যুতের বিল হয় অনেক বেশি। ব্যাঙ্কার ব্যবস্থায় ঘর ঠাণ্ডা রাখতে মোটরের সাহায্যে হাওয়া নিচ থেকে ওপরে তুলতে হয় না। এতে ঘর ঠাণ্ডা করার কয়েল নিচে না বসিয়ে ওপরে চারতলায় বসানো হয়। আলু রাখার যে খাঁচা ঘরের ভিতর আছে তার মধ্যে কয়েল বসানো হয়। এতে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের খরচ অনেক কমে যায়।

(৩) আর্থিক সাশ্রয়ের জন্যে ব্যাঙ্কার পদ্ধতিপ্রবর্তনের সাথে সাথে সৎ ও উদ্যমী পরিচালকমণ্ডলী ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মিদলও প্রয়োজন। সব হিমঘরের কর্মিদের বেতন হারে একটা সমতাও আনতে হবে।

(৪) বন্ধ জানুয়ার বণ্ড বিতরণের দায়িত্ব থেকে পরিচালকমণ্ডলী বঞ্চিত থাকায় সমবায় সমস্য ও সমবায় আন্দোলনের নিজস্ব স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সমবায় তথা সদস্যদের স্বার্থে বণ্ড বিতরণের দায়িত্ব পরিচালকমণ্ডলীর হাতেই থাকা প্রয়োজন: পঞ্চায়েতের হাতে শতকরা ৮০ ভাগ না রেখে সমিতির হাতে শতকরা ৮০ ও পঞ্চায়েতের হাতে বড় জোর ২০ ভাগ রাখা যেতে পারে।

(৫) সব কিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও বহু সমবায় হিমঘর কর্তৃপক্ষ অনেক আবেদন নিবেদন করেও যথাসময়ে লাইসেন্স নবীকরণ করাতে পারছেন না। তার জন্যে সমবায় দপ্তরকে উদ্যোগী হতে হবে।

(৬) প্রতিটি সমবায় হিমঘরে অভি সত্বর পূর্ণ সময়ের মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নিয়োগ করতে হবে। সমবায় হিমঘরের নিজস্ব ও স্থানীয় এবং হিমঘর সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারিদেরই এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তিনটি বিষয়ে আলোচনায় ভারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর কিছু সিদ্ধান্ত ও সুপারিসের মধ্যে অন্যান্য গোষ্ঠীর সুপারিশও এসে গেছে। স্বভাবতই তিনটি আলোচনা গোষ্ঠীর সুপারিশের মধ্যে এসে পড়া সাধারণ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পরিহারের প্রয়াস এই প্রতিবেদনে নেওয়া হয়েছে।

কল্যাণীর নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের দক্ষ পরিচালনায় সমবায় হিমঘরের ওপর ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম কর্মশালায় মোট ৭১ জন ও ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কর্মশালায় মোট ৭৬ জন সক্রিয় অংশ নিতে নিকট ও দূর হতে এসেছিলেন। তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ পর্বের শেষদিনে বিভিন্ন আলোচনা গোষ্ঠী তাদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সহ প্রতিবেদন দাখিল করার সাথে সাথে প্রশিক্ষণ পর্বের মূল্যায়নও করলেন। মূল্যায়নের সূত্রে যে সত্যটি বেড়িয়ে এল তা একটি গোষ্ঠীর প্রতিবেদকের ভাষায় — "তিনদিনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তা স্বাভাবিকভাবে পেতে হলে বছর পাঁচেক লাগতো"। তিনদিন একত্র অবস্থানের সুবাদে একসাথে খাওয়া-বসা, পথা-চলা, কথা-বলার মধ্যে সমবায় হিমঘরের ভাবনাই তাঁদের মধ্যে বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার বনিয়াদে বুদ্ধিদীপ্ত উপলব্ধির প্রতিফলনে মনে হল অচিরেই অন্তত আশি ভাগ সমবায় হিমঘরকে স্বতন্ত্র করা যাবে। কিন্তু একটা কথার সম্বন্ধে আমরা সমবায় হিমঘরগুলোকে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সাফল্যের উন্নত আর্থিক সোপানে উত্তরণের অভিপ্রায়ই বোধ হয় সমবায় হিমঘরের ওপর কর্মশালা পুঁজির অন্তিম ফলশ্রুতি।

□

শৈলবালা ঘোষ

শৈলবালা ঘোষের জন্ম ১৮৮৪ সালের ২০ এপ্রিল। ১৯২০ সালে তিনি মহাত্মা গাঁধীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। নিজের বাড়িতে তুলা গাছ লাগিয়ে তার তুলায় সুতা প্রস্তুত করেন। অন্য অনেককেও তিনি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে কুমিল্লার সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র পূর্ববঙ্গ সফর করলে ত্রিপুরা জেলার মোগড়া বাজারে স্থানীয় মহিলা সমিতির নেত্রী হিসাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শৈলবালা। প্রবল গাঁধীবাদী হয়েও নেতাজির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। জাত ও ধর্মের বেড়া তিনি জানতেন না। একটি হরিজন বিদ্যালয়ও তিনি পরিচালনা করেন। স্বাধীনোত্তর ভারতেও সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত থাকেন। মহান এই দেশ সেবিকার মৃত্যু হয় ১৯৭১-এর ৫ জানুয়ারি।

□ *অশোককুমার গিরি*

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines
as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (২য় তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪১২১ ৩৩৪-৫৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যক্রম : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি। উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, কেননা বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** **&** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE 475-5566 475-2390

প্রসঙ্গ ঃ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

ধনঞ্জয় মিত্র

ওঁরা সবাই গ্রামের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী, সুভাষ। রবীন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে এসেছিলেন মাটির কাছাকাছি। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে (১৮৯০ সালে) রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ড থেকে ফিরলেন, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ওঁকে পারিবারিক জমিদারীগুলি দেখার ভার দিলেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পল্লীবাস করতে হয়। এই পল্লীবাসের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে, তেমনই দরিদ্র, মূঢ়, ম্লান, মূক কৃষককুলের হিতসাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে। ফলে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর ধ্যানধারণা, আজকের পঞ্চায়েত প্রথায় দেখি তারই প্রতিফলন। গ্রামের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত চিহ্নিত করেন — জনশিক্ষা, শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, ধর্মগোলা স্থাপন, সমবায় পণ্য ভাণ্ডার ও কৃষি ব্যাঙ্ক গঠন। এছাড়াও চেয়েছিলেন সালিশি মাধ্যমে গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা, চিকিৎসালয় স্থাপন, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সুষ্ঠু পথঘাট, সংস্কারস্থান, ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, চেয়েছিলেন সুরাপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করতে, বৃদ্ধাবাস তৈরি করতে, বৃদ্ধ বয়সের জন্য সংস্থান রাখতে। তিনি পল্লীবাসীদের মতানুসারে পাঁচ জনের একটি মণ্ডল বা পল্লীসমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যাতে 'স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সভ্য' হয়ে ওঠে। কালিগ্রাম (বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা) পরগণায় রবীন্দ্রনাথ ঐরকম একটি পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, নাম দিলেন 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। সভার আর্থিক পুঁজি সংগৃহীত হত প্রজাদের চাঁদায় আর জমিদারের অর্থানুকূল্যে।

গ্রামের উন্নতির কথা গাঁধীজিও ভেবেছিলেন, যেমন ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দু'জনের চিন্তাধারায় একটা মৌলিক পার্থক্য ছিল। গাঁধীজি যেখানে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানের জন্য গ্রামের তথা গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে ছিল বিশ্বজনীন। গাঁধীজির মতে, 'ভারতবর্ষ বাস করে তার গ্রামে ; গ্রাম যদি ধ্বংসে হয় তাহলে ধ্বংস হবে।' তিনি পঞ্চায়েতীরাজ-এর প্রবক্তা ছিলেন এবং আশা করেছিলেন প্রতিটি গ্রাম পরিণত হবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি স্বনির্ভরশীল পঞ্চায়েতে। গ্রামভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল গাঁধীজির পঞ্চায়েতীরাজ সম্পর্কিত ধারণা। পক্ষান্তরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র গ্রাম ও শহরের জনগণকে আলাদা চোখে দেখেননি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। এজন্য তিনি প্রণয়ন করেছিলেন একটি জাতীয় পরিকল্পনা। এই প্রসঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন আমূল ভূমিসংস্কার, সমবায় প্রথা, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন অর্থনীতির মূল যেন মুষ্টিমেয়র হাতে না থাকে, তা থাকে যেন জনগণের হাতে। অনেকেই বলেন, সুভাষচন্দ্রের অর্থনীতিক পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার যেখানে উন্নয়নের যে কোন নির্দেশ আসত কেন্দ্রের থেকে, অর্থাৎ ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীভূত, সেখানে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি জনগণের হাতে ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুরাতন কাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও প্রশাসনে পঞ্চায়েতের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাঁচ জনকে নিয়ে তৈরি হত পঞ্চায়েত। এই পাঁচ জন হতেন নির্বাচিত অথবা মনোনীত। প্রাচীন পঞ্চায়েত তৈরি হত নিজের তাগিদেই। গ্রামের আইন প্রণয়ন, বিচার ব্যবস্থা সবই ছিল পঞ্চায়েতের হাতে। পরস্পরিক সহযোগিতা ছিল এর ভিত্তি। গ্রামের কৃষি সকলে মিলে চাষ করত, ফসল ভাগ হত সবার মধ্যে। সবাই ছিল জমির যৌথ মালিক। প্রতিটি গ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক আমোদের পড়া, স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ইংরেজ শাসকের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পছন্দ হল না। ঘুটি ব্যবস্থার প্রবর্তনে ইংরেজ শাসক নিজেদের সুবিধা তৈরি করে নিলেন। প্রথম ব্যবস্থায়, দেশির কারিগরী, তা সে তাঁত বস্ত্র তৈরিতেই হোক, দেশি ছুরি-কাঁচি-কৃষিযন্ত্র তৈরিতেই হোক বা অন্য কোন কুটিরশিল্প, তা সবই আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলেন, যাতে বিলাতী পণ্যসামগ্রীর উপর নির্ভরতা বাড়ে। গ্রামগুলিতে যেখানে কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থান ছিল, ইংরেজ শাসনে হয়ে উঠল শুধু কৃষিনির্ভর। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থায় একটি পরজীবী, কর্তাভজা, মধ্যবর্তী সম্প্রদায় তৈরি করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদার শ্রেণী, যাঁরা ছিলেন ইংরেজ প্রভু জমির সত্বের পূর্ণ অধিকারী হলেন। কৃষক শুধু জমি কর্ষণ করবেন, জমির মালিক তিনি নন। তিনি শুধু খাজনা দেবেন, আর না দিতে পারলেই উচ্ছেদ। সরাসরি ইংরেজ সরকার অবশ্য গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুরোপুরি রদ করেননি। যদিও লোক দেখানো ভাবে চালু রেখেছিলেন, কিন্তু এসব ব্যবস্থা রেখেছিলেন এগুলিকে বজায় রাখার জন্য, যে রবীন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'এক সময়ে পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিস ছিল। এখন পঞ্চায়েত গভর্নমেন্ট আপিসে পড়া জিনিস হইতে চলিল।'

পরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে পঞ্চায়েতের ইতিহাসের রূপরেখা বর্ণনা করা যাক।

বৈদিক যুগে আর্য উপজাতিগুলি বিভিন্ন 'গণ'-এ বিভক্ত ছিল। 'গণ'গুলি যাঁরা শাসন করতেন তাঁদের গণপতি বলা হত। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতেন 'গণ'-এর পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ, 'বিনথ' বা সভার মাধ্যমে। এই সভাগুলি ছিল স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত। গ্রামীণ এই সভাগুলি থেকে নির্বাচিত হতেন বৃহত্তর 'গণ'-এর অধিপতি বা দেশের রাজা। কিন্তু কালক্রমে রাজা ও তাঁর অনুচরেরা এই সভাগুলি কুক্ষিগত করে নিলেন, গ্রামীণ সভা হয়ে উঠল রাজসভা তবু গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র, যা পঞ্চায়েতের উত্তরাধিকার, তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হল না।

মৌর্য যুগেও প্রাচীন প্রজাতন্ত্রগুলি টিকে ছিল, যদিও গ্রামীণ সমাজে সর্বহারা শ্রেণী অর্থাৎ জনমজুর, গৃহভৃত্য, ক্রীতদাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ছিল। পঞ্চায়েতে এদের কোন অধিকার ছিল না। পঞ্চায়েত প্রধানরা নির্বাচিত হতেন সমান সম্পদশালী ও প্রভাবশালী অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা। গ্রামপ্রধানের নির্বাচন ছিল রাষ্ট্রের অনুমোদনসাপেক্ষ, অর্থাৎ

পরোক্ষভাবে তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রেরই প্রতিনিধি। আবারও হল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। গ্রামীণ সভাগুলি রাজার অধীনে এসে যায়। তবে রাজার আধিপত্য কমাতে গ্রামীণ সমাজ তথা গ্রাম পরিষদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। তবে এতে মণ্ডলাধিপতি বা মোড়লের প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। কালক্রমে তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন সমস্তরাজ্যিক প্রভু। তবে বৃহত্তর প্রভু ছিলেন মোহন্ত আর মঠাধীশরা।

কালের আবর্তনে এল মুসলিম শাসন। প্রথমে তুর্কিরা। বিরাট কোন সামাজিক পরিবর্তন এ-সময় হয়নি। আগের মতই রইল গ্রামের কাঠামো, 'যথাপূর্বং তথা পরং'। মোগলদের সময়েও তাই। তবে এই সময়ে হিন্দু মন্দিরকে কেন্দ্র করে মোহান্ত মঠাধীশদের যে যৌথ মালিকানা ছিল, তা খানিকটা গড়ে উঠল মসজিদকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ মৌলবীরাও সমান শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল বড়ই ক্ষীণ। গ্রামীণ বিবাদ-বিসম্বাদে পঞ্চায়েত আর মধ্যস্থতা করত না। এগুলির নিষ্পত্তি করতেন চৌধুরী আর কানুনগোরা। অন্যদিকে গ্রামের মোড়ল ও পাটোয়ার (হিসাবরক্ষক) ছিলেন রাজকর্মচারী। তুর্কি আমলেও তাই ছিল। সাধারণ মানুষ নবাব-বাদশাদের বৈভব যোগাতে নগদ অর্থে খাজনা দিতে বাধ্য থাকতেন। তাঁদের দুর্গতি অপরিসীম হয়ে উঠল। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু পঞ্চায়েত প্রথা বন্ধ হল না। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটা বড় পঞ্চায়েত ছিল, যা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির তত্ত্বাবধান করত, আর দরকার হলে তাদের কাজে হস্তক্ষেপও করত। বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, বহু রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে, দৈব-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সমাজ ও পঞ্চায়েত হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। গ্রামের বাইরের কোন অশান্তি তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও এই ঘটনা দেখা যায়। কার্ল মার্কস গ্রামীণ সমাজ তথা পঞ্চায়েতের এই চিরন্তনতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, জমির যৌথ মালিকানা দেখে, গ্রামীণ স্তরে প্রজাতন্ত্রের বিকাশ দেখে তুরস্কী প্রশংসা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশ শাসক নিজেদের স্বার্থে কেমন করে গ্রামীণ সমাজের স্বয়ম্ভরতা নষ্ট করে দিলেন। লোক-দেখানোভাবে ১৮৭০ সালে চালু করলেন চৌকিদারী পঞ্চায়েত। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হলেন গ্রামের লোকেদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি জমিদারদের মাধ্যমে দফাদার-চৌকিদারদের নিয়োগের দ্বারা গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তবে সরকার বাহাদুর চৌকিদারদের বেতন দিতেন না, দিত গ্রামের পরিব কিষান টাকা তুলে। ব্রিটিশ শাসকের কি সুবিচার! আরো সুবিচার — পঞ্চায়েত সদস্যরা নির্বাচিত হতেন না, তাঁরা মনোনীত হতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা। এরপর ১৮৮৫ সালে পাস হল বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, যার ফলে তৈরি হল জেলায় জেলা বোর্ড, মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড। আর গ্রামপর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি। এতে খানিকটা স্বায়ত্তশাসন ফিরে এল। এই আইন রচনার পিছনে ছিলেন উদারপন্থী লর্ড রিপন। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট। এতে অবশ্য আগের আইনটি রদ হয়নি। তার মানে, গ্রামে তখন দু'ধরনের পঞ্চায়েত ছিল। এক, চৌকিদারি পঞ্চায়েত, আর দুই, ইউনিয়ন কমিটি।

উদারপন্থী লর্ড রিপন গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের কথা বললেও ব্রিটিশ প্রভুরা পরে পঞ্চায়েতকে কাজে লাগালেন রাজনৈতিক আন্দোলন, বিপ্লবী কাজকর্ম দমন করার কাজে। ব্রিটিশ প্রভুদের স্বার্থে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিচারব্যবস্থা চালু করা হয় ১৯১৯ সালে। নাম দেওয়া হয় গ্রামজরা — বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন।

কালক্রমে এসে গেল স্বাধীনতা। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চায়েতের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বসলো বলবন্ত রাই মেহতা কমিটি, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার কাজ সমীক্ষা করে দেখার জন্য। এই কমিটি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সুপারিশ করে, গ্রামস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতি, তারপরে জেলাস্তরে জেলা পরিষদ। ১৯৫৮ সালের ১২ জানুয়ারি কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হয়। প্রথম প্রথম খুব উৎসাহের সঙ্গে পঞ্চায়েত গঠনের কাজ চলতে থাকে রাজ্যে রাজ্যে। তারপর ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর সব উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য ১৯৫৭ সালেই পঞ্চায়েত আইন পাস হয় (১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথার অবসান হয়)। এর ফলে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরনো ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গায় অঞ্চল পঞ্চায়েত ঐ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হল। এরপর ১৯৬১ সালের জেলা পরিষদ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে যোগ হল আরও দুটি স্তর — ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ আর জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। এই চারস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলল ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত, যখন পঞ্চায়েতগুলির পুনর্গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (৪১নং আইন) প্রণয়ন করা হল। এই আইনে অনেকগুলি ধারা-উপধারা আছে এবং সবকিছু অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বলা আছে। এই আইনের ভিত্তি হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত অর্থাৎ মেহতা কমিটির রিপোর্ট অনুসরণ করা হয়েছে। এই আইনে বলা হল, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকবেন একজন প্রধান, একজন উপপ্রধান আর কিছু কর্মচারী (সদস্য)। সম্পাদক হবেন রাজ্য সরকার নিযুক্ত কোন ব্যক্তি। প্রতি মাসে কম করে একটি সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। সদস্যদের কার্যকাল হবে পাঁচ বছর। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কর্তব্যের মধ্যে পড়বে গ্রামের সার্বিক উন্নতি করা, দফাদার-চৌকিদারদের কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। রাজ্য সরকার প্রদত্ত অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সমবায় আন্দোলন, সমবায় বিপণি এবং অন্যান্য সমবায় প্রচেষ্টার উৎসাহ দেওয়া। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিজস্ব আয় ছাড়াও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অনুদান ; জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদানের উপর নির্ভরশীল। যার মুখ্যত সম্পাদকের, কর্মচারিদের দফাদার-চৌকিদারদের বেতন-ভাতা, গ্রামের উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ধার্য করা হল। ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ গঠনে মোটামুটি একই গঠন প্রণালী অনুসরণ করা হল। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা, কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার হবেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। সম্পাদক হবেন পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক (পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার)। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বি ডি ও) হবেন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক। আবার জেলা পরিষদের সদস্যরা হবেন জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা আর কিছু নির্বাচিত সদস্য। রাজ্য সরকার একজন নির্বাহী আর একজন সম্পাদক নিযুক্ত করবেন। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে অর্থ ও সংস্থা, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, কৃষি, শিক্ষা ও সমবায়, শিল্প, কুটিরশিল্প ও

ব্লাপ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ, খাদ্য ও সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে স্থায়ী সমিতি (স্ট্যান্ডিং কমিটি) থাকবে। স্থায়ী সমিতিগুলির মধ্যে বোঝাপড়া রাখার জন্য সমন্বয় কমিটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার হিসাব পরীক্ষক ও পরিদর্শক টিমটি তবেই পাঠাতে পারবেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে। ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়ে চলেছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন হয়েছে ১৯৯৩ সালে। পঞ্চমটি হবে এই বছরের (১৯৯৮) ২৮মে। ১৯৯৩ সালে ৭২ হাজারের মত প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন পঞ্চায়েতে, সারা ভারতের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটি সাড়ে বাইশ লক্ষ।

বর্তমানে ১৬টি জেলা পরিষদ, ৩৪০টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৩৩২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি মহকুমার দার্জিলিং জেলার জন্য একটি মহকুমা পরিষদ আছে, যেটি জেলা পরিষদের সমতুল মর্যাদা পেয়ে থাকে, ক্ষমতাও জেলা পরিষদের। এখানে বলে রাখা ভাল যে রাজ্য সরকার যে কোন মৌজা বা মৌজার অংশ বা পরস্পর সংলগ্ন মৌজাকে গ্রাম বলে ঘোষণা করতে পারবেন গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের উদ্দেশ্যে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মৌজার সংখ্যা ৪১ হাজারের মত, কিন্তু ঘোষিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা অনেক কম। গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি প্রতিষ্ঠান আছে — গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভা। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সংসদের কাজ হল গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরামর্শ দেওয়া ও পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা। সভার কাজ হল গ্রাম সংসদের সুপারিশগুলি বিবেচনা করা, গ্রামোন্নয়নের প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকার বিবেচনা করা, আয়-ব্যয় বিবেচনা করা ইত্যাদি (প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত বছরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকে)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় থেকেই গ্রামোন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামোন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য এতদিন যা কাজ হয়েছে তা সমীক্ষার উদ্দেশ্যে জি ভি কে রাও কমিটি গঠন করেন। আবার ১৯৮৭ সালে গঠিত হল এল এম সিংভি কমিটি যা পঞ্চায়েতগুলির পুনর্গঠনের জন্য কিছু সুপারিশ করে। এরপর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৯ সালে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন ৬৪ এবং ৬৫ নং বিলের ধারা (যথাক্রমে 'পঞ্চায়েত বিল' ও 'নগরপালিকা বিল')। বিল দুটি লোকসভায় পাশ হলেও রাজ্যসভায় অনুমোদন পায়নি। নরসিমহা রাও সরকার অবশ্য ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত বিলটি কার্যকর করেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন, রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন, তপশিলি জাতি-উপজাতি এবং মহিলাদের আসন সংরক্ষণ (চতুর্থ পঞ্চায়েত নির্বাচনে যথাক্রমে ২৭.৫৪%, ৬.৭৬% এবং ৩৫.১৮%) ইত্যাদি সবই হয়েছে কিন্তু এই আইন অনুযায়ী। তাছাড়া এই আইনে সংবিধানের ১১নং তফসিলে যে ২৯টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন সড়ক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি) তা পঞ্চায়েতের কার্যকর্মের এক্তিয়ারভুক্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৯৯৮ সালের মধ্যেই ২৯টি দপ্তর পঞ্চায়েতে হস্তান্তর করবেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা পঞ্চায়েতের কর্মী বলে গণ্য হবেন। তবে এই আইন প্রবর্তনের বহু আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রচলন করা হয়েছিল যাতে তৃণমূলস্তরে পরিকল্পনা রচনা এবং তা রূপায়ণ করার ব্যবস্থা করা যায় (বর্তমানে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা বাবদ অর্থের ৫৩ শতাংশ জেলাগুলিতে ব্যয় করে থাকেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে এক হাজার কোটি টাকা পঞ্চায়েতে যাচ্ছে)। অবশ্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি (এন জি ও) পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। যদিও সম্প্রতি এই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কিছু প্রতিবন্ধ লাগাবার এক সরকারি প্রস্তাব আছে।

রাজ্য সরকার (কেন্দ্রীয় সাহায্যে) পঞ্চায়েতগুলিতে জওহর রোজগার যোজনা, এমপ্লয়মেন্ট অ্যাসিওরেন্স স্কিম, ন্যাশনাল সোসাল অ্যাসিস্টান্স প্রোগ্রাম, ট্রাইসেম, মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, ডেকেন্ট ইত্যাদি চালু করেছেন, তবে এর সবগুলিতে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি (যেমন ১৯৯৬-৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে জওহর রোজগার যোজনার অর্থাৎ গ্রামীণ স্বনিযুক্ত প্রকল্পে খরচ হয়েছে মাত্র ৬০.২৩ শতাংশ, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় একাদশ স্থানে, যেখানে সিকিম, ত্রিপুরা ও গোয়া খরচ করেছে ১০০ শতাংশের বেশি)। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যাতে প্রযুক্তিগত কোন অসুবিধা না হয়, তাবজন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের একটি প্রযুক্তিগত পুস্তিকা (টেকনিক্যাল ম্যানুয়াল) দেওয়ার প্রস্তাব আছে। এতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আত্মনির্ভরতা বাড়বে, ফলে অঞ্চলে উপসেলের জন্য পঞ্চায়েত সমিতিতে দৌড়তে হবে না। আরও একটা আশার কথা — রাজ্য সরকার কৃষির উন্নতির জন্য ছোট ছোট কৃষিজমিগুলিকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেচের জল, ট্রাক্টর, সার, বীজ ইত্যাদি খরচ কৃষকেরা সমবায়ের মাধ্যমে বহন করবেন, উৎপন্ন ফসলও জমির বিস্তৃতি অনুযায়ী ভাগ হবে। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এতে যাবে না। যেহেতু সমবায় প্রসার উৎসাহ দেওয়া পঞ্চায়েতের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তাই পুরো কর্মকাণ্ডটি পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে হবে।

পঞ্চায়েতের আবির্ভাবে যেমন সমাজের কোন কিছু কল্যাণ হয়েছে, তেমনি হয়েছে কিছু কুপ্রথার সৃষ্টি। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। জমিদার তথা উচ্চবর্ণের কর্তৃত্ববাদি সমাপ্ত করেছে, ঠিকাদারি প্রথার অবসান ঘটিয়েছে, বাড়িয়েছে জনচেতনা। অপরদিকে স্বজনপোষণ কিছু জায়গায় বেড়েছে, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আসছে কিছু, প্রশাসনিক বিরোট বাবে প্রকল্পগুলির ব্যয় সঙ্কোচ হচ্ছে (এক টাকার মাত্র ৩৫ পয়সা নাকি প্রকৃতে খরচ হয়), ভূমি সংস্কার ব্যাহত হচ্ছে। তবে পঞ্চায়েতের কর্মকুশলতা (অপারেশন বর্গার প্রভাব সাকলোর পরও) কিন্তু পারেনি কৃষিশ্রমিকদের (যারা হয়তো সত্যিই ভূমিহীন আর গৃহহীন) ক্রমবর্ধমান সংখ্যা কমাতে, পারেনি দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষদের (৫৭% ১৯ সালে, যা বিহার-ওড়িশার থেকেও বেশি) ভাগ্য পরিবর্তন করাতে। তবে আশার কথা একটাই, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা (যাদের ক্ষেত হচ্ছে এক হেক্টরের কম থেকে দুই হেক্টর পর্যন্ত) সবথেকে বেশি উৎপাদন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই হল বেশি (মোট কৃষিজীবী জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ)।

আমাদের পঞ্চায়েত গোষ্ঠী একটি সজীব, সচল প্রতিষ্ঠান। বিশাল ভারতবর্ষ তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে, সঠিক দিশার ঠিকানা পাওয়ার জন্য। আসুন ছোটখাটো মতপার্থক্য দূর করে দলাদলি ভুলে সবাই একত্র হয়ে পঞ্চায়েত আন্দোলনকে সফল করে তুলি। ❑

With Best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLES' CO-OPERATIVE BANK LTD.
(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713 204
Phone : 0343/56-2393, 0343/56-4722

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি
ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ইতিকথা

অরুণোদয় সরকার

১৯৭৫ সালে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ -এর আত্মপ্রকাশের পশ্চাতে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে তৎকালীন "মেদিনীপুর-খেলাড় বলরামপুর-বেলিয়াবেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ" নাম পরিবর্তন করে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ নাম গ্রহণ করে। আর পূর্বোক্ত নামের উৎপত্তি হয় ১৯৬৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, খেলাড় বলরামপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ ও বেলিয়াবেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ একত্রীভূত হওয়ার ফলে এদের মধ্যে বঙ্গদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক খেলাড় বলরামপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৯০৯ সালের ১২ই জানুয়ারি। আর বেলিয়াবেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯১২ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি ও ১৪ই আগস্ট তারিখে। তাই একথা সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয় সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

ভারতের প্রথম সফল আইনটি সমবায় ঋণ সমিতিসমূহের আইন, ১৯০৪ (The Co-operative Credit Societies Act, 1904) নামে ১৯০৪ সালের দশ নং আইন (Act X of 1904) হিসাবে ১৯০৪ সালের ২৫শে মার্চ ভারতের গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ করে ও এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ চালু হয় (The Gazette of India, March 26, 1904, Part IV, Page 43)। এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত কৃষককুলকে মহাজনের চড়া সুদের শোষণ ও নানাবিধ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা। বঙ্গদেশে (তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে বিহার ও ওড়িশাও যুক্ত ছিল) ১৯০৫ সাল থেকেই গ্রামীন ঋণদান সমিতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। গ্রামের কৃষকদের সস্তা সুদে ঋণ সরবরাহ করার জন্য এইসব সমিতিগুলিতে মূলধনের যোগান আসত প্রধানত সরকারের কাছ থেকে আর কিছু রাজা মহারাজ, ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন দ্বারভাঙ্গার (বিহার) মহারাজ, এস্টেটের রাজা, স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটন আর স্থানীয় জনসাধারণের এককালীন বদান্যতা হলেও কৃষক সদস্যদের কাছ থেকেও আমানত ও ঋণ হিসাবে। বেশির ভাগ আমানত ও ঋণ রেজিস্ট্রারের কাছে জমা পড়ত আর বিভিন্ন সমিতিকে তিনি প্রয়োজনমত মূলধন সরবরাহ করতেন আর তার হিসাবও রাখতেন।

ধীরে ধীরে সমিতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯০৭-০৮ সালে মেদিনীপুর জেলা ও সমগ্র বঙ্গদেশে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫ ও ৩২৬। ফলত নতুন সমিতির সংগঠন, সমিতিগুলির দেখভাল ও পরামর্শদান, মূলধন জোগানোর আর তার হিসাবাদি রাখার কাজ একা রেজিস্ট্রারের (Registrar of Co-operative Credit Societies, Bengal) পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তখন তাঁর মাত্র দুজন করণিক (Clerk) ছিল আর কোন অন্যতন আধিকারিক (Officer) ছিল না। ক্রমশ এলাকার সমিতিগুলিকে সম্মিলিত করে একপ্রকার প্রতিষ্ঠান — ইউনিয়ন বা ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত সমবায় আইনে কেবলমাত্র ব্যক্তিসাধারণকে নিয়ে প্রাথমিক সমিতি গঠনের বিধান ছিল, এদের সম্মিলিত করে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ ছিল না। একমাত্র আইনটির ২৯ ধারার (Section 29-Special power to Local Government to register any Association under the Act) সরকারের বিশেষ হুকুম মারফৎ ও আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে ন্যূনপক্ষে দশজন ব্যক্তি সমন্বিত যে কোন ধরনের সমিতি স্থাপনের অনুমতি দিতে পারতেন। (Section 29(1)-Notwithstanding anything contained in this Act, the Local Government may, by special order in each case, and subject to such conditions as it may impose, permit any association of not less than 10 persons above the age of eighteen years to be registered as a rural or an urban society under this Act.) । এই ধারার সুযোগ নিয়ে ১৯০৫ সালেই মাদ্রাজের কতিপয় বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী ও সমবায়মনস্ক ব্যক্তি মাদ্রাজ কেন্দ্রীয় শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক (Madras Central Urban Bank Ltd.) স্থাপন করেন। এর সদস্যপদ কেবলমাত্র শহরে ব্যক্তি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল কিন্তু ঋণ দেওয়া হত সারা মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষককুলে। বঙ্গদেশে ১৯০৫-০৬ সালেই কলকাতার একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন বা সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য রেজিস্ট্রার একটি প্রকল্প (Scheme) প্রস্তুত করেন। কিন্তু সমবায় বিশেষজ্ঞ মিঃ হেনরি উলফের (Mr. Henry Wolff) পরামর্শে ও অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অনুভূত হয় যে বাইরের আর্থ বাজারের সম্মুখীন হবার মত বিশ্বাসযোগ্যতা, সামর্থ ও শক্তি তখনও সমিতিগুলির আসেনি। ফলে ঐ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা হয়। রেজিস্ট্রার কতকগুলি নির্বাচিত এলাকার সমিতিগুলিকে নিয়ে সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গঠন করে পরে তাদের নিয়ে প্রতি জেলায় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং শেষে তাদের নিয়ে প্রাদেশিক স্তরে বৃহত্তর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা গ্রাম্য সমিতিগুলিকে একক (Unit) হিসাবে ধরে তাদের সমস্ত কৃষকদের সদস্যভুক্ত করে ঋণ সরবরাহ করার জন্য সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন বা

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের এক প্রকল্প (Scheme) রেজিস্ট্রার ১৯০৭-০৮ সালে সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সর্বভারতীয় রেজিস্ট্রারদের সম্মেলন কর্তৃক গঠিত কমিটি সুপারিশ করে যে যেখানে প্রাথমিক সমিতিগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থানীয় আমানত সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না সেসব স্থানে কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধাজনক দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সঙ্ঘ বা ইউনিয়ন গঠন করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকার ১৯০৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের জন্য রেজিস্ট্রারের ঐ প্রকল্প অনুমোদন করেন।

মেদিনীপুর জেলায় সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তনের, প্রসারের ও সাফল্যের ইতিহাসে দুই ব্যক্তির নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এদের একজন হলেন সমাজ সচেতন, কর্মনিষ্ঠ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সমবায় ব্যবস্থার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও সাফল্যে আত্মপ্রত্যয়ী ও মৃদুভাষী সঙ্গপুর থানার খেলাড় গ্রামনিবাসী মেদিনীপুর কালেক্টরির (Collectorate) কর্মী (Record Keeper) প্রয়াত রতিনাথ বসু মহাশয় ও অপরজন হলেন মেদিনীপুর কালেক্টরির কর্মঠ, উদ্যোগী নব নব চিন্তা ও ভাবধারার প্রয়োগ ও পরীক্ষায় উৎসাহী ডেপুটি কালেক্টার ও পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের রেজিস্ট্রারের আপ্ত-সহায়ক এবং তৎপর রেজিস্ট্রার হিসাবে সমবায়ের ধারক ও বাহক প্রয়াত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়। এদের দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অফুরন্ত উৎসাহে ১৯০৫ সালে খেলাড় অঞ্চলের গ্রামগুলিতে কয়েকটি গ্রামীণ কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে ওঠে।

সমবায় ঋণ সমিতি সমূহের আইনটি চালু হবার পর বঙ্গদেশ সরকার ১৯০৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ১৮৬৯টি — আর, নম্বরের প্রজ্ঞাপন (Notification — No. 1869 T. R., dated Darjeeling the 6th September, 1904) দ্বারা মিঃ গৌরলেকে (Mr. W. R. Gourlay, I. C. S) বঙ্গদেশের (বিহার ও ওড়িশা সহ) রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করেন। তিনি ২৫শে অক্টোবর কার্যভার গ্রহণ করে জেলায় জেলায় গিয়ে কালেক্টারের সাহায্য নিয়ে সমবায় সমিতি স্থাপনের কাজ শুরু করে দেন। তিনি ঐ উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত মেদিনীপুরে কাটান। ২৯ তারিখে তিনি কালেক্টার মিঃ কারের (Mr. J. H. Kerr, ICS) সঙ্গে বৈঠকে বসেন। মেদিনীপুরের সরকারি উকিল ভুবনচন্দ্র ব্যানার্জি ও খাসমহল ডেপুটি কালেক্টার যামিনীমোহন মিত্র ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্থির হয় যে শ্রী ব্যানার্জি ১লা জানুয়ারি ১৯০৫ তারিখে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আর শ্রীমিত্র সরকারি খাসতালুক (Government estate) বলরামপুরে সেখানকার অধিবাসীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠনের বিষয়ে আলোচনার জন্য ৩১শে ডিসেম্বর সভার ব্যবস্থা করবেন। ১লা জানুয়ারি বেইলী হলের সভায় রেজিস্ট্রার কালেক্টারের সাথে উপস্থিত হয়ে সমবেত ব্যক্তিগণের কাছে সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি আলোচনা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন —

ভুবনচন্দ্র ব্যানার্জি	সরকারি উকিল
রঘুনাথ দাস	ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান
ত্রৈলোক্যনাথ পাল	উকিল
প্রেমানন্দনাথ ঘোষ	অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ ও জমিদার
রাধাগোবিন্দ পাল	জমিদার
কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জি	নাড়াজোল রাজার ম্যানেজার
অবিনাশচন্দ্র মিত্র	জমিদার
কালিপদ হাজরা	উকিল ও জমিদার
ভানুচরণ ঘোষ	মন্ত্রিক স্টেটের ম্যানেজার
প্রবেশ পাল	জমিদার
রামচন্দ্র কই	ব্যবসায়ী
পরমানন্দ সাহা	মণিকার

আর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বলরামপুরের সভায় রেজিস্ট্রার ডেপুটি কালেক্টার যামিনীমোহন মিত্রের সহায়তা নিয়ে উপস্থিত গ্রামবাসীদের সামনে সমবায়ের আদর্শ, নীতি, সমবায় সমিতি গঠনের উপায়, সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিয়ে বলেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালের ২২শে মার্চ তারিখে বলরামপুর খাসমহালে একটি ঋণদান সমিতি স্থাপনের জন্য বহুসংখ্যক গ্রামবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত এক দরখাস্ত কালেক্টারের নিকট পেশ হয়। অবশেষে মেদিনীপুর জেলার প্রথম সমিতি "বলরামপুর কৃষাণ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" নামে ১৯০৫ সালের ২৮শে মে তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। তারপর ঐ বছরের ৯ই জুন ঝাঁকড়া ও রাধানগর গ্রাম দুটিতে দুটি অনুরূপ সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়। অতঃপর শ্রীবসু'র নিজগ্রাম খেলাড়ে ১৯০৫ সালের ২২শে জুন "খেলাড় কৃষাণ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" রেজিস্ট্রিকৃত হয়। ১৯০৮-০৯ সালে মেদিনীপুরে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬টি আর সমগ্র বঙ্গদেশে সমিতির সংখ্যা হয় ৩৫৯।

অবশেষে আবারও শ্রীবসু মহাশয় এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিয়ে এলাকার সমিতিগুলিকে সম্মিলিত করে গড়ে তুললেন এক সঙ্ঘ/ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়ে "খেলাড় বলরামপুর ইউনিয়ন লিমিটেড" নামে আত্মপ্রকাশ করল বঙ্গদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। পরে

১৯২১-২২ সালে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পরিচিতি হয় "খেলাড় বলরামপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড" হিসাবে। অবশেষে ১৯২৮-২৯ সালে পুনরায় নাম বদল করে এই ইউনিয়নটি "খেলাড় বলরামপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড" এ পরিণত হয়। উক্ত ইউনিয়নের সদস্যপদ কেবলমাত্র এলাকার প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির জন্য উন্মুক্ত ছিল। সেজন্য এই কেন্দ্রীয় সমিতিটিকে বলা হয় অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ ধরনের (Pure type) ব্যাঙ্ক। ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক গড়ে উঠতে থাকে। যেহেতু এই জাতীয় ইউনিয়ন/ব্যাঙ্কটি প্রথম খেলাড় এলাকায় গড়ে ওঠে তাই এই ধরনের (Pure type) ব্যাঙ্ক খেলাড় ধরনের (Khelar type) ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিচিত হয়। এ-অবশ্যই মেদিনীপুরের যথেষ্ট গৌরবের বিষয়।

মূলত চতুর্বিধ উদ্দেশ্যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কটি স্থাপন করা হয়। (এক) এলাকার প্রাথমিক সমিতিগুলির উন্নতিসাধন, (দুই) সংযুক্ত (affiliated) সমিতিগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করা বিশেষত আর্থিক দিক দিয়ে ঘাটতি সমিতিকে বাড়তি মূলধনসম্পন্ন সমিতির মূলধন সরবরাহ করে সাহায্য করা, (তিন) নিয়মিত পরিদর্শনের (inspection) মাধ্যমে সংযুক্ত সমিতিগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, আর (চার) পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থীয় বিষয় আলোচনা ও মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা এবং সদস্যগণের সর্বতোভাবে মঙ্গলবিধান করা। ইউনিয়নটি অংশমূলক বা শেয়ার ভিত্তিক (with shares) ছিল এবং কেবলমাত্র সমিতিগুলিই এই ইউনিয়নের সদস্য ও অংশীদার (share holder) হতে পারত। সমিতি ইউনিয়নের যত টাকার শেয়ার (Share) নেবে তার দশগুণ পর্যন্ত ঋণ পাবে। এছাড়াও ইউনিয়নের দেনার জন্য প্রতি সমিতি ইউনিয়নের যত টাকার শেয়ার নিয়েছে তার পাঁচগুণ পর্যন্ত টাকার জন্য দায়ী থাকত।

ইউনিয়নের অন্যতম লক্ষ ছিল স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে ও ব্যবসায়ীদের ইউনিয়নে আমানত (deposit) হিসাবে অর্থ বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা। ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে বহু হাজার টাকা ইউনিয়নে আমানত রাখার প্রতিশ্রুতি রেজিস্ট্রার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন।

রেজিস্ট্রিভুক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯০৮-০৯ সালেই ইউনিয়ন তিনটি নতুন প্রাথমিক ঋণদান সমিতি স্থাপন করে আর ঐ সময়ের মধ্যে ১২টি প্রাথমিক সমিতি এর সদস্যভুক্ত হয়। এই বছরই সদস্য (member) সমিতিদের কাছ থেকে অংশগত মূলধন (Share Capital) হিসাবে পাওয়া যায় ৩১০ টাকা আর স্থানীয় পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২২৫ টাকা। স্থানীয় স্তরে আরও অনেক পরিমাণ আমানত সংগ্রহের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায় ইউনিয়নকে মূলধন সংগ্রহের জন্য রেজিস্ট্রারের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। এই বছর ইউনিয়ন ৫৫০ টাকা সমিতিগুলিকে ঋণ দেয় শতকরা বার্ষিক ৯৩/৮ টাকা (নয় টাকা ছয় আনা) হারে। সমিতিগুলি তাদের সদস্যদের কাছ থেকে সুদ আদায় করত শতকরা বার্ষিক ১২১/২ টাকা হারে। ইউনিয়ন আমানতের ওপর সুদ দিত ৬১/৪ (সওয়া ছয় টাকা) হারে, পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৯-১০ সালে ইউনিয়নের কার্যকরি মূলধন দাঁড়ায় ৮,৭০২ টাকা, এর মধ্যে অংশগত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০১০ টাকা। এ-বছর প্রথম সদস্য নন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যায় ৭০০ টাকা। ইউনিয়ন এ বছর ঋণ দেয় ৮,৪৪৫ টাকা। বর্ষশেষে সদস্যদের আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,৮৯৫ টাকা। ইউনিয়ন স্থির করে যে নিজ এলাকার মধ্যে থেকেই মূলধন সংগ্রহ করবে, এলাকার বাইরে থেকে আমানত বা ঋণ নেবে না। এটা খানিকটা নঞর হলেও দৃঢ় ও অবিচলিত লক্ষে এগিয়ে যাবার নীতি। সংযুক্ত সমিতিগুলির অনেকেরই নিজস্ব বেশ কিছুটা মূলধন থাকায় সদস্যদের ঋণ সরবরাহ করার জন্য পুরোপুরি ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করতে হত না। অবশ্য এবছর ইউনিয়ন সরকারের কাছ থেকে ঋণ পায় ২,০০০ টাকা।

এই ইউনিয়নের অগ্রগতির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেওয়া হল:

	১৯১০-১১	১৯১১-১২	১৯১২-১৩
সদস্য সংখ্যা	২৫	২৭	৪২
শেয়ার	২,৭৩০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৪,০২০ টাকা
আমানত	৩,৮০৫ টাকা	৭,৪২৫ টাকা	
কার্যকরি মূলধন	২১,০৮৮ টাকা	২৪,৮০২ টাকা	
ঋণদান	১৩,৬৯০ টাকা		১৬,৪৭৫ টাকা
বৎসরান্তে পাওনা ঋণ	১৯,৬০৮ টাকা		২৭,০০৬ টাকা
বৎসরান্তে খেলাপি ঋণ			৬,২২৫ টাকা
রিজার্ভ ফান্ড	৩৭৫ টাকা	৪০৭ টাকা	৮৪৫ টাকা
লাভ	২৪০ টাকা	৪০৮টাকা	
লভ্যাংশ	১২১/২%	১২১/২%	

ইতিমধ্যে জাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার বিলাবেড়্যা গ্রামের উদারচেতা, পরহিতৈষী বেলেবেড়া পরগনার জমিদার রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রধানরাজ বাহাদুরের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বেলেবেড়া ও আশপাশের গ্রামগুলিতে অনেকগুলি গ্রামীণ কৃষি ঋণদান সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে প্রথম জেলা সমবায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উক্ত প্রধানরাজ মহাশয়ের সভাপতিত্বে। অবশেষে ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে তাঁরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে বিলাবেড়্যা

গ্রামে "বিলাবেড়্যা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড" স্থাপিত হয় বিলাবেড়্যা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির সমিতিগুলিকে সম্মিলিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অন্তত ১৯১২ সালের শোড়ার দিক পর্যন্ত সরকারি স্তরে কো-অপারেটিভ (Co-operative) শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসাবে সমবায় কথাটির প্রচলন ছিল না। উপরোক্ত বিলাবেড়্যা ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থেকে দেখা যায় যে Co-operative Credit Societies Act, 1904 (Act X of 1904) এর বাংলা তর্জমা ছিল "পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন (১৯০৪ সালের ১০ আইন)" আর Registrar of Co-operative Credit Societies, Bengal কে বাংলায় লেখা হত "বঙ্গদেশের পরস্পরের সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার"।

এই ব্যাঙ্কটির এলাকা ছিল গোপীবল্লভপুর ও ঝাড়গ্রাম থানা দুটি নিয়ে। ব্যাঙ্ক রেজিস্ট্রিকরণের দরখাস্তে আবেদনকারী হিসাবে স্বাক্ষর করেছিল ২৬টি সমিতির প্রতিনিধি। ধীরে ধীরে এই ইউনিয়নে আমানত জমা পড়তে থাকে। এই ইউনিয়নের/ব্যাঙ্কের প্রথম আমানতকারী হলেন রামচরণ সাহা। তিনি ১৩১৯ সালের ৫ই বৈশাখ (ইং ১৯১২ সালের এপ্রিল মাস) জমা দেন ৫০০ টাকা। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯১২ সালের ১৯শে মে তারিখে ইউনিয়ন প্রথম নয়টি সমিতিকে ঋণ দেয় মোট ৮,১০০ টাকা। সমিতিগুলির নাম ও মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল -

(১)	বালিশাকিয়া	যৌথ ব্যাঙ্ক	—	১,২০০	টাকা
(২)	কালীঞ্জা			৬০০	
(৩)	তোল			২০০	
(৪)	গোপালপুর			৫০০	
(৫)	বাসুদেবপুর			১,০০০	
(৬)	ফুলঝরা			৬০০	
(৭)	তলাজামলী			৫০০	
(৮)	পাঁচকশী			৫০০	
(৯)	নয়াবসান যৌথ কৃষিঋণ সমিতি		—	৩,০০০	"
			মোট	৮,১০০	টাকা

১৯১১-১২ সালের শেষে অর্থাৎ জন্মের প্রায় চার মাসের মধ্যে এই ইউনিয়নের/ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত (affiliated) হয় এলাকার ৩৬টি সমিতি আর একবছর পর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালের শেষে সংযুক্ত সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯১১-১২ সালের শেষে ইউনিয়নের/ব্যাঙ্কের অংশগত মূলধন ছিল ৩,০৬৭ টাকা আর কার্যকরি মূলধন হয় ৩১,০১৭ টাকা। এই মূলধনের মোটা অংশই রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে কলকাতা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। ঐ বছর ব্যাঙ্কের/ইউনিয়নের নিট লাভ হয় ২১৭ টাকা। পরের বছর অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালে অংশগত মূলধন হিসাবে জমা হয় ৪,৩৬০ টাকা, সদস্য সংখ্যা এক এক সূত্র থেকে এবং অন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় যথাক্রমে ২৪,৫৬১ টাকা ও ২৯,৬০০ টাকা। এই ইউনিয়ন/ব্যাঙ্ক ঐ বছর সদস্য সমিতিগুলিকে ঋণ দেয় ৪৫,৪৫০ টাকা। বর্ষশেষে অর্থাৎ ৩০শে জুন, ১৯১৩ তারিখে অংশগত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭,৭২৭ টাকা, রিজার্ভ ফান্ড ৪০৫ টাকা, সদস্য সমিতিগুলির কাছ থেকে পাওনা ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৪,৬০৪ টাকা আর এর মধ্যে বকেয়া ঋণ ছিল মাত্র ৬০৪ টাকা। কার্যকরি মূলধন ছিল ৬৫,৬৫৭ টাকা। ঐ বছর লাভ হয়েছিল ৩৬৭ টাকা।

এই ইউনিয়নটিও ছিল খেলাড় ধরনের (Khelar type) বা অবিমিশ্র ধরনের (Pure type) অর্থাৎ এলাকার শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতিগুলিই ছিল এর সদস্য। এই ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি ছিলেন পূর্বোক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর। আর তিনি ছাড়া প্রথম পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন।

সুধাংশুমোহন দত্ত — ভাইস চেয়ারম্যান
পরীক্ষিৎ দাস — সেক্রেটারি
দুর্গাপ্রসাদ প্রামানিক — ডিরেক্টার
গঙ্গাধর দাস — ডিরেক্টার
হরেকৃষ্ণ দাইতি — ডিরেক্টার
পৃথ্বীনাথ সংপথী — ডিরেক্টার

পূর্বোল্লিখিত প্রথম সমবায় আইনটির নানাবিধ ত্রুটি দূর করে ১৯১২ সালে নতুন সমবায় আইন — সমবায় সমিতিসমূহের আইন ১৯১২ — The Co-operative Societies Act, 1912 (Act II of 1912) পাশ হয় এবং ঐ সালের ১লা মার্চ থেকে চালু হয়। এই আইনে প্রাথমিক সমিতিগুলির সম্মেলক সমিতি (Secondary Society) স্থাপনের বাধা দূর হয়।

খেলাড় ধরনের (Khelar type) বা অবিমিশ্র (Pure type) ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি নিয়েই গঠিত হত বলে এর পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হত সংযুক্ত গ্রামীণ সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে। তৎকালে গ্রামীণ সমিতিগুলির সদস্য এবং স্বভাবতই তাদের প্রতিনিধিরা বেশির ভাগই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর ছিলেন। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ব্যবসায় জটিল হিসাব নিকাশ ও পরিচালনার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব দেখা যেত। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য এবং স্থানীয় মূলধন আকর্ষণ করার জন্য গ্রামীণ ঋণদান সমিতি ছাড়াও সহর বা গঞ্জ এলাকায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, রাজা-জমিদারদের ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সদস্যভুক্ত করে এক নতুন ধরনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন শুরু হয়। এই সব ব্যাঙ্কে তাই দুই ধরনের সদস্য থাকত — ব্যক্তি সাধারণ ও

গ্রামীণ সমিতি। প্রথম ধরনের সদস্যদের বলা হত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বা সুবিধাভোগী অংশীদার (Preferential share holder) আর সমিতি সদস্যদের বলা হত সাধারণ অংশীদার (Ordinary share holder)। প্রথম প্রকারের অংশীদারগণ শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের লভ্যাংশে প্রাপ্তির বেলায় অগ্রাধিকার পেতেন কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে তারা ঋণ পেতেন না। ঋণ পেত শুধুমাত্র সংযুক্ত সমিতিগুলিই। ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীতে উভয়বিধ শ্রেণীরই প্রতিনিধিরা থাকতেন। তৎকালীন নিয়মাবলী অনুযায়ী জেলা কালেক্টারই ব্যাঙ্কের সভাপতি হতেন। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হত মিশ্র ধরনের (Mixed type) ব্যাঙ্ক। নতুন সমবায় আইনটি চালু হবার পর পাবনা, রংপুরের গাই বান্ধা (দুই বর্তমানে বাংলাদেশে) মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে ১৯১২-১৩ সালে এই জাতীয় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। যেহেতু এই ধরনের প্রথম ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয় পাবনায় (অধুনা বাংলাদেশে) তাই এদের পাবনা ধরনের (Pabna type) ব্যাঙ্ক বলেও অভিহিত করা হয়। সাধারণত জেলা বা মহকুমা শহরে খেলাড় ধরনের ব্যাঙ্কের চেয়ে বড় এলাকা নিয়ে পাবনা ধরনের ব্যাঙ্ক স্থাপনের নীতি নেওয়া হয়।

১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি মেদিনীপুরে চতুর্থ জেলা সমবায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কাশিম বাজারের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর এবং এর উদ্বোধন করেন মেদিনীপুরের কালেক্টার মিঃ ডব্লু আর গৌরলে, আই সি এস মহোদয় যিনি কিনা বঙ্গদেশের প্রথম রেজিস্ট্রার ছিলেন তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে। এই সম্মেলনের আলোচনার ফলশ্রুতিতে মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে। এই প্রচেষ্টা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১১-১২ সালের শেষে মেদিনীপুর জেলায় সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯টি।

অবশেষে মেদিনীপুর জেলা শহরে ধনাঢ্য ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের সুবিধার্থে শহরের বুদ্ধিজীবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অন্যান্য সমিতিদের নিয়ে ১৯১২ সালের ১৪ই অগস্ট মিশ্র ধরনের ব্যাঙ্ক হিসাবে মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের এলাকা সারা জেলা ব্যাপি বিস্তৃত ছিল। খেলাড় বলরামপুর ইউনিয়ন ও বিলাবেড়্যা ইউনিয়ন দুটি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সদস্যপদ গ্রহণ করে আর জেলার বাকি সব এলাকার সমুদয় গ্রামীণ ঋণদান সমিতিকে এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত (affiliate) করে সরাসরি ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়। তখন ভাবা হয়েছিল যে উপরোক্ত দুটি ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য এলাকার সমিতিগুলিকে নিয়ে অনুরূপ ইউনিয়ন গঠন করা হবে আর মেদিনীপুর ব্যাঙ্কটি সমস্ত ইউনিয়নের মহাসঙ্ঘে (Federation) পরিণত হবে। এই ব্যাঙ্কের প্রথম সম্পাদক (Secretary) ছিলেন উৎসাহী ও কর্মঠ অটলবিহারী সিংহ মহাশয়, আর ছিল জেলার কালেক্টার মিঃ ব্র্যাভলী বার্টের সক্রিয় উৎসাহ, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা। শুরু থেকেই এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্থানীয় ইন্সপেক্টার (Local Inspector) হিসাবে যুক্ত ছিলেন মেদিনীপুরের সমবায় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, দক্ষ সংগঠক ও পরিচালক হরিনাথ বসু মহাশয়।

ঋণের প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৯১২-১৩ সালের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের সদস্য হয়েছিল ৪১ জন ব্যক্তি ও ৩৮টি সমিতি। এই সমিতিগুলির মধ্যে ছিল ৩৪টি কৃষি ঋণদান সমিতি, ২টি অকৃষি ঋণ সমিতি ও পূর্বোক্ত ২টি ইউনিয়ন — খেলাড় বলরামপুর ও বেলিয়াবেড়া। এই ব্যাঙ্ক সদস্যদের কাছ থেকে অন্য সদস্য নন এমন সূত্র থেকে আমানত/ঋণ পেয়েছিল যথাক্রমে ১৫,৮৮০ টাকা ও ১৭,২১৬ টাকা। এই বছর ব্যাঙ্ক সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়েছিল ৪৯,০০০ টাকা। এই বছরের মধ্যেই ২,০০০ টাকা ঋণ আদায় হয়ে গিয়ে বর্ষশেষে সদস্য সমিতিগুলির কাছ থেকে ঋণ পাওনা ছিল ৪৭,০০০ টাকা। এর সবটাই ছিল হাল বা অখেলাপি ঋণ। এই ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক ৭১/২(সাড়ে সাত) টাকা। আর গৃহীত আমানত ও ঋণের ওপর ব্যাঙ্ক সুদ দিত শতকরা বার্ষিক ৬১/৪ (সওয়া ছয়) টাকা হারে। এই বছর ব্যাঙ্কের লাভ হয়েছিল ৩৫০ টাকারও বেশি। বর্ষশেষে কার্যকরি মূলধন হয়েছিল ৪৯,৮৭৮ টাকা। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সূচনা বেশ ভালই হয়েছিল বলা চলে।

প্রথম বছর শেষে অর্থাৎ ৩০শে জুন, ১৯১৩ তারিখে ব্যাঙ্কের উদ্বর্তপত্র (Balance Sheet) ছিল নিম্নরূপ :

সম্পত্তি (Assets)	টাকা	আনা	পাই	দায় (Liabilities)	টাকা	আনা	পাই
হাতে ও ব্যাঙ্কে মজুত	২,৮৭৭	১৪	৬	অংশগত মূলধন	১৬,৮৮০	০	০
সমিতির কাছ থেকে পাওনা ঋণ	৪৭,০০০		০	রিজার্ভ ফান্ড	১৭৮	১১	৩
সমিতির কাছ থেকে ঋণের সুদ পাওনা	৫৮০	৪	৬	সদস্যদের আমানত	১৫,৪০০	০	০
				সদস্যদের আমানতের সুদ প্রদেয়	২৩৯	৮	০
				সদস্য নন এমন ব্যক্তিগণের কাছে ঋণ	১৬,৮৫০	০	০
				ঋণের সুদ প্রদেয়	২৪১	৮	০
				লভ্যাংশ প্রদেয়	৩২১	০	৩
				মোট	৫০,১১০	১১	৯
				নিট লাভ	৩৫০	৭	৩
সর্বমোট	৫০,৪৬১	৩	০	সর্বমোট	৫০,৪৬১	৩	০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

(১) অসিতেশ্ চৌধুরী, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, মেদিনীপুর ১নং ব্লক।

(২) Annual Report on the working of Co-operative Credit Societies in Bengal for the years 1906-07, 1908-09, 1911-12, 1912-13.

(৩) Diary of the Registrar of Co-operative Credit Societies, Bengal—Vide Appendix III of the Annual Report on the working of Co-operative Credit Societies during the year 1904-05.

(৪) The Co-operative Movement in Bengal — Dr. G. P. Niyogi, Minto Professor of Economics, Calcutta University.

(৫) বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬) বেলিয়াবেড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উক্ত ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নকলসহ ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা — পূর্বোক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(৭) জাতীয় গ্রন্থাগার (The National Library)।

(৮) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার (West Bengal State Archives)। ❑

বহিরাগত (ফ্রেসার্স) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

(ডিপ্লোমা কোর্স ইন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট)

বেশ কিছু অগ্রগণ্য সমবায় সমিতিসমূহে নতুন কর্মী নিয়োগ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করা হয় এবং কর্মী নির্বাচন/নিয়োগের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন সমবায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সমবায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র সমবায় সমিতি/বিভাগের কর্মচারিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের নাম	ডিপ্লোমা কোর্স ইন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট
মেয়াদ	১৬ সপ্তাহ
শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাধ্যমিক পাশ
বয়স	৩০ বৎসর
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৭৫০ টাকা

(বিঃ দ্রঃ - স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে নিজ নিজ বাসস্থান থেকে যাতায়াত করতে পারবেন। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হবে তবে সেখানে যেমন প্রযোজ্য 'মেস চার্জ' ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের বহন করতে হবে।)

উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশদ বিবরণের জন্য অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ঃ

উত্তরপাড়া / কাঁচরাপাড়া / বড়ওল / ইলামবাজার / কালিম্পং / জলপাইগুড়ি

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

স্বাগতম ১৯৯৮-৯৯ সমবায়বর্ষ

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হোক সদস্যদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন

সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য শুধু ক্রয়-বিক্রয় বা ভোগ্যপণ্য সরবরাহ নয়। শুধুই মাছ চাষ বা গৃহনির্মাণ নয়। সমবায় সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল সদস্যদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সার্বিকভাবে সহায়তা করা। সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা এবং তাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য সমিতির উপবিধিটি ভালভাবে পড়ে দেখুন, অন্যদেরও পড়তে বলুন।

সমিতি-সমস্যা ব্যবধান দূর হোক

সমিতির সাফল্য বহুলাংশেই সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক সদস্যের মনে রাখা দরকার যে তিনিও ঐ সমিতির একজন অংশীদার বা মালিক। সমিতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন, সমিতির কাজকর্ম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিন, সমিতির খেকে কেনাকাটা করুন। সমিতির সাধারণ সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং বিভিন্ন আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের নির্বাচনে, যদি থাকে, যোগ্য প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করুন।

পরিচালকদের হতে হবে সদস্যদের আশা-ভরসার নির্ভরস্থল

সমবায় সমিতিতে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হয়ে শক্তি বা পদমর্যাদা বাড়ল মনে করা উচিত। বরং এই পদমর্যাদা পাওয়ার ফলে সমবায় নীতি এবং আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণের সেবা করার একটা সুযোগ পাওয়া গেল বলেই ধরে নেওয়া উচিত। সাধারণ সদস্যরা আপনাদের বিশ্বাস করেন, আপনাদের ওপর নির্ভর করেন বলেই তারা আপনাদের ওপর এই গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। মনে রাখবেন সমিতির সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করছে পরিচালকমণ্ডলীর কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ও সর্বোপরি দায়িত্ববোধের ওপর। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে আপনার করণীয় কি?

* সমিতির এলাকার মধ্যে বসবাসকারী এবং উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তিকে সমিতির সদস্য করুন।
* পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিটি সভায় যোগ দিন, সক্রিয়ভাবে সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন। প্রতিটি সভায় সমিতির কাজের পর্যালোচনা করুন। আত্মসমালোচনা করুন, এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবুন।
* সৎ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তুলুন। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা আনুন। হিসাবপত্র যাতে সঠিকভাবে রাখা হয় সেদিকে নজর দিন এবং সময়মত নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করুন।
* বার্ষিক পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং বাজেট যাতে যথাযথভাবে এবং সময়মত্তে প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করা হয় তা সুনিশ্চিত করুন।
* সময়মত সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করুন, সময়মত নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখুন এবং জনমতের প্রতি মর্যাদাবান হোন।
* সময়, শ্রম এবং অর্থের অপব্যবহার বন্ধ করুন। খরচ কমান, আয় বাড়ান, সম্পদ বৃদ্ধি করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তার বিনিয়োগের পথ সুগম করুন।
* শুধু দেওয়া-নেওয়া বা কেনাকাটার গণ্ডিতে সমিতির কাজকে সীমাবদ্ধ না রেখে সদস্যদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে হাত দিন। পরিবেশ উন্নয়নের কথা ভাবুন, মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা ভাবুন, সমাজের জন্য চিন্তা করুন।

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার

সমবায় সমিতি আবশ্যিকভাবেই একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এর কিছু অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে। এজন্য শুধু পরিচালন পদ্ধতি বা প্রয়োগবিধি জানাই যথেষ্ট নয়, সমবায় আন্দোলন কি ও কেন, সমবায় নীতি ও তার তাৎপর্য জানাও বিশেষ প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। সমবায় সমিতির কর্মচারি, সাধারণ সদস্য এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য সকলের জন্যই আলাদা আলাদা ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। সমিতির উচিত এইসব ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা।

আন্দোলনের উন্নয়নের স্বার্থেই সমবায় শিক্ষা তহবিলকে পুষ্টসোষকতা করা দরকার

সমবায় শিক্ষা তহবিলে আপনাদের সমিতির প্রদেয় অর্থ যথাসময়ে জমা দিন। এটি কোন ট্যাক্স নয়, এ টাকা সরকারের ঘরেও জমা পড়ে না। এ টাকা সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি গ্রহণ করেন এবং সমবায় আন্দোলনের প্রচার, প্রসার ও সমৃদ্ধিকল্পেই তা খরচ করা হয়। মনে রাখবেন সমবায় আন্দোলনের সমৃদ্ধি মানে আপনার সমিতির তথা আপনার নিজেরও সমৃদ্ধি।

আসুন, আমরা সবাই মিলে স্বাগত জানাই ১৯৯৮-৯৯ সমবায় বর্ষকে। শপথ নিই সমবায় আন্দোলনকে জনমুখী করার, গতানুগতিকতার সীমা পেরিয়ে সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার।

ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা

প্রতি সংখ্যা	৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	৫০ টাকা
আজীবন চাঁদা	৬০০ টাকা

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৪১৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। সৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

আওয়েনের অর্থনীতি

ভোলানাথ দত্ত

[আওয়েনের লেখার মধ্যে আমরা প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা বিষয়সমূহ পাই যা সেই সময়ে ইংলিশ সমাজবাদী গ্রে, ইডজস্কিন এবং টমসন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আওয়েনের চিন্তাধারাকে প্রস্ফুটিত করেছিল। তারা সমাজবাদী নীতির দ্বারা উন্নয়নে অংশগ্রহণকে কার্যকরী রূপ দিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল সম্পদের উৎস হল শ্রম, সম্পদ মাপা হয় মূল্যে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটানো, ম্যালথাসের সূত্রের বিরোধিতা করাও আওয়েনের উল্লেখযোগ্য কাজ।]

১৮৪৪ সালে মার্কসের ধারণা হয় যে সমাজের দৈহিক গঠনের স্বরূপ অর্থনীতির মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। তখন থেকে প্রায় ৪০ বছর অর্থনীতি চর্চায় তিনি লিপ্ত থাকেন। 'মজুরি, শ্রম ও মূলধন' এবং 'মূল্য, দাম ও মুনাফা' রচনা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ ও 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তাঁকে কালজয়ী করেছে।

উক্ত প্রেক্ষাপটে আওয়েনের অর্থনীতির চিন্তা লক্ষ্যণীয়। মার্কসের পূর্বসূরি হিসাবে আওয়েনের অবদান কম ছিল না। ছয়টি মূল সূত্র দ্বারা আওয়েনের অর্থনীতির প্রকাশ পাওয়া যায়।

I. Labour the Source of Wealth.

II. Labour as the true standard of value.

III. Unity of Agriculture and Manufacture.

IV. Principles of Exchange

V. Men and Machines.

VI. The fallacy of Malthusianism.

শ্রম সম্পদের উৎস : সমাজে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন শ্রমজীবী মানুষকে সংসার চালানো ও পরিবার পরিজন প্রতিপালনের জন্য শ্রমের বিনিময়ে যথেষ্ট মজুরির প্রয়োজন। উক্ত সূত্র যতই বাস্তবসম্মত হোক না কেন তা বাস্তবায়িত করা কঠিকর ছিল, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন করা বা এমনকি কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান করা খুব সহজসাধ্য ছিল না যতক্ষণ না রাজা বা রাণীর অধীন সরকার এবং আইনসভায় এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আইন প্রণয়নের ফলশ্রুতি হিসাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাধা অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়েছিল। কর্ম সংস্থানের সাফোচনে বাধা দেওয়াও হয়েছিল।

আওয়েনের অর্থনৈতিক সূত্রকে নিম্নলিখিত ধারায় বিবেচনা করা যায় এবং উপসংহারের সত্য হিসাবে আলোকপাত করে।

প্রথম - সঠিকভাবে নির্দেশিত হলে দৈহিক শ্রমই হল সমস্ত সম্পদের উৎপত্তির উৎস এবং জাতীয় উন্নতির সোপান।

দ্বিতীয় - সঠিকভাবে নির্দেশিত হলে শ্রমিকদের যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থাকার প্রয়োজনীয় খরচের চেয়ে শ্রম সমাজে যথেষ্টই মূল্যবান।

তৃতীয় - সঠিকভাবে নির্দেশিত হলে দৈহিক শ্রমের ফল পৃথিবীর সকল প্রান্তে অব্যাহত রয়েছে ; আগামী বহু শতাব্দীতে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও এর বহুল থাকবে।

চতুর্থ - দৈহিক শ্রম সঠিকভাবে নির্দেশিত হলে গ্রেট ব্রিটেন ও তাদের পদানত দেশসমূহের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অকল্পনীয়তায় পৌঁছলেও সেখানকার অধিবাসী লাভবান হবেন।

পঞ্চম - যখন দৈহিক শ্রম সঠিকভাবে নির্দেশিত হয় তখন জনসংখ্যা অনেক বছর ধরে উৎসাহিত হতে পারে যেহেতু সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না।

উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসম্মত হাতিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক — এই মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে আওয়েনের দৃঢ় বিশ্বাস বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী ছিল ; কর্মক্ষম জনসংখ্যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আওয়েনের উক্ত ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি ছিল :

প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক বা কৃত্রিম সহায়ক যুক্ত করা প্রয়োজনীয় ছিল ; প্রকৃত চাহিদা ছিল একই এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লে মানুষের দৈহিক শক্তি কম লাগবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনেক সম্ভাব্য শক্তি যুক্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন হাতিয়ারে বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক শক্তির অতিরিক্ত বৃদ্ধিতে সম্পদও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি হবে। সেই অনুসারে এটা দেখা গেছে সব ধরনের সম্পদ বৃদ্ধিতে সেই সময়কার শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতা বর্তমান ছিল। পৃথিবীর সকল বাজারের বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রক্রিয়ায় মূলের মজুদ ছিল বেশি পরিমাণ।

তৃতীয়ত, বাজার পাওয়া গেলে সমাজের সম্পদ সৃষ্টিতে অতিরিক্ত সম্পদ সংযোজন করা যায় কেননা যারা কর্মসংস্থান চায় তারা সংখ্যায় কম। বহুসংখ্যক মানুষ আছেন যারা অল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনুপোযুক্ত। তা সত্ত্বেও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ও অনুত্য সম্পদ যোগান বাড়ানো হয়।

চতুর্থত, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কর্মসংস্থানের অভাব, সম্পদ বা পুঁজির কারণে হয় না। বরঞ্চ এটা দেখা যায় শ্রম বণ্টনের পদ্ধতি গ্রহণ না করার জন্য উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। বাজারের অভাব, বিনিময় ও উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে এক সহ-অবস্থান বিরাজ করে। তাই অনেক সময়ে অধিক পুঁজি নিয়োগ ফলপ্রসূ হয় না।

তাই সম্পদ সৃষ্টির পরে তার সুষম বণ্টনে কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। সকলের জন্য হিতকর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা কঠিন কাজ নয় এবং বেকারদের কর্মসংস্থান করা যায় যদি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সকল অংশের মধ্যে পরিকল্পনা থাকে।

শ্রম হল মূল্যের প্রকৃত মান। দেশের উন্নতি হ্রাস পায় মূল্যের মান পরিবর্তনের সাথে, পৃথিবীর সভ্য সমাজে সোনা ও রূপোকে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে মেনে নেওয়া হয় যদিও দুইটি ধাতু কৃত্রিম মানে পাওয়া যায় এবং এদের

ব্যবস্থাকে অসুবিধা ও বেসিক অবস্থা দেখা যায়। পরবর্তীকালে স্যার জন ইংলান্ড ব্যাঙ্কের নোট প্রবর্তন করে, এই বিনিময় ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সিদ্ধ করে।

নীতি হিসাবে মূল্যের সাধারণ মান হল মানুষের দৈহিক ক্ষমতা বা দৈহিক ও মানসিক কর্মকুশলতার যৌথ ক্ষমতা বা শ্রমশক্তি হিসাবে মানুষ প্রয়োগ করে থাকে। মানুষে মানুষে দৈহিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিশক্তি পৃথক। তাই শ্রমের মূল্যও পৃথক, এর সঠিক মূল্য নির্ধারণ করাও শক্ত। অতীতে বেশি করে ঘোড়াকে কাজে লাগানো হত এবং মানুষ ও ঘোড়ার শক্তিকে কাজে লাগানো হত। মানুষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসাবে বুদ্ধিশক্তিকে যোগ করা হত কিন্তু ঘোড়ার ক্ষেত্রে তা করা যায় না। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে যান্ত্রিক অন্যান্য শক্তির সংযোজন হয় ও শ্রমের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হতে থাকে।

মনুষ্য শ্রমের চাহিদা কখনও মূলের আকস্মিক পরিবর্তন সাপেক্ষ হয় না বা মানুষকে জীবনের অবলম্বনরূপে হয় না, বর্তমানে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার এবং শ্রমিক শ্রেণীকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে মজুরির দাসত্বে পরিণত [illegible] সমাজ কর্তৃক ক্রীতদাস প্রথার ফল হচ্ছে নিশ্চয়, তবে একে বর্বর বা সভ্য যে কোন দিকে নেওয়া যেতে পারে।

কৃষিজ ও শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঐক্য : সভ্যতার উষালগ্নে কৃষিজাতই ছিল মানুষের প্রধান বৃত্তি। পরে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন কৃষির সঙ্গে জুড়ে পরিণত হয়। কারণ মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু এবং কৃষি ছাড়া এটা সম্ভবপর নয়। আবার মানুষের স্বাচ্ছন্দের জন্য শিল্পবস্তুও প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণী যেমন উন্নত ভোগ্যবস্তু পেতে প্রত্যাশী তেমনি খাদ্যও তার প্রয়োজন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি দরকার, তাই যথেষ্ট অতিরিক্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা যাতে অতিরিক্ত কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারেন। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য সৃষ্ট পরিবেশ প্রবর্তনের প্রয়োজন যাতে শ্রমজীবী মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীও স্বাচ্ছন্দে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ ও সাবলীলভাবে সৃষ্টি করতে পারে ও বৃত্তিমূলক কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম ও বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে পারে কেননা সুস্থ্য সবল শ্রম ও জীবনের অনন্তের স্থিরিই উৎপাদনমুখী প্রক্রিয়া চালু রাখার পূর্ব শর্ত। জমি থেকে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত ফসল উচ্চশ্রেণীর জন্য রক্ষিত থাকে যে কৃষিতে ও বাগানের কাজে কায়িক শ্রম লাগে না।

বিনিময় নীতি : সকল ধরনের উৎপাদক অতি উৎপাদনে শঙ্কিত কেননা বিনিময় প্রক্রিয়ায় তাদের অসুবিধা দেখা দেয় এবং তাদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করতে পারে কেননা তারা তাদের প্রাপ্য বিনিময় মূল্য নাও পেতে পারেন। ফলে স্বার্থপরতার পরিবেশ গড়ে ওঠে, মন্থরতে প্রতিহত করার জন্য সাধারণ মানসিক সৌহার্দ্য প্রয়োজন। মানুষের সহজাত অফুরন্ত চাহিদা পূরণে সহজ সরল বিধিসমূহ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা যা কোন নতুন সংস্থা গঠনের দ্বারা সম্ভবপর। বাড়তি-স্বার্থপরতাকে দূর করতে অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহ যোগান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ [illegible] সকলেই লক্ষ করেছেন যে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে সৃষ্ট সম্পদ যা বাড়তি-চাহিদা ও স্বাচ্ছন্দ পূরণ করে উৎপাদন। উদাহরণ হিসেবে বোতলে আস্তে আস্তে তরল দ্বারা পূরণ হবে।

এইভাবে উৎপন্ন সম্পদ সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হবে, বর্তমান হাজার ধরনের প্রতিক্রিয়ার এই নতুন সম্পদ ভোগ প্রাপ্ত হবে, কেননা সমাজে অসংখ্যভাবে ঠকানোর ব্যবস্থা বিরাজমান। সমতা ও ন্যায়, স্বচ্ছতা ও মুক্ততা পরিবেশ সৃষ্টি নীতি নির্ধারণ করা মাত্রই সমাজকে প্রভাবিত করবে। ফলে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময় ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। প্রত্যেক সংস্থার বিশেষ উৎপাদনকে বৃদ্ধি করতে হবে। জীবনের স্বাচ্ছন্দ সামগ্রী ও সাধারণ প্রয়োজনীয় সরবরাহ ছাড়াও যদি সম্ভবপর হয় তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রভূত উৎপাদনের দরকার : মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর অন্তর্হিত মূল্যের বিনিময় মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন বিশেষ কারণে উদ্বৃত্ত উৎপাদন যা শিল্পে শক্তি এবং [illegible] যোগান দেবে সেই শিল্পের সমিতির সদস্যরা তাদের অন্তর্ভুক্তের [illegible] জন্যে, এবং উদাহরণ স্বরূপ স্থানীয় পরিকাঠামোর [illegible] এই সমস্ত কাজের প্রমের মূল্য সাধারণ মানের ও [illegible]

দৈহিক, মানসিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রমের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাজার সৃষ্টি ও বাজারের চাহিদার দিকগুলোকেও নজর দিতে হবে চাহিদার পরিমাণে। অনেক সময় মন্দার ভাবও দেখা দিতে পারে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড দেশির ব্যবসায় বা বিনিময়ে নতুন নোটের প্রবর্তন করেছিল তার বিনিময়ে নোটের অন্তর্নিহিত মূল্য গচ্ছিত রেখে।

মানুষ ও মেসিন : অনেকেই উৎপাদনের সঙ্গে মেসিনের সম্পর্কের কথা জানেন। মেসিনের আবিষ্কারের ফলে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে, অল্প সময়ে, কম খরচে নিখুঁতভাবে মালপত্র উৎপাদিত হয়। এমনকি মেরামতি ও সংস্কার সাধনের কাজেও মেসিনের ভূমিকা রয়েছে। মেসিনের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতাও দিন দিন উন্নত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে মেসিনের রূপ ও রূপান্তর ঘটেছে। মেসিনের যন্ত্রপাতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে। মেসিন ও যন্ত্রপাতির গঠনে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও মেসিনের উদ্ভব ঘটে যাচ্ছে। মেসিনে কাঠ, ব্রাস ও লৌহের চল প্রথমদিকে দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ধাতুর চলন এসে যায়। পরীক্ষা-নীরিক্ষার মধ্য দিয়ে গবেষণার ফলে মেসিনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। মেসিন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের স্থান দখল করল, কেননা মেসিন তার প্রভুকে ঠকায় না। ব্যবসায় মেসিন অর্থ সাশ্রয় করে। সঠিক পরিকল্পনা করে বর্তমানে মেসিনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

মালথুজিয়ানিজমের ভ্রমাত্মক ধারণা : প্রজ্ঞা, সঠিক আইন ও প্রশিক্ষণ দ্বারা সকল মানুষ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্জন করে এবং অভ্যাস বলে যদি প্রয়োজন হয় তবে অধিক উৎপন্ন করে যা তার প্রয়োজন ও বিনোদনে দরকার হয়। তাই পৃথিবীর উর্বর ক্ষেত্রে জনগণ বেশি সংখ্যায় ও সুখে বাস করে তাদের গায়ে দুঃখ ও কলঙ্ক লাগে না।

এ ব্যাপারে মালথাস সঠিক যখন তিনি বলে থাকেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা অবিরত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই জনসংখ্যার জন্য খাদ্যেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু তিনি এই [illegible] যে পরিবর্তন ও বৃদ্ধিমান লোকের

কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা একটি কৃষি থেকে কি পরিমাণ ও কতদিন সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর। যদি একটি অপরার্থ ও অজ্ঞ সরকার থাকে তবে কি উক্ত সূত্র কাজ করবে? উত্তর এক থেকে অসীম। কেননা মানুষ খাদ্য উৎপাদনে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে না। কি পরিমাণ ক্ষমতা তার সঙ্গে যুক্ত আছে? মানুষের জ্ঞান শৈশবের কোন পর্যায় আছে।

মানুষের খাদ্যের ধারণা যৌলিক পদার্থের যৌগিক পর্যায়ে বিজ্ঞেনা, করা যেতে পারে। রসায়নের জ্ঞান আমাদের প্রত্যয় গুণ, সংযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের নতুন ধারণা দেয় এটা এখনও বলা যায় না কোন জ্ঞান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বা তাকে শেষ করে দেবে।

মনুষ্য আমাদের কাছে খাদ্যের অমূল্য ভাণ্ডার হিসাবে এখনও বিবাজমান। খুবই সহজভাবে বলা যায় পৃথিবীর জনসংখ্যা অনেক সহস্র বছর ধরে বাস পাবে। মানুষ প্রকৃতি ও সূর্যের বহুদিন কাঁচারে. তার গায়ে ধূলি কষ্ট ও গ্লানি ছোঁয়া লাগাবে না। যদি মানুষের প্রজনন প্রজোগ সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে মানুষ সুস্থের উচ্চপর্যায়ে মনুষ জীবন যাপন করবে। একজন কৃষিজীবী জানে যে সে যে-পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করে তার চেয়ে এক-ষষ্ঠাংশ সে ভক্ষণ করে। তাই যদি সে কোন সুযোগ সুবিধা সে না পায় তাহলে জনসংখ্যার চাপ আমরা এখন যা পাই তা সেখানে থাকে সেখানে প্রকৃতিতে কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন পৃথিবীর সমস্ত ভার ১'বের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে আমরা ৮-সন্তের যে একটা চাহিদাও যোগানের ক'ষম সূত্র সেটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র থেকে উদ্ভূত — সমাজে সমষ্টিগত ভালোর বিপরীত। এটা অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টিতে জনসংখ্যার চাপ বলে অভিহিত।

❑

সংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি

সারা দেশের প্রায় ৫ কোটি পরিবার সংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত। গত ১৯৮১ সালে এই কর্মসূচিটি চালু হয়। গত ১৭ বছর ধরে ভর্তুকি হিসেবে এই কর্মসূচি খাতে ১,৬৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সময়ে মোট ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ১৮,৩৬৬ কোটি টাকা। এই কর্মসূচিতে উপকৃতদের মধ্যে ৫০ শতাংশে তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই কর্মসূচি ৩৩ শতাংশে মহিলাদের কাছে পৌঁছেছে। বর্তমানে পরিবার প্রতি কর্মসূচিটিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫,০৬৮ টাকারও বেশি।

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে সমৃদ্ধি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছিল। কর্মসূচিটি কেন্দ্র গ্রামোন্নয়ন সংস্থা রূপায়ণ করবে এবং এই কর্মসূচিতে ভর্তুকির তার কেন্দ্র ও রাজ্য আধাআধিভাবে বহন করে। ❑

পতিত জমি উন্নয়নে

দেশের পতিত জমি উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র এ পর্যন্ত ৩৯৪.০৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬.২৫ লক্ষ হেক্টর জমি চাষযোগ্য করে তোলা হবে। সারা দেশের প্রায় ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত বলে চিহ্নিত হয়েছে। জল ও বায়ু দ্বারা মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় এইসব জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনযোগ্য নয়। এইসব জমির মাটির রাসায়নিক উপাদান ও উর্বরক্ষমতা হ্রাস করেছে।

গ্রামাঞ্চল ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের আওতায় ১৯৯২ সালে পতিত জমি উন্নয়ন বিভাগ গড়ে তোলার পর থেকে এই বিভাগ সমগ্রদেশে পতিত জমি উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। অরণ্যাঞ্চলগুলির বিভাগের সঙ্গে প্রযুক্তি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিও এই বিভাগ রূপায়িত করে। এইসব পতিত জমির ক্ষয় রোধ করা এবং জ্বালানি ও পশু খাদ্যের যোগানের ব্যবস্থা করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে যে পতিত জমিতে ভাল মানের ডাল ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব।

ট্রাইসেম কর্মসূচি

ট্রাইসেম কর্মসূচিতে এ-পর্যন্ত ৪২ লক্ষ গ্রাম্য তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এই কর্মসূচিতে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত আর্থিক বছরে ট্রাইসেম কর্মসূচিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে ৯৪ কোটি টাকা ও আবর্তক ব্যয় খাতে ৩৬.৪৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ❑

পি আই বি

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত

১৯৯৫সালের ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা জাতীয় শিক্ষক হিসাবে তুফানগঞ্জ টাউন বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তানুপ্রকাশ দে-কে পুরস্কৃত করেন। পুরস্কার হিসাবে শ্রী দে পেয়েছেন একটি রৌপ্যপদক, মানপত্র ও দশ হাজার টাকা মূল্যের একটি চেক।

শ্রী দে সাতাশ বছর যাবৎ একই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে থেকে পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে সাবোদে প্রকাশ। বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি সর্বদা সচেষ্ট। ছাত্র, শিক্ষকদের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৯৩ সালে এই মহকুমার পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের মূল্যায়নের বিচারে প্রথমস্থান অধিকার করেছিল তুফানগঞ্জ টাউন বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই কারণে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এই বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করেন। পুরস্কার স্বরূপ প্রশংসাপত্র এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রদান করেছেন।

আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি যেমন সকলের কাছে জনপ্রিয় ঠিক তেমনি একজন সমাজসেবী হিসাবেও সমাজের মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রী দে বিভিন্ন সমবায় সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত।

তিনি কোচবিহার জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক, তুফানগঞ্জ লার্জ সাইজড্ কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির সম্পাদক। তুফানগঞ্জ দ্বিমুখর সমবায় সমিতির অন্যতম পরিচালক। এছাড়া, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ভিজিটিং কমিটির সদস্য, তুফানগঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগারের গভর্নিং বডির সদস্য, (অনাথ) শিশুকল্যাণ সমিতির সহ-সম্পাদক এবং আরো বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সমবায় সমাচার

জেলা সমবায় সম্মেলন ও আলোচনাচক্র

জলপাইগুড়ি । গত ৭ মার্চ জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় কদমতলা আজাদ হিন্দ পাঠাগার ভবনে ১৯৯৭-৯৮ বর্ষের "জেলা সমবায় সম্মেলন ও আলোচনাচক্র" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ইউনিয়ন সভাপতি প্রদীপকুমার গাঙ্গুলি। প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি সত্যজিৎ বসু বলেন, অনেক সমবায় সমিতিতেই কর্মী, পরিচালক ও সদস্যদের মধ্যে ঐক্য না থাকায় সমবায় আন্দোলনের প্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না। এদিককার বেশির ভাগ কৃষি সমবায় সমিতির ঋণ আদায়ের হার দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় হতাশাব্যঞ্জক। পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সমবায়কে বাঁচিয়ে তুলতে তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে সহ-নিয়ামক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলায় অধিকাংশে সমিতি রুগ্ন হয়ে পড়ছে। তুলনায় কর্মী কল্যাণ ও শ্রমিক কারিগরী সমবায়ের অবস্থা ভালো। সমিতিগুলির (কৃষি) মধ্যে ঋণনির্ভরতা আনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কর্মীদের মধ্যে 'কমন ক্যাডার' প্রথা বাতিল করেছেন। এতে প্রাথমিক অসুবিধা থাকলেও পরবর্তীতে নিজ চেষ্টায় সমিতিগুলি নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন। সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান অনুপ ঘোষ, রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, কাই টোকেমিক্যাল কারখানার সুপার রাজেশ সান্যাল এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে দেবাশিস ঘোষ (কর্মী কল্যাণ), অমলা রায় (কৃষি), নির্মাল্য দাসগুপ্ত (শিল্প), দীপক দে (শ্রমিক), সুবর্ণরঞ্জন রুদ্র (আবাসন) উল্লেখযোগ্য। ধন্যবাদ দেন বাসন্তী গুহ। মোট ১৫০ জন সমবায়ী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

জেলাস্তরে সমবায় প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় জেলার স্কুল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে (নবম ও দশম) কদমতলা আজাদহিন্দ পাঠাগার ভবনে গত ২২ এবং ২৩ ডিসেম্বর '৯৭ যথাক্রমে 'বসে লেখ' পদ্ধতিতে 'জাতীয় সংহতি ও সমবায়' বিষয়ে প্রবন্ধ ও 'আর্থ সামাজিক সংকট নিরসনে সমবায় প্রভূত সহায়তা করে' বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় ক্ষেত্রে ফলাফলে প্রবন্ধ — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে যথাক্রমে পৌষালি সরকার (দশম)- দেশবন্ধুনগর হাইস্কুল, মেঘালী বসু (নবম)- জেলা স্কুল, সাথী চৌধুরী (নবম)- বেগম রকেয়া মহিলা বিদ্যালয়। বিতর্ক- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান যথাক্রমে তাপস দে (নবম)-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় (পক্ষে), অরবিন্দ দেব (নবম)-ঈশ্বরচন্দ্র দেব বিদ্যালয় (বিপক্ষে) ও সন্ধ্যাসাথী বক্সি (দশম)- দেশবন্ধুনগর হাইস্কুল (পক্ষে)। প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অর্থনীতির অধ্যাপক দেবাশিস ঘোষ ও সমবায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের প্রধান অনুপ ঘোষ। বিতর্কের বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন অসীম ব্যানার্জি (সহ-নিয়ামক), নিরঞ্জন

ভট্টাচার্য, (শিক্ষা সহ-অধিকর্তা), অনুপ ঘোষ, শিক্ষার প্রবীণ গাঙ্গুলি সভাপতি জেলা সমবায় ইউনিয়ন।

❑ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডেশ্বরে সমবায় কর্মশালা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে প্রাথমিক কৃষিঋণ সমবায় সমিতিগুলি যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে সর্বাগ্রে তাদের উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রাথমিক সমিতিগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনটি মুখ্য উপাদান — (ক) ব্যবসা সংক্রান্ত, (খ) সদস্যদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত, (গ) সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত।

উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা ও বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্ধমান বেল্ট — ২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় এবং সমবায় শিক্ষা ভবনের আর্থিক সাহায্যে মণ্ডেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে স্থানীয় বিভিন্ন সমবায় সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও ম্যানেজারদের নিয়ে গত ২৫-২-৯৮ তে একটি সমবায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার মোট ২৬টি প্রাথমিক সমিতি থেকে ৪২ জন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাটির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান। তিনি তাঁর ভাষণে এইরূপ কর্মশালার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ব্যবসা, সদস্যদের অংশগ্রহণ ও সমবায় আন্দোলনসংক্রান্ত বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে বুকলেট সহ-নিয়ামক উদ্বোধন দিবসপতি। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জুরামোহন কোঙার, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সুভাষ মজুমদার, ব্লক-ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিত্র ঘোষ, কাটোয়া-কালনা-সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নির্বাহী আধিকারিক মনোরঞ্জন দাস। আলোচনাকে বাস্তবোচিত করবে ও সুপারিশ গ্রহণের জন্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দুটি গোষ্ঠিতে ভাগ করে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করতে দেওয়া হয়। স্থানীয় সমবায় পরিদর্শক তথাগত মুখার্জি বাবাবি আঞ্চলিক মার্কেটিং-এর নির্বাহী আধিকারিক উমাশঙ্কর দাস ও সুপারভাইজর বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য আলোচনায় সাহায্য করেন। জামনা ইউ সি এ সি এস-এর সভাপতি শুকপ্রসাদ ধাঁ ও কুলটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার হরিপুর রহমান আলোচনার সুপারিশগুলি উপস্থাপনা করেন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রণজিৎ মুখার্জি ও সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

বর্ধমান বেল্ট-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের অস্থায়ী ডিরেক্টর মাধবী দাস সমাপ্তি ভাষণ দেন এবং ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

❑ প্রবীর দাস

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ওণে, মানে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা শতবার্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির প্রতিষেধক হিসাবে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিংএ মনোরম পরিবেশে

হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায়ভিত্তি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১২ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন ঃ ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬		১০০		১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৩৯০৪.৫৯	(+) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
53-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ April -98 ■ Vol. XXXVI ■ Postal Regd. No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* *বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।*
* *৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।*
* *ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।*
* *মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।*
* *সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।*

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

পত্রিকার স্বত্ব সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অমীম রায় কর্তৃক ২০এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং আরডি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা
সকলে আসুক সকল দিক থেকে।

শৃণন্তু বিশ্বে
শুনুক বিশ্বের লোক।

বেদাহম্
আমি জানি।

ভাণ্ডার

মে, ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

আজ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত লোকে দেশের কাজ করিবার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। কোন্ কাজটা বিশেষ দরকারী এ-প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়। অনেকে সেবা করিয়া, উপবাসীকে অন্ন দিয়া, দরিদ্রকে ভিক্ষা দিয়া দেশের কাজ করিতে চান। গ্রাম জুড়িয়া যখন আগুন লাগিয়াছে তখন ফুঁ দিয়া আগুন নেবানোর চেষ্টা যেমন ইহাও তেমনি। আমাদের দুঃখের লক্ষণগুলিকে বাহির হইতে দূর করা যাইবে না, দুঃখের কারণগুলিকে ভিতর হইতে দূর করিতে হইবে। তাহা যদি করিতে চাই তবে দুটি কাজ আছে। এক, দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া – বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদের মনটা গ্রাম্য এবং একঘরে হইয়া আছে, তাহাদিগকে সর্বমানবের জাতে তুলিয়া গৌরব দিতে হইবে, ভাবের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে। আর এক, জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া। বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাংসারিক দিকে তাহারা দুর্বল ও একঘরে হইয়া আছে। এখানেও তাহাদিগকে মানুষের বড়ো সংসারের মহাপ্রাঙ্গণে ডাক দিয়া আনিতে হইবে, অর্থের দিকে তাহাদিগকে বড়ো মানুষ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিকড়ের দ্বারা যাহাতে মাটির দিকে তাহারা প্রশস্ত অধিকার পায় এবং ডালপালার দ্বারা বাতাস ও আলোকের দিকে তাহারা পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইতে পারে, তাহাই করা চাই। তাহার পরে ফলফুল আপনিই ফলিতে থাকিবে কাহাকেও সেজন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে না।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ½% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও তেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। বেদাহম্।

সকলে আসুক সকল দিক থেকে। শুনুক বিশ্বের লোক। আমি জানি।

ভাণ্ডার

মে, ১৯৯৮

প্রতিষ্ঠিত : ১৩২৫ বঙ্গাব্দ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ৫
সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রথম বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলন ৯
বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনির অভ্যর্থনা
সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথ - একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা : বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
নবম পরিকল্পনা ভারতের কৃষি উৎপাদনকে
উজ্জীবিত করতে পারবে কি? : সুনীল ঘোষ
সমষ্টির কল্যাণকল্পে বিভিন্ন স্তরে সমবায়
সমিতির ভূমিকা : বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
সমবায় প্রশিক্ষণ সূচি ১৯৯৮-৯৯
সমবায় সমাচার

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশার স্তব্ধ বাক্য ; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি কেন।
রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের ভাষা যাবে শোনা
ভেঙে যাবে রুদ্ধশ্বাস নিরন্ধ্র সুদীর্ঘ মৌনতা
আমাদেরই দুঃখে-সুখে ব্যক্ত হবে প্রত্যেক রচনা
পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত হবে সব কথা।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

নোবেল প্রাইজের টাকা পতিসর কৃষি ব্যাঙ্কে ডিপোজিট রাখা হয়

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সচ্ছলেরাই কম আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, যেন থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসংস্কারের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পাননি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়- কিন্তু সুদের হার এত বেশি আর সুদের সুদ আসল হয়ে উঠে আসল কোনোদিন শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজনমত কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দু'-একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে আরও হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সেই ধার করা টাকা-বাবদ বাবাকে শতকরা ৮ টাকা সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলেও কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এই জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১,০৮,০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অন্তত প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানায় যখন তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কি করবেন। সুরেনদা (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দু'দিকেই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল বন্ধ বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বহুরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম পরগনার যতো বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি অনেকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু বছর প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness-এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না-নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারেনি।

সূত্র। অতীত দিনের ভাণ্ডার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী ড. অসীমকুমার দাশগুপ্ত'র ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেট বিবৃতিতে সমবায় প্রসঙ্গ

২.১৫। একইসঙ্গে লক্ষণীয় যে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গত কয়েক বছরে লক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে। জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৩১ মার্চ, ১৯৯০-তে যথাক্রমে ৫১৩ ও ২৮১ কোটি টাকা থেকে শুধু যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ মার্চ, ১৯৯৭-তে যথাক্রমে ৮১৯ ও ৬১৮ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে তাই নয়, এই দুই স্তরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-আমানতের অনুপাত গত পাঁচ বছরে গড়ে ৭০ শতাংশেরও বেশি থেকেছে এবং এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তাদের মোট ঋণের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশেরও বেশি ঋণ দিয়েছে ছোট শিল্পোদ্যোগী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আদায়মাত্রা থেকেছে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি, যা সাধারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণ আদায়ের মাত্রার থেকে অনেক উন্নত। আমরা চাই এরাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি শিল্পায়ন ও কৃষির উন্নয়নে আরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক। পাশাপাশি, এই ক্ষেত্রগুলিতে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩.৭। রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, জনপরিবহনের আরও সম্প্রসারণের জন্য প্রতিটি জেলাতে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা পরিষদ, পরিবহন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে, স্থানীয় বেকার যুবকদের দিয়ে সমবায় গঠন করে, তাদের মারফৎ চুক্তির ভিত্তিতে অতিরিক্ত বাস চালাবে। এই জনপরিবহন প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে ১৫ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করবে।

৩.৯। এই শিল্পগুলি হতে পারে পঞ্চায়েত বা পুরসভার সঙ্গে যৌথ-উদ্যোগে, সমবায় (মহিলা সমবায় সমেত) ভিত্তিতে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

৩.১৬। কলকাতা এবং জেলার শহরগুলিতে বস্তি এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য এই পরিকাঠামো উন্নয়ন অর্থ নিগম থেকে অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব আমি রাখছি। এই পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে, এর রচনা ও রূপায়ণে, বস্তি এলাকার যুবকেরা সমবায় স্থাপন করে সরাসরি যুক্ত হবেন।

৩.১৮। প্রতিযোগিতাভিত্তিক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলের মতন শহরাঞ্চলেও আমরা চাইছি যে শহরাঞ্চলে বস্তি এলাকার, উদ্বাস্তু কলোনী এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের এলাকাতে, পরিবেশ দূষণ না করে, ছোট শিল্প এবং সেবাভিত্তিক পরিষেবামূলক শিল্প স্থাপিত হোক। এই উদ্দেশ্যে, প্রতিটি বস্তি, উদ্বাস্তু কলোনি এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এলাকার আগামী বছর থেকে রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায়, যাতে নাগরিক সমবায় সমিতি / ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই সমবায় সমিতি / ব্যাঙ্কগুলি চলবে এলাকার যুবক-যুবতীদের চুক্তির ভিত্তিতে যুক্ত করে। সমবায় ব্যাঙ্কব্যবস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগম থেকে শহরাঞ্চলে এই ছোট শিল্পগুলি স্থাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা ঋণ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকেও সমপরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা রাখা হবে। নাগরিক সমবায় সমিতি /ব্যাঙ্কগুলি শুধু ঋণ প্রদানের মাধ্যম হবে না, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং বিপণনের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

সংকলন। তোলানাথ বসু

সম্পাদকীয়

সেদিন তেমন করে কিছু বলা হয়নি বলে জিলা পরিষদের সভাধিপতির মনে দুঃখ ছিল। প্রায় বিশ বৎসর গ্রামের আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি কাজ করে চলেছেন। তাঁর জেলার অনেক সমবায় সমিতির কাজকর্মের সাথে তিনি পরিচিত। আবার কোন কোন সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে তিনি সক্রিয় ভূমিকাও নিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে অনেক সমবায় সমিতি গ্রামের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সামিল হতে পারছে না। সমবায় সমিতি যেন একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, এককভাবে সমবায় সমিতি যেন তার সভ্যদের আর্থিক উন্নতি বিধান করতে পারবে। পঞ্চায়েত গ্রামের সকলের জন্য, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। সভাধিপতির ধারণা সমবায় সমিতি গ্রামের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি পরিকাঠামো হিসাবে কাজ করুক। এই পরিকাঠামো ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিভূমি হোক আর পঞ্চায়েতের সাথে একটা আত্মিক যোগ গড়ে উঠুক। এতে পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সমবায়ের আর্থিক গণতন্ত্রের মিলন ঘটবে। সমবায় সমিতির নিজস্ব আর্থিক অবস্থা খুব বড় কথা নয়। সমবায় সমিতি গ্রামের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি পরিকাঠামো হিসাবে কাজ করলে সেই অসুবিধা দূর হবে। এতে সামাজিক সম্প্রীতিরও প্রসার ঘটবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা এই কথাগুলি স্মরণ করে যেন আমাদের কর্মপদ্ধতি পরিচালনা করি। পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির মধ্যে আত্মিক যোগ গড়ে উঠুক।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই
আজ প্রার্থিত —
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের দিঘা, পুরী, দার্জিলিং ও গ্যাংটক-এ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ নিবাসের (হলিডে হোম) সুবিধা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭৫ বৎসর ধরে (১৯২৪-১৯৯৮) সাধারণের পরিষেবায় উজ্জ্বল নজির সৃষ্টিকারী এই ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চায়। মাখলা ও হিন্দমোটর-এ দুটি শাখা কেন্দ্র (ব্রাঞ্চ) খোলার সিদ্ধান্ত সেই আকুতিরই ফলশ্রুতি।

নন্দ গোস্বামী
সভাপতি

মদনকুমার বণিক
সম্পাদক

উত্তরপাড়া, হুগলি
পিন ঃ ৭১২ ২৫৮
ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

মশা মারতে না পারায় রোখা যাচ্ছে না ম্যালেরিয়া : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ওজনবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে বিধানসভায় জানিয়েছেন, মশার বংশবৃদ্ধি কোনওভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না। তাই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না ম্যালেরিয়া। পার্থবাবু বলেন, অপরিকল্পিতভাবে অযথেচ্ছ মশা মারার তেল ব্যবহারের ফলে মশার মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি জন্মে গিয়েছে। মশা মারার তেলে মশা আর মরছে না। উল্টে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের একটি রিপোর্টও পড়ে শোনান পার্থবাবু। রাজ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় গ্রামে গ্রামে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মশা মারার ওষুধ ছড়ানোর আগেকার পদ্ধতি ফের চালু করা যায় কি না জানতে চেয়েছিলেন কয়েকজন বিধায়ক। পার্থ দে তার জবাব দিচ্ছিলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতে, "ম্যালেরিয়া এখন আর ডাক্তারি সমস্যা নয়। এখন এটা একটা সামাজিক সমস্যা।" সেইভাবেই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচি তৈরি করা হচ্ছে।

সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৮ মার্চ, ১৮[তি]

সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের এই কাজ উপলক্ষে কী করে মিলন হল একটু বলে রাখি আমি নিজে অবশ্য ডাক্তার নই, এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে আমার মতের কোন মূল্য নেই। আপনারা সকলে জানেন আমাদের যে 'বিশ্বভারতী' বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তার অন্তর্গত করে শান্তিনিকেতনের চারিদিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে সে গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের আশ্রমে আমরা ছেলেদের বিদ্যাচর্চা করে থাকি বটে, কিন্তু আমার বরাবর এই মত — বিদ্যাকে, স্কুল-কলেজগুলিকে জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র হতে বিচ্ছিন্ন করলে পরে আমাদের অন্তরের সঙ্গে মিল খায় না, তাকে জীবনের বস্তু করা যায় না। এইজন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে চেষ্টা করছি চারিদিকের গ্রামের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের বিদ্যানুশীলনের কর্মকে একত্র করতে। এই কাজ আমাদের চলছিল। এখানে এই সভাগৃহে আমাদের এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। যাঁরা সে সভাক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা জানেন কি রকমভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে। এই কাজ হাতে নিয়ে প্রথমে দেখা গেল — রোগের দুর্গতি। আমরা অধ্যবসায়ী, আমাদের এমন সাহস ছিল না যে বেদের জোরে বলি যে, যাঁরা অভিজ্ঞ, গ্রামের রোগনিবারণ কাজে তাঁরা সহায়তা করুন। নিজেরাই যেমন করে পারি চেষ্টা করেছি। এ সম্বন্ধে বিদেশি লোকের কাছে সাহায্য পেয়েছি, সে কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি। আমরা আমেরিকার একটি মহিলাকে সহায়রূপে পেয়েছি। তিনি ডাক্তার নন, যুদ্ধের সময় রোগীর শুশ্রূষা করাতে কতকটা পরিমাণে হাতে-কলমে জ্ঞান হয়েছে সেইটাকেই মাত্র নিয়ে তিনি রোগীদের ঘরে ঘরে এক হাঁটু কাদা ভেঙে গিয়েছেন, অতি দরিদ্রের ঘরে গিয়ে সেবা করেছেন, পথ্য দিয়েছেন — অত্যন্ত কদর্য ঘা, যা দেখে ভদ্র সমাজের লোকের ঘৃণা হয়, সে সমস্ত নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়েছেন — যারা অন্ত্যজ জাতি তাদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, পথ্য খাইয়েছেন — আজ পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন, অসহ্য গরমে শরীরের গ্লানি সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃসাধ্য কর্মও তিনি ছাড়েননি। শরীর যখন ভেঙে পড়ল, শিলং গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, ফিরে এসে আবার শরীর নষ্ট করেছেন। এমন ভাবে তাঁকে পেয়েছি। তাঁকে দেশে যেতে হবে, বেকায়টা দিন আছেন প্রাণপাত করে সেবা করছেন।

আর একজন সহৃদয় ইংরেজ এল্‌মহার্স্ট, তিনি এক পয়সা না নিয়ে নিজের খরচে বিদেশ থেকে নিজে টাকা সংগ্রহ করে সে টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তিনি নিজেও চতুর্দিকের গ্রামগুলির দুরবস্থা কী করে মোচন হতে পারে, এর জন্য কী না করেছেন বলে শেষ করা যায় না। যে দুজনের সহায়তা পেয়েছি সে দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন, এঁদের নিয়ে কাজ করছি

একটা ঘটনা শুনেছি — হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেই রকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে, যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় করব, সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে প্রাণ-স্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত করে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

মানুষ কথা বলে, মানুষের ভাষা আছে। জন্তুর ভাষা নাই। মানুষের এই ভাষার ফলটা কী? যে মনটা আমার নিজের মধ্যে বাঁধা সেই মনটাকে অন্যের মনের সঙ্গে ভাষার যোগে মিলাইয়া দিতে পারি। কথা কওয়ার জোরে আমার মন দশজনের হয়, দশজনের মন আমার হয়। ইহাতেই মানুষ অনেকে মিলিয়া ভাবিতে পারে। তার ভাবনা বড়ো হইয়া উঠে। এই বড়ো ভাবনার ঐশ্বর্যেই মানুষের মনের গরিবিয়ানা ঘুচিয়াছে।

এইটে আপনারা বুঝতে পারেন, পতঙ্গে মানুষে লড়াই। আমাদের রোগশত্রুর কথাটি যে ক্ষেত্রে অধিকার করে আছে সে অতি বিস্তীর্ণ এই বিস্তীর্ণ জায়গায় পতঙ্গের মতো এত ক্ষুদ্র শত্রুর নাগাল পাওয়া যায় না। অন্তত ২/৪ জন লোকের দ্বারা তা হওয়া দুঃসাধ্য, সকলে সমবেতভাবে কাজ না করলে কিছুই হতে পারে না। আমরা হতভম্ব হলাম, চেষ্টামন্ত্র করছিলাম, এমন সময় আমার একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, মেডিকেল কলেজে পড়ে, আমার কাছে এসে বললে, 'গোপালবাবু খুব বড়ো জীবাণুতত্ত্ববিদ, এমনকি ইউরোপে পর্যন্ত তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি খুব বড়ো ডাক্তার, যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। আপনারা ম্যালেরিয়ার সহিত লড়াই করতে যাচ্ছেন, তিনি সে কাজ আরম্ভ করেছেন। নিজের ব্যবসাতে ক্ষতি করে একটা পণ নিয়েছেন — যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাংলাদেশকে তার প্রবলতম শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন।' যখন এ কথা শুনলাম, আমার মন আকৃষ্ট হল। আমাদের এই কাজে তাঁর সহায়তা দাবি করতে সংকল্প করলুম। মশা মারবার অস্ত্র পাব এজন্য নয়, মনে হল এমন একজন দেশের লোকের খবর পাওয়া গেল যিনি কোনরকম রাগদ্বেষের উত্তেজনায় নয়, বাহিরের তাড়নায় নয়, কিন্তু একান্তভাবে কেবলমাত্র দেশের লোককে বাঁচাবার উপলক্ষে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন — এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ো বিরল। আমার মনে খুব ভক্তির উদ্রেক হল বলে আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয় আলোচনা করতে চাই। এমন সময় তিনি স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর কাছে শুনলাম তিনি কীভাবে কাজ আরম্ভ করেছেন। তখন এ কথা আমার মনে উদয় হল, যদি এঁর কাজের সঙ্গে আমাদের কাজ জড়িত করতে পারি তা হলে কৃতার্থ হব, কেবল সফলতার দিক থেকে নয় — এঁর মতো লোকের সঙ্গে যোগ দেওয়া একটা গৌরবের বিষয়।

আপনারা দেখেছেন, যুদ্ধের পর এই যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার প্রতিভা ম্লান হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে দৈহিক দুর্বলতা তার কারণ। যখন ব্লকেড দ্বারা খাবার বন্ধ করা হয়েছিল, সেসময় অনাহারে অনেক মানুষ মরেছে সেইটেই বড়ো কথা নয়। যে সমস্ত শিশুর দুধ খাওয়ার দরকার ছিল, যে সমস্ত প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার ছিল, তারা তা না পাওয়ায় এই যুদ্ধের শিশুরা অপরিপুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে এল। এর ফলে এরা বড়ো হলে যেমন বুদ্ধিশক্তির জোর নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাতেই এই হিসাবে দেখতে গেলে মাথা গুনতি অনুসারে লোকসংখ্যা হয় না, যাদের মাথা আছে তাদের কার্যকারিতা কতদূর তা দেখতে হবে। শুধু সংখ্যা গণনা ঠিক গণনা নয়। বাংলাদেশে আমরা ভাবছি না —যেখানে আমাদের স্বাস্থ্যের মূল উৎস সেখানে সব শুকিয়ে যাচ্ছে। আমরা রোগের বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চিরদুর্বলতা বহন করে আছি। প্রতি বৎসর কত লোক উজাড় হচ্ছে, কত লোক মরছে, সংখ্যা কত বৃদ্ধি হচ্ছে, এটা বড়ো কথা নয়, যারা টিকে রইল তারা মানুষের মতো রইল কি না সেইটে বড়ো কথা। তাদের কার্যকারিতা, মাথা খাটাবার শক্তি আছে কি না সেইটে বড়ো কথা। বড়ো জীবযূথের দল যদি অধিকাংশে হয়, তার বোঝা ভারি বইতে পারবে না। শারীরিক দুর্বলতা থেকে মানসিক দুর্বলতা আসে। ম্যালেরিয়া রক্তের মধ্যে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যেও বল পাই না। যার প্রাণের প্রাচুর্য আছে সে প্রাণ দিতে পারে। যার কেবল কোনরকমে বেঁচে থাকা চলে, জীবন ধারণের জন্য যা দরকার তার বেশি যার একটুও উদ্বৃত্ত হয় না, তার প্রাণে বদান্যতা থাকে না। প্রাণের বদান্যতা না থাকলে বড়ো সভ্যতার সৃষ্টি হতে পারে না। যেখানে প্রাণের কৃপণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা আসবে। প্রাণের শক্তির এত বড়ো ক্ষয় কোন সভ্য দেশে কখনও হয়নি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্গতির কারণ সব দেশেই আছে। কিন্তু মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কী। না, সেই দুর্গতির কারণকে অনিবার্য বলে মনে না করে, যখন যাতে কষ্ট পাচ্ছি চেষ্টা দ্বারা তাকে দূর করতে পারি, এ অভিমান মনে রাখা। আমরা এতদিন পর্যন্ত বলেছি, ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী তার সঙ্গে কী করে লড়াই করব, লক্ষ লক্ষ মশা রয়েছে তাদের তাড়াব কী করে, গভর্নমেণ্ট আছে সে কিছু করবে না, আমরা কী করব। — সে কথা বললে চলবে না। যখন আমরা মরছি, লক্ষ লক্ষ মরছি — তত লক্ষ না মরেও মরে রয়েছে — যে করেই হোক এর যদি প্রতিকার না করতে পারি আমাদের নিষ্কৃতি নেই। ম্যালেরিয়া অন্য ব্যাধির আকর। ম্যালেরিয়া থেকে যক্ষ্মা, অজীর্ণ প্রভৃতি নানারকম ব্যামো সৃষ্টি হয়। একটা বড়ো ঘর খোলা পেলে যমদূতেরা হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ে, কী করে পারব তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। গোড়াতে মরণ বন্ধ করা চাই, তবে যদি কাহিলি জাতিকে আমরা বাঁচাতে পারি।

আর একটা কথা আছে, সেইটে আপনারা ভাবছেন। এই যে নিজের প্রতি অবিশ্বাস এ যদি কোন এক জায়গায় মানুষ দূর করতে পারে — সমস্ত অমঙ্গল, এতদিন পর্যন্ত আমরা যা বিধিলিপি বলে মেনে আসছি, যদি এর উল্টা কথা কোন উপলক্ষে বলতে পারি — মস্ত কাজ হয়। শত্রু যত বড়োই হোক, তাকে মানব না, মশাকে রাখব না, যেমন করে পারি উচ্ছেদ করব — এ সাহস যদি হয়, তবে কেবল মশা নয়, তার চেয়ে বড়ো শত্রু নিজেদের জীবনের উপর জয়লাভ করব।

আর একটা কথা — পরস্পরের মিলনের মনো উপলক্ষ চাই। এমন অনেক উপলক্ষ চাই যাতে আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলতে পারে। দেশ বলতে যা বুঝি সকলে তা বোঝে না, স্বরাজ কী অনেকে তা বোঝে না। কিন্তু মিলন বলতে যা বুঝি, এমন কেউ নেই যে তা বোঝে না। কিন্তু যদি কোন একটা গ্রামের সকলে মিলে কিছু পরিমাণেও রোগ কমাতে পারি, তবে বিদ্বান মূর্খ সকলের মেলবার এমন সহজ ক্ষেত্র আর হতে পারে না। গোপালবাবু এ কাজ আরম্ভ করেছেন। এই যে ইনি মণ্ডলদের নাম করলেন, শুনে সুখী হলাম এঁরা একযোগে এক মাটিতে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুদ্র শত্রু মশা মারবার জন্য সকলে মিলে লেগেছেন। এর মতো সুলক্ষণ আর নেই। কারণ, প্রত্যেকের হিতের জন্য সকলেই দায়ী এবং পরের হিতই নিজের সকলের চেয়ে বড়ো হিত, এই শিক্ষার উপলক্ষ আমাদের দেশে যত বেশি হয় তত্তই ভালো। একটি গ্রামের মধ্যে একটা রাস্তা গিয়েছে, দেখা গেল গরুর গাড়ি চলায় তার একটা জায়গায় গর্ত হয়েছে ৪/৫ হাতের বেশি নয় — বর্ষার সময় তাতে একহাঁটুর উপর কাদা জমে আর সেই কাদার মধ্য দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ হাটবাজার করতে যায়। নিকটবর্তী গ্রামের লোক যারা সবচেয়ে কষ্ট পায় তারাও এ কথা বলে না কোদাল দিয়ে খানিকটা মাটি ফেলে জায়গাটা সমান করে দিই, তার কারণ তারা ঠকতে ভয় পায়। তারা ভাবে, 'আমরাই

ঘাটের অথচ তার সুবিধে আমরা ছাড়াও অন্য সবাই পাবে, এর চেয়ে নিজেরা দুঃখ ভোগ করি সেও ভালো।' আমি পূর্বেও আপনাদের কাছে বলেছি — একটা গ্রামে বৎসর বৎসর আগুন লাগত, গ্রামে কুয়ো ছিল না, আমি তাদের বললুম, 'তোমরা কুয়ো খোঁড়, আমি সে কুয়ো বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'বাবু, মানুষ তেলে মাছ ভাজতে চাও। অর্থাৎ অর্ধেক বাড়ুনি আমাদের, অথচ জলদানের পুণ্যটা সম্পূর্ণ তোমার। তারচেয়ে ইহলোকে আমরা জ্বলাতঙ্কে মরি সেও ভালো, কিন্তু পরলোকে তুমি যে সস্তায় সদ্গতি লাভ করবে সেটি হতে পাবব না।'

দেশের মধ্যে এরকম ভাব রয়েছে। ভদ্রলোকের মধ্যেও অনেক জনা নলা অকারে, সে কথা আলোচনা করতে সাহস করি না। গোপালবাবু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাতে লোকে এই কথা বুঝতে পারবে যে, পরের লোকের বাড়ির ছেলের যে দশা হয় তারা বিনা পক্ষপাতে অন্যেরও রক্ত শোষণ করে, অতএব তার ছোবার সম্পর্ক কম রাখাও ভাল।

গোপালবাবু বহু কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, লোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষের উত্তেজনা-বর্জিত নির্মল শুভবুদ্ধি তাঁকে এই কাজে প্রবৃত্ত করেছে। মহত্ত্বের এই দৃষ্টান্তটি দলবদ্ধের চেয়েও আমাদের কাছে কম মূল্যবান নয়। এইজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শনীপ্রকৃতি : ১৯ অগস্ট, ১৯১২

সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব? এ-কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ-কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। তাই, যখন আমরা পেটের জ্বালায় মরি তখন কপালের দোষ দিই : বিধাতা কিম্বা মানুষ যদি বাহির হইতে দয়া করেন তবেই আমরা রক্ষা পাইব, এই বলিয়া ধূলার উপর আধমরা হইয়া পড়িয়া থাকি। আমাদের নিজের হাতে যে কোনো উপায় আছে, এ কথা ভাবিতেও পারি না।

এই জন্যই আমাদের দেশের সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া নেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া। মানুষ না খাইয়া মরিবে — শিক্ষার অভাবে, অবস্থার গতিকে হীন হইয়া থাকিবে, এটা কখনই ভাগ্যের দোষ নয়, অনেক স্থলেই এটা নিজের অপরাধ। দুর্দশার হাত হইতে উদ্ধারের কোনো পথই নাই, এমন কথা মনে করাই মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম জয় করিবার ধর্ম, হার মানিবার ধর্ম নয়। মানুষ যেখানে আপনার সেই ধর্ম ভুলিয়াছে সেইখানেই সে আপনার দুর্দশাকে চিরদিনের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে।

যত অল্প সময়ে যে যত বেশি কাজ করিতে পারে তারই জিত। এই জন্যই মানুষ হাতিয়ার দিয়া কাজ করে। হাতিয়ার মানুষের একটা হাতকে পাঁচ-দশটা হাতের সমান করিয়া তোলে। যে অসভ্য শুধু হাত দিয়া মাটি আঁচড়াইয়া চাষ করে তাহাকে হলধারীর কাছে হার মানিতেই হইবে। চাষবাস, কাপড়-বোনা, বোঝা-বহা, চলাফেরা, তেল বাহির করা, চিনি তৈরি করা প্রভৃতি সকল কাজেই মানুষ গায়ের জোরে জেতে নাই, কল-কৌশলেই জিতিয়াছে। লাঙল, তাঁত, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘানি প্রভৃতি সমস্তই মানুষের সময়ের পরিমাণ কমাইয়া কাজের পরিমাণ বড়াইয়াছে। ইহাতেই মানুষের এত উন্নতি হইয়াছে, নহিলে মানুষের সঙ্গে বনমানুষের বেশি তফাত থাকিত না।

জগতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর — শুধু ভাঙে না, নষ্ট হয় না — আদর্শ।

জয়তু নেতাজি

শতবর্ষের লহ শত প্রণাম

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
অফিস ফোন : ২৪০-১৭৮৬ / ১৭৯৮ / ১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়, কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায়জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

❐ প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা ❐

- ❐ ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ৮৬.৩৩ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৪৯.৬১ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৩০.৭২ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৬ কোটি।
- ❐ বিগত আর্থিক বছরে ঋণ দাদন ৪০.০৪ কোটি। এর মধ্যে ২৯.৮৬ কোটি কৃষিতে, ৮.২৬ কোটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে, ১.৯১ কোটি আবাসনে।
- ❐ কেন্দ্রীয় স্তরে বর্তমান বছরে ৬০.০৬% ঋণ আদায় হয়েছে এবং বিগত বছরে ২২,১১৫ চাষীভাই ও অন্যান্যরা উপকৃত হয়েছে।
- ❐ এন সি ডি সি ২ ও ৩ প্রকল্পে প্রশংসনীয় কাজ। এন এইচ বি ও হাডকো-এর সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- ❐ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ সি এস টি আই ও জে এল টি সি-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।
- ❐ ডিপোজিট মোবিলাইজেশন-এ অধিক সুদ ও আই টি সুবিধা।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

[বিদেশি শাসকরা আমাদের দুঃখ-কষ্ট বোঝে না, বুঝতে চায় না — এরকম মানসিকতা থেকে স্বাধীনতার বহু বছর আগে অবিভক্ত বাংলার সমবায়ীগণ যে সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা করতেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০ বছর পরেও আমরা তেমন কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। "বিদ্যালয়েও কলেজের পাঠ্যতালিকায় সমবায় সম্বন্ধীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করা" আজও সম্ভব হয়নি। এইরকম কয়েকটি লক্ষণীয় প্রস্তাবসহ সম্মেলনের নির্বাচিত অংশ অতীত দিনের 'ভাণ্ডার' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে প্রকাশ করা হল]

প্রথম বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলন

প্রথম দিনের অধিবেশন

গত ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ বীরভূমের অন্তর্গত সুরুল গ্রামের সন্নিহিত শ্রীনিকেতনে প্রথম বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনের অধিবেশন হয়। বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সমিতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বাংলাদেশের অন্যান্য নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত বহু অতিথিবর্গ এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন এই সম্মিলনের সভানেতৃত্ব করেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং ইহার উদ্বোধন করেন। শ্রীনিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

সম্মিলনের প্রথম দিনের কার্য আরম্ভ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে — ঠিক দশ ঘটিকায়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে সভার উদ্বোধন করেন।

সম্মিলনের উদ্বোধনের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।* অতঃপর রামপুরহাট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ঘোষ, বি এল, মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। এই প্রস্তাব ঘোষ মহাশয় বলেন যে, স্যার ডানিয়েল এই দেশের সমবায় প্রচেষ্টার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজেকে জড়িত করিয়াছেন এবং তাঁহার নানা কার্যের মধ্যেও সমবায় প্রচেষ্টার দ্বারা কিরূপে এই দেশের পল্লির কৃষিজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করা যায় তাহা সর্বদা চিন্তা করেন। বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অবৈতনিক সম্পাদক রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র সিংহ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে স্যার ডানিয়েল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ সম্মিলনে আলোচনার জন্য প্রেরিত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য তিনটি সাবকমিটি গঠিত হইয়া সেই দিনকার মতন সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

পরদিবস ১০ই ফেব্রুয়ারি স্যার ডানিয়েলের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হইলে পূর্বদিবস যে সাবকমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা নির্ধারিত প্রস্তাবসমূহের কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

"বীরভূম কালেক্টর মিস্টার এস জি হার্ট, আই সি এস প্রস্তাব করেন —

"সর্বেল কর্মচারিগণকে সমবায়ের নীতি এবং প্রথম প্রথম বিবেচ্যগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দিবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকার্য ১০-১২ দিনের শিক্ষায় সম্পন্ন হইবে এবং উপযুক্ত কর্মচারিগণের দ্বারা নির্বাহিত হইবে।"

এই প্রস্তাব কোনরূপ বাদানুবাদ ব্যতিরেকেই গৃহীত হয়।

"এই অধিবেশনের মতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির নিজ নিজ এলাকায় কৃষি, বিক্রয় এবং সরবরাহ সমিতি স্থাপনের জন্য সচিবের চেষ্টা করা কর্তব্য এবং কোন গ্রামে সমিতির নিকট কার্যকরী করিবার সময় এমন করা উচিত, ঐ সকল সমিতির সভ্যগণ কৃষি, বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতির নিকট সভ্য উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিবে।"

এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

"এই সম্মিলন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন সমবায় বিভাগের কর্মচারিবৃন্দের এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের সেক্রেটারি, অডিটর, সেক্রেটারি ও সুপারভাইজারগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সমবায় প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেন।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"সমবায়ের তত্ত্ব ও আদর্শ দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বর্ধমান বিভাগের ও কলেজের পাঠ্য তালিকায় সমবায় সম্বন্ধীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হউক এবং সমবায় কর্মীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

* লিখিত অভিভাষণটিও এইসঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হল।

বালি-জমিতে ফসল হয় না, কেন না, তাহা আটি বাঁধে না। তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতাপচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষও ঠিক তাই ; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।

অনেক গৃহস্থ অনেক মানুষ একজোট হইয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার যে উপায় তাহাকেই য়ুরোপে আজকাল কো-অপারেটিভ প্রণালী এবং বাংলায় 'সমবায়' নাম দেওয়া হইয়াছে। আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।

[রবীন্দ্রসদনের স্নেহধন্য 'ভাণ্ডার' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। তৎকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদগণের প্রবন্ধ ও লেখা 'ভাণ্ডার'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হত। সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ছাপ অতীত দিনের 'ভাণ্ডার'-এর পৃষ্ঠায় আমাদের জন্য তাঁরা রেখে গিয়েছেন। সমকালীন সমস্যার সমাধান সূত্র তাকে যেমন ছিল, তেমনি বর্তমানকালের সমবায় কর্মীদের নিকট তা আজও আলোর দিশারী হয়ে রেখে আছে।

বর্তমান সংখ্যায় বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণটি ভাণ্ডার, চৈত্র ১৩৩৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। এই সম্মেলন শ্রীনিকেতন, সুরুলে ২৭শে মাঘ, ১৩৩৫ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।]

বর্ধমান বিভাগীয় সমবায় সম্মিলনির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ধমান বিভাগের সমবায় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে আপনাদিগকে সম্বর্ধনা করার ভারটি আমার উপরে অর্পিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমি এই সুযোগ এবং অধিকার লাভে পরম গৌরব বোধ করিতেছি। কিন্তু ইহাও ভুলিতে পারিতেছি না যে, এই গুরুভার বহনের যোগ্যতা আমার নাই। এই কথা কেবল বিনয় করিয়া বলিতেছি না, সমবায়নীতি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করার অবকাশ আমার ঘটে নাই। ইউরোপের নানাদেশে ইহার আশ্চর্য সুফল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, স্বদেশে এই সমবায় নীতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসাহ অনুভব করিয়াছি এবং সমবায়নীতির বহুল প্রচার অন্তরের সহিত কামনা করিয়াছি। এই আন্তরিক অনুরাগ এবং সমবায় প্রচেষ্টার সাফল্যে দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া আজ আপনাদিগকে আহ্বান করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি জানি আপনারা সহকর্মী, স্বদেশ অনুরাগে অনুপ্রাণিত এবং সমবায়মন্ত্রের সাধক। হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় আপনারা এখানে সমবেত হইয়াছেন ; আমাদের যোগ্যতা বা অযোগ্যতার অপেক্ষা রাখেন নাই। তাই মনে করিতেছি, আমার দৃষ্টতা আমাকে লজ্জা দিলেও, আমার প্রার্থনার পূর্বেই তাহা আপনারা মার্জনা করিয়াছেন। আমাদের শক্তি অল্প, সময় সংক্ষেপ এবং আমরা এরূপ প্রচেষ্টায় প্রথম ব্রতী। সুতরাং আমাদের আয়োজনে বহু ত্রুটি ঘটিবে। আপনারা অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া এবং অসুবিধা ভোগ করিয়া এই স্থানে সমবেত হইয়াছেন। তাই আপনারা উপেক্ষা করিলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির আশঙ্কা আমাকে পীড়া দিতেছে।

সমবায়নীতি পশ্চিম দেশের নূতন আবিষ্কার নয়। ইহাই ছিল ভারতীয় সমাজের ভিত্তিভূমি। এই নীতিই ছিল পল্লীসমাজের প্রাণ। পল্লীবাসীগণ সকলে মিলিয়া সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া নির্বাহ করিত। পল্লীর শ্রীসম্পদ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, এমনকি আনন্দোৎসবের বিধানের মূলে ছিল সমবায় প্রচেষ্টা। পল্লীর সাধারণ প্রয়োজন নির্বাহের জন্য তখন বাহিরের সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইত না। যাঁহারা বয়সে প্রবীণ, চরিত্রে শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁহারাই ছিলেন গ্রামের নেতা ও আইন-আদালত। তাঁহারাই দুর্জনদিগকে শাসন করিতেন, বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি করিতেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিতেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে আমরা সেরূপভাবে কার্য করিবার শিক্ষা প্রায় ভুলিয়াছি। তাই আজ পল্লীসমূহ শ্রীভ্রষ্ট, স্বাস্থ্যহীন, ক্ষুদ্র দলাদলিতে ধ্বংসোন্মুখ। আজ আপনারা যে সকল গ্রামে সমবেত হইয়াছেন — ইহা এক সময়ে সম্পদে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, আনন্দে আদর্শ পল্লীরূপে পরিগণিত ছিল। আজ সেই পল্লীই সব হারাইয়া জীর্ণ কঙ্কালরূপে দাঁড়াইয়া আছে। কেবল এই গ্রাম নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল পল্লীরই অবস্থা এই প্রকারই শোচনীয়। এই পরিণাম কোন স্থানীয় কারণ হইতে উদ্ভূত নহে এবং কোন সঙ্কীর্ণ স্থানেও বদ্ধ নয়। আমাদের সমাজদেহে ব্যাধি প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহকে অবসাদগ্রস্ত করিয়াছে। পল্লীসমাজের বর্তমান অবস্থা তাহারি প্রকাশ। সুতরাং একটি পুষ্করিণী খনন বা বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা পল্লীর আংশিক অভাব মোচিত হইলেও প্রকৃত ব্যাধির প্রতিকার হইবে না। ইহা অনুভব করিয়াই আমার পূজনীয় পিতৃদেব এই শ্রীনিকেতনে সাত বৎসর পূর্বে পল্লী-সংগঠন বিভাগ সংস্থাপন করিয়াছেন।

আশা করি আপনারা সদয় করিয়া পল্লীসংগঠন বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের কার্য পরিদর্শন করিবেন। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ সঞ্চয় করা শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্য নয়, যাহাতে বিচ্ছিন্ন কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া স্বদেশি সমাজের উপযুক্ত স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মনুষ্যত্বে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্ষেত্রজাত ফসল হইতে যাহাতে অধিক অর্থাগম করিতে পারে, ইহাই হইল শ্রীনিকেতনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মে ও আধ্যাত্মিকতায় জীবন সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ ভারতবর্ষে যত আছে, অন্য কোন দেশে তত আছে কিনা জানি না। যাহা হউক, এই শ্রীনিকেতনে আমরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ক্ষেত্রে সার দিবার প্রণালী, বীজ সংরক্ষণ, একই ক্ষেত্রে একাধিক ফসল জন্মাইবার ধারা, ক্ষেতকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সরস রাখার প্রণালী প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি। আমাদের গোশালায় গোজাতির উন্নতি সাধন সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চলিতেছে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গো-সেবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শিক্ষিত যুবকেরা আজ অন্নাভাবে হাহাকারে রত। অন্ন সংস্থানে যাহাতে এই যুবকগণ সমবায় নীতিতে পল্লী পালন করিয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন, আমাদের পল্লী পালন বিভাগে (Poultry) তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। রেশমের চাষ ছিল এ-অঞ্চলের একটি লাভজনক ব্যবসা। আজ তাহা মৃতপ্রায়। গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত রেশম বিভাগ, এই শ্রীনিকেতনেই বহু শিক্ষার্থীকে রেশম-কীটের পালন শিক্ষা দিয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা শিক্ষা সমাপন করিয়া গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রণালীতে রেশমের চাষ আরম্ভ করিবেন। বীরভূম জেলায় প্রায় ছয় হাজার তন্তুবায় আছেন। উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য ইহাদের পূর্বপুরুষদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বীরভূমের বস্ত্র কোম্পানির আমলে ইংলণ্ড পর্যন্ত রপ্তানি হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে তাঁহাদের জাতিগত ব্যবসা আজ মৃতপ্রায়। শ্রীনিকেতনের 'বয়ন ও রঞ্জন বিভাগ' সেই শিল্পকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করিতেছে। বহু যুবক এই বিভাগে শিক্ষার্থী হইয়াছেন এবং অনেকে শিক্ষা সমাপন করিয়া নিজ নিজ গ্রামে তাঁত বসাইয়া স্বাধীনভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন এই

বীরভূম জেলার নানা স্থানে আমরোটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা বহুশিল্প শিক্ষা দিতেছি; বীরভূমের বাহিরেও আমাদের পাঁচটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরভূম জেলায় কুড়ি হাজার চর্মকারের বাস। উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত চর্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া, তাহারা দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের 'চর্ম প্রস্তুত বিভাগ' (Tannery) হইতে চর্মকারকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চর্ম প্রস্তুত করা ও জুতা তৈয়ারি করা শিক্ষা দিতেছে। উদ্দেশ্য তাহারা সমবায় প্রথায় সংঘবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে চামড়া প্রস্তুত করিয়া জুতা তৈয়ারি করুক। শ্রীনিকেতনের 'শিক্ষা সত্রে' কি প্রকারে গ্রামের বালকদিগকে শিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যাইবে, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ছাত্রেরা প্রথমে কোন অর্থকর হাতের কাজ শিক্ষা করিতেছে, তাদের নিজের হাতের তৈয়ারি বাগানে তরকারি উৎপন্ন করিতেছে এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং পার্শ্বস্থ গ্রামের অবস্থার সহিত সুপরিচিত হইতেছে। শ্রীনিকেতনের বালিকা বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছুঁচের কাজ, রাঁধাবাড়ার প্রণালী এবং সবজি বাগান প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অঙ্কজড়া খেলায়, অভিনয়ে এবং গানে যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভাব প্রকাশ করিতে পারে তাহার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। আমাদের এই বিচিত্র কর্মগুলি শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন বিভাগের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই বিভাগ নিকটবর্তী গ্রামগুলির সর্বপ্রকার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিতেছে। এই বিভাগই সমবায় নীতি অবলম্বনে পল্লীকোষ, ভাণ্ডার, জল সরবরাহ সমিতি, বয়ন সমিতি স্থাপন করিতেছে। অঙ্কজড়া ব্রতীবালক সমিতি সংগঠন, পল্লীকর্মীদের শিক্ষা দান ব্যবস্থা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে বয়স্কদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি এই বিভাগ দ্বারাই চলিতেছে। পল্লীসংগঠন বিভাগের সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের 'আরোগ্য বিভাগ' ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ব্যাধি নিবারণের উপায় গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দিতেছে, পীড়িতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছে, ব্যাধি নিবারণের জন্য টিকা দিতেছে এবং গ্রামের দাইদিগকে যথাসম্ভব ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করিতেছে। মূল কথায় গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরক্ষম করিতে এবং তাহাদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতি করিতে গেলে যাহা প্রয়োজন, তাহার সকল ব্যবস্থাই শ্রীনিকেতনে রাখা হইয়াছে। আমাদের কর্মক্ষেত্র যাহাতে বিস্তার লাভ করে তাহার জন্য সরকার গভর্নমেণ্টের সাহায্যে সম্প্রতি প্রায় আড়াই হাজার বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার জন্য কত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারেন। এই অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমরা এরকম প্রতিষ্ঠানকে কখনই সহজে দাঁড় করাইতে পারিতাম না। শ্রীনিকেতনের অধিকাংশ ব্যয়ভারই আমেরিকাবাসিনী মহাপ্রাণা মিসেস এলমহার্স্ট একাকী বহন করিয়া আমাদিগকে পরম উপকৃত করিয়াছেন। আজ সেই সহৃদয়া নারীর উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল, বর্তমান বিশ্বের এত বড় বড় সমৃদ্ধিশালী সহর থাকিতে কেন গুরুত্ব নগণ্য সুরুল গ্রামের এক প্রান্তে এই মহতী সভার অধিবেশন হইল। এই প্রশ্নের উত্তর দিব না। নিজেদের তরফ হইতে একমাত্র নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় সমবায় সংঘের সাধকের তত্ত্বাবধান হইতে এবং তাঁহাদের শুভ ইচ্ছায় ও উপদেশে বল লাভ করি, ইহাই ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আজ সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন আনন্দিত হইয়াছে।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পশ্চিমের অনুষ্ঠানসমূহের অন্ধ অনুকরণ দ্বারা আমাদের সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ের উপযোগিতা উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন পন্থার বিচারবুদ্ধিহীন অনুসরণেও আমরা স্থায়ী সুফল লাভে সমর্থ হইব না। পশ্চিমের হিতকরী অনুষ্ঠানগুলিকে আমাদের দেশ-কালের উপযোগী এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক ধারার সহিত সুসঙ্গত করিয়া লইতে হইবে। আবার আমাদের প্রাচীন সংস্কারকেও বর্তমানকালের উপযোগী করিতে হইবে। ইহা মনে রাখিয়া আমাদের কয়েকজন কর্মীকে পশ্চিমের সমবায় কার্য পর্যালোচনা করিবার জন্য বহু বারে ইউরোপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহারা সমবায় মন্ত্রের কবি সার হোরেস প্লাইকেটের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গত বৎসর যখন আমরা বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কোষ স্থাপনের অনুমতির জন্য সুযোগ্য রেজিস্ট্রার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম, তখন কেন্দ্রীয় কোষ অবলম্বনে পল্লী সংগঠনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা যাহাতে সর্বত্র হয় তাহাই ছিল আমাদের অভিপ্রায়। সাধারণ লোন অফিসের মতো ঋণ দান করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সহৃদয় রেজিস্ট্রার মহাশয় এবং বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় কোষ স্থাপন করিয়া আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সহায়তা করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, পূর্বোক্তভাবে পরিচালিত হইলে কেন্দ্রীয় কোষগুলি সুচারুরূপে পল্লী সমস্যের পুনর্গঠনের জটিল সমস্যা সমাধান করিবে।

আজকালকার কেন্দ্রীয় কোষগুলি ঋণদান এবং সুদ আদায় করিয়া ব্যস্ত। ইহাকে একরকম মহাজনী বলা যাইতে পারে। অল্প সুদে টাকা দাদনে লোকের উপকার হইতেছে না এ-কথা আমি বলিতেছি না। অনেক ক্ষেত্রে সুদখোর মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার পাইতেছে। কিন্তু ইহাই কি কেন্দ্রীয় কোষের চরম লক্ষ্য? কখনই নয়। সমস্ত বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিয়া ঋণগ্রহীতারা যে ধানচাল উৎপন্ন করিতেছে, ব্যবসায়ী দালালের সম্বন্ধে হইতে তাহা ন্যায্যমূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইতেছে। তারপরে সেই কৃষকেরা অন্নাভাবে পূর্বের হইতে কেহ ন্যাংটেরিয়ায়, কেহ ওলাউঠায় বা অন্য পীড়ায় হাজারে হাজারে মরিতেছে। ইহা যেন নিত্য ঘটনা। এই অবস্থা হইতে আমাদের পল্লীবাসীদিগকে মুক্ত করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় কোষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। পল্লীবাসীরা সমিতি গঠন করিয়া কেন্দ্রীয় কোষের সাহায্যে প্রত্যেক গ্রামে ধর্মগোলার প্রতিষ্ঠা করুন, জল সরবরাহ সমিতি এবং সমবায় কৃষি সমিতি গঠন করিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করুন, স্বাস্থ্য সমিতি করিয়া দেশ হইতে ব্যাধিকে দূর করুন — অল্পকাল মধ্যে দেশে পূর্ণশ্রী ফিরিয়া আসিবে। তখন দেখা যাইবে, যে পরিত্যক্ত পল্লীসমাজ আজ ভদ্রলোকীবিদিগকে পদদলিত করিতেছে, তাহারাই অবনত মস্তকে শ্রমিকদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে। এই সকল সংগঠন কার্যে সাহায্য করার অধিকার কেন্দ্রীয় কোষের আছে।

যেমন দেশের লোকে গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা, ঋণ সমবায় ও ক্রয়-বিক্রয় সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় কোষের দ্বারে আঘাত করিবে, বুঝিতে হইবে সেইদিনই কোষের প্রকৃত কার্য আরম্ভ হইল আর প্রতীক্ষা করার সময় নাই, তাঁহারা কেন্দ্রীয় কোষের কর্ণধার হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা এই কার্যে মনোযোগী হউন, আমাদের দরিদ্র অশিক্ষিত অনভীষ্টীগণিগকে প্রকৃত পথ ধরিয়া চলিতে সাহায্য করুন আজ আমার এই সানুনয় অনুরোধ নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আজ এই অধিবেশনের সভাপতির আসনে ভারতবন্ধু মাননীয় সার জন্সিলেন হ্যামিলটনকে উপবিষ্ট দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি এবং তাঁহার সহধর্মিণী লেডি হ্যামিলটনকে আমাদের মধ্যে পাইয়া পরম উৎসাহিত জ্ঞান করিতেছি। এই মহাত্মাগণ সম্প্রতি আমাদের দেশের সমবায় সংগঠন কার্যে কত সহায়তা করিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সার জন্সিলেন যেমন ব্যবসা পরিচালনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি ভারতবাসী অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। অবশেষে যে সকল রাজকর্মচারী ও ভদ্রমহোদয়গণ বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া আজ এই অধিবেশনে অনুগ্রহপূর্বক যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সহানুভূতি আমাদের কর্মে বল প্রদান করিবে, তাঁহাদের সহায়তা সকল প্রচেষ্টাকে সার্থক করিবে। বর্ধমান বিভাগের কেন্দ্রীয় কোষসমূহের প্রতিনিধি স্বরূপে আমরা এই সম্মিলনিতে আহূত হইয়াছি। এই সকল কোষ হইতে উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে আমাদের সম্মিলনি কখনই সম্ভব হইত না। আজ এই সুযোগে কেন্দ্রীয় কোষসমূহের পরিচালক মহোদয়দিগের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

সর্বশেষে নিবেদন, আমরা অনিপুণ হস্তে এই সম্মিলনির পূজার বেদীখানি প্রস্তুত করিয়াছি মাত্র। আপনারাই এই পূজার পুরোহিত এবং হোতা। পূজা সার্থক হউক, ঈশ্বরের নিকটে আজ এই প্রার্থনা করিতেছি।

❐

যদি প্রত্যেক চাষা কেবল নিজের ছোটো জমিটুকুকে অন্য জমি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া না দেখিত, যদি সকলের জমি এক করিয়া সকলে একযোগে মিলিয়া চাষ করিত, তবে অনেক হাল কম লাগিত, অনেক বাজে মেহন্নত বাঁচিয়া যাইত। ফসল কাটা হইলে সেই ফসল প্রত্যেক চাষার ঘরে ঘরে গোলায় তুলিবার জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র মজুরি আছে, প্রত্যেক গৃহস্থের স্বতন্ত্র গোলাঘর রাখিতে হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যদি অনেক চাষী মিলিয়া এক গোলায় ধান তুলিতে পারিত ও এক জায়গা হইতে বেচিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে অনেক বাজে খরচ ও বাজে পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইত। যার বড়ো মূলধন আছে তার এই সুবিধা থাকাতেই সে বেশি মুনাফা করিতে পারে, খুচরো খুচরো কাজের যে-সমস্ত অপব্যয় এবং অসুবিধা তাহা তার বাঁচিয়া যায়।

আমাদের দেশের গ্রামগুলি শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কামনা করি। একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জমানদশা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঃ একটি প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ এক পরম বিস্ময়। কেবল রচনার বিপুলতার কারণেই নয়, শিল্পে নন্দনতত্ত্ব ও মানবতত্ত্ব নামক দুই মতবাদ তিনি যে কুশলতায় তাঁর লেখায় মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। সাহিত্যে ও শিল্পে যে রুচিশীলতার অনুশীলনে তিনি পূর্বাপর স্থিত ছিলেন, তাও আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে গর্বের ও বিস্ময়ের সামগ্রী। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গায়ে রুচিহীনতার লেবেল এঁটে দেওয়ার কুশলী চেষ্টা বিভিন্ন মহলে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে পরেও 'রবিবাবুর গানে' অঙ্গুৎকণ্ঠা শ্রবণের বিরোধিতার রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধতা ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হিসাবে বা ধনিক-বণিক শ্রেণীর প্রতিভূরূপে মানুষের কাছে তাঁকে নস্যাৎ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে কালের নিয়মে তিনি প্রবলভাবেই টিকে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কথা কখনও বিস্মৃত হননি। বাস্তব কারণে সাধারণে মিলে যাওয়ার অসুবিধা তাঁর হৃদয়ে গভীর বেদনার জন্ম দিয়েছিল। তাই অকৃত্রিম দুঃখবোধ থেকে তিনি লিখেছিলেন, 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের দ্বারে। ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।' জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে কৃত্রিম পণ্যে যে সাহিত্যের পসরা ব্যর্থ হয়, অভিজ্ঞতা থেকেই একথা তিনি জানতেন। তাই প্রকৃত ও সাধারণ মানুষের শরিক যিনি হতে পারবেন এমন সাহিত্যকারের প্রতি তাঁর দৃষ্টি উন্মুখ ছিল। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, 'যে আছে মাটির কাছাকাছি / সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।'

সীমাবদ্ধতার কথা নিজে মুখে স্বীকার করলেও মানুষের জন্য, বিশেষ করে দলিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখন মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বরং এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমাদের সাহিত্যের যে অংশে মানুষের জয়গান, সেখানে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। আঞ্চলিকতা ও স্থূলতার অপবাদে (?) তারাশঙ্কর যখন অভিবিক্ত ও বিভ্রান্ত, রবীন্দ্রনাথের সে সময় সম্ভাব্য বিপদের মুখ থেকে নবীন লেখককে বাঁচিয়ে এনেছে। শরৎচন্দ্র, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রতি কবিসম্রাটের স্নেহ ও প্রশ্রয়ের অন্যতম কারণ, এঁদের লেখার সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম চিত্রণ ও যথাযোগ্য মর্যাদা। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' — এই জীবনদর্শন থেকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি আস্থা রেখেছেন চিরকাল। যে মানুষ অপর মানুষের উপর অন্যায়-অসাম্যের স্টিম রোলার চালায়, তার মত ও পথে অকুণ্ঠ জ্ঞাপন করেছেন আশ্চর্য শোভনতায়। নীরবে অন্যায় সহ্য করে যারা তাদের দলে তিনি ছিলেন না কখনও। প্রতিবাদের উচ্চকিত ময়নানী ভাষা তাঁর কণ্ঠে ছিল না, কিন্তু অন্যায়ের বিরোধিতায় পূর্বাপর সক্রিয় ছিলেন তিনি।

সুবিখ্যাত 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির কথা আমরা সকলেই জানি। নিজে জমিদার হয়েও জমিদার-জোতদার-মহাজন শ্রেণীর প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বারবার কলম ধরেছেন। জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত উপেনের জীবন-সংগ্রামের প্রতি তিনি গভীর সহমর্মিতা দেখিয়েছেন, বিপরীতক্রমে অত্যাচারী জমিদারের প্রতি সাহিত্যিক বিরোধিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপেনের মুখে ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি বলেছেন : 'তুমি মহারাজ সাধু হলে মোরা এখন আজ চোর বটে।' আর একটি বহুল পরিচিত কবিতা 'মাধো'-তেও রবীন্দ্রনাথের গণচিন্তা প্রত্যক্ষতা খুঁজে পেয়েছে। রায়বাহাদুর কিশোরীলালের স্যাকরা জগন্নাথের ছেলে মাধো। বাপের ইচ্ছা ছেলেকে ভাবিদার করে তোলে। কিন্তু দস্যি ছেলে কাজ শেখার ধারে কাছেও যায় না। দিনরাত টো-টো করে ঘোরে। রায়বাহাদুরের ছেলে দুলাল ছিল বদমেজাজী। পয়সার দম্ভ ছিল তার। একদিন কিসের কারণে মাধোর পোষা কুকুরকে চাবুক মারল সে। মাধোও চাবুক কেড়ে নিয়ে উচিত শিক্ষা দিল দুলালকে। জমিদার এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে মাধো গ্রামছাড়া হল। শহরে গিয়ে পাটকলে কাজ নিল। পরে মালিকের অন্যায়ের প্রতিবাদে মজুর-ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিল মাধো। স্লোগানধর্মী বক্তব্য না হয়েও 'মাধো' কবিতাটি শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্যতায় পরিণতি লাভ করল। নন্দনতত্ত্বের সীমানা মাধো থেকে রবীন্দ্রনাথ

লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও ; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশ সেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে সমন-সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায়, আত্মকল্যাণ সাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে।

এভাবেই ব্যবহারে অবহেলিত ও শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

যে শ্রেণী-অবস্থানে রবীন্দ্রনাথ স্থিত ছিলেন, সেখানে তাঁর চিন্তনে এই রাজনৈতিক প্রগতি তলস্তয়ের সঙ্গে তুলনীয়। বিপুল প্রতিভা সত্ত্বেও আভিজাত্যের যে গণ্ডি থেকে টলস্টয় বা প্রথম জীবনের তলস্তয় বেরিয়ে আসতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই সে গণ্ডি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত চিন্তন জাতিকে প্রগতিশীলতার এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। মনের মধ্যে নিরন্তর যে শিকল-গড়ার কারখানা চালু আছে, সে সম্পর্কে সদাই অবহিত ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শিকল ছেঁড়ার গান গাওয়া সম্ভব হয়েছিল। নিজস্ব ঈশ্বর-চিন্তা থাকা সত্ত্বেও 'সুবিধা' কবিতায় সিউনন্দন গোয়ালার মর্মদ্বারা হয়ে পথে দাঁড়ানোর পর তিনি লিখতে পারেন : 'বলে উঠল, দেবতাকে তোরা বেঁধে নবিস ভক্তি / তার দরজা বাঁচিয়ে যেটুকু আড়ো রইল বাকি / তার দেব তার নিজের পরেই, ঘুচুক নাড়ো যাই আর / এর বাড়া তো সর্বনাশের সম্ভাবনা নাই আর।' সানক নামক এক চরিত্রের মুখ দিয়ে একথা বলালেও বক্তব্যটি যে আদতে কবিরই, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমনকি সানক এখনও বলে 'ফাঁসি আমি ভয় করিনে, এইটে মনে রেখো / দশ বছরের জেল খাটিব, ফিরব তো তারপর / সেই কথাটাই শেষ বলে, আমি চললেম ঘর।' রবীন্দ্র-প্রতিভা অন্বেষণে সানক, নাধো, উপেন ও অন্যান্য দলিত চরিত্রের প্রতিবাদী রূপটি সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন।

ধর্ম নিয়ে এদেশে আবার নতুন করে মোহান্ধতা শুরু হয়েছে। 'ধূলামন্দির' কবিতায় অনুষ্ঠানবাদের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ মানুষকেই বড় করে দেখিয়েছিলেন। 'দীনদান' কবিতাতেও তিনি দেখিয়েছেন, যে বহু প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে বিশ লক্ষ প্রজা গৃহহীন ছয়ে, নিজের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, সেই বছরেই বিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে রাজা দেবমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সাধুজেঠ নরোত্তম সে মন্দিরে থাকতে অস্বীকার করে মানুষের মাঝে নেমে এসেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, রাজার ঐ মন্দির স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ্ বিশেষ। সে মন্দিরে দেবতা নেই, দেবতার পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভবপর নয়।

সুদূর অতীতে শঙ্করাচার্য অনুষ্ঠানবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সুফী সাধকগণ এবং মধ্যযুগের ভক্তিবাদী আন্দোলনের নেতৃবর্গ ধর্মে মানবতাবাদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবও 'আচণ্ডালে কোল' দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন ষোড়শ শতকেই। আধুনিক যুগে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ মানুষ সেবাকেই প্রধান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরূপে রবীন্দ্রনাথও মানুষের ধর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ধর্মমোহের নাগপাশ ছিন্ন করে মানবতার মহান আদর্শকেই তিনি তাঁর রচনায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। 'শলাতকা' কাব্যের 'ফাঁকি' কবিতাই হোক বা 'চেনা পাওনা' গল্পে নিরূপমার চেতনা কিম্বা 'লোকহিত' প্রবন্ধে ক্ষুরধার যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণ, সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ মানবতাবাদী দৃষ্টির অনুসরণে জীবন পরিচালনা করার কাজে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যেও এই আদর্শ প্রচার করে গেছেন। তিনি এটাই সংস্কার মুক্ত ছিলেন যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে নিত্যকার প্রার্থনার অনুষ্ঠানটুকু বাদ দিলে পৌষ উৎসব, বসন্ত উৎসব, বর্ষা বন্দনা, কৃষি বন্দনা প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক উৎসবমালায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক নিরপেক্ষ চরিত্র দান করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক চেতনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা আলাপ-আলোচনা হয়। প্রধান কোন কবির চরিত্রে এবং রচনায় বহুসাজাল থাকবেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো দায়িত্বশীল লেখক আপনার চারপাশে বহুসাজাল বিস্তার করে ধূপ ধুনোয় সমাচ্ছন্ন থাকবেন, এমন আশা করা মূর্খতা। এদেশের সমাজ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে যে অনেক রচনা তিনি রেখে গেছেন, যে যুক্তিবাদী জীবনচর্যার আদর্শ তিনি উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে গেছেন, তা বর্তমান বিভ্রান্তি ও অবক্ষয়ের কালে জাতির কাছে দিগদর্শন রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। ধর্মমোহের উল্লম্ফনে দেশে বিশেষ জাত-ধর্মের জেনীতি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার প্রতিরোধে রবীন্দ্র-চর্চা যে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। রবীন্দ্র-রচনার যুক্তিনিষ্ঠতার মাঝেই জাতি তার সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্রগতি-চেতনার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলতে পারবে, আমাদের এই আশার মধ্যে বোধহয় বাহুল্য বা অতিরঞ্জনের স্থান নেই। তাঁর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা তাঁর রচনার প্রতি আরও বেশি মনযোগী হতে চাই। এটাই আমাদের এই সময়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। □

কল চালাইতে হইলে জমি বেশি এবং অর্থ বেশি চাই। অতএব গোড়াতেই যদি এই কথা বলিয়া আশা ছাড়িয়া বসিয়া থাকি যে, আমাদের গরিব চাষিদের পক্ষে ইহা অসম্ভব, তাহা হইলে এই কথাই বলিতে হইবে, আজ এই কলের যুগে আমাদের চাষী ও অন্যান্য কারিগরকে পিছন হঠিতে হঠিতে মস্ত একটা মরণের গর্তে গিয়া পড়িতে হইবে।

যাহাদের মনে ভরসা নাই তাহারা এমন কথাই বলে এবং এমনি করিয়াই মরে। তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া, সেবাশুশ্রূষা করিয়া, কেহ বাঁচাইতে পারে না। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জন চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলার পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে।

নবম পরিকল্পনা ভারতের কৃষি উৎপাদনকে উজ্জীবিত করতে পারবে কি?

সুনীল ঘোষ

নবম পরিকল্পনার দলিলে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ও মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বাড়িয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে নবম পরিকল্পনা প্রমাণ করেছে অতি প্রয়োজনীয় এই বিষয়টির উপর বিগত আটটি পরিকল্পনা 'তেমন কিছু জরুরি নয়' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এই ছয় বছরে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ১.৭ শতাংশ অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ এর থেকে অনেক বেশি।

১৯৬১ সালে ডালের উৎপাদনের মাথাপিছু হার ছিল ৬৯ গ্রাম, ১৯৯১ সালে তা নেমে এসেছে মাত্র ১৯ গ্রামে এবং বাস্তবক্ষেত্রে গত ৪০ বছরে ডালের মোট উৎপাদন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মোটা কলাই-এর চাষের জমি তা কিনা কম জমির লোকেরা ব্যবহার করে ক্রমশ কমছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার এতই মন্থর যে, যেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে ভারত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে পরের বছরই যখন উৎপাদন কিছু কম হল, তাকে বিদেশ থেকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হল। এমতাবস্থায় যদি কোন বছরে ৩/৪ শতাংশ উৎপাদন কম হয় তাহলে দেখা বিপর্যয়কারী অবস্থার সৃষ্টি হবে। একদিকে খাদ্যশস্যের অপ্রত্যাশিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে, অন্যদিকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আমদানি করতে হবে ঘাটতি পূরণ করতে। এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী বিশেষ কয়েকটি কারণ হল (১) সরকারি/বেসরকারি ক্ষেত্রে থেকে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের অভাব, (২) চলাচল ব্যবস্থা ও বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি, (৩) ভূমি-সংস্কারের গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য লাগাতার কোন কর্মসূচি গ্রহণ না করা। অবশ্য মুখে সবাই একথা স্বীকার করেন যে কৃষির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ শিল্প-বিকাশের পূর্বশর্ত।

বিগত কয়েক বছরে কৃষিতে ব্যক্তিগত পুঁজির সঞ্চয় ও যোগান কিছুটা বাড়লেও এক্ষেত্রে সরকারি অর্থের যোগান কিন্তু ক্রমশই কমছে। এর অন্যতম কারণ সরকারি ব্যয়ের নিরুৎসাহই বাধিত হয়, খাদ্য, সার, বিদ্যুৎ, সেচ, কৃষিঋণ এবং কৃষি বস্তুপাতি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাবদ। সম্পদ অথবা পরিসম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়েছে যৎসামান্য। এর সঙ্গে রয়েছে আরো হাজারো সমস্যা যেমন বৃহৎ সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রমবর্ধমান খরচ, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান না রাখা, গ্রামীণ পরিকাঠামো ও কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র গড়ে না তোলা এবং শতাব্দী প্রাচীন কৃষি জল ও কৃষি সহায়ক শিল্পে জল সরবরাহ পরিকাঠামোর বাস্তবানুগ সংস্কার না করা।

বস্তুত প্রতি বছর দেশের খাদ্য উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সরকার যেসব বেসরকারী কাজে কোন নির্ভরযোগ্য আস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি এবং কৃষিক্ষেত্রে মূলধন যোগান ও সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়তা আনতে পারেনি। যার ফলে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীর পরেও দেশের জনসমূহের প্রায় ৭০ শতাংশে মানুষের, যারা কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের মেরুদণ্ড, জীবনযাত্রার মানের কোন উন্নতি ঘটেনি এবং কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রেও কোন আশার আলো ফুটে ওঠেনি।

মাঝে মধ্যে অবশ্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার কোন ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়নি। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক ঢিলেমি এবং লাল ফিতার ফাঁস ভেদ করে যদিও বা কোথাও নতুন কিছু ব্যবস্থা চালু হয়েও থাকে, অধুনাও তার অপ্রতুলতা এবং নিয়মকানুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে আসল প্রাপকদের কাছে তাঁর উপকারিতা প্রায় কিছুই পৌঁছয়নি। এই সব দিকগুলিকে সংকটজনকভাবে রূপায়িত করতে

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এই জন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়।

আজ কিছুকাল থেকে মানুষ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। সেই নতুন আবিষ্কারেরই নাম হয়েছে সমবায় প্রণালীতে ধন উপার্জন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে। আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানবনীতির স্থান ছিল না বলেই এত অশান্তি সেখানে সেই মানব সত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী-প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য করে। সেই জয়ধ্বজা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশে সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।

গেলে সরকারি নিয়মকানুনের যুগোপযোগী শিথিলতা ঘটানো দরকার, টার্গেট গ্রুপের লোকজনের নিয়ে কমিটি গঠন করা এবং প্রয়োগ কালের সময় সীমার মধ্যে নীচে থেকে ওপর পর্যন্ত নিয়মিত তথ্যের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

দেশভাগের পর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ মেটানো এবং শিল্পোৎপাদনের জন্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই খাতে মোট ব্যয়ের ৩১% অর্থ বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব পায় শিল্প। তার ফলে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়নে মোট বরাদ্দ কমে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে কৃষিখাতে বরাদ্দ করা হয় মোট ব্যয়ের ২০.৫ শতাংশ, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ছিল ১৭৪৩.৬০ টাকা। এর মধ্যে অবশ্য সেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন বিষয় দুটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রায়োগিক কৌশলগত ভুল অথবা গাফিলতির কারণে একমাত্র খাদ্যে উৎপাদন ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার ফলে কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে মার খায়।

এর প্রায় তিন বছর পর চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরি ও চালু করা হয়। এই তিন বছর অবশ্য বাৎসরিক ভিত্তিতে রচিত পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ধারা চালু রাখা হয় এবং এই সময়েই দেশে সবুজ বিপ্লব ঘটে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুটি উদ্দেশ্য মাথায় রেখে চতুর্থ পরিকল্পনা রচিত হয়। প্রথমটি হল পরিকল্পনার পাঁচ বছরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বছরে ৫ শতাংশ হারে বাড়িয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল অনুর্বর জমিতে কর্মরত কৃষক, ক্ষেতমজুর, ক্ষুদ্র কারিগর ইত্যাদিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে উন্নয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ২৩.৮ শতাংশ। এই লক্ষ্যমাত্রাও অবশ্য পূরণ করা যায়নি। পঞ্চম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয় উচ্চ-ফলনশীল দানাশস্যের উৎপাদন এবং একই জমিতে একাধিক ফসল ফলানোর উপর। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব পায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি ও সেচের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫ শতাংশ, বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয় ৩.১৮ শতাংশ। সপ্তম ও অষ্টম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং তার সঙ্গে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু যেহেতু প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থের যোগান নিশ্চিত করা যায়নি এবং সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ফাঁকফোকর ছিল সেজন্য সপ্তম পরিকল্পনার সময় থেকেই চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ফারাক বাড়তে থাকে। এর ফলে উদ্বৃত্ত ক্ষেতমজুরদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়নি এবং অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনের বাড়তি খরচ বৃদ্ধি ও কৃষিপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও ক্ষেতমজুরদের ক্রয় ক্ষমতার ব্যাপক অবনমন ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশ বছর পরেও পরিকল্পিত অর্থনীতির মাধ্যমেও উদ্বৃত্ত কৃষি মজুরদের ন্যূনতম আয় সুনিশ্চিত করতে কোন সুসংহত গ্রামীণ পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এটা সম্ভব হত যদি প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টরের পুঁজি যুগপভাবে বিগত পরিকল্পনাগুলির কার্যকালে পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ করা যেত।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে নবম পরিকল্পনা কি এই পথ অনুসরণ করবে? অর্থনীতি ও রাজনীতির এই সন্ধিক্ষণে ১০০ কোটি ভারতবাসী আজ এই বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি।

কেন্দ্রের যুক্তফ্রন্ট সরকার মনোনীত নবম যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মধু দণ্ডবতের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের কয়েক দফা সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়। এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে মনে হয় যে কৃষি ও কৃষকের সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক দণ্ডবতে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। একাধিকবার অধ্যাপক দণ্ডবতে এই মত প্রকাশ করেন যে, কৃষিতে সরকারি মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং কৃষি উৎপাদন ও কৃষিজাত পণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে সমবায়কে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করলে নবম পরিকল্পনাকালে ৪-৫ শতাংশে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। অবশ্য একই সঙ্গে কৃষকের স্বার্থে ভূমি-সংস্কারও রাজ্যে রাজ্যে করা প্রয়োজন। অধ্যাপক দণ্ডবতে নবম পরিকল্পনা সম্পর্কে যোজনা কমিশনের সুপারিশ অর্থমন্ত্রকে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রের রাজনীতির পট পরিবর্তন ঘটে যাদব লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে। কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক দণ্ডবতে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং বিজেপি সরকার তাঁর জায়গায় রাজস্থানের যশবন্ত সিংহকে ঐ পদে নিয়োগ করে। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে যশবন্ত সিংহ তাঁর পূর্বসূরির সুপারিশ বহাল রাখেন অথবা তাঁর নিয়োগকর্তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ও মতবাদ অনুযায়ী নতুন করে সুপারিশসমূহ তৈরি করেন। এটা অবশ্যই ধরে নেওয়া যায় যে পরিকল্পনার দলিল নবকলেবর লাভ করবে এবং তার জন্য যথেষ্ট কালক্ষেপও ঘটবে। কিন্তু কি হবে তার সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা ? ●

"সহৃদয়তা! তাই বুঝি কেহ পাড়াপ্রতিবেশীর খোঁজ রাখে না। বিপদে আপদে লোকের সাহায্য করে না ; হাতে টাকা থাকিলে সামান্য জাঁক-জমক লইয়াই থাকে, দশজন অনাথকে প্রতিপালন করে না ; তাই বুঝি পিতা-মাতা অযত্নে অনাদরে কষ্টে থাকেন অথচ নিজের ঘরে সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব নাই — নিজের সামান্য অভাবটুকু হইলেই রক্ষা নাই — কিন্তু পরিবারই আর সকলের ঘরে গুরুতর অনটন হইলেও বলেন হাতে টাকা নাই। এই তো ভাই এখনকার সহৃদয়তা।"

সমষ্টির কল্যাণকর বিভিন্ন কাজে সমবায় সমিতির ভূমিকা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ বিগত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শততম কংগ্রেসে সমবায় নীতিগুলির পুনর্ঘোষণা করেছেন। পুনর্ঘোষিত এই নীতিগুলিতে অতীতে নির্ধারিত নীতিগুলির সঙ্গে "সমষ্টির জন্য ভাবনা" — এই নীতিটিকে যোগ করা হয়েছে। 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' অন্যতম মূলনীতি হিসাবে যুক্ত হওয়ায় সমবায় আন্দোলনে যে একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা সংযোজিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

এখন দেখা যাক "সমষ্টির জন্য ভাবনা" — এই নীতিটির সঠিক অর্থ কি। এককথায় বলা যায় যে কেবল সমষ্টির আর্থিক উন্নয়ন নয়-জনসমষ্টির স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যেও সমবায়গুলি কাজ করবে। অর্থাৎ সামাজিক পরিমণ্ডলে কল্যাণকর বিভিন্ন কাজ এই নীতির দ্বারা সমর্থিত এবং স্বীকৃত হল। এর ফলে সমবায়ের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেল, সমবায়ের ওপর দায়িত্বও বর্তাল অনেক। এখন জনসমষ্টির বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে চিহ্নিত করা যাক। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে কাজটি অত্যন্ত কঠিন। সমস্যা একটি নয়, সমস্যা বহু এবং অঞ্চল/এলাকা হিসাবেও বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং আলোচনার এই স্বল্প পরিসরে কেবলমাত্র সাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে :

১) বেকারত্ব, ২) যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ৩) স্বাস্থ্য সমস্যা, ৪) নিরক্ষরতা, ৫) আবাসন সমস্যা এবং সেই সঙ্গে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থার সমস্যা ইত্যাদি।

১) **বেকারত্ব :** বেকারত্ব সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এই বিশাল এবং বিপুল সমস্যার মোকাবিলা করা সমবায় আন্দোলনের পক্ষে সম্ভবপর নয় ঠিকই কিন্তু সমবায়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে এই সমস্যার সমাধানে কিছু প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সমবায় সমিতি দু'চারটি "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড" টাইপরাইটার মেশিন কিনে দিলে অন্তত কিছু ছেলে-মেয়ে বিনা/স্বল্প ব্যয়ে টাইপিং শিখতে পারে, প্রশিক্ষক হিসাবেও/একজনকে নিয়োগ করা যেতে পারে। টাইপিং শেখার পর তাদের নিয়োগের সম্ভাবনা বা স্ব-নিযুক্তির সুযোগ অন্তত বৃদ্ধি পাবে। একই কথা কম্পিউটার শেখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার বর্তমানে তারা যে সকল কাজে নিযুক্ত আছে সেই সংক্রান্ত কাজে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের কর্ম-দক্ষতা বাড়াতেও সমবায় সমিতি সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন সরকারি/আধা সরকারি ব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয়ে বিনা/স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকলেও অনেকে সেসব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন না বা যোগাযোগের অভাবে ঐ সব শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি সামান্য একটু উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থাটুকু করে দিলে যথার্থই উপকার হয়। স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য সমিতি যদি 'কর্মক্ষেত্র' বা "Employment News" বা ঐ ধরনের সংবাদপত্র রাখার ব্যবস্থা করে তাহলে তাদের উপকার হতে পারে।

২) **যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা :** সমস্যাটি বেকারত্বের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সমস্যাটিও ক্রমবর্ধমান। আমাদের মনে রাখা দরকার যুব সম্প্রদায়ের শক্তির এই অপচয়ের অর্থ মানব সম্পদের অপচয় তথা জাতীয় ক্ষতি। এই বিপুল অপচয়কে রোধ করে তাকে সমাজ ও সংসারের উন্নয়নের কাজে নিয়োগের কথা অকপাই যথাযোগ্য গুরুত্ব নিয়ে ভাবা দরকার। এতদিন সম্পদ বলতে বোঝাত খনিজ উদ্ভিদজাত বা মনুষ্যজাত সামগ্রীকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বা ব্যক্তিকেও সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। আমাদের জানা দরকার যে আমাদের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদের দৃঢ়তা মানব সম্পদের, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের বিরাট শক্তি ও সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। এজন্য এই সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি সমবায় আন্দোলনের এক

.... লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে সেটা পরের কথা ; কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে এইটেই গোড়াকার কথা।

হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব। যথাযথ নেতৃত্বের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করতে পারলে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কাজকাজ যে সহজেই করা যেতে পারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করার জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলির কথা ভাবা যেতে পারে : (১) আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা সভা/বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা, (২) শিক্ষামূলক ছায়াছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, (৩) স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মেধা পুরস্কারের ব্যবস্থা করা, (৪) দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার খরচের জন্য অনুদান প্রদান করা, (৫) পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য-সচেতনতা, স্বাক্ষরতা কর্মসূচির মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা এবং এইসব কাজে তাদের দায়িত্ব প্রদান করা, (৬) উদ্যমি যুবক-যুবতীদের নিয়ে Self Help Group গঠন করা ইত্যাদি।

৩) স্বাস্থ্য সমস্যা : স্বাস্থ্য সমস্যার অনেকগুলিই সাধারণ সচেতনতার অভাবে, অপরিচ্ছন্ন ও দূষিত পরিবেশজনিত কারণে এবং সময়মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা (টিকা ইত্যাদি) গ্রহণ না করা ও প্রাথমিক চিকিৎসার (যেমন ও আর এস ইত্যাদি) অভাবে ঘটে থাকে। উপযুক্ত প্রচার এবং সম্প্রসার কর্মসূচি (Extension Work) রূপায়ণের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে এগুলির মোকাবিলা করা আদৌ অসম্ভব নয়। এইসব কাজে অর্থের প্রয়োজন নেই বললেই চলে-প্রয়োজন শুধু সামান্য উদ্যোগ, সেবামূলক মনোভাব এবং কিছু পরিশ্রমের। এছাড়াও সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সমিতির অফিস ঘরে বা অন্য কোনও সুবিধাজনক স্থানে সপ্তাহে একবার একজন ডাক্তারের পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যয়ের কিছুটা সমিতি বহন করতে পারে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

৪) নিরক্ষরতা দূরীকরণ : নিরক্ষরতা আমাদের সমাজের এক অভিশাপ। সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলিও একাজে এগিয়ে আসতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপনে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা (infrastructural facilities) যেমন ক্লাসঘর, বসার জায়গা, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমিতির শিক্ষিত সদস্য এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে স্বাক্ষরতা কর্মসূচির সফল রূপায়ণে প্রত্যক্ষ সহায়তা করতে পারেন।

৫) আবাসন সমস্যা : আবাসন সমস্যা এবং সেই সঙ্গে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থার সঙ্কট নিরসনের মত কাজেও সমবায় সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবায় সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে সব না হলেও অন্তত কিছু সমস্যার যে মোকাবিলা করা সম্ভব তা বোধকরি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। সমিতির আর্থিক সঙ্গতি থাকলে সদস্যদের বাসগৃহ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা (ঋণ প্রদান) করা, বস্তি অঞ্চলের উন্নয়ন বা বস্তিবাসী শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করার বিষয়েও চিন্তা করা যেতে পারে।

উক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও আর একটি বিষয়ে সমবায় সমিতিগুলির বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন-বিষয়টি হল বিনোদন। গ্রামাঞ্চলে এবং আধা-শহরাঞ্চলে, এমনকি শহরাঞ্চলেও, মানুষের মনের খোরাক ক্রমহ্রাসমান। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও তার সুযোগ খুবই সীমিত। সমবায় সমিতিগুলির এ বিষয়ে করণীয় অনেক কিছুই করণীয় আছে। বর্তমান যুগের বিনোদনের একমাত্র ব্যবস্থা 'বোকাবাক্সে'র কল্যাণে মানুষ আজ গৃহবন্দী। সমবায় সমিতি বা সদস্য-সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ তো দূরের কথা, অনেকে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখেন না। এই অবস্থায় একটি লাইব্রেরি-কাম-রিডিং রুম চালু করে কিছু বই, খবরের কাগজ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থা করতে পারলে অন্তত তিনটি প্রত্যক্ষ সুফল হাতে-হাতেই পাওয়া যাবে : (১) সদস্যবৃন্দের বিনোদন, (২) সমিতি সদস্য যোগাযোগ এবং (৩) সদস্য-সদস্য যোগাযোগ। এছাড়া উপরি পাওনা হল সমিতির প্রচার। এছাড়া স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে আবৃত্তি, কুইজ, বিতর্ক, রচনা বা ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারলে শুধু যে প্রতিযোগিরাই উপকৃত বা উৎসাহিত হবে তা নয়, তাদের অভিভাবকেরাও সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হবেন। প্রতিযোগিতার দিনে আক্ষরিক অর্থেই ঐ সমবায় সমিতি সমাজের সকলের এক মিলনস্থলে পরিণত হবে। একটা 'চিলড্রেন পার্ক', তৈরি করা কি খুবই খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার? একাধিক সমিতি মিলিতভাবেও কি একটা কো-অপারেটিভ চিলড্রেন পার্ক তৈরি করতে পারেন না? পাঠকেরা একমত হবেন কি না জানি না, কিন্তু মনে হয় অর্থ এসব ক্ষেত্রে মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হল চিন্তা ও উদ্যোগের অভাব। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে এইসব কাজ যে করা যেতে এবং করা প্রয়োজন, তার ফল যে সুদূর প্রসারী-এসব কথা আমাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা বোধ হয় সেভাবে ভাবিনি। ইদানিং অবশ্য কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। কেন কিছু সমবায় সমিতি 'হলিডে হোম' চালু করেছেন, কোনও কোনও সমিতি স্বাস্থ্য-পরিষেবাও চালু করেছেন। তবে তেমন সমিতির সংখ্যা খুবই কম। সবশেষে তাই বলি আর দেরি না করে কাজ শুরু করে দিন। চড়ুইভাতি বা পিকনিক তো প্রায় সকলেই করেন। এবারের পিকনিকটা কি সমবায় সমিতির ব্যানারে করা যায় না?

সমবায় সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভায় সদস্যদের কিছু স্মারক-উপহার (ব্যাগ, ছাতা, টর্চ, ঘড়ি) দেওয়া এক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ঐসব ক্ষণস্থায়ী উপহারের পরিবর্তে সমস্যা পিছু মাত্র ৪৫ টাকা খরচ করে ১ লাখ টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা উপহার দিয়ে সদস্যদের পরিবারবর্গকে সুরক্ষিত করাই কি অধিকতর কাম্য নয়? দেরি নয়, এবারের সাধারণ সভাতেই এটি চালু করে সদস্যদের প্রকৃত কল্যাণে উদ্যোগী হন। ❐

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিসটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1998-99

Name of the Centre	Sl No	Name of the course	Duration	Period		Intake Capacity	Remarks
				From	to		
C. C. M. UTTARPARA	1	Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	20 4 98	7 8 98	55	Institutional Candidates
	2	Sensitisation programme on legal literacy for DWCRA Groups	2 days	6 7 98	9 7 98	30	In Collaboration with DRDA Hooghly
	3	—do—	2 days	13 7 98	14 7 98	30	—do—
	4.	Management Dev course for the Directors of PACS	1 Week	17 8 98	21 8 98	30	In collaboration with ICDP Hooghly
	5	—do—	1 Week	24 8 98	28 8 98	30	—do—
	6	Management Dev Programme for Directors of Primary Fishery Cooperatives	1 Week	7 9 98	11 9 98	30	Directorate of Fishery
		Management Dev. Course for Branch Water Project under NCDC	1 Week	14 9 98	18 9 98	30	In Collaboration with BENFISH
	8.	Leadership Dev. Course for Handloom Weavers Coop Society.	1 Week	12 10 98	16 10 98	30	Funds C E F C
	9.	S T Course for Empl Coop Credit Societies.	1 Week	9 11 98	13 11 98	30	Cost to be borne by sponsoring Soctys
	10.	Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	23 11 98	12 3 99	55	Institutional candidates & Freshers
		Short-term course for Managers of PACS & TSS.	1 Week	14 12 98	18 12 98	30	In collaboration with Barasat Unit of W B State Coop Bank Ltd
	12.	Spl. S. T. Course on Municipal Audit	1 Week	4 1 99	8 1 99	30	Directorate of Coop Audit
	13.	Salesmanship course for Tantuja	2 Weeks	11.1.99	22 1 99	30	In collaboration with W B Handloom Weavers Coop Soty Ltd
	14.	Management Dev. Course for Directors of PACS.	1 Week	8 2.99	12 2 99	30	In collaboration with Hooghly D C C B
	15.	Management Dev. Course for Marine Fishery.	1 Week	15.3.99	19 3 99	30	In collaboration with BENFISH
	16.	Refresher Course for J B.C. trained personnel.	8 Weeks	22.3.99	14 5 99	55	For Institutional candidates
C. C. M. BARUIPUR	1.	Diploma Course in Coop. Management.	16 Weeks	20.4.98	7 8 98	40	For institutional candidates & freshers
	2.	Leadership Dev. Course - Fishery	1 Week	8.6.98	12 6 98	30	In collaboration with Director ate of Fishery-Funds-C E F C
	3.	Management Dev. Course for Dairy Cooperatives.	1 Week	15.6.98	19 6 98	30	In collaboration with Milk Producers Coop Union. Burdwan
	4.	S.T. Course on Deposit Mobilisation for PACS.		17.6.98	21 6 98	30	In collaboration with Nadia Dist C C B
	5.	Management Dev. Course for Engineers' Coop. Societies		24.8.98	28 8 98	30	In collaboration with W B Engrs Coop Fedn — Course fees to be borne by the sponsoring Coop Society
	6.	Leadership Dev. Course for PACS.	1 Week		11 9 98	30	In collaboration with Nadia Dist C C B
	7.	Management Dev. Course for Fishery Coops.	1 Week		18 9 98	30	In collaboration with FFDA
	8.	Management Dev. Course for Directors of Women Credit Societies.	1 Week		16 10 98	30	Funds C E F C
	9.	S. T. Course on Deposit Mobilisation for PACS.	1 Week		13 11 98	30	In collaboration with Burdwan D C C B. Course fees to be borne by the Soctys
	10.	Management Dev. Course for Labour Contract & Cons. Coop Societies	1 Week		20.11.98	30	In collaboration with W B Engrs Coop Fedn. Course fees to be borne by the sponsoring societies
	11.	Management Dev. Course for Dairy Cooperatives.	1 Week	23.11.98	27.11.98	30	In collaboration with Burdwan Milk Producers' Coop Union
	12.	Leadership Dev. Course for PACS.	1 Week	14.12.98	18.12.98	30	In collaboration with Burdwan D.C.C.B. Ltd
	13.	—do—	1 Week	28.12.98	1 1 99	30	—do—
	14.	Training Course for the members of SHG.	3 Days	4.1.99	6.1.99	30	In collaboration with NABARD

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the course	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	15.	Management Dev. Course for Dairy Coops.	1 Week	18.1.99	22.1.99	30	Funds : C.E.F.C.
	16.	Management Dev. Course for Industrial Coops	1 Week	8.2.99	12.2.99	30	Course fees to be borne by the sponsoring societies.
	17.	Refresher Course for J.B.C trained personnel.	8 Weeks	22.2.99	16.4.99	40	For Institutional candidates
C. C. M. HALDIBARI	1.	Workshop on Job Orientation of C.Is. of N. Zone.	1 Week	20.4.98	24.4.98	25	Candidates to be sponsored by the D.R.C.S., N. Zone - Funds : C.E.F.C.
	2.	Leadership Dev. Course	1 Week	11.5.98	15.5.98	19	For Directors of W.B. State Coop. Union. Funds - C.E.F.C.
	3	Workshop on Accounts & Secretarial Practice.	1 Week	25.5.98	29.5.98	20	For Indoor staff of W.B. State Coop. Union. Funds - C.E.F.C.
	4.	Diploma Course in Coop. Management	16 Weeks	1.6.98	18.9.98	25	For Institutional candidates.
	5.	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	12.10.98	16.10.98	25	Non-official leaders of Coop. Societies — Funds C.E.F.C
	6.	Course for DWCRA Group leaders & members.	1 Week	26.10.98	30.10.98	25	In collaboration with Darjeeling Council Rural Development Agency.
	7.	—do—	1 Week	9.11.98	13.11.98	25	—do—
	8.	—do—	1 Week	23.11.98	27.11.98	25	—do—
	9.	—do—	1 Week	7.12.98	11.12.98	25	—do—
	10.	S.T. Course on Dairy Development	1 Week	14.12.98	18.12.98	25	—do—
	11.	S.T. Course for Piggery Development.	1 Week	28.12.98	1.1.99	25	—do—
	12	S.T. Course for Urban Coop. Banks	1 Week	11.1.99	15.1.99	25	For Empl./Directors of Urban Coop. Bank-Cost to be borne by the sponsoring Banks.
	13	Workshop on Accounts & Secretarial Practice.	1 Week	1.2.99	5.2.99	25	For Employees of Dist. Coop. Unions — Funds : C.E.F.C
	14.	Course on B.D.P. — DAP.	1 Week	15.2.99	20.2.99	25	For Managers of PACS - In collaboration with C.C.Is.
	15	Leadership Dev. Course (Women).	1 Week	1.3.99	5.3.99	25	For non-official leaders of Women Coop. Societies Funds — C.E.F.C.
	16	Refreshers Course for J.B.C trained Managers	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	25	For Institutional candidates
C. C. M. JHARGRAM	1.	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	20.4.98	24.4.98	30	For non-official leaders of Coop. Socys. - Funds - C.E.F.C
	2.	Workshop on Deposit Mobilisation for PACS (1.5.98 being a holiday, the course will conclude on 2.5.98)	1 Week	27.4.98 -	2.5.98	30	In collaboration with V.C.C. Bank Ltd
	3.	S.T. Course for Employees' Coop Credit Socys.	1 Week	11.5.98	15.5.98	30	For Directors of local E.C.C.S Pay course.
	4.	Workshop for Women Industrial Coop. Societies	1 Week	18.5.98	22.5.98	30	—
	5.	Leadership Dev. Course for CADP-FSCS	1 Week	1.6.98	5.6.98	30	In collaboration with W.B.C.A.D.C.
	6.	S.T. Course on Fertilizer Business.	1 Week	15.6.98	19.6.98	30	In collaboration with IFFCO.
	7	TRYSEM Course.	1 Week	29.6.98	3.7.98	30	In collaboration with D.R.D.A.
	8	Refreshers Course for J.B.C Trained Managers.	8 Weeks	13.7.98	4.9.98	40	For Institutional candidates
	9	Course on BDP-DAP	1 Week	14.9.98	18.9.98	40	For Managers of PACS in collaboration with C.C.Is.
	10	Spl. Course on Municipal Audit	1 Week	21.9.98	25.9.98	30	Directorate of Coop. Audit
	11	Course for the employees of Purulia C.C.B	2 Weeks	12.10.98	23.10.98	30	In collaboration with Purulia DCCB.
	12	Workshop on Deposit Mobilisation for PACS.	1 Week	26.10.98	30.10.98	30	In collaboration with C.C.Is.
	13.	Diploma course in Coop. Management.	16 Weeks	9.11.98	26.2.99	40	For Institutional candidates
		Management Development Course for Labour/Engineers Coop Societies.	1 Week	8.3.99	12.3.99	30	In collaboration with W.B. Engineers' Coop. Federation Ltd.
	15	Refresher Course for J.B.C trained Managers	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	40	For Institutional candidates.
C. C. M. JALPAIGURI	1	Diploma Course in Coop. Management (Spill over)	16 Weeks	8.3.98	26.6.98	40	Institutional candidates. (Spill Over)
	2	Course for DWCRA Group Leaders & Members.	1 Week	13.7.98	18.7.98	30	In collaboration with D.R.D.A. Jalpaiguri.

Name of the Centre	Sl. No	Name of the course	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	3	—do—	1 Week	27.7.98	1.8.98	30	—do—
	4.	—do—	1 Week	17.8.98	22.8.98	30	—do—
	5	—do—	1 Week	31.8.98	5.9.98	30	—do—
	6.	—do—	1 Week	14.9.98	19.9.98	30	—do—
	7.	S.T. Course for Panchayet functionaries.	1 Week	12.10.98	16.10.98	30	In collaboration with D P O , Jalpaiguri
	8.	—do—	1 Week	26.10.98	30.10.98	30	—do—
	9	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	9.11.98	13.11.98	30	Non-official Leaders of Coop Societies - Funds C.E.F.C
	10.	Workshop on Deposit Mobilisation for PACS.	1 Week	23.11.98	27.11.98	30	In collaboration with Cooch-Behar Unit of W.B. State Coop. Bank & Jalpaiguri CCB
		Course for DWCRA Group Leaders & Members	1 Week	7.12.98	12.12.98	30	In collaboration with DRDA, Jalpaiguri
	12.	—do—	1 week	28.12.98	2.1.99	30	—do—
	13.	—do—	1 Week	11.1.99	16.1.99	30	—do—
	14.	—do—	1 Week	1.2.99	6.2.99	30	—do—
	15.	—do—	1 Week	15.2.99	20.2.99	30	—do—
	16.	Diploma Course in Coop. Management.	16 Weeks	1.3.99	18.6.99	40	Institutional candidates
C. C. M. ILLAMBAZAR	1.	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	20.4.98	24.4.98	25	For employees of PACS In collaboration with C C Bs
	2.	4th Diploma Course on Coop. Management.	16 Weeks	18.5.98	4.9.98	25	Institutional candidates & freshers.
	3.	S.T. Course on fertilizer business.	1 Week	14.9.98	18.9.98	25	For employees of PACS & PAMS - In collaboration with IFFCO
		DWCRA 1st slot	1 Week	12.10.98	17.10.98	25	For Group leaders & Asstt Group Leaders - In collaboration with D.R.D.A. Birbhum
	5.	Leadership Dev. Course (Normal).	1 Week	26.10.98	30.10.98	25	Non-official leaders of Coop Socys
	6.	DWCRA 2nd slot.	1 Week	9.11.98	14.11.98	25	For Group Leaders & Asstt Group Leaders - In collaboration with D.R.D.A., Birbhum
	7.	DWCRA 3rd slot.	1 Week	16.11.98	21.11.98	25	—do—
	8.	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	23.11.98	27.11.98	25	For employees of PACS - In collaboration with C C Bs
	9.	S.T. Course on Business Dev. Plan & Dev. Action Plan.	1 Week	7.12.98	11.12.98	25	For employees of PACS In collaboration with C C Bs
	10.	S.T. Course for employees of Employees' Coop. Credit Societies	1 Week	14.12.98	18.12.98	25	Cost to be borne by sponsoring Cooperatives
		S.T. Course on Consumer Business of Employees Coop. Credit Societies	1 Week	4.1.99	8.1.99	25	For employees of PACS & Consumers' Socys - In collaboration with C C Bs
	12.	Leadership Dev. Course for Weavers' Coop. Societies.	1 Week	18.1.99	22.1.99	25	For non-official leaders of Handloom Coop Socys Funds C.E.F.C
	13.	S.T. Course on Employees & Leaders of Industrial Societies.	1 Week	8.2.99	12.2.99	25	For employees & leaders of Industrial Socys In collaboration with Dist. Industry Centre, Birbhum
		S.T. Course on B.D.P. & D.A.P.	1 Week	22.2.99	26.2.99	25	For employees of PACS & PAMS & Supervisors of Birbhum Dist. Central Coop. Bank
	15.	DWCRA 4th slot.	1 Week	8.3.99	13.3.99	25	For Group Leaders & Asstt Group Leaders (In collaboration with D.R.D.A Birbhum)
	16.	DWCRA 5th slot	1 Week	15.3.99	20.3.99	25	—do—
	17.	Refresher Course for J.B.C. trained personnel.	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	25	For institutional candidates.

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

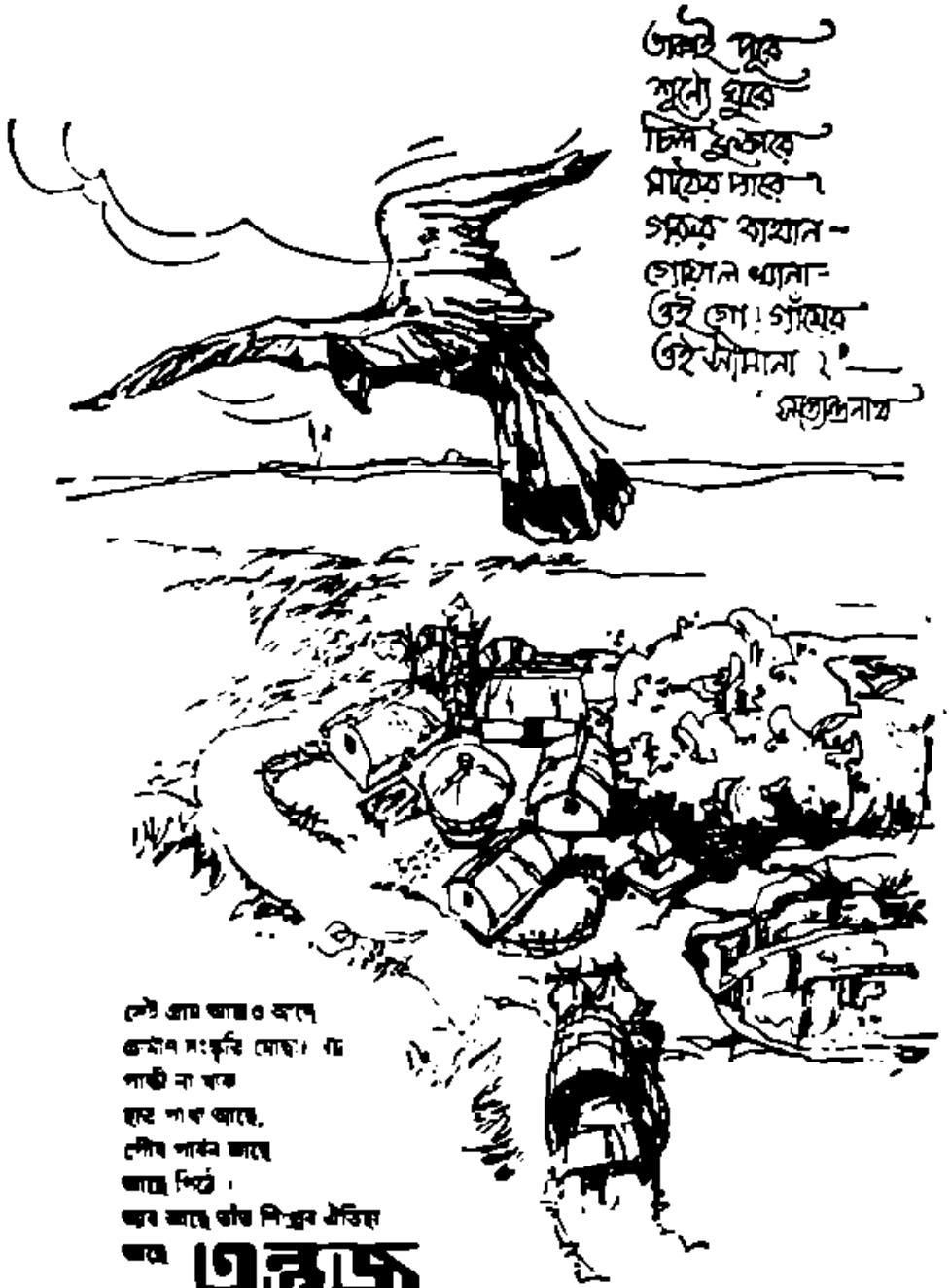

সেই গ্রাম আজও রয়েছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মোড়া। যদি
পাখী না থাক
হাতে শাখা আছে,
সীঁথে সিঁদুর আছে
আছে বিন্দি।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপা: সোসাইটি লি:
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন ঃ ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬		১০৩			১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৫২০৪.৫৯	(-) ১০৬.৮৩

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

সমবায় সমাচার

সমবায় আন্দোলনকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দিতে হবে

— সমবায়মন্ত্রী

সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, জলপাইগুড়ির নির্মীয়মান নিজস্ব ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল বলেন, 'অমূল' প্রকৃতপক্ষে সমবায় নয় — লিমিটেড কোম্পানির নামান্তর মাত্র। মহারাষ্ট্রের সমবায় চিনিকলগুলির উল্লেখ করে সমবায়মন্ত্রী বলেন এগুলির সঙ্গে সাধারণ মানুষের নাড়ির যোগ নেই বললেই চলে। তিনি সমবায়কে কুক্ষিগত করে না রেখে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

গত ৬ এপ্রিল সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, জলপাইগুড়ির নিজস্ব ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন ও নির্বাচনসংক্রান্ত বিধিনিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস কর্মসূচি বন্ধ দিয়ে নির্মীয়মান ভবন প্রাঙ্গণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রতন মুখার্জি এবং জলপাইগুড়ি জেলার জেলা সমবায়ী দিনেশকুমার, আই এ এস। এছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি সত্যজিৎ বসু, ডি আর ডি এ. সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ।

সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত উদ্বোধন সঙ্গীত ও অতিথি বরণের পর প্রারম্ভিক ভাষণে অধ্যক্ষ অনুপকুমার ঘোষ ওই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অতীত দিনের দু-চার কথা বলেন এবং জানান যে সমবায়

মঞ্চে উপবিষ্ট বক্তিবর্গ থেকে বাঁ-দিক থেকে সত্যজিৎ বসু, দিনেশগোপাল মিত্র, সুনীল ঘোষ, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, রতন মুখার্জী ও দি বন্দ্যোপাধ্যায়

জলপাইগুড়ির প্রবীণ আধিকারিক শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমবায় সমিতিসমূহের উত্তরবাঙ্গলের উপনিবন্ধক দীপক ঘোষ এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সমবায় সমিতির পদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট সমবায়ীবৃন্দ। এই সভার পৌরোহিত্য করেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মসূচির ব্যাপক সম্প্রচারণের ফলে নিজস্ব সম্পত্তির ভবন অপরিহার্য হয়ে উঠছে ; অত্যন্ত আনন্দের কথা সে প্রত্যাশা আজ পূরণের পথে। তিনি এই নির্মাণ কাজে আর্থিক সহায়তা এবং অনুষঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্যদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও হার্দিক অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সমবায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল রূপায়ণে গৌরবজনক অবস্থানের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে।

ভাষণরত সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক দিনেশগোপাল মিত্র সভাতে অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান। সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি জানান যে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলার জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ওই কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা প্রকোষ্ঠের জন্য নয় — আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। আন্দোলনের

সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থেই সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন এবং এই কাজে সকলের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করেন।

অতি সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে জলপাইগুড়ি জেলার জেলা সমাহর্তা পি রমেশকুমার নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটির প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে এই নির্মাণ কাজ আরও আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা হয়নি। তিনি বলেন যে নির্মাণ কাজে দেরি হওয়া মানে নির্মাণ খরচ বেড়ে যাওয়া এবং নির্মাণ খরচ বাড়ার মানে হল সর্বসাধারণের অর্থের অপচয়। এই অপচয় যাতে না ঘটে সেজন্য প্রস্তাবিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করার জন্য বাস্তুকারদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি বরুন মুখার্জি গ্রাম উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য-দূরীকরণে সমবায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সভাধিপতি তাঁর ভাষণে বলেন সমবায় আন্দোলন ঋনিমুক্তিতে সহায়তা করছে ঠিকই, তবে আরও কিছু করণীয় আছে। উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনের কাজে আরও সহায়তার প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে সমবায় বিভাগকে অনুরোধ জানান।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি সত্যজিৎ বসু তাঁর ভাষণে জেলার সমবায় আন্দোলনের একটি চিত্র তুলে ধরেন। আন্দোলনের উন্নয়নের স্বার্থে সমবায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন বলে শ্রীবসু মন্তব্য করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে সমবায়মন্ত্রী বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ওই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের অবস্থান, ওই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা, পশ্চিমবাংলার সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এর ফলাফল ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা এবং তৃণমূলে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। সমবায়মন্ত্রী এই বছরের বাজেটে সমবায় বিভাগের জন্য আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও সভায় জানান। মন্ত্রীমহাশয় জানান প্রাথমিক সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতির ম্যানেজারদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

সভাপতির ভাষণে সুনীলকুমার ঘোষ বলেন, বাজার অর্থনীতির কুফল এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে সমবায়ের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখন আর সরকার অর্থনীতিকে পরিচালনা করেন না, বাজার অর্থনীতির দ্বারা সরকার পরিচালিত হয়।' শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে সমবায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলার সময়ে ১৯৯৮-৯৯ সালের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের (ক্লেসার) জন্য 'ডিপ্লোমা কোর্স' এবং পাঁচ বছর বা তারও আগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য 'রি-ক্লেসার কোর্স' প্রবর্তন করার কথা জানান। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি রূপায়ণে বিভিন্ন রাজ্য-বিপত্তির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত কিছু বিধিনিষেধ এবং সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার জন্য কিছু পদ খালি পড়ে থাকায় অনেকগুলি জেলায় কোনও শিক্ষা নির্দেশক নেই। প্রশিক্ষণকালে প্রদত্ত ভাতার (স্টাইপেণ্ড) স্বল্পতার কথাও তিনি অফিসারের সঙ্গে উল্লেখ করেন এবং জানান যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও সমবায় শিক্ষা তহবিলের অর্থানুকূল্যে গত ১৯৯৭-৯৮ বছর থেকে ওই ভাতার হার কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। সভাপতি তাঁর ভাষণে সমবায় শিক্ষা তহবিল কি ও কেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সমবায় আন্দোলনের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের স্বার্থে ওই তহবিলে প্রদেয় টাকা যাতে সমবায় সমিতিগুলি সময়মত প্রদান করে সেজন্য প্রতিনিধিবর্গকে অনুরোধ জানান। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে ইদানিংকালের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জানান যে একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ভাষণ শেষ করার আগে সভাপতি মহাশয় এই ভবন নির্মাণের কাজে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানান এবং এই কাজে ভবিষ্যতেও সকলের সাহায্য-সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।

সভায় সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে একটি সমবায় বিষয়ক কবিতা পাঠ করে শোনানো হয়। সভা শেষে সমবেত অতিথিবৃন্দকে আহার জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর স্থানীয় সদস্য বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

❑ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

পরলোকে শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী

গত ২৬ এপ্রিল ১৯৯৮-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় অধিকারের বিশিষ্ট আধিকারিক শৈলেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী প্রয়াত হয়েছেন। তিনি সমবায় শিক্ষাক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং উত্তরপাড়াসহ বিভিন্ন সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যক্ষের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। পুরনো মূল্যবোধের মূল্যবান মানুষেরা আমাদের রিক্ত করে এইভাবে চলে যাচ্ছেন। সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রসারে ও ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে তাঁর অমূল্য অবদান সংযোজন করেছে। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। ❑ নিজস্ব প্রতিনিধি

আলো নবজীবনের নির্মল দীপিকা,
মর্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা।
আঁধার গহ্বরে রচো আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ৩য়, মানে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা শতবার্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিস্তারনের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় স্পর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 139 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713204
Phone : 0343 / 56-2393, 0343 / 56-4722

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* *বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।*
* *৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।*
* *ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।*
* *মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।*
* *সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।*

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম নন্দী কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং আর্টি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-১২ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথম হৃদয়ের অনুভূতি। বুদ্ধি বা যুক্তিতে কি আছে? কতবার পদ অস্খলন হইয়াই ইহা থামিয়া যায়। প্রকৃত প্রেরণা আসে অন্তর হইতে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে। হে আমার ভবিষ্যতের দেশভক্তগণ! হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে শিখ। তোমরা কি এক্থা অনুভব করিতে পার যে, দেবতা ও ঋষির কোটি কোটি বংশধরগণ আজ পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে? তুমি কি অনুভব কর যে, কোটি কোটি লোক অনশনে দিন যাপন করিয়া আসিতেছে? এ কথা কি চিন্তা কর যে, অজ্ঞতা কালমেঘের মত সমস্ত দেশকে আবৃত করিয়াছে? ইহা কি তোমাকে বিচলিত করে? ইহা কি তোমার চোখের নিদ্রা হরণ করে? ইহা কি তোমার রক্তের সঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া হৃৎস্পন্দনের সহিত তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে? ...জাতির আসন্ন কল্যাণের যেদনাময়ী চিন্তা কি তোমাকে ভাবাবিষ্ট করিয়াছে এবং তুমি তোমার নাম-যশ, তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, তোমার সম্পত্তি, এমন কি তোমার দৈহিক সত্তা পর্যন্ত কি তুলিয়া আত্মহারা হইতে পারিয়াছ? এই চিন্তাই জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান।

স্বামী বিবেকানন্দ

ভাণ্ডার

জুন, ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

উনবিংশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি ড. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণের নির্বাচিত অংশ

"... সমবায়ের মূলনীতি হইতেছে Selfhelp (স্বাবলম্বন) এবং Mutual aid (পারস্পরিক সহযোগ)। সমবায় বলিতে যদি আমরা ঋণ-দান ও ঋণ গ্রহণ বুঝি তবে দেশের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ হইবে না। সমবায়ের মহৎ আদর্শ সম্মুখে থাকিলে সামান্য ভুলত্রুটি হইলেও কোন বিরাট ক্ষতি হইবে না। আমাদের পক্ষে সমবায়ের মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কঠিন নহে। কারণ বর্তমান সুসভ্য জাতির অনেকে যখন সভ্যতার আলোক দেখে নাই তখন ভারতে পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর সমবায়ের নীতি নিহিত ছিল। কিন্তু পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মূলনীতি বিস্মৃত হইয়াছি। আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা সমবায়ের মূলসূত্র ভুলিবেন না।

অনেকে বলেন যে সরকারি প্রভাব মুক্ত না হইলে বর্তমান যুগোপযোগী ভিত্তির সমবায় প্রচেষ্টা চালন সম্ভব নহে। আমি স্বীকার করি সমবায় প্রচেষ্টার প্রসারে ভারতে তথা পৃথিবীর সকল দেশেই সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সহযোগিতা এক জিনিস এবং প্রভুত্ব অন্য জিনিস। যদি সরকার সহযোগিতার সুযোগে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন তবে সমবায় নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে এবং দেশের লোকের চরিত্র গঠন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমি অবশ্য বলিতেছি না যে আমরা সরকারি সহযোগিতা বর্জন করিতে চাই। আমি চাই সরকারি সহযোগিতা যেন অধিকতর পরিমাণে লাভ হয়। সুখের বিষয় এই যে, আমাদের বেজিস্ট্রার এই সভায় উপস্থিত আছেন। আমি জানি তিনি আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এই একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের দেশে অন্তত ১০ জন লোক নিজেদের গ্রামবাসিগণকে সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে প্রথম কার্য চালন সমবায় যাঁহারা কিছু লেখাপড়া জানেন তাঁহারা বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জার্নাল এবং ভাণ্ডার পত্রিকা পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। অবশ্য পত্রিকা দুইখানির আরও উন্নতি করা সম্ভবপর। কিন্তু অর্থাভাবে এখনও বিশেষ বৃদ্ধি করা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন যে-সকল শিক্ষক বা প্রচারক প্রচারকার্যে যাবেন তাঁহাদের সমবায়ের আদর্শে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তাঁহাদেরও যথেষ্টপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া করা দরকার। সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সংগঠন সমিতি ট্রেনিং অব সমবায়কর্মীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে ইহা নিতান্ত অল্প। এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। আমাদের রেজিস্ট্রার মহাশয় এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিরূপে টাকার সংকুলান হইতে তাহার পথও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি গৃহীত হইয়া কার্যে পরিণত হইলে ভাণ্ডারের উন্নতি হইবে এবং প্রচারক ও সমবায় কর্মীদের সুশিক্ষার পথ সুগম হইবে। আমি ভরসা করি, আপনারা সকলে এই বিষয়ে অবহিত হইয়া সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইবেন।"

: ভাণ্ডার (পৌষ, ১৩৩১)

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২% অংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

ভাণ্ডার

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ : ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ধোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাণী রায়	সদস্য
সুভাষ বাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র
যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক

জুন, ১৯৯৮

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		৩
বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন	কোলানাথ দত্ত	৫
ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	৮
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি এলাকা, কৃষি প্রকরণ ও কর্মসংস্থান	ড. সুনির্মল মাইতি	১৩
সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে - ৪ :	বনানী দাস	
সমবায় প্রশিক্ষণ সূচি (১৯৯৮-৯৯)		৩১
সমবায় সমাচার		৩৫

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

"স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়।
ধর্ম, শান্তি, কাব্য, অনন্ত-এরা আরও বড়।
এদের একান্ত বিকাশের জন্যই তো স্বাধীনতা,
নইলে এর মূল্য ছিল কোথা?"

— শরৎচন্দ্র (পথের দাবি)

● ● ●

"মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার
নেশায় নরমর এই সমাজের (মধ্যবিত্ত)
কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল।
ভেবেছিলাম, ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে
অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের
মতো মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে
পারি সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা
করবে।"

— মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েসির আখড়া দিয়ে,
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই চক্রপথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতির মহীরূহ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান করবি, শুনি?"

— নজরুল ইসলাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ডাকা মিটিং বাতিল — অশোভন, অন্যায্য ও অন্যায়

সেদিন তুমি অপ্রত্যাশিত ও অচেনা চড়া সুরে আমার সাথে কথা বললে। নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললে মিটিং টা বাতিল করতে। আমি তোমাকে বলেছিলাম একটা মিটিং ডাকলে তার সাথে অনেক কিছু জড়িত থাকে, এত সহজ ভাবনায় মিটিং বাতিল করা যায় না। এ-কথায় তোমাকে নিরস্ত করা গেল না। তুমি ততোধিক চড়া স্বরে মিটিং বাতিল করার দাবি জানালে। আমি তোমার দাবি মানতে পারিনি। কারণ তা যেমন আইনগতভাবে ঠিক নয়, পদ্ধতিগতভাবে যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। এটা জানা দরকার আইনগতভাবে মিটিং ডাকার ক্ষমতা যার, মিটিং বাতিল করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয় না — এটা যে কোন সাংবিধানিক বা আইনি ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক। অনেক কারণের মধ্যে বোধ হয় একটি কারণ হল এই যে এতে যিনি মিটিং ডাকেন তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকবে অথবা তিনি কোন গোষ্ঠীর সুবিধার্থে কিম্বা কোন গোষ্ঠীর অসুবিধা সৃষ্টি করার কাজ করতে পারবেন। আরও অনেক আইনি দিক আছে যা আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। দ্বিতীয় দিকটি হল পদ্ধতিগত। একটা মিটিং ডাকার পেছনে কিছু উদ্দেশ্য থাকে, কর্মসূচি থাকে আর থাকে তারা যারা ঐ উদ্দেশ্য ও ঐ কর্মসূচির সামিল। মিটিং বাতিল করলে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব যায় কমে, কর্মসূচি তার সময় হারায়, কর্মসূচি নিছক আনুষ্ঠানিক হয়ে ওঠে আর যারা উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সামিল তাদের কাছে জবাবদিহি করার মতো করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন এসে পড়ে। পদ্ধতিগত দিক থেকে আরও কিছু বলার আছে যা এখানে আলোচনা করা যাবে না। একটি তৃতীয় দিকও আছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সজাগ ও সচেতন কর্মচারি-ইউনিয়নের কাছেও মিটিং বাতিল করার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যাখ্যা করার একটা নীতিগত দায় থাকে। সামগ্রিকভাবে এই দিকগুলি মিটিং ডাকার ক্ষেত্রে মনে রাখার দরকার হয় এবং কোনক্রমে মিটিং বাতিল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া যায় না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে নিয়ম একই।

সৌজন্যে : বিনয়গোপাল মিত্র

একটি বিশেষ আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলী এবং "স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং"-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে নবাগত (ফ্রেসার) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "ডিপ্লোমা কোর্স ইন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট" চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি স্তরে পাঠ্য বিষয় হিসাবে "সমবায়"কে এখনও অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনাধীন সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলি ছাড়া অন্য কোথাও সমবায় বিষয়ক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থাও নেই। এজন্য "ডিপ্লোমা কোর্স ইন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট" এ প্রশিক্ষণলাভের সুযোগ শুধুমাত্র চাকুরিরতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নবাগত (ফ্রেসার) ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বড়গুলে ইতিমধ্যেই দশজন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রশিক্ষণক্রমে যোগদান করেছে। বলাবাহুল্য, এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রী যদি চাকরির সুযোগ লাভ করে তবেই তারা এই প্রশিক্ষণ নিতে আরও আগ্রহী হবে এবং এই উদ্যোগটি সফল হবে।

কর্মী নিয়োগকালে যদি প্রার্থীদের যোগ্যতা হিসাবে "সমবায় প্রশিক্ষণ"কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় - অন্ততপক্ষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় তাহলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থীরা উপকৃত হবেন। পক্ষান্তরে নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগের পর সমবায় প্রশিক্ষণ দানের প্রশ্নটি থাকবে না - এতে নিয়োগকারী সমবায় সমিতিটিরও সাশ্রয় হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কর্মরতদের মত নবাগতদেরও একই মেয়াদ ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বিষয়টি যথাযথভাবে ভেবে দেখার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলী। কর্মকর্তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

সম্পাদকীয়

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রায় এক নির্দিষ্ট জনসমষ্টিকে ঘিরে প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির যত চিন্তা-ভাবনা! পঞ্চায়েত আছে, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানও আছে কোথাও কোথাও। মানুষ মানুষের জন্যে; আবেগতাড়িত সহানুভূতির বা মানবিকতার প্রসঙ্গ নয়। বিষয়টি কর্মসূচির এবং কর্মসূচি রূপায়ণের। সমবায় সমিতির কেবল অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকলেই চলবে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক ও পরিবেশগত সমস্যাগুলির সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। নইলে সমবায় সমিতি জনসমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। গ্রামেগঞ্জে সমবায়ের কি আজ সত্যি সত্যি কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে! সময়ের সাথে তাল রাখতে না পারলে সমবায় সমিতির অস্তিত্ব যে বিপন্ন তা সময়ই বলে দেবে। উন্নয়নের সূচক খুব দ্রুত পাল্টেছে, গত দু-দশকের উন্নয়নের ইতিহাস অভূতপূর্ব। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিবেষার আয়োজন দ্রুতগতিতে ঝড়মুড় করে আমাদের কাছে এসে আছড়ে পড়েছে। তাই চিন্তাভাবনায় ও কর্মসূচিতে সমবায় সমিতির আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। সমবায়নীতিতে যুক্ত হয়েছে Concern for Community. আমাদের কর্মসূচি প্রণয়নে যত্নবান হতে হবে যাতে এই সুচিন্তিত নীতিটি আমরা কাজে লাগাতে পারি। যে জনসমষ্টির জন্য সমিতি সেই জনসমষ্টিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যেই কর্মসূচি প্রণয়ন করা দরকার। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ – তিনটি শ্রেণী। ছাত্রছাত্রী আর একটি। শিক্ষিত বেকার অন্যতম একটি শ্রেণী। নারীর শিক্ষা, চেতনা ও উন্নয়নে অংশগ্রহণে প্রস্তুতির জন্য শ্রেণী বিভাগ। এমনি করে এক-একটি শ্রেণী-চিহ্নিত করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি নিতে না পারলে কেউ কোন শুকনো আদর্শের ভিত্তিতে সমবায় ঘরে বসে থাকবে না। আর কিছুদিন যদি ঘরে থাকেই সেটা হবে 'ঘর কাছি তো ঘরে আছি' গোছের। এবং একদিন অজান্তেই কাছি হাত থেকে খসে পড়বে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ প্রচেষ্টার ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয় তাহলে সমবায় প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্মোহ হওয়া ছাড়া উপায় কি।

বিডিপি রূপায়ণে যত্নবান হলে অনেকাংশে Concern for Community কর্মসূচি পালিত হবে। বিডিপি'র জন্য কোন সীমাবদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয় রূপরেখা থাকতে পারে না। স্থানীয়ভাবে সমিতি তার বিডিপি কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণে অগ্রসর হলে সেটাই হবে পথনির্দেশিকা।

❐

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে
গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, শেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

ফোন : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ ★ ফ্যাক্স : ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয় — কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহণের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭.২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে নেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হতে — সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা

১) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ১১৭.২৫ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৬১.৬৭ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে, ৪৬.০৮ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৯.৫০ কোটি।

২) কৃষি, অকৃষি ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবাংলায় গত বছরের সর্বশেষ লগ্নি ৬৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ও পরিবহণে গত চার বছরে আমানতের লগ্নি ৫৮ কোটি টাকা।

৩) গ্রামে কিংবা শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ দানে আমরাই অগ্রণী — এখনও পর্যন্ত লগ্নির পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

৪) আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করি না, তাছাড়া আমানতের ক্ষেত্রেও জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে না।

৫) সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না। আয়কর আইনের ১২৪ ধারা অনুযায়ী স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে এই সুযোগ নেই।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ	প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য	সরল দেব
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	*ভাইস-চেয়ারম্যান*	*চেয়ারম্যান*

বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন

ভোলানাথ দত্ত

পরিবেশ আন্দোলনের সূচনার ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "ঠিকানা" কবিতার কবির কোন নির্দিষ্ট ঠিকানার সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁকে পাওয়া যাবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ; তেমনি পরিবেশ আন্দোলনের ঠিকানা পাওয়া যাবে মানুষের ঘরে ঘরে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রথমদিকে পরিবেশগত সমস্যাগুলি ছিল স্থানীয় ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত দূষণ লক্ষ্য করা যেত, প্রত্যক্ষ দূষণকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। শিকার করা ও বন্যজন্তুর গায়ে কাটাকে দূষণ হিসাবে মান্য করা হতো না প্রথমদিকে। পরিবেশ সম্বন্ধীয় চেতনা ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হতো। আদিমযুগে শিকার এক সময়ে মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বৃত্তি ছিল। সময়ের ব্যবধানে সেই শিকার ব্যবস্থা বন্যপ্রাণী বিলোপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিমি ও সীল মাছ শিকার এক সময়ের অতি পরিচিত ঘটনা ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্ত্রী জাতির প্রাণী শিকার ঐ প্রজাতির প্রাণী বিলোপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীনকালে রাজা ও সম্রান্তদের শিকার এক পথ হিসাবে বিবেচিত ছিল। অষ্ট্রিচের পালক, বাইসনের শিং, হিপ্পোর দাঁত, মাংস ও চামড়া সংগ্রহ প্রচলিত ছিল। অস্ট্রেলিয়ার কাঙ্গারুর দশাও একই রকম।

ইউরোপে পরিবেশ চিন্তা শহরকেন্দ্রী স্তরে মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, জল-স্থল, অরণ্যাঞ্চল, জীব-জন্তু, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির রূপ সময়ের ব্যবধানে রূপান্তরিত হয়েছে। অব্যবহৃত জমি, কৃষি, মনুষ্যবসতি, সমুদ্র ও ঔদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে পরিবেশগত বিষয় হিসাবে গণ্য করা আরম্ভ হয়। খাদ্যের জীবনচক্র প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতো, জীব বৈচিত্র্য সত্তার প্রকৃতির স্বরূপকে প্রকাশ ও বিকশিত করতো, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে জলবায়ুর চরিত্রের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তাপের লক্ষণীয় বৃদ্ধি ঘটেছে অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও ভিন্নি উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমুদ্রের জলের স্তর ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কার্বন নির্গমন বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রীন হাউস গ্যাসও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধারণা একেবারেই ছিল না। পরিবেশ সমস্যার দিক গুলো সম্বন্ধে তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি নিয়ে তারা অনেকদিন বিভ্রান্ত অবস্থায় থেকে গেছেন ও সমস্যা সমাধানের সহনশীল রাস্তা খুঁজে পাননি। সমস্যা দিন দিন বেড়ে পুঞ্জিভূত হয়েছে — এ পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য থাকবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন বিভিন্ন দেশে সংগঠিত হয়েছে, বহু চুক্তি, বহু সিদ্ধান্ত ও বহু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে-সহনশীল বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়নের বাণী শোনানো হচ্ছে বিশ্ববাসীকে। এবই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা দরকার। ইউরোপের সাথে সাথে উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিবেশগত বিস্তার প্রসার ঘটতে লাগলো, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি ক্রান্তীয় বনাঞ্চলের ও জীব-বৈচিত্র্যের উপাদানে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই সমস্ত অঞ্চলের পণ্য সামগ্রী অন্যত্র চলে যেতে লাগলো।

অবশেষে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক প্রভাবের প্রসার ঘটে গেল। জার্মানির বনরক্ষকদের জ্ঞান বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন হয়ে ভারতে, ভারত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার এবং অন্যত্র চালান হতে থাকলো। আল্পো এবং ডায়উইনইজিম মানুষের জন্মগত ব্যবধান অনুকূল পরিবর্তন ঘটালো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন করা কষ্টকর হয়ে পড়লো। যদিও পদ্ধতি ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভিন্নতা রইল তবু গ্রোবাল পরিবেশ আন্দোলনের এক নতুন মাত্রিকে উত্তরণ ঘটলো।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগের মধ্যেই ব্রিটিশ পরিবেশতত্ত্বের উৎস বিদ্যমান। প্রকৃতিকে মানুষের শোষণ করার সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রকৃতির ইতিহাসে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বন্য জীব-জন্তু রক্ষার প্রথম উদ্যোগ দেখা যায়, পাতা ঝরিয়ে, গাছ-পালা কেটে শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি কয়েকটি শহর গড়ে উঠবে প্রতিবেশক হিসাবে গ্রাম রমণীয়তা রক্ষার দাবিও চলে আসে। প্রথম ব্রিটিশ পরিবেশবাদীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয় প্রকৃতির ইতিহাস অধ্যয়নে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অপেশাদার/সৌখিন কর্মীরত প্রকৃতিবাদীদের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মোদ্যোগ যা আধুনিক উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং অন্যান্য জীববিদ্যার ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

ব্রিটিশ প্রকৃতিবাদীদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন গিলবার্ট হোয়াইট যার সৌখিক কাজ ১৭৮৮ সালে "দি ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ সেলবার্ন" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে চতুর্থ প্রকাশনা যা ডারউইন সনেট পরবর্তী প্রজন্মের প্রকৃতিবাদীদের প্রভাবিত করেছিল। প্রকৃতিতে সুখশান্তির স্থান যা সরলতা ও মানবতার সমর্থনকারী কেননা প্রকৃতির সাথে মানুষের শান্তিমূলক সহাবস্থান পুনঃ উদ্ধারের প্রয়োজন।

"গিলবার্ট হোয়াইটের মত অসাধারণ প্রজ্ঞা নিয়ে কেউ যদি প্রকৃতিকে দেখেন বা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে প্রকৃতির ইতিহাসে নূতনত্বের অভাব দেখা যাবে।" এই মন্তব্য ভেত্তি আন্দোলনের। প্রকৃতিকে জানার অগ্রহ দিন দিন প্রকৃতিকে রক্ষা করার কাজে পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে। এই আগ্রহ উৎসাহিত করেছে জনসাধারণ যারা হিসাবে, আগ্রহ ও সমর্থন যোগাচ্ছে। চারুক ও অলিন্দবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও প্রজ্ঞাতত্ত্বের চালচিত্রের পরিবর্তে ভাবকল্পী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, তারা মনে করেন যে প্রকৃতিবাদী হল ব্যবসায় ও বিদেশীয়। প্রকৃতিকে মানুষের বিভিন্নতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে অলিন্দ অধিবাসীদের সম্পর্কভাব সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যবসাগ্রস্ত হয়। কৃষিকাজের জন্য গ্রামের পরিবর্তন হয়েছে তাতে কবি ও শিল্পীরা আক্ষেপ করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন প্রকৃতির লক্ষণীয় অধিকারের বিষয় সৌন্দর্য বিলাস ও লেখক উইলিয়াম গিলপিন লিখেছিলেন যে একদা মানুষ তার বসতবাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছেন তখনই বিকলাঙ্গ তাকে অনুসরণ করেছে। তার কোলাল, লাঙ্গল, কোপকাড, পরিখা ঘরা ফুলচাষের ক্ষেত ও সরলভাবে উপর বলপূর্বক দখল মানুষকে নর্মাহত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে মানুষের মূল্যবোধ সার্বজনীন ও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি যা পরিবেশ আন্দোলন করতে সক্ষম হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে প্রকৃতিপ্রেমীরা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন যা বিংশ শতাব্দীতে অপেশাদারী/সৌখিন প্রকৃতিবাদীরা, পেশাদারী পরিকল্পনাবিদরা পাবলিক পলিসি একেত্তার জন্য

উঠে পড়ে লাগানো এবং ১৯৪৫ সালের পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অভিগার্ড পরিবেশে পরিবেশতত্ত্ব বর্ধিত, জাতীয় এবং রাজনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বিস্তারিত হল। পরিবেশ আন্দোলন কোটি কোটি মানুষের মন জয় করল। মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীর পরিবর্তন ঘটাল, আইনের নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠল, নতুন রাজনৈতিক দলের পত্তন ঘটাল, অর্থনৈতিক প্রাধান্যের নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটাল এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাহ্যরেখা সৃষ্টি করল। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবী সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটাল। প্রকৃতি যে সসীম-এই মূল সত্যকে মানবতার প্রথম সর্বপ্রথম মানুষের মনে জাগানো হল। বর্তমানে বিজ্ঞানের অপব্যবহার পরিণামে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্নপন্ন করে তুলবে।

বহুদিন ধরেই এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পরিবেশ আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলী। বহুদিন ধরেই মানুষ পরিবেশকে অপব্যবহার করে চলেছে। প্রায় ৫৭০০ বছর আগে সুমেরীয় শহরগুলি পরিত্যক্ত হয়েছিল কেননা সেচসেবিত জমি যা পৃথিবীতে উদ্বৃত্ত কৃষি ফসল দেয়, সেই জমি লবণাক্ত ও জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। প্রায় ২৪০০ বছর আগে গ্রেটো বনাঞ্চলে অরণ্য ও ভূমিক্ষয় লক্ষ্যিত হয়েছিলেন, সেই সময়ে আটিকার পাহাড় অঞ্চলে যথেচ্ছভাবে গাছ কেটে রাস্তার কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এতদ্বারা জানালেন যে প্রথম শতাব্দীর রোম, কার্থেজনেলা এবং সিসিলিতে খারাপ কৃষিব্যবস্থার ফলে ফসলের ক্ষতি ও জমি ক্ষয় হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মেসোপটেমিয়ার জটিল সভ্যতা সঞ্চনী ব্যবস্থাপনার জন্য সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল যা ৪০০ বছর ধরে গড়ে উঠেছিল। নবম শতাব্দীতে নেওতিন সভ্যতা জল-বিস্ফোরণের চাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে গড়ে উঠা জাহাজ শিল্প বয়রেনটাইন, ভ্যাটিক্যান ও জেনিওয়ানে ধ্বংস হয়েছিল। ১৬৬১ সালে ইংলণ্ডে কয়লা পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ হয়েছিল। ডায়েরিস্ট ও ন্যাচরালিস্ট জন এভিলিন "স্মোকি স্ট এণ্ড ডিসমাল ক্লাউডের" বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন এবং লণ্ডনে "The suburds of Hall, than an assembly of Rational creatures" মন্তব্য মানুষকে সমবেত করেছিলেন।

এই সমস্ত প্রারম্ভিক সতর্কতা সত্ত্বেও আসল উৎকণ্ঠা খুবই কম দেখা গেল। শিল্প বিপ্লবের পরেই কিছুটা সচিৎ লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সাড়া পাওয়া যায় : ব্রিটেনে রক্ষণশীল গড়ে উঠে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষজন দুই ধারায় সম্পদ সংরক্ষণে ও বনাতা রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। প্রথমদিকে সচেতনতা ছিল নিতান্তই নগণ্য কিন্তু বিজ্ঞানের বিকাশে প্রকৃতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তবের মুখোমুখি হতে হয়, মানুষ ক্রমে ক্রমে গতিশীল হয় এবং নিজস্ব পরিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকে, আন্দোলন বাড়তে থাকে এবং সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রকৃত পরিবেশ আন্দোলন ১৯৪৫ সালের পরে সংগঠিত হয়েছে বিশেষ করে ষাটের দশকে।

পৃথিবীতে প্রথম পরিবেশ আগ্রহী সচেতন গ্রুপ (the commons Foolpaths and open Preservation Society) ১৮৬৫ সালে ব্রিটেনে তৈরি হয়েছিল। আজকের পৃথিবীতে এই ধরনের গ্রুপের সংখ্যা ২০০০০ এর বেশি যার এক-তৃতীয়াংশ ১৯৭২ সালের পরে গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীতে প্রথম ১৮৬৩ সালে ব্রিটেনে প্রথম বায়ুদূষণ সংক্রান্ত আইন পাস হয়েছিল এবং প্রথম বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এজেন্সি গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ১২টি জাতীয় পরিবেশ সংস্থা গঠিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি দেশেই অন্তত একটি করে অনুরূপ সংস্থা গড়ে উঠেছে। ১৮৮৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তি রচিত হয়েছিল এবং আজকের নিরিখে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫০টি চুক্তিপত্রে, এর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৬০ সালের পরে। ১৯৭২ সালে জাতি সঙ্ঘের আহ্বানে স্টকহোমেতে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের প্রতিনিধিরা মানুষ পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। তারা পুনরায় ১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনিরোতে "বসুন্ধরা" সম্মেলনে মিলিত হয়ে এ-বিংশ-শতাব্দীতে নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

স্টকহোম সম্মেলনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ সংক্রান্ত এক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন যাতে বলা হয় যে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ইউরোপীয় কমিউনিটি এবং তৎসংগঠনগুলি যথা ইকনমিক কর্পোরেশন এবং ডেভলপমেন্ট ইত্যাদি সংস্থা পরিবেশ সংক্রান্তনীতি নির্ধারণ করেন।

চিরাচরিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পুরাতন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন নতুন গ্রীন পার্টি আবির্ভূত হয়। ১৯৭২ সালে নিউজিল্যান্ডে এই ধরনের পার্টি গড়ে উঠে এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে ২০টি দেশে এই সমস্ত গ্রীন পার্টি কার্যকর্ম শুরু করে দেয়। দশটি দেশের জাতীয় আইন সভায় গ্রীন পার্টির প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এর ফলে অনেক পুরানো পার্টির মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তারা গ্রীন ভোট পাবার আশায় তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিসমূহ নতুনভাবে নির্ণয় করেন।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপগুলি সবই কার্যকরী ছিল না, কিছু কিছু জাতীয় গভর্নমেন্ট এজেন্সিগুলির ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট ও যুক্তিযুক্ত, পরিবেশ সংক্রান্ত অনেক আইনকে কলা দেখানো হয়েছিল আর কিছু কিছু সরকারি নীতি ছিল মোটের উপর অলঙ্কারিক। গ্রীন পার্টিগুলি তাদের কার্যকর্মগুলি জনগণের ঘটনায় পর্যবসিত করেছিল। এইগুলি ছাড়া বিশ্বব্যাপী কোন নিরবিচ্ছিন্ন পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১.৭ কোটি মানুষ নিজেদেরকে পরিবেশ কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ মানুষ পরিবেশ আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন। ব্রিটেনের ৪৫ লক্ষ মানুষ কোন না কোন পরিবেশ গ্রুপের সদস্য এবং ব্রিটিশ ইতিহাসে পরিবেশ আন্দোলনে এই সংখ্যা সর্ববৃহৎ।

এই পটভূমির পশ্চাতে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই অল্প পরিসরে পরিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্ব লেখা হয়েছে। অনেক কিছুই পুনঃ পুনঃভাবে বলা হয়েছে। মৌলিকভাবে সমস্ত বিষয়গুলি বারে বারে এসেছে কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত তত্ত্বাবহতা সম্পর্কে তেমন কিছু সচেতন প্রয়াস চোখে পড়েনি। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে পরিবেশ নিয়ে খুবই ব্যাপক পরীক্ষা-নিরিক্ষা হয়েছে কিন্তু পরিবেশ নিয়ে তেমন কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবেশকে পৃথক পৃথকভাবে দেখা হয়েছে ও বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা হয়েছে।

পৃথিবীতে পরিবেশ আন্দোলনকে সংরক্ষণ বিষয়ক সংস্কারবাদী আন্দোলন হিসাবে আমেরিকা মনে করে এবং তাতে তাদের ভূমিকা যথেষ্ট। সংরক্ষণবাদীদের ধারণা যে তারা তাদের মত অন্যদেশে স্থানান্তর করেছে। আমেরিকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা জার্মানির বনব্যবস্থা থেকে নেওয়া হয়েছে। ইউরোপেও এই একই ব্যবস্থা দেখা যায়, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে আমেরিকার আগেই এই ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল। ১৬৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রান্নার কাঠের জন্য ব্যাপক ও বেপরোয়া গাছ কাটা হতো, খাদ্যের জন্য শেষ হিন হত্যা, শীল মাছের চামড়া সংগ্রহ ও হাতির

বাঁতের আইভরি সংগ্রহ, হেড্রা হত্যা নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হয়। ১৮৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় বন-আইন প্রবর্তিত হয়।

জাতীয় পার্ক বা উদ্যান গঠনের ধারণা আমেরিকা থেকে এসেছে এবং এটা আমেরিকার আবিষ্কার। সত্যই, ইয়োলোস্টোনে পৃথিবীর প্রথম জাতীয় পার্কের মডেল দেখতে পাওয়া যায়। জর্জ-ক্যাটলিন ১৮৩০ সালে এই পার্কের মডেল রচনা করেন। কবি ওয়ার্ডওয়ার্থ ১৮২০ সালে লেখেন ও আশা প্রকাশ করেন যে ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্টকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করা এবং এতে সকল মানুষের অধিকার ও আগ্রহ থাকবে। দেখার চোখ ও হৃদয় দিয়ে এর সৌন্দর্য্য উপভোগ করা নিতান্তই এক ঐক্যিক বিষয়।

অনেক পরিবেশ বিষয়ক জিনিস আছে এবং সমস্যা আছে যা নতুন কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা বলে বিবেচিত হয় কেননা অনেক বিষয় পূর্বেই ঘটেছে যা সেই সময়ে অজানা ছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে যে ১৯৮০ সাল থেকে এসিড দূষণের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এই দূষণকে সন্দেহ করা হতো। ১৯৮০ সালের জন বিস্ফোরণ সংক্রান্ত বিতর্ক ১৭৬৮-১৮৩৪ সালের টমাস ম্যালথাসের তত্ত্বকে অতিক্রম করে। মনুষ্য সংখ্যা এক্সপোনেনসিয়াল ক্রমে বৃদ্ধি ঘটে যার ফলে উৎপাদন এরিথমেটিক্যাল ক্রমে বৃদ্ধি হয় এর তুলনা চলে আসছে। শিল্পগতভাবে জীবনযাপনের ধারণা অসহনীয় হয়ে পড়ছে ১৯৭২ সালে "A blue print for surival" তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এই ধারণা। ১৮৯৯ সালের প্রথমার্ধে ভূগোলবিদ পিটার ক্রোপোটকিন এই ধারণাই দিয়েছিলেন।

পরিবেশতত্ত্বের সংজ্ঞা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয় কেননা পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা থেকে গেছে। এইভাবেই কি জীবন প্রবাহ থাকবে? মানুষের মনের অবস্থা, সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অথবা রাজনৈতিক দর্শন? হয়ত এটাই সব বা তাদের মধ্যে কিছু। কেনই বা 'বাস্তু সংস্থান' আন্দোলন বা 'সংরক্ষণ' আন্দোলনকে ও পরিবেশ আন্দোলন বলা হবে না? কি করে রক্ষণকে সংরক্ষণ থেকে আলাদাভাবে দেখা হবে? কেমন করে 'সহনীয় উন্নয়ন' সংরক্ষণ থেকে আলাদা হবে? সহনীয় উন্নয়নই বা কি?

লিবারালাই জিম, ডিনোক্রেসি এবং ফ্যাসিইজিম আন্তর্জাতিক গ্রহণীয় সত্তাকে অস্বীকার করছে : এমনকি পরিবেশতত্ত্বকেও একথা বলা যেতেও পাঠকরা সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে তাহলে পরিবেশকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হলে কোন পরিমাপক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। রোজার স্কুটন পরিবেশতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন। পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা রাজনৈতিক অনুসরণে উদ্ভিত হয়। একই সঙ্গে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সংরক্ষণের সংকীর্ণ ধারণায় পরিবেশকে গুটিয়ে না ফেলা।

পরিবেশকে গ্লোবাল, সোস্যাল, ইকনমিক্যাল এও পলিটিক্যাল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে দেখতে হবে। পৃথক জাতীয় আন্দোলনের ব্যবহারিকতা হিসাবে না দেখে উদার ও দীর্ঘ মেয়াদি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশকে দেখা উচিত। পরিবেশ সংক্রান্ত বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা মনে না করা হয় যেন ইউরোপে পরিবেশ সমস্যা তত তীব্র নয়। ❑

জাতীয় সম্প্রীতি পুরস্কারের মনোনয়নপত্র আহ্বান

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জাতীয় ফাউণ্ডেশন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কার ১৯৯৮-এর জন্য মনোনয়নপত্র আহ্বান করেছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন, ১৯৯৮। ব্যক্তি বিশেষ এবং সংগঠন-এই দুই বিভাগে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারস্বরূপ ব্যক্তি বিশেষকে মানপত্র ও নগদ একলক্ষ টাকা এবং সংগঠনকে মানপত্র ও নগদ দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে টানা পাঁচ বছর এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে দশ বছর যাবৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও জাতীয় সংহতি বিকাশের উদ্দেশ্যে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

❑

কয়লা উৎপাদন ৪.৯ শতাংশে বৃদ্ধি

কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও সিঙ্গারেনি কয়লাখনিতে কয়লা উৎপাদন ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে তার আগের বছরের ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টনের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯০ হাজার টন হয়েছে। গত ১৯৯৭ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বরে এই দুই সংস্থার যৌথ উৎপাদনের পরিমাণ তার আগের বছরের তুলনায় ৪.৯ শতাংশ বেশি হয়ে ১৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ২০ হাজার টন হয়েছে।

১৯৯৭ সালের নভেম্বরে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ০.০৭ শতাংশ বেশি কয়লা পাঠানো হয়েছে। ইস্পাত কারখানায় কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এই সময়ে দৈনিক ২১৩৬৩ টন কয়লা সরবরাহ করেছে। তার আগের বছরের এই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ২৪২৫৩ টন।

পি আই বি

একদল লোক ভোগ্যোপযোগী বস্তু তৈরির করতে লাগল, হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেইসব ভোগ্যপণ্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেইসব দ্রব্য বিনিময় করতে লাগল। আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ জায়গার জিনিসটা ও জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখল। একজন চাষ করল, একজন পাহারা দিল, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনল। যে চাষ করল সে পেল ঘোড়ার ডিম। যে পাহারা দিল, সে মুলুক করে কতকটা আগভাগ নিল, অধিকাংশ নিল ব্যবসাদার-যে কিনল সে দাম দিতে মরলো। পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল ব্যবসাদার। এ দু'জন ভাজ করলো না ঝাঁকি দিয়ে মুড়ো মরতে লাগল। যে জিনিস তৈরি করতে লাগল, পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগল।

ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন .....

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। কেউ পুরুষ, কেউ নারী, কেউ শিশু, কেউ যুবক/যুবতী আর কেউবা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা। ঐহিকে আমরা ভিন্ন হলেও একটি ক্ষেত্রে আমরা সবাই একাত্মী। আমরা সবাই ভোক্তা এবং ক্রেতা। আমাদের বয়স, পেশা, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি আমাদের আর্থিক অবস্থার উপর আমাদের প্রয়োজনের এবং ক্রয়ক্ষমতার তারতম্য অবশ্যই আছে কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা যে সবাই ভোক্তা এবং ক্রেতা এ কথা অনস্বীকার্য। দরিদ্রতমের মধ্যে দরিদ্রতম ব্যক্তিটিকেও কিছু না কিছু কিনতেই হয়, আমীরদের আমীর ক্রুসাই-এর সুলতানকেও কিনতে হয়। ক্রয়ক্ষমতার হেরফেরে কেউ নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসটি কেনার আগেও হয়ত শতবার ভাবেন আর কেউ বা অবলীলাক্রমে একটা আস্ত প্লেট বিমান কিনে তার প্রণয়ী-কাম-স্ত্রীকে উপহার দেন (রিচার্ড বার্টন — এলিজাবেথ টেলর) — এটুকুই যা তফাৎ। মোট কথা হল, আমরা সবাই ক্রেতা আমাদের এই ভোক্তার রাজত্বে। অসাধারণ ক্রেতাদের কথা বাদ দিই। আমাদের মত সাধারণ ক্রেতাদের অবস্থাটা কেমন? "সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন অনেকটা ক্লান্তিকর, কিছুটা শক্তি তোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সাংসারিক নানাবিধ দায়-দায়িত্ব পালন, অর্থউপার্জন প্রভৃতি তো আছেই, আর আছে প্রতি পদে পদে ঠকবার ভয়।.... ভোগ্যপণ্য সংগ্রহের জন্য বাজারে এলে শেষ হাসিটুকু মিলিয়ে যায়। অথচ ভোগ্যপণ্য সংগ্রহ একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার আর এইখানেই যত ক্লান্তি যত অবসাদ। ঠকতে ঠকতে ক্লান্তি আর নিঃস্বতার অবসাদ" (সম্পাদকীয় — ভাঙার : মার্চ, /১৯৯৮)।

সকলেই ভুক্তভোগী, সকলেই জানেন যে কিছু কেনা মানেই ঠকা। শুধু দাম বেশি, ওজনে কম বা পুরানো জিনিস এইটুকুতেই শেষ নয় - বেহালার ভেজাল (বিষাক্ত) তেল-কেলেঙ্কারির কথাও নিশ্চিত সকলেরই এখনও মনে আছে। তাহলে উপায়? আমাদের বাঁচার উপায় বলতে গেলে একটাই। রচডেল পাইওনিয়ার্স প্রদর্শিত পথে ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠন করে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা: নিজেদের স্বার্থরক্ষায়, নিজেদের উদ্যোগে। নিজেদের দোকান-সমবায় ভাণ্ডার গড়ে তোলা। গ্রামাঞ্চলে আলাদাভাবে 'ক্রেতা সমবায় সমিতি' গঠনেরও প্রয়োজন নেই। গ্রামের সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিই এই কাজ করতে পারে। 'করতে পারে' বলাটা বোধ হয় ভুল হল-'করা উচিত' বলাই বোধ হয় বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ সহজেই দু-চারটে দোকান ঘুরে দর-দাম যাচাই করে কেনাকাটা করার যে সুযোগটা আছে, গ্রামাঞ্চলে তাও নেই। হরিদ্বার (হরি শব্দের অন্য অর্থ চুরি) দোকানই যেখানে একমাত্র ভরসা সেখানে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে ঐসব নানারকম উৎপীড়ন থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে, এলাকার টাকা এলাকাতেই থাকে, স্থানীয় এক-আধজনের রোজগারও বাড়ে।

ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ১৮৪৪ সালে রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি লিমিটেড-এর নাধ্যমে। শুধু ক্রেতা সমবায় নয় — রচডেল পাইওনিয়ার্স সমগ্র সমবায়ের আন্দোলনেরই পথিকৃৎ। ভারতবর্ষে ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত পরের শতকে মাদ্রাজে ট্রিপ্লিকেন আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে কেন কিছু ক্রেতা সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পণ্যের কন্ট্রোলের ফলে ক্রেতা সমবায়ের ভূমিকা ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে কিন্তু যুদ্ধ শেষে কন্ট্রোল ব্যবস্থা উঠে গেলে ক্রেতা সমবায় আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ১৯৬১ সালে জাতীয় স্তরে ক্রেতা সমবায় সংক্রান্ত নাটেশান কমিটি বড় ও ছোট শহরে ক্রেতা সমবায় সমিতি গঠনের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার সুপারিশ করেন। কমিটি নতুন সমিতি গঠনের সময় আয়তন ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকার কথা বলেন। গ্রামাঞ্চলে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নাধ্যমে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের সুপারিশ করা হয়। এই কমিটির সুপারিশ এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে ক্রেতা সমবায় আন্দোলনে আবার জোয়ার আসে।

চাল, ডাল, গম, চিনি, নুন, তেল, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে ক্রেতা সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়। সরব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে পণ্যদ্রব্যগুলির সজ্জা ও চাহিদা পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রেতা সমবায় সমিতির পণ্য তালিকায় যোগ হয়েছে প্রসাধন সামগ্রী, এমনকি শুল্ক বিভাগের বাজেয়াপ্ত করা নানারকম জিনিসপত্র। কাজটা শুরু হয়েছিল ভালই কিন্তু উদ্যমের সেই স্তরকে ধরে রাখা গেল না। আন্দোলনটা দানা বাঁধল না। ভাল কাজ করছে এমন কিছু সমিতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঠিকই কিন্তু সংখ্যায় তারা এতই নগণ্য যে তাদের 'ব্যতিক্রম' হিসাবে চিহ্নিত করাই ভাল। ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক পরিস্থিতি বোঝার সুবিধার জন্য কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

ভারতের ক্রেতা সমবায় আন্দোলন

ভারতের জাতীয় ক্রেতা
সমবায় মহাসংঘ (১)
▼
রাজ্যস্তরীয় ক্রেতা
সমবায় সংঘ (২৯)
▼
কেন্দ্রীয়/জেলাস্তরীয় পাইকারি
ক্রেতা সমবায় সমিতি (৬৬৬)
প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি
প্যাক্স (PACS) ও ল্যাম্পস (LAMPS)
(২৫৭৫০)
▼
সদস্য সংখ্যা ৯.১৮৮ মিলিয়ন
(ভারতের জনসংখ্যা ৯০৪.০ মিলিয়ন)

ন্যায্যমূল্যের দোকান

(ফেয়ার প্রাইস শপস)

১। সমবায় :		
(ক) শহরাঞ্চল	২০১১৯	(২২%)
(খ) গ্রামাঞ্চল	৭২৭৮২	(৭৮%)
	মোট	৯২,৯০১
২। অন্যান্য		৩,৩৮,৫৯৭

লাভে চলা সমিতি

১। প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি	৪৫.৯%
২। কেন্দ্র/জেলাস্তরীয় পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি	৪৫.৯%
৩। রাজ্যস্তরীয় ক্রেতা সমবায় সংঘ	৫৬%

অংশগত (শেয়ার) মূলধন এবং সরকারি অংশগ্রহণ (গভর্ণমেন্ট পার্টিসিপেশন)

	মোট অংশগত মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সরকারি অংশগ্রহণ
১। প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি	৪৫৮.২	১৭.৫%
২। কেন্দ্র/জেলাস্তরীয় পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি	২৬১৪.৮২	১৪.৩%
৩। রাজ্যস্তরীয় ক্রেতা সমবায় সংঘ	৭১১.৮১	৭৪.৭%

(দ্রঃ দ্রঃ জেলা ও প্রাথমিক স্তরের সমবায় সমিতিগুলিকে সহায়তা করার জন্য গঠিত হলেও রাজ্যস্তরীয় ক্রেতা সমবায় সংঘগুলির প্রদেয়ত মূলধনের পরিমাণ খুবই কম-প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলির চেয়ে সামান্য কিছু বেশি এবং তারও সিংহভাগ সরকারি সমর্থন পুষ্ট)

কার্যকরী মূলধন, ব্যবসার পরিমাণ, নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অংশ এবং কার্যকরী মূলধন-ব্যবসার অনুপাত

মূল্য মিলিয়ন টাকায়

		১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৪-৯৫
(ক) প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি				
১। কার্যকরী মূলধন	২০৭৩	২২৪০		
২। মোট বিক্রয়	১৮৪৯.৫	১০৩১২.৯		
যার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অংশ	৪৬%	৪৫%		
৩। কার্যকরী মূলধন-ব্যবসার অনুপাত (১:)	৪.৭৫	৪.৪৮		
(খ) পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি				
১। কার্যকরী মূলধন	১৮৩১	১৭৬৮	১৬৬২	২৬১৮
২। মোট বিক্রয়	১২২৭৯	১২৩২০	১২৪৭৪	১৬৬১৩
যার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অংশ	৪০%	৩৫%	৩৫%	৪৮%
৩। কার্যকরী মূলধন-ব্যবসার অনুপাত (১:)	৬.৭০	৬.৯৬	৭.৫০	৬.৩৪
(গ) রাজ্যস্তরীয় ক্রেতা সমবায় সংঘ				
১। কার্যকরী মূলধন				১১৪২.৭১
২। মোট বিক্রয়				৮৭৩৭.৪৯
যার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অংশ				৩১.৩%
৩। কার্যকরী মূলধন-ব্যবসার অনুপাত				১:৭.৬৪

পরিসংখ্যানের সূত্র ঃ Indian Co-operative Movement : A Profile by National Resource Centre of NCUI.

ক্রেতা সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ শক্তিশালী ক্রেতা সমবায় আন্দোলন দ্রব্যমূল্যের স্তরকে কম-বেশি স্থিতিশীল রাখতে পারে। ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের সম্ভাবনা প্রচুর। কারণ একমাত্র ক্রেতা সমবায় সমিতিই অসৎ, মুনাফাখোর, ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে পারে। ক্রেতা সমবায়ই হল সমবায় আন্দোলনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র (সেক্টর), কারণ আমরা সকলেই ক্রেতা। স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন জাগে তা হল এতদ্‌সত্ত্বেও ক্রেতা সমবায় আন্দোলন সফল হচ্ছে না কেন?

ক্রেতা সমবায়ের অসাফল্যের জন্য অধিকাংশ সময়েই অসাধু ব্যবসায়ীদের দিকে আঙুল তোলা হয় এবং ঐ অসাধু ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের নানা অপকর্মের কথা বলা হয়। অভিযোগ করা হয় যে তারা নিম্নমানের এমন কি ভেজাল পণ্য সামগ্রী বিক্রি করেন, ওজনে ফাঁকি দেন, হিসাবে কারচুপি করেন, কর ফাঁকি দেন বলে তাদের পক্ষে সমবায় ভাণ্ডার অপেক্ষা কম দামে পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হয়। বলা হয় যে এইসব ব্যবসায়ীরা সমবায় ভাণ্ডারকে ক্ষয় করতে অনেক সময় কেনা দাম অপেক্ষা কমেও পণ্য বিক্রি করে থাকেন এবং পরে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এবং ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে ঐ লোকসান পুষিয়ে নেন-যা সমবায়ের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। বক্তব্যের তালিকায় আরও আছে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের কালোবাজারী, ক্রেতাকে প্রলোভিত করতে ঢালাও উপঢৌকন প্রদান, বাকি বিক্রি ইত্যাদি। অভিযোগ সবই সত্যি কিন্তু আমাদের আন্দোলনটাই যেহেতু ঐসব অসৎ ব্যবসায়ীদের অপকর্মের বিরুদ্ধে সেহেতু সমবায়ের বিফলতার কারণ হিসাবে ঐসব যুক্তি খাড়া করা যুক্তিযুক্ত হবে কি? প্রতিপক্ষের কাছে আমরা কি কখনও ভিন্ন মুখ আচরণ আশা করতে পারি? না, তা আশা করা যায় না। তাই ঐসব কারণগুলিকে ক্রেতা সমবায়ের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করাও ঠিক নয়। আমরা বড়জোর বলতে পারি ঐসব অসাধু ব্যবসায়ী এবং এদের নানাবিধ অপকর্ম রোধ করা বাস্তবিকই এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। যথাযথভাবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে আরও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সমবায় আন্দোলনকে আরও জোরদার করে গড়ে তুলতে হবে।

ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের অকৃতকার্যতার

কারণ একটি নয় অনেক। মূল কারণগুলি হল :

১। সমিতির প্রতি সদস্যদের সহানুভূতির অভাব :

আমরা অধিকাংশ সময়ে সমিতির সদস্য হয়ে থাকি (ক) সস্তায় কেনাকাটা করতে, এবং (খ) বাজারে অমিল বা মূল্যবৃদ্ধি জিনিসটি সংগ্রহ করতে। এই অভিজ্ঞতা আজকের নয়-বহুদিনের। যখনই 'কন্ট্রোল'-এর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তখনই ক্রেতা সমবায় আন্দোলনে জোয়ার এসেছে এবং 'কন্ট্রোল' উঠে গেলেই আবার হতশ্রী অবস্থা ফিরে এসেছে। তবু 'কন্ট্রোল' নয়, বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হলে বা হঠাৎ কোনও পণ্যের দাম বেড়ে গেলে পুরানো (সঠিক) দামে ঐ পণ্যটি সংগ্রহ করতে আমরা সমবায় ভাণ্ডারে ছুটতে দেরি করি না। বাজারে স্থিতাবস্থা ফিরে এলে সমবায়কে টা-টা, বাই-বাই করতেও আমরা দেরি বা দ্বিধা করি না। এটা কি আমাদের সমবায়ী মনোভাবের পরিচায়ক?

২। অভিজ্ঞতার অভাব এবং দুর্বল পরিচালন ব্যবস্থা :

সঞ্চয়ের তাত্ত্বিক এবং ব্যবসায়িক-উভয় দিকই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির প্রতি সদস্যদের আনুগত্য 'প্রার্থনা' করে চিরকাল চলতে পারে না-টিকে থাকার জন্য সদস্যদের আনুগত্য "অর্জন" করাও দেখা দরকার। দুঃখের বিষয় ক্রেতা সমবায়ে নানা দুর্বলতা ও গলদের জন্য ক্রেতা/সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয় না ; ফলে ক্রেতা/সদস্যদের আনুগত্য লাভও অধরা থেকে যায়। ক্রেতা/সদস্য তাঁর প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সমবায় ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করতে পারলেও, প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর অধিকাংশই তাঁকে বাজার থেকেই কিনতে হয়। যে টুকু পণ্য সমবায় ভাণ্ডারে পাওয়া গেল তার দাম যে বাজার দামের চেয়ে কম, পণ্যটি যে পুরানো মাল (ওল্ড স্টক) নয় - এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। পণ্যের প্রদর্শন ব্যবস্থা (ডিসপ্লে) একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া সত্ত্বেও ক্রেতা সমবায়ে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বলা যায়। আর সেলসম্যানশিপ? সেলসম্যানশিপের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। বিক্রয়ে অনীহা বললে কম বলা হয় ; ক্রেতাকে দেখে অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হওয়ার অভিযোগ অনেকের কাছেই শুনতে পাওয়া যায়।

ক্রেতা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত দুর্বলতা/ত্রুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :-

(ক) সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সর্বস্তরে প্রয়োজন ক্রেতার সংখ্যা, ক্রেতাদের চাহিদা, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ (সার্ভে) করা. কিন্তু অধিকাংশ সমিতিতে কাজটি আদৌ করা হয় না বা দায়সারাভাবে করা হয়।

(খ) কোন্ কোন্ পণ্য বিক্রয়ের জন্য মজুত করা হবে, পণ্যগুলি কোথা থেকে এবং কিভাবে কেনা হবে এবং সর্বোপরি মজুত পণ্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ কি হবে (এক কথা স্টক পলিসি) এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে কোথাও ক্রেতার অভাবে পণ্যগুলি পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। আর কোথাও বা ক্রেতা তাঁর প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনতে এসে ফিরে যান।

(গ) পণ্যের কাটতি এবং মজুতের পরিমাণ যথাযথভাবে পরীক্ষা করে পণ্যটি পুনর্বার কেনার (রি-অর্ডারিং) বিষয়ে পাকা পদ্ধতি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয় না। মূলধন কম হওয়ার ক্রেতা সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্য মজুত নীতি (স্টক পলিসি) এবং পুনর্বার কেনার পদ্ধতি (রি-অর্ডারিং সিস্টেম) সঠিকভাবে নির্ধারণও প্রয়োগ করা হলে মূলধন কম হলেও তাকে বারবার ব্যবহার করে (রোটেশান অফ ক্যাপিটাল) অনেক বেশি টাকার ব্যবসা করা যায়। এ বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে অধিকাংশ সমবায় সমিতির ব্যবসার পরিমাণ কম হয় ; কারণ মূলধন আটকে (ব্লক) থাকে। এতে মূলধনের খরচ বৃদ্ধি পায় এবং আয় কম হয়।

(ঘ) পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ আরও একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পণ্যের ক্রয়মূল্য, বিক্রয়ের সময়-কাল, পচনশীলতা/গুদামজাত থাকাকালীন সময়ে ক্ষয়ক্ষতি, প্রত্যাশিত লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিচার বিবেচনা করে প্রতিটি পণ্যের বিক্রয়মূল্য স্থির করা উচিত কিন্তু ক্রেতা সমবায়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। সাধারণভাবে দেখা যায় সমিতিগুলি পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর সমহারে (ফ্ল্যাট রেট) ৫ বা ১০% অতিরিক্ত ধরে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন। বলাবাহুল্য, এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক।

(ঙ) বিক্রির জন্য সংগৃহীত পণ্য সঠিকভাবে নথিভুক্ত ও গুদামজাত করা : এগুলির ক্ষয়-ক্ষতি ও চুরি রোধ করার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ; খালি ব্যাগ, পেটি, কৌটা বা শিশি (বিশেষ করে যেগুলি ফেরতযোগ্য) ঠিকমত সরবরাহকারীদের ফেরত দেওয়া ; বিক্রিত পণ্যের অর্থ ঠিকমত ভোলাগারে জমা পড়ছে সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা - এমনতর বহু কাজ আছে যেগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও লাভ-ক্ষতির নিরিখে অপরিহার্য।

৩। ক্রেতা সমবায় সমিতির অসাফল্যের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ অসাধু পরিচালন ব্যবস্থা :

(ক) আয়ের উপর লক্ষ্য না রেখে ব্যয় করা, (খ) স্বজন পোষণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ, (গ) কমিশনের লোভে এবং অশুভ আঁতাতের বশবর্তী হয়ে অপ্রয়োজনীয় এবং নিম্নমানের পণ্য ক্রয় সহ অন্যান্য নানাবিধ দুর্নীতি শুনতে খারাপ লাগলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য।

অকৃতকার্যতার উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে, যেমন : (১) পর্যাপ্ত নিজস্ব তহবিলের অভাব, (২) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর অনিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা এবং এই ব্যাপারে অস্পষ্ট নীতি, (৩) নিজস্ব উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার অভাব, (৪) পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ বৃদ্ধি, (৫) কর জনিত বাধা, (৬)ক্রয় ও বিক্রয়মূল্যের স্বল্প পার্থক্য, এবং (৭) ধারে পণ্য বিক্রয় করতে না পারা।

ক্রেতা সমবায়ের নানা সমস্যা সত্ত্বেও এর কার্যকারিতা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। সুতরাং, সাধারণ মানুষের স্বার্থেই ক্রেতা সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা দরকার। এজন্য সর্বাগ্রে দরকার আরও দৃঢ় সঙ্কল্প, সততা ও নিষ্ঠা ; দরকার পেশাদারী পরিচালন ব্যবস্থা। সদস্যগণ তথা সাধারণ মানুষ যাতে ক্রেতা সমবায় সমিতি থেকেই পণ্য সামগ্রী কেনা-কাটা করেন এবং সমিতিকে নিজের সংস্থা হিসাবে ভাবেন তার জন্য আরও গভীর, ব্যাপক এবং ধারাবাহিক প্রচার দরকার। সমবায়ের তাৎপর্য-সমবায় সমিতি যে শুধুই একটি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, এর যে একটি তাত্ত্বিক দিকও আছে সে কথা মানুষকে জোরদার দিতে দরকার। একইসঙ্গে মানুষ যাতে তাদের অধিকাংশ পণ্য সামগ্রী ন্যায্যমূল্যে এবং সঠিক ওজন ও গুণমানে

নিয়মিত পান তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিক্রয়ের জন্য নির্বাচিত পণ্যগুলি সরাসরি উৎপাদন কেন্দ্র /সংস্থা থেকে কেনা প্রয়োজন। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন /প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে ন্যায্যমূল্য ও গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। প্রি-প্যাকিং ব্যবস্থার প্রচলন দরকার। এর ফলে বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়েরই সময় বাঁচে, ওজন ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং ওজন করার সময়ে ক্ষয়-ক্ষতি কিছুটা কমে। 'ডিসপ্লে' বা প্রদর্শনী ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির মত জাঁকজমক বা আড়ম্বর অভিপ্রেত নয় কিন্তু প্রদর্শনী ব্যবস্থায় কিছুটা মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, ডিসপ্লে ব্যবস্থা যে বিক্রয় বাড়াতে সহায়তা করে একথা অনস্বীকার্য।

ক্রেতা সমবায়কে সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানা পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বছরের শেষে বা শারদ উৎসবের সময় রিবেট ব্যবস্থা চালু করা, বিক্রয়-রসিদের উপর লটারি ব্যবস্থা চালু করে কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বাধিক ক্রয়ের জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার কথা ভাবা যেতে পারে।

শুধু ক্রেতা সমবায় নয় - যে কোন সমবায় সমিতির সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে সদস্যদের উপর, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর। সমিতির এলাকার মধ্যে বসবাসকারী এবং উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ব্যক্তিকে সমিতির সদস্য করা দরকার। বিশেষ করে মহিলাদের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা প্রয়োজন কারণ বর্তমানে সংসার চালানোর সকল দায়-দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। একই সঙ্গে সমিতির সকল সদস্য যাতে সমিতির সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, সাধারণ সভায় নিয়মিতভাবে যোগদান করেন সেজন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা দরকার। সাধারণ সদস্যদের জানা দরকার সমিতির সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে পরিচালকমণ্ডলীর সততা, কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা এবং দায়িত্ববোধের উপর। সুতরাং নির্বাচনের সময় কথাগুলি মনে রেখে উপযুক্ত ও যোগ্য প্রার্থীদেরই নির্বাচিত করা প্রয়োজন। অপরদিকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের উচিত তাঁদের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করা। তাঁদের উচিত সৎ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ে তোলা, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, সঠিকভাবে হিসাবপত্র রাখা ও সময়মত নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা। তাঁদের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়, শ্রম এবং অর্থের অপব্যবহার বন্ধ হয়; খরচ কমে এবং বিক্রি ও আয় বাড়ে।

এ এক কঠিন কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কঠিন বলে হার মানা কি আমাদের উচিত। প্রকৃতির সঙ্গে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে মানুষ খোলা আকাশ থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমে ক্রমে গুহা, গুহা থেকে কুটির, কুটির থেকে বন্য প্রাসাদে পৌঁছেও থামতে দেখেনি-ভিন্নগ্রহে পাড়ি দিচ্ছে; যে মানুষ নভল ভেতাব পর এবার মানুষ ক্লোনিং করার কথা ভাবছে, যে মানুষের এইটুকুতে হার মানা কি শোভা পাবে? না। আমাদের আরও ধৈর্য ধরে একতা, দৃঢ় সঙ্কল্প আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের, আমাদের অবশ্যই জয় হবেই।

ভেজাল

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।
ভেজাল তেল আর ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর ময়দা,
'কৌন ছোড়ে গা ভেজাল ভেইয়া, ভেজালসে হ্যয় ফয়দা।'
ভেজাল পোশাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।
ভেজাল কথা - বাংলাতে ইংরেজি ভেজাল চলছে,
ভেজাল দেওয়া সত্যি কথা লোকেরা আজ বলছে।
'খাঁটি জিনিস' এই কথাটা রেখো না আর চিত্তে,
'ভেজাল' নামটা খাঁটি কেবল আর সকলই মিথ্যে।

— সুকান্ত ভট্টাচার্য

কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের সদস্য বাড়ল

পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশনের সদস্য সংখ্যা এক থেকে বাড়িয়ে তিন করার জন্য বিধানসভায় ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিস (সংশোধনী) বিল ১৯৯৭ গৃহীত হয়েছে। বিধানসভায় বিলটি উত্থাপন করে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল বলেন, এই বিলের উদ্দেশ্য সার্ভিস কমিশনের কাজকে আরও সরলীকরণ এবং গণতান্ত্রিক করা।

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা ঃ ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ৩য়, মানে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা শতবার্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিন্যাসের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির ধারণাকে হিসাবে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713204
Phone : 0343 / 56-2393. 0343 / 56-4722

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি এলাকা, কৃষি প্রকরণ ও কর্মসংস্থান

ড. সুনির্মল মাইতি, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, শস্য বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গে জল, হাওয়া, মাটির উপর ভিত্তি করে রাজ্যকে ৬টি কৃষি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। (১) উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তরবঙ্গে সমতল এলাকা তরাই অঞ্চল, (৩) সমুদ্রোপকূলের লবণাক্ত মাটি, (৪) খরাপ্রবণ কাঁকুরে ও লালমাটি, (৫) গাঙ্গেয় পলিমাটি, (৬) বিল্ধ পলিমাটি এলাকা।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকা :

দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অংশ এই এলাকার মধ্যে পড়ে। এখানকার মাটি বেলে ও অম্লপ্রধান। মাটিতে আপেক্ষিক পক্ষ জৈবপদার্থের আধিক্য, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখা যায়। অম্ল বেশি হওয়ায় মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বেশি দেখা যায়। মলিবডিনাম ও কোনও কোনও জায়গায় বোরনের অভাব দেখা যায়।

যেকোন ফসলের ফলন কম হয়, কারণ এখানে মাটির গভীরতা কম, ঢালু প্রকৃতির, বেশি অম্ল, বেশি আর্দ্র, তাপমাত্রা কম, শীতকাল বেশি দিন স্থায়ী থাকে, সূর্যের আলো কম হয়। চাষবাসের উপাদান সব ঠিকঠিকমত পাওয়া যায় না ও বিপণনের অভাব রয়েছে। এখানকার বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২৮০০ থেকে ৩১০০ মিলিমিটারের মতো। ১৩৩৫ ফুট উঁচু পাহাড়েও বাপ কেটে জমি সমতল করে ধান চাষ সম্ভব। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি স্থানীয় ধানের চাষ বেশি হয়। এছাড়া ভুট্টা, সরষীন, শীতের আলুর চাষ বেশি হয়। তবে গতানুগতিক ফসল যেমন ধান ও ভুট্টার উৎপাদন বেশি না করে তার পরিবর্তে অর্থকরী ফসল যেমন এলাচ, ফুল, ফল, সব্জি, ঔষধ তৈরির ফসল ইত্যাদি চাষ করা ভাল।

উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকা :

উত্তরবঙ্গের এই এলাকা তরাই অঞ্চল বলে পরিচিত। তরাই অঞ্চলে রয়েছে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরের কিছু অংশ। এলাকার বৃষ্টিপাত ২০০০- ৩০০০ মিমি। এখানকার মাটি প্রধানত দিয়ে বেলে বা বেলে দোয়াঁশ মাটি। এখানকার মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় মাটির রং কালচে বা ধূসর হয়। অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাতের ফলে এখানকার মাটি থেকে চুন জাতীয় পদার্থ জলের সঙ্গে ওলে নিচে বেরিয়ে যায়, ফলে জমি বেশি অম্ল হয়। কম তাপমাত্রা ও জমিতে অম্লত্বের জন্য জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া ঠিক ঠিক হয় না। ফলে জৈব পদার্থ বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেনের অভাব দেখা যায়। গ্রহণযোগ্য ফসফরাস ও পটাশিয়ামের পরিমাণ মাঝারি থেকে নিচু এবং চা-বাগান জায়গায় অনুখাদ্যের ঘাটতি দেখা যায়। সেইসঙ্গে এখানে সেচের অভাব রয়েছে। ফসলের বিপণন ও পরিবহণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শীতের শেষে ফাল্গুন মাসে এখানে যে বৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক এলাকায় পাট ও আউশ ধানের চাষ হয়। খরিফ মরশুমে ধানই প্রধান ফসল। অধিক ফলনশীল ধানের চাষ কম হয়।

সমুদ্রোপকূলবর্তী লবণাক্ত এলাকা :

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন, হাওড়া জেলার দক্ষিণ অংশ, পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশে এই এলাকার মধ্যে পড়ে। এখানকার বেশির ভাগ মাটি ভারী প্রকৃতির, উর্বর কিন্তু নোনা, প্রবণীয় লবণের গড় পরিমাণ হল ৩.০ থেকে ১৮.০ মিলি মোঃ / সেমি। বছরের গড় বৃষ্টিপাত হল ১৬০০-১৮০০ মিমি। বেশি বৃষ্টি এবং জলনিকাশের অসুবিধার জন্য দীর্ঘদিন জমিতে জল জমে থাকে এবং ফসলের ক্ষতি হয়। জমা জলে দীর্ঘমেয়াদি বেশি ধানের চাষ হয়ে থাকে। অবশ্য যেখানে নালা কেটে জল নিকাশের ব্যবস্থা করে তোলা হয়েছে সেখানে মধ্যমেয়াদি অধিক ফলনশীল ধানের চাষ হতে দেখা যায়। বেশির ভাগ জায়গায় খরিফ মরশুমে একবার ধান চাষ হয়। তবে মরশুমে মিঠা জলের অভাবে ব্যাপক বোরো ধানের চাষ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় ফসল হিসাবে সূর্যমুখী, সরষে, চীনাবাদাম, লঙ্কা, তরমুজের চাষ ছোট এলাকায় করছে। সংরক্ষণ, যোগাযোগ, সেচ, বিপণনের অভাব রয়েছে। ফসল ছাড়া মাছ, হাঁস-মুরগি, ছাগল প্রভৃতি পালনে লাভ বেশি দেখা যায়।

খরাপ্রবণ কাঁকুরে ও লালমাটি এলাকা :

সমস্ত পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমদিক এই এলাকার অন্তর্গত। এখানকার বেশির ভাগ মাটি লাল ও কাঁকুরে। জমির উপরিভাগ উঁচু-নিচু, মাটির গভীরতা কম, জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ কম, সেচের যথেষ্ট অভাব, কোন কোন জায়গায় অণুখাদ্যের অভাব দেখা যায়। মাটির অম্লত্ব ৫-৬। বছরে গড় বৃষ্টিপাত ১১০০-২৪০০ মিমি। বর্ষাকালে কখনও কখনও ১০-১৫ দিনের খরা দেখা যায়। জমির জলধারণ ক্ষমতা কম। শতকরা ২০-৩০ ভাগ জমিতে উঁচু প্রকৃতির — একে ডাঙ্গা বা টাঁড় জমি বলা হয় এখানে চুনাপাথর খুব বেশি। এরপরে ২০-৩০ ভাগ জমি হল বাইদ। এতে জলধারণ ক্ষমতা সামান্য। ৩০-৪০ ভাগ জায়গা হল কাঁকরিয়া বা মাকরি প্রকৃতির। জলধারণ ক্ষমতা মাঝারি। সব থেকে নিচু অবস্থানের জমি হল দোন বা বহাল ১০-২০ ভাগ জমি হল এই ধরনের উঁচু জায়গা থেকে জল গড়িয়ে এসে এখানে জমা হয়। ১০ ভাগ জায়গায় খরিফ মরশুমে চাষ হয় এছাড়া ভুট্টা, জোয়ার, রাগি, অড়হর, চীনাবাদাম প্রভৃতি ফসল ধানের বদলে লাগান যেতে পারে।

পলিমাটি এলাকা :

ক) গাঙ্গেয় পলিমাটি এলাকা : এই এলাকার মধ্যে পড়ে উত্তরদিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা বাদে জেলার বাকি অংশ, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ দুর্লভপুর, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমুদ্রোপকূল বাদে, হুগলি ও হাওড়া জেলার বেশির ভাগ।

খ) বিল্ধ পলিমাটি এলাকা : এরমধ্যে রয়েছে বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা বাদে বাকি অংশ, মেদিনীপুর পূর্ব, বীরভূম, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার কিছু অংশ।

এইসব এলাকার মাটি গভীর, সমতল ও নিরপেক্ষ। উর্বরতা মাঝারি থেকে উত্তম। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত হল ১৩০০-১৭০০মিমি।

প্রায় সব রকমের ফসল এসব এলাকায় হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রধান প্রধান ফল ও সব্জির চাষ কোথায় হয় এবং সেইসব সব্জি ও ফল থেকে কোন কোন ধরনের খাদ্য তৈরী হতে পারে তা দেখানো হল :

শস্য	পাওয়ার সময়	প্রধান প্রধান উৎপাদনের স্থান	কয়েকটি উৎপন্ন দ্রব্য
আম	মে-জুলাই	মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি,রস, স্কোয়াস, বার
আনারস	এপ্রিল-নভেম্বর	শিলিগুড়ি এলাকা, ইসলামপুরের চোপরা এলাকা	স্কোয়াস, স্কিং, বার, রস, জ্যাম, জেলি, টুটি ফ্রুটি
কলা	সারা বছর ধরে	হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ	ফ্লেক, ফিংগার, শুকনো গুঁড়ো, চিপস
পেঁপে	সারা বছর ধরে	হুগলি, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ	প্যাপিস, টুটি ফ্রুটি, জ্যাম
ম্যান্ডারিন কমলা	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	দার্জিলিং	স্কোয়াস, জ্যাম, মারমালেট, রস, ক্যান্ডি, পিল তেল
পেয়ারা	জুলাই-সেপ্টেম্বর	দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ	জেলি, স্কোয়াস, ফ্লেক, চিজ
কাঁঠাল	জুলাই-আগস্ট	জলপাইগুড়ি, কোচবিহার	স্লিক, ফ্লেক, মধু, পেকটিন
লিচু	মে	মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ক্যান, স্কোয়াস, শুকনো (নাট)
বেল, কয়েত বেল	এপ্রিল-জুন	ছোটমাটি সারা রাজ্যে	গুঁড়ো, সংরক্ষিত খাদ্য, পানীয়
তাল	জুন	পূর্ব মেদিনীপুর	তাজা নাট, খোসা থেকে তরল, পানীয় হিসাবে
নারকেল	সারা বছর ধরে	দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর	তেল, দড়ি জাতীয় কুটির শিল্প, পানীয়
সফেদা	মে-জুন	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সংরক্ষিত দ্রব্য
আলু	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	হুগলি, বর্ধমান	গুঁড়ো, চিপস্, অ্যালকোহল
টমেটো	জানুয়ারি -মার্চ	দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া	সস, ক্যাচাপ, রস ইত্যাদি
বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, গাজর শসা	সেপ্টেম্বর-মার্চ	দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান	ফারমেন্টেট দ্রব্য, প্রিকলিং
মটর	জানুয়ারি-মার্চ	নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা	ক্যান, শুকনো
বেগুন	সারা বছর	হুগলি, বর্ধমান	প্রিকলিং
পেঁয়াজ	মার্চ-এপ্রিল	হুগলি, বর্ধমান	প্রিকলিং, শুকনো
ঢেঁড়স উচ্ছে	এপ্রিল-সেপ্টেম্বর	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান	প্রিকলিং
ফ্রেঞ্চ্ বীন, পুঁই শাক	অক্টোবর-মার্চ	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা	ক্যান
তরমুজ	মার্চ-মে	মেদিনীপুর (পূর্ব), দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা	পানীয়
লঙ্কা	জানুয়ারি-মার্চ	উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর	সস, তেল, গুঁড়ো
আদা	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি	ক্যান্ডি, তেল, অলিরেসিন, গুঁড়ো
বড় কাজামাম	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	দার্জিলিং	শুকনো, তেল, অলিরেসিন
হলুদ	জানুয়ারি-মার্চ	মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর	পাউডার, তেল, অলিরেসিন

ধান, গম, পাট ইত্যাদি ফসলের চাষ এবং সেগুলি থেকে কি ধরনের আয় পেতে পারি কৃষক মাত্রেই অবহিত আছেন। কিন্তু ফলের ও ফুলের চাষ সম্বন্ধে অনেকেরই খুব স্পষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। তাই পরবর্তী পাতায় এ বিষয়ে বলা হল। যদিও এই হিসাব বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তবে একটি ধারণা পেতে সুবিধা হবে :

ফলের চাষ থেকে আয় কতখানি ঃ

ফলের নাম		বছরে বিঘাপ্রতি (টাকায়)
	দেশি আম	৫ বছরের পর থেকে বছরে ৮-৯ হাজার এবং ১০ বছরের পর এ পরিমাণ বাড়বে।
	হাইব্রিড আম	৩ বছরের পর থেকে বছরে ১৫ হাজার এবং ৬ বছরের পর থেকে এর পরিমাণ বাড়তে থাকবে।
	কলা	বছরে ১৫-২০ হাজার।
	পেঁপে	বছরে ১০ হাজার।
	আনারস	বছরে ১৫ হাজার।
	পেয়ারা	বছরে ১০-১২ হাজার।
	কাঁঠাল	বছরে ৪ হাজার ৮০০ টাকা।
	লিচু	বছরে ১০ হাজার টাকা।
	কাজু	বছরে ৩ হাজার।
	নারকেল	৫ বছরের পর থেকে বছরে ১২ হাজার।
	সপেটা (দেশি)	৭ বছরের পর থেকে বছরে ১২-১৫ হাজার।
	(হাইব্রিড)	৫ বছরের পর থেকে বছরে ২৫-৩০ হাজার।
১২।	কমলা	৫ বছরের পর থেকে বছরে ১০ হাজার ৮০০ টাকা।

ফুলের চাষ থেকে আয় কতখানি ঃ

ফুলের নাম	ফলনে / বছরে	বিঘাপ্রতি (টাকায়)
১। গোলাপ, রজনীগন্ধা, যুঁই, বেলী	বছরে	৮-১০ হাজার।
২। অ্যাজিওলাস	ফলনে	৩০ হাজার।
৩। চন্দ্রমল্লিকা	ফলনে	১০-১২ হাজার।
৪। অ্যাসটার, অ্যাটিহিনাস চেরী গোল্ড, জিনিয়া	ফলনে	১২-১৫ হাজার।

পানচাষ ঃ বোরোজের এলাকা ৪০০ বর্গমিটার বা ১০ ডেসিমেল

বছর	খরচ (টাকা)	আয় (টাকা)	বাৎসরিক নেট আয় (টাকায়)
১ম বছর	৮০৩০	৪৫০০	-৩৫৩০
২য় বছর	৪৮৫০	৯০০০	+ ৪১৫০
৩য় বছর	৫০০০	১০০০০	+ ৪৭০০
৪র্থ বছর	৪৮০০	১০০০০	+ ৫২০০
৫ম বছর	৫৪০০	১০০০০	+ ৪৬০০
৬ষ্ঠ বছর	৫০০০	১০০০০	+ ৫০০০
মোট	৩৩,৮০০	৫৩৫০০	

পানিকলের চাষ (বছরে বিঘাপ্রতি হিসাবে) ঃ খরচ - ৯৩০ , আয় - ২০০০ , লাভ - ১০৬৭ টাকা

হোগলার চাষ (বছরে বিঘাপ্রতি হিসাবে) ঃ খরচ - ৯৬০, আয় - ২৬৬৭, লাভ - ১৭০৭ টাকা। তবে হোগলা দিয়ে চটাই, ছাউনি ইত্যাদি তৈরিতে অনেক বেশি লাভ হবে।

শীতলপাটির চাষ / মাদুর কাঠির চাষ ঃ খরচ - ৫৪১৪, আয় - ১৫,০৩৪, লাভ - ৯৫৪০ টাকা।

তুঁতের চাষ ও রেশম পোকা পালন ঃ বছরে বিঘাপ্রতি ১২-১৫ হাজার টাকা লাভ।

তসর তুঁতির চাষ (অর্জুন, আমন বা শাল গাছ)

কেঁচোর চাষ

মাদুর ও কার্পেট তৈরি (সাবাই বা বাদুই ঘাস, নারকেল গাছের পাতা)

কেয়া গাছ লাগানো ও তার থেকে তেল তৈরি বা ঔষধ তৈরি করা
শালপাতা থেকে বাটি, থালা তৈরি করা
খেজুর পাতা বা তালপাতা থেকে পাটি বোনা।

চাষবাস ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে একজন প্রান্তিক চাষী কিভাবে মাসে মোটামুটিভাবে ২০১০ টাকার মতো আয় করতে পারেন তার কতগুলি উপায় দেখানো হল। যদিওবা এগুলি অনেকের জানা তবে আবার অনেকের কাজে লাগতে পারে।

কতিপয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্রশিল্প প্রকল্প

প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্রশিল্প	কাঁচামাল	প্রধান যন্ত্রপাতি	মাসিক বাদে শ্রমিক সংখ্যা	প্রতি মাসে লাভ (টাকায়)
১। ডাল ভাঙা ও প্যাকেট তৈরি	মুগ, মুসুরি, অড়হর, কলাই	ডাল ভাঙা যন্ত্র	৩	২৫৫৯
২। নুন গুঁড়ো ও প্যাকেট	লবণ	নুন গুঁড়ো করার যন্ত্র		
৩। চিনির সরবত (সিরাপ)	চিনি, সংরক্ষণ দ্রব্য, রঙ, এসেন্স, বোতল ইত্যাদি	কড়াই, হাতা, উনান, ছাকনি, হাইড্রোমিটার/ রিফ্রাক্টোমিটার ইত্যাদি		
৪। গম ভাঙানো ও প্যাকেটে বিক্রি	গম	আটা চাকী, চালনী, প্যাকেট বন্ধ করার যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা		
৫। ম্যাঙ্গোবার (আম থেকে তৈরি খাবার)	আম, চিনি, কেমিক্যাল ইত্যাদি	অ্যালুমিনিয়াম টেবিল, গামলা, বালতি, ছুরি, বাটি, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি		১৬৬৬
৬। মাছের চাটনি ও মাছজাত খাদ্য	মাছ, অর্গানোওয়ার, টোপিওকা, ময়দা, তেল, ভিনিগার, চিনি, মশলা	গ্রাইন্ডিং মেশিন, প্রসেসিং টেবিল, ট্রাই, প্লাটফর্ম, কড়াই, গামলা, উনুন ইত্যাদি		৫৮৩১
৭। মৌমাছি পালন ও মধু সংরক্ষণ	মৌমাছির জন্য খাবার, বোতল	মৌমাছি বসার জন্য বাক্স, ছাকনি, দাঁড়িপাল্লা, সিপি লাগানো যন্ত্র		২০৮৬
৮। সরিষার তেল	সরিষা ও তিল	ছোট নিষ্কাশন যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা		
৯। মিষ্টি কদবেল	কদবেল, প্রিজারভেটিভ, রঙ, চিনি, টিন	ডিজেলচালিত উনান, সংরক্ষণ পাত্র, ডেকচি, কাঠের হাতা ও লোহার কড়াই		
১০। গ্যাসযুক্ত জল	স্যাকারিন, গ্যাস, চিনি, বোতল, জল	গ্যাস ভর্তি করার যন্ত্র		
১১। তামাক পাতা থেকে খইনি	তামাক পাতা (মতিহারি) চুন, অপরাপর কেমিক্যালস, প্যাকিং	হাতে কাটার যন্ত্র, গুঁড়ো করার যন্ত্র (মোটর সহ), মাখানোর যন্ত্র, লোহার ট্রে		
১২। গুড়াকু	তামাক, গুড়, সুপারি	কাটা, গুঁড়া করার যন্ত্র		
১৩। মাসরুম চাষ ও শুকনো করা	খড়, মাসরুম বীজ (স্পন), মোড়ক	ড্রায়ার, স্প্রেয়ার, স্ট্র কাটার, সিঁড়ি, র‍্যাক, দড়ি, মোড়ক, শুকনো করার চাটাই, সিট আসবাবপত্র ইত্যাদি		

প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্রশিল্প	কাঁচামাল	প্রধান যন্ত্রপাতি	মালিক বাদে শ্রমিক সংখ্যা	প্রতি মাসে লাভ (টাকায়)
১৪। বাদাম পাটালী	বাদাম, জাগারী, ময়দা, প্যাকিং বক্স, পলিথিন ব্যাগ	কড়াই, খুন্তি, সাঁড়াশি, কাঠের পাটা, রোলার, কাটার ইত্যাদি	৫	১১৯০
১৫। জয়দাপাতি (পানমসলা)	তামাক পাতা, প্রিসারিন, এসেন্স, টিনের কৌটা ও মোড়ক	স্টেনলেস গামলা, হাতা, চামচ, পলিথিন জার, ইলেকট্রিক পাখা, ওজনের যন্ত্র, স্লেলিং মেশিন ইত্যাদি		
১৬ ওজনো লঙ্কা (ডিপসল সলিউসনে চোবানো শুকনো লঙ্কা)	পাতের জালের ট্রে, ট্যাঙ্ক, ঝুড়ি	পাকা লঙ্কা, কেমিক্যালস, মোড়ক		৫৬০০
১৭। আদার ক্যান্ডি (মুখশুদ্ধি ও কেক তৈরিতে লাগে)	আদা, চিনি, কেমিক্যালস, মোড়ক	বড় প্রেসার কুকার, প্যান, উনুন কাপের টেবিল, ছুরি, বঁটি, চামচ, হাতা		
১৮। শুকনো সব্জি অসময়ে ব্যবহারের জন্য	মটর, ফুলকপি, আলু, বাঁধাকপি, নুন, মোড়ক	ড্রায়ার, প্যাকিং মেশিন, ভাটা-ছেলার ছুরি, ইত্যাদি		
১৯। পেপসি	চিনি, রং ও গন্ধ, বরফ নুন, প্লাসটিক	সিলিং মেশিন, বালতি, মগ, গামলা, ফিলটার, বরফ বাক্স		
২০। কুলপি মালাই	চিনি, গুঁড়া দুধ, কনডেন্সড মিল্ক, পেস্তা বাদাম, রং ও খাওয়ার গন্ধ, বরফ ও নুন	স্টেনলেস বালতি, মগ, কুলপি ছাঁচ, মাটির হাঁড়ি, ঢাকনা		
২১। বাচ্চাদের সুষম খাদ্য (Energy food)	গম, ছোলা, বাদাম, ময়দা, জাগারী, ভিটামিন, মিনারেল, কেমিক্যালস, মোড়ক, কৌটা	ব্লেন্ডার, সিফটার, বয়েল, দাঁড়িপাল্লা		
২২। কেক, প্যাস্ট্রি	ময়দা, তেল, ডিম, চিনি, দুধ, বেকিং পাউডার, নুন	ওভেন (বেসি ভাটা), মিক্সিং টাব, ছাঁচ, দাঁড়িপাল্লা, চালনী		
২৩। আমের নুন আচার	কাঁচা আম, নুন, বস্তা	বাঁশের খাঁচা, চাটাই, কাঠের গামলা, কাটাছেলার যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা		
২৪। পাঁপড়, বড়ি, বোঁকা	মুগডাল, বিউলি ডাল, ছোলা, গোলমরিচ, হিং, নুন, তেল, মোড়ক	ড্রায়ার, প্যান, কাঠের ট্রাম, রোলার, প্লাস্টিক শিট, মাথা যন্ত্র		২৬৬৩
২৫। চকোলেট, লজেন্স	চিনি, গ্লুকোজ (তরল), রং, গন্ধ, মোড়ক	পিছিং ও ছাঁচ, সাইজিং মেশিন ও চাকা, রোলিং মেশিন, লোহার প্লেট, তামার পাত্র, উনুন ইত্যাদি		
২৬। জ্যাম	টম্যাটো, পেয়ারা, আম, আনারস, চিনি, মসলা, কেমিকেল, বোতল, লেবেল, মোড়ক	পাল্পার, এক্সট্রাক্টর, উনুন প্যান, প্রেসার কুকার		
২৭। হজমি গুলি ও মুখরোচক চাটনি	আমচুর, কুলচুর, আমলকি, চিনি, জিরা, মসলা, সাইট্রিক অ্যাসিড, মোড়ক	মিক্সিং মেশিন (মোটর সহ) পেষাই মেশিন, পলিথিন ব্যাগেল, গামলা, বালতি		

প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্রশিল্প	কাঁচামাল	প্রধান যন্ত্রপাতি	মালিক বাদে শ্রমিক সংখ্যা	প্রতি মাসে লাভ (টাকায়)
২৮। পটাটো ওয়েফার	আলু, তেল, নুন, মশলা, মোড়ক	পিলার, স্লাইসার, প্যান, টেবিল, ছুরি, সিলিং যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, উনুন	৬	৩৩৪৭
২৯। সুগন্ধ সুপারি	শুকনো সুপারি (বাছাই), মশলা, এলাচ, সুগন্ধ, মোড়ক	স্লাইসার, গুঁড়ো করার মেশিন, মিক্সিং মেশিন, মেপে করার পাত্র, সিলিং যন্ত্র		
৩০। তালগুড়/ পাটালি	তালের রস	কড়াই, হাতা, উনান, সংরক্ষণের পাত্র		
৩১। ব্যাসন ও ছাতু তৈরি ও প্যাকেট ভরা	ছোলা, গম, যব, মুগ মটর	ডাল-ছোলা-যব ভাঙা ও পাউডার করার যন্ত্র, চালনী,		
৩২। প্যাসট্রি	ময়দা, সুজি, চিনি, ডালডা, নুন, ঘং	ভাটা উনুন, টেবিল, টিউবওয়েল ছাঁচ ইত্যাদি		
৩৩। লজেন্স, টফি, লালিপপ্	চিনি, গ্লুকোজ কেমিক্যালস, প্যাকিং দ্রব্য, জ্বালানি	পাকিং, সাইকিং, প্লেট, ভাইস, পাত্র, বোলিং যন্ত্র, আসবাব, কড়াই		
৩৪। মুড়ি-মৈ মোয়া	মুড়ি-মৈ-চিড়া, চিনি/ গুড়, ঘি, ক্ষীর, প্যাকেট	কড়াই, হাতা, উনুন, বড় পাত্র, প্যাকেটের মুখ বন্ধ করার যন্ত্র।		২৫৮৩
৩৫। প্যাতা/লিচ্ছিটি/ পেঁপে ক্যান্ডি	চালকুমড়ো, লাউ, পেঁপে, চিনি, জ্বালানি, গ্লুকোজ (তরল)	কাটাছেলার যন্ত্র, কড়াই, গামলা, উনুন		৩৬৫৫
৩৬। ভিনিগার তৈরি (অ্যাসিটিক অ্যাসিড যোগে)	অ্যাসিড, তেঁতুল, ঘং	কাঠেরড্রাম, ক্যাপ আঁটার যন্ত্র		
৩৭। চিড়া, বাদাম ভাজা / মশলামার প্যাকেট	কাঁচা চিড়া, ছড়ানো বাদাম, নুন, মশলা, জ্বালানি	উনুন, কড়াই, ছাতনা		
৩৮। পপকর্ন (ভুট্টার খই)	ছড়ানো বাছাই ভুট্টা, নুন, জ্বালানী	উনান, কড়াই-চালনী, ছাতনা টিন ড্রাম		
৩৯। মিছরি, বাতাসা, ফলনা, নকুল দানা	চিনি, ময়দা	কড়াই, হাতা, উনান, হাঁড়ি কাঠের পাটাতন, চাটাই, ছাঁচ		১৭৮৮
৪০। ঘি তৈরি	ক্রিম, বোতল, লেবেল	কড়াই, অ্যালুমিনিয়াম ড্রাম, উনান, সেনট্রিফিউজ যন্ত্র		৩২৮০
৪১। সন্দেশপড়ি	ব্যাসন, ময়দা, চিনি/ গুড়, ডালডা, প্যাকেট	কড়াই, হাতা, উনান, কাঠের পাটাতন মাল রাখার পাত্র		২৯৮০
৪২। চনাচুর	চিড়ে, ডাল, ব্যাসন, বাদাম, মটর ডাল, মটর, কচু, আলু, চিনি, সঃ তেল, গুড়, ডালডা	বড় কড়াই, ছাননা, আলু কাটার যন্ত্র কাঠের টব, ঝুড়ি, পাত্র, উনুন		৩৩৯৫
৪৩। কেক, বিস্কুট, কেক তৈরি	ময়দা, চিনি, ঘি, ইস্ট, লবণ, বাদাম, কেমিক্যাল, শুকনো ফলমূল	ভাটি উনুন, চাক/ট্রে, র‍্যাক, কাঠের ময়দা মাখা গামলা		

প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্রশিল্প	কাঁচামাল	প্রধান যন্ত্রপাতি	মালিক বাদে শ্রমিক সংখ্যা	প্রতি মাসে লাভ (টাকায়)
৪৪। মুড়ি তৈরি	চাল, লবণ, প্লাস্টিক বস্তা, পলিপ্যাক	মুড়ি তৈরির বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, প্যাকেট মুখ বন্ধ করার যন্ত্র	৩	৩৫৫০
৪৫। নারিকেল ভাজা	নারকেল, তেল, প্যাকেট	স্লাইসার, কড়াই, কারণা, উনুন		২২৪৬
৪৬। ধান ভাঙা (মিনি চালকল)	খরিদ্দারের ধান বাদীতে ভাঙা হবে নিজের কাঁচামাল লাগবে না	চাল সাফাই করার হোলার, যুক্ত ডিহাস্কার (15 HP)		৩৮১৮
৪৭। পিকলস, চাটনী, সস	কাঁচা আম, সরষের তেল, চিনি, জাগারী, টম্যাটো, মশলা, রসুন, কেমিক্যালস	অ্যালুমিনিয়াম প্যান, কাজের টেবিল, পালপিং মেশিন, উনুন		
৪৮। মাছ শুকানো ও ভেটকির ফিলেট	মাছ, চিংড়ি, ভেটকি, অন্যান্য	মাছ শুকানোর যন্ত্র, উনান, ডেকচি, সরেক্ষণ পাত্র, ওজন যন্ত্র		২৩৬৮
৪৯। সিমুই, চাউ	গম, মশলা	সিমুই, চাউ তৈরি করার যন্ত্র, শুকানোর যন্ত্র		
৫০। তৈরি বোঁদে / মিহিদানা (রসগোল্লা)	ছানা, ঘৃৎ, মশলা, চিনি	উনুন, কড়াই, ছাঁকা, করনা		
৫১। চিড়ে তৈরি (মেসিনের সাহায্যে)	ধান	চিড়ে তৈরির মেশিন, উনান		

হেলেন কেলার

জন্ম : ২৭ জুন, ১৮৮০ মৃত্যু : ১ জুন, ১৯৬৮

১৮৮০ সালের ২৭ জুন আমেরিকার তুসকামবিয়া নামক স্থানে হেলেন কেলার জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যান। তবে জন্মলগ্ন থেকেই হেলেন কেলার এসব দৈহিক অক্ষমতা নিয়ে জন্মাননি। যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ মাস তখন তাঁর এক মারাত্মক অসুখ হয়। সেই অসুখ থেকেই তাঁর এইসব দৈহিক অক্ষমতা। সহজেই অনুমান করা যায় — কী দুর্ভাগ্যের মতো তিনি জীবন যাপন করেছিলেন। ১৮৮৭ সালের ৩রা মার্চ হেলেন কেলারের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। এই দিনই তিনি শ্রীমতী অ্যান ম্যানসফিল্ড সুলিভান-এর সান্নিধ্যে আসেন। শ্রীমতী সুলিভান-ই প্রথম হেলেনকে পড়তে ও লিখতে শেখাতে লাগলেন। শিক্ষিকা হিসেবে তিনি নিজেকে কত নিবেদিত করেছিলেন। শিশু অবস্থায় সুলিভানও তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান। পরে অবশ্য তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। তিনি ব্রেইল প্রবর্তিত বর্ণমালা শিখেছিলেন। তার শিখেছিলেন অন্ধদের জন্য তাঁর প্রবর্তিত লিখন পদ্ধতি। পরবর্তী জীবনে হেলেনও ব্রেইল প্রবর্তিত বর্ণমালা শিখেছিলেন। ব্রেইলের পদ্ধতি অনুসারে প্রকাশিত সবকটা বই পড়তে তাঁর খুব বেশি সময় লাগেনি। এর পরে হেলেন কেলার মারা কুলার নামে একজন শিক্ষিকার সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে হেলেন একজন বিচক্ষণ শিক্ষিকা হন এবং বোবা শিশুদের কথা বলতে শেখান অন্ধ তিনি নিজেই বোবা।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে হেলেন কেলার স্নাতক হন এবং সাম্মানিক স্তরের পাঠক্রমে (অনার্স কোর্সে) প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি অনেকগুলি বই লেখেন আর প্রতিবন্ধী মানুষের শারীরিক অসুবিধার উর্ধ্বে হতে ও সুস্থ জীবন-যাপন করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি ফরাসি, স্প্যানিশ ও জার্মান ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। ১৯৫৫ সালে লেখিকা শ্রীমতী হেলেন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশসহ অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর বধির ও অন্ধ লোকদের জন্য স্থাপিত কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন। যদিও তাঁর দেখার, শোনার ও কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, তবুও তাঁর মন ছিল অতিশয় প্রখর ও তাঁর চারদিকে ও নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটত, সে সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। দুর্ভাগ্যকে অগ্রাহ্য করে সুস্থ জীবন-যাপন করার জন্য তাঁর অদম্য সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমাদের সবার কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকা উচিত।

ইস্টন কনেকটিকাট নামক স্থানে ১৯৬৮ সালের ১লা জুন-এর গোধূলি লগ্নে ৮৮ বছর বয়সে হেলেন কেলার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরতরে বিশ্রাম নেন।

— অশোককুমার গিরি

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই
আজ প্রার্থিত —
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের **দিঘা, পুরী, দার্জিলিং ও গ্যাংটক**-এ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ নিবাসের (হলিডে হোম) সুবিধা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭৫ বৎসর ধরে (১৯২৪-১৯৯৮) সাধারণের পরিষেবায় উজ্জ্বল নজির সৃষ্টিকারী এই ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চায়। মাখলা ও হিন্দমোটর-এ দুটি শাখা কেন্দ্র (ব্রাঞ্চ) খোলার সিদ্ধান্ত সেই আকুতিরই ফলশ্রুতি।

নন্দ গোস্বামী
সভাপতি

মদনকুমার বণিক
সম্পাদক

উত্তরপাড়া, হুগলি
পিন ঃ ৭১২ ২৫৮
ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পড়ুন, 'ভাণ্ডারে' বিজ্ঞাপন দিন

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য 'ভাণ্ডার' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম সমবায় পত্রিকার গৌরবে গৌরবান্বিত ভাণ্ডার আজ থেকে আশি বছর আগে (শ্রাবণ, ১০২৫ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) আত্মপ্রকাশ করেছিল। সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যান্য মনীষীদের রচনায় 'ভাণ্ডার' নিয়মিত অলঙ্কৃত হত।

আজও 'ভাণ্ডার' সমবায় আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কেবলমাত্র সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ, সংবাদ এবং মতামতই নয়, কৃষি বিষয়ক রচনা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংক্রান্ত রচনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশাবলী নিয়মিতভাবে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কচকচি নয় — ভাণ্ডার পত্রিকার সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা মিলিতভাবে পূজা বা শারদ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয় যাতে বর্তমানকালের খ্যাতনামা লেখক-লেখিকাদের প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাস-কবিতা সন্নিবেশিত হয়। ভাণ্ডার আপনার পত্রিকা, আপনার সমবায় সমিতির পত্রিকা। ভাণ্ডার পড়ুন, অন্যকে পড়ান। আপনার এলাকার উন্নয়নমূলক সংবাদ, সমিতির সাফল্যের ও অগ্রগতির সংবাদ ভাণ্ডারে পাঠান — আমরা তা আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করব।

বিজ্ঞাপন দিয়ে এই প্রচার মাধ্যমকে আপনার কাজে লাগান এবং সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্রটিকে আরও শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে সহায়তা করুন।

ভাণ্ডার পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা ও বিজ্ঞাপনের হার

কাগজ, মুদ্রণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকার চাঁদা ও বিজ্ঞাপনের হার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ পূর্বের হার পুনর্বিন্যাস করেছেন। বর্তমান ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ভাণ্ডার পত্রিকার চাঁদা ও বিজ্ঞাপন হারের এই পরিবর্তন ওজানুযায়ী গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ অনুমোদন করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

গ্রাহক চাঁদার বর্তমান হার (সডাক) :
১-৬-৯৮ থেকে কার্যকর

প্রতি সংখ্যার মূল্য	৫ টাকা
পূজা /শারদ সংখ্যার মূল্য	৫০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	৭০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	৭৫০ টাকা

বিঃ দ্রঃ একসঙ্গে ৫ কপি বা তার বেশি সংখ্যক পত্রিকা ক্রয়ের জন্য শতকরা ২০ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : ১-৬-৯৮ থেকে কার্যকর
(শারদ সংখ্যা সহ প্রতি সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার)

প্রচ্ছদপটের চতুর্থ পৃষ্ঠা	১,২০০ টাকা
প্রচ্ছদপটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা	১,০০০ টাকা
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০ টাকা
ভিতরের অর্ধপৃষ্ঠা	৫০০ টাকা
ভিতরের এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	৩০০ টাকা

বিঃ দ্রঃ ১২ মাস বা তার বেশি সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ ছাড় দেওয়া হবে।

বিনয়গোপাল মিত্র,
সম্পাদক, ভাণ্ডার

জনসংযোগ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

মহাশয়,

আগামী ..... মাস থেকে আমার / আমাদের সমিতির নাম ভাণ্ডার পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক / আজীবন গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেবেন।

বার্ষিক চাঁদা /আজীবন গ্রাহক চাঁদা বাবদ .....টাকা নগদে / চেক /ব্যাঙ্ক ড্রাফট নং ..... তাং ..... মারফৎ প্রেরণ করা হল।

ভবদীয়,

স্বাক্ষর

নাম / সমিতির নাম

সমিতির সিল

ঠিকানা

জনসংযোগ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম তল
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

মহাশয়,

আগামী ..... থেকে ..... জন্য ভাণ্ডার পত্রিকার ..... পৃষ্ঠা আমাদের বিজ্ঞাপনের জন্য সংরক্ষিত রাখবেন।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু এই সঙ্গে পাঠানো হল।

☐ বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ ..... টাকা চেক /ব্যাঙ্ক ড্রাফট নং ..... তাং ..... মারফৎ প্রেরণ করা হল।

☐ বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ টাকা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর প্রদান করা হবে।

ভবদীয়,

স্বাক্ষর

নাম / সমিতির নাম

সমিতির সিল

ঠিকানা

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন উভয়ক্ষেত্রে চেক, ড্রাফট 'West Bengal State Co-operative Union'-এর নামে কাটতে হবে। চেক ও ড্রাফট অবশ্যই কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের ওপর হতে হবে।

সমবায় পরিদর্শকের ডাইরি থেকে - ৪

বনানী দাস

ব্লকের রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত বাবু সমবায় পরিদর্শকের অবস্থান কেমন? হ্যাঁ বিডিও ও পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার ব্যতিরেকে তিনিই মাত্র এখানকার শুধু বি সি এস অফিসার। হ্যাঁ, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অন্যান্য অফিসারদের অপেক্ষা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিয়া থাকেন। হ্যাঁ, তিনি বিডিও সাহেবকে তোয়াক্কা না করিয়া নিজস্ব চিঠিপত্র লিখিতে পারেন। তিনিই নিজস্ব মেমো ও ইস্যু রেজিস্টার রাখিতে পারেন, নিজস্ব প্রয়োজনমাফিক ট্যুর করিতেও পারেন এবং বেতন, ভাতা বা টিএ বিলের জন্য বিডিওকে সর্বদা হুজুরে রাখিতে বাধ্য নন।

মস্ত ট্রাজিক সত্য হইল ইহাই, এইসব বিশেষাধিকার সত্ত্বেও সমবায় পরিদর্শকের ব্লক প্রাঙ্গণে অবস্থান অনেকটা অনাহুত অতিথির মত, অনেকটা যেন ব্রাত্যজনের উদাসীনতায় সমস্ত ব্লক কর্মকাণ্ডের পরিচালক তাঁহাকে কেবল মৃত সৈনিক বানাইয়া রাখিতে চান। কি রকম? বিস্তারে বলিলে একটু অতীতে ফিরিতে হইবে।

সাদা জলহস্তির মত গতর পঞ্চায়েত শ্যামবাবু, একজন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তিনি একবার গল্প করিয়াছিলেন যে একসময় সমবায় পরিদর্শক গ্রামে আসিলেন এই উপলক্ষে গ্রামে সাজো সাজো রব উঠিত। তাঁহার জন্য প্রবেশ পথে তোরণদ্বার তৈয়ারি হইত। সমস্ত ব্লকেই সমবায় পরিদর্শকের বিশেষ সম্মানজনক স্থান ছিল। অফিসকর্তা কোন কারণে স্থানান্তরে গমন করিলে সমবায় পরিদর্শক অস্থায়ী বিডিও রূপে কার্যভার গ্রহণ করিতেন। এককথায় অফিস মধ্যে তাঁহার দাপট কোন অংশে কম ছিল না। তখন পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ ছিল এই পদাধিকারীর। আহা দিন তখন কতই না রসের ছিল। সমিতিতে লোন বিলি হইত সুপারভাইজার, অডিটর ও সি আই সকলের মিলিত প্রয়াসে। সমস্ত গ্রামিণাপী। গ্রামে তাঁবু পড়িত। সেখানে থাকিত সব চাষির রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। চাষিরা বৎসামান্য সুদে সমবায় ঋণ বিলি করিতে আসা পরিদর্শক, সুপারভাইজার, অডিটর ইত্যাদি ব্যক্তিকে দেবদূতের মত জ্ঞান-সম্মান করিত। পঞ্চায়েত-বাটের দলকেও সমবায়গুলির সংগঠন কাজে পরিদর্শকের ভূমিকা তো সভাই বলিবার মত ছিল। জানা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সেই দশকগুলিতে গ্রামীণ মহাজনদের কবল হইতে গরিব চাষিকে মুক্ত করিতে পাড়ায় পাড়ায় মানুষের সংগঠিত করিতেন পরিদর্শকেরা। তাহারাই সমবায় ক্ষেত্রে বেসরকারি নেতৃত্বকে উৎসাহিত করিতেন। কৃষি সমবায়গুলি মূলত ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে তখন হইতেই কাজ শুরু করে। বস্তুত সরকারি চাকুরি করিলেও পরিদর্শকরা তখনকার সময়ে যে উদ্দীপনার কর্ম সম্পাদন করিতেন তাহা বহুলাংশে সেবামূলক কার্যের সঙ্গে তুলনীয়। সে সময়টার বাতাসেই বোধহয় গঠনমূলক কিছু বীজ ছিল, সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত একটি দেশে জনসাধারণ নিজেকে সমষ্টির অংশ ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত, তাহার ক্ষুদ্র কর্ম যে কয়েকশত গুণ হইয়া দেশের ও দশের কাজে লাগিবে এই ভাবনা শিরায় শিরায় খেলা করিত। প্রতিটি ব্লকেই পূর্ববর্তী সমবায় পরিদর্শক সম্বন্ধেও অনেক গল্প শোনা যায়। কোথাও শোনা যায় কোন পরিদর্শক উদরান্ত পরিশ্রম করিতেন, কেহ ছুটির দিনেও বাড়ির দরজা খোলা রাখিতেন সমবায়িক মানুষের সখ্য, বন্ধুতা লাভের জন্য। কোথাও সমিতি সংগঠিত করিতে যাইবার পথে মহাজনেরা মস্ত বাধা হইয়া উঠিত। সরকারি ঋণের দায়ে জমিজমা ক্রোকের হুমকিতে হইবে এই গুজব ছড়ানো হইত গ্রামীণ চণ্ডীতলায়, জমায়েতে, সান্ধ্য আড্ডায়, যাত্রাপালার আসরে। বিভ্রান্ত গরিব মানুষকে বুঝাইবার মহৎ দায়িত্ব পালন করিতেন পরিদর্শক। পরিদর্শকের বেতনক্রম খুব নগণ্য ছিল না। বিডিও অফিস হইতেই তাহাদের বেতন হইত। তবু বিডিও-র সঙ্গে তাহাদের একটি সমমর্যাদার সম্মানপ্রাপ্তি প্রচলিত ছিল। সামান্য অবমাননায় পরিদর্শক প্রতিবাদ করিয়াছেন, আদায় করিয়া লইয়াছেন তাঁহার প্রাপ্য অধিকার।

কিন্তু এ সবই অতীতের গল্প। বর্তমানে সমবায় পরিদর্শক একঘরে ব্লক প্রশাসনের মধ্যে একটি উটকো ব্যক্তিত্ব। ব্লকের অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁহার সানন্দস্পর্শ মনে হয় না। তাহার সম্বন্ধে ব্লকে কাহারও কোন বিশেষ আগ্রহ নাই। তাঁহার বেতন বিডিও অফিস হইতে হয় না। তিনি অবশ্য হেডকোয়ার্টারে বিডিও-র ওপর নির্ভরশীল নন। কারণ তাহার কর্তা হইলেন সহ-নিয়ামক মহাশয়। অবশ্য তাঁহার ওপর কর্তৃপক্ষ ফলাইবার একটুকু সুযোগ পাইলে বিডিও মহাশয় সদ্ব্যবহার করেন। সময় সময় এই দুই কর্তার মধ্যে নির্দেশিত কাজের চাপে পরিদর্শক মহাশয় দিশেহারা হন। বিডিও-র সহিত সেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আর অবশিষ্ট নাই। যেহেতু বিডিও এই অফিসারকে অন্যান্য অফিসারদের মত বেতন, টিএ বিল ইত্যাদির মাধ্যমে বশে রাখিতে পারেন না, তাই তাঁহার অবস্থা অনেকটা হাত-পা বাঁধার মত। অন্যদিকে সমবায় পরিদর্শকের স্বাধীন স্বতন্ত্র কাজকর্ম তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করে এই ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট বিশিষ্টতাকে বেশির ভাগ বিডিও আঘাত করিয়া বিনষ্ট করিতে চান। নির্বাচন তালিকা সংশোধন, লোকগণনা বা অন্য যে কোন কাজে পরিদর্শককে যুক্ত করিয়া নিজস্ব ক্ষমতার সীমা দেখাইতে সচেষ্ট হন। পরিদর্শকদের মধ্যে বিডিও সম্বন্ধে এই প্রবচন প্রচলিত, 'ভূত দেখার কেউ নয়, কিল মারার গোঁসাই'। অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের বহু ব্লকেই এইসব ঊর্ধ্ব টানাপোড়েনের ঊর্ধ্বে অনেক বিডিও আছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এইসব টাগ-অফ-ওয়ার-এর মাঝে পরিদর্শককে মস্ত ফাঁসরে পড়িতে হয়। ব্লকের অন্দরমহলে তাঁহার ডাক পড়ে মোটামুটি মাসে একবার। সেটি হইল 'কৃষি-সেচ-সমবায়'-এর স্থায়ী সমিতির বৈঠকে। এই তিনটি দপ্তর খাপিয়া একজন কর্মাধ্যক্ষ থাকেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি কৃষি দপ্তরের মিনিকীট, চাপান সার ইত্যাদির বিলিবণ্টনে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিককে সাহায্য করিলেও সমবায়ের ক্ষেত্রে উদ্যোগহীন থাকেন। উদ্দিষ্ট

মিটিংটিও কৃষি আধিকারিক আহ্বান করেন। সমবায় এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের যোগসূত্র এখান হইতেই শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তবত প্রায় ক্ষেত্রে পরিদর্শক এই মিটিং হইতে সামান্য সাহায্য পান। তবে ব্যক্তিবিশেষে ব্লক সভাপতি বা কর্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে সহযোগিতা করেন। যদিও গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি লইয়া যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তাহার মধ্যে সমবায় পরিদর্শক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্ত থাকেন না বলিলে চলে। থাকেন কৃষি বা সেচ কর্মীরা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া পরিদর্শক বিভিও অফিসের সরকারি গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি পান না। যেহেতু গাড়ির তেল বাবদ সমবায় দপ্তর কোন অর্থ ব্লকে দেয় না তাই নেহাত ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাদে পরিদর্শকের গাড়ি চাহিবার অধিকারও নাই। ব্লকের অন্যান্য অফিসারদের সহিত তাহার মস্ত পার্থক্য হইয়া যায়। সেসব ব্যক্তির লিখিত চিঠির দায়িত্ব থাকে বিডিও-র। অথচ একটি মাত্র পিওন লইয়া সমবায় পরিদর্শক যখন ব্লকের সমিতিগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করেন, তখন তাহার পদক্ষেপ কেন, নীরবে ভাবেন নানান আইনগত ও আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের, তখন কার্যত তাঁহার পক্ষাবলম্বনে কেহই থাকে না। না ব্লক প্রশাসন, না পঞ্চায়েত সমিতি। এই একাকীত্ব বর্তমানে পরিদর্শকের নিত্যসঙ্গী।

কেন এই দশা, অর্থের অবলম্বন! বেতনক্রমের নিচ হইতে সমবায় পরিদর্শক অত্যন্ত সাধারণ একটি স্থানে অদ্যও অবস্থান করিতেছেন। বিভিও অফিসে প্রতিপত্তি বিস্তার, ব্যাঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে তাঁহার ভূমিকা শুধু ঋণদান সীমা নির্ধারণে সুপারভাইজারের অনুমোদনকে প্রতিস্থাপনে পুনরোনুমোদিত করা। কিন্তু কেন এই সব ব্যাপার। সমবায় ঘুটির ছকগুলি কিভাবে ছিল পূর্বে? বর্তমানেই বা তাহারা কিভাবে বদলাইয়া গেল? কিভাবে, কেন গেল? মনে হয় সমবায় ছকগুলি বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে খেলুড়েরা বিভিন্ন সময়ে তাহাদের মনোমত কিভাবে তাহাদের সাজাইয়াছেন, নড়াইয়াছেন।

মহাজনের পাপ-হিসাব জ্বালাইয়া, তাহাদের ঘুণ ধরা পৃথলিত ইতিহাসকে মুক্ত করিতে পুনা ও আহমদনগর অঞ্চলে কৃষকরা প্রথম তৈরি করেন সমবায়। হ্যাঁ, এটি ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যমূলক প্রতিষ্ঠান। খেলুড়ে তখন ইংরাজ সরকার। অন্যান্য কৃষকদের এই মূর্খমনীষ একত্র তাহাদের ঘুম সত্যি কাড়িয়াছিল। ভূমির খেতগুলিই যে তখন রাজনিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত বাঁধা। যদি একবার এই অযুত নিযুত বোড়ের দল সেই খেতগুলি কাটিয়া নেয় তবে তো সিংহাসনটিও টলে না সাম্রাজ্যটিতে পাড়িয়া ধসিয়া পড়িতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজা, মন্ত্রী ..... সুতরাং একদিকে সেনা নামিল, ছিন্নভিন্ন হইল বিদ্রোহী চাষির ঝুঁড়ে, অন্যদিকে চাষির কল্যাণমূলক কিছু আইনও প্রণয়ন করিতে হইল। এতদ্যতীত ইতিহাস বলে এইসব তথাকথিত আইন নিরপেক্ষ সমবায়গুলি তখন সভিই এখানে সেখানে গজাইয়া উঠিতেছিল। তার স্বল্প পুঁজির এই সংস্থাগুলিকে ঋণ দিতে উদ্যতপ্রদেশে ভূপরিবেশক, পঞ্জাবে ম্যাকলাগান, বাংলাদেশে লায়ন বেসরকারি ঋণ চালু করিয়াছিলেন। তবে এই সকল অতিউদ্যমকেন্দ্রীন সমবায়গুলি কেন্দ্রভাবে চলিত আহার বিদের কোন চিন্ন না জন্ম গেলেও এগুলিকে এবং সার্বিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে ঋণদান যে একটি বৃদ্ধিপ্রবেশী সরকারি ব্যবস্থা হইতে পারে তা বেশিদিন ইংরাজ বুঝিতে বিলম্ব করে নাই। তাই ১৮৯২ সালে মাদ্রাজের এক আই সি এস অফিসার ইউরোপে যাইয়া সুপারিশ করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ভূমি ও কৃষি ব্যাঙ্ক প্রবর্তনের। 'রাইফিফেইজনকে খুঁজুন' মানত তাঁর প্রতিবেদনে তিনি ভারতের কৃষিক্ষেত্রের বেহাল অবস্থাকে আয়ত্তে আনিতে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ঋণ দান এবং জার্মানি ও ইটালির অনুকরণে সংস্কারক রাইফিফেইজনের মত তাহারও তত্ত্বাবধানে সমবায় ক্ষেত্রকে জোরদার করিতে পরামর্শ দেন। ১৯০১ সালেও দুর্ভিক্ষ কমিশন স্যার এডওয়ার্ড ল-র সভাপতিত্বে সরকারিভাবে সমবায় গঠনের সুপারিশ করেন। আইন সচিব স্যার ইবেটসন্ প্রথম বিল আনেন, যা 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন - ১৯০৪' নামে পাশ হয় ১৯০৪ সালে। এই আইনে ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮১৭৭টি সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুযোগ না থাকা, মুনাফা বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি বিবিধ ত্রুটি হইতে এই আইনকে মুক্ত করিতে ১৯১২ সালে প্রণয়ন হইল 'সমবায় সমিতি আইন'। ইহাতে অন্য স্তরের সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইল। ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড আইনে সমবায় হইল প্রাদেশিক বিষয়। সর্বপ্রথম প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন হইল বোম্বাইতে ১৯২৫ সালে, মাদ্রাজে ১৯৩২-এ। ১৯৩৪ সালে হইল বিহার ও উড়িষ্যার আইন। আর বাংলাপ্রাদেশিক আইন হইল ১৯৪০ সালে। ইতিমধ্যে ১৯২৯-৩১ সালের মন্দার জন্য কৃষিঋণের ধাম কমিল, চাষী ঋণ শোধ করিতে অপারগ হইল। ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে, ১৯৩৫ সালে বোম্বাই প্রদেশে চালু হয় জমি বন্ধকি সমবায় ব্যাঙ্ক। সমবায়ের বিকাশের জন্যই ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন গঠিত এ ডি গোরওয়ালার সভাপতিত্বে 'মিথিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি' ৭৪টি জেলা, ৬০০টি গ্রাম এবং ২১,২৭,৩৪৩টি পরিবারে সমীক্ষা চালাইয়া ১৯০৪ সাল হইতে গৃহীত সমবায় ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন (১৯৪৪) 'Cooperation has failed, but cooperation must succeed. 'Cooperation has failed' এই মন্তব্য সমবায় সম্বন্ধে করিল মিথিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি সেই ১৯৪৪ সালে। যে গ্রামীণ মহাজনকে হঠাইবার জন্য একদিন চাষিরা নিজেরা মিলিয়াছিল এই সমবায়ের পতাকার নীচে, সমবায় আসিয়া সাহায্য করিয়া গত ৪০ বছরে হিসাব করিয়া দেখা গেল গ্রামীণ ঋণের ৪৪.৮% মহাজন আজও বহন করে, বড় চাষী ভরে ২৪.৯%, সেখানে সমবায় সমিতি করে মাত্র ৩.১%। এই ৩.১% এর মধ্যে যেখানে বড় চাষী ঋণ পাইয়াছে ২১ টাকা সেখানে প্রান্তিক চাষী পাইয়াছে ৪.৭ টাকা আর ছোট /ক্ষুদ্র চাষী পাইয়াছে মাত্র ১.৯ টাকা। সমবায়ের এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থাকে কাটাইবার জন্য স্বাধীন ভারতের উপরিউক্ত কমিটি সমিতির জন্য সরকারি শেয়ার দানের ব্যবস্থা, মার্কেটিং সমিতিগুলির মধ্যস্থতায় চাষিদের ঋণ ফসলের মাধ্যমে শোধের ব্যবস্থা, ছোট ছোট সমিতি ভাঙিয়া বৃহদাকার ঋণদান সমিতি তৈরি, খরা, বন্যা ইত্যাদির সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জাতীয় কৃষি ঋণ তহবিল তৈরি ও তার ব্যবহার, গুদাম তৈরিতে সরকারি সাহায্য, সমবায় শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সুপারিশ করেন। তাহার পর কত কমিটি আসিল, গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (এপ্রিল '৬১ হইতে মার্চ '৬৬) আসিল মেহতা কমিটি, ১৯৬৯ সালে সমবায়ের ঋণদান কিভাবে পরিচালিত হইবে সে বিষয়ে সুপারিশ করিল 'তেজটারাইয়া কমিটি'। বৃত্তমুখী সমবায় সমিতি

তৈরারি হইতে লাগিল। শুধু কৃষক নয়, সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষদের জন্য সমবায় তৈরি হইল। আর এই সময়কালের মধ্যেই সমবায় মন্ত্র পাইয়াছিল সেইসব যতি পরিব্রাজী, কর্মকুশলী, সৎ, সম্মানসচেতন সমবায় পরিদর্শককে। তাঁহারা অক্লান্ত শ্রমে বহু সমিতিকে জন্ম দিয়াছেন, শিশু সমিতিগুলিকে পরিচর্যা করিয়াছেন। বিভিন্ন ব্লকেই এইসব পরিদর্শক সম্বন্ধে বিচিত্র গল্প চালু আছে। কেহ সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়াও কোন টিএ বিল করিতেন না। কেন? হয়ত বিলের ধারা বিডিও-র সঙ্গে কোন কারণে মনান্তর হয়। গোবিন্দ ভৌমিক নামী একজন পরিদর্শককে সমিতি বিষয়ক খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য অফিস ফাইল ঘাঁটিতে হইত না। সেগুলি তাঁহার কোলাতেই একটি বাঁধানো খাতায় শ্রেণীবদ্ধভাবে লেখা থাকিত। প্রয়োজনে শুধু খুঁজিয়া বাহির করিবার অপেক্ষা। সমস্ত ব্লকের সব সমিতির তথ্যাদি একত্র রাখিবার অদ্ভুত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ধারি করিয়াছিলেন ইনি। পদোন্নতি হইবার বহু সুযোগই হাতছাড়া করিয়াছেন ঘাটের দশকের পরিদর্শক প্রজন্মের প্রায়। আজীবন পরিদর্শক থাকিবার মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধরিয়া উঠিবার বাজারচলতি প্রলোভন জয় করা এই দৃঢ়চেতা মানুষটিকে আজও কলকাতা অফিসে চিরাচরিত সি আই রূপে দেখা যায়। বর্ধমান জেলার প্রবীণ বহু সমিতিই তাঁহার কঠোর নজরদারিতে মেরুদণ্ড লাভ করিয়াছে। কথিত আছে, প্রবল বর্ষণ বা প্রখর রৌদ্রে যখন কুকুর-বিড়ালও বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয় না তখনও মাঠের আল পথ ধরিয়া ঘর্মাক্ত মানুষকে ওটিওটি যাইতে দেখা যাইত তবে নিশ্চিতভাবেই মনে করা হইত একজন সমবায় পরিদর্শক ও অপরজন তাঁহার হতভাগ্য শিষ্যন। একজন সমবায় পরিদর্শক-এর ঝোলায় পাওয়া যাইবে না এমন জিনিস নাই। পেন, কাগজ, কালি, স্ট্যাম্প, প্যাড, ক্লিপ, কার্বন, সুঁচ, সুতা, আঠা আবার একটি আবশ্যকলা পুঁথি, গামছাও মূলত সেখানে। কোন সমিতিতে যাইয়া রাত্রিযাপন করা তাঁহার অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। পরিদর্শকের এই জনমুখী, কর্মসচেতন ভাবমূর্তি কিন্তু তৈরারি সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে।

দেশ স্বাধীন হইবার পরবর্তী গঠনমূলক উদ্যমনা হইতে পরবর্তী কয়েক দশকে সমবায় পরিদর্শকেরাও মুক্ত ছিলেন না। বহু ক্ষেত্রেই সমিতির ম্যানেজার হইতে অডিটর (হিসাব নিরীক্ষক) এবং অডিটর হইতে পরিদর্শক হওয়া এই কর্মীদের মধ্যে সমিতির আবশ্যিক ভাল ও মন্দ দিকগুলি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে দেশ গড়ার জন্য মিশ্র হিসাবেই তাঁহারা সমবায়ের পরিচর্যা করিতেন আপ্রাণ। ভারতবর্ষের বাতাসে তখনও ছড়ান ছিল দেশপ্রেমের সৌরভ, তখনও দেশের মানুষ সরলতা, মূল্যবোধকে আশ্রয় করিয়া নিজের ও দেশের উন্নতির প্রত্যাশা রাখিতেন। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ রূপায়িত করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেন যথাসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাস কি সত্যিই এতটা স্বর্ণখচিত! ইতিহাস কি প্রকৃত এতটাই ইতিবাচক? তবে সমবায় মানেই চোরের আখড়া, পরিদর্শক মানেই গুড়ের উপর পিঁপড়ার ন্যায় লগ্ন একশ্রেণীর অর্থলোলুপ কর্মচারি এইসব অপবাদ সৃষ্টি হইল কবে, কাহাদের দ্বারা! সুতরাং ইতিহাসের জন্য আর একটি পিঠও আছে।

কোন্ ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া যায় ব্রিটিশ? জাতিভেদ, শ্রেণীভেদে জীর্ণ একটি ভারতবর্ষকে। ইহাদের রাজতন্ত্রের চাকা ঘুরাইত একশ্রেণীর অর্ধ-ইংরেজি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষ। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিরই একটি অংশ যেমন চরমপন্থী, নরমপন্থী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছেন, উহারি কম্যুনিস্ট আন্দোলনের গোপন শিরায় রক্ত সঞ্চালন করিয়াছেন তেমনি ইহাদেরই একটি অংশ চরম সুবিধাভোগী, ইংরেজ তোষক, চতুর যাহারা কমবেশ জাতিভেদকে উসকাইয়া বীভৎস আনন্দ লাভ করিয়াছেন। অস্বীকার করিবার উপায় নাই সমবায় পরিদর্শক নামক পদে গ্রাম, শহরের এইসব মধ্যবিত্তরাই মূলত যোগদান করেন। শ্রেণীগতভাবেই তাহাদের কেহ কেহ নমস্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের উদাহরণ, আবার কেহ কেহ স্বাধীনতার ভোরলগ্নেই তৈরারি করেন উৎকোচ গ্রহণ, সুবিধাবাদীতার একটি ট্রাডিশন।

ভূমি-সম্পর্কের সহিত সমবায়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সেদিক দিয়াও সমবায় বিকাশ লক্ষ্যের পথ রুদ্ধই ছিল, একটু লক্ষ করিলেই দেখা যায় দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের মূল শাসন কাঠামো তো মোটের উপর অপরিবর্তিতই ছিল। খুঁটিগুলি একই ছিল শুধু খেলুড়েদের জায়গায় আসিল লালমুখ ইংরেজ বেনিয়ার পরিবর্তে দুশিয়াধা রাজনৈতিক নেতা, ভুঁড়িওলা ব্যবসায়ী, আরেলী জমিদার আর গ্রাম, চটপটে শিল্পপতি। সরকারি অভিগ্রহণে বাজনা যত বাজিয়াছিল সমবায় ক্ষেত্রে বাজনা তত উঠিল না। আসলে স্বতঃস্ফূর্ত বাঁচিবার উপায় হিসাবে সমবায়ের গুরুত্ব তাহাতে বাড়িল না, বরঞ্চ রাষ্ট্রযন্ত্রের এই বন্দুকাস্তিতে একের পর এক সমবায় গড়িয়া উঠিল, কিন্তু জন্মিয়া উঠিল না। সরকারি লেনের অঢেল ব্যবস্থা হওয়ায় এবং সরকারি দপ্তরের সহিত তাগাতপত্রের মারফৎ যোগাযোগ করিবার যোগ্যতা প্রবীণ অভিজ্ঞতা চাবী অর্জন করে নাই কখনো। তাই মহাজনেই হয় সমবায়ের ম্যানেজারও বাস্তবেই একজন হইলেন। এবং ওনুকবাবুর সমিতি, তনুকবাবুর সমিতি, এই সব নামে সমবায়ের সারা অঙ্গে অলঙ্কারটি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বছরে বারো মাস গতর খাটান চাষচাষী পরাণ নস্কি, বুক ফেঁপে সমবায়ে আসিয়াও জড়োসড়ো হইয়া থাকেন, ম্যানেজারবাবুর মর্জি বুঝিয়া বক্তব্যের স্বরের প্রসঙ্গ উঠান। একথা এই নকই-এর দশকেও সত্য যে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি বলিতে মূলত বৃহৎ চাষির নেতৃত্বে গঠিত একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বুঝায় যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী দূরে থাকেন। অবশ্য অবশ্যই কথার উপায় নাই কিছু ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষির কাঁধেও আসিয়াছে, কিন্তু সার্বিক-ভাবে সমবায়ের সেই চেতনা বা অধিকারবোধ সাধারণ সভ্যদের মধ্যে আজও অনুপস্থিত। শ্রমিক সমবায় বলিতে বুঝায় কন্ট্রাকটারি করিবার লাইসেন্স এবং এইভাবে তালিকা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার অবিকৃত অবস্থায় সমাজের উন্নয়নও একটি কাগুজে ব্যাপার হইয়া আছে। সমবায় পরিদর্শকের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাই সমবায়ের গোড়ায় গলদ ঘুচিয়া যায় নাই। অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে সমবায়কে মাখান করা হয় নাই আজও নির্মম সত্য। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কবিসত্তা দ্বারা তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত সমবায়কে স্বাগত জানাইয়াছিলেন সেই বিশে শতকের প্রথম দিকে কিন্তু ভেলেক্সনা, ভেভাগা, নকশালবাড়ি কোন ভূমি-আন্দোলনেই আমরা সমবায়কে গুরুত্ব পাইতে দেখি নাই। অন্ত সমান দেয়ার, সমান লভ্যাংশ, সমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্মান প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে সমবায় তো প্রাথমিক

একটা ব্লাকমেল হইতেই পারিত। বৃহৎ ভূস্বামী বা কণ্ট্রাকটর-এর কবল হইতে সমবায়কে উদ্ধার করিয়া সমানাধিকারের ভূমি তৈয়ারি করা কি খুবই কঠিন হইত?

হয়ত হইত না, অথবা হইত। এ প্রশ্ন তোলা আজ অপ্রাসঙ্গিক। তবে প্রাসঙ্গিক কথাটা ইহাই যে সমবায় পরিদর্শক সহ সমস্ত সমবায় দপ্তরের বিস্তর টানাহেঁচড়া সত্ত্বেও সমবায় ব্যবস্থা যে আজও সমবায় আন্দোলন হইয়া উঠে নাই তাহার পশ্চাৎপটে এই সব সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভেদ বা রাজনৈতিক উদাসীনতার গল্প আছে।

ক্রমেই জীবন, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের ধারণারও মস্ত জটিল ধরিয়াছে। রাজনৈতিক রঙের পার্থক্য প্রায় ঘুচিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ কেলেঙ্কারির কাদায় নেতাদের ওস্ত পশ্চাৎদেশ দৃষ্ট হইতেছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদে অনাস্থার হাওয়া জোর বহিতেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অলস অবক্ষয় মানুষকে দারিদ্র এড়াইবার, কাজে ফাঁকি দিবার, অন্যকে প্রতারণা করিবার এক অহেতুক প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। সমবায় পরিদর্শক বঞ্চিত হইয়াছেন তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুবিচার হইতে, তাঁহার অর্থপ্রাপ্তি ও সম্মান প্রাপ্তির পদার ভাটা জাগিয়াছে। আবার ইহাও সত্য সমবায় পরিদর্শক অ্যাসোসিয়েশন আজও এই সব বঞ্চনার অবসান করিবার জন্য একটিবারও আদালতের দ্বারস্থ হইবার জন্য একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার পশ্চাৎবর্তী সাব-রেজিস্ট্রারও (জমি নিবন্ধন বিভাগ) আদালতের আশীর্বাদে যখন স্পেশাল গ্রে নামক উপহারে অভিষিক্ত হইয়াছেন তখনও মতান্তরে দীর্ঘ সমবায় পরিদর্শকের কণ্ঠে গান মাত্র সম্বল, 'সবাই আগে যায় যে চলে। আমি আছিস তুই কি বলে '। এই সমস্ত অঘটনের মাঝেই মৎস্য বিভাগ, ক্ষুদ্র শিল্প, তন্তু বিভাগ, সমস্ত বিভাগের দারিদ্র হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সমবায় পরিদর্শক আজ বুক ফুলের নিতান্ত 'অতিথি শিল্পী'।

তবুও আজও বিপন্ন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসকে বাঁচাইতে যখন কর্মী সমবায় স্থাপন করা হয়, নন্দনের পিছনের ক্যান্টিনের মহিলা সমবায়টি যখন সার্থকভাবে ব্যবসা করে পরিদর্শক তৃপ্ত হন। গ্রামীণ দু-চারটি কৃষি সমবায় গ্রামোন্নয়নে সার্থক হন পরিদর্শক স্বস্তি পান। তাঁর মনের মধ্যে নিজে বাওয়া সলতেতে আগুন ধরিতে চায় যখন প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামের এক চটকল শ্রমিক নেতা তিন বছরব্যাপী কারখানা চালাইবার জন্য শ্রমিক সমবায়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান। চটকলটির নাম ভালোরিয়া জুট মিল।

কৃতজ্ঞতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী - অশীষ ব্যানার্জী

সমবায় বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি - অশীষ বাগ ❑

সমবায় শিক্ষা তহবিল-একটি অনুরোধ

মূলধন ও মুনাফা সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে সরে এসে সদস্য-কল্যাণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন পথে চলতে না পারলে সমবায় পদ্ধতি কোনদিন সফল হতে পারে না, শোষণ মুক্তির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে না। পরাধীনতা-পরবর্তী সুযোগ-সন্ধানীদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে সমবায়ের সদস্য ও কর্মীদের সমবায় নীতি ও কর্মপদ্ধতি উভয় বিষয়েই ওয়াকিবহাল ও সচেতন হতে হবে। অজ্ঞানতাপ্রসূত অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং বাহ্যিক নানা বাধাবিঘ্নের কথা মনে রেখেই সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎগণ তাঁদের নির্ধারিত 'সমবায় নীতি'র মধ্যে সমবায় শিক্ষাকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন। নিজ স্বার্থেই সমিতি যেন্যার সমবায় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এই ছিল তাঁদের নির্দেশ।

যে কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক ও অবিরাম প্রক্রিয়া এবং একক প্রচেষ্টায় তা সফল হতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাই প্রয়োজন সমবায়মূলক মনোভাব ও সমবেত প্রচেষ্টা। সমবায় সমিতিসমূহের যৌথভাবে একটি সাধারণ তহবিল গড়ে উঠবে, ঐ তহবিল সদস্যদের স্বার্থে, সমিতির স্বার্থে তথা সমবায় আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যয়িত হবে এবং সমবায় আন্দোলন উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে — মূলত এই ভাবনা থেকেই সমবায় শিক্ষা তহবিলের সৃষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে সমস্ত শিক্ষা তহবিল গঠনের নির্দেশ আছে। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীতে প্রত্যেক সমবায় বছরের শেষে প্রতিটি সমবায় সমিতিকে অনধিক সাত হাজার পাঁচশো টাকা সাপেক্ষে নীট লাভের শতকরা পাঁচ টাকা হারে সমবায় শিক্ষা তহবিলে জমা দেওয়ার কথা (নির্ধারিত হিসাব পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে) বলা হয়েছে। এটি হল একটা দিক। অন্যদিকে ঐ তহবিল পরিচালনার জন্য একটি 'কমিটি' গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং কোন্ কোন্ কাজে ঐ টাকা ব্যয় করা যাবে সে বিষয়ে [illegible] নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

আগেই বলা হয়েছে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমবায়ের সদস্য ও কর্মীদের সমবায় নীতি ও কর্মপদ্ধতি — এই উভয় বিষয়েই ওয়াকিবহাল ও সচেতন করে তোলা। শুধুমাত্র সমিতির সংখ্যা বা বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়ন প্রয়াস — সৈনিক বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সামরিক পরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জামের সাহায্যে সেনাবাহিনী গঠনের মতই হাস্যকর ব্যাপার।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার সমবায় সমিতির কয়েক লক্ষ সদস্য ও কর্মীকে সমবায় শিক্ষার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চাই বিরাট পরিকল্পনা, ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি। এই ব্যাপক কর্মসূচির বিশাল আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সমবায় শিক্ষা তহবিলে প্রদেয় টাকা অবিলম্বে জমা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিনয়গোপাল মিত্র
সম্পাদক
সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills — even poultry hatcheries and fisheries — offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,
NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be
important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

সেই প্রাচীন ভারতের আজো
গ্রামের সংস্কৃতি মোছে নি যে
শাড়ী না যায়
হায় লক্ষ্য আছে,
পৌষ পার্বণ আছে
আছে পিঠে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্যান্য বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রভৃতি, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, জেরক্স, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমবায় আদালত বিভাগের দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও সুরেন্দ্রপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

THE STATE BANK OF INDIA STAFF ASSOCIATION CO-OPERATIVE BANK LIMITED

11, Abdul Hamid Street, Calcutta-700 069
Phone : 248-9413, 248-2621, 210-4122
Membership Over 20,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U. P., H. P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (l) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Account allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules
- Loan against NSC/KVP/FD/Recurring Deposit/Unit '64 are given on easy Terms And Conditions.

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Re-investment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি ব্লক সি রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

দূরভাষ : ৩৩৪-৪১৩১/৩৩৪-৫৮৬০

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা

(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ◆ মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ◆ মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ◆ মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ◆ বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ◆ সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ

◆ কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, বেনফিশ বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটি একনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1998-99

Name of the Centre	Sl No	Name of the course	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. UTTARPARA	1	Diploma Course in Coop Management (Continuing)	16 Weeks	20 4 98	7 8 98	55	Institutional Candidates
	2	Sensitization programme on legal literacy for DWCRA Groups	2 days	8.7.98	9 7 98	30	In Collaboration with DRDA, Hooghly
	3	—do—	2 days	13 7 98	14 7 98	30	—do—
	4	Management Dev course for the Directors of PACS	1 Week	17 8 98	21 8 98	30	In collaboration with ICDP Hooghly
	5	—do—	1 Week	24 8 98	28 8 98	30	—do—
	6.	Management Dev Programme for Directors of Primary Fishery Cooperatives	1 Week	7 9 98	11 9 98	30	Directorate of Fishery
		Management Dev Course for Birnish Water Project under NCDC	1 Week		18 9 98	30	In Collaboration with BENFISH
	8.	Leadership Dev Course for Handloom Weavers Coop Society	1 Week		16 10 98	30	Funds C E F C
	9.	S T. Course for Empl Coop Credit Societies			13 11 98	30	Cost to be borne by sponsoring Socys
	10.	Diploma Course in Coop Management.			12 3 99	55	Institutional candidates & Freshers
		Short-term course for Managers of PACS & TSS.			18 12 98	30	In collaboration with Barasat Unit of W B State Coop Bank Ltd
	12.	Spl S. T. Course on Municipal Audit	1 Week		8 1 99	30	Directorate of Coop Audit
	13.	Salesmanship course for Tantuja	2 Weeks		22 1 99	30	In collaboration with W B Handloom Weavers' Coop Soty Ltd
		Management Dev Course for Directors of PACS	1 Week	8 2 99	12 2 99	30	In collaboration with Hooghly D C C B
	15.	Management Dev Course for Marine Fishery.	1 Week	15 3 99	19 3 99	30	In collaboration with BENFISH
	16	Refresher Course for J.B C trained personnel	8 Weeks	22.3 99	14 5 99	55	For Institutional candidates
C. C. M. BARASAT	1.	Diploma Course in Coop. Management (Continuing)	16 Weeks	20.4 98	7 8 98	40	For Institutional candidates & freshers
	2	Leadership Dev. Course - Fishery	1 Week	8.6 98	12 6 98	30	In collaboration with Director ate of Fishery-Funds-C E F C
	3.	Management Dev Course for Dairy Cooperatives.	1 Week	15.6 98	19 6 98	30	In collaboration with Milk Producers Coop Union, Burdwan
		S.T. Course on Deposit Mobilisation for PACS.	1 Week	17.8 98	21 8 98	30	In collaboration with Nadia Dist C C B
	5.	Management Dev. Course for Engineers' Coop. Societies.	1 Week	24.8.98	28 8 98	30	In collaboration with W B Engn Coop Fedn — Course fees to be borne by the sponsoring Coop Society
	6.	Leadership Dev. Course for PACS	1 Week		11 9 98	30	In collaboration with Nadia Dist C C B
		Management Dev Course for Fishery Coops	1 Week		18 9 98	30	In collaboration with FFDA
	8.	Management Dev. Course for Directors of Women Credit Societies.	1 Week		16.10 98	30	Funds C E F C
	9.	S. T. Course on Deposit Mobilisation for PACS.	1 Week		13.11 98	30	In collaboration with Burdwan D C C B. Course fees to be borne by the Socys
	10.	Management Dev. Course for Labour Contract & Cons Coop. Societies.	1 Week		20 11 98	30	In collaboration with W.B. Engn Coop Fedn Course fees to be borne by the sponsoring societies.
		Management Dev Course for Diary Cooperatives.	1 Week	23.11.98	27 11 98	30	In collaboration with Burdwan Milk Producers' Coop Union

Name of the Centre	Sl No	Name of the course	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	12.	Leadership Dev. Course for PACS	1 Week	14.12.98	18.12.98	30	In collaboration with Burdwan D.C.C.B. Ltd.
	13.	—do—	1 Week	28.12.98	1.1.99	30	—do—
	14.	Training Course for the members of SHG.	3 Days	4.1.99	6.1.99	30	In collaboration with NABARD
	15	Management Dev. Course for Dairy Coops.	1 Week	18.1.99	22.1.99	30	Funds : C.E.F.C.
	16.	Management Dev. Course for Industrial Coops	1 Week	8.2.99	12.2.99	30	Course fees to be borne by the sponsoring societies.
		Refresher Course for J.B.C. trained personnel	8 Weeks	22.2.99	16.4.99	40	For institutional candidates
C. C. M. **KALIMPONG**	1	Diploma Course in Coop. Management	16 Weeks	1.6.98	18.9.98	25	For institutional candidates.
	2	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	12.10.98	16.10.98	25	Non-official leaders of Coop. Societies — Funds : C.E.F.C
		Course for DWCRA Group leaders & members.	1 Week	26.10.98	30.10.98	25	In collaboration with Darjeeling Council Rural Development Agency.
	4.	—do—	1 Week	9.11.98	13.11.98	25	—do—
	5.	—do—	1 Week	23.11.98	27.11.98	25	—do—
	6.	—do—	1 Week	7.12.98	11.12.98	25	—do—
	7.	S.T. Course on Dairy Development	1 Week	14.12.98	18.12.98	25	—do—
	8.	S.T. Course for Piggery Development.	1 Week	28.12.98	1.1.99	25	—do—
	9.	S.T. Course for Urban Coop. Banks	1 Week	11.1.99	15.1.99	25	For Empl./Directors of Urban Coop. Bank-Cost to be borne by the sponsoring Banks.
	10.	Workshop on Accounts & Secretarial Practice.	1 Week	1.2.99	5.2.99	25	For Employees of Dist. Coop. Unions — Funds : C.E.F.C.
		Course on B.D.P — DAP	1 Week	15.2.99	20.2.99	25	For Managers of PACS - In collaboration with C.C.Bs.
	12.	Leadership Dev. Course (Women)	1 Week	1.3.99	5.3.99	25	For non-official leaders of Women Coop. Societies Funds — C.E.F.C.
	13	Refreshers Course for J.B.C. trained Managers	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	25	For institutional candidates.
C. C. M. **JHARGRAM**	1	Leadership Dev. Course for CADP-FSCS	1 Week	1.6.98	5.6.98	30	In collaboration with W.B.C.A.D.C.
	2	S.T. Course on Fertilizer Business	1 Week	15.6.98	19.6.98	30	In collaboration with IFFCO.
	3	TRYSEM Course.	1 Week	29.6.98	3.7.98	30	In collaboration with D.R.D.A.
	4	Refreshers Course for J.B.C. Trained Managers	8 Weeks	13.7.98	4.9.98	40	For institutional candidates.
		Course on BDP-DAP.	1 Week	14.9.98	18.9.98	40	For Managers of PACS - In collaboration with C.C.Bs.
		Spl. Course on Municipal Audit	1 Week	21.9.98	25.9.98	30	Directorate of Coop. Audit.
		Course for the employees of Purulia C.C.B.	2 Weeks	12.10.98	23.10.98	30	In collaboration with Purulia DCCB.
	8.	Workshop on Deposit Mobilisation for PACS	1 Week	26.10.98	30.10.98	30	In collaboration with C.C.Bs
	9	Diploma course in Coop. Management	16 Weeks	9.11.98	26.2.99	40	For institutional candidates.
	10.	Management Development Course for Labour/Engineers Coop. Societies.	1 Week	8.3.99	12.3.99	30	In collaboration with W.B. Engineers' Coop. Federation Ltd.
		Refresher Course for J.B.C. trained Managers.	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	40	For institutional candidates.
C. C. M. **JALPAIGURI**	1.	Diploma Course in Coop. Management (Continuing)	16 Weeks	9.3.98	26.6.98	40	Institutional candidates. (Spill Over)
		Course for DWCRA Group Leaders & Members.	1 Week	13.7.98	18.7.98	30	In collaboration with D.R.D.A. Jalpaiguri.
		—do—	1 Week	27.7.98	1.8.98	30	—do—
		—do—	1 Week	17.8.98	22.8.98	30	—do—
		—do—	1 Week	31.8.98	5.9.98	30	—do—
		—do—	1 Week	14.9.98	19.9.98	30	—do—

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the course	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	7	S.T. Course for Panchayet functionaries.	1 Week	12.10.98	16.10.98	30	In collaboration with D.P.O., Jalpaiguri
	8.	—do—	1 Week	26.10.98	30.10.98	30	—do—
	9.	Leadership Dev. Course (Normal)	1 Week	9.11.98	13.11.98	30	Non-official Leaders of Coop. Societies - Funds C.E.F.C
	10.	Workshop on Deposit Mobilisation for PACS	1 Week	23.11.98	27.11.98	30	In collaboration with Cooch-Behar Unit of W.B. State Coop. Bank & Jalpaiguri CCB.
		Course for DWCRA Group Leaders & Members.	1 Week	7.12.98	12.12.98	30	In collaboration with DRDA, Jalpaiguri
	12	—do—	1 week	28.12.98	2.1.99	30	—do—
	13	—do—	1 Week	11.1.99	16.1.99	30	—do—
	14.	—do—	1 Week	1.2.99	6.2.99	30	—do—
	15	—do—	1 Week	15.2.99	20.3.99	30	—do—
	16.	Diploma Course in Coop. Management.	16 Weeks	1.3.99	18.6.99	40	Institutional candidates
C. C. M. **ILAMBAZAR**		4th Diploma Course on Coop Management.	16 Weeks	18.5.98	4.9.98	25	Institutional candidates & freshers
	2.	S.T. Course on fertilizer business.	1 Week	14.9.98	18.9.98	25	For employees of PACS & PAMS - In collaboration with IFFCO
	3.	DWCRA 1st slot	1 Week		17.10.98	25	For Group leaders & Asstt. Group Leaders - in collaboration with D.R.D.A. Birbhum
		Leadership Dev. Course (Normal).	1 Week	26.10.98	30.10.98	25	Non-official leaders of Coop. Socys.
	5.	DWCRA 2nd slot.	1 Week	9.11.98	14.11.98	25	For Group Leaders & Asstt. Group Leaders - in collaboration with D.R.D.A., Birbhum
	6.	DWCRA 3rd slot.	1 Week	16.11.98	21.11.98	25	—do—
	7.	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	23.11.98	27.11.98	25	For employees of PACS - In collaboration with C.C.Bs
	8.	S.T. Course on Business Dev. Plan & Dev. Action Plan.	1 Week	7.12.98	11.12.98	25	For employees of PACS - In collaboration with C.C.Bs
	9.	S.T. Course for employees of Employees' Coop. Credit Societies.	1 Week	14.12.98	18.12.98	25	Cost to be borne by sponsoring Cooperatives
	10.	S.T. Course on Consumer Business of Employees Coop. Credit Societies.	1 Week	4.1.99	8.1.99	25	For employees of PACS & Consumers' Socys. - In collaboration with C.C.Bs
		Leadership Dev. Course for Weavers' Coop. Societies.	1 Week	18.1.99	22.1.99	25	For non-official leaders of Handloom Coop. Socys. Funds : C.E.F.C
	12.	S.T. Course on Employees & Leaders of Industrial Societies.	1 Week		12.2.99	25	For employees & leaders of Industrial Socys. (In collaboration with Dist. Industry Centre, Birbhum)
	13.	S.T. Course on B.D.P. & D.A.P.	1 Week	22.2.99	26.2.99	25	For employees of PACS & PAMS & Supervisors of Birbhum Dist. Central Coop. Bank
	14.	DWCRA 4th slot.	1 Week	8.3.99	13.3.99	25	For Group Leaders & Asstt. Group Leaders (In collaboration with D.R.D.A. Birbhum)
	15.	DWCRA 5th slot	1 Week	15.3.99	20.3.99	25	—do—
	16.	Refresher Course for J.B.C. trained personnel.	8 Weeks	22.3.99	14.5.99	25	For institutional candidates.

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬		১০৩			১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(-) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৩৯০৪.৫৯	(-) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, ভাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

সমবায় সমাচার

"সমবায় বাঁচে গণতন্ত্রে — সমবায় মরে গণতন্ত্রের অভাবে" — শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত কেন্দ্রীয় সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী গত ২১ এপ্রিল (১৯৯৮) ঐতিহ্য-মণ্ডিত ভারত সভা ভবনে তাঁর দীক্ষান্ত ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রতি বছরের মত এবারও মূলত তিনটি উদ্দেশ্য সাধনে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য তিনটি হল : পশ্চিমবঙ্গের ছটি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রবুদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের উপাধিপত্র ও পুরস্কারের দ্বারা প্রেরণা সঞ্চার — মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিভিন্ন জেলাস্তরের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র ও পুরস্কারের মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন — সমবায় শিক্ষা তহবিলের আইনানুগ প্রাপ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণকারী বিভিন্ন সমবায় সংস্থা, বিভাগীয় দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের পুরস্কৃত করে স্বীকৃতি জ্ঞাপন।

শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে নিকট ও দূর হতে সমাগত সভাগৃহে স্বাগত জানিয়ে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র বলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয় — সমবায় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদানই তার কাজ। সৃষ্টিসুখের সম্ভাবনায় সতত সচেতন এই সমবায় ইউনিয়নের বাৎসরিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যে আয়োজনের বাহ্যিকসুলভ আড়ম্বর ও বিকাশের বাহুল্য না থাকলেও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা অবশ্যই আছে। সত্যকে যেমন নিজের আলোকে দেখা যায় সমবায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রচারের প্রয়াস তাই হয়তো কেন কম। আর সেই কারণেই সীমাহীন সম্ভাবনাময় সমবায়ের পদচারণা আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে যেন হারিয়ে যাচ্ছে বলে মাঝে মাঝেই মনে হয়। কিন্তু সমবায় হারাবে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষে সমবায় সদস্যের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোন দেশের থেকে বৃহৎ। তবে সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্বের পিঠোপা নিয়ে বিশ্বের সমবায় দরবারে গুণগত সম্মানের আসন পেতে হলে ভারতের সমবায়কে এখনও অনেক পথ পরিক্রমা করতে হবে। আর তখনই লাগবে সমবায় গড়ার প্রবুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত কারিগর — নতুন প্রজন্মের অধিবিদ্যা সমর্থনপুষ্ট সমবায় অনুকূল জনমত এবং প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত সহায়ের পরিষেবা। স্বাগত ভাষণে শ্রীনিত্র অনুষ্ঠানের মূল সুরটি সুন্দরভাবে বেঁধে দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসনে ছিলেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। সভাপতির ভাষণ শুরু করার আগে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত অনুষ্ঠানোজ্জ্বল মঞ্চে আসীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে পুষ্পস্তবকে দিয়ে সমর্থনা জ্ঞাপন করা হল। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, নয়া অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশে সমবায়কে অনিবার্যভাবে সঙ্কট করে এগোতে হবে তবে যদি ব্যাপকতা না আনা যায় তাহলে তা নকল সৌখিন প্রজাপতির নামান্তর হিসাবেই বিবেচিত হবে। পরিণামে আন্দোলন বিস্তৃতি না পেয়ে শুকিয়ে যাবে। দুষ্টিনের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে সমবায় ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা কুক্ষিগত রেখে সমবায়ের বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বাইরে রাখার ঔপনিবেশিক প্রবণতা পরিহার করার সময় এসেছে। প্রথাগত শিক্ষার অঙ্গনে সমবায়ের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু হলেও তা ঠিক কিছু পথে যায়নি। তার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রবর্তন বিষয়ে ডি. ভি. নরসিমহা কমিটির (১৯৭২-৭৭) প্রতিবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মুখপত্রে সম্যক প্রচারিত হয়ে যেতে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৩ সালের ২১ অক্টোবর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অমিতাভ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের তদানীন্তন সভাপতি ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় যে কমিটি গঠন করেন তার মূল্যায়ন ১৯৮৫ সালের ২০ অগস্ট লক্ষিত করা হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ৯টি পাঠক্রম সহ এক বছর ও ছয় মাস স্থায়ী দুটি ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠক্রমও এই কমিটির মূল্যায়নের মধ্যে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই কমিটি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন সমবায়মন্ত্রী ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক

কেন্দ্রীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষণ দিচ্ছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী। পাশে উপবিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ।

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সমবায় সার্বিকভাবে না হলেও কিছুটা যে আর্থিক ও সামাজিক স্থিতি দিতে পারে সে সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। পৃথিবীর ১৯২টি দেশে অনুসৃত আর্থিক নীতির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও সমবায় মতবাদের আসন সর্বত্রই বিছানো আছে। তার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে পরিপূর্ণ আত্মিক উপলব্ধি প্রয়োজন। আর এই উপলব্ধির মধ্যে

নির্মল বসু। আবার ১৯৮৫ সালের ২৯ নভেম্বর কমিটির সুপারিশের অনুলিপি সরকারের বিবেচনার জন্য যখন ইউনিয়ন সভাপতি হবিদাস মুখার্জি পেশ করেন তখন নীহার বসু ছিলেন সমবায়মন্ত্রী আর অধ্যাপক নির্মল বসু ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ও তৎকালীন উচ্চশিক্ষার ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী। উভয়ের হাতেই ঐ তারিখে প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা দুজনেই আজ প্রয়াত। পশ্চিমবঙ্গের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটল না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী রবীন্দ্রনাথের নিজের রাজ্যের কাছে এ বড় আফসোসের ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই সভাপতি শ্রীঘোষ রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আবেদন রেখে বলেন, তিনি যেন এবিষয়ে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে ও অন্যত্র পরোক্ষভাবে তাঁর সহৃদয় প্রভাব বিস্তার করেন।

উপাচার্য ড. চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে শুরুতেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সমবায়ী রবীন্দ্রনাথের সমবায় মননের উৎস সন্ধান করে দেখিয়েছেন অধিনব এই আধুনিক পুরুষটি শুরুতেই সমবায় ভাবনার অনুষ্ঠান আবেদ : সমবায়াধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। গণতন্ত্রকে ওপরতলার ভাবনা থেকে তৃণমূলে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রচেষ্টা চলছে। ত্রিভাবে তার প্রকাশ : স্কুল কলেজের বিদ্যানিকেতনে রয়েছে সামাজিক গণতন্ত্র পঞ্চায়েতে প্রতিফলন ঘটেছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের আর একমাত্র সমবায় আন্দোলনই পারে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বহু প্রতীক্ষিত স্বপ্নকে সফল করতে। অভাব অভাব ও বিভেদ-বেদনার অবসানে একান্তভাবে সমবায়কেই সামিল করতে হবে। অনিবেদ আগুন নেভাতে জলাশয়ের আর্থিক কাজটা একমাত্র সমবায়ইতো করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লেখায়, কথায় ও কাজে যার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন — যে ইচ্ছা ও আবেগ নিয়ে গান্ধীজি (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রার্থনা সভায় প্রাণ দিলেন — সারা ভারতকে সমবায় মতবাদ দ্বারা আন্দোলিত করার যে অঙ্গীকার জাতির উদ্দেশ্যে জওহরলাল (১৮৮৯-১৯৬৪) বারবার ঘোষণা করেছেন সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন-রঞ্জিন সমবায় কিন্তু কথায় কথাই রয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতের অর্থনীতিকে সমবায় মতবাদ এখনও সেভাবে প্রভাবিত করতে পারল না। পরাধীন ভারতে ইংরেজ সমবায়কে স্বাধীনতা দেয়নি। ভয় ছিল তা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে মদত দেবে। রবীন্দ্র প্রত্যাশিত সমবায়ের সাথে জওহরলাল প্রভাবিত সমবায়ের বিশেষ কোন তফাত তারতম্য ঘটল না। সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সিক-চক্রবালের বাইরেই রয়ে গেল। উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা কায়েমি স্বার্থ সমবায়ের ক্ষেত্রে একাধিক অন্তরায় সৃষ্টি করে ইপ্সিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বিড়ম্বিত করছে — বাজার প্রাচীর তুলে তাকে নির্লজ্জ ভাবে বিলম্বিত করছে। এক্ষেত্রে প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রমে সমবায়ের একটা প্রসারী প্রভাবের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। সে বিষয়েও অদ্যতাবধি কর্তৃপক্ষ উদাসীন। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে পরিবেশ সম্পর্কে পাঠ প্রবর্তিত হয়েছে — মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মানবাধিকার সম্পর্কিত পাঠও প্রবর্তনের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছেন। কিন্তু সমবায় পাঠের মধ্যে পরিবেশ প্রতিফলিত ও মানবাধিকার সুরক্ষিত হলেও তার দিকে আমরা এক আত্মঘাতী অবহেলার অলস চোখে শুধুই তাকিয়ে আছি। অথচ সমবায়তো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। গত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ সমবায়ের সংজ্ঞা, নীতি ও মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করে সমবায়ের যে পরিচিতি বিশ্বের সমবায় অনুরাগী মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছে রবীন্দ্রনাথ তো সেই একই কথা সহজ ও কোমল ভাষায় অনেক সরলভাবে ৭০ বছর আগেই শুনিয়েছিলেন। আমাদের চেতনার বৃহত্তর উপলব্ধিতে সে বাণী যে এখনও কেন আনুষঙ্গিক কর্মযোগ সৃষ্টি করল না তা কিন্তু পরিতাপের বিষয়। যাই হোক এখনও সময় আছে।

বিদ্যানিকেতনের পাঠক্রমে সমবায় পাঠ প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ড. চক্রবর্তী দৃঢ়তার সাথেই তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বিদ্যালয় পর্যায়ে সমবায়কে পাঠসূচির মধ্যে আনার জন্য সরকার, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সংসদের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ সাধন করে লেগে থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুকূল্য অর্জন করতে হবে। তার সাথে সমবায় বিষয়ক উপযুক্ত পাঠপুস্তক রচনার ওপর যেমন জোর দিতে হবে তেমনি সমবায়ের পাঠ নেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থানের যে প্রত্যাশা থাকে সে পথও খোলার কথা উপাচার্য স্মরণ করিয়ে দিলেন। আর বিদ্যানিকেতনে সমবায় পাঠক্রম প্রবর্তনে তাঁর যতটুকু করার আছে তা তিনি সাধ্যমত করবেন বলে আশ্বাস দেন।

এরপর শুরু হয় পুরস্কার দেওয়ার পর্ব। পুরস্কার প্রদান করেন উপাচার্য ড. ওভর চক্রবর্তী, সভাপতি সুনীল ঘোষ, সহ-সভাপতি দিলির গুপ্ত ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র। এবিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তচালিত তন্তুবায় সমবায় সমিতি (তন্তুজ)।

পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি দিলির গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের সমবায়মূলক চিন্তাধারার অনুসারী হয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মে ব্রতী হতে অনুরোধ করেন আর সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

❑ অমীয় সাহা

"কাজের মধ্যে ত্যাগ ও সেবার মানসিকতা চাই"

- স্বামী সর্বলোকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান স্টাফ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে গত ৩০ মে, ১৯৯৮ সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ত্যাগ শব্দের ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করে বলেন, বৃহত্তর স্বার্থের সর্বজনীন তাগিদে শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থকেই ত্যাগ করতে হবে আর কিছু নয়। আর প্রতিটি কাজই হল সেবা যদি তার মধ্যে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব থাকে। আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করি, তাতে যদি উদ্দেশ্যের মহত্বটুকু প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে সার্বিকভাবে সমাজ ও সংস্থার আকাঙ্খিত ফললাভে সক্ষম হবে।

অপর বিশেষ অতিথি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় আবাসন ফেডারেশনের সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ দত্ত আবাসন সমস্যার সমাধানে

সার্বিকভাবে সমবায়ের ভূমিকা ও আবাসন ফেডারেশনের অবদান সম্পর্কিত আলোচনায় জনগণের সামগ্রিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায় আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের সাতটি সমবায় নীতির ব্যাখ্যা ও তাদের বিশ্বব্যাপ্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি তপন ব্যানার্জি। বিশিষ্ট সমবায়ী ও আবাসন ফেডারেশনের পরিচালক পার্থ সেনগুপ্ত অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা ও বক্তৃতা ছাড়াও বিভিন্ন বৌদ্ধিক ও বিনোদনমূলক উপকরণের সমাবেশ অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বাড়িয়েছিল, যেমন স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ কর্তৃক সমিতির স্মরণিকা প্রকাশ — সদস্যদের কৃতি পুত্র কন্যাদের পুরস্কার প্রদান — প্রতিটি আলোচনার স্বল্প বিরতিতে আবৃত্তি, কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত পরিবেশন প্রভৃতি।

❐ অসীম রায়

প্রবীর সেনগুপ্ত সমবায় ভবন উদ্বোধন

প্রবীর সেনগুপ্ত জেলার পাখিরা নামে পরিচিত। প্রাক্তন বিদ্যুৎ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পমন্ত্রী প্রয়াত প্রবীর সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যু দিবস উদ্‌যাপন (২রা এপ্রিল) উপলক্ষে দি হালি-চুঁচুড়া আদর্শ কো-অপ-সেবায় কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সমিতি, ত্রিবেণী, হুগলি তাঁদের সমবায় ভবনটি প্রয়াত প্রবীর সেনগুপ্তর নামে উৎসর্গ করেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। প্রবীরবাবু শুধু রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী ছিলেন না, তিনি যে একজন বড়মাপের সমবায়ী ছিলেন এবং সমবায় সম্পর্কে তাঁর বিরাট জ্ঞান ও অবদানের কথা অনেকেরই জানা ছিল না।

এদিন সমবায় ভবনের দ্বার উদঘাটন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় রূপচাঁদ পাল পাখিরার অতীত স্মৃতিচারণ করে বলেন ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের ঠিকাদারদের গোলমাল করতে পাখিরা সেখানে সমবায় গড়েন। এমনকি সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি সদস্যদের মধ্যে রীতিমত ক্লাস নিতেন। তাঁর নিজে হাতে গড়া সমিতিগুলোকে বাঁচাতে ও নতুন নতুন সমিতি গড়া ও তাদের কাজ চালানোর জন্য এই ভবন সহায়ক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে এই কামনা করেন সাংসদ শ্রীপাল।

ভবনের ফলক উন্মোচন করেন বিনোদ দাস।

বি টি সি এস-এর জেনারেল ম্যানেজার বলদেব ঘোষ প্রবীরবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎ প্রকল্পের স্থায়িত্ব ও চালু রাখার ব্যাপারে তাঁর অবদান বিরাট। তাঁর অনুপ্রেরণায় ৮২ সালে প্রকল্পের পাঁচটি ইউনিট চালু হয় একেবারে নির্দিষ্ট দিনেই। তিনি এই সমিতির কাজকর্ম ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রশংসা করেন।

❐ সন্তোষ ভট্টাচার্য

বড়গুলে নতুন শিক্ষাক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

সম্প্রতি সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বড়গুলে শুরু হয়েছে 'ডিপ্লোমা কোর্স ইন কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট'। পাঠক্রমটির বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং-এর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাকুরিরতদের পাশাপাশি এই সর্বপ্রথম নবাগত ছাত্রছাত্রীদেরও অধ্যয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রথম শিক্ষাক্রমটিতেই মোট দশজন নবাগত ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছে।

গত ৪-৫-৯৮ তারিখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণক্রমটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ। উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি বলেন যে 'সমবায়কে এখনও কলেজ বা ইউনিভার্সিটির পাঠসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনাধীন সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলি ছাড়া অন্য কোথাও সমবায় বিষয়ক বৃত্তিমূলক শিক্ষারও কোনও ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থায় বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে নবাগতরা যাতে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা বা অগ্রাধিকার পায় সেই কথা ভেবে এই প্রশিক্ষণক্রমে নবাগতদেরও অধ্যয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিও এ ব্যাপারে অগ্রসহায়িত হবে, কারণ নিয়োগের সময় প্রশিক্ষিত কর্মী পেলে তারাও উপকৃত হবেন। এই মর্মে তাদের 'রিক্রুটমেন্ট কোটা' বা 'সার্ভিস কোটা' প্রয়োজনীয় রদবদল করতে অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের তরফ থেকে চিঠিও দেওয়া হচ্ছে বলে শ্রীঘোষ জানান। তিনি বলেন, এইভাবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতই উপকৃত হবে এবং তাদের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে। তিনি এই প্রশিক্ষণক্রমের অন্যান্য বিষয় — পাঠ্যসূচি, পঠন-পদ্ধতি, মূল্যায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাদের সকলের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং-এর সহসচিব বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রদের ছবি তোলেন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মলিনা পালিত।

ইলামবাজারের আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সভা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের জন্য গঠিত অঞ্চলভিত্তিক কমিটির প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪ এপ্রিল সমবায় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, ইলামবাজারে।

ওই সভায় নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির (ক্যালেন্ডার অফ কোর্সেস) সুষ্ঠু রূপায়ণের বিষয়ে এবং বিশেষ করে প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণক্রমে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর যোগদানের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। সভায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা হয় এবং কেন্দ্রটির অন্যান্য সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য গৌতম ঘোষ এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র, বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহ-নিবন্ধক, স্টেট কমিটি ফর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং-এর সহসচিব এবং ওই ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ এই সভায় যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ।

❐ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
53-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ June-98 ■ Vol. XXXVI ■ Postal Regd. No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭১৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
* ৩৯টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
* ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
* মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
* সাহায্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে ৮৮-৫৯ কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অটবলা), কলিকাতা:-৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণ প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলি-১২ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

ভোজ্য

শারদীয় ১৪০৫

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ
২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস :
ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :
ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাজরাবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

শারদীয় ১৪০৫

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৩২৫ বঙ্গাব্দ/১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৯৮

সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	:	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	:	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	:	সদস্য
সুভাষ রাহা	:	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	:	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	:	সদস্য

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

প্রচ্ছদ শিল্পী : মানবসাধন বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন : ২২০- ৮১৯৮

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

উপন্যাস

বিনয়গোপাল মিত্র ❐ অসময়ে সময় নেই ১৩

প্রবন্ধ

সুনীল ঘোষ ❐ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের অসুখী উত্তরাধিকারী ৫

প্রভাত ভট্টাচার্য ❐ সঠিক নেতৃত্বই উন্নতির চাবিকাঠি ৯৫

তরুণ সান্যাল ❐ প্রকৃতির নির্বাচন ১০৯

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু ❐ 'আজ জগতের বড় দুর্দিন' : প্রসঙ্গ প্রেম ৬৭

ভোলানাথ দত্ত ❐ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও রিও-র উইল ১৮২

পরিমল চৌধুরী ❐ সত্যের সন্ধানে ৭১

অসীম রায় ❐ সারস্বত নদীয়ায় সমবায় লক্ষ্মীর আরাধনা ৩১

বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ❐ ইন্টারেস্টিং ৭৭

শ্যামল মৈত্র ❐ জন্মশতবর্ষে নজরুল ৭৩

দীপালি ঘোষ ❐ হাতিপাওয়ার সবুজায়ন ৮৩

গৌরহরি বসু ❐ শিশু শ্রমিক ১২১

অরুণোদয় সরকার ❐ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সমবায় সমিতি ১৩৭

অমিয় মজুমদার ❐ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন ১৬৪

ড. দুলালচন্দ্র সেন ❐ পান বৃত্তান্ত ১৯০

অনুবাদ গল্প

মানবসাধন বিশ্বাস ❐ চার টাকা ৩৯

অসিত মজুমদার ❐ যে রাতে আমার ডাক এসেছিল ৪৯

গল্প

দেবেশ রায়	❐	একই নিয়মে অঙ্কও
দীপ ভট্টাচার্য	❐	চাঁদের অন্ধকার
দিব্যেন্দু পালিত	❐	হিমঘরে অগ্ন্যুৎপাত
বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	❐	আগন্তু
জীবন সরকার	❐	সমুদ্রনদী
প্রদীপকুমার ভাদুড়ি	❐	অন্য পথের খোঁজে
সমরেশ বসু	❐	নেগেটিভ

ভ্রমণ-কাহিনী

শ্যামসুন্দর ঘোষ	❐	সমুদ্র আমাদের ঢেকে রেখেছে
		ফুটবলের গল্পে ছবি
অরুণ বসু	❐	মজার খেলা? না মরণ খেলা!
অর্ঘ্য ঘোষ	❐	টেরাকোটা ফুটবল এবং এরাবের বিশ্বকাপ

ভ্রমণ-কাহিনী

নবকুমার ঘোষাল	❐	মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	❐	এই আঁধারে
কৃষ্ণ ধর	❐	এ গান তার শুনতে প্রয়োজন
আনন্দ ঘোষ হাজরা	❐	উৎক্ষেপণীয়তা
মল্লিনাথ পলাশগুড়	❐	পরিচিন
নজরুল ইসলাম	❐	একা
শীতেন সাহা	❐	ফেউরা
প্রদ্যুম্নসুন্দর ঘোষ	❐	অভিমান
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	❐	এক নড়বড়ে টেবিল
হিরণ্ময়ী মৈত্র	❐	সেই দিন
অপরাজিতা খেয়ালী	❐	কে কোথায় নিদ্রামগ্ন
মল্লিনাথ পলাশগুড়	❐	রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়
শুভ্রা মুখোপাধ্যায়	❐	অনেক কথা বাকি
গৌতম হাজরা	❐	ভ্রমণ কাহিনী
কাজী মুরলিদুল আরেফিন	❐	জন্মদিন
অদিতি বাইরী	❐	বৃষ্টির জানলা
উমি দে	❐	ফিরে দেখা
মাসুদের চাটার্জি	❐	সান্নিধ্য
প্রবীরকুমার সামন্ত	❐	উপেক্ষা
অমিতাভ দাস	❐	আলো আমার পায়ে বেড়ি হতে দেবেন
সৌভেন্দু রায়	❐	অন্য এক সূর্যের শপথে

মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন

পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৭২। শারদ আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত এ-সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশ থেকেও জল ঢুকছে। পশ্চিমবঙ্গের সব নদীতেই জল বাড়ছে। ভীষণ ভয়াবহ রূপ এবারই যে সেনাবাহিনীও ত্রাণে নেমে বাধার সম্মুখীন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন। দিনে-রাতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পানীয় জলের সঙ্কটের সাথে রাতের অন্ধকার ভয়ঙ্করতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে শারদোৎসব এসে গেল। উৎসবের আয়োজনও চলছে। এই আয়োজনের ভাঙারে আসুন আমরা সবাই ভাবি বানভাসি দুর্গত মানুষদের কথা। তাঁদের পাশে দাঁড়াই মানসিক ও আর্থিক শক্তি নিয়ে পূজার আড়ম্বর ও পূজা উপলক্ষে পারিবারিক ব্যয়ের বাহুল্য বর্জন করে। ব্যয় বরাদ্দের বেশির ভাগ বন্যাত্রাণেই এখন আমাদের দান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি অংশের কষ্টকে আমরা যেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কষ্ট বলে ভাবি।

এ-বিষয়ে সমবায় সমিতিগুলির দায়িত্ব রয়েছে সবার আগে। তার অন্যতম মৌলিক নীতি হল "সমষ্টির জন্যে ভাবনা"। এ নীতি আন্তর্জাতিক। সমবায় সংস্থাসমূহের সদস্য ও কর্মী-নির্বিশেষে সমবায় সংস্থাগুলিকেও এই নীতির অনুসারী হয়ে বন্যাত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে যথাসাধ্য দান করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের হাত এখনও প্রসারিত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

সব দেখে, সব জেনে, সব বুঝে আমরা থাকব স্থির। বলব ভাল আছি।

সারা বৎসরের একঘেয়ে 'কেমন আছেন'? শুনতে শুনতে পুজোর নতুন জামাকাপড়ের সাথে আসবে নতুন প্রশ্ন — 'পুজো কেমন কাটল'? 'পুজোয় কোথায় যাচ্ছেন?' যদি অস্বস্তিতে পড়ি তবু মনে হবে কুশল বিনিময়ের তাগিদে এ-প্রশ্নগুলো বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে। সমীরণের বাবার সাথে দেখা হয়েছিল সকালে। কুশল বিনিময়ও হয়েছিল। সন্ধ্যায় সমীরণের বন্ধু কৌশিকের কাছে হঠাৎই জেনেছিলাম সমীরণ গত কয়েকদিন ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণায় হাসপাতালে দিন কাটাচ্ছে। শোভনার মা নেই। বাবার সুরাসারে সন্ধ্যারতি। মেয়ে হয়েও সন্ধ্যার পর বাবার কাছে যাওয়ার তার সাহস হয় না। শোভনার মামা জানেন তাঁর ভগ্নিপতি ভাগ্নির নিরাপত্তার জন্য সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফেরেন। মানবের সংসারে ঘোর দুর্দিন। শ্রমিক আন্দোলনের জেরে কর্মহীন। দিনরাত কঠিন সংগ্রামে কোনরকমে যদি একবেলা খাওয়া জোটে! ঘরের বাইরে এলে পাড়া পড়শির সাথে কুশল বিনিময়ের ঘাটতি নেই। কেউ জানে না মানবের এখন কী অবস্থা। এমনি করে আমরা চলছি, হয়ত চলবও। পথে চলতে চলতে কিম্বা টেলিফোনে, অফিসে বা বাজারে দেখা হলে ভাবলেশহীনভাবে বলি 'ভাল আছি'। আন্তরিকতা নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই, ঘরে ঘরে যাতায়াত নেই ; সঙ্কোচ আর সঙ্কীর্ণতায় ঘেরা এ-জীবন। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের অভাব আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হওয়া থেকে দূরে রাখছে। নিজের তৈরি পরিমণ্ডলে হতাশা কেন আবদ্ধ হয়ে আছে বাইরে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই তাই সুস্থতাও নেই। নানাবিধ বিকার ঠাঁই পাচ্ছে আমাদের আচার আচরণে।

শারদীয় মিলনোৎসবের দিনে আমরা আনন্দ ভাগ করে নেব। উদারভাবে সবার কাছে সবার সাথে শ্রদ্ধা বিনিময় করব। পুজোর দিনগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা যেন রিক্ত না হই। আমরা যেন সমাজে সংসারে ফিরতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম (W.B.F.C.)-র উজ্জ্বল ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শিল্প উদ্যোগের জন্য আপনার কি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন? **পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগমের** কিন্তু আপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজ আছে। আমরা কোন নতুন শিল্প / পরিষেবামূলক ইউনিট স্থাপন অথবা আপনার চালু ইউনিটটি ভিন্নমুখীকরণ / আধুনিকীকরণ / সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি।

ডব্লিউ বি এফ সি প্রযুক্তি, পরিচালনা এবং আর্থিক বিষয়গুলিতে পরামর্শ (প্রকল্প সম্পাদন যোগ্যতা প্রতিবেদন সহ) সুনিশ্চিত করবার জন্য সুদক্ষ অফিসারগণকে নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি পরামর্শদানের সেল গঠন করেছে।

রাজ্যের সর্বত্র শাখাগুলি (১৪টি কেন্দ্রে) আপনাকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক কার্যালয়টি উত্তরবঙ্গ এবং জেলাগুলিতে নিগমের কাজকর্মের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখে চলেছে।

আরও বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের জেলা শাখা কার্যালয়গুলিতে অথবা ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ঠিকানাস্থিত প্রধান কার্যালয়ে লিখুন / চলে আসুন।

- ★ রপ্তানিসহ বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণে ঋণের ব্যবস্থা।
- ★ ভিন্নমুখীকরণ, নতুন পণ্য উৎপাদনের উন্নয়ন ও দ্রুত পরিষেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান।
- ★ চালু ও লাভজনক সংস্থার Viable Project-এ ERS/ECFS প্রকল্পে ৭ দিনের মধ্যে ঋণের ব্যবস্থা।
- ★ নতুন প্রকল্পগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পরিষেবার ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম

প্রধান কার্যালয় : ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৪র্থ ও ৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১

টেলিফোন : ২২০-০০৫৫, ২২০-৩২৫৯, ২২০-৪৯৫৪, ২২০-৩০৮৩ ★ **ফ্যাক্স :** (৯১) (৩৩) ২২০-১২৫০

আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি, পিন - ৭৩৪ ৪০১

টেলিফোন : (০৩৫৩) ৪২৬৬১৫

প্রবন্ধ

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের অসুখী উত্তরাধিকারী

সুনীল ঘোষ

প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতীয় নাগরিক অবশ্যই দ্বার্থা অটলবিহারীর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করেন না অথবা তাঁর অন্তত নন এতদিনে একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, তাঁর চেয়ে অসুখী প্রধানমন্ত্রী সিংহের গদিতে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর কেউ আসীন হননি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর চলন-বলন, কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও কেতাদুরস্ত জীবনযাত্রা তাঁকে এবং তাঁর সদ্য স্বাধীন দেশকে এক নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। যদিও দেশনায়ক হিসাবে তাঁর চিন্তাধারার অনেকখানি সুদীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থেকেও রূপায়িত করতে পারেননি তবু তাঁর কিছু কিছু অবদান, যেমন মিশ্র অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতি, বিদেশ নীতি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে জোটবদ্ধ করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার প্রয়াস প্রভৃতি দেশবাসী এখনও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা তৈরি করা, নিজের ইচ্ছামত নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তিনি ভোগ করে গেছেন। দেশের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের ভূমিকা পালন করে গেছেন এবং বিদেশেও যথাযথ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আমার মনে হয় গান্ধীজির জীবনী ও কাজকর্ম নিয়ে যেমন কেউ কিছু নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে অনুরূপ অনেক উপাদান আছে যা নিয়ে নেহরু সম্পর্কেও একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রূপালী পর্দায় ছবি তৈরি করা যায়। বিশ্ব রাজনীতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপে অবশ্য জীবনের শেষদিকে কার্যত তিনি বিমর্ষ, বিজিয় ও একক হয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টি ও সরকারের নেতৃত্ব নিজের কব্জায় থাকায় জন্য তিনি সবসময়ই স্বাধীনভাবে দেশের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে গেছেন এবং এ জন্য কোনো দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।

সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের উচ্চক্ষমতাসীন নেতৃত্বের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিতে হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে। তাঁর পূর্বসূরি নেহরুর ন্যায় প্রশ্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়েও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন মূলত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভাবমূর্তির জন্য। দল অথবা সরকারের উচ্চপদে আসীন হওয়ার উদগ্র বাসনারও কোনো পরিচয় তাঁর আচরণে ছিল না, তাপসিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই ছিল তাঁর পছন্দ। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তান এই সময়ে নেহরু-নেতৃত্বের অভাব এবং চিনের সঙ্গে সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে, কিন্তু বাহ্যত দুর্বল দেখা লালবাহাদুর অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তার সমুচিত জবাব দেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা অবশ্য তাঁকেও পোহাতে হয়নি।

অতঃপর এলেন ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রথম দিকে স্বাধীনভাবে চলতে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলেও অবশেষে দলকে দুটুকরো করে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং অচিরে ক্ষয়িষ্ণু দলের উপরও অপ্রতিহত স্থাপন করে দলকে টেনে তোলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এরপর থেকে ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি

কংগ্রেস দলকে তিনি রক্ষণশীল নেতৃত্বের কবল থেকে মুক্ত করে বামপন্থীদের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে আনা, রাজন্যভাতা বিলোপ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে মুক্তির সহায়তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের করলমুক্ত করা প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী শাসকের পথ গ্রহণ করে জনগণের রায়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য এবং নিজের দল সংগঠনশক্তির সাহায্যে তিনি অল্পকালের মধ্যেই হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্তির জন্য মোরারজী দেশাইকে প্রায় সারাজীবনই অপেক্ষা করতে হয়। জনতাদলের অভ্যন্তরে তিনি অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন না, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের বদান্যতায় তিনিই প্রধানমন্ত্রী হন। এতে তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁর সন্তুষ্টি বিধান ঘটত না। তিনি ছিলেন কঠোর, নিয়মনিষ্ঠ এক ব্যক্তি। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির অনেকটাই তাঁর নিজের সৃষ্টি। তিনিও ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একক।

রাজীব গান্ধী অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী পদের সুখ টুটিয়ে ভোগ করে গেছেন। বয়সে তরুণ, মাতামহ ও মাতার উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছুটি কাটিয়েছেন কখনও মালদ্বীপে, আন্দামানে অথবা বলখাল্যে। জনসংযোগের নামে রাজস্থানের মরুভূমির বুক চিরে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেছেন, বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। একই বিদেশ বিমানে বিল্লি-মস্কো-ওয়াশিংটন ছুটেছেন, কখনও হয়েছেন অতিথি আবার কখনও অতিথি-সেবক তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছি করেছেন। মন্ত্রিসভা গঠন করতে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি পছন্দের লোকেরা অনায়াসেই চান্স পেয়ে গেছেন। রাজধানী দিল্লির হাল-চাল হাতে গঠিতে নিজে গাড়ি চালিয়েছেন রাজনীতিতে উচ্চ আসন এবং প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেও এই পদটিতে তিনি যথেষ্ট সুখ, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দ উপভোগ করে গেছেন এবং এই বিষয়টি নিজের স্ত্রী ও পরিবারের মধ্যেও সঞ্চারিত করে গেছেন। কোনো কারণে পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করেও প্রার্থমিকভাবে যোগ্যতা সমিতির কাছে হয়ে হতে হয় বলতে বাধ্য হননি।

ইন্দিরা গান্ধীর পতনের পর জনতা সরকার গঠনের সময় থেকেই চন্দ্রশেখরের লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতি। কিন্তু মুরারজী প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে সরিয়ে কংগ্রেস সমর্থনে তিনি সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এতে তিনি তার খুশি খুশি ভাব শেষ রাখতে পারেননি যদিও তাঁর তরুণে বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিদেশ ভ্রমণ অথবা বিশ্ব সমস্যা সমাধানের সুযোগ ঘটেনি তবু পর পর দুজন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং ইসলামিনে কথাবার্তা হত-বলে শোনা যায়। এর জন্য বিদেশ দূত হিসাবে দলবন্ত সিং-এর প্রয়োজন হয়নি। অতঃপর কয়েকমাস আগে তিনি ভোঁড়সির আশ্রম থেকে

এসেছিলেন পুনরায় সেখানেই ফিরে যান। একসময় রাজধানীতে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী বলে প্রচারিত ছিল যে, তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবেন।

বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের পর বেশি খুশি হয়েছিলেন, না পদত্যাগ করে বেশি খুশি হয়েছিলেন বোঝা দুষ্কর। কিন্তু যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর হাতে ছিল। তিনি যা চেয়েছিলেন তাঁর সবই কাজে পরিণত করেছিলেন, হয়ত অনেকেই তাঁর অনেক কিছু পছন্দ নাও করতে পারেন। তাঁর মুখ ছিল ভাবলেশহীন, কিন্তু লোকসভায় তাঁর শেষ ভাষণ, "নিষ্ঠুর পৃথিবী বিদায়" চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নরসীমা রাও-এর মুখটি ছিল ওমোট-গম্ভীর, দেখে বোঝা যেত না খুশি না অখুশি, কিন্তু অনুমান করা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর পেয়ে তিনি বেশ খুশিই ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব ছিল ভাগ্যেরকালের রাজাদের মত ঈশ্বরদত্ত অধিকার, কেন না তিনি দীর্ঘদিন পার্লামেন্টের সদস্যপদে এবং কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস দলের প্রতি কোনদিনই আনুগত্যের অভাব দেখা যায়নি। আর রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে তিনিই সবচেয়ে লাভবান হয়ে গেলেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উদারীকরণের বিষয়টি ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে, তা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপরতা দেখাতে পারেননি যার মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতগ্রাহ্য বহু অপরাধ করেক বছর ধরে জমা হয়ে আছে, কিন্তু একটারও ফয়সালা হয়নি এবং আশঙ্কা করা যেতে পারে হবেও না, যেমনটি হয়েছে তাঁর ছেলে প্রভাকর রাওয়ের বেলায়। একটু বিশদ ব্যাখ্যায় গেলে একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, যে নরসীমা রাও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনিই আবার আকৃষ্ট হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং এই পদটি তাঁর কাছে এতই উপভোগ্য হয় যে, তিনি হৃত স্বাস্থ্য এমনভাবে পুনরুদ্ধার করেন যে স্বাস্থ্য তাঁর বয়সকে চাপা দেয় এবং ঐ বয়সে পরিপূর্ণ মানসিক উৎফুল্লতা ছাড়া ঐ সুস্বাস্থ্যের অধিকার সম্ভব নয়।

স্বল্পকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেও দেবেগৌড়া এই পদটি খুব ভালভাবেই উপভোগ করেছেন। শুরুতে তাঁর এই পদে অভিষিক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকলেও অচিরেই তিনি একটি বৃহৎ পরিবার নিয়ে দিল্লিতে বসতি গড়ে তোলেন এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে এমনভাবে সপরিবারে ভোগ এবং সাদসিটি সফর করেন যেন রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না'। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁর ঐ পদে আসীন হবার পর এমন কিছু কিছু কাজ করবার ইচ্ছা হয় যার ফলে তিনি দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন, যেমন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান, কিন্তু সময় তাঁকে সে সুযোগ দিল না। অনেকে তাঁকে তাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করলেও তাঁর প্রস্থান পর্বটি ছিল মহানায়কোচিত।

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ঘটল ইন্দ্রকুমার গুজরালের। অনোর হৃদ্রোগাক্রান্ত দীর্ঘদিনের রাজনীতিক এবং একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ও কূটনীতিক ইন্দ্রকুমার তাঁর পদের গুরুত্ব অনুযায়ী তার সদ্ব্যবহার করেন। যখন প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন ও সাধ তাঁর ধারে কাছেও ছিল না, এবং যখন তিনি তাঁর দিনগুলি ইতিহাস ইন্টারন্যাশনাল হাউসের কবি হাউসে হাষ্টচিত্তে কাটাচ্ছিলেন তখন হঠাৎই ছিওরি অফ এলিমিনেশন প্রয়োগের মাধ্যমেই তাঁর এই পদে অভিষেক ঘটে। অত্যন্ত সহজভাবে, শান্তচিত্তে, সস্মীক তিনি সমগ্র ব্যাপারটি উপভোগ করেন। পদের গুরুত্ব তাঁর উপলব্ধিতে ছিল। অবশ্য একজন এক্সিকিউটিভ প্রধানমন্ত্রী থেকে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ছিল তার বেশি ঝোঁক। দাড়িটি সঠিকভাবে ছেঁটে, ওয়ার্ডরোব থেকে পুরনো পোষাকগুলি ঝেড়ে ইস্ত্রি করে তিনি অবিলম্বে তাঁর নিজের শহর লাহোরের বন্ধুবান্ধব অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করবার উদ্দেশ্যে। যতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন ততদিন তিনি পদের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি আচমকা চলে গেলেন।

কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজির দশা দেখে, যাঁর দল খিচড়ি সরকারের পরিবর্তে "স্থায়ী সরকারের দক্ষ প্রধানমন্ত্রী"-র আওয়াজ তুলে নির্বাচনে জিতে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসায়। সংখ্যোতত্ত্ব যে কত নির্মম তা এই ভদ্রলোকের চেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নেই। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েও নিরঙ্কুশ পরিষ্ঠতা লাভের জন্য তাঁকে নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর আতাত্রোটি দল ও ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে সরকার গড়তে হয়, অথচ তেরোটি দলের খিচড়ি সরকারকে কতই না ব্যঙ্গ করে মাঠে-ময়দানে সাংবাদিক সম্মেলনে ও দেশি-বিদেশি টিভির পর্দায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেছিলেন তিনি ও তাঁর পার্টির নেতারা কয়েক সপ্তাহ ধরে। তবে পরস্পর দুটি খিচড়ি সরকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য যা ইতিমধ্যে জনমানসে কখনও উদ্বেগ, আবার কখনও হাসি-ঠাট্টা-তামাশার খোরাক জুগিয়েছে তা হল পূর্ববর্তী সরকারের ভিত এত কাঁচা ছিল না যে-হাল বর্তমান সরকারের। অটলজির সরকারের বিপদ নিজের অন্দরমহলেই। প্রথমেই বিপদসূচিত হয় দক্ষিণের এক স্বামীজিকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই না দেওয়ায় এবং শপথ গ্রহণের রেশ মেলাতে না মেলাতেই তিন পূর্ণমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রীত্ব থেকে বহিষ্কার করাতে। সাম্প্রদায়িক দলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত, যোয়ারজী সরকারের বিদেশমন্ত্রীর পদে তাঁর কাজকর্ম প্রশংসিত এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জন্য অনেক নেতার তুলনায় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য। দেশ শাসনের জাতীয় কর্মসূচি থেকে সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট বিষয়গুলি বাদ দিলেও উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে তাঁর দলের মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক ভৈরব বাহিনীর তাণ্ডবলীলা এবং তজ্জ নিত প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়ত শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে পড়ছে। ওএস দিয়ে বঙ্গললনাকে সামলানো গেলেও বিহারী মিত্রের চাপ থেকেই যাচ্ছে, আর দ্রাবিড়ীয় রমণীর কাণ্ডকারখানা তো তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিপক্ষীয় শিবিরের রমণীটি যিনি এতাবৎকাল নীরবে সময় ও সুযোগের জন্য ওঁত পেতে ছিলেন সম্প্রতি সরব হয়েছেন এবং এই সরবতা প্রধানমন্ত্রীর দুশ্চিন্তাকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। শপথ গ্রহণের পর থেকে এমন একটা দিন যাচ্ছে না যাতে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন এবং এই অস্বস্তির কারণ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর নিজের দল, সহযোগী দল এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও কাজকর্মের ফলে। পোখরানের আণবিক বিস্ফোরণে সম্মতি দিয়ে তিনি এই অন্তর্বর্তীকালীন কোয়লিশনকে চাপা দিয়ে জাতীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে জনমনের দৃষ্টি তাঁর সরকারের উপর থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে পারবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু আশা যে, 'কুহকিনী', 'ওষু মিত্রে ছলনা' আরও একবার প্রমাণিত হল। উল্টে নিজের ভিখারী মেশকে করে ফেললেন একঘরে এবং আমেরিকার কাছে নতজানু। অযোধ্যা, বিদেশি বিতাড়ন, উধমপুর, কাবেরী, মন্ত্রীদের উল্টো-পাল্টা বিবৃতি, বন্ধ ও দ্রাবিড় রমণীর অভিমান ও আস্ফালন তাঁকে সবসময় জড়া করে চলেছে। কেরালী অটলবিহারী এর মধ্যে ক্ষমতার স্বাদ

গ্রহণ করবার অবকাশই পেলেন না, ক্ষমতাকে ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত এত হিমসিম খেতে হচ্ছে। মোটামুটি সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বুকে নেহরু থেকে রাজীবপর্যন্ত, তারও স্থায়ীত্ব দীর্ঘ সময়, তারও পূর্ণ সময়কাল, তারও স্বল্পকালীন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পেয়ে এত অসুখী হলেন ও অপমানিত কাউকে হতে হয়নি। অটলবিহারীকে তাই, শুধু যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না তুলেই, এই অভিযোগ জানাতে হয় যে, তিনি শুধু ভারতের নন, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী প্রধানমন্ত্রী। ❑

আজি কী তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহ

খাজুরদহ-বলাগড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পোঃ — খাজুরদহ, * জেলা - হুগলি
রেজিঃ নং - ৭৭ এইচ জি * তাং - ১৫-২-৬১

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	হবিবর রহমান মল্লিক	মুকুন্দ ঘোষ
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

নতুন সাজে নতুন ভঙ্গিতে

মালদা সমবায়িকা

মালদার সর্বসাধারণের জন্য তার ডালিতে নিয়ে এসেছে প্রয়োজনীয় সবকিছুই। এবারের নতুন সংযোজন 'ধারা' ঘাঁটি সরিষার তেল ও আমূলের খাদ্য সম্ভার। তাই স্বয়ংসেবা বিপণী আপনাদের সকলকে জানাচ্ছে শুভ শারদীয়ার সাদর আমন্ত্রণ।

দূরভাষ - ৫২৫০৬
এস টি ডি - ০৩৫১২

নিমাই দাস	লক্ষ্মণ বণিক
সভাপতি	মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক

কিষাণ বিকাশ পত্র

যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে পাওয়া যায়

২½ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা

উৎসমূলে কোন আয়কর কাটা হয় না

স্বল্পঞ্চয় প্রকল্প ভারত সরকারের নিশ্চয়তা তাই এখানে টাকা রাখায় কোন ঝুঁকি নেই

স্বল্পসঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :- স্বল্পসঞ্চয় অধিকর্তা, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা-৭০০০০১

D/GSS

একই নিয়মে আজও

শেখর বসু

কথা উঠেছিল বাঙালিদের বাবুয়ানি নিয়ে।

অরিন্দম বলল, 'বাবুরা বাবুয়ানি করবে, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু সে-আমলে ডাকাতরা পর্যন্ত বাবুগিরি করত। ডাকাতি সেরে যে নিশ্চিন্তে বাবুয়ানি করছে তা কিন্তু নয়, ডাকাতি করার সময়ও গদাইলস্করি চাল, পুরো বাবুর মেজাজ।'

অরিন্দমের গল্পের ঝুলি সব সময় ভর্তি থাকে। আর, গল্প বলতেও পারে বেশ জমিয়ে। দরকার মতো চোখ ছোট-বড় হয়, ভুরু নাচে, দুজনের সংলাপ চালার সময় দুরকম গলা বার করে। এই মানুষটি আড্ডায় থাকলে সে-আড্ডা জমতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।

ইতিমধ্যে চা, তেলেভাজা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আনন্দী চট করে উঠে গিয়ে পটভর্তি চা আর চারটে কাপ নিয়ে এসে বলল, 'এবার বলুন আপনার বাবু ডাকাতের গল্প।'

গল্পবিলাসের হাতে চায়ের কাপ প্রথম ধরাল আনন্দী। কাপে ছোট একটা চুমুক মেরে অরিন্দম বলল, 'ভাল লোকের লেখা থেকে বলছি। ওলগাঁয়া নয়। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের ঘটনা। কলকাতার কাঁসারিপাড়ার দিকে বারাণসী ঘোষের তখন খুব নামডাক। বড়লোক মানুষ। বড়লোক হয়েছিলেন সাহেবের দেওয়ানিগিরি করে। ভাল ইংরেজি জানতেন বলে সাহেব বেশ খাতির করতেন। বিরাট এক বাড়ি বানিয়েছিলেন থাকার জন্যে। ওঁর নামেই পরে ওই রাস্তার নাম হয় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট। তখন সাহেবরা দেশ শাসন করলে কী হবে, ডাকাতরা নির্ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতি করে বেড়াত। সেই সময় তিন ডাকাত সর্দারের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। এদের নাম রঘুনাথ, বিশ্বনাথ আর বশিনাথ। আমি যে বাবু-ডাকাতের কথা বলছি, তার নাম বিশ্বনাথ। লোকে বলত বিশ্বনাথবাবু।'

'সত্যি?'

আনন্দীর তাজ্জব উত্তরে চায়ের কাপে আর একটা বড় চুমুক দিল অরিন্দম, তারপর বলল, 'মিথ্যে হওয়ার উপায় নেই। আমি একেবারে ঐতিহাসিকের কথা শোনাচ্ছি তোমাদের। বিশ্বনাথবাবু যে বিরাট বড়বাবু ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল তিনি পালকি করে ডাকাতি করতে যেতেন।'

এবার সুদর্শন হেসে ফেলল।

ওকে হাসতে দেখে, অরিন্দম একটু চটে উঠে বলল, 'না, গালগপ্পো শোনাচ্ছি না। যদি চাও একেবারে ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট দাখিল করতে পারি।'

আনন্দী আর ওর বর জয় তর্কাতর্কি থামিয়ে দিয়ে অরিন্দমকে আসল গল্পে ফিরিয়ে আনল আবার। ও গল্পের সেই থেকে শুরু।

'ডাকাত সর্দার বিশ্বনাথবাবু থাকতেন ডুমুরদহে। সে আমলে একটা দস্তুর ছিল চিঠিপত্তর দিয়ে ডাকাতি করতে আসা। একদিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, এ ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা সাহেবিয়ানা আছে। এটিকেট মেনে ডাকাতি - যাকে বলে ডেকোরেটেড বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তাই না?' অরিন্দমের কথায় সবাই হেসে উঠেছিল। আনন্দী লম্বা করে বলল, 'ঠিকই তো।'

চায়ের কাপে এবার পর-পর তিনটে চুমুক দিল অরিন্দম। একটু থেমে গল্প জুড়ল আবার। 'তা, একদিন বিশ্বনাথবাবু চিঠি পাঠালেন বারাণসী ঘোষের কাছে : অমুকদিন সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া সেইদিন সন্ধ্যার সময়, মূল্যবান সামগ্রী একত্র করিয়া রাখিবেন।'

সুদর্শন আবার একটা বাধা সৃষ্টি করল। 'ওই চিঠিটাও কি তোমার ওই ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেছেন।'

'না। তবে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে গেলে ডাকাতরা তো এই ধরনের চিঠিই লিখবে। আর কী-ই বা লেখার আছে।' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল জয়। 'ঠিকই। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে গেলে এই রকমের চিঠিই লিখবে। এছাড়া আর তো কিছু লেখার নেই। কিন্তু তখন চিঠি দিয়ে ডাকাতি করার চল হয়েছিল কেন বলো তো?'

অরিন্দম বড় একটা চুমুকে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবার পরে বলল, 'ঠিকটা তো জন্ম হেতেমি। তবে আমার যা মনে হয় জানো, আজ থেকে বুদ্ধো বছর আগে কলকাতার বাস্তাঘাট তো তত ভাল ছিল না। তার ওপর তখন কলকাতার আশেপাশে বিস্তর খালবিল ছিল। সন্ধের চরদিকের জঙ্গল থেকে শেয়াল বেরোত। বাঘও বার হত নাকেনধে। বর্ষাকালে নেটো পথ কলকে ডুবে যেত। এই অবস্থায় পাঁচ-ছ ক্রোশ দূর থেকে ডাকাতরা ডাকাতি করতে গিয়ে যদি শোনে বর্ষ সপরিবারে তীর্থে গেছেন কিংবা দূরের কোনও গ্রামে আত্মীয়র বাড়িতে লোক-লৌকিকতা করতে গেছেন তাহলে তো কেলেঙ্কারি। একেবারে একশেষ। ডাকাতরা তো ডঙ্কুরে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসে। ডাকাতি করা তো তাহলে কস্মিনকালে পোষাবে না।' কথা শুনে শ্রোতরা একটু হাসল, কিন্তু কেউ আর কোনও প্রশ্ন তুলল না।

সিগারেটে লম্বা একটা টান মেরে আবার সুখ পুরু অরিন্দম। 'যথাসময়ে ডাকাতের চিঠি হাতে পৌঁছল বারাণসী ঘোষের। কৃষ্ণাত্ত ডাকাত, বিরাট দলবল, কথাবার্তে কোনও নড়চড় হয় না। কোম্পানির লোককে জানলে বিপদ আরও বাড়বে। সাহেবদের দৌলতে সে যাত্রা হয়তো উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর? ওরা চলে গেলেই ডাকাতরা কাঁপিয়ে পড়বে। তখন শুধু লুটপাটেই ক্ষান্ত হবে না, বাড়ির সবাইকে নৃশংসভাবে খুন করবে। কিন্তু সে তো গেল পরের কথা ; টাকা-পয়সা, সোনাদানা মনোমত না হলেও তো ডাকাতরা দু-চারটে লাশ ফেলে দিতে পারে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন বারাণসী ঘোষ। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ওই বাড়িতে এক খানসামা ছিল, সে অত্যন্ত সাহসী আর পাকা চৌকস। খানসামা মালিককে বলল : এ বাড়ির ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা অন্য কোথাও গা ঢাকা দিন। আমি একাই সব সামলে নেব। জবাবে বারাণসীবাবু বললেন : তা

কী করে হয়! তুমি একা, ওরা অতজন। প্রত্যেকের কাছেই আবার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকবে। খানসামা অভয় দিয়ে জানাল : ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। সব দায়িত্ব আমার। আর সময় নষ্ট করবেন না এখন। আপনারা নিরাপদ কোনও আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ুন। অন্য কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত খানসামার হাতে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠলেন বারাণসীবাবু।'

চোখেমুখে কৌতূহল ফুটিয়ে তুলে আনন্দী জিজ্ঞেস করল 'তারপর?' গম্ভীর মুখে সিগারেটে কয়েকটা টান মারল অরিন্দম। তারপর অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে বলল, নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যাবেলায় মশালের আলোয় চারদিক আলো-আলো করে দলবলসমেত এসে পড়লেন ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবু। ডাকাতদের ভয়ঙ্কর চেহারা। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে সড়কি, কারও হাতে খোলা তরোয়াল। বাবু বিশ্বনাথ কিন্তু ছ-বেহারার পালকিতে। বারাণসী ঘোষের অট্টালিকার সামনে এসে দেখলেন, সদর দরজা হাঁ করে খোলা। এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। কৃখ্যাত ডাকাতের নামে গৃহস্থের বুকে কাঁপুনি ধরে। জনালা-দরজা বন্ধ করে ইষ্টনাম স্মরণ করে। তারপর ডাকাতরা হা-রে-রে-রে করে উঠে দরজা খুলতে বললেই কেউ একজন ঠকঠক করতে করতে দরজা খুলে দেয়। গৃহস্বামী ডাকাত-সর্দারের হাতে সর্বস্ব তুলে দেয় তখন। সে-অঞ্চলে বড় বড় ডাকাতির এটাই ছিল ধরন। কিন্তু এখানে তো তা হয়নি। সদর দরজা আগে থেকেই হাট করে খোলা। ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবুর কাছে এই বেনিয়মটা একেবারেই ভাল ঠেকল না। বাবু ডাকাত তো। ডাকাতি করতে গেলেও সঙ্গে খাস চাকরকে নিয়ে যান। সদর দরজা খোলা দেখে খটকা লাগতেই মাথাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে বিশ্বনাথবাবু চাকরকে বললেন : তামাক সাজ।'

'কী বলছ কী! ডাকাতি করতে এসে ওই সময় চাকরকে তামাক সাজার কথা বলা! না, এটা বোধহয় তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ।'

সুদর্শনের কথায় আর একবার বিরক্ত হল অরিন্দম। 'কী আশ্চর্য, আমার এখানে বাড়াবাড়ি বা অনাকৃতি করার ব্যাপার নেই, আমি তোমাকে একজন পণ্ডিত লোকের লেখা থেকে তথ্য দিয়ে যাচ্ছি শুধু।'

সুদর্শন বেশ ভাল টুকে তর্ক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আনন্দী আর জয় প্রায় কাঁপিয়ে পড়ে থামিয়ে দিল ওকে। গম্ভীর মুখে সিগারেটে কয়েকটা টান মারার পরে আবার গল্পের খেই ধরল অরিন্দম। তখন নাকি ডাকাতদের মধ্যে মালসাট শব্দটার খুব চল ছিল। মালসাটের মানে হল আস্ফালন। ভয়ঙ্কর চেহারার ডাকাতগুলো ওই অন্ধকার রাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মালসাট মারছিল, আর অপেক্ষা করছিল সর্দার বিশ্বনাথবাবুর আদেশ শোনার জন্যে। আদেশ শোনা মানে বে-রে করে বাড়ি চড়াও হওয়া। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর মাথায় তখন অন্যরকম চিন্তা। ডাকাতের চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও বারাণসী ঘোষ আগে থেকে সদর দরজা হাট করে খুলে রেখেছে কেন? নিশ্চয়ই ওর অন্য কোন মতলব আছে। খোলা দরজা হয়তো একটা ফাঁদ। মাথা সাফ করার জন্যে আলবোলার দুটো টান দেওয়া দরকার। চাকর বেশ তরিবত করে কল্কে সেজে আলবোলার নাথায় বসিয়ে দিল, কিন্তু বিশ্বনাথবাবু নল হাতে নিয়ে যেই না টান মারতে যাবেন অমনি ওই খোলা দরজা দিয়ে একটা তীর ছুটে এসে কল্কে কেটে মাটিতে ফেলে দিল।'

'এঁ্যা! বলো কী!'

আনন্দীর বিস্ময়ে সায় দিয়ে অরিন্দম বলল, 'তোমার মতো বিশ্বনাথবাবুও চমকে উঠেছিলেন ওই কাণ্ড দেখে। এত নিখুঁত তীরন্দাজ তো যে সে লোকের কম্ম নয়। কে বা কারা আছে ওই বাড়ির ভেতরে? তবে, আফটার অল ডাকাত-সর্দার তো-ভয়টয় অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট কম। ওই নিস্তব্ধ রাতে বাকুর্দই গলার হেঁকে উঠে বললেন : বাড়ির ভেতর থেকে তীর ছুঁড়ল কে? তবে যেই ছোড়ো না কেন, তোমার বাহাদুরি আমি এখনই মানতে রাজি নই। আমি আবার তামাক সাজাচ্ছি, যদি সত্যিই জবুর তীরন্দাজ হও, ওইভাবে আর একবার কল্কে কেটে দেখাও তো। বলেই চাকরকে বললেন : নে ব্যাটা আর একবার সাজ। চাকর তামাক সাজল, তারপর আলবোলার নাথায় কল্কে বসিয়ে দিল আবার। বিশ্বনাথবাবু যেই না আলবোলার নল-মুখ মুখের কাছে তুলেছেন অমনি বাড়ির ভেতর থেকে আর একটা তীর ছুটে এসে সেই কল্কেটাও কেটে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি বাজার গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু : তুমি সত্যিই বাহাদুর। বেরিয়ে এসো তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করব। কথা দিচ্ছি, এখানে আমি ডাকাতি করব না।'

'বেরিয়ে এসেছিল কেউ?'

'কেউ বলতে তো একজনই। গোটা বাড়িতে ওই খানসামা ছাড়া আর কেউ ছিল না। খানসামা তীর-ধনুক নিয়ে একটা লুকনো জায়গায় বসে ছিল। বিশ্বনাথবাবু আর একবার হাঁক পেড়ে বললেন : আমার কথা-কাজে কোনও কারাক থাকে না। তোমার বাহাদুরি দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। এতই খুশি যে এ-বাড়িতে আর ডাকাতি করব না। তীরন্দাজ, তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে আমার ভাবসাব হওয়া দরকার। কিন্তু খানসামা কথার জবাবও দিল না। বারও হুল না ঘর থেকে। ডাকাতের এসব কথা কে আর চট করে বিশ্বাস করে। তার ওপর আবার একা মানুষ। খানসামা ভয় পেল, ওইসব বড়-বড় কথা হয়তো স্রেফ চালাকি। ওকে বাগে পেলে বিশ্বনাথবাবু নির্ঘাত তরোয়ালের এক কোপে ওর বড়মুণ্ডু আলাদা করে দেবেন। কী দরকার ঝামেলা ঝুঁকি নিয়ে। খানসামা কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে লুকনো জায়গায় বসে রইল চুপ করে। বিশাল অট্টালিকার কোথাও আলোর কোনও চিহ্ন ছিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বিশ্বনাথবাবু একটু হেসে বললেন : বুঝতে পারছি, বেরুতে তোমার অসুবিধে আছে। ঠিক আছে, আমরা চললাম এখন। আমার চিৎপুরের বাগানে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল। শিগ্‌গিরই এসো একদিন। শোনা যায়, পরে নাকি ওই ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে বারাণসী ঘোষের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।'

আনন্দী হাঁ করে গল্প শুনছিল। অরিন্দম থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'তারপর আর কিছু নেই। গল্প এখানেই শেষ।' আনন্দী ছেলেমানুষের গলায় বলল, 'যুর, এত তাড়াতাড়ি গল্প শেষ হলে ভাল লাগে না।'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, 'এটা তো বানানো গল্প নয়, সত্যকাহিনী। সত্যি গল্প এইভাবেই শেষ হয়।'

সুদর্শন বলল, 'না, গল্পটা বেশ ভালই, তবে পুরোপুরি সত্যি বলে মনে হয় না। আজ থেকে দুশো বছর আগে এই কলকাতায় ইংরেজদের শাসন ছিল খুব জবরদস্ত। তখন কি আগে থেকে ওইভাবে চিঠিপত্তর পাঠিয়ে ডাকাতি করা সম্ভব ছিল? তার ওপর আবার বারাণসী ঘোষ ইংরেজের দেওয়ান, ইংরেজদের সঙ্গে অত খাতির। একটা খবর পাঠিয়ে দিলে তো গোরা পুলিশ এসে দলবলসমেত তোমার ওই বিশ্বনাথবাবুকে চেঁছিয়ে সাবেস্তা করে দিত।'

গল্পের সত্যি-মিথ্যে নিয়ে প্রশ্ন তুললে সব গল্পলিখিয়েই চটে যায়। বিরক্ত হয়ে জবাব দিল অরিন্দম - 'দেশে যত বড় শাসনব্যবস্থাই থাক না কেন একটা আণ্ডারওয়ার্ল্ড সব সময় কাজ করে

যায়। তখনও করত, আজও করে। এই যে মাফিয়া তন্ত্রা — গোটা পৃথিবী জুড়ে যারা অপারেট করছে — পুলিশ তাদের কতটা বাগে আনতে পেরেছে?'

'মাফিয়াদের কথা ছেড়ে দাও।'

'কেন ছাড়ব? মাফিয়া মানেও তো একজনের ডাকাত।'

জয় এবার অরিন্দমের সমর্থনে এগিয়ে এল। 'তুমি যদি সাবেক ডাকাতদের কথা ধরো, তাও তো আছে এখন। এই যেমন চন্দনের ডাকাত। দস্যুরানি ফুলনদেবী তো এখনও খবরের হেডলাইন।'

সুদর্শন তর্কে হারার লোক নয়। বলল, 'চন্দনের ডাকাতদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে প্রচুর গালগল্প তৈরি হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য মিডিয়াই দায়ী। কিন্তু চুরি-ডাকাতি সব সময়ই ছিল, থাকবেও। কিন্তু ওই যে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসা, বিশেষ করে পুরনো কলকাতার এক বড়লোকের বাড়িতে — এটা বেশি বেশি। আমি তো শুনেছি সে-সময় চুরি-ডাকাতির ভয় একটু বেশি ছিল বলে বড়লোকরা বাড়িতে নিজস্ব একটা সিকিউরিটি ফোর্স রাখত। এই যেমন ভোজপুরী দারোয়ান, তেলেঙ্গি বা বাগদি লাঠিয়াল —। তোমার এই বারাণসী ঘোষের বাড়িতে শুধু একজন খানসামা ছিল কেন?'

'আমি কক্ষনো একথা বলিনি যে ওই বাড়িতে বাইরের লোক বলতে শুধু একজন খানসামাই ছিল। গল্প শুনেই বোঝা যায় ওই খানসামা ছিল অসম্ভব সাহসী আর বীরপুরুষ। অত সাহসী বলেই ওই বাড়ির সবাইকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেছিল। ঠিকই করেছিল সঙ্গে ভিন্ন লোক থাকলে ও ওর স্ট্র্যাটেজি ভাঙতে লাগাতে পারত না।'

'ঠিক আছে একটা বড় বাড়িতে একজন অসম্ভব বীরপুরুষ থাকাটা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু পালকি চেপে ডাকাতি করতে আসাটা — তার ওপর আবার সঙ্গে চাকর, চাকরের কাজ শুধু তামাক সেজে দেওয়া —। এটা কি বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

এবার এগিয়ে এল আনন্দী। 'কেন, ইতিহাসে তো পড়েছি — মুঘল-পাঠান বাদশাদের কেউ কেউ দূর দেশে যুদ্ধ করতে গেলে সঙ্গে গাইয়ে-বাজিয়ে আর নর্তকীদের মস্ত দল নিয়ে যেত।'

'সে তো বাবা যুদ্ধ।' যুদ্ধ আর ডাকাতি কি এক হল?'

আনন্দীর মুখ দিয়ে আর একটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, দ্যাঁ একই। কিন্তু ও নিজেকে সামলে নিয়েছিল কোনও মতে।

সুদর্শন এবার ভিতে যাওয়ার ঢঙে বলল, 'আসলে, ইতিহাসের সঙ্গে এত গল্পো মিশে আছে না —। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। তবে মুশকিল হয় যখন আমরা শুধুমাত্র ওই গল্পোটাকেই ইতিহাস বলে চালাতে যাই। অরিন্দমের গল্পটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বিস্তর ফাঁক চোখে পড়ে যায়। আরে বাবা গল্প সত্যি কি মিথ্যে বোঝার জন্যে সব সময় ডকুমেন্ট পরীক্ষা করার দরকার হয় না, একটু কাণ্ডজ্ঞান খাটালেই হল। যাকগে, বিস্তর ডাকাতের গল্প হয়েছে, এবার তোমাদের নতুন এই ফ্ল্যাটটার গল্প একটু শোনা যাক। ফ্ল্যাটটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে। প্ল্যানিং ভারী সুন্দর। তার ওপর আবার বেশ খোলামেলা। ভাল আর্কিটেক্টের কাজ।'

সবে একমাস হল নতুন ফ্ল্যাট কিনে নতুন পাড়ায় উঠে এসেছে জয় আর আনন্দী। সুদর্শন ও অরিন্দম নতুন এই ফ্ল্যাটে আজই প্রথম এল। আসার পরে বকবককে ফ্ল্যাটের খুটো ঘর, বারান্দা, কিচেন এমনকি টয়লেট পর্যন্ত দেখে নিয়েছে। চমৎকার ফ্ল্যাট। তখন এক দফা প্রশংসা করার পরে ড্রইংরুম-কাম-রিটিরুমে বসে গল্প শুরু হয়েছিল। এ গল্প সে-গল্পের শেষে ডাকাতের গল্প সেটা শেষ হওয়ার পরে আবার ফ্ল্যাটের গল্প।

ফ্ল্যাটের প্রশংসায় আনন্দী আর জয়ের চোখমুখ ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। ঝলমলে মুখে জয় বলল, 'ফ্ল্যাট তো সুন্দর, কিন্তু এই ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে দেনার দায়ে মাথার সব চুল তো বিকিয়ে গেছে।'

'সে সবারই হয়। দেনা শেষ হলেই বিকিয়ে-যাওয়া চুলের সখ ফিরে আসবে আবার।'

উত্তরে জয় হেসে বলল, 'সখ যখন ফিরবে তখন দেখব মাথার সব চুল ঝরে গিয়ে মস্ত টাক বেরিয়ে পড়েছে।'

'তা হোক না, দেনাহীন টাক খারাপ নয়। কেউ তো আর তখন বলতে পারবে না যে, দেনার দায়ে বুড়োর মাথা বিকিয়ে গেছে।'

সুদর্শনের কথায় আনন্দীও হাসল, কিন্তু ঠিক তার পরেই ওর মুখে মৃদু একটা দুশ্চিন্তার ছায়া খেলে গিয়েছিল। একটু থেমে থেকে ও বলল, 'ফ্ল্যাটটা ভালই, তবে পাড়া কেমন হবে কে জানে!'

'আরে বাবা পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে কেউ এখন আর মাথা ঘামায় না, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে।'

'না-না, সে-কথা বলছি না আমি। এখানে বড্ড চাঁদার উৎপাত। মানখানেকও আসিনি, এর মধ্যে তিন দফা চাঁদা দিতে হয়েছে। একটা ক্লাবের, একটা পার্টির আর একটা চ্যারিটি শোয়ের বিরাট টাকা। আমরা ধার করে চাঁদা দিয়েছি। মানের শেষটেস পেলেনি। পরশুদিন এসে কালীপুজোর চাঁদার বিল ধরিয়ে দিয়ে গেছে। কত টাকা জানো? পাঁচ হাজার এক!'

'অ্যাঁ! বলো কী! এতো চাঁদার নামে জুলুমবাজি।'

'জুলুমবাজি নয়, ডাকাতি। তোমরা এক পয়সাও ঠেকাবে না। আসলে তোমরাই ফুল ভয়ে ফেলেছ। তিন দফা মোটা চাঁদা দেওয়া ঠিক হয়নি। এক্কেবারে মেতে গেছে ওদের। সাধারণ চাকরিজীবী মানুষ, তার কাছে পুজোর চাঁদা চাইছে পাঁচ হাজার এক টাকা!'

তিনজনের কথাবার্তা অবাক বিস্ময়ে শোনার পরে জয়, আনন্দীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাঁচ হাজার এক টাকার চাঁদার বিল কেটে গেছে। অথচ তুমি তো আমাকে একবারও বলোনি!'

'বলার আর সময় পেলাম কোথায়! পরশু বিকেলে এসেছিল, আজ সন্ধ্যের আবার আসবে বলে গেছে।'

জয়ের ঘোর এখনও বুঝি কাটেনি। ঘরখরে মুখে বলল, 'পাঁচ হাজার এক টাকার বিল কেটে দিয়ে গেল! অথচ তুমি ওদের কিছুই বললে না!'

'কেন বলব না, বলবার বলেছি। তার উত্তরে কী বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি সব কথা শুনিয়ে দিল ছেলেগুলোকে দেখতেও ঠিক গুণ্ডার মতো। শেষে শাসিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল — পরশু সন্ধ্যেবেলা আসছি, চাঁদাটা বেড়ি রাখবেন, ঠাকুর বানানো দিতে লাগবে।'

'আমার বড়ি পেয়েছে। কিন্তু মেরে না ভয় পেলে এরা আরও পেয়ে বসে। বেশি জুলুমবাজি করলে পুলিশে খবর দেবে এই তো তিন-চার দিন আগেই আমাদের পুলিশের একটা সার্কুলার বেরিয়েছে। চাঁদার জন্য কেউ জুলুম করলে লালবাজারে খবর দিন। পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে একবার লক-আপে পুরলেই দেখবে ভ্যাঁদড়ামি আর তখনও ওরা তোমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না। এক কাজ করা যাক, এখনই একটা ফোন করে দিই। ফোন নাম্বার আছে ওখানে।'

কিন্তু অরিন্দমের উৎসাহের পরোয়া আনন্দী কিংবা জয় কেউই সাড়া দিল না। সাড়া না পেয়েও অরিন্দমের উৎসাহে ভাটা পড়ল না এতে বাধেই। বলল 'মোড়ের গুন্ডাদের

দোকানটায় টেলিফোন আছে দেখেছি। নাম্বারটা দাও, আমি ট্রাঙ্ক করে একটা ফোন করে দিয়ে আসি। এখনই তো ওদের আসার কথা, একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।'

এ-কথার জবাবেও ওরা কিছু বলল না। অরিন্দম এবার হিসহিসে গলায় বলল, 'শোনো, আজকের দিনে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল রুখে দাঁড়ানো। এক মাসের মধ্যে তিন-তিনবার চাঁদার নাম করে ওরা তোমাদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে — এখনও যদি প্রতিবাদ না করো, তবে আর কবে!'

আনন্দীর শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে গিয়েছিল। ও নিচু সুরে বলল, 'কিন্তু পাশের বাড়ির মিসেস ব্যানার্জি তো আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তো এ-পাড়ার অনেক দিনের বাসিন্দা —।'

'কী বলেছেন মিসেস ব্যানার্জি?'

'বলেছেন এ-পাড়ার ছেলেগুলো একেবারে গুণ্ডাগোছের হয়ে গেছে। চাঁদা তোলার একটা না একটা কিছিব ওদের সব সময় লেগে থাকে। এই করেই নাকি ওদের চলে। মদটদ খায়, অথচ কেউ চাকরি-বাকরি করে না। পাড়ার পুরনো বাসিন্দাদের ওপর জুলুম কম, তবে আমাদের মতো যারা নতুন তাদের অবস্থা রীতিমত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আমরা আসার আগে এখানে একটা পুরনো বাড়ি ছিল। মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন পাড়ার ছেলেগুলো নাকি বাড়িওলার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাড়াটেদের তুলে দিয়েছে, ওই জমিতেই এই বাড়ি। এখন আবার শুনছি, বাড়িওলা নাকি আবার ছেলেগুলোকে টাকা খাইয়ে আমরা যারা এখনে এসেছি তাদের তাড়াতে চায়।'

'তাড়াতে! কেন?'

'তাড়াতে পারলে ফ্ল্যাটগুলো আবার চড়া দামে বেচতে পারবে।'

'তা কী করে হয়! কেউ যদি কোনও কারণে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে চায়, সে তো তার পছন্দমতো লোকের কাছেই বিক্রি করবে। বাড়িওলাকে দেবে না।'

'দিতে চাইবে না ঠিকই, কিন্তু অন্য খদ্দের পাবে কোথায়? যারা ফ্ল্যাট কিনবে তারা তো আশেপাশে খোঁজখবর নেবে। তখনই ফাঁস হয়ে যাবে নতুন ফ্ল্যাট বিক্রির রহস্য। কেউ তখন আর এগোবে না। বাধ্য হয়ে শেষে বাড়িওলা কিংবা বাড়িওলার চেনা খদ্দেরকেই কম দামে বেচতে হবে।'

'বলো কী, এ তো রীতিমত চক্রান্ত!'

চোখ বড়-বড় করে সুদর্শন কথাটা বলার পরে অরিন্দম বলল, 'তোমরা একটু বেশি ভেবে ফেলেছ। এসব এত সহজ হলে সবাই এই-ই করে বেড়াত। চাঁদা চাইতে এলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলবে — এর বেশি তোমরা দিতে পারবে না। তাতে রাজি না হলে অন্য ব্যবস্থা তো আছেই।'

'অন্য ব্যবস্থা মানে পুলিশ? না-না এক্ষুণি এ-ব্যাপারে পুলিশকে জানাতে চাই না। পুলিশ না হয় একবার বাঁচাল, কিন্তু তারপর? অফিসে কাজের চাপ থাকলে ওর তো বাড়ি ফিরতে বেশ রাত্তির হয়ে যায়। অচেনা পাড়া বলেই বলছি —।' একেবারে অসহায় মানুষের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল আনন্দী।

হাতের কাছে সমস্যা সমাধানের কেউই কোনও উপায় খুঁজে পেল না। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে আটটায় এসে পৌঁছেছিল। সামান্য আগে-পরে সবারই মনে হয়েছিল — এক্ষুণি সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা যাবে, তারপরেই হাজির হবে কৃষ্ণকান্ত এক চাঁদা পার্টি।

হিমুকুল বাগে সুদর্শন হঠাৎই খুশি হয়ে বলে বসল, 'এতো দেখছি গল্পের ওই বিষ্ণুনাথ ডাকাতের মতো। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসা। ওখানে চিঠি, এখানে চাঁদার বিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো একই।'

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে আনন্দী বলল, ঠিক বলেছেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ইশ্! আমাদের যদি বারাণসী ঘোষের খানসামার মতো একজন বীরপুরুষ খানসামা থাকত!' আধঘণ্টা আগে যদি এই কথাটা আনন্দী বলত, সবাই নির্ঘাত হা-হা করে হেসে উঠত। কিন্তু এখন আর কেউ হাসল না। সবাই টের পাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা দমবন্ধ ভাব চেপে বসেছে।

বিচ্ছিরি এই আবহাওয়াটা কাটাবার জন্য প্রত্যেকেই নানা ধরনের প্রসঙ্গ টেনে গল্প জোড়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। একটুখানি এগোবার পর বেয়াড়াভাবে গল্পের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল প্রতিবার।

দেয়ালঘড়িতে আটটা থেকে ন'টা বাজল কেন কটা ঘুরেও যায়নি। অরিন্দম আর সুদর্শন এখান থেকে অনেক দূরে থাকে, সুতরাং এবার ওদের উঠতেই হবে।

অরিন্দম একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'উঠি এবার, আমরা তো আবার অনেক দূরের বাসিন্দা। কই, তোমাদের চাঁদা-পার্টি এল না তো? আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে আমরা বড্ড বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছি।' শুকনো মুখে জবাব দিল আনন্দী — 'সিরিয়াসলি নেওয়ার মতনই ব্যাপার। এখনও আসেনি, তবে কখন তখন এসে পড়বে। এরা তো পাড়ারই। মিসেস ব্যানার্জি বাজে কথা বলার মহিলা নন। আমার মনে হয় যা সত্যি তার থেকে একটু বোধহয় কমিয়েই বলেছেন —।'

'এটা যদি কম হয়, বেশিটা কী?' একজন বিভ্রান্ত মানুষের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল জয়।

'সত্যিই তো, আমাদের চলাফেরার মধ্যে এইটুকু নিরাপত্তা যদি না থাকে! দুশো বছর আগের কলকাতায় মানুষজন ডাকাতের ভয়ে যেভাবে দিন কাটাত আমাদেরও কি সেইভাবে কাটাতে হবে!'

সুদর্শনের কথাটা শুনে অরিন্দমের ঠোঁটে ছোট্ট একটা বাঁক খেলে গেল। 'যাক, ডাকাত বিষ্ণুনাথের গল্পটা তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলে!'

'বিশ্বাস না করে আর উপায় কী, আসলে —।'

সুদর্শনকে আসল কথাটা বলার সুযোগ না দিয়ে আনন্দী অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি বলছিলেন না — পরে ডাকাত বিষ্ণুনাথের সঙ্গে বারাণসী ঘোষের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল — এটা কি সত্যি?'

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে অরিন্দম বলল, 'যিনি ওই কাহিনীটি লিখেছেন ওঁর লেখার শেষের দিকে তো ওইরকম কথাই আছে।'

ছটফটে ভঙ্গিতে আনন্দী বলল, 'কিন্তু ঠিক কী ভাবে ওই ডাকাতের সঙ্গে বারাণসী ঘোষের ভাব হয়েছিল তা নিয়ে ওই ভদ্রলোক কি একটা লাইনও লেখেননি?'

ওর চোখমুখের চেহারা আর প্রশ্নের ধরনে এই ফ্ল্যাটের দুই অতিথিরই মনে হয়েছিল — উত্তরটা জানতে পারলে আনন্দী বুঝি ওদের সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলবে একুণি।

ন'টা কুড়িতে দুই বন্ধু আনন্দী আর জয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। কিন্তু বেই না ওরা রাস্তায় পা দিয়েছে অমনি ঝুপ করে পাওয়ার কাট। সঙ্গে সঙ্গে আলো-ঝলমলে গোটা পাড়াটা কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল।

কাপসা বাড়ি আর হাট করা সদর দরজা দেখে দুই বন্ধুরই সামান্য আগে-পরে একই ধরনের একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, অলৌকিক কোনও উপায়ে আজ থেকে দুশো বছর পিছিয়ে গিয়ে উত্তর কলকাতার একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। □

উপন্যাস

অসময়ে সময় নেই

বিনয়গোপাল মিত্র

তা রূপর অনেক বৎসর পার হয়েছে। অরূপের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। দেখা যেদিন হ'ল বলার কিছু ছিল না। যখন ওর মুখোমুখি হয়েছিলাম তখন একটু ভয় ভয় করছিল, সঙ্কোচও কম ছিল না। এখন সে রাশভারি কবি। গল্প করে বললেও সে মজা বলে না। আবৃত্তির মতো শোনায়। তার সাথে তাল মিলিয়ে কথা বলা কঠিন। শুনতে মুখ বেশি, তার বলার ঢঙের প্রশংসাও করতে হয়। নইলে থেমে থেমে কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করবে 'বলো, ঠিক বলিনি?' আর বলবে, 'তুমি আগের মতো আর নেই। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। প্রায়ই তোমার কথা বলি। ভালো থেকো। চলি।' এ কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে যাবে। ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে জানিয়ে বলবে 'একদম সময় নেই।' অভিযোগ করতেও ভুলবে না যে আমি ওর সাথে যোগাযোগ রাখি না বা আমি ওকে সময় দিই না। ভয় সেখানে নয়। ভয় ও যখন ওর করে পুরানো সেই দিনের কথা। ওর জীবনে সুমিতা এসেছিল, কৃষ্ণা থেকে ছিল। ছোট ভাই-এর বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী রমলাকে দেখে বিগলিত হয়ে তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল। বাড়িওয়ালার পুত্রবধূকে কবি সম্মেলন, নানা বিচিত্রানুষ্ঠান আর গানের আসরের কার্ড দিয়ে কাছে টেনেছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়িটাও ছাড়তে হয়েছিল। বাড়িওয়ালার অবশ্য লাভ কিছুই হয়নি কারণ অরূপের ভাই স্বরূপ ঐ পুত্রবধূকে ঘরছাড়া করে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিল। অনিন্দ্যসুন্দরী গৌরবর্ণা সুষমাকে নিয়ে আবেগভরে অরূপ গেয়েছিল, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। এসব ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমি। হয়ত তাই অরূপের আমাকে এত মনে পড়ে। কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিনগুলি তার এমনি করেই কেটেছিল। অরূপ থামতে জানত না। বাসা বাঁধবার কথাও ওর মাথায় ছিল না। দুই বোনের বিয়ে, ভাই-এর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে ওর আর্থিক দিক তেমন স্বচ্ছল না হওয়ায় ও বিয়ের কথা ভাবতেও পারত না। প্রেম-ভালবাসার অনুভূতি আগের নিয়ে ও বেঁচে রয়েছে।

অরূপ ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী। আবৃত্তি করত ভাল। স্কুল-ম্যাগাজিন আর দেওয়াল পত্রিকায় নিয়মিত লিখত। একজন কবি-স্যারের বাড়িতে যেত। স্যারের স্ত্রী ওকে খুব ভালবাসতেন। এই স্যারের বাড়িতেই ওর কবিতার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল। অরূপের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। ছাড়াছাড়ি হ'ল কলেজ ছাড়ার পর আমরা কত পথ কত প্রান্তর ছুটেছি। কত পায়ে হেঁটেছি। রঙীন ভবিষ্যতকে যেন হাতের মুঠোয় দেখতাম। কত কী-ই না খুঁজছিলাম, কাকে যেন চাইছিলাম। স্বপ্নে না বাস্তবে মনে নেই হয়ত বা কোনদিন কোন ভবিষ্যতকে চিনেছিলাম, পরিচিত হয়েছিলাম যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্যে। জীবনকে গড়ে কিছু পেতে চেয়েছিলাম। একদিন ছিল যখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটেছি, কথা ও গল্পের মধ্যে থেকেছি। সেদিন দেখা হল অনেক দিনের পর, দুজনেই স্নিগ্ধ, না ছিল বিষয় না ছিল গল্প। দূরত্ব অনেক বেড়েছে। কোন কারণ ঘটেনি। হয়ত বা আমরা কৃত্রিমের বোঝা বয়ে চলেছি। আলাপে আলাপনে মুখোমুখি এসে আমরা কী পেলাম যাচাই করতে ভয় হয়। অথবা 'সময় নেই' বলে হয়ত আমরা অতীত জীবনের কাহিনীকে সংগোপনে টেনে আনতে পারিনি।

সুমিতা অরূপের কাছাকাছি এসেছিল। কবি বলে নয়। কবিতার প্রতি ওর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। সুমিতার সংস্কার ছিল। সামাজিক সংস্কার নয়। জন্মগত সংস্কার। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসী সুমিতা স্বামীকে একান্তভাবে জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হিসাবে পেতে চায়। জীবন ও যৌবনের টানে সুমিতা অরূপের কাছে এসেছিল। মনের আদান-প্রদান ঘটেছিল। সংসার পাতার কথা কোন দিন তেমনভাবে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে খুঁজে পায়নি। সুমিতার কাছে অরূপের অস্থির জীবনের কোন পরিচয় ছিল না। ধীরে ধীরে কলেজ চত্বরে সুমিতার কাছে অরূপের অস্থিরতার প্রকাশ পেতে থাকল। সামনা-সামনি হাল্কা কথাবার্তায় অরূপের মিষ্টিভাব সুমিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। অরূপের অস্থির জীবনযাত্রা ক্রমেই সুমিতাকে শঙ্কিত করে তুলছিল। সুমিতার সমবেদনা যে সীমিত তাও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সুমিতাকে অন্যায় করে সেদিন যখন সুষমার হাত ধরে অরূপ ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল তখন অনার খুব খারাপ লেগেছিল। সেটা কলেজ-জীবন শেষ হওয়ার দিনের ঘটনা। সুমিতা ফিরিতে হবনি। মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে সে দেখতে চেয়েছিল ঘটনা কোন দিকে গড়ায়। সুমিতা অরূপের বাড়ি গিয়েছিল অরূপের মা বাড়ির বাইরে থেকেই সুমিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সুমিতা এখনিতে ধীর স্থির ওর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে কতটা আবেগ আছে তার চাইতে বেশি আছে জীবনের বিশ্লেষণ ও জীবনদর্শন। একদিন সুমিতার সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। খুব স্বাভাবিকভাবেই সুমিতা অরূপের সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছিল। অরূপের কথা বলতে গিয়ে ও বলেছিল জীবন তো শিল্প হাঁটে না, পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো যত বড় হতে থাকে মানুষের চিন্তার ধারা তত প্রভাবিত হতে থাকে। ও আরও বলেছিল, যে ঘটনা একদিন কেবলই নিজের মনে হত তা যে কত সূক্ষ্মভাবে আমাদের চারদিকে ছড়ানো ছিল তা তখন বুঝতে পারিনি। সেদিন সে-চোখ ছিল না, সে-মন ছিল না, সে হৃদবৃত্তিও তখন গড়ে ওঠেনি। মনের অগোচরে দিনের পর দিন কত ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার খোঁজ রাখতাম না অতীতকে সাথে নিয়ে চলছি বলেই এ একরকমের চলা। সৃষ্টি আমাদের সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, দুর্বার গতি কত স্পষ্ট! তাই মাথা নত করে সৃষ্টি যেমন অতীতকে

সাথে নিয়ে চলেছে তেমনি করেই চলতে হবে। এ-চলার আনন্দ সেই জানে যে কখনো নিজের ডানাকে কেবলই নিজের করে নেয়নি।

প্রথম দেখার পর অরূপ বারবার রমলার কাছে গেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পর থেকে 'বৌদি' ডেকে তাকে মুগ্ধ করেছে। বিনয়ী কবি হয়ে রমলার রূপ বর্ণনা করেছে। রমলাকে কাছে টেনে আদরও করেছে। মুখের রক্তিম অভ্যর্থনা রমলার সুখ গোপন থাকেনি। রমলা হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত ও প্রাণচঞ্চল। রমলার স্বামী ওদ্বিকে সংসার করে আর চুটিয়ে আড্ডা দেয়। রমলার কোন পরিবর্তন কোনদিন তার চোখে পড়েনি। কিন্তু রমলা বুঝতে পারছিল যে সে জড়িয়ে পড়ছে। পরিণতি কখনই সুখের নয়। তাই সে একদিন অরূপকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। রমলা বুঝতে পারে সংসারের সুখ যদি কিছুক্ষণের হয় সংসারের বাইরের সুখ কিয়ৎক্ষণের। অরূপকে সংযত হওয়ার কথা বারবার বলে সে যখন নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল তখন অরূপ ধীরে ধীরে নারীর মুখ থেকে সংযত হওয়ার কোমল পরামর্শের মধ্যে প্রশ্রয় খুঁজে নিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠছিল। রমলা ছিল নিঃসন্তান। তার স্বামী ভুলে থাকতে চাইলেও তার মনে দুঃখ ছিল। রমলা এমনিতেই স্বভাবে ভক্তিভাবী। তারপর তার নিঃসন্তান অবস্থা তাকে আরও নীরস করে দিয়েছিল। পাড়াপড়শি আর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঐ একই প্রশ্ন বারবার শুনতে শুনতে তার আর কারুর সাথে মিশতে ইচ্ছে করত না। নিজেকে খুবই গুটিয়ে নিয়েছিল। তার স্বামী পুলিশ বিভাগে সাধারণ চাকরি করত। এক দুর্ঘটনায় তার স্বামী অকালে মারা গেল। রমলা তার স্বামীর চাকরিতে বহাল হ'ল। এরপর রমলার সাথে অরূপের বহুবার দেখা হয়েছে, সৌজন্যমূলক হাসি আর দৃষ্টি বিনিময় করেই শেষ হয়েছে হঠাৎ দেখা হওয়ার পালা।

সুমিতার বিয়ে হয়েছিল প্রণবের সঙ্গে। বাবা-মার দেখে দেওয়া পাত্র। পাত্র মেধাবী। উন্নত ও আধুনিক মনের : বাংলার অধ্যাপক।

অরূপ নারীসঙ্গ ছাড়া কিছুতেই দিন কাটাতে পারে না। জীবনে অনেক মেয়ের সাথে মিশেছে কিন্তু কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবার কথা ভাবেনি। রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণার গান শুনে ওর সাথে আলাপ হয়েছিল। তারপর কিছু মেলামেশা। লেকে, রেস্তোরাঁয় আর সিনেমা-থিয়েটারে ওদের সম্বন্ধটা গভীর হয়েছিল। দুজনেই দুজনের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। একদিন ওরা ঠিক করেই ফেলল যে বিয়ে না করে ওরা সহবাস করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বিয়ের মধ্যে যে একঘেয়েমি আছে তা নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা করেছে। বিয়ে করলে পরস্পরের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়ে সে-দায়িত্ব পালন করার মতো মানসিকতা দুজনেরই ছিল না। ওরা ভেবেছিল উভয়ে উভয়ের সঙ্গ পাবে অথচ মুক্ত থাকবে, কেউ কারুর কাছে বাঁধা পড়বে না। ওরা দু-জনেই বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে সংসার দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। নতুনত্ব একটা কিছু চাই। ওরা ঠিক করেছিল কেউ কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না, কেউ কারুর ব্যাপারে নাক গলাবে না আর যখন ইচ্ছে হবে একজন আরেকজনকে ছেড়ে যেতে পারবে। ওরা ভাবত আর বলত সহবাসের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে, বিয়ের মধ্যে যা নেই। দুজনেই স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে ভেবেও ওরা আনন্দ পেত। কৃষ্ণা আর অরূপ সহবাস করে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

সুমিতার দিন যায় সাধারণভাবে। প্রণবের সাথে বয়সের তফাৎ একটু বেশি-ই। সুমিতার সাথে তেমন উজাড় হয়ে মিশতে পারে না। সংসারে যদি অব্যক্ত কোন বেদনা থাকে তো আছে কিন্তু সংসার পুরো স্বাভাবিক নিয়মেই চলে এবং সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোন ঘটনা কারুর দিক থেকেই ঘটেনি। প্রণবকে একটা চিন্তা ঘিরে রাখে, সেটা হ'ল চাকরির কারণে ভাঁহ হওয়া নইলে কোন উদ্বেগ নেই। স্বামীর সাথে বাড়িতে থেকেও সুমিতার প্রায়ই একা একা লাগে। পত্রিকা, ম্যাগাজিন আর টিভি নিয়ে সময় কাটে। বাইরে বেরুলেই বাপের বাড়ি যেতেই বেশি ভালো লাগে। মার্কেটিং-এ তেমন কোন উৎসাহ নেই। যা না হলে নয় সেটুকুতেই সুমিতা সন্তুষ্ট থাকতে পারে। সবের মধ্যে যেটা একটু চোখে পড়ে সেটা হ'ল প্রসাধন জিনিসের মার্কেটিং। সময়ে সুমিতা একটি কন্যা সন্তানের জননী হয়েছে। মেয়ের তদারকির কাজ হাতে আসার পর সুমিতার সময় বেশ ভালভাবেই কাটে। তখনো কখনো যেন সময়ের অভাবও ঘটে। প্রণব ভালো মানুষ। শান্ত প্রকৃতির। কারুর সাথে উঁচু গলায় কথা বলে না। এমনিতে অমায়িক স্বভাবের। প্রণব শুধু যা পারে না তা হ'ল বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে যতটা সময় দিলে ভাল হয় তা দিতে পারে না। বাইরে বেড়িয়ে আসা, লক্ষ্যহীনভাবে স্ত্রীকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কিম্বা লেকে-পার্কে যাওয়া ইত্যাদি বিবাহিত জীবনের বাইরের এই অনুষঙ্গগুলির প্রতি প্রণবের কোন আগ্রহ ছিল না। সুমিতা প্রথম প্রথম ওর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কিন্তু কোনদিন তার ইচ্ছা জোরদার করতে চায়নি। সবই মেনে নিয়েছিল। এক অর্থে সুমিতার সংসার আদর্শ সংসার ছিল।

অরূপ সুমিতার সাথে যোগাযোগ রেখে চলত। মাঝে মাঝে সুমিতার বাড়িতে এসে প্রণবের সাথে গান কবিতা আবৃত্তি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত। প্রণবের কাছে অরূপের কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। যেটুকু পরিচয় পেয়ে প্রণব অরূপকে গ্রহণ করেছিল তা সুখের ও আনন্দের। বাংলার অধ্যাপক অরূপের আলোচনার বিষয়বস্তু সহায়ক বলেই মনে করত। সুমিতা অরূপের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে কখনো কখনো কল্পনার অনুমানে কালো মেঘের ছায়া দেখতে পেত। কিন্তু সুমিতার অবস্থা এমন যে ও সবকিছু খুলে প্রণবকে বলার ঝুঁকি নিতে পারছিল না। সুমিতা ও অরূপের পূর্ব পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা না জানলে আপাতভাবে ওদের দুজনের কারুর কাছে এমনকী প্রণবের কাছেও ওদের সম্বন্ধ নির্মল এবং সন্দেহ বা আপত্তির কোন অবকাশ ছিল না। বরং অরূপ সুমিতার বাড়িতে সম্মানিত অতিথি। অরূপ সুমিতার সাথে অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি।

কৃষ্ণা অরূপের মতোই উদ্দাম। বছর তিনেক পার হতে না হতেই কৃষ্ণা ও অরূপের মধ্যে নানাবিধ কারণে কলহ শুরু হ'ল, এমনকী হাতাহাতিও। অথচ কেউ কাউকে ছেড়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারছে না। অরূপের অনেক ভাল দিক আছে তারপর পুরুষ বলে ওর পক্ষে একা হয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই কিন্তু কৃষ্ণার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। কৃষ্ণা সহবাস করতে করতে অরূপকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। অরূপের ওপর ধীরে ধীরে চেপে বসতে চাইল। অরূপের গতিবিধির ওপর জবাব চাইতে শুরু করল। অরূপ এই রকমের সহবাসের কথা সরে নিতে পারছিল না আর তাইতেই শুরু হল ঝগড়াঝাটি। কৃষ্ণা একটা থিয়েটার গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল। ঐ থিয়েটার গ্রুপের কয়েকজন এসে একদিন অরূপকে শাসিয়ে গেল। কৃষ্ণার ওপর কোন অত্যাচার তারা সহ্য করবে না। কৃষ্ণা যখন এইভাবে বাইরের লোক এনে অরূপকে শাসাল তখন অরূপ বুঝল কৃষ্ণাকে নিয়ে আর চলবে না কিন্তু কিভাবে কৃষ্ণাকে ছাড়বে বা কৃষ্ণার কাছ থেকে

মুক্তি পাবে তাও বুঝতে পারছিল না।

এদিকে সুমিতার ছোট দুর্বিন, তাকে পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা করা দরকার। প্রণব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, তার একদিক প্যারালিসিস। ডাক্তাররা বলছেন ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সারতে সময় লাগবে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরার পর ফিজিওথেরাপি কদিন চালাতে হবে এবং হাঁটা-চলা ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে। অরূপ হাসপাতালে যায় সুমিতাকে যতটা সাহায্য করা যায় তা আন্তরিকভাবেই করে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর অরূপ সুমিতার বাড়িতে অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রতিদিন যায়। সুমিতার সংসারের বাইরের অনেক কাজ করে দেয়। মাঝে মাঝে প্রণবের সাথে আগের মতোই আলোচনা করে, সুমিতাও যোগ দেয়। আগে অরূপ এলে প্রণবের সাথেই কথা বলত, সুমিতা বড় একটা আসত না, অন্য ঘরে বসে-শুয়ে কাটাত। এখন প্রণব, অরূপ ও সুমিতা একসাথেই বসে আলোচনা করে। ছোট্ট মেয়েটা এসে মাঝে মাঝে সবাইকে বিরক্ত করে সবাই-এর মনোরঞ্জন করে। এমনি করেই চলল অনেকদিন। কৃষ্ণা চলে গেছে। যারা তাকে দেখতে এসেছিল তারা কৃষ্ণার এই উপকারটুকু করতেই এসেছিল। কৃষ্ণাকে ছাড়িয়ে তাদের একজনের সাথে জড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কৃষ্ণার হয়ে শাসাতে এসে কৃষ্ণাকে কোমল করা গিয়েছিল। তারপর বোঝানো সহজ ছিল যে এইভাবে সহবাস করা যায় না। পুরুষশাসিত সমাজে সহবাসেও নারীর ওপর অত্যাচার হতে পারে এ-কথা একজন পুরুষই কৃষ্ণাকে বোঝাতে পেরেছিল। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্বাধীনতা লোপ এবং লাঞ্ছনার কথা পুরুষের মুখেই নারীর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

তারপর যে কী হল! সুমিতা ধীরে ধীরে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। অরূপের কাছ থেকে কবিতার বই চেয়ে পড়তে আনন্দ পেত। কবিতার বই কিনতে শুরু করল। প্রণবের সাথে কবিতা, আবৃত্তি, গান আর সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বেশ আগ্রহী হয়ে উঠল। অরূপ এলে সুমিতাকে খুব উজ্জ্বল লাগে। আবার কখনো সুমিতা হয়ে উঠত বেশ গম্ভীর, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। সুমিতা ভাবে জীবনের কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। একটির পর একটি ঘটনা আমাদের কেবলই সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে নিচ্ছে। ক্ষুদবুদ্ধিতে আমরা কোন ঘটনায় অদৃষ্টের রূপ আরোপ করি। ঘটনার রূপ পাল্টায়, তবু দেখতে পাই না। একটি ঘটনা এমনকী একটি মাত্র ঘটনা সময়ের অন্তরালে দুঃখ ও গ্লানিময় জীবনের সূচনা করে তাকে উত্তরণের পথ ধরে একদিন আনন্দময় করে তোলে। চোখ মেলে দেখলে এ-সবই সকলের চোখে পড়ে।

প্রণবকে অসহায় লাগে। শয্যাশায়ী। কখনো কখনো অরূপ বাড়িতে এলে অরূপ ও সুমিতা অস্ফুটস্বরে চুপি চুপি কিছু কথা বলছে বোঝা যায় কিন্তু কি কথা বলছে জানা যায় না। মনটা খুঁত খুঁত করে। কী যে হ'ল! অরূপ এত ভাল ছেলে, সুমিতা এত ভাল মেয়ে তাছাড়া বিবাহিতা, ওরা কি ভুল কাজ করবে! সুমিতা প্রকৃত গৃহবধূ, ওকে নিয়ে ভয় করার কি আছে! প্রণব আবার অন্যভাবেও ভাবে। পৃথিবীতে যত ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে সবই নিজের জীবনে ঘটলে তবেই তা বুঝতে পারব এমনটি কী ভাবা যায়! তথাপি অনেককে দেখলে তাই মনে হয়। এই মনে হওয়ার মধ্যেও ভ্রমের বিস্তর অবকাশ আছে। সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে দেখি সাহিত্য তখনই খুব ভাল লাগে যখন দেখি কোন ঘটনা হয় নিজের জীবনের সাথে মিলে যায় কিম্বা আমার মনোজগতে যে অসংখ্য জীবনের ছবি আছে তাদের সাথে মিলে যায়। সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরা তত অসংখ্য জীবনের সৃষ্টি করেন — সবই কি তাঁদের নিজের জীবনে পাওয়া! তবে বুঝতে অসুবিধা কোথায়!

অরূপের সঙ্গে সুমিতাকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। অরূপ আসে-যায়। সুমিতাকে দেখতে পায়, সুমিতার সাথে গল্প করতে পায়, সুমিতার উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে — এতেই ওর আনন্দ, এতেই ওর সুখ, এতেই আছে ওর বাস্তব ও স্বপ্নবাস্তবের সব চাওয়া। অরূপ ভাবে পথ চলাতেই আনন্দ, পথ চলাতেই অনুভূতির জাগরণ, পথ চলার আয়োজনটুকু যেন শেষ না হয়। কে যে ভিতরে আমাদের সকলকে এগিয়ে নিচ্ছে জানি না, চোখে পড়ে আমরা সকলে সকলকে এগিয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছি। যে আমাকে তাকে আসতে দাও, ঘটনা যে-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে সেইভাবে প্রকাশ পেতে দাও, আসল চেহারাটা দেখতে দাও, সেই চেহারার মধ্যে যদি প্রথম দেখায় অভিজ্ঞতার বোধ জাগে সেই অভিজ্ঞতার স্বরূপটুকু পেতে দাও, সেই চেহারার মধ্যে যদি জীবন-তত্ত্বের কিছু ধরা পড়ে তার মুখোমুখি হতে দাও। যে আসছে তাকে সময়ের সঙ্গে বরণ করব। সময়ের কাছে আছে চাওয়া-পাওয়ার অসংখ্য সম্ভার। সময়ের মধ্যে অসময় নেই ভয় পেতেও ভয় হয়।

তারপর যে কী হ'ল —

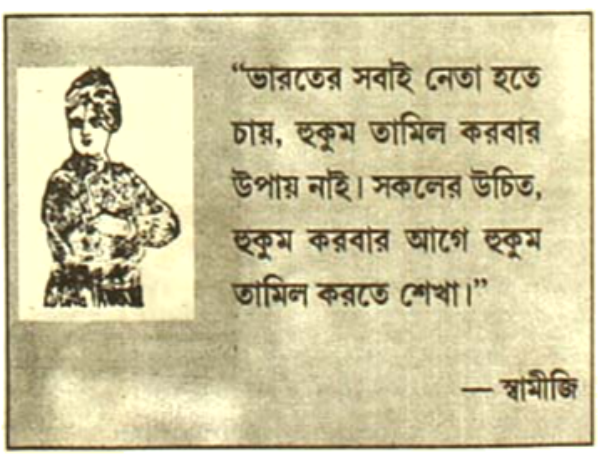

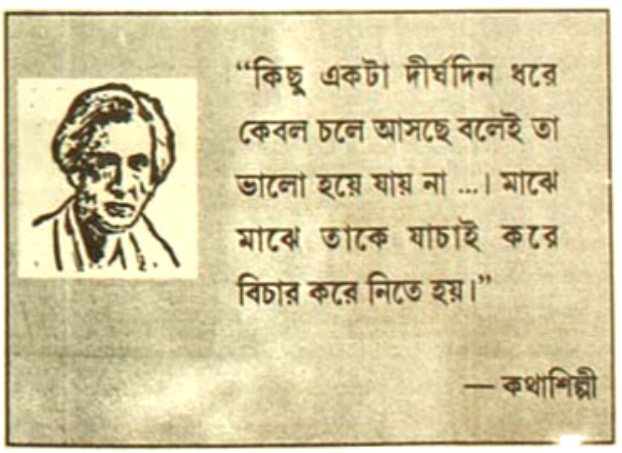

বুকে সংকল্প

চোখে মোদের সোনালী ভবিষ্যৎ

দেশের কৃষিক্ষেত্রে বইছে দিন-বদলের হাওয়া। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কৃষির অগ্রগতি। কালের চাহিদা-সারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। তিন দশক ধরে মাঠে মাঠে সাফল্যের ফসল তুলছে একটি নাম—ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড, বা ইফকো। তৈরি করছে চেতনা। সবুজ বিপ্লবের তাগিদে জেগে উঠছে সারা দেশ।

নতুন দিন আনে নতুন চ্যালেঞ্জ। ইফকোও নতুন শতাব্দীর জন্য তৈরি হচ্ছে। সার্বিক বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়েছে এক ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-'ভিসন ২০০০'। সারের দুনিয়ায় ইফকো হবে শুধু দেশের সেরা নয়, বিশ্বের সেরা। বিরাট পরিকল্পনা, রূপায়ণে চাই অবাধ গতি। আরো প্রসার। আরো বৃদ্ধি। আরো বিশাল বিকাশ। নক্‌শা তৈরি। কাজও শুরু।

IFFCO

ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড

একটি স্বপ্ন, একটি সন্ধান

হিমঘরে অগ্ন্যুৎপাত

দিব্যেন্দু লাহিড়ি

হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকেই দাওয়ার ওপর নেতিয়ে পড়ে নকড়ি। ক্লান্তি-বেড়ার গায়ে কোন্ ঢ্যারা-দলা আর চুকচুকে কিংবা বেন বড়ে বাবুই-বাসার মতই চোখের সামনে দুলে ওঠে। আপনা-আপনিই চোখের পাতা ওপরথর করে কাঁপতে থাকে। বুকের মধ্যে টিবটিব। গলার কাছে বমিবমি। হাত-পা সারা শরীর ক্রমশ অবশ। — একটু পরেই শালিকের কগড়া বাধানো হাউ-হাউ কান্না।

কান্না শুনেই ঘরের পেছনের কলা গাছের আড় ছেড়ে গামছা কাঁধে পড়ি-মরি বেরিয়ে আসে ফুলমণি। নকড়িকে ওই অবস্থায় দেখে ভাবে — আর রক্ষে নেই, এবারে নির্ঘাত আলের পালা। ধান পাড়া, হাট পাড়া শেষ করে শয়তানের দল এবারে নিশ্চয়ই এদিকে তেড়ে আসছে। তাহলে উপায়? এক ছুটে ঘরে ঢুকে জানলা দরজা দুদ্দাড় বন্ধ করে দেয়। পাল্লার ফোকড়ে নেকড়া গোঁজে। তারপরে উঠোনে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে জ্বালানি শুকনো পাতা ও আগাছা উঁই করে জমা করে। মনে মনে কষি আঁটে — আসার আগেই আগুন দিতে হবে। ধোঁয়ায় নিশ্চয়ই পালাবে। দু-দিন আগে পথকুড়োর মা এরকম কথাই বলেছিল। কষিটা যার করা হলেও ট্যাপা-টোপা বোকা চাউনি ফুলমণি নিজেই নিজেকে তারিফ করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়। তারপরে পায়ে পায়ে নকড়ির সামনে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ায়।

বাঁ-হাতে নাকের শিকনি মুছে কোঁপাতে কোঁপাতে নকড়ি জিজ্ঞেস করে, — ও ওলানে কি হবে?

— আগুন দিব।

— কুথায়। আমার মুখে?

বুকের ভেতে ধড়াস করে ওঠে ফুলমণির। কি অলক্ষুণে কথা রে বাবা। মানুষটার কি মাথা খারাপ হয়েছে। অস্ফুটে বলে, — ওনিছি আগুনে উঁয়া পালায়।

বিরক্ত হয় নকড়ি, — ইখানে আসবে কেন? ইখানে কি বস্তা উলুর করা হয়েছে?

— তাহলে তুমি চুকরায় কাঁদ কেন?

নকড়ি হাঁ হয়ে যায়। এ নাগি বলে কি? আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল আর আমি কাঁদব না! বউকে গাল দিতে গিয়েও পারে না। ভাবে ওনলে যদি ও অজ্ঞান হয়ে যায়। ওর কি দোষ? ও তো এখনও জানে না। চোখে চোখ রাখতেই আর নিজেকে সামলাতে পারে না। — ফুলি রে, সব্বনাশ হয়ে গিছে, সব্বনাশ গিয়ে একদম এ-কেঁউ ও-কেঁউ।

— আঁই না! কাকে মারল? খুন পাটি?

— কাকেও না, আমাকে - আমাকে। সকাল থিকে লাইন দিয়ে দশ বস্তা বার করেছি, লাস্টা বস্তাই — চাচালে উলুর করা মাল্লই।

আর খুলে বলতে হয় না। জ্বাল-ক্যাল করে ফুলমণি এদিক ওদিক তাকায়। অপরিচিত দৃষ্টিতে নকড়িকে দেখে। তারপরে ধুপ করে পা ছড়িয়ে বসে দু'হাতে বুক চাপড়ে চিৎকার করে ওঠে, — অরে আমার কি হল রে — এত বড় সব্বনাশটা কুন গুনন করল রে — হে ভগবান তুমি তাকে কানা করে দেও। তার গায়ে পুতা পড়ুক, জিবে কুষ্ঠে হোক — নিবংশে হোক। অরে আমার টাবু রে —

কান্না শুনে আশ-পাশ বাড়ির দু'একজন উঁকি-ঝুঁকি মারে। কিন্তু বাড়িতে কেউ ঢোকে না। অনায়াসেই বুঝতে পারে হিমঘরে লাশের সংখ্যা আর একটা বাড়ল।

ক'দিনের মধ্যেই গাঁয়ের চেহারাটা বদলে গেছে। কান্না, কগড়া, চিৎকার, উত্তেজনা, মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, সরকারি আমলা কর্মচারিদের আনাগোনায় সর্বদাই টান-টান। এবেলা ওবেলা নতুন নতুন গুজব। দুর্গন্ধে বাতাস ভারি। সঙ্গে উপদ্রব — মাছি।

লক্ষ লক্ষ নীল-কালো মাছি। আকারে গো-মাছির মতই কিংবা একটু বড়। আকাশ কালো করে ধেয়ে আসছে। যেখানেই বস্তা খোলা হচ্ছে সেখানেই আক্রমণ। রোগের ভয়ে অনেকেই পালিয়েছে। সঙ্গতি যাদের আছে তারা ওষুধ ছড়িয়ে পরিবার-পরিজনদের কোনক্রমে আগলাচ্ছে।

সমবায়মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, বিদ্যুৎমন্ত্রী ও সঙ্গিনমন্ত্রীদের ঘন ঘন কাজিয়া-বৈঠক। পরস্পর দোষারোপ এবং সংবাদপত্রের চাপান-উতোর যাতায়াতেই শান্ত নিরুম হরিৎ গ্রামকে খাক করে তুলেছে। ছোট চাষী প্রধান গ্রাম এই হরিৎ। এ গাঁয়ের প্রধান চাষ ধান আর আলু। যারা চাষী নয় তারাও নরশুনে আলুর ব্যবসা করে দু-পয়সা আসান। কল-বারো মাইলের মধ্যে সাত-আটটি হিমঘর। বয়েসে সর্বকনিষ্ঠটি এখানে, এবং সেটি সমবায় হিমঘর।

ঘটনার সূত্রপাত ক'দিন আগে। সমবায় হিমঘরের বস্তা দেব করা মাত্রই দেখা যায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ আলুই পচা। ছাট কেজির বস্তায় দু-আড়াই কেজি স্বাভাবিক-ভাবেই নষ্ট হতে পারে। এতকাল তাই হয়েও এসেছে। কিন্তু সব আলু। এ যে বজ্রপাত। চাষী, ব্যবসায়ীরা, দালাল, ফড়ে, হিমঘর-কর্তৃপক্ষ-কর্মচারি সবার মাথাতেই হাত পড়ে। আশপাশের ব্যক্তিমালিকানা হিমঘরের আলুও বের হয়। কিন্তু সেখানে সব ঠিকঠাক, যত কারেলা হরিৎ গাঁয়ে। খবর ছড়ায়। ঘনায় এ সময়ে আলু বেচে ফেলার কথা নয় তাদেরও বেচে ফেলে পড়ে। বস্তা বস্তা আলু পচা। কাঁচা থেকে বের করে চাচালে শুকনোর আগে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু চামড়া ভিজে ভেতরে কাটা মাত্রই দুর্গন্ধ। সে দুর্গন্ধে কেউ টিকতে পারে না। হাজারে হাজারে নীল-কালো মাছি কোথা থেকে যেন এসে লক্ষ ঝুলে ঝনঝন করে। কেউ সেখানে থেঁষতে পারে না। হিমঘরের শতাপতি, সম্পাদক পালাবে অফিসার, ম্যানেজার নিখোঁজ। সবার থেকে, কলকাতা থেকে, অফিসাররা ছুটে আসেন। বিধানসভায় হৈ-হট্টগোল-হাতাহাতি। দুষ্টচক্রের আলুব্যবসায়ীদের আলু নষ্ট অভিযোগে সভা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। প্রশাসন নাড়ে-চড়ে বসে। স্বাস্থ্য কর্মীরা গাঁয়ে এসে ওষুধ ছিটায়। পচা আলু পুঁতে দেয়। শেষে তারাও হাল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ভগবান আমার বুক ধাঁধে কিন্তু মানুষ! যদি তাদের বস্তা বজ্জা পায়। নকড়িরও বিশ্বাস ছিল। সে কোনদিন কারও ক্ষতি করেনি। সুতরাং ভগবান তারও কোন ক্ষতি করবে না। তার বস্তা ঠিকই থাকবে। এলাকার সবচাইতে বড় হিমঘরের সব আলু কি কখনও খারাপ হতে

পরে?

তিন কিস্তির মধ্যে এইবারই প্রথম কিস্তির আলু বের করা। আর ক'দিন পরেই বের করবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পচা আলুর খবরে দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় আর স্থির থাকতে পারেনি। এ চাষ ও ব্যবসার হাতে খড়ি বলে খুব স্বাভাবিক কারণেই আলাটা ছিল একটু বেশি।

গতকালই গণেশবাবুকে ছুটির জন্যে বলেছিল, — বাবু, কাল কিন্তু আসতে পারবনি।

— কেন রে, তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাবি?

— না বাবু, সেবার গিয়েছি নোট। আর যাবনি। কাল আলু বালাস করব। কি যে কপালে আছে!

গণেশবাবুর কপালেও ভাঁজ পড়েছিল, — খপ্পর দিবিনে না। অন্য হিমঘরের থেকে ভাড়া কম বলে তোরা সব ওখেনে — তোর আলু তো কম?

— মাত্র সত্তর বস্তা।

— কিন্তু ভাবিসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভরসা পায় নকড়ি। গণেশবাবুকে ভাল এ জন্যেই লাগে। কত বড় মানুষ — তেরোকলের মালিক, ইস্কিতে বড় ইস্কুলের মাস্টার, পার্টির নেতা, পঞ্চায়েতের কর্তা — কিন্তু কোন দেমাক নেই! এমন উপকারি মানুষ এ যুগে দেখা যায় না ওই মানুষটাই তো বলেছিল — তুই কি চিরদিন গোলদারি করেই কাটাবি নাকি? তিলি, তিসি, বাই, সবকেকেড়ে শুকিয়ে ক'দিন চলবে? তুই নিজেই যে শুকিয়ে যাবি!

দুধ ফুটে পড়ে বলেই ফেলেছিল নকড়ি। — একটা চাকরি দেন না বাবু।

— দূর বুদ্ধু, চাকরি কি গোলার ধান যে, ফুকো ঝুললেই গরগরিয়ে বের হবে? আরে —

চাকরির বাকা সরকারি
তো চাষের বাসী তরকারি

সরকারি চাকরি ছাড়া খুব নাই যেমন, তেমনি আলু ছাড়া তরকারিতেও স্বাদ নাই। বুঝলি নকড়ে — আলুর চাষ কর।

— ন্যাংটা ভিখিরিকে রাজভোগ খেতে বলছেন বাবু?

— নকড়ে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমার বাবা তেরোকল করে দেয়নি। তুই একটা হামদো জোয়ান হয়ে যদি কানে পাতা চাপা দেওয়া ছাগলের মত ন্যাদোস হয়ে থাকিস তাহলে পেট ভরবে? ভরবে না। গর্জে ওঠে। সরষে থেকে তেল বের করতে না জানলে তোর তেলও যে আর একজন বের করে নেবে।

— হ্যাঁ বাবু, নিরানব্বইটার তেলও নেয়।

— তাহলেই বোঝ। — তাই বলছি, আলুর চাষ কর। করবি? গোলাবাড়ির পেছনের জমিটা। দেখেছিস? আড়াই বিঘে। পড়েই আছে। বাড়ি থাকলে বলে বন্দোবস্ত করে দিই। তুই করলে কেউ আর ঝামেলা দেবে না। আমিও নিশ্চিন্ত হব।

জীবনের আসল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ওই আড়াই বিঘেতেই।

এক সময়ে দুজনের কান্নাই বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। কারও দিকে তাকায় না। সন্ধ্য আওনে পোড়া বাড়ির ছাদে ধুপের ছাই-কালি ধোঁয়ার দিকে যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নকড়ি উঠে দাঁড়ায়। ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। ফুলমণি তখনি বসেই থাকে। কাঁদ কিংবা অন্তে আস্তে কত কথাই না মনে পড়ে।

দু'গাছা চোরের চুড়ি, নাকছাবি আর সরু চেন পাঁজা-ঘুড়োর কাছে বন্ধক রেখে, গণেশবাবুর কাছে কর্জ নিয়ে জমি তৈরি শুরু হয়েছিল। বন্ধক রাখার কথা গণেশবাবুকে জানায়নি। জানলে রেগে যেত। কেননা বাবুই ওকে বলেছিল — নকড়ে, ঘরের লক্ষ্মীর গয়না বাঁধা দিয়ে কখনও চাষ বা ব্যবসা করনি, ওতে অলক্ষ্মী হয় না অন্নপূর্ণা বেজার হয় — তাই কি এই সর্বনাশ! মানুষটা কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল — আর পারবে না। তিন ঘড়ের ঘরটুকুও যাবে এবারে। বাবুর কর্জ মেরিতে ওখনেও না হয় চলবে। কিন্তু পাঁজা-ঘুড়ো? আলু উঠতেই দু-বস্তা এমনিতেই দিতে হয়েছিল খাওয়ার জন্যে। তাও কত কথা।

— হ্যা ফুলি, তোর কত্তা ঘরে আছে?

— না, এখনি আসবে। বলেন ঘুড়ো।

— না রে! সময় বড় কম। তা নকড়েকে ওখুদ তো ও কি বেছে বেছে আমাকে ঘুড়ে আলু আর চাষি -আলু খেতে দিয়েছে? লজ্জা পেয়েছিল ফুলমণি। তাও কি কখনও সম্ভব? গরম ঘুঁড়ের চাপে কি সব আলুই ঘামি হয়? তা যদি হত তাহলে তুলতে তো কেউই লাগল দিত না। লাল চাষি রোগ তো ভেতরের ব্যাপার। বাইরে থেকে তা কি টের পাওয়া যায়? অস্ফুটে বলেছিল — কি যে বলেন ঘুড়ো, দু'একটা হতে —

— না রে মা, দু'একটা না — গোটা বস্তাই। যাক ওকে বলিস আর এক বস্তা যেন দিয়ে আসে।

নকড়িকে সে কথা বলতেই সে খারাপ কথা বলেছিল, — শালা বুড়া শুকুন। কেমন নোলা দেখিছ! বলছি হত আপনের অলপুটার চিটা গুড় মকারে খান।

আলু বীজ বোনার দু'হপ্তা আগে যেদিন জমিতে কলিচুন মেশানো হয়েছিল প্রায় সারাদিন সেও পাশে পাশে ছিল: সরু চিরুনিতে উনুন সাফের মতই জমির খড়-কুটো-কাঠি-ঢিল পরিষ্কার করে মাটিতে চুন মলাম দিয়েছিল। তাই দেখে লাজুর মা মুখ টিপে হেসেছিল। — কোলে নাই মাণিক, ও আলু খাবে কে? আলু না ফলাবে —

প্রথম সর্বনাশ টাকুর মৃত্যু। তিন দিনের জ্বরে দু'বছরের বাচ্চা চোখ বুজেছিল। আর খোলেনি। ওর মুখটা মনে করলেই বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে। — বাবা রে। তুই থাকলে তোকে জড়িয়েই বাঁচতাম। কত বড় হয়ে গেল তারকেশ্বরে জল ঢেলে আর তো তোকে পেলাম না। ভক্তার, কবরেজ, হেকিম, তাবিজ-কবচ সবেতেই খাসা রোগ। আর দ্বিতীয় সর্বনাশ এই আলু। হিমঘরের না দেখা আগুনে সব ছারখার। সে আগুন মাছি হয়ে, মাড়ি হয়ে ধেয়ে আসছে। কেউ রেহাই পাবে না। মাছি — মাছি — নীল কালো ডেঁয়ো মাছি লাখে লাখে তাড়া করছে পচা গলা দুর্গন্ধের ভাগাড়ে যেন শকুন হামলে পড়ছে। চারদিকে শ্মশান শ্মশানের মরণ-বাতাস বইছে। অথচ এই আলু ওঠার বহু আগে থেকেই যেন বাতাসে তার বুক-ভরা সুঘ্রাণ ভেসে আসত। প্রতিটি গাছ-গাছালি শাক-সব্জির আলাদা আলাদা গন্ধ আছে। চোখে না দেখলেও ওই গন্ধেই বলে দেওয়া যায় বছরের একটা কোন সময়। সজনে-ডাঁটির গন্ধে গরমকাল, বাতাবি লেবুর গন্ধে বর্ষাকাল, আলু-কপির গন্ধে শীতকাল। আলু বীজ আনার আগে নকড়ি একদিন মুচকি হেসে বলেছিল, — কোন আলু লাগাই বল দেখি?

— সবাই যা লাগায়। — কিছু না বোঝাই উত্তর দিয়েছিল ফুলমণি।

— দূর, ভাল-মন্দ জাত আছে না। সব বউই কি এক? কেউ টোপা কুল, কেউ যুলো কুল, কেউ খুদোর খেলানো ওল, কেউ মাখন গলা ওল। বাঁদর খোবাও আম — মধুমতিও আম।

— যা রে আমি কি অত জানি?

— ওকথা শুনবনি। তোমাকেই বলতে হবে। জ্যোতি — না চন্দ্রমুখী।

— ঘুটের মধ্যে তফাত?

— তোমার আমার যা — ঠিক তাই। জ্যোতি আমার মত গায়ে কাটা দাগ — খসখসে। আর চন্দ্রমুখী তোমার মত টেলটেলে।

— অসভ্য!

শক্ত দু'হাতে হঠাৎই তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল নকড়ি। তারপরে ফিসফিস করে

বলেছিল — চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী।

গ্যামাক্সিন দিয়ে আলু পচা বন্ধ করার একটা বন্ধুল হঠাৎই কি করে কেন চাউর হয়ে যায়। নিস্তাল পাথরের মূর্তির মত নকড়িকে দু'দিন একটু অন্যরকম দেখায়। পনেরো বস্তা আলু। বেগুলোতে পচন কম, এনে উঠোনে রাখে। গ্যামাক্সিন মেশায়। দু'দিন পরে অবাক হয়ে দেখে — আর পচছে না। মাছিও উড়ছে না! খুশিতে কেটে পড়ে, ফুলি রে, আমি জানতেম ভগবান ক্ষতি করবেনি। আসছে বার ভারকেশ্বরে বিল ঘড়া ঢালব। দুই মাসের মধ্যেই চালের ঘড় পাল্টাব। না না, মজুর লাগাবনি, আমিই ছাইব। তুমি ছুড়ে ছুড়ে আটি যোগান দিবে আর ব্লাউজের হাতায় ঘাম মুছবে।

বেশ কিছু কম দামে সাত আট বস্তা আলু বিক্রি হয়ে যায়। নকড়ি হাতেই সন্তুষ্ট। বিড়ি টানতে টানতে বলে, — লাভই আছে। লোকসান হয়নি। তোমার এলুমিনির ঘড়া এবার আমি কিনবই কিনব। সেই সঙ্গে লোহার একটা দু'মুখো হাতা, তাবু ও খোন্তা। ইদিকে ডাল খোঁট। তো উদিকে কুচো মাছের চচ্চড়ি। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই মাথায় বাড়ি পড়ে। গ্যামাক্সিন দেওয়া আলু কোনমতেই খাওয়া সম্ভব নয়। রান্না করলেও তাতে ভয়ঙ্কর ওষুধের গন্ধ। টাকা ফেরত দিতে হয়।

জমির ওপরেই আলুর বস্তা সাজিয়ে রাখে নকড়ি। রাতদিন পাহারা দেয় কেন মাছি না বসে। দু'হাতে একটা খলপার টুকরো নিয়ে ছুটে ছুটে বাতাস করে বস্তায়। কিন্তু কিসের কি? খলপার বাতাসে এদিকের মাছি ওড়ে তো ওদিকে ভনভন করে। আরও ঝাঁক বেঁধে আসে। দুর্গন্ধ বাড়তে থাকে। কোন কোন বস্তায় পোকা কিলবিল করে। পাড়া প্রতিবেশী পচ্চারীদের বমি ঠেলে আসে। নকড়িকে আলু নষ্ট করে দিতে বলে। কিন্তু নকড়ি নির্বিকার। শুধু মাছি তাড়ায় আর গাল দেয়। চোখ পাকিয়ে মাছিদের সঙ্গে ঝগড়া করে। শাপ দেয়, অভ্রান্ত বিষ্ঠির কন্যা ছোটায়। তাই দেখে সবাই বলে নকড়ি পাগল হয়ে গেছে।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে নকড়ি একেক সময়ে ভাবে — হায় রে আমার চন্দ্রমুখী। কত স্বপ্নে কত আশায় রয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম চালের লাউডগায় ওপরে প্রজাপতি নাচবে। গঙ্গাফড়িং ঘাড় উঁচু করে অবাক হয়ে তাই দেখবে, তারপরে একদিন পুতুওড়ার কৃষি মেলায় ফুলমণিকে নিয়ে সারাদিন ঘুরবে।

— ও ফুলি, কি নেবে? ধনেখালি, না শান্তিপুরী?

— তুমার যা পছন্দ।

— আমার পছন্দ টিভির সাবান সুন্দরীদের মত পাতলা জাদিরা।

— আই মা, উসব পরে নাকি! তুমি কি গ? তুমাকে —

— চুপ চুপ, নাইকে আমার নাম করে কেন? — চোখ বুঁজেও নকড়ি দেখতে পায় অফিসারের হাত থেকে সে পুরস্কার নিচ্ছে। — এবারে এ কেলার সব চাইতে কম জমিতে বেশি আলু ফলিয়েছে হাত্রিত গ্রামের —

বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। টাবুর মত সবাই ফাঁকি দিল। কেউ বাধা বুঝল না। এভাবে বাঁচার মানে কি? সুদিনের আশা নিয়েই মানুষ বাঁচে। সেই সুদিনই যদি বেরোয় হয় তাহলে তো বলা পচা জীবন। পটাল দিয়ে আর কি তাকে লোকন করা যাবে? যাবে না। নাবী ব্যবসা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। কি দরকার ছিল এই চাষের। কেন তো দিন ওজরান হচ্ছিল বাতাসহীন ওমোটে স্থির পাতার মত। বন্দুকি মাটিতে গজানো হলুদ শাকের মত। পোকরে খাওয়া কুটি কাটা ছিঁড়ে পাতার মত। শিকড়ে লাগা অষ্টাবক্র ডাড়শের মত। মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করে। আর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় হিমঘরে।

থাক ফুঁড়ে আলুর হাল্কা সবুজ কচি পাতা বেদিন বেরিয়েছিল সেদিন নকড়ির ফুর্তি দেখে কে! টাবুর প্রথম কান্না শোনার মতই এও এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আনন্দের চোটে নালিতে, দরকার নেই জেনেও, সেচ দিয়েছিল। এক ছুটে বাড়ি এসে ফুলমণিকে বলেছিল, — ভগবানের কি আশ্চর্য লীলে। বীজ থিকে গাছ। গাছ থিকে ফল। প্রতিটি চারায় জীবন ধুকপুক করছে। পাতলা পাতা মোটা হলেই বাচ্চার মত হাত-পা ছুড়ে খলবলাবে।

— আলুর সোতে তুমি মজলে।

— না ফুলি না। ছোট্ট গাছের জীবন কতগুলো জীবনকে বাঁচাচ্ছে। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক আছে। চাঁদ সূর্য মাটি জল গাছ মানুষ সবাই একই ঘড়িতে বাঁধা।

ফুলমণি বুঝতে পারে না নকড়ি কি বলতে চায়। হাঁ করে শুধু তাকিয়েই থাকে।

— সেই ঘড়িতে হঠাৎ ঢিল পড়ে। বাঁচন আলগা হয়। গণ্ডগোলটা লাগে তখুন। শুরু হয় শয়তানের খেলা। — কি, মাথায় ঢুকলনি? মনে কর এক নাম্বারে বিষ্টি। রোল নাই, কাপড় শুকায় না। চিতি পড়ে। ওই জায়গা কমজোর হয়ে ফুটো হবে। কাপড় ছিঁড়ে যাবে। আবার খরচ করে কিনতে হবে। কিন্তু হিসাবের বাইরে টাকা দিবে কে? ধার করতে হবে। মানে এক বিষ্টির খেলায় যান। ফসলের ক্ষতি, জিনিসের দাম আগুন, রিলিফ, ধার

— সব বাঁচন আলদা। কখুনো ভেবেনি তুমি একা বাঁচবে, সম্পর্ক সবার সঙ্গে।

ঘুম থেকে উঠেই প্রতিদিন ভোরে নকড়ি ছুটত ক্ষেতে। অবাক হয়ে দেখত সবুজ পাতার বুকে হিরের মুক্তো নয়ন রোদে কেমন ঝিকমিকাচ্ছে। কচি-কলাপাতা সবুজ রঙ দিনে দিনে কেমন গাঢ় হচ্ছে। ঝুরঝুরে হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপছে, মাথা দোলাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই যেন দু'হাত বাড়িয়ে কোলে ওঠার জন্যে ছটফট করছে। খুব সাবধানে তাদের গিয়ে আদরো ছোঁয়ায় — যেন ব্যথা না লাগে — তাদের অনুভব করত — ও টাবু সোনা, টাবুবাবু। তোমার গায়ে কেমুন নরম, শিশুর মত পাতলা চুল। গোটা শরীলটাই যেনি ঢেঁড়ের মাথার দুধের ফেনার মত ফুলফুলে। চেহারা রাজপুত্তুর — উঁহু, নবীচোরা কালো কেষ্ট — উঁহু, দেশটি পরা পাথরে কোঁদা কালো বলাই। আর কদিন সোনা, তারপরেই তুমি মুক্তো জোয়ান। তোমার বাতাস আনন্দ প্রাণ ছড়াবে। হাত ছড় সোনা, কত কাজ আমার।

একটা ঘোরের মধ্যে দিন কাটছিল। সারা দেহ-মন ফুর্তিতে চনমন করত। স্বরচিত দু-এক কলি গানও ঠোঁটে গজাতে দেখে উঠত —

চন্দ্রমুখী নও আমার হাওয়ায় উড়ে যায়
আর হাতে বসে নকড়ে মাছি উলুক ঝুলুক চায়।

গান শুনে ফুলমণি হেসেই খুন। — ই আবার কেমন ধরার গান? তুমি মাছি নকি?

— তাহলি কি "না না না নারে নারে নারে" গাব? তোমার নামে আমি তো মাছিই।

— তুমা কোন নামে যাও কিনা কে জানে

— এমুন নচ্ছারপক্ষী থাকতে তুমা নামে যাব কেন?

আলু উঠে বস্তা বন্দী হতেই শুরু হল আর এক যুদ্ধ। বস্তা নিয়ে হাহাকার। কালোবাজারী। যখন বেশি হওয়ার সময় নেতেই বস্তা পাওয়ার জন্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড। হিমঘরের দরজায় ট্রাক, গরুর গাড়ি, ভ্যান, বস্তার লাইন। পঞ্চায়েতে ঝগড়া। সমবায় হিমঘরের ভাড়া কম, খাঁচা বেশি — তাই ভিড়ও বেশি, বেশির ভাগ আলুর খুপ ও পেটরোটা বস্তা মাটেই পড়ে থাকে।

অবস্থায় ফেরে নকড়ি যখন দিশেহারা তখন একদিন গণেশবাবুই দেবতা হয়ে দেখা দিল. — নকড়ে। কিন্তু ঘাবড়াসনি। বস্তা তুই পাবি। কিন্তু সাবধান, বেশি টাকায় বিক্রি করে দিসনি কেন।

— কি যে বলেন বাবু। আপনাকে আমি

অমান্য করতে পারি? — আপনেই আমার সিদ্ধিদাতা — অন্নদাতা — মা অন্নপূর্ণার সুপুত্র!

— আলুর ব্যবসা না করে অনেকেই বস্তের ব্যবসা করছে। পার্টির চাঁইরাও আছে এর মধ্যে। দেশটার কি হল বল তো? পয়সার লোভে মানুষ পিশেল হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যেই কি ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে ঝুলেছিল। লাহা হরীন প্রাণ দিয়েছিল? এদেশের খোল-নলচে পাল্টানো দরকার। আজ যদি নেতাজি থাকতে তো দেখতে পেতিস কেন শয়তান ট্যা-ফো করতে পারত না।

নকড়ি রামভক্ত হনুমানের মত বসে গণেশবাবুর কথা শোনে আর ভাবে বাবুর কত দিকে চিন্তা। আমি ভাবি আলুর কথা, বাবু ভাবে দেশের কথা। এই না হলে মাথা!

মাছির অত্যাচারে গোটা গ্রামখানা অতিষ্ঠ।

কয়েকটি পাড়ার ছেলেদের পেটের রোগও দেখা দেয়।

সরকারি অফিসারদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়।

মাছি তাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শ দেয়, আলুর চাষ করা না।

রাজ্য সরকার এই অন্যায় পরামর্শের প্রতিবাদে একদিন বন্ধ ডাকে।

এর মধ্যে একদিন সকালে গাঁয়ের ওপর হেলিকপ্টার ঘুরে ঘুরে ধোঁয়ার মত ওষুধ ছড়ায়। মাছি পালিয়ে যায়। কিন্তু হেলিকপ্টার ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসে। আলোচনা সমালোচনা উত্তেজনায় মুখর হয়ে ওঠে সবাই।

চাকরিদের নিয়ে বিরাট মিছিল বের করে গণেশবাবু 'বন্দেমাতরম, আমাদের দাবি — মানতে হবে, মানতে হবে।' 'ক্ষতিপূরণ — দিতে হবে, দিতে হবে।' ধ্বনি তুলে মিছিল গাঁয়ের পথ পরিক্রমা করে। নকড়ি ও সঙ্গে ফুলমণি মাসখানেক আগের মহামিছিলের মতই তাতে সামিল হয়। স্লোগানের সঙ্গে আওয়াজ তুলতে গর্বে তাদের বুক টনটন হয়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতেই নকড়ির মনে পড়ে সেই মহামিছিল ও সভার কথা। কলকাতায়। জীবনে প্রথম কলকাতায় যাবে সে কথা ভেবেই দু'রাত তার ভাল করে ঘুম হয়নি। ফুলমণিরও ওই দশা। গণেশবাবুই তাদের সবাইকে ডেকে বলেছিল, — তোমাদের কলকেতা যেতে হবে। জমলা এখন বলছে। সেই বলে সাড়া না দিলে তোমরাই ঠকবে, পিছিয়ে পড়বে। জেনে শুনে বুকে আমরা দেশটাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। দিলে পাপ হবে। তোমার আমার ছেলে-মেয়ে তোর চারশ-কিশ জানোয়ার তৈরি হবে। তাই আমাদের জন্মী নেত্রী কলকেতার ময়দানে সভা ডেকেছে। সবাইকে পাড়া প্রতিবেশী মেলা লোক নিয়ে যেতে হবে। ট্রেনে ভাড়া লাগবেনি। দুপুরে পাউরুটি আলুর দম পাবে। মনে রেখ, এ লড়াই বাঁচার লড়াই — এ লড়াই জিততে হবে। আমামী ভোটে দেশের প্রাণ তোমরা আমাদের হতেই হবে। সবাই মিলে জোরসে বল, ভুবড়ি কন্যা — জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

সেই মহামিছিল ও বৃষ্টি ভেজা সভা মনে রাখবার মত ঘটনা বটে। কষ্ট হলেও সে আনন্দ ভোলবার নয়। ট্রেনে ঠাসাঠাসি ভিড়। চেকার দেখলেই 'বন্দেমাতরম', 'ভুবড়ি কন্যা' লড়াই কর — আমরা তোমার সঙ্গে আছি। হাওড়া ব্রিজ, মা গঙ্গা, জাহাজ, পাঁ-পোঁ-মোটর গাড়ি। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, প্যান্টলুন পরা ধাড়ি মেয়ে। সিনেমাকে লোক আর দোকান — পোল্লাই ব্যাপার, আশ্চর্য দুনিয়া। মিছিলের ঠেলায় গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। মনুমেন্টের কাছে আসতেই সব লাইন ভেঙে ছুট। চল পতাল রেল। সে আর এক যাদুনগর। চলন্ত সিঁড়ি উঠছে নামছে, ওই সিঁড়ির ঘটনা মনে পড়তেই কিক করে হেসে ফেলে নকড়ি। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে দেখে কেউ তার হাসি লক্ষ করেছে কিনা। সিঁড়ি দেখেই ফুলমণির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তার নিজের বুকও টিপটিপ করছিল। তবুও সে সাহস করে এগিয়েছিল। প্রায় জোর করেই ফুলমণিকে টেনে চলন্ত সিঁড়িতে তুলেছিল। ফুলমণি শক্ত হাতে তাকে ধরেছিল। ডাকাবুকো মুখে পাশে একটা বউ দাঁড়িয়েছিল। তার যে কি হল — থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপরেই পায়ের কাছে গলন জল। আশপাশের সবাই ছিটকে সরে গিয়েছিল।

ময়দানে বিশাল জমায়েত। টিপটিপ করে আবার কখনও জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। মঞ্চে ভুবড়ি-কন্যা নাড়িয়ে হাত নাড়তেই সে কি জিন্দাবাদ আর হাততালি। তারপরে শুরু হল বক্তৃতা। ওহ — সে কি তেজ। একে গলা টিপে ধরে তো তাকে লাথ মারে। কখনো ভয়-ওঠা ক্ষেপী মা। আবার কখনো ঠিক যেন "বাসর ঘরে বাঘিনী" পালার নায়িকা। হাততালি আর নায়িকের গাঁক-গাঁক শব্দে কি বলে ঠিকমত বোঝা যায় না। শুধু বোঝা যায় ভুবড়ির মত বলসে উঠছে। বেহালার মত নেতিয়ে পড়ছে। পাশের একজন বলে — ফুলটাই এখন ভুবড়ি, রাবড়ী, ফুলুরি, কচুরি, ঘুসুরীর — ঠিক কিনা বলুন? নকড়ি নিজের মত মাথা নেড়ে রেহাই পায়। সভা শেষ হতেই আবার দল বেঁধে ফেরা। ভিড়ে গাদাগাদি ট্রেন। কামরার টিমটিমে করে বাতি জ্বলছে। ফুলমণি ক্লান্তিতে তার গায়ে মাথা কাত করে ঘুমিয়ে। সে নিজেও টের পায় — ঘুম পাচ্ছে। এমন সময় হৈ-চৈ।

— আরে! গোঁসাই ঠাকুর। তুমি ঝাপটি মেরে বসে কেন?

— মিটিং-এ গান শুনতে না শোনাতে এয়েছিলে?

— মিটিং তো শুনলে, ইবারে আমাদের গান শুনাও।

— উসব রামোচন পাঁচালি চলবে না। নিল তো পাগল হ্যায়।

— না না নি নি তেরা দেবর দিবানা।

— ধুর ফাজিল, আমি উসব জানি না।

— কি জান তাহলে? বেধবা সঙ্গীত।

— আর দর বাড়ায়ো না। এই নাও সিগ্রেট। তোমার বাঁধা গান শোনাও। বাঁয়ো হাতে ঘুঙুর।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই দোতারার পিড়িং-পিড়িং। সমবেত হাততালি — পিটি। পাঁচালি ঢঙে শুরু হয় —

মঞ্চেতে ভুবড়ি কন্যা আহ্লাদে কত
ময়দানে মেব-ছাগ জুটিয়াছে যত।
ভুবড়ি কন্যা যমকন্যা কাহাকেও না ডরে
বৃদ্ধ দেবকুল তাহার প্রণয় ভিক্ষা করে।
হাষ্টচিত্তে ভুবড়ি কন্যা চক্ষু মারি কয়ে
বুড়াদরাজ খতম করে আর নাহি সহে।
কখনও হেঁসু আমি আবার মোছলমান
ষোট লাগি অভিনয়ে জান কোরবান।
প্রৌঢ়াবাকী আমি বটি মেজাজ হিটলারি
নারীমুখে আভি চাই কালো গোঁফ দাড়ি।
মরদ মর্দানা যদি সমান সমান
একা কেন গর্ভ ধরি চাই নতুন বিধান।।

প্রচণ্ড উল্লাস। হাসি আর হাততালিতে কামরার সবার ঘুম ছুটে যায়। কয়েকজন বুড়ো ধরে — ভুবড়ি কন্যা। হে এ এ এ।

কিন্তু আজকের এ মিছিল চলবে কতক্ষণ! সেদিনের মিছিল ছিল অনেকের আর আজ — সর্বত্র খোয়ানোর।

হিমঘরের সামনে এসে মিছিল থেমে যায়। শুরু হয় সভা। গণেশবাবু নায়কে অদ্ভুত শ্বর ধরধরে গলায় বলতে শুরু করে — ভাইসব, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার করে আমরা পেলাম কি, খাচ্ছি কি, খাব কি? আপনারা হয়ত বলবেন পচা আলু। কিন্তু আমি বলব — না, দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। কঠিন কালো অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। এ অন্ধকার অত্যাচারী এ অন্ধকার অপশাসনের

— বজবজ — মোটামুটি। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ওপরতলার তছরূপ হচ্ছে। আর তার ওপরের মিঠি নিচুতলার আমরা। আড়াই বিঘের আলু চাষী নকড়ি জানে না কাল সে কোথায় দাঁড়াবে — কি খাবে। কে এর জন্যে দায়ী? আমি, না আমার পার্টি? সমবায় হিমঘর সরকারেরই বলা যেতে পারে। অতএব ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও তাদের। আমরা দাবি জানাচ্ছি। প্রতিটি আলু চাষীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। না দেওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমরণ অনশন করব। স্কুল কলেজ হাসপাতাল রেল বাস সব বন্ধ করে দেব। যদি না পারি তবে কথা দিচ্ছি আমাদের নেত্রী আপনাদের সবার সামনে গলায় শাল জড়িয়ে মা কালীর মত জিভ বের করে আত্মহত্যা করবে। আর সরকার যদি দাবি মেনে নেয়, তবে সেটাই হবে স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তীর পর আপনাদের সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ উপহার।

অধিকাংশের মত নকড়িও গণেশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এ কয়দিনের ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পায়। ভাবে, গণেশবাবু নিশ্চয়ই একদিন মন্ত্রী হবে। বিড়ির লাল আগুনের চাইতেও আরও লাল, আরও বড় বাতি জ্বালিয়ে কালো সিঁটিয়ে গাড়ি হাঁকাবে। পুলিশে সেলাম ঠুকবে। সে রাতেই গণেশবাবু যখন তাকে বলে, — নকড়ে। আমার কর্জ আর তোকে ফেরত দিতে হবেনি। নাক করে দিলেম। কবরকর করে কেঁদে ফেলে নকড়ি।

রাতারাতি গণেশবাবু নয়নমণি — কারও কারও কাছে দেবতা হয়ে যায়। তার ব্যস্ততা বাড়ে। ওদিকে আলুর স্তূপ পচতেই থাকে। মাছির উৎপাত আরও সাংঘাতিক হয়। ধাক্কা অনেকটাই সামলিয়ে ওঠেন নকড়ি। ফুলমণি নিশ্চিন্তের হাসে। আশায় আশায় দিন কাটে সবার। সরবে-পেশা তেলকলের চাকা দিন রাত ঘোরে।

একদিন গণেশবাবুর বাড়িতে খানা-পিনার আসর বসে। দশ-বারোটা গাড়ি থামে দরজায়। গণেশবাবুর পুরনো চাকর হাঁদুদা নকড়িকে বলে। — তুমি অন্য রাস্তে ঘরে ফিরে। আমি একা পারবনি সামাল দিতে। তোমাদের দু'জনার খাবার নিয়ে যাও। মনে মনে খুশি হয় নকড়ি। হাঁদুদা তাকে চিনিয়ে দেয় বিভিন্ন হিমঘরের মালিককে, ইলেকট্রিসিটি অফিসের ইঞ্জিনিয়ারকে। আরও দু'একজন অফিসের বাবুকে। মনে মনে আশ্বস্ত হয় সে। আজ একটা ফয়সালা নিশ্চয়ই হবে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে। কিন্তু সমবায় হিমঘরের কেউ নেই কেন? আজই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়ে?

হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে আসরের সবাই। মদ মাংসের ছড়াছড়ি। গ্লাস হাতে গণেশবাবুকে দেখে অবাক হলেও নকড়ি ভাবে — নেতা হতে গেলে এসব একটু আধটু খেতেই হয় বুঝ তো আর রোজ নাশা মুন্সির মত চোলাই গিলে হল্লা করে না। রঙ তামাসা জানলার আড়াল থেকে লক্ষ করতে করতে শোনে — তার ওদের ব্যবস্থা করতে হবে না। জোগেন্দর না পেলে হিমঘর চলবে কি করে? সবাই এবার আসবে আমাদের কাছে। শালারা এবার যাবি কোথায়?

— সমবায় এখন হিমঘরে। তারপরে বার্লিংঘাটে।

— খাসা প্লান দিয়েছিলেন গণেশবাবু।

— পাওনাটা এখনও সব পাইনি কিন্তু।

— কেলিয়ে যাওয়া ক্লাসকে দারুণ দাওয়াই দিয়েছেন।

— এই না হলে মাস লিডার! ব্লাক কেউ ধরতেই পারল না!

— আসুন, আমরা এবার সমবায়ের স্বাস্থ্যে পান করি। চিয়ার্স।

সব কথার মানে না বুঝলেও বুঝতে পারে ব্যাপারটা কি। হাত পা নাড়া বিলকিস করতে থাকে নকড়ির। এক ছুটে বাড়ি এসে গুম মেরে বসে থাকে। মুখ দেখে ফুলমণি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। বিকারগ্রস্ত রুগির মত বিড়বিড় করে নকড়ি। — দু'মুখো সাপ, শয়তান, বজ্জাত। ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক, চোট্টা। এদের চিনব কি করে? পঞ্চাশ বছর ধরে দেশে কি এইসব বিষবৃক্ষই পয়দা করার মতন তৈরি হয়েছে? এদের উপড়াবে কে?

অস্থির পায়চারি করতে করতে রাত গভীর হয়। কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে যায় নকড়ি।

খানে জবরদস্ত হয়ে ফেরে ভোর রাতে।

ঘুম থেকে উঠে তুলে ফুলমণিকে ফিসফিস করে বলে, — ফুলি, চাট্টি বর্শা উঠারে যুদ্ধ করার হিম্মত আমাদের নাই। তাই আমা আমু দিয়ে যুদ্ধ করলাম। কুড়িয়ানের বোমা না, নকড়ের বোমা — একটা না, অণ্ডকটি। পঞ্চাশ বছর পর উল্টা উপহার।

ফুলমণির চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়

— ভয় নাই, সমস্ত আলুর বস্তা বাবুর বাড়ির চারপাশে ঢালে দিইছি। লক্ষ লক্ষ মাছি কাল ভনভনাবে। অত্যাচার সবাই। আর পঁচাবে সব মানুষ জানতে পারবে —

কথা শেষ করে না নকড়ি। একটা চাপা হিংস্র হাসি ফুলন্ত লাভার মত, তার কোটর মস্তিষ্কের ভাঙা ডেউয়ের মত, তার সমস্ত দেহে আছড়ে পড়ে। ❑

শারদীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দনসহ

দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম - দেউলপাড়া ✱ পোঃ - দেয়াড়া ✱ জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৮ — এইচ জি

কানাইলাল ধাওয়া	রঞ্জিতকুমার ঘোষ	রতিকান্ত সামন্ত
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে
গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

ফোন : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ ★ ফ্যাক্স : ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয় — কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহণের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭.২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হতে — সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা

১) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ১১৭.২৫ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৬১.৬৭ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে, ৪৬.০৮ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৯.৫০ কোটি।

২) কৃষি, অকৃষি ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবাংলায় গত বছরের সর্বোচ্চ লগ্নি ৬৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ও পরিবহণে গত চার বছরে আমাদের লগ্নি ৫৮ কোটি টাকা।

৩) গ্রামে কিংবা শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ দানে আমরাই অগ্রণী — এখনও পর্যন্ত লগ্নির পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

৪) আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য কোন ঋণ দাদন করি না, কারণ আমাদের ঋণ গ্রহণের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে না।

৫) সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না। আয়কর আইনের ১৯৪ ধারা অনুযায়ী স্বল্প সঞ্চয় দপ্তর ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে এই সুযোগ নেই।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ	প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য	সরল দেব
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	*ভাইস-চেয়ারম্যান*	*চেয়ারম্যান*

ক্রীড়া জগৎ

মজার খেলা? না মারণ খেলা!

অজয় বসু

মজার তো বটেই।

সব খেলার মত ফুটবলও মজার। খেলতে মজা, দেখতেও মজা। আবার দেখার ফাঁকে ফাঁকে যেকোন দু'দলের একটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ারও অনেক মজা। দল সমর্থনের ব্যাপারটা তো ফুটবলের অঙ্গাঙ্গী। কে কখন কাকে এবং কেনই বা সমর্থন জানাবেন, তার যুক্তি তাঁর নিজস্ব। দল সমর্থনে পছন্দ অপছন্দ, অনুরাগ বীতরাগের প্রশ্ন থাকে। আন্তর্দেশীয় খেলা হলে সমর্থনের মূলে থাকে স্বদেশী সচেতনতা আর দেশজ ভাবনার বীজ।

সবকিছু মিলিয়ে খেলা ফুটবল হল মজার, আনন্দ, উত্তেজনা, অস্থিরতার। পরিমিতিবোধ থাকলে দর্শক মনের সুখে খেলা দেখতে পারেন। মনের সুখ মানে চোখের তৃপ্তিও বটে। কিন্তু পরিমিতিবোধে টান পড়লেই বিপত্তি। তখন দল সমর্থনের নামে অসুস্থ উদ্দাম মানসিকতার আস্ফালন ঘটে, বাঁধন ছেঁড়ার মাতামাতির আড়ালে এক অবক্ষয়ের চিত্র ওঠে ফুটে।

উত্তেজনা জীবন্তচর্যার একটি স্তর। কিন্তু উত্তেজনার আধিক্য মারাত্মক। তেমন উত্তেজনা প্রশ্রয় পেতে থাকলে তা জীবন হননের পথে মানুষকে ঠেলে দেয়। লেবু কচলালে রসের স্বাদ যেমন তেঁতো হয়ে যায় তেমনি বাড়তি উত্তেজনার ফলে রসালো অনুভূতির জায়গা দখল করে নেয় তিক্ত, বিস্বাদ উপলব্ধি।

মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়লে বোধবুদ্ধি, স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে কোনও কোনও ফুটবল অনুরাগী সাময়িকভাবে কেন পাগল হয়ে যান। কেন এই পাগলামি তা মনস্তত্ত্ববিদদের জানা থাকলেও থাকতে পারে। আমার নেই। আমি শুধু বুঝি যে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা হল বিষবৎ পানীয় যা গলায় ঢাললে নিজেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

তীব্র উত্তেজনার মোড়কে পোরা এই বিষ পানীয় গলাধঃকরণের পরিণামে কত যে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তার হিসেব নিকেশ করতে বসলে মনে প্রশ্ন জাগে যে ফুটবল সত্যিই কি মজার খেলা? অথবা দোষটা ফুটবলের নয়, দোষ তাঁদের যাঁরা ফুটবল উপভোগ করার ছুতোয় ফেক উত্তেজনার আগুনে নিজেদের কপাল পোড়াতে চান।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বোড়শ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কতজন যে দল সমর্থনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনার গলানে আঁচে কাঁপ দিয়ে নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন তার ঠিক ঠিকানাই নেই।

আত্মহননের সব খবর আমাদের নজরে পড়েনি। তবে দু-চারটি খবরে আমাদের দুর্ভাবনা বেড়েছে।

ধরা যাক, ত্রিচুরের ২৫ বছর বয়স্ক বিজুর কথা। বিজু ছিলেন আর্জেন্টিনার ভক্ত। আর্জেন্টিনার ফরওয়ার্ড বাতিস্তুতা তাঁর কাছে জীবন্ত বিগ্রহের মত। বাতিস্তুতার ছবি বিজুর ঘরের দেওয়ালে সর্বক্ষণই টাঙানো থাকত। গত ৪ জুলাই টিভিতে বিজু ফ্রান্সের সঙ্গে আর্জেন্টিনার খেলা দেখছিলেন। খেলায় হারে আর্জেন্টিনা। প্রিয় দল আর্জেন্টিনার হারের দৃশ্য বিজু সহ্য করতে পারেনি। চুপি চুপি ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যান। কোথায় গেলেন বিজু? চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। কিন্তু দিনের দিন তাঁর সন্ধান মিলল না। খোঁজ মিলল পরের দিন। বাড়ির পাশে একটি গাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় বিজুর শব ঝুলছিল। আর্জেন্টিনার হার সইতে পারেননি। তাই বেছায় আত্মহননের পথ নিয়েছেন বেছে। দক্ষিণ ভারতীয় বিজুর সঙ্গে বাতিস্তুতা বা আর্জেন্টিনার রক্তের বা নাড়ির সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দলপ্রেমের দড়িদড়ায় বিজু নিজেকে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে আর্জেন্টিনার জন্য পরিণামে তাঁর বিন্দুমাত্র বুঝা জানেনি।

কেন সুদূরে আর্জেন্টিনা তার কোথায় ভারতে উপমহাদেশে। দূরত্ব যোজনব্যাপী হলেও মাথাকোনায় ক্রীড়াকৃতিয়ে বহু উপমহাদেশবাসীর অনেকেই আর্জেন্টিনা প্রেমে মজে গিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনাপ্রেমীদের দলে সমাজের নানা স্তরের মানুষজনই ছিলেন। হয়তো এখনও আছেন। এঁদেরই অন্যতম তরুণ ললিত হ কলেজের ছাত্রী বহিনা বেগম। ফলাফলের হাতে আর্জেন্টিনা হারলেনেই বহিনা কাণ্ডজ্ঞান না করে বিশ্বের একটি বড় টিপে ফেলেন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আসপাশের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বহিনা বেগম যে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান তবে আর্জেন্টিনার হারের পর প্রাণে বাঁচতে চাননি ঢাকার যৌক্তি কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জিসানুর রহমান এবং তেজপুরের বিজ্ঞানাচার্য পলিটেকনিকের ছাত্র নিজা। বিষ পানে দুজনেরই দেহান্ত ঘটে যায়। খেলা শেষ হবার পর বিশ্বকিলোরে তখনের খাকেন। হাতে টিভি সেট ও যাবতীয় আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় হাতের কাছে পেয়ে সেট ভাঙার সময়টিতেই বিক্ষোভকারীদের কয়েকটি করেন প্রচণ্ড উত্তেজনা ও গণ্ডগোলে জখম হয়ে ছাড়ি খালেদা হকের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন সরকার সরকারি হাসপাতালে এক দল তরুণও আর্জেন্টিনা-প্রেম ছিল নিখাদ। উপর রেখে উপবাস করে আর্জেন্টিনার সাফল্য কামনা করেছিলেন।

শুধু আর্জেন্টিনাই নয়, আরও অনেক দলের সমর্থক-অনুরাগীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন দুনিয়ার নানান প্রান্তে। এমনই একজন হলেন শ্রীহট্টের ব্যবসায়ী রঞ্জকুমার মালাকার বয়স নেহাৎ কম নয়, বাহান্ন। তবে বয়স বেশি বলেই বোধহয় টেনশনের চাপটা ছিল বেশি, সে চাপ তিনি সহ্য করতে পারেননি। ব্রাজিল বনাম ডেনমার্কের খেলা দেখছিলেন টিভির সামনে বসে। হঠাৎ ডেনমার্কের জুরগেনসেন গোল করে বসলেন। আর যাবে কোথায়! তখুনিই হৃদরোগ কাঁপিয়ে দিল সমস্ত শরীর মিনিট দুয়েকের মধ্যে সব শেষ! প্রথমে [illegible]

খেলেও শেষ পর্যন্ত ওই ম্যাচে তাঁর প্রিয় দল ব্রাজিল যে জিতে গেল, এই সত্যটুকু জেনে যাওয়ার ফুরসৎও পেলেন না রাজকুমার মজলকার। উত্তেজনাজনিত টেনশন এমনই নির্মম বটে!

উগ্র দলপ্রেম মানুষকে যে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তার নজির দেখা গেছে আউসবার্গে। '৯৮-এর ৪ জুলাই বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানি বনাম ক্রোয়েশিয়ার খেলা ছিল ফ্রান্সের লিয়ঁতে জেরল্যান্ড স্টেডিয়ামে। শক্তিধর দল হিসেবে জার্মানি পরিচিত। এর আগে বারতিনেক বিশ্বকাপ জয় করেছে। অনুপাতে ক্রোয়েশিয়া এক উটকো প্রতিযোগী। এই সবে বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে এসেছে। জার্মানিই ফেবারিট। কিন্তু মাঝমাঠে খেলা মাতিয়ে দিল উটকো দল ক্রোয়েশিয়াই। তিন তিন গোলে হারাল জার্মানিকে। খবর শুনেই তো আউসবার্গের ওই জার্মান সমর্থকদের চক্ষু চড়কগাছ। কালবিলম্ব না করে দোতলার খোলা জানালা গলে নিলেন ঝাঁপ। আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। হাত-পা ভাঙল, তবু প্রাণে গেলেন বেঁচে।

প্রায় অনুরূপ এক কাণ্ড বাধিয়েছিলেন এক রোমান তরুণ ১৯৭৮ সালে। সেবার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আর্জেন্টিনায়। ইতালি পেল্লাল্লার কাছে হারে ১-২ গোলে। খবরটা শুনে এক রোমান তরুণ জাতীয় দলের বিপর্যয়ে দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে নিজের হাতের কব্জির শিরাতে যেন ছুরি চালিয়ে। ভাগ্যিস, নিজের হৃৎপিণ্ডে ছুরি বসাননি। তাই রক্ষে। হাত কেটে গেলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান সে যাত্রায়।

আত্মহনন বা পরের জীবন হননের কত ঘটনাই যে ঘটে গেছে। ১৯৫০-এ বিশ্বকাপের আসর বসে ব্রাজিলেই। ব্রাজিলই হট্ ফেবারিট। কিন্তু চূড়ান্ত খেলায় উরুগুয়ে ব্রাজিলকে হারাতেই এক ব্রাজিলিও সমর্থক শোক সইতে না পেরে নিজের পিস্তলের গুলিতেই নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়। আর প্রিয় দলের এই পরাজয়ের খবর শোনামাত্র এক ব্রাজিলিও সমর্থকের হৃৎকম্পন তখুনি থেমে পড়ে।

শুধু দুঃখে যন্ত্রণাবিদ্ধ হওয়াই নয়, আনন্দে অধীর হয়ে অভাবনীয় কাণ্ড বাধাতেও বোধহয় ব্রাজিলিওদের জুড়ি নেই। ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনার মাঠে ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের আর এক প্রতিনিধি প্যারাগুয়েকে হারায় এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। সুসংবাদ পেলামাত্র ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেরোর রাজপথে ছুটন্ত এক বাস ড্রাইভার স্টিয়ারিং ছেড়ে বাসের জানালা গলে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর চলন্ত বাসটি একের পর এক পথচারীকে ধাক্কা দিতে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ও ছুটন্ত বাসের ধাক্কায় দু'জন পথচারীর প্রাণ যায়, জনাতিরিশ আহত হন। তবে ওই অপকর্মের খলনায়ক ড্রাইভারটি কিন্তু অক্ষতই থেকে যান। সেবারেই ব্রাজিলের জয়লাভের খবর শুনে আত্মহারা এক ব্রাজিলিও তরুণ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দেন এক ছুটন্ত ট্রেনের চাকার তলায়। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ওই তরুণটিও।

স্বদেশীয় দলের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ, কিন্তু একদল দুষ্কৃতি আর যে এক অপকর্ম করেছিল বছর চারেক আগে তার দুষ্কৃতি সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কের কালো দাগ এঁকে দিয়ে রেখেছে। বছর চারেক আগে ঘটে যাওয়া সেই অলুক্ষণে কাণ্ড স্মরণ করলে আজও সুস্থমনোদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চার বছর আগে বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের আসর পাতা হয়েছিল আমেরিকায়। সেই আসরে আমেরিকা বনাম কলম্বিয়ার ম্যাচে কলম্বিয়ার তরুণ ফুটবলার আঁদ্রে এসকোবার বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টায় অতর্কিতে নিজের গোলের মধ্যে বল ঠেলে দেন। বল তিনি ঠেলে দিয়েছিলেন না এসকোবারের পায়ে লেগে গোল হয়েছিল সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও গোলটিকে 'আত্মঘাতী' বা 'সুইসাইডাল'-এর পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। আর এই আত্মঘাতী গোলের সূত্রে আলোচ্য ম্যাচে কলম্বিয়া আমেরিকার কাছে হেরেও যায়।

ফুটবল খেলায় আত্মঘাতী গোল তো কতই হয়। ছোট, বড়, সবস্তরের খেলাতেই এই অঘটন ঘটতে পারে এবং ঘটেও। তাই অনিচ্ছাকৃত এই কাণ্ডের জন্য কাউকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় চড়ানো হয় না। নেহাৎই দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটিকে ক্ষমার চোখে দেখাই হয়। কিন্তু এসকোবারের খেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটে গেল। কাঠগড়ায় চড়ানো তো দূরস্ত, এসকোবারকে একেবারে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হল! দেশে ফিরে এসকোবারকে একদিন স্থানীয় এক হোটেলের সামনে ঘিরে ধরে জনাকয়েক কলম্বিয়ান সন্তান আত্মঘাতী গোল করার জন্য পালমন্দ করতে থাকলে এসকোবার যথারীতি প্রতিবাদ করেন এবং দুষ্কৃতির দল সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে তরুণ এসকোবারকে খুন করে ফেলে। খেলা মজার, আর সেই মজার খেলা ঘিরে এ কি মর্মান্তিক কাণ্ড!

আঁদ্রে এসকোবার না হয় একটা উপলক্ষে পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মাঝমাঠের কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার জড়িত নন এমন ব্যক্তিরাও কি ফুটবল ঘিরে উত্তেজিত দুষ্কৃতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না। ধরা যাক এবারে অর্থাৎ '৯৮-তে ঘটে যাওয়া বুয়েনোর্স এয়ার্সের ঘটনার কথা। আর্জেন্টিনার তারকা বাতিস্তুতা ফ্রান্সে গ্রুপ লিগের খেলায় জামাইকার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করাতে স্বদেশে প্রচুর আলোড়ন উঠল। লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকল বাতিস্তুতা বা তাদের আদরের 'বাতিগোল'-এর প্রসঙ্গে। বুয়েনোর্স এয়ার্সের রাজপথে ভজন বন্ধু বাতিস্তুতার গোল ও আর্জেন্টিনার জয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এক বন্ধুর বক্তব্য, বাতিগোলের আরও গোল করা এবং আর্জেন্টিনার পাঁচ গোলে কেন, আরও বড় ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। অন্য বন্ধুর অভিমত, না, না, পাঁচ গোলই যথেষ্ট। দু পক্ষে সামান্য বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আর সেই তর্কাতর্কি শুনে রাস্তার পাশের একবাড়ি থেকে এক ব্যক্তি এসে সেই আলোচনায় যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রেসেমেগে ক্রবাহৃত মানুষটি গুলিভরা বন্দুকের ট্রিগার টেনে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেয়।

ফুটবলের ফলাফল ঘিরে কত সামান্য কারণে যে কী মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে যায় তা ভাবলেই অবাক হতে হয়। ১৯১৮-এর ফ্রান্সের আসরকে কেন্দ্র করে ম্যানরে যা ঘটল তার তো তুলনা মেলা ভার। জার্মানি বনাম ক্রোয়েশিয়ার খেলায় জার্মানি জিতবে বলে এক চিনিকলের মালিক তার চিনিকলটিকেই বাজি ধরেছিলেন। কিন্তু মাঠের খেলায় ক্রোয়েশিয়ানদের কাছে জার্মানি হেরে যেতেই মিল মালিকটি আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার মূল কারণ চিনিকলটি বেহাত হওয়া না জার্মানির হার কে জানে। আর এক যুবক জার্মানি-যুগোস্লাভিয়ার ম্যাচ ঘিরে নিজের

মোটর বাইক বাজি ধরেছিলেন। বাজিতে হার হতেই মোটর বাইকের শোকে তিনিও আত্মহননের পথ বেছে নেন। গুলি গোলা, খুন-জখম, আত্মহত্যা ইত্যাদি যেন অতি সাধারণ ব্যাপার। উত্তেজনায় যাদের ভেতরটা সর্বক্ষণই ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে তাদের কাছে গুলি-বন্দুক, বোমা-বারুদ, প্রাণ দেওয়া-নেওয়া যেন কোনো ব্যাপারই নয়। সবই জলভাত সমান!

ফুটবল আসলে এক খেলা। যুদ্ধ নয়। তবে কারণে অকারণে উত্তেজনার টানে যেকোন মাঠকে রণভূমিতে পর্যবসিত করায় ফুটবলারদের যেমন অভ্যাস ঘটেনি, তেমনি মাঠের খেলা ঘিরে মাঠের বাইরে বারুদ ছড়াতেও লোকের কাবাই পড়েনি। মূল্যবোধের বিকৃতি, আদর্শের অবমাননা ঘটিয়ে যখন উত্তেজনার আগুন জ্বালানো হয় মাঠ কিংবা মাঠের বাইরে তখন সম্পর্কিত মনে প্রশ্ন জাগে যে ফুটবল কি সত্যিই নজার খেলা! না, মরণ খেলা।

ফুটবল যুদ্ধ, খেলার মাঠ, রণভূমি এইসব শিরে চমকানো শব্দ উঠলেই মনে পড়ে যায় ১৯৭০ সালের হন্ডুরাস বনাম এল সালভাদোরের ফুটবল ম্যাচের কথা, যে খেলাকে উপলক্ষ করে পাশাপাশি দুটি দেশ এল সালভাদোর ও হন্ডুরাসের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। যুদ্ধ বাধিয়েছিল যুদ্ধবাজরা, যারা লড়াই বাধাতে বদ্ধপরিকর হয়ে একটি ফুটবল খেলার ফলাফলকে হুজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ওই যুদ্ধবাজরা হল এল সালভাদোরের জঙ্গী রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ফিদেল সানচেজ হায়নানদেজ ও তার সঙ্গীসাথীরা।

ব্যাপারটা কি ঘটেছিল বা ঘটানো হয়েছিল সংক্ষেপে তা স্মরণ করা যাক।

হন্ডুরাস ও এল সালভাদোর পাশাপাশি দুটি দেশ। প্রতিবেশী তবে দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত। আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি ঘিরে দু'পক্ষে বাদবিসম্বাদ চলেই আসছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে দু'দেশকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

মধ্য মার্কিনমণ্ডলের এক নম্বর সাব গ্রুপ বিজয়ী হন্ডুরাস। আর তিন নম্বর গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী হল এল সালভাদোর। অতঃপর আন্ত সাব গ্রুপ বিজয়ী নির্ধারণে দু'দলের দুটি খেলা। প্রথম খেলা হয় হন্ডুরাসের তেগুসিগালপায়, জেতে (১-০) হন্ডুরাস। দ্বিতীয় খেলা এল সালভাদোরে। দ্বিতীয় খেলায় এল সালভাদোর জিতল ৩-০ গোলে।

দু'পক্ষই একটি করে ম্যাচ জেতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তৃতীয় ম্যাচের ব্যবস্থা করা হল নিরপেক্ষ দেশ মেক্সিকোতে। মেক্সিকোর বিখ্যাত অ্যাজটেক স্টেডিয়াম আজটেকে তৃতীয় ম্যাচের ব্যবস্থা হয়। নিরাপত্তার কারণে দোরাটোদের মধ্যে দু'দলের খেলোয়াড়দের মেলামেশা বন্ধ রেখেই খেলছিলেন। নির্ধারিত নব্বই মিনিটে কোনো গোল হয়নি। হল অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে গোলটি করে মরিসিও রডরিগাস এল সালভাদোরকে জিতিয়ে দেন।

আর যেই না মাঠের খেলায় জিৎ অমনি জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জয়লাভের উদ্দেশ্যে এল সালভাদোরের জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক সানচেজ হায়নানদেজ তার সেনাবাহিনীকে হন্ডুরাস আক্রমণে হুকুম দিয়ে বসেন মাঠের খেলায় যখন জিৎ হয়েছে তখন জীবনযুদ্ধেও জয় অনিবার্য, এই মানসিকতায় তাড়িত হয়ে হায়নানদেজ যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়।

জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক সানচেজ হায়নানদেজ অনেক দিন ধরে তলে তলে তৈরী হচ্ছিল। পক্ষান্তরে হন্ডুরাস ছিল যুদ্ধের জন্য নিতান্তই অপ্রস্তুত। ফলে আক্রান্ত হয়ে হন্ডুরাস দিশেহারা হয়ে পড়ে। জেনারেল হায়নানদেজের হুকুমে হাজার দশেক সালভাদোরী সৈন্য সীমান্ত পার হয়ে ছুটে গেল হন্ডুরাসের রাজধানীর দিকে। মাটিতে গর্জে উঠল বিমানবিধ্বংসী কামান। বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হল। বেঘোরে প্রাণ দিতে হল হাজার তিনেক হন্ডুরাসবাসীকে। আর কত হাজার আহত হল ও বাস্তুচ্যুত হল তার ঠিক ঠিকানাই বা কে রাখে! অবস্থা বেগতিক দেখে হন্ডুরাসের পক্ষ থেকে সাড়ে চারদিনের মাথায় শ্বেত পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করা হয়।

সে যুদ্ধ থেমে গেছে। মধ্যমার্কিনমণ্ডলে হন্ডুরাস ও এল সালভাদোর আজও পাশাপাশি অবস্থান করছে। দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে খেলাধুলোতেও অংশ নিচ্ছে। কিন্তু নিছক একটি খেলাকে ঘিরে দু'দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার অপকীর্তির কথা কেউ ভোলেনি। তাই জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল ফিদেল সানচেজ হায়নানদেজের দুর্নাম সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী খলনায়ক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরে নানান মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করা হল। এবার কিছু মজার কাহিনীও স্মরণ করা যাক। বিশ্বসেরা এই ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে অনেক মজাদার ঘটনাও ঘটেছে, অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যের স্বাদ বাড়াতে মেসকটের ভূমিকাও স্মরণীয়।

সবাই জানে যে পেশাদারি ফুটবলের পথিকৃৎ ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডই হল ফুটবলের জন্মভূমি। ইংল্যান্ড থেকে ফুটবল ছড়িয়েছে দেশ দেশান্তরে। ফুটবলের প্রসার, প্রচার এবং জনপ্রিয়তা অর্জনে ইংল্যান্ডের অবদান সম্পর্কে স্বয়ং ইংল্যান্ড এক সময়ে বেশি মাত্রায় সচেতন ছিল। মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতার পরিণামে ইংল্যান্ড এক সময় তাঁপ্ত অভিজাতবোধের শিকারও হয়ে পড়েছিল। ফুটবল উচ্চমন্যতায় এই অবস্থার ১৯৫০-এ যখন বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয় তখন প্রচণ্ড অহংবোধের উচ্চশিখরে ইংল্যান্ড এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি শুধু ১৯৫০-এই নয়, প্রাক্ যুদ্ধপূর্বে তিনটি অনুষ্ঠানের কোনটিতেই ইংল্যান্ড অংশ নেয়নি। ইংল্যান্ডের মনোভাব ছিল অনেকটা এইরকম যে ফুটবল তো আমাদেরই খেলা, অন্যের আবার কি খেলবে! অন্যরা খেললে তবেই প্রতিযোগিতার মর্যাদা বাড়বে, নইলে নয়।

অবশেষে ইংল্যান্ডের এই অসহযোগিতা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ ফুটবলের আকাশে দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, বাড়ছিল প্রতিযোগী সংখ্যা। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা পুনরারম্ভ হতে নাকি উঁচু তার জলাঞ্জলি দিয়ে ইংল্যান্ড আবির্ভূত হয় মূল আসরে কিন্তু ইংল্যান্ডের আবির্ভাব শুভ হয়নি। উল্টে কতকটা অভাবনীয় ও করুণ পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডকে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। সেবার প্রাথমিক লিগ স্তরে তিনটি ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড জেতে নামমাত্র একটিতে, হারে বাকি দুটি খেলায়।

হায় বলে হায়, হায় আমেরিকার কাছে' যে আমেরিকার ফুটবলে পরিচিতি বলতে কিছুই ছিল না তারই কাছে মাথা নোয়াতে হল ফুটবলের কৌলিন্য গর্বে গর্বিত ইংল্যান্ডকে। মান, মর্যাদা, প্রজ্ঞার অহংকার সবকিছু ধূলিসাৎ

হতে দেখে ইংল্যান্ডের এক অর্বাচীন সংবাদপত্র সেদিন সখেদে মন্তব্য করেছিল, আমাদের হৃদয়ে আমেরিকানদের জায়গাই তো শিখিয়েছি — পরিভাষায় 'উই টট্ দেম টু বিট্ আস!' ইংলাণ্ডীয় পত্রিকার এই সখেদ মন্তব্য সেদিন অন্য মহলে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গটি উঠলে আজও আলোচনাকারীদের ঠোঁটের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে গুঁড়ো হাসির ঝিলিক।

সেবার অর্থাৎ ১৯৫০-এ আসর বিছানো হয়েছিল ব্রাজিলে। ব্রাজিলই ছিল হট্ ফেবারিট। চূড়ান্ত খেলা ব্রাজিল-উরুগুয়েতে। রিও ডি জেনেরোর বিশাল মারাকানা স্টেডিয়ামে প্রায় দু'লক্ষ দর্শকের উপস্থিতিতে খেলা শুরু হতে ব্রাজিল এক গোলে এগিয়ে যায়। মারাকানা তখন জনসমুদ্রে উত্তাল। নাচে গানে, বাদ্যি বাজনায়, সহর্ষ জয়ধ্বনিতে মাতোয়ারা। কিন্তু তারপরই পরপর দু'গোল করে উরুগুয়ে ব্রাজিলের মুখের গ্রাস নিল ছিনিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্বিক অবস্থার হল আমূল পরিবর্তন। বাঁধন ছেঁড়া আনন্দ উল্লাসের বদলে জমাট বাধা অন্ধকার। দর্শনের স্তব্ধতায় ঢাকা পড়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম মারাকানা।

জাতীয় দলের পরাজয়ে ব্রাজিলিও সংগঠকরা এমনই শোকাহত হয়েছিলেন যে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করতেও তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। ভি আই পি আসন ছেড়ে নিচে নেমে গিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) তদানীন্তন সভাপতি রিমিয়ে জুলে রিমে ব্রাজিলিও কর্মকর্তাদের তাঁদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তবেই পুরস্কার বিতরণ পর্ব সম্পন্ন হয়। শোনা যায় যে ব্রাজিল জিতবে এবং বিজয় উৎসবে মাততে হবে ভেবে স্থানীয় দর্শকেরা হাজার লক্ষাই শ্যাম্পেনের বোতল সঙ্গে করে এনেছিলেন স্টেডিয়ামে। কিন্তু খেলা শেষে সেগুলি অবিকৃত অবস্থাতেই পড়ে থাকে। একটি বোতলেরও ছিপি খোলার কেউই উৎসাহ বোধ করেননি। আমেরিকার কাছে হেরে যেতে যেমন ইংল্যান্ডে তেমনি উরুগুয়ের হাতে হারাতে ব্রাজিলেও সেবার জাতীয় শোকপর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

১৯৫০-এর আসরে গ্রুপ লিগে ইংল্যান্ডের কাছে আমেরিকার হার ছিল প্রত্যাশিত। অনেকের ধারণায় সেই পরাজয় ছিল সম্ভাব্য নিশ্চিত ঘটনা। কিন্তু মাঠের খেলায় সেই নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত। এমন অনিশ্চিত ঘটনা ঘটার ট্রাডিশনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে পরের প্রতিযোগিতা উপলক্ষেও।

পরের আসর পাতা হয় ১৯৫৪ সালে সুইজারল্যাণ্ডে। সেবারের হট্ ফেবারিট ছিল হাঙ্গেরি। পাঁচের দশকের গোড়ার পর্বে ফুটবলে হাঙ্গেরির উত্থান বিস্ময়কর। পুসকাস, কবসিজ, হিদেকুটি, বোজিক প্রমুখ দক্ষ খেলোয়াড় সমন্বয়ে হাঙ্গেরিও দলের শক্তি তখন অপরিমিত। সম্ভাবনাও বিপুল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের ফাইনালের অন্তর্বর্তীকালে কোনো ম্যাচে হাঙ্গেরিকে হারতে হয়নি। প্রায় সর্বত্রই জয়জয়কার।

সুইজারল্যাণ্ডে এসে হাঙ্গেরি গ্রুপ লিগে খেলা শুরু করে কোরিয়াকে ৯-০ গোলে, পশ্চিম জার্মানিকে ৮-৩ গোলে হারায়। অতঃপর কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলকে হারায় ৪-২ গোলে। সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ৪-২ গোলে। অতঃপর ফাইনালে মুখোমুখি পশ্চিম জার্মানির। ওই জার্মানিকে হাঙ্গেরি গ্রুপ লিগে হারিয়েছে ৮-৩ গোলে। কিন্তু ফাইনালে আগের হারা দল পশ্চিম জার্মানিই জিতে গেল ৩-২ গোলে।

এই অভ্রভ্রান্তিত ফলাফলের পরিপামে পর্দার আড়ালে বেশ কয়েকটি বিয়োগান্ত দৃশ্যাভিনয় হয়েছিল। জাতীয় দলের জয় অবশ্যম্ভাবী জেনে হাঙ্গেরিতে দলের খেলোয়াড়দের প্রতিমূর্তি গড়া হয়েছিল, ফাইনালের পর সেগুলি হাঙ্গেরির রাজপথে স্থাপন করার জন্য। কিন্তু ফাইনালে হাঙ্গেরির হার হতেই প্রতিমূর্তিগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চালান করে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপ জেতার পর বিজয়ী দলের ফুটবলাররা সস্ত্রীক নয়া জায়গা ঘুরে ছুটি কাটাবেন বলে স্থির ছিল। ফাইনালের আগেই শ্রীমতীরা অনুষ্ঠান ভেন্যু সুইজারল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ফাইনালে হাঙ্গেরি হেরে যেতে তাঁদের অন্যত্র বেড়াবার পরিকল্পনা বাতিল করে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বদেশের পথে ফিরতি পাড়ি জমাতে হয়।

খেলা শেষের বাঁশি বাজার আগে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যে কোনো কালের কথা নয় তার প্রমাণ শুধু ১৯৫৪-তেই নয়, ১৯৭৪-এও পাওয়া গিয়েছিল।

চুয়াত্তরে পশ্চিম জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর পাতার সময় থেকেই বিষমত ছিল হল্যাণ্ডের অনুকূলে। নবতর পদ্ধতি 'টোটাল ফুটবল'-এ অভ্যস্ত হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধি তখন আকাশচুম্বী। হল্যাণ্ডই চ্যাম্পিয়ন হবে এই অভিমতে সেদিন প্রায় সবাই সোচ্চার।

এই পরিস্থিতিতে ফাইনাল খেলা পশ্চিম জার্মানি বনাম হল্যাণ্ডের। ফাইনাল শুরু হওয়া মাত্রই হল্যাণ্ড এক গোলে গেল এগিয়ে। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা বল স্পর্শ করার আগেই পেনাল্টি এবং পেনাল্টি সটে হল্যাণ্ডের নিসকেনের গোল। কিন্তু আরম্ভ আরম্ভই, শেষ নয়। শেষ যখন হল তখন জিৎ হল জার্মানিরই, ২-১ গোলে।

পশ্চিম জার্মানির পৌষমাস, আর হল্যাণ্ডের সর্বনাশ। হল্যাণ্ড জিতবেই এই ধারণায় ওলন্দাজ ডাকবিভাগ হল্যাণ্ডের ফুটবলারদের প্রতিমূর্তি সম্বলিত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। স্মারক ডাকটিকিট ছাপাও হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাজারে ছাড়া হয়নি। ফাইনালের পর স্মারক ডাকটিকিটগুলি বস্তাবন্দী করে লুকিয়ে ফেলা হয়।

বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে এক দলের পক্ষে সহোদরদের খেলতে দেখা নতুন কোনো নজির নয়। যেমন ফ্রান্সে খেললেন ডেনমার্কের লাউড্রুপ ভাইয়েরা, মাইকেল ও ব্রায়ান। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। যথা ১৯৫৪-তে বিশ্বকাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মান দলে ছিলেন ওয়াল্টার ভাইয়েরা ফ্রিজ ও ওটমার, ১৯৬৬-তে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে চার্লটন ভাইয়েরা ববি ও জ্যাকি। তবে এক দলে তিন ভাইকে দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি, হল এই ১৯৯৮ সালে। '৯৮-তে ফ্রান্সে নরওয়ের পক্ষে হাজির ছিলেন সহোদর খাঁরে ও জস্টিন ফ্লো এবং তাঁদের জ্ঞাতি ভাই হ্যান্ডার ফ্লোও। আরও মজার কাণ্ড ঘটেছিল ১৯৫৮ সালে সুইডেনে। সেবার একটি ম্যাচে দু'পক্ষেই খেলেছিলেন জোড়ায় জোড়ায় সহোদররা। রাশিয়ার পক্ষে ভিক্টর ও আলেকজান্ডার ইভানভ এবং বিপক্ষ অস্ট্রিয়ার তরফে পিত্তনি ও এমিল কন্সলিমেক।

আচ্ছা, বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে কি কোনোদিন কোনো পক্ষে অন্ত ভাইয়েদের খেলতে দেখা গেছে? হ্যাঁ, তাও দেখা গেছে। ১৯৯০-এ ইতালিতে মিশরের পক্ষে মাঠে

হাজির ছিলেন যদ্দু ভাই হোসাম হাসান-ইব্রাহিম হাসানেরা।

দল হারলে বিপর্যয়ের দায় অনেক সময় দলের কোচের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই কোচদের চাকরি চলে যায়। যেমন গেল কার্লোস এলবার্টো পেরেরার। পেরেরা এবার ১৯৯৮-তে সৌদি আরবের কোচ ছিলেন। ফ্রান্সে সৌদি আরব সুবিধা করতে পারেনি। গ্রুপ লিগে হারে দুটিতে এবং বাকি একটি ম্যাচ ২-২ গোলে অমীমাংসিত রাখে। দলের ভূমিকা ভাল নয়। তাই সব দোষ চাপানো হল কোচ পেরেরার ওপর। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার আগেই পেরেরাকে কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়।

দলের অনুজ্জ্বল ভূমিকার জন্য নারী যেন শুধু কোচই। যত দোষ নন্দ ঘোষ-এরই বুঝি!

অথচ দেখুন হলেন এক বিশ্ববিজেতা ফুটবল কোচ। ঊনই ১৯৭০-এ ব্রাজিল প্রায় চব্বিশ বছর পরে ১৯৯৪-তে আবার বিশ্বকাপ জয় করেছিল।

কার্লোস আলবার্টো পেরেরার কপালে অনেকটা স্বদেশীয় কোচ ভিসেন্টি ফিওলার মত। কোচ ফিওলার তত্ত্বাবধানে ব্রাজিল আগেই বিশ্বকাপ জয় করেছিল। তখন ফিওলার প্রশংসায় গোটা ব্রাজিল হয়েছিল প্রশস্তিমুখর। কিন্তু বেবার ব্রাজিল বিশ্বকাপে হেরে গেল জনরোষের কোপ গিয়ে পড়ল দলের কোচ ফিওলার ঘাড়ে। ফিওলার পুর্ব কীর্তি, কৃতিত্ব সব ভুলে গিয়ে ব্রাজিলের উগ্র সমর্থকরা রিও ডি জেনেরোর রাজপথে একটি ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে রাখল কোচ ফিওলার উদ্দেশ্যে। যেন সিধেই ফিওলাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার মতলবে।

ঘোড়শ বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে ব্রাজিলের কোচ ছিলেন মরিও জাগালো। জাগালো এক সময়ে বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। পরে ১৯৭০-এ তাঁরই কোচিংয়ে থেকে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করে। ফ্রান্সে ব্রাজিল চাম্পিয়ন হতে পারেনি। পূর্বস্থিত সাফল্য ভুলে ব্রাজিলিও সংবাদপত্রের তাই কোচের কার্যকলাপের উগ্র সমালোচনা করে জাগালোকে ভুলোবেলা করে ছেড়েছেন। তবে জাগালোকে ফিওলার মত ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার মতলব কেউ ভাঁজেনি। যদি এটাই ফ্রান্স থেকে ফেরে ফেরার পর জাগালো বা ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের কোপে পড়তে হবে। উল্টে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জাতীয় দলের সমর্থনে নিজের প্রাসাদে অনুষ্ঠান করিয়ে আপ্যায়ন করেছেন।

ব্রাজিলের ফুটবল অনুরাগীদের মনস্তিত্বের কি পরিবর্তন ঘটেছে? ঘটুক না, পরিস্থিতি যে তাদের দিকেই যাচ্ছে ❑

কেবল বড় ডিগ্রি পেলেই আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না। আদর্শ মানুষের চাই এমন অন্তঃকরণ — যা কখনো কঠিন হবে না, চাই এমন প্রকৃতি — যা কখনো বিরক্ত হবে না। চাই এমন স্পর্শ — যা কখনো ব্যথা দেবে না।

— জন মুরি

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

কেশবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ২৫ এইচ জি তাং ১৮-১২-৬৬

গ্রাম ও পোঃ — কেশবপুর ; ব্লক আরামবাগ

জেলা ঃ হুগলি

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, সার ব্যবসা, ভোগ ঋণ, ফসল বন্ধকি, আমানত ব্যবসা ও স্বল্প সঞ্চয়ের উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

অশোক বসু	সুকান্ত সরকার	নিমাইলাল বসু
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

সরজুপ্রসাদ রোড, মালদা

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগলবন্দী মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা, পরিচালন সমিতির নৈপুণ্যে মালদা জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গত বৎসরের এই ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে এবং এই বৎসর "নাবার্ড" কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

অগ্রগতির চিত্র

বৎসর	অংশগত মূলধন	কার্যকরী মূলধন	আমানত	নিট লাভ	পুঞ্জীকৃত লাভ
	১৩৮.৮৬	২৮১৮.৭১	১১০১.০৩	৪২.২৩	৬২.৬৫
	১৪৪.১২	৩৩৬৮.৬৮	১৬৬৫.২৯		১০৬.৫২
			২০৮৬.১০		১৭০.০৫

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্ক আমানতের উপর .৫% সুদ বেশি দেয়। গিফ্‌ট চেক ও গোল্ডেন ফিক্সড্ ডিপোজিট-এর ব্যবস্থা আছে।

আনন্দ ব্যানার্জি
সভাপতি

জগদীশপ্রসাদ যাদব
মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক

✆ Suri 55-445, STD 03462 ✆ Bol. 53-773, STD 03463

BIRBHUM COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

P.O. Suri, Dist. - Birbhum (W.B.)

***Branch* : Bolpur, Birbhum**

The Birbhum Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd formed way back in 1934, is the oldest ARDB in the State. It is one of the most important Banks in the district of Birbhum, esp. in the long term credit sector. The major activity of this Bank is to provide long term credit to individuals in Farm, Non-farm and Housing Sectors. Recent years have witnessed considerable diversification in the activities of this Bank in areas such as non-farm lending, deposit mobilisation and advancement of loans for purchase of consumer durables like Scooters, TV, Refrigerator, Washing Machine, etc. Loans are available against pledge of NSC, KVP and Fixed Deposits. Other relevant details in respect of this Bank are as follows :—

1.	**Area of Operation**	Eleven (11) blocks of Suri Sadar and Bolpur Sub-division in Birbhum District
2.	**No. of Units**	2 (1 Head Office at Suri, 1 Branch at Bolpur)
3.	**Membership Strength**	8060 (upto 31.3.98).
4.	**Share Capital**	Rs. 58.21 lakhs, of which State Share Rs. 12.09 lakhs (as on 31.3.98).
5.	**Working Capital**	Rs. 835.97 lakhs
6.	**Recovery Percentage**	79% (as on 30.6.98)
7.	**Investment (loan issue)**	Rs. 171 lakhs. (during 1997-98)
8.	**Deposits Mobilised**	Rs. 55.51 lakhs (upto 31.3.98)

FOR MORE DETAILS, PLEASE CONTACT

G. S. BANERJEE
Chairman

P. BASU
Chief Executive Officer

With Best Compliments From :

THE BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

Regd. No. 5. Calcutta of 1947

Regd. Office 23A, Netaji Subhash Road (3rd & 4th Floor), Calcutta-700 001

Phone : 220-8564/221-1710

LIST OF MEMBERS OF BOARD

SRI SUBIR KUMAR MUKHERJEE	**SRI SACHINDRA NATH BISWAS**	**SAMAR KUMAR GHOSH**
Chairman	*Vice-Chairman*	*Secretary*
United Bank of India	**UCO Bank**	**The Bank Employees' Coop. Bank Ltd.**

DIRECTORS

Sri Barun Chatterjee	United Bank of India
Sri Barun Kishore Sarbadhikary	Central Bank of India
Sri Jyotirmoy Chakraborty	Bank of India
Sri Kshitish Chandra Poddar	Bank of India
Sri Nemai Prasad Bhattacherjee	Syndicate Bank
Sri Paramananda Adhikari	Bank of Baroda
Sri Ratan Krishna Ray	Central Bank of India
Sri Shibapada Bhattacherjee	UCO Bank
Sri Shyamal Kumar Das	Punjab National Bank
Sri Tripur Roy	Allahabad Bank
Sri Arun Kumar Kar	The Bank Employees' Cooperative Bank Ltd.
(Representative of Workmen)	

BANK'S PERFORMANCE

(Figures in Thousand)

Year	Owned Capital	Borrowed Capital	Loans	Bank Deposit	Gross Profit	Net Profit	Name of Secretary	Name of Chairman
1988-89	8244	51963	40222	16478	5932	634	Sri G. C. De	Sri Barun Chatterjee
1989-90	9717	57185	48563	14209	7437	703	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1990-91	10788	68766	54254	22234	8894	957	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1991-92	11439	74696	64287	17119	8408	1037	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1992-93	123376	86151	74983	19929	13207	1733	Sri S. K. Ghosh	Sri Barun Chatterjee
1993-94	13052	98702	81694	30373	14177	1620	Sri S. K. Ghosh	Sri Barun Chatterjee
1994-95	14567	108916	92549	86640	15642	1887	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1995-96	15690	127693	104903	34747 PSU Bond 1000	17220	2516	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1996-97	18512		126500	36200 PSU Bond 1000	20135		Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1997-98	21494	182968	145998	46780 PSU Bond 3180	24043	2628	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee

প্রবন্ধ

সারস্বত নদীয়ায় সমবায় লক্ষ্মীর আরাধনা

অমীয় রায়

নদীয়া জেলা প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় কৃষ্ণনগর গিয়েছিলাম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। তার আগের দিন বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্ট ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে নিত্যযাত্রীরা সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও ঘন্টার ওপর রেল অবরোধ করে রাখেন। পরের দিন শুক্রবার ট্রেন চলেছিল। সারা নদীয়া জেলা চলেনি। জেলার প্রাণকেন্দ্র কৃষ্ণনগরেও চলেনি। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯৯৭) বিহারের জেহানাবাদের লক্ষ্মণপুর বাথে গ্রামে রণবীর সেনার ৬১ জনকে নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদে নকশালদের ডাকা বন্ধ-এ সারা নদীয়া জেলার সাথে কৃষ্ণনগরও থেমেছিল। ১১ জানুয়ারির দৈনিকগুলি খবর দিল, ১ জানুয়ারি অর্থাৎ লক্ষ্মণপুর বাথের গণহত্যার ৪০ দিনের মাথায় ৯ জনকে ওদিতে খতম করে নকশালরা আরওয়ালে বলল নিল। সমবায়ের সুধা সাগরের পাড়ে বসে আর কতদিন আমরা একফোঁ হলাহল পান করে শুধুই প্রেতনৃত্য করে যাব কে জানে! যাই হোক, আমার যাওয়ার আগেই সংবাদ যথারীতি পৌঁছলেও ঐদিন আর নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে রাখার উপায় ছিল না।

জজ কোর্টের সামনে ব্যাঙ্কের কোলাপসিবল গেটে তালা দেখে বুঝলাম — হয় আমায় ফিরতে হবে আর না হয় থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় থাকব? ভেতরের দুচোখ ভরে তাকালাম। শুধু একটি মুখ দেখতে পেলাম। সে সন্তু, ভাল নাম সত্যনারায়ণ ঘোষ। আমরা অর্থাৎ আমি, রণজিৎ ও কাজের অল্প কয়েকজন তাকে মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) সৃষ্ট 'চৌরঙ্গী'র 'স্যাটা ঘোষ' বলে ডাকতাম। সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অধ্যাপনা শুরুর আগে প্রথমে কোচবিহার তারপর মেদিনীপুর ও কৃষ্ণনগরে মোট পাঁচ বছর সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের একক দায়িত্বে ছিলাম। মেদিনীপুরের ছোটবাজারে মহামায়া হোটেলে নদীয়ার ছেলেটির ছেলে রণজিৎ ঘোষের সাথে এক ঘরেই থাকতাম। সন্তুর সাথে আলাপের সূত্রটা ওর কাছ থেকেই কৃষ্ণনগরে এনেছিলাম। ঐ পাঁচ বছরের পরিধিতে আকাশভরা সূর্য-তারার আলোয় কৃষ্ণচূড়ার আগুনে রোমাঞ্চ লাগাতে, আমার পৃথিবী তখন অল্প অল্প করে ঘোমটা খুলছে। ঈশ্বরের মুখখানি একটু একটু করে চিনতে পারছি। সোনার পৃথিবীতে তখন নতুন নতুন রঙ দেখতাম। নীল আকাশের গায়ে ভালবাসা খুঁজে পেতাম। জীবন নিয়ে তখন আমার অনেক স্বপ্ন। সমবায় নিয়ে তখন ছিলাম সীমাহীন প্রত্যাশায়। মেদিনীপুরে মানবিক সম্পর্কের অনেক বাঁধন ছিঁড়ে সেই ১৯৬৪ সালে কৃষ্ণনগরে এলাম। সন্তুর সাথে আলাপ তখনই। আলাপ থেকে আন্তরিকতা মানুষটির সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। ও তখন কৃষ্ণনগরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরে চাকরি করছে।

বন্ধুত্বের সূত্রে ৫ ডিসেম্বর (১৯৯৭) দুপুর ২-৩০ নাগাদ যখন ঘরিয়েলের মিষ্টি বাজনাটা বাজছিল তখনো ও জানে না আমি এসেছি। আমার আসা ও থাকার জন্যে সন্তু-জায়া দীপালিও কম্বুকে কম্বাবন্ধ জলালো। সন্তু-দীপালির তনয়া মৌ বাংলায় এম-এ পাস করে বি-এড করেছে। ওপাশ সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রিগ্ধতায় সন্ধ্যাটা ভরে তুললেও তার হাতে তৈরি সিঙ্গাড়া কিন্তু রসনা তৃপ্ত করেনি। তবে প্রথম প্রয়াস হিসাবে সাধুবাদ আদায় করতে ছাড়ল না। ইতিমধ্যে আরতিকে নিয়ে রণজিৎ এল, তাদের একমাত্র মেয়ে শিবশ্রীও সঙ্গে এল। মেদিনীপুরের পাট চুকিয়ে নদীয়ায় এসেছে অনেককাল। এখন কৃষ্ণনগরেই বাড়ি করেছে। কিছুদিন আগে জেলা পরিদর্শকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে। মেয়ে শিবশ্রী জ্যালজিতে অনার্স সহ স্নাতক হয়ে বি-এড করেছে। ঘোষজায়া আরতি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছে। আর শ্রীমতী ঘোষ জন্য একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে। ওদের একমাত্র পুত্র কলকাতায় ওকালতি পড়ছে। অবশ্যস্তাবী সন্তু এখন পুরোনোত্রায় গৃহী। বুকে পেসমেকার নিলেও এখনও খুব তৎপর। রাত্রে একসাথে খাওয়া-দাওয়া হল। অনেক পুরনো স্মৃতি অতীত থেকে উঠে এল। মেদে-রোগা দুজনের বিয়েতেই অনি কলকাতায় হাজির ছিলাম। শুভলগ্নের সন্ধ্যায় নলদময়ন্তীর মাঝে কিছু কিছু ঘরানার বাধা মাঝেমধ্যে আমাদের মাঝে শুভাশুভ নিয়ে নিয়ে গেলেও সব মিলিয়ে বাড়িটা ভালই কেটেছিল। ঐদিন আমার নির্ধারিত কাজ না হওয়ার জন্য মনস্থির অবসাদ তখন চলে গেছে টেরই পাইনি।

পরের দিন ৬ ডিসেম্বর নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ভিন এগ্রিকিউটিভ অফিসারের ঘরে সন্তুর সাথে ঢুকে গেলাম। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সন্তুর থেকে এখন ঐ পদে ওর নাম আগেও শুনেছিলাম। প্রথম আলাপেই বুঝলাম মানুষটা বেশ কাজের কিন্তু পদে বসার সভাপতি আগে ঘোষ এসেন। ঐ কথাবার্তায় এগিয়ে চলার একটা সুতরাং ছক ছিল। ১৯৬১ সালে কৃষ্ণনগর বৃহত্তরের পূর্ব তখনো সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে সমবায় আন্দোলনে তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ডেপুটি হিসাবে এখন এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমবায় মানেজার সদস্য হিসাবে সভাপতি এত সময়ে কৃষ্ণনগর থেকে স্বর্ণপদক পাইকপাড়া বিবেকানন্দ হাইস্কুলে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতার সমান্তরালে এখন সমবায় আন্দোলনকে আরও পরিমার্জিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেলার সমবায় আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটির অগ্রগতি কল্পে মূলত এই দুজনই সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। ব্যাঙ্কের ডেভেলপমেন্ট অফিসার বলাকাথ সেন ও ডেপুটি ম্যানেজার প্রশান্ত তরফদার মাঝে মধ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করছিলেন।

বর্তমানে নদীয়া জেলার আয়তন ৩৯২৭ কিমি। তার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২৪ পরগণা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি, আর পূর্বদিক জুড়ে বাংলাদেশ। নদীয়া জেলার ১৭টি ব্লকের মধ্যে ২৯৫ কিমি দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্তেই আছে ৭টি ব্লক। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসরে এই জেলার জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষ ৫১ হাজার

৯৭ জন। সীমান্ত এলাকার ৭টি ব্লকে নদীয়ার জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ মানুষ বসবাস করে। স্বাধীনতার আগে নদীয়ার মহকুমা ছিল পাঁচটি। সেগুলি হল কৃষ্ণনগর সদর, রাণাঘাট, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার কালে নদীয়া ভাগ হয়। উত্তরাংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়। দক্ষিণাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয়। একসময় মত স্বাধীনতার আগেও জেলাশহর ছিল কৃষ্ণনগর। চুয়াডাঙা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া এই মহকুমা তিনটি এখন বাংলাদেশে। তারা কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় এখন মহকুমার সংখ্যা চারটি হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ছিল মাত্র দুটি কৃষ্ণনগর সদর ও রাণাঘাট। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর সদর থেকে সৃষ্টি হল তেহট্ট মহকুমা আর রাণাঘাট থেকে নতুন মহকুমা হল কল্যাণী।

একাধিক মনীষী নদীয়ার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের সকলের উল্লেখ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। অল্প কয়েকজনের সময়ানুক্রমিক উল্লেখ এখানে করছি। প্রথমেই বলতে হয় কৃত্তিবাস ওঝার (১৩৯৯-১৪০৫) কথা। ফুলিয়ায় তাঁর জন্ম। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যে জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রচলিত সেটি শ্রীরামপুরের ব্রিস্টীয় যাজকগণ প্রথম (১৮০২-০৩) মুদ্রিত করেন। ঘুরে ঘুরে তাঁর অনুদিত রামায়ণই বাংলার ঘরে ঘরে রামের কাহিনী প্রচার করছে। এই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে চিরকালের জন্যে স্থান করে নিয়েছেন। নদীয়া শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) পবিত্র আবির্ভাবভূমি। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে চৈতন্যদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত হলেও তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। নবদ্বীপে উপনয়নের পর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করেন। অল্পবয়সে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে মাত্র ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করেন। নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখের চেষ্টায় এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ভক্তি বিহ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে অধ্যাপনা ছেড়ে সংকীর্তনে মনোনিবেশ করেন।

বিশেষভাবে পরিচিত 'সংবাদ প্রভাকর' (প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়ার কাঞ্চনপল্লী। বাস করেছেন নদীয়ার বাইরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁর নাম আসবেই। তিনি শুধু লেখক-সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ভবিষ্যতের অনেক সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুই ভক্তশিষ্য হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে যুগের কোন লেখক খ্যাতি এবং প্রভাবের শিখরে থাকলেও গুপ্তকবির বিদ্রূপ থেকে রেহাই পাননি।

আর একটি উজ্জ্বল নাম রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-১৮৯৮)। কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাসভূমি। অল্প বয়সে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন ও ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলীর 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের অন্যতমরূপে পরিচিত হন। বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক আর নানান কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ও 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও সম্পাদক ছিলেন। একজন কৃতকর্মী শিক্ষক হিসাবে তাঁকে "Arnold of Bengal" বলা হত। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর প্রথম সভাপতি (২৮-১২-১৮৮৩) তিনি সভাপতিত্ব করেন। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সাধারণের সংগ্রামের কাহিনী নদীয়ার আর এক সুসন্তান দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ'-এ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়ার গ্রামে। তখন মহকুমা নদীয়া ভুক্ত ছিল। পিতৃদত্ত নাম ছিল গঙ্গাবিষ্ণু। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণনগরে বসে লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। পাদরি লং সাহেব তা প্রকাশ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নাটকটির অভিনয় দেখতে এসে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মঞ্চে জুতো ছুঁড়ে মারেন। সেটাই অভিনেতা পুরস্কার হিসাবে মাথায় তুলে নেন। নাটকটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'আঙ্কেল টমস্ কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করে ইংরাজিতে এম.এ পাশ করেন। ছাত্র জীবনে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' ১৮৮২-তে প্রকাশিত হয়। সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখতে যান। সেখানে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন ও "Lyrics of Ind" নামে ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। চাকরি জীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, কখনও বা ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড এগ্রিকালচার বিভাগে সহকারি ডিরেক্টর রূপে কাজ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রায় ১২টি, নাটক প্রায় ১৬টি। অধুনালুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে তাঁর শেষ কীর্তি, কেননা প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই তিনি মারা যান। বাঘাযতীনও নদীয়ার মানুষ। আসল নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫)। বাংলা সরকারের স্টেনো হিসাবে কাজ করার সময় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ায় একবার খোলা হাতে একটি বাঘ মারেন বলে 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩০) সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক দলগুলির যোগাযোগে জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় যতীন্দ্রনাথ জার্মান জাহাজ 'মেভেরিক' থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু পুলিস সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বিরাট বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। বুড়িবালামের তীরের এই যুদ্ধটি ইতিহাসে এখনও 'কোপতিপোদার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত। এই বিপ্লবীর মৃত্যুর সময় কলিকাতার দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট অবনত মস্তকে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন।

নদীয়ার শান্তিপুরের নিকটবর্তী কাশপটকয়ার বিশিষ্ট অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর (১৮৯৫-১৯৭৪) বাড়ি। বাবার নাম চন্দ্রভূষণ। তাঁর

লন্ডন মিশনারি স্কুলে পড়াশুনা করেন। কিশোর বয়সে থিয়েটার ও ব্যান্ডমিন্টনের আকর্ষণে পড়া ছেড়ে দেন। মঞ্চে শশধরের বেশি নাটকে অভিনয় করেন। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তাঁর পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরিল অব্রাশকরূপে বক্তৃতা দেন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালে নাট্য শতবার্ষিকীতে তিনি স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন। কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর পুত্র দিলীপকুমার রায়ও (১৮৯৭-১৯৮০) ছিলেন প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক। ১৯১৮ সালে অক্সফোর্ডে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি.এ পাশ করার পর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্সফোর্ডে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রথম ভাগ পাশ করে জার্মান ও ইতালীয় সঙ্গীত শিখতে বার্লিন যান। তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা প্রায় একশ। প্রায় ১৫খানি গ্রন্থের তিনি ছিলেন গৌরবিত গ্রন্থকার। ১৯৩৮ সালে সরকারের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের পাঠ্যসূচির জন্য তিনি 'গীতসাগর' ও 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থ দুখানি রচনা করেন। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার প্রেরিত সঙ্গীত মিশনে গিয়ে ইউরোপের বহু দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, জাপানে ও মিশরে সঙ্গীতের ওপর ভাষণ দেন। নদীয়ার জাতীয়তাবাদী ধারার শেষ কবি সম্ভবত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪)। কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বিশেশ্বরীলাল। তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক। সেই সঙ্গে গান্ধীবাদী, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী, সংগঠক এবং কারা-বরণকারী। একসময়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। পরে একাধিক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর বড় পরিচয় তিনি কবি — চারণকবি। তিনি চারণের মত গড়েছিলেন। স্বরচিত গান গেয়ে জনজাগরণ ঘটাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। তিনি অনেক গ্রন্থেরও রচয়িতা। "The Champion of the Prole-tariate" তাঁর ইংরাজি গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গের বাজা বিধানসভার দুবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন। নদীয়ার মাটিতে এই সমস্ত মনীষীদের আগমনে এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের অঙ্গনে বিশিষ্ট অবদানে সারা বাংলা ও সমগ্র ভারতের কাছে নদীয়া ছিল সরস্বতীর লীলাভূমি।

গঙ্গার উত্তরবাহিনী স্রোত নবদ্বীপ মধ্যযুগে ছিল সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পত্তিশালী ইতিহাসখ্যাত নগর জনপদ। কালে নবদ্বীপ পরিণত হয় সংস্কৃত চর্চার বাণীশ্বরী অভিকেন্দ্রে। নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামটির উৎপত্তি। প্রথমে নদীয়া বলতে নবদ্বীপকেই বোঝাতো। ইংরেজ শাসনের আমলে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গদেশে প্রথম জেলা এই নদীয়া। তখন যশোহরও ছিল এই জেলার মধ্যে। পরে যশোহর স্বতন্ত্র হয়ে গেল। জেলার এই সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে নদীয়া প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ'-এর বর্ণনানুযায়ী ২৫০০ বছর আগে শিক্ষায় সমৃদ্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। বল্লালঢিবি উৎখননে নদীয়ার প্রাচীনতম বসতির স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলা চালাবীতির পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত জোড়বাংলা মন্দির এবং শিবনিবাসের বৃহদায়তন ও বিরল রীতির কেরালের নদীয়ার উল্লেখ্য উজ্জ্বল পুরাসম্পদ। সেদিক থেকে নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নসমৃদ্ধতম জেলা।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব-পরবর্তী দুর্বল দিল্লিকে মোগল শাসনকালে বাংলার শাসনকর্তা জাফর খাঁ মুর্শিদকুলি খান নামে বাংলার স্বাধীন নবাব হন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তখন নদীয়ারাজেরা বাংলার নবাবকেই বার্ষিক কর দিতেন। আবার পলাশীর যুদ্ধের পর (২৩ জুন, ১৭৫৭) ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের ফলে নদীয়ারাজদের বার্ষিক কর দিতে হত কোম্পানিকে। ১৭৭২ সালে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি জেলা প্রশাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য জেলায় জেলার সমাহর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭৮৭ সালে নদীয়ার সর্বপ্রথম ইংরেজ জেলা সমাহর্তা নিযুক্ত হন ব্রেডশ'। তাঁর সহকারী ছিলেন বেরী। ঐ শতকের শেষে নদীয়ায় নীলচাষ প্রবর্তিত হয়। 'বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ন' (ইংরেজ কারবার) সহ নানা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী নীলচাষে নদীয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে। নীলচাষিদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করে লাভও বেশ করতে থাকে। পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি নদীয়া ও অন্যত্র নীলচাষিরা জোটবদ্ধ হয়। বিদ্রোহ করে। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনার নাম 'নীলবিদ্রোহ'। তখন নীলের কারণে নদীয়ার মাটি চাষির রক্তে লাল হয়েছিল।

ইতিহাসের তিনটি উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তনে নদীয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতকে বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানে বাংলায় মুসলিম অধিকার সহ নবযুগের সূচনা হয়। লক্ষ্মণ সেনের আমলে ১২০২ সালে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়ার নবদ্বারে এসে ঘাটকে আঘাত না করে বীরগতিতে এগিয়ে গেলেন নগরের সকলেই ভেবেছিলেন যে একদল বণিক ঘোড়েদের জন্যে ঘোড়া নিয়ে এসেছে। লক্ষ্মণ সেন তখন খেতে বসেছেন। বখতিয়ার রাজরক্ষীদের হত্যা করে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। শঙ্কিত লক্ষ্মণ সেন খুব তাড়াতাড়ি নৌকা করে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলেন। এই বিবরণের প্রামাণিকতা নিয়ে ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করলেও কাহিনীটি বেশ প্রচলিত। যেটুকুতা বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানের পরেই বাংলায় যে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় তার অবসান হয় ১৭৫৭ সালে। এই নদীয়ার পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। আবার ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বর্তমান নদীয়ার চাপড়া থানার মুজিবনগরে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নদীয়ার একটা ঐতিহ্য আছে। নদীয়ার মহেশগঞ্জের জমিদার হিতৈষী পালচৌধুরী (১৮৫৭-১৯১৪) ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক, ইংল্যান্ডের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। অবিভক্ত বাংলার প্রথম সমবায় নিবন্ধক উড্রফ তাঁর গৌরবে তাঁকে বলতেন "দি ডি পালচৌধুরী অব মহেশগঞ্জ"। ১৯০৩ সালের ১২ মার্চ পত্র নং ৬৯এ পাঠিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে তাঁর তৈরি 'কৈলাসেশ্বরী ফান্ড' থেকে পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। খণ্ড ছিল নদীয়ারই কয়েকটি গ্রাম

বেছে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। বিপ্রদাসবাবুর শর্ত পূরণে সেই সময়ে সরকারের নানান টালবাহানায় তাঁর উদ্দেশ্য তখন সফল না হলেও সরকারি সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পূর্বেও নদীয়ার মাটিতে সমবায় ভাবনার এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তবে ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ নাগাদ বাংলার সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে বিভিন্ন তহবিল থেকে অগ্রিম হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয় তার মধ্যে 'কৈলাসেশ্বরী ফাণ্ড'-এরও অবদান ছিল। অবিভক্ত নদীয়া জেলায় ১৯২২-২৩ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে গুণানুসারে এ, বি ও সি শ্রেণীভুক্ত কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

	মোট সমিতি	এ ও বি শ্রেণী	সি শ্রেণী
১৯২২-২৩	৩৪১	১৩	×
১৯৩৪-৩৫	৯৪৩	৫	৬৪৫

১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ নদীয়ায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল পাঁচটি। ব্যাঙ্ক পিছু সদস্যভুক্ত সমিতির গড় সংখ্যা ছিল ১৯৪টি আর কার্যকর মূলধনের গড় পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার। এই পাঁচটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার।

সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত খণ্ডিত নদীয়া জেলার বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির শুধু সংখ্যাগত কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

সমিতির প্রকার	১৯৭১ ৩০ জুন	১৯৭৬ ৩০ জুন	১৯৯৬ ৩১ মার্চ
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক	১	১	১
প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন/ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক	১	১	১
প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি	৫৬৮	৪৭৭	৩৬৪
গ্রেন ব্যাঙ্ক	১৬	×	১৩
অকৃষি ঋণদান সমিতি / পৌরব্যাঙ্ক	১৮	২৯	১৭৮
প্রাথমিক কৃষি বিপণন	১১	১৫	১৫
খামার সমিতি	২৫	১৭	৯
পাইকারি ক্রেতা সমিতি	২	২	২
বহুমুখী সহ প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি	১০৫	১১৫	১২৭
আবাসন সমিতি	১০	২১	১১৪
প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি (শক্তিচালিত)			
তাঁত সহ শিল্প সমবায় সমিতি	৬৭	১৬৫	৪৩৮
শ্রম ও নির্মাণ সমিতি	৬১	৮৯	৮৩
পরিবহণ সমিতি	২	×	৬৪
ইঞ্জিনিয়ার সমিতি	১৯	২২	২০
মৎস্যজীবী সমিতি	×	১৬	৮৯
সেচ সমিতি	×	৭৮	৭৮
হিমঘর সমিতি	×	৩	১১
জেলা সমবায় ইউনিয়ন	১	১	২
মৎস্যজীবী ফেডারেশন	×	×	১
কিষাণ সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক	×	×	১
প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদক	×	×	১
হাঁস-মুরগি পালন	×	×	১৩৯
হকার্স সমবায়	×	×	২২
অন্যান্য সমবায় সমিতি	×	২৬১	১৭
	৯০৭	১৩১৪	১৭৯৪

সমবায় ক্ষেত্রে নদীয়া জেলার বিশেষ গর্বের প্রতিষ্ঠানটি হ'ল নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট। বিধান রায়ের মানসকন্যা কল্যাণীতে ১৯৫৬ সালের ১লা জুন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা ভারতে যে আটটি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মধ্যবর্তী স্তরের কর্মিদের জন্য চালু হয় তার মধ্যে এটি অন্যতম। প্রথমদিকে ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চল ছিল এর পশ্চাৎভূমি। এখন তা সঙ্কুচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ-আন্দামান নিকোবর ও ত্রিপুরার জন্য চিহ্নিত হলেও বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্বের ক্ষেত্রে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মূলত কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদা-সম্পন্ন অফিসারদের সমবায় প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিষেবা দিয়ে থাকে। শুরুতে এর নাম ছিল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৬৮ সাল থেকে নামের বদল ঘটেছিল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং কলেজ হিসাবে। সমবায় সম্পর্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগ্রহের স্বীকৃতিতে ১৯৮০ সালের ১৪ অগস্ট থেকে এটির নাম হয় নেতাজি সুভাষ কো-অপারেটিভ ট্রেনিং কলেজ। ১৯৯১ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে কল্যাণীর ইনস্টিটিউটের নাম হ'ল নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট। তবে এটি ১৯৯৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে 'নেতাজি সুভাষ রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট'-এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। সারা ভারতের ১৯টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে মাত্র ৫টি অনুরূপ 'রিজিওনাল' শিরোপায় ভূষিত। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হয়।

নদীয়া জেলায় বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যে ১৭৯৪টি সমবায় সমিতি আছে তাদের বৈষয়িক ও আর্থিক সাফল্যের জন্যে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বিশেষ সচেষ্ট। আর বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাধারণ সমস্যার সমাধান, সমবায় ভাবধারার প্রচার ও প্রসার, সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার, সমবায় সমিতি সমূহকে নিয়ে মাঝেমধ্যে অধিবেশন, সম্মেলন, আলোচনাচক্র প্রভৃতির আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় নদীয়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন। জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কটির নিবন্ধীকৃত নাম "নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ"। এটি নিবন্ধিকৃত হয়েছিল ১৯৬১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। যে দুটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের একীকরণ প্রক্রিয়ায় এটির নিবন্ধন হল তাদের নাম নদীয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাণাঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ হল নদীয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — নিবন্ধিকৃত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। আর ১৯২৩ সালে নিবন্ধন হয়েছিল রাণাঘাট

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল মধ্যগ্রামে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে। শুরু থেকে দুটিই ছিল মিশ্র ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ 'পাকা টাইপ'। মিশ্র ধরনের ব্যাঙ্ক মানেই দলসাপন সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যেই উন্মুক্ত ছিল। ১৯৭৬ সালের ৩০ জুন নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যে অবস্থা ছিল তার থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে কি অবস্থায় এসেছে নিচের তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

	৩০-৬-৭৬	৩১-৩-৯৭
সদস্য সংখ্যা - ৭৪১		১৯৫
সমিতি - ৭০২		
ব্যক্তিসদস্য-৩৮		কৃষি - ৩৬৮
সরকার - ১		তন্তুবায় - ২৯০
		কর্মচারী - ২০০
		ইঞ্জিনিয়ারিং - ৫৬
		বিপণন - ১৪
		মৎস্য - ১১
		অন্যান্য - ৫২
		সরকার - ১
মেট ঋণ		
কেন্দ্রের (ব্রাঞ্চ)		
সংখ্যা		
বিভিন্ন অঞ্চলের		
পরিমাণ	১৬১.০১ লক্ষ	৬৫৯০.৯১ লক্ষ
কার্যকর		
মূলধন	৪১৭.১৭ লক্ষ	৯০৩০.৬৬ লক্ষ
বিভিন্ন খাতে		
জমানত	৪.৬৪ কোটি	৪২৩০.২৮ লক্ষ
নিট লাভ	১.০১ লক্ষ	২৭.৩৩ লক্ষ (১৯৯৫-৯৬) ৩৪.৮৭ লক্ষ (অডিটকৃত লাভ)

মূলত কৃষিক্ষেত্রে ঋণ ও অন্যান্য সমবায় ঋণ দেওয়ার জন্য গঠিত হলেও এই ব্যাঙ্ক তার কার্যধারা শুধু কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জেলার সব রকম সমবায় সমিতিকে ঋণদানের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল স্বনিযুক্ত গোষ্ঠী গঠন। সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে এদের সদস্যভুক্ত করে ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার টাকা দিয়েছে। আরও স্বনিযুক্ত গোষ্ঠী গঠনের চেষ্টা চলছে। প্রান্তিক ব্যক্তির ব্যবস্থার দরিদ্রতম নিম্ন শ্রেণীর কাছে পৌঁছনো সম্ভব হবনি বলেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিতরণ করে শতকরা ২ টাকা হারে কমিশন পাওয়ার ব্যাঙ্কের বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার আয় যেমন নিশ্চিত হয়েছে, তেমনি শিক্ষক সমাজকে সমবায় আন্দোলনে সামিল করার ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের কাছে একটি ইতিবাচক দরজা খুলে গেছে। শিক্ষকদের নিয়ে অনেক সমবায় সমিতিও গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নদীয়া জেলাতেই প্রথম ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ প্রবর্তিত সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্পের (ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) কাজ ৩১-৩-৯৪ তারিখে শেষ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে এই ব্যাঙ্কেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ডঃ এ এন খুসরোর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির (১৯৮৬-৮৯) সুপারিশ অনুসারে জেলার কৃষি ভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যায়ক্রমে ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান - বিডিপি) আনা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে সবের স্বনিযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা। কাজ এগোচ্ছে। তাছাড়াও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যসূচির (ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান - ডি এ পি) আওতায় কৃষি ভিন্ন সমিতিগুলিকে আনা হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য দায়িত্ব নিয়ে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

ব্যাঙ্কটির পরিচালন পর্ষদে মোট ১৬ জন আছেন। তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত ৯ জন, সরকার মনোনীত ৩ জন, জেলা পরিষদ থেকে মনোনীত ১ জন, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে মনোনীত ১ জন, কর্মচারী প্রতিনিধি ১ জন এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ১ জন। সমবায় আইনের ২৭ ধারা অনুসারে ১৬ জনকে নিয়ে গঠিত পরিচালন পর্ষদ এই ব্যাঙ্কের সার্বিক দায়িত্বে আছে। পরিচালন পর্ষদের ওপরে আছে সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক ও বিশেষ সাধারণ সভা। ব্যাঙ্কের সার্বিক নীতি প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, কমিটিগুলি নির্বাচন, তিন বৎসর অন্তর পরিচালন পর্ষদ গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বাৎসরিক সাধারণ সভার সদস্যবর্গ মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হয়ে সমিতি তথা পরিচালন পর্ষদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখেন তা গত ১৯৯৭ সালের ৭ জুন কৃষ্ণনগরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কের সার্বিক কাজকর্মে দৈনন্দিনের দায়িত্বে আছেন কর্মীরা। ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকা পরিচালন পর্ষদকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন ১৫৫ জনের এক সুশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীবাহিনী। এরাই সাধারণ মানুষ ও গ্রাহকদের কাছে সমবায় মতাদর্শের ধারকবাহক। সমবায় আন্দোলন তথা এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে এদের ওপর। কর্মীদলটি মূলত ব্যাঙ্কের নিজস্ব কর্মীদের দ্বারা গঠিত হলেও ২ জন সরকারি অফিসার আছেন। ব্যাঙ্কের নিজস্ব অফিসারের সংখ্যা ৪৭ জন। অন্যান্যদের মধ্যে ক্যাশিয়ার, সুপারভাইজর ও ক্যাশিয়ার নিলিয়ে আছেন ৫২ জন। ক্লার্কদের ক্যাশিয়ার, রেকর্ড ক্লার্কের সংখ্যা ১০ জন। আর অফিস পিওন আছেন ২৪ জন।

সভ্যভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সহযোগিতা ও কর্মীদলের সক্রিয়তার ফলে ব্যাঙ্কটি প্রতিবছর লাভ করেই চলছিল। বিগত ১৯৯৫-৯৬ সালেও লাভ ছিল ২৭.৩৩ লক্ষ টাকা আর পুঞ্জিভূত অবিলিকৃত লাভ ছিল ৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৯৫-৯৬ সালের লাভ আশানুরূপ না হওয়ায় সদস্য-সমিতিদের অনুকূলে তা বণ্টন করা যায়নি। কেন এমন হল? এ প্রশ্নের জবাবে বেশ কিছু সমস্যার কথা শোনা গেল। প্রথমত, ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কেও আন্তর্জাতিক বিচক্ষণতার মাপকাঠি (প্রুডেনসিয়াল নর্ম) অনুযায়ী ব্যাঙ্কের হিসাব তৈরি করতে হচ্ছে নিষ্ক্রিয় পরিসম্পদ (নন পারফর্মিং অ্যাসেটস) হিসাব করে নির্দিষ্ট সংস্থান (প্রভিসনিং) রাখতে গিয়েই এই বিপত্তি। ভবিষ্যৎ আদায়ের অবস্থার উন্নতি হলে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। তবে আদায়ের ব্যাপারে বলেছে নানান অসুবিধে ১৯৯৫-৯৬ সমবায় বর্ষে আদায়ের হার শতকরা ৫২ ভাগের কিছু বেশি হলেও ৯৬-৯৭ বর্ষে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৪ ভাগ। এর অবশ্য কিছু অপরিহার্য কারণও আছে যার ওপর ব্যাঙ্কের কোন হাত নেই। নদীয়ার মোট সমাদের শতকরা ৩০ ভাগ দেওয়া হয় পাটের ওপর আর পাট বিক্রি করেই শোধ হয় সমবায়ের ঋণ। সেই পাটের দর নেমে কমে। তাছাড়া ন্যাশনাল জুট মিল কর্পোরেশনের কাছ থেকেও বিপণন সমিতিগুলি সময়মত পাটের টাকা পাচ্ছে না। সমবায় তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে

বিনিয়োগও তার অনাদায়ের আর একটি বড় কারণ। তাঁতশিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের মধ্যে নবদ্বীপ এলাকার ৪৪টি তাঁত-সমবায়ের কাছেই পড়ে আছে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। তারমধ্যে তন্তুজ'র কাছেই পাওয়া যাবে ৬২ লক্ষ টাকা। তন্তুজের বক্তব্য হল, ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া যাচ্ছে না বলেই এই বকেয়া। তাছাড়া আমানত সংগ্রহের মূল্যও এখন বেড়েছে। সঞ্চয়ের মেয়াদগত পরিবর্তনের প্রবণতায় আমানতকারীরা এখন সঞ্চয়ী আমানতে কম টাকা রাখছে। বেশি রাখছে স্থায়ী আমানতে। গ্রাহকদের লাভজনক হারে টাকা খাটাতে না পারলে স্থায়ী আমানতের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ সুদ গোনা ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে, কৈ পূর্ণিমাকে ফসল নষ্ট হওয়ার ঝামেলা তো আছেই। শস্যবিমার একটা আনময় ব্যবস্থা অবশ্য আছে। তবে তা থেকে সব ক্ষেত্রে সাধারণ চাষির খুব একটা সুরাহা হচ্ছে না। কারণ সব ফসল এখনও বিমার পরিধিতে আসেনি। অবশ্য দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও বিমার ক্ষেত্রে ও অপকাঠি ব্লকভিত্তিক থেকে এখনও গ্রামভিত্তিক করা হয়নি। তাছাড়া অনুমোদিত ক্ষেত্রে শস্য নষ্টের প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও সময়মত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। শস্যবিমার এ অসুবিধের পাশাপাশি ঝামেলাকৃত আদলের টাকা আদলের খাতে আর সুদের টাকা সুদের খাতে জমা না করার অসংগতিপূর্ণতা বহুদিন ধরেই আলোচিত হয়েছে। কৃষিঋণের টাকা সময়মত পরিশোধের আশায় সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে যে সুদ ভর্তুকি পান তাও সময়মত আসছে না। এই খাতে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা পাওনা ছিল। আবার বাড়তি বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকি তহবিলের (রিস্ক ফান্ড) পাওনা টাকা আসার ব্যাপারটাও বেশ অনিয়মিত। অন্যদিকে কৃষি ঋণ মকুব (এ আর ডি আর - ১৯৯০) নির্দেশাবলী রূপায়ণ করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সরকারের কাছ থেকে আর পাওয়া যাবে না।

বাণিজ্যিক সাফল্যের দিক থেকে নেতিবাচক এই হতাশার চিত্রের পাশাপাশি কিন্তু ইতিবাচক সঙ্কেতও পাওয়া গেল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল তিনটি স্তরের পঞ্চায়েতের সাথে এই ব্যাঙ্কের সার্বিক সহযোগিতার একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সৃজনশীল মানসিকতা গঠনের জন্য এটি একান্তই প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদ বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে জিলা পঞ্চায়েতের সাথে ব্যাঙ্কের সামগ্রিক কারকর্মের সমন্বয় ঘটানোর এক উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতি ব্লকে যৌথ সভাও হয়েছে। সমবায় আইনের ২৭(৫) ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তাঁর কর্তব্য পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রাথমিক ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থায় সামিল করার একই আইনগত সংস্থান রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সাথে সর্বস্তরের সমবায় আন্দোলনের সার্বিক তাবলত সমন্বয় ও সহযোগিতা থাকলে জেলার সব সমবায় সংস্থার সাথে সাথে এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কেরও অনাদায়ের বোঝা অনেক কমবে। প্রসারিত পরিষেবা থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি অনুসারে "সমষ্টির জন্য ভাবনা"র অনুশাসনে নানান সামাজিক কল্যাণেও ব্যয় করা যাবে। এতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাও প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ভাবে উপকৃত হবে। গ্রামপর্যায় থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার দিকেই নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবার বেশি করে নজর দিয়েছে দেখে ভাল লাগল।

বর্তমান সভাপতি আশু ঘোষের মনন ও তার প্রাসঙ্গিক প্রতিফলনে বেশ আবেগই দেখলাম। মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সজল ঘোষের মধ্যে পেলাম আন্তরিকতার আমেজ। এই আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে যদি কর্মীবাহিনীর কাজের গতিবেগ যুক্ত হয় তাহলে সাধ ও সাধ্যের মধ্যেকার অনেক মুশকিলের আসান আপনা থেকেই হয়ে যাবে। আমরা সেই দিনেরই পথ চেয়ে আছি। সরস্বতীর লীলাভূমি নদীয়া আস্তে আস্তে সমবায়ের পৌরোহিত্যে মানবিক কল্যাণমন্ডিত আর্থিক সাফল্যে লক্ষ্মীর বর লাভ করুক।

❐

NEVER GUESS

"When Rudyard Kipling is clever he is very clever : and when he is foolish he is very foolish."

Clever indeed!
Oh, No! No! And look
Sometimes it was worrying lest he should exhaust himself. It other times it was fearfully felt lest he should exhaust the public.

"Who amongst us may be like him?"—
asked a member.
A member just withdrawing his nomination sharply retorted, "I don't know."

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই
আজ প্রার্থিত —
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের দিঘা, পুরী, দার্জিলিং ও গ্যাংটক-এ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ নিবাসের (হলিডে হোম) সুবিধা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭৫ বৎসর ধরে (১৯২৪-১৯৯৮) সাধারণের পরিষেবায় উজ্জ্বল নজির সৃষ্টিকারী এই ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চায়। মাখলা ও হিন্দমোটর-এ দুটি শাখা কেন্দ্র (ব্রাঞ্চ) খোলার সিদ্ধান্ত সেই আকুতিরই ফলশ্রুতি।

নন্দ গোস্বামী
সভাপতি

মদনকুমার বণিক
সম্পাদক

উত্তরপাড়া, হুগলি
পিন ঃ ৭১২ ২৫৮
ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ৩য়ে. মানে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা পত্তবার্ষিকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্বায়নের যোক্তিতে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713204
Phone : 0343 / 56-2393. 0343 / 56-4722

অনুবাদ গল্প

চার টাকা

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

মূল লেখক : আর কে নারায়ণ

গাছের কাজটা যে কেমন ধারা হবে রঙ্গা কিছুতেই তা ঠাহর করতে পারে না। কবীর লেনের মোড় ঘুরতেই কিন্তু উল্টো-পাল্টা কাজকর্ম মিলে যায় তার।

মার্কেট কাউন্টেনের কাছে বসে ছিল আরু। হঠ করে এক আজব কাজ মিলে গেল। রাস্তার ধারের বড় বাংলোর এক কাজের লোক সন্দেহী চোখে এদিক ওদিক ঘুরছিল। বরাত কাছেই খোলসা করল লোকটা। 'আমাদের আমার পাম্পটা কুয়োয় পড়ে গেছে। ওটা তুলতে হবে। একটা লোক জোগাড় করে দিবি?'

'কত দেবে?'

'কত চাস বল না।'

'আগে কুয়োটা দেখতে দাও। দু'টাকার কমে তো হবেই না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে।'

রঙ্গা তো অবাক। ভাবতেই পারেনি হাঁকা দরটা এমন এক টাকায় কবুল হয়ে যাবে। অদ্দিনকালে কুয়োয় নামেনি, তাই সে পালাবার ফিকির খুঁজছিল। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। ওর হাতের কবজিটা বেশ চেপে ধরেই টানতে টানতে নিয়ে চলল। রঙ্গা সেই নিমরাজি। 'ছেড়ে দাও বাপু আমাকে — বলছি কুয়োটুয়োর কিস্যু জানি না।' চেঁচালে কি হবে, চাকরটা ছাড়নেওলা নয়। সে বলছে, 'ওসব কথা রাখ, দেখ আগে কুয়োটা। আজ চার দিন হল সিস্টেমে পিচ্ছে না, জীবনটা বিষ হয়ে গেল। আজই একটা কিছু না করতে পারলে আমার চাকরি খতম।'

'আরে, বলছি তো কুয়োটুয়োর কিস্যুই জানি না।'

'চোপ। ওসব চালাকি রাখ।' বুড়ো চাকরটা খেঁকিয়ে উঠে সেকেলার মতো মুচকি হাসল, 'ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করিস না। দু-এক আনা বেশি লাগলে বল।'

'কিন্তু — কিন্তু —'

রঙ্গা কাঁউ কাঁউ করছিল। লোকটা তক্ষুনি একটা বিড়ি এগিয়ে ধরে চুপ করিয়ে দিল ওকে। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে লোকটার পিছু পিছু চলল রঙ্গা।

বাংলোর গেটে তখন মালিক, মালকিন আর তাদের দুই ছেলে দাঁড়িয়ে। চাকরকে দেখেই তারা চেঁচাল — 'কি হে, কাউকে পেলে?'

রঙ্গাকে দেখিয়ে সে বলল — 'এই যে এনেছি।'

রঙ্গা তখন কাঁপছে। সে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল। কর্তা হাঁকলেন। 'একটা আমার জলা কুয়োয় পড়েছে। ওটা তুলবে।'

'হুজুর, আমি কী করে পারব' — ওর কথার মাঝেই চাকরটা বলতে লাগল — 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন মালিক, আমি বলছি ও পারবে।' কর্তা আর পরিবারের সবাই এর মধ্যে কোনো গভীর চালাকির গন্ধ পেয়ে থাকতে পারেন। তবুও ওরা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কুয়োটা আগে দেখো।'

রঙ্গাকে ওরা পিছনের উঠোনে নিয়ে এল। বাড়ির কর্তা ও আর সবাই তাকে খাতিরের চোখে দেখছে বলে ধীরে ধীরে নিজের ওকালতী উপভোগ করতে শুরু করল রঙ্গা। সবাই ঘোরাকে ঘিরে রেখেছে আর ঘটনাটা বলছে। বেশ গম্ভীরভাবে শুনল সে সব। তারপর বলল, 'জিনিসটা নিশ্চয়ই বেশ পুরনো ছিল।' সবাই একবাক্যে ঘাড় নাড়লো। রঙ্গা ভাবতে শুরু করল এহেন মন্তব্যটা করে বাকল কিছু একটা করে ফেলেছে, এবং তারা তাকে জলাটার ইতিহাস শোনাল। ওটা নাকি সম্প্রতি মরুদ্যানে বাংলোর ওভারিবাহে পাওয়া, সেই থেকে হাতবদল চলছে পুরুষানুক্রমে। ওরা কটমট করে তাকাল বুড়ো চাকরটার দিকে। মালকিন বলল, 'জানতাম যাতে ছুঁতে পর্যন্ত দেবনি এই বুদ্ধির ঢেঁকিটা, তবে আজ —'

'কুয়োর জল তুলতে সব সময় সম্ভাব পাম্পই ব্যবহার করতে হয় রঙ্গা রীতিমত ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের মত চিন্তনী ভাসল। ভয় ভয় করে উঠল সবাই : রঙ্গা ধরে নিল এবারে সে পাকা ডুবুরি।

ওরা কুয়োর ওপরের ঢাকাটা তুলে ফেলতেই রঙ্গা উঁকি দিল নিচে। দেখেই রঙ্গার মুখ শুকিয়ে গেল। এযে এক বিশাল গভীর, অন্ধকার অন্ধকারের অন্য প্রান্তে এক চিলতে জলের রেখা চকচক করছে। রঙ্গা বলল, 'হুম, খুব গভীর কুয়ো।'

'মাত্তর ষাট ফুট।'

'চল্লিশ ফুটের বেশি লম্বা কুয়োয় নামা যাবে না।'

'আনা আটেক বেশি দিচ্ছি, অসুবিধেটা কি আছে?'

'পুরো চার টাকা দিতে হবে। নইলে ডুব দেওয়া হবে না।' কিছুক্ষণ কথাকাটির পর ওরা রাজি হল। সবে পঞ্চাশ শেষ আলটুকুও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তখন। এক থেকে চার টাকা জীবনে কখনো কামাতে রঙ্গা। টাকাটা লুকে নেওয়ারই মত। কম করে তিন দিন তাকে আর কাজ খুঁজতে হবে না। বউ আর শাশুড়ি চুপচাপ থাকবে। মনে হচ্ছে এবার বরাত খুলেছে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই কালো অন্ধকারের ভয়ে উঁকি দিতে সেই টান কিকিয়ে যায়। চারটে টাকার গেরো, অমন শবে পড়তেই চাইছে মন। কুয়ো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সন্তোষজনক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষ করে পল্লী লোকের মেজাজে এবার বলল, 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যের দিকে আসব। এখন বাড়ি যাচ্ছি।'

'কেন?'

রঙ্গা বোঝাতে পারল না কেন। আমতা আমতা করতে লাগল। সে ভুঁই ভুঁই করে বলল, 'এখনও যাইনি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা রঙ্গাকে নিয়ে গেল বাংলোর একটা খোপে। একটা পাত্র পেতে দিল ওর সামনে। খাবার এসে গেল। জায়গাটা বাংলোর ঠিক কোথায় সেটুকু বুঝতে না বুঝতেই খাওয়া হয়েছে ভরপেট। ওকে ঘিরে জোরদার পরিবেশন চলছে। সবাই সন্তুষ্ট, আরো চাট্টি হয়ে যাক। শেষে এল পান সুপুরী। রঙ্গা চিবুচ্ছে, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে হয়ে গেল। রঙ্গার মনে হল সে এ বাড়ির

সাক্ষাৎ অতিথি নারায়ণ। কিন্তু এবার দায় বড় বালাই। এখন তার এই অভিধানে ফেরার সব রাস্তা বন্ধ — কথা ফিরিয়ে নেবার কোন পথ নেই। যাই হোক, আধ ঘন্টার মতো জিরোবার পর কুয়োতলায় ডাক এল। এবার তাকে আসামীর মতো লাগছে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে কুয়োর জলের তল খুঁজতে লাগল। এবার সে সেবকদের মতো হাত কাটানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাল 'না, না —আমি এসব পারব না।' ওরা সবাই মিলে হে হে করে উঠল। 'একদম ওরকম বোল না।' রঙ্গার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন এরা বেমক্কা জলে ডুবিয়ে মারতে চাইছে ওকে। এক পলকের জন্য ছুট লাগিয়ে পালাবার কথা মাথায় এসেছিল। চারপাশটা দেখছিল। না, ওরা ঘিরে রেখেছে আটটির মতো। ওর মনে হল পালানোর চেষ্টা করলে ওরা ফেলবে সবাই মিলে, তারপর চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে ফেলবে কুয়োর মধ্যে। কোনো আশা নেই পালিয়ে বাঁচার। ছেঁড়া-ফাটা জামাটা খুলে, ধুতির কাছা শক্ত করে বেঁধে নিল রঙ্গা। একটা দড়ি টেনে নিয়ে তার এক প্রান্ত দিয়ে কুয়োর ওপরের খাম্বার সঙ্গে কোমর বাঁধল, অন্য প্রান্ত নিচে নামিয়ে দিল। কুয়োর মুখে উঠে পড়ল, তারপর দড়ি ধরে নামতে লাগল। সমস্তক্ষণ কুয়োর দেওয়াল ছুঁতে পা দুটো ছড়িয়ে নিয়েছে। এভাবেই নামতে লাগল সে। ভয়ে নিচে তাকাবার সাহস হচ্ছে না বলার। বাড়াসটা আরও গরম, আরও ভাঁপার ঘনিয়ে আসছে। সে উপরে তাকাল। আকাশে নীল চাকতি। ওপরের খাম্বার ফাঁকে একটা বিপুল চাবা বেরিয়েছে। আর দেখা যাচ্ছে আবছা মুখগুলো — ওপর থেকে ওর দিকে নজর রাখছে। একজন বলল, 'খলিয়ার।' আর একজন ধমকে উঠল — 'ডাঙাড়ো কোর না।' রঙ্গা বলছে, 'বাপধনেরা সোহাই, উঠে আসতে দাও, আমি নামতে পারছি না।' মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল করতে মজুরি করতে অন্য বাড়িরও নিল। 'আরে অর্ধেকটা নামা তো হয়েই গিয়েছে।'

'যদি তার আমি ওপরে উঠতে না পারি, বাবুরা দয়া করে আমার ছেলেমেয়েকে খবর দিয়ে দেবেন।'

কথাটা শোনামাত্র সবাই হেসে উঠল হো হো করে। বড় অসহায় লাগছিল রঙ্গার। সে ভাবছিল, পালাবার পথ নেই, নামতেই হবে। সে ধীরগতিতে নিচে নামতে লাগল। পথে মুহূর্তেই আরো অন্ধকার, আরো আতঙ্ক। কানের শ্রবণশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে, বুকটা ভারি ভারি লাগছে। চোখ ঘুলিয়ে উঠছে। যখন শেষ পাদানিতে পৌঁছল তখন সে আতঙ্কিত। তবে মাথায় শুধুই বাজছে, 'চার টাকা। চার টাকা।' নিজের মনেই বলে চলেছে, 'মরে যাচ্ছি আমি, না, মরেই গিয়েছি!' পায়ে সহসা ঠাণ্ডা কনকনে জলের ছোঁয়া লাগল। বিপন্নবকভাবে নিচু হয়ে গেল। তারপর হাত ভরে জল নিয়ে খেতে ফেলল। তারপর লাগাল ঝাঁপ। মুখে তখন বিড়বিড় করছিল, 'চার টাকা। চার টাকা।' তার আঙুলগুলো কুয়োর তলানির মধ্যে চিরুণী তল্লাসী করতে করতে অবশেষে এক টুকরো দড়ি খাবলে ধরল। সেই দড়ি বরাবর হাতটা এগিয়ে নিতে দেখল ওর সঙ্গে বাঁধা আছে তার সেই পাত্তরটা।

এবারে ওপরে ওঠা। সেটা আরও বড় এক অভিযান। বলতে গেলে তারা সকলে মিলে সবলে টেনে তুললো তাকে। মাটির ওপর প্রায় ঘন্টাখানেক উপুর হয়ে পড়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরল, ওরা বলল — 'বড় ভাল লোক তুমি। এবার কুয়োয় বিষ্টু পড়লেই ফের তোমাকে ডাকবো। থাক কোথায়?' রঙ্গা বলতে চাইল না। সে শুধু বলল — 'মজুরিটা দাও, চলে যাই।' ওরা ওকে চার টাকা চার আনা দিল। সেগুলোর দিকে চেয়ে রঙ্গা বলল, 'হুজুর বলেছিলেন চার টাকা বারো আনা।' ওরা অবাক হয়ে তেড়ে উঠল — 'পয়সার খাঁই দেখ না! জানিস জামাটার দাম ওর থেকেও কম? আমরা তোকে খেতে দিলাম, সব দিলাম। যা, যা, পালা। আজ খুশি হতে শেখ।'

'ডুবুরিদের কথা আর বোল না — ওদের খাঁই মেটে না কিছুতেই। সব ব্যাটাই এক, বুঝলে।' কে যেন মন্তব্য করলো।

রঙ্গা বাড়ি পৌঁছে দেখে বউ আর শাশুড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। যখন কারেই ওরা সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকে। দেখামাত্র বউ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল — 'এই এখন তোমার সময়টা বাজে! বাজার করব তখন আর রাঁধবই বা কখন? ভেবেছ কি? বাঁদিগিরি করতে জন্ম নিয়েছি? আজ রাত্তিরটা ওকিবে রাখলে তোমার উচিত শিক্ষা হয়!' এবার সে চার টাকা চার আনা মেলে ধরল।

'চার টাকা! চুরিটুরি করনি তো?'

রঙ্গা কলুই আর হাঁটুর ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো দেখিয়ে সব খুলে বলল। ওরা শুধু হাসল আর বলল — 'কস্মিনকালে তোমাকে কুয়োর ধারেপাশে ঘেঁষতে আজি দেখিনি! নির্ঘাৎ গোলমালের মধ্যে ভিড়েছিলে। তারপর সুযোগ বুঝে আরো পকেট থেকে টাকাটা হাতিয়েছ, তাই না?□

শারদীয় অভিনন্দন সহ

শিলিগুড়ি সিভিল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

(সদস্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি আর্থিক সংস্থা)

স্থাপিত : ১৯১৪

নেতাজিপল্লী, কবিগুরু সরণি

পোঃ রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ৪০৬

ফোন : শিলিগুড়ি - ৫৩৪৫৬১

শিলিগুড়ি মহকুমার অধিবাসীদের সেবায় নিয়োজিত

তন্তুজ

পুজোর স্টক এসে গেছে

পুজোর বাজার করে নিন কিস্তিতে দাম দিন

উৎসবের সময় সকলের জন্য কেনাকাটা করতেই হয়। নিজের জন্য লাক্স একটা ঠাঁতের শাড়ী পছন্দ হলো, কিন্তু বাজেটে কুলোচ্ছে না - এমনতো প্রায়ই হয়। সুন্দর একটা অভিজাত কাপড়ের বা মনভোলানো জামদানী, কম্পিউটারে ডিজাইনের টাঙ্গাইল শাড়ী, তসরের উপর কাঁথা স্টিচ, হাত পেইন্টেড মুর্শিদাবাদ সিল্ক /গরদ অথবা প্রিন্টেডের জন্য ১০০% কটন শার্ট বা সালোয়ার কামিজে নজর পড়তেই মনটা ছটফট করে ওঠে, এমন হামেশাই হয়।

এখন থেকে আর মন খারাপ করে ফেরা নয়। 'তন্তুজ' এনেছে কিস্তিতে কেনার অভূতপূর্ব সুযোগ। পাঁচটি বা দশটি মাসিক কিস্তিতে আপনি চেক্ কেটে দিন। এর জন্য বাড়তি কোন সুদ লাগবে না। কোন ডকুমেন্টেশন চার্জ লাগবে না। কিস্তিতে দাম দেওয়ার এই সুযোগ আপাতত কেবলমাত্র সরকারী/আধাসরকারী অফিস, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক ও প্রথমত কেবলকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য। কমপক্ষে ২,০০০/- সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকার তন্তুজ সামগ্রী কিনতে পারা যাবে এই প্রকল্পে।

এবার যত খুশি কিনুন, মনের মতন কিনুন।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত তন্তুজ শোরুমে এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে :-

◆ তন্তুজ ভবন (সল্ট লেক-ডি ডি-১৮/৪-নো রিকেট পশ সয়) ◆ পার্ক ষ্ট্রীট ◆ লিডসে ষ্ট্রীট ◆ চৌরঙ্গী ◆ গড়িয়াহাট মার্কেট নো রিকেট পশ (ছিতলে) ◆ দক্ষিণাপন (দক্ষুরিয়া) ◆ বৌবাজার ◆ শিয়ালদহ ◆ মানের বাজার ◆ বেহালা (মাউন্ট সুন্দর মার্কেট) ◆ শ্যামবাজার (নো রিকেট পশ সয়) ◆ জি.আই.সি মার্কেট-কুলবাগান ◆ উত্তরাপন (উল্টোডাঙ্গা, সিভিক সেন্টার) ◆ বাবাসাত (কলেজী মোড়) ◆ হাওড়া ময়দান ◆ কদমতলা ◆ বেলুড় ◆ উত্তরপাড়া ◆ শ্রীরামপুর (বি. পি. দে স্ট্রীট) ◆ কল্যাণী (সেন্ট্রাল পার্ক)

অথবা টেলিফোন করুন : ৪৭৪-৬৩৬৩

তন্তুজ

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডলুম

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

তন্তুজ ভবন, ৪০ ডি. ডি. নং-১৮/৪, সেক্টর-১, বিধান নগর, কলিকাতা-৭০০ ০৯১

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১ [illegible]
২ [illegible]
৩ [illegible]

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউডি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রভৃতি, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ডাইরেক্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাভুক্ত দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও মুরারই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

আম্মা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধে নামছে ধীরে ধীরে। শ্রাবণের শেষ। ঘোলা মাঠের মিষ্টি হাওয়ার প্রাণের আবেগ। ইলশেগুড়ির খামখেয়ালিপণার বিড়ম্বনাও। তিন পা পিছনের টান এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে এক পা এগনোর স্বভাবধর্ম প্রকৃতির। মানুষেরও। বিশেষ করে এই মানুষটির, যে এখন হেঁটে চলেছে আলপথে।

বর্ধমান-সোনামুখী বাস রাস্তা অনেক পিছনে। মাঠ-ঘাট, আলো-বাতাস, আকাশ-নদীর ওপর চিকনকালো শরীরখানি বিছিয়ে দিয়ে সন্ধে নামল। এবড়ো-খেবড়ো পথ, পিছিল, সঙ্গে আলো নেই। হোঁচট খেয়ে, ধাক্কা সামলাতে সামলাতেই এগিয়ে চলে পরিতোষ।

ঘন্টাখানেক হাঁটার পর আলো চোখে পড়ল। বৈদ্যুতিক আলো না। কোন গৃহস্থের দাওয়ার কুপি বা লণ্ঠন। ম্লান তবু আঁধারে উজ্জ্বল, যেভাবে উজ্জ্বলতা ঘিরে থাকে শতজীর্ণ সন্ন্যাসী মনুষ্যমণ্ডলীকে।

ক্রমে আলো বাড়তে থাকে, এক দুই তিন ...। চণ্ডীমণ্ডপ চোখে পড়ে। টোকা মাথায় বিক্ষিপ্ত মানুষজনের সতর্ক আনাগোনা। বানা চিন্তা জট পাকায় পরিতোষের মনে। কী কর্তব্য!

এ গ্রামের পরিচয় পরিতোষ জানে। সোমসার। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বাস থেকে নেমেই সে বিকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল মুহূর্তের জন্য। জোল না সোমসার ...। শেষ পর্যন্ত সোমসারই। হ্যাঁ, তেমন সাত-পাঁচে নেই এই গ্রাম। চাববাস, ভালোমন্দ, নামগান, বন্ধুত্ব-শত্রুতার মাঝে নেহাতই প্রয়োজনের রাজনীতি। খণ্ডঘোষে কাজ করার সময় এ গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিল। দীপঙ্কর। জিজ্ঞাসাবাদ করলে বাড়ি খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথে যাওয়া ঠিক হবে কী!

চণ্ডীমণ্ডপের কাছাকাছি এসেও থমকে দাঁড়ায় পরিতোষ। বহু লোকের জটলা। উদ্বিগ্ন মুখের মিছিল। তবে কি খণ্ডঘোষের ঘটনা নিয়েই আলোচনা চলছে। হতে পারে নাও হতে পারে। তবে অত লোকের চোখের সামনে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গ্রামে পাকে চলা পথের অভাব নেই। চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিকের পাকে চলা রাস্তায় গা ঢাকা দিল পরিতোষ।

দুধারে উঁচা বাড়ি, মাঝে সরু রাস্তা। কোনদিকে কোন আলো নেই। নিশ্ছিদ্র কাদা-পথে টাল খেতে খেতে পা টিপে এগিয়ে চলে পরিতোষ। হঠাৎ অন্ধকার চিরে ভেসে একটি শব্দ। ভালো করে বোঝা যায় না শব্দটি। পরমুহূর্তেই টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ে পরিতোষের মুখে। আলোর পিছনের লোকটিকে দেখা যায় না। কিন্তু এবার ভেসে আসে স্পষ্ট কণ্ঠস্বর : 'কমরেড'।

চমকে ওঠে পরিতোষ? সে ভাব গোপন রেখে স্থির গলায় বলে, 'কে'?

— যতই সাবধানে চলুন, এ পথ বড় পিছিল কমরেড।

— আপনার পরিচয়?

— চতুর্দিকে পুলিসের জাল। গা ঢাকা দেওয়া এত সহজ ভেবেছেন?

পরিতোষের মনে হয় লোকটি পুলিসের আড়কাঠি। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে হঠাৎই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির ঘাড়ে। আছাড় খেয়ে ফেলে। হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে তার মুখের ওপর আলো ফেলে।

কালো কালো দোহারা চেহারার এক যুবক। গালভর্তি দাড়ি, চকচকে চোখ। পরিতোষ বলে, 'কি নাম তোর?'

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি বলে, 'হামিদ। হামিদ মিঞা।'

— আমার সঙ্গে তোর কিসের পরিচয়।

— বলছি, ছাড়ুন।

হামিদকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পরিতোষ। দুজনেই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চাপা গলায় পরিতোষ বলে, 'বল্ কী পরিচয়।'

— আমি আপনাকে জানি শান্তিদা। আপনার ডাকনামটাও আমি জানি। খণ্ডঘোষে, বড়া-কমলাপুরে তাপচাষীদের লড়াইয়ে আপনার নেতৃত্ব ছিলাম। ডুবিরডেড়ির আন্দোলনে জোতদারের গুণ্ডারা আপনাকে ... এই সেদিন খণ্ডঘোষেও বাইপাসে বাস।

— থাক। এবার তোমার কথা বলো।

— আমি সামান্যি এক চাষী। অল্প জোত-জমি আছে বটে। সে হিসেবে মাঝারি চাষীও পাবেন। কিন্তু কি জানেন বটে

— যা বলবে খোলসা করে বলো।

— হ্যাঁ। আমি আপনাদের মনোবেদনার কথি সে হিসাব আপনাকে ডেকটার দিতে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিতোষ তাকায় হামিদের মুখে। হামিদ ফের স্পষ্ট করে বলে, 'হ্যাঁ, আমি তো চাষিই বটি

তার বিশ্বাস অর্জনের ধরন দেখে পরিতোষ লজ্জা পায়। ছি ছি! এত সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করা ঠিক না। যদিও লেনিনের কথা সে জানে যে, জমি থাকার জন্যই মালিকানা এবং সে কারণে কৃষক সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্বে আসতে পারে না — তবুও স্বল্প সামর্থ্যের এই কৃষি-মালিকানের সহযোগিতা বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজন। তাই সে হামিদকে লক্ষ্য করে বন্ধুত্বের সুরে বলে, 'আপনি যখন হলই তখন বলি, পুলিস আমার পেছনে লেগে আছে। আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি'

— সে তো বুঝতেই কমরেড। তাই তো আপনাকে ডাকা।

— আচ্ছা, দীপঙ্কর নন্দের বাড়িকে চেনো?

— দীপঙ্কর ... না তো।

— এই গাঁয়েই থাকত বলে শুনেছি।

— না, আমার বুঝাও ভুল হচ্ছে বোধহয়

— বেশ, আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও, চলো ...

এগিয়ে চলল দুজনে। পরিতোষের কড়া নির্দেশ। নেহাত বাধ্য না হলে টর্চ জ্বালাবে না হামিদ। সোমেশ্বরের মন্দির বাঁ পাশে রেখে শালি দামোদরের কোল ঘেঁষে খানিকটা চলতেই তারা এসে পৌঁছল তিন গম্বুজের মসজিদের কাছে। ছোট্ট এক টিলাতে বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে অতিথেয়তার ভঙ্গীতে হামিদ বলল, 'আইয়েন, বসে আইয়েন।'

বাড়িতে দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘর ছেড়ে

দেওয়া হল পরিতোষকে। বাড়িতে হামিদ ছাড়া আর কেউ থাকে বলে মনে হল না। হামিদই এগিয়ে দেয় জল বালতি, লুঙ্গি,গামছা ইত্যাদি। হাতমুখ ধুয়ে লুঙ্গি পরে আরাম করে ঘরে বসে পরিতোষ। দরজা ভেজানোর রীতি গ্রামে খুবই কম। তবু সাবধান হওয়ার জন্য দরজা ভেজিয়ে দেয় খানিকক্ষণের মধ্যেই মুড়ি চেখে চা নিয়ে আসে হামিদ।

সারা দিনের পর এই প্রথম পেটে কিছু পড়ল। গেলাসে মুড়িকটি খেয়ে চায়ে চুমুক দেয় পরিতোষ। দেহের বল ফিরে পায়। হামিদকে কাছে বসিয়ে হাসি মুখে বলে, 'তোমার কেউ নেই?'

— আছে, তবে এখন পাই যান না কাউকে।

তার কথা শুনে হেসে ফেলে পরিতোষ। বলে, 'না না, পেতে চাইছি না কাউকে। জিজ্ঞেস করছি, এই মাত্র।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর হামিদ বলে, 'যান শুন গিয়া। আর লোনেন, লোকের আসাটা দিয়া লেন বটে কওয়া ত যায় না....

মাকড়াতে ভরি পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় পরিতোষের। দাওয়ার এবং সামনের পথে দিকদিক করছে পুলিশ। আগল ফাঁক করে এক নজর তাকাতেই পরিতোষের চোখ যায় হামিদের মুখে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে এক কর্তাব্যক্তিকে বলে চলেছে না স্যার, টের পাওনের চান্স নাই। এ্যাক্সন অ্যাকটিং কন্সি

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিতোষ। ঘরের পশ্চিমদিকে ছোট একটি জানলা। মাটির বুকে বাখারি বসিয়ে তৈরি। বাখারিতে ঘুণ। কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় বাখারিগুলো খুলে ফেলে পরিতোষ। তক্তাপোষের সমান্তরালে জানলা। তক্তাপোষে উঠে হামা দিতে জানলা গলে বাইরে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না তাকে।

এই নিকটায় ঝোপঝাড়। তার ওপর নিকষ অন্ধকার। সাপখোপ থাকতেই পারে। অন্যান্য বিপদও । তবু উপায় নেই। কয়েক পা এগোনোর পর ডানদিকে অস্পষ্ট আলোর নিশান। হাত পা কেটে ছড়ে যাচ্ছে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলেছে পরিতোষ। খানিকদূর যাওয়ার পর ঝোপঝাড় পাতলা হয়। হঠাৎ পরিতোষের মনে হয় কাছেই একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। এত রাতে কারো থাকার কথা নয়। তবে ডাকাতি হতে পারে কিংবা পুলিশ। ভাঙা গলায় পরিতোষ বলে, 'কে?'

এমন সময় বিদ্যুৎ চমকালো। চকিত আলোয় পরিতোষ দেখে, শীর্ণকায়া এক প্রৌঢ়া রমণী। শুকনো দেহ কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। ঘের অন্ধকার। নিবড়ঙ্গর। হঠাৎ আলোর ভঙ্গীতে প্রৌঢ়ার কণ্ঠ বেজে ওঠে, 'ডরাইবেন না' আইবেন'।

আপনার পরিচয়।

— পরিচয়ে কী প্রয়োজন! অহন বিপদ। চইল্যা আসেন

— আমি জানতে চাই।

— আমার বদনসীব, হামিদের আম্মা আমি। সে পুলিশের আড়কাঠি, শয়তানের সাগরেদ। কিন্তু আমার স্বামী ছিলেন কৃষক সভার নুর আলি

— নুর আলি! আমাদের নুরদা ... হামিদ তার ছেলে!

— বদনসীব ভাইসাব। তবে আমনাকে আমি চিনি। ছবিতে দেখেছি। হামিদ আজ আমনাকে নিয়ে আসতেই আমি বুঝতে পারি ওর মতলব। পাশের ঘরেই ছিলাম বটে। যোগাযোগের সুযোগ পাই নাই।

— পুলিশে খবর দিল কি করে?

— শয়তানের কি লোকের অভাব ভাইসাব! যাক্, এই টর্চ নেন আর উত্তরমুখো হাঁটা দেন। দামোদরে অনেক নৌকো বাঁধা আছে। যে কোন একটা নিয়া ওপারের চরে বাঁইধ্যা যান। চরের উপরে পানাগড়। রাত থাকতেই পার হইয়া যান কমরেড।

আর দ্বিধা করে না পরিতোষ। কাদায় ভর্তি ঝুলি বাঁ কাঁধের ওপর ঠিকঠাক তুলে নিয়ে সে বলে 'চললাম কমরেড অভিনন্দন।'

পায়ে পায়ে পিচ্ছিল পথে এগিয়ে যায় পরিতোষ। জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করেই। পেছন ফিরে একবার দেখে। ক্ষীণকায়া মানুষী দাঁড়িয়েই আছে কেন।

দামোদরে এসে নৌকা ছেড়ে পরিতোষ। হাল ধরে। তার দু'চোখে অন্যরকম এক প্রত্যয় আজ। এক শীর্ণা নারীর অস্থিতে গড়া সে প্রত্যয়। যে নারীর নাম নেই, ধাম নেই, উত্থান নেই, পতনও নেই, যে নারী কারো জায়া নয়, পুত্রী নয়, ভগ্নী কিংবা ভবনেরী নয়, যে নারী বিপ্লবের জননী। বিকল্পরহিত এক আত্মা যার গর্ভে শয়তান জন্ম নিলেও সেই শয়তানের মারণাস্ত্র তিনি নিজেই তৈরি করেন। বিপ্লবের অবিকল্প ভূমিতে স্থির প্রত্যয় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, দাঁড়িয়ে থাকেন, দাঁড়িয়েই থাকেন.....।

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ

পিড়াতলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ৬১ এইচ জি ; তারিখ - ৩-১১-৬২

গ্রাম - পিড়াতলী ● পোঃ - জোলকুল ● জেলা - হুগলি

জয়া মাইতি
সভাপতি

আনন্দচাঁদ দত্ত
সম্পাদক

বাসুদেব ঘোষ
ম্যানেজার

আপনার আনন্দঘন দিনগুলি কাটান

গোদরেজ কলকাতা কর্মচারিদের সমবায় ঋণদান সমিতির
উদ্যোগে পরিচালিত

পুরীর হলিডে হোমে

এই সমুদ্রমুখী চারখানি এক কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ হলিডে হোম
উদ্বোধন করা হয় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-এ

পুরীর মনোরম বালুকাবেলায় গৌরাবারাসাহীতে হরিভবনের
বিপরীত বাড়ির তিন তলায়।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

গোদরেজ ক্যালকাটা এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ব্লক ঃ জি এন, সেক্টর-৫, বিধাননগর, চতুর্থ তল
কলিকাতা-৭০০ ০৯১

প্রবীরকুমার নাথ
সম্পাদক

কল্যাণচন্দ্র মণ্ডল
এস কানান

ফোন ঃ ৩৫৭-০৮৯৫/৯৯

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM

Adambandh Samabaya Krishi Unnayan Samity Ltd.

MUTHADANGA, POST.-MAYAPUR, DIST.- HOOGHLY
PHONE : 03211-59222

(Govt. of West Bengal its largest Share Holder)

Marching Ahead for —

- *Providing Agril. & Non Farm Loan to its Members.*
- *Stockist of IFFCO Fertilisers.*
- *Wholesale & Retail Selling of Veterinary Medicines.*
- *Manufacturing of Live Stock Feeds in Mocera Feed Plant.*
- *Supply of Pasteurised Milk from own Plant.*
- *Ensuring supply of Table Eggs & Birds to the Govt. for Hospital after procuring from the Farmers sponsored under the Society.*

ড়া জ গ
ক্রী ৎ

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ

সবুজ ক্যানভাসে ফ্রান্স এঁকেছে ফুটবলের অনন্য ছবি

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ফুটবল শহর কলকাতা। বিদেশিদের কাছে বিস্ময়ের। বিদেশি সাংবাদিকদের ধারণা ভারতে ফুটবল খেলা হয় না। ফ্রান্সে ভারতীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতির হার দেখে তারা অবাক হয়েছেন এবং চমকে উঠেছেন সাংবাদিকদের কর্মচাঞ্চল্য দেখে।

কাজের সুবাদে সাংবাদিকদের ফ্রান্সের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরতে হয়েছে। এতে ভারতীয় সাংবাদিকরা লাভবানও হয়েছেন। কারণ ফ্রান্সের মাটিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে।

বিশ্বকাপ মানেই মহাযজ্ঞ। তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ভারতীয় সাংবাদিকদের চলতে হয়েছে। কারণ সময়টা মুখ্য হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের সময়ের সঙ্গে ভারতীয় সময়ের ব্যবধান সাড়ে তিন ঘন্টার। এই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা সহজ কথা নয়। কারণ ভারতীয় সাংবাদিকদের মাথায় কেবল একটাই চিন্তা ফ্রান্স বিশ্বকাপের ঘটনাবলী থেকে যেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা বঞ্চিত না হন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মাঝে মধ্যে এমনও হয়েছে ভারতীয় সময় সকাল আটটায় স্টেডিয়াম থেকে হোটেলে ফিরতে হয়েছে। মাত্র বিশ্রাম মাত্র তিন ঘন্টার। তারপর আবার বেরোতে হয়েছে। কারণ সেই একই। বিশ্ব ফুটবলের সংবাদ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করা চলবে না।

ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে এ এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলা শেষ হয়েছে ভারতীয় সময় রাত আড়াইটায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়েছে সংবাদটি যথাসময়ে নিজ নিজ অফিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

তবে, এই কাজের পরিশ্রম গায়ে লাগেনি। বরং এতে প্রত্যেকেই আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। নিজেদের শরীরের দিকে তাকানোর কোনও ফুরসতই ছিল না। হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই খেয়েছি।

বাঙালি বলে কথা। মাঝে মধ্যে সময় পেলে ভাতও খেয়েছি। হ্যাঁ, শহর হলেও বন্ধু সজল তাই ভাত খাবার এক হোটেল খুঁজে নিতেও অসুবিধা হয়নি। অনেকটা মরু বিজয়ের মত আমরা একটি বাংলাদেশী মুসলমানের হোটেল আবিষ্কার করেছিলাম। কখনও কখনও সেইখানেই রসনা তৃপ্তি করেছি।

● রোনাল্ডো - সোনার বলের অধিকারী

ফ্রান্সের মাটিতে বিশ্বকাপ। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! প্রথম দিকে ফরাসি মহিলাদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে কোনও উৎসাহ চোখে পড়েনি। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। মেট্রোর যাত্রাপথে চোখে পড়েছে ফরাসি মহিলাদের চোখ বই কিংবা ট্যাবলয়েডের উপর। কারও মুখে ফুটবল শব্দটি উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি।

কিন্তু পরে, অর্থাৎ ফ্রান্স যখন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠল, ঠিক তখনই চিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। পুরুষ ফুটবল অনুরাগীদের উৎসাহকেও ছাপিয়ে গেল।

বিশ্বকাপ জ্বরের পরের দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বাঁধ ভাঙা জ্বরের আনন্দে ফরাসি মহিলা ফুটবলপ্রেমীরা আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মহিলাদের লাল গালে মুখ হয়ে উঠেছিল লিপ্ত, কবিতা ও সাহিত্যের দেশ

এতদ্বা জন্মীকার্য আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কেভাবে ফুটবল প্রতিযোগিতার খবর প্রচার করে থাকি, তার সঙ্গে বিশ্বকাপের কভারে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

● সর্বকালের সেরা ফুটবলার ডিয়েগো মারাদোনা

ফ্রান্সের মাটিতে ফুটবলপ্রেমের সঙ্গে সাংবাদিকদের যেরকম সহজ মহজ বিশ্বকাপের মত আসরে তা সম্ভব নয় বলে বারবারতার পাশাপাশি এখনও একটি বড় সমস্যা। অংশগ্রহণকারী দেশের অধিকাংশ ফুটবলারই অপরিচিত, পুরোপুরি কিংবা আংশিক ভাষায় কথা বলেন। তাছাড়া যখন তখন ফুটবলারদের সামনে হাজির হয়ে কথা বলারও কোনও সুযোগ নেই। সাংবাদিকদের অনুরোধ দেখার সূচিও নির্দিষ্ট। যতটুকু সময়ের অত্যাংসাহী সাংবাদিকদের ঐ সময়ের মধ্যেই লেখার মসলা জোগাড় করে নিতে হত, বহু দোভাষীর সাহায্যে।

এবার দেখা যাক শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপের আসরে। বিশ্ব ফুটবলের সোনার মুকুটটি ফ্রান্সের শিরেই শোভা পাচ্ছে। বহু সমালোচিত কোচ আমি জাকের মুখে এখন হাসি। তবে, এক কথায় মানুষ কোচ জ্যাক। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন হয় কিংবা জয়, যাই হোক

বিশ্বকাপের পর আর জাতীয় দলের প্রশিক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন না তিনি।

উদ্যোক্তা দেশ হিসাবে '৯৮ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন এবং বিশ্বকে চমকে দিয়ে ফাইনালে ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপে ব্রাজিলই ছিল সকলের পছন্দের ঘোড়া। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধৃত ধারণা ছিল ফ্রান্সের মাটিতে ব্রাজিল পঞ্চপাণ্ডব বিশ্বকাপ জয়ের অন্য নজির গড়বে।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের এই ধারণার পিছনে অবশ্য যুক্তি ছিল। একমাত্র ব্রাজিলই বিশ্বকাপের ১৬টি আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এবং দলে রয়েছে একাধিক তারকা ফুটবলার। তাছাড়া ব্রাজিল সন্দেহের দল।

ফাইনালে ফ্রান্স ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক স্মরণের ফুটবল উপহার দিয়ে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের দুই রূপকার জুলে রিমে ও হেনরি দালুনে উভয়েই ফরাসি। প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসে ১৯৩০ সালে।

রূপকার ফরাসি হলেও, ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেতে ৬৮ বছর অপেক্ষা করতে হল। '৯৮ বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলিই এগিয়ে ছিল। ফ্রান্স খেতাব জয়ের আগে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার পাল্লা এক সমান সমান। ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকা উভয়েই আটবার করে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

১৯৩৮ সুইডেন বিশ্বকাপে ফ্রান্স প্রথম বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ঐ ম্যাচে ব্রাজিলের কাছে ৪-২ গোলে পর্যুদস্ত হয়ে ফ্রান্স প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। ব্রাজিলের পক্ষে পেলে তিনটি গোল করেছিলেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। এরপর ফ্রান্স দুবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল।

১৯৮৬ সালে ফ্রান্স দলটি প্রকৃত অর্থেই একটি শক্তিশালী দল ছিল। ইতালি ও ব্রাজিলকে হারিয়েও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিশ্বকাপে সেদিন স্যাঁতসেঁতে ফ্রান্স সেমিফাইনালে জের্মেনিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করল, সেদিন প্যারিস যেন এক স্বপ্নলোকের চেহারা নিয়েছিল।

হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? এর পিছনে বড় ভূমিকা ছিল জাতীয় দলের অভিনায়ক মঁসিয়ের। দেশের জনগণের ফুটবলের উপর অসীহা দেখে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'এ দেশে আচরণ যে দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ এবং যে দেশ ফাইনালে উঠেছে, অথচ জাতীয় দলের ফুটবলারদের উৎসাহিত করার মত কোনও লোক নেই।'

পরের দুদিন কিংবা ঘটনার কথা সকলেরই জানা। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই দুটি গোল করে জিদান হয়ে গেলেন ফ্রান্সের নায়ক। এরপর ফ্রান্সের পক্ষে শেষ গোলটি করেন ইম্মানুয়েল পেটিট।

● ফ্রান্সের নায়ক জিদান

ব্রাজিলের এইভাবে হার দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন ফাইনালের পরই শুরু হয়েছে ব্রাজিলের খেলা নিয়ে পোস্টমর্টেম। সন্দেহের আঙুলটি স্বভাবতই রোনাল্ডোর দিকে। অনেক প্রশ্নেরও ছিল রোনাল্ডোর উপর।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ফাইনালে ব্রাজিলের প্রথম একাদশে রোনাল্ডোর নাম ছিল না। হঠাৎই দেখা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক হুড়মুড় হয়ে গ্রেস মাঠের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি জানালেন, ব্রাজিল দলের লিস্ট পাল্টানো হচ্ছে। দশ মিনিট পরে ব্রাজিল দলের যে লিস্ট আমরা পেলাম তাতে পেলাম রোনাল্ডোর নাম।

চূড়ান্ত লিস্ট হাতে পেয়ে আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল — সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে রোনাল্ডো কি সোনার বুটের অধিকারী হতে পারবেন?

না। রোনাল্ডো সোনার বুট পাননি। তবে সোনার বল পেয়েছেন।

সোনার বুট পাবেন কি করে? খেলা দেখে মনে হয়েছে রোনাল্ডো আদৌই সুস্থ ছিলেন না। ফাইনালের আগে অনুশীলনেও অংশ নিতে তাকে তেমন দেখা যায়নি। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া গেছে, যথাসময়ে তাঁকে অপনারা মাঠে উঠতে দেখবেন। এখন তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোনও বিতর্কে নিজেকে না জড়িয়ে বলা যায়, চার বছর আগে রোনাল্ডো হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর হাঁটুর চোট যে সম্পূর্ণভাবে সেরেছে সেই সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে, ফাইনালের আগে ফুটবল সম্রাট পেলে রোনাল্ডোকে বলেছিলেন, 'শরীরের প্রতি যত্ন নিও।'

সে যাই হোক, ব্রাজিলের হারে অনেকে বিস্মিত হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যোগ্য দল হিসাবেই ফ্রান্স বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলগুলি নিজেদের ফুটবল নৈপুণ্য ভুলে ধরতে পারেনি। সেমিফাইনালের আগেই তারা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। উরুগুয়ে অবশ্য '৯৮ বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি।

এমনকী জিদানে ফাইনালে দুটি গোল করলেও, রোনাল্ডো, দাভের সুকের, ওরেন, ওর্তেগা, বাতিস্তুতা, বার্গক্যাম্প, দেল পিয়েরো, ব্লিলম্যান, অলিভার, বিয়েরহফ ও সালাস নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি।

ইতালি ও জার্মান দলের ব্যর্থতার সব দায়ই বর্তেছে ঐ দুই দেশের কোচ যথাক্রমে সিজার মালদিনি ও বার্তি ফোগটসের ওপর। তবে, বিশ্বকাপের আসরে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়ে নজর কেড়েছে ছোট্ট দেশ ক্রোয়েশিয়া, যে দেশের জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ লাখ।

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপে সেরা ম্যাচটি হল আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ড। এই বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। দুই দেশের ফুটবলাররা নিজেদেরই উজাড় করে দিয়ে সেরা ফুটবল তুলে ধরেছিলেন। অনন্য হয়ে উঠেছিলেন ওরেন ও ওর্তেগা দুই দলের দুই ফুটবল তারকা।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে গেছে ফ্রান্স। ফুটবলকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের প্রতিটি শহরের অলিগলি কানায়ানে নতুন ছবি এঁকে দিয়েছিলেন রুচিশীল ফরাসি ফুটবলপ্রেমীরা। অবশ্যই সৌন্দর্য্য বাড়াতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সে দেশের মহিলারা। ❑

অনুবাদ গল্প

যে রাতে আমার ডাক এসেছিল

অনিন্দিত মজুমদার

(এয়ার মার্শাল স্যার ভিক্টর গডার্ডের রচনার অনুবাদ)

১৯১৫ সাল থেকে আমি একজন পেশাদার বিমানচালক। আমার বিমান দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থাকলেও আমি দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস কখনো পাইনি। তবুও আমরা যখন সাহোইই থেকে টোকিও যাবার জন্য বিমানে উঠতে যাচ্ছি তখন আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি দু'বছর প্রশান্ত মহাসাগরে রয়্যাল নিউজিল্যান্ড এয়ারফোর্সের অধিনায়ক থাকার পর আরও দু'বছর বর্মা ও মালয়ে ব্রিটিশ এয়ারফোর্স পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। জেনারেল ম্যাক আর্থার এবং অন্যান্য আমেরিকান যাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধের সময় একসঙ্গে কাজ করেছিলাম তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য আমি টোকিও হয়ে বাড়ি ফিরে আসছিলাম। অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজের বিমান সিস্টার অ্যানকে বিমান কর্মিগণ সহ আমাকে ধার দিয়েছিলেন। এই বিমান ও বিমানকর্মিগণ দুই-ই ছিল বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি।

আমার অবসাদের কারণ মানসিক অশান্তি এইজন্য যে আমার সঙ্গে যারা বিমানে যাচ্ছেন তাদের আমি এক মারাত্মক বিপদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি বলে ভাবছি, অথচ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাবে তাদের বলতেও পারছি না থেকে যেতে। একজন এয়ারমার্শাল হয়ে আমি তাদের কি করে বলি যে আমি সতর্কিত হয়েছি অলৌকিকভাবে।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সাহোইইতে এক পার্টিতে ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি আমার পুরনো বন্ধু আমেরিকান বিমান বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন ম্যাক কনেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম আমার পিছনে দু'জন ইংরেজ ভদ্রলোক আলাপ শুরু করেছেন যা তৎক্ষণাৎ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

'এই পার্টি কি এয়ারমার্শাল গডার্ডের অভ্যর্থনা উপলক্ষে নয়?'

'অবশ্যই, কিন্তু কেন?'

'তিনি তো মারা গেছেন। গতরাত্রে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

ভদ্রলোকটি অপ্রতিভভাবে এবং বেশ নিশ্চিতরূপে কথাগুলি বললেন। আমি ধীরে ধীরে পিছনে ফিরলাম। লোকটি ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন কম্যাণ্ডার। তিনি হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে গেলেন এবং মনে হল যে আমি যুক্তি তাকে কিছু দিয়ে আঘাত করেছি।

তিনি শ্বাস নিয়ে বিস্মিতভাবে বললেন 'হ্যায় ভগবান, আমি ভীষণ দুঃখিত। মানে আমি দারুণ আনন্দিত — কি অদ্ভুত ব্যাপার! দেখুন, গতরাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং তা খুবই সত্য বলে মনে হয়েছিল।'

আমি হাসলাম। 'আমি এখনও মরিনি, কম্যাণ্ডার। আপনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন? ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল?'

'সন্ধ্যাবেলায়, কুয়াশার মধ্যে ঢাকরবে ঢেকা এক পাথুরে সমুদ্রতটে যেখানে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে পাথরের খণ্ড। জায়গাটা ছিল চিন অথবা জাপানে। আপনি পাহাড়ের উপর ছেঁড়ার মধ্যে ছিলেন — আমি এসব ঘটতে দেখেছি।'

'আমি কি রকম বিমানে ছিলাম?'

'একটি সাধারণ পরিবহন বিমান, সম্ভবত একটা ডাকোটা (সিস্টার অ্যান ছিল একটি ডাকোটা)'

'স্বপ্নে বিমান কর্মিদের সম্বন্ধে কি দেখেছিলেন?'

'এটা ছিল একটা ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা।'

আমি কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে চলে আসতে গিয়ে ঠিক করলাম যে তাকে আরও একটু পরীক্ষা করব। ভূগোল এবং ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে সে যে বিবরণ দিয়েছে তা মনে হচ্ছে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

'স্বপ্নে কি আপনি দেখেছেন যে কি ধরনের প্লেনকেন্দ্র সঙ্গে আমি ভ্রমণ করছিলাম?'

একটু ধীরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সাধারণ বিমান কর্মিগণ এবং তিনজন অসামরিক ব্যক্তি — দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। সকলেই ইংরেজ।'

'অনেক ধন্যবাদ'। এটাই যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক যে বিমান কর্মিগণ ছাড়া আর কাউকেই আমি সঙ্গে নিচ্ছি না। কোন অসামরিক ব্যক্তি নেই আচ্ছা, আমি আপনার নাম জানি না।'

'ও, আমার নাম ডিউই, বাড়ি ক্রেমিটে। আমি এখনকার বন্দরে আছি।'

আমরা আরও একটু কথা বলার পর পরস্পরকে ছেড়ে গেলাম তার সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হয়নি।

কয়েক মিনিট পরে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের সেনর রেপ্তাঁ ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি বাড়িতে ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি এবং আপনার সঙ্গে টোকিওতে যাবার অনুমতি চাইছি আপনার পাইলট বললেন যে আপনি রাজি হলে হতে পারে। আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

একটা মানসিক আঘাত অনুভব করে আমি উত্তর দিলাম, 'মোটেই না, যথেষ্ট জায়গা আছে। আমি ভোর সাতে ছাড়ার ব্যবস্থা হবে।' কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা হল বেরীকে একজন যাত্রীরূপে নেবার জন্য।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল জর্জ অলউইন ওগডেন আমার জন্য একটি ডিনার পার্টি দিলেন। ওগডেন আমাকে আমার যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন এমন সময় তার চিনা খানসামা এসে তাঁর হাতে একটি বেতারবার্তা পৌঁছে দিল। ওগডেন সেটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি আপনার উপর চাপ দেবার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনি যদি আগামীকাল আপনার সঙ্গে আমাকে নিতে পারেন তো খুব ভাল হয়।'

আমি কি করে না বলি? বার্তাটি এসেছে বিদেশমন্ত্রক থেকে। কনসাল জেনারেলকে অবিলম্বে টোকিওতে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। এর ফলে দাঁড়াল দু'জন অসামরিক বাকি. দু'জনেই ইংরেজ। কিন্তু কোন মহিলা নেই। যাই হোক, একজন অপরিচিত লোকের দুঃস্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগে খানসামাটি আবার একটি খাম এনে দিল। আরেকটি বেতারবার্তা। ওগডেন বললেন, 'আপনি বরং এটি পড়ুন। আমাদের টোকিওস্থ প্রতিনিধি গার্ডেনারের কাছ থেকে এটি এসেছে।'

আমি পড়লাম ' আমার কোন নির্ভরযোগ্য সাংকেতিক লিপিকার নেই সম্মেলনে নোট নেবার জন্য। অন্তত সপ্তাহের জন্যে কাউকে ধার দিতে পারলে খুব বাধিত হব।'

ওগডেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এই ব্যাপারেও আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিলাম, 'আমার মনে হয় আমি তাকে নিতে পারি, তবে তিনি যদি একজন পুরুষ হন।'

'এতে কি কোন অসুবিধা হবে? আমার ধারণা যে তিনি অবশ্যই একজন মহিলা হবেন।'

এখন দাঁড়াল তিনজন অসামরিক ব্যক্তি, তাদের মধ্যে একজন মহিলা।

সাংহাই বিমান বন্দরে সেদিন ভোরবেলার আবহাওয়া ছিল বিষণ্ণ। কনসাল জেনারেল ওগডেন ভেরিটা ব্রেকস্পিয়ারকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। মেয়েটি লম্বা এবং সুশ্রী, বয়স ২০ বছর। সে আমাকে বলল যে এর আগে সে কখনো বিমানে চড়েনি। আরও বলল, 'কিন্তু আমি আশা করি যে আমি বেঁচে যাব।'

তার প্রত্যেকটি কথাই আমাকে যেন ছুরিকাঘাত করল এবং আমি রানওয়ের উপর দিয়ে বয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে লাগলাম।

আমাদের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ লিডার তন ক্যাম্পবেলকে তেমন প্রশ্ন করেনি।

'সুপ্রভাত ক্যাম্পবেল, আবহাওয়া সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস পেয়েছেন কি?'

'খুব খারাপ নয় মহাশয়। টোকিও থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে উঁচু কিউমুলাস অনেক পরিমাণে থাকার সম্ভাবনা। হয়ত একটা প্রাচীরের মত। বিমানের উড়ান প্রায় ছয় ঘন্টার মত হওয়া উচিত।'

এইসব কথা হবার পর আমরা বিমানে উঠলাম এবং একটু পরেই সিস্টার অফ এলেমেলোভাবে ছড়ানো সাংহাই শহরের উপর দিয়ে উড়ে চলল টোকিওর উদ্দেশ্যে অথবা — দূর হোক চিন্তা! ডিউটি বলেছিলেন এই ঘটনাটি ঘটবে সন্ধ্যাবেলায় একটা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে। অর্থাৎ ভোজনের একটু পরেই আমাদের টোকিওতে পৌঁছে যাওয়া উচিত। আমি ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারিনি কারণ অসমান মেঘের গুঁতো-খাবার ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন চলতে চাইছিল। আমরা নিশ্চয়ই উপরে উঠেছি। বিমানের স্টারবোর্ড পাখা কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল কয়েক। কয়েকের ধূসর কণাগুলি বিমানের সামনের দিকে লেগে পিছন দিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল।

ভেরিটা এবং সেমুর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনে হল কনসাল জেনারেল ওগডেনের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন যে তার মাথায় প্রচণ্ড রকমের ঠাণ্ডা লেগেছে। একটু পরেই বাইরের আলো আরো উজ্জ্বল হল। আমরা সূর্যের প্রখর আলোর মধ্য দিয়ে যেতে লাগলাম। আমি লক্ষ করলাম যে বিমানের উজ্জ্বল ধাতব ডানায় কয়েকের একটা হালকা আস্তরণ লেগে রয়েছে।

ক্যাম্পবেল পিছনে এলেন এবং মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, 'আমাদের আরও উপরে থাকতে হবে। এইভাবে চললে আবার আমরা খুব কয়েকের মধ্যে পড়ব।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ করেছি। আমরা এখন নিশ্চয়ই বেশ উপরে রয়েছি।'

'সতেরো হাজার।'

'বিমানে কোন অক্সিজেন নেই।'

'না।'

কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পবেল আবার পিছনে এলেন। 'এর ভিতর দিয়ে যেতে আরও একবার আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে মহাশয়। মেঘের মাথা আরও উঁচু এবং আমরা এখন আঠারো হাজারে আছি। আমার মনে হচ্ছে যে বিমান কিছুটা কাঁপুনির মধ্যে পড়বে।'

এরপর আমরা ঘূর্ণির মত কালো কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম ধবকের টুকরোগুলো কেবিনের গায়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ছে। বিমানের প্রপেলারের পাখায় লেগে এইগুলি ছিটকে আসছিল। অন্ধকার হয়ে গেল। আমার ঘড়িতে বাজল ১১-২০ — টোকিওর সময় তখন ১২.২০। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? তুষারের দেখা তো মেলেনি। ডিউটি নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে তুষার থাকবে।

আবার একবার চারদিকের কুয়াশা হঠাৎ একপাশে সরে গেল। সিস্টার অফ যেন শূন্যে একটা ধাক্কা খেয়ে উঁচু মেঘের মাথার উপর পাড় নীলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আমাদের কানের উপর চাপ অনুভব করায় এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস হতে থাকায় মনে হল যে আমরা আবার এত উপরে উঠেছি যেখানে অক্সিজেন খুব কম। কনসাল জেনারেল এবং ভেরিটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আমার আশঙ্কা হল তাদের জীবনের জন্য। এই অবস্থায় তারা বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবেন না।

ক্যাম্পবেল আবার পিছনে এলেন। ক্লান্তিতে এবং দুশ্চিন্তায় তার মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের হাসি এবং আত্মবিশ্বাস তিনি বজায় রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমরা কি ডাকোটার পক্ষে সব থেকে বেশি উচ্চতায় রয়েছি না? আমরা কি এখন কিছুটা নেমে আসতে পারি না উষ্ণতার স্তর পাবার জন্য? আমাদের জ্বালানি নিশ্চয়ই কমে এসেছে। কিন্তু ক্যাম্পবেল, আপনি যেরকম ভাল বুঝবেন, সেইরকমই করবেন। আমি আশা করি যে আমরা ঠিক বেরিয়ে আসব।' নরত, আমি নিজের মনে ভাবলাম, আমরা আছড়ে পড়ব কাঁকরে ঢাকা পাথুরে সমুদ্রতটে।

ক্যাম্পবেল হাসলেন এবং বললেন যে তিনি ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে

যাবেন।

আমরা নিচে নামতে লাগলাম। আবার শুরু হল জোরে নিচে নামা। ধাক্কা খাওয়া, উপরে ওঠা এবং এভাবে চলতে থাকল একনাগাড়ে, তবুও দীর্ঘ চার ঘন্টা। আমরা ঝাঁকুনি খেয়ে নামতে নামতে চলে এলাম উঁচু প্রাসাদের মত কিউমুলো নিম্বাস মেঘের ভেজা ঠাণ্ডা অন্ধকারে। কি অন্ধকার হয়ে গেল! আমি তখন শুনতে পেলাম সিস্টার অ্যানের ধাতব গায়ে ক্র্যাক ক্র্যাক শব্দ। বরফ! আবার প্রপেলারের উপর বরফ। আবার হঠাৎ করে এর বাইরে চলে এলাম — কিন্তু অন্য কিছুতে। নিচে ঐ যে নীল সিল্কের মত জিনিস ফুঁসে উঠছে তা হল সমুদ্রের ঢেউ।

এখন আবার জোরে তুষারপাত হতে লাগল। সময় এখন রাত ৩ টা বেজে তিনটা।

সমুদ্র এবং তুষার। এইরকমই হবে ডিউং বলেছিলেন। আলোকে নিচে দেখতে পেলাম একটি কালো পাহাড়ের উপর তুষারের চিহ্ন। পাহাড়ের পাদদেশে সাদা ঢেউ ভেঙে আছড়ে পড়ছে, যেন রাগে ফুঁসছে।

এই দুর্বিপাক ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা। মনে হল সিস্টার অ্যান আর বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। আমরা সমুদ্রের তটরেখা অনুসরণ করে এগোলাম এবং কিছুক্ষণ পরে একটি উপসাগরের উপর এলাম। সেখানে পাথুরে সৈকতের কাছে তুষারে ঢাকা ছোটখাটো একটি গ্রাম আছে। সৈকতটি ৩০০ গজের কম, কাঁকরে আচ্ছাদিত এবং তার উপর ইতস্তত ছড়ানো পাথরখণ্ড। এর ধারে প্রত্যেক কোণে রয়েছে উঁচু বন্দুক পর্যবেক্ষণ। অবতরণের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়।

আবার আমরা খাড়া পাহাড় এবং সমুদ্রের ঢেউ অনুসরণ করে চলে এলাম মেঘ ও সাগরের মাঝখানে অপরূপ এক সমান্তরাল শূন্যস্থানে যা বাদুতাড়িত তুষারের দ্বারা ভর্তি হয়ে আছে। টোকিওর সময় অনুযায়ী আমার ঘড়িতে এখন চারটে বেজে পাঁচ মিনিট। এইরকম একটি দিনে পাঁচটা বাজার একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে।

এরপর আমরা খাড়া পাহাড়টিকে হারিয়ে ফেললাম, আবার তার দেখা পেলাম। এর যেন আর শেষ নেই। এক খণ্ড সমুদ্রতট পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে জরুরি অবতরণ করা যায়।

হঠাৎ খাড়া পাহাড়টি শেষ হল। আলোর উন্নতি দেখা গেল। এখানে একটি উপসাগর আছে। তটের কাছে তুষারে ঢাকা একটি গ্রাম। সৈকতটি পাথুরে। কাঁকরে আচ্ছাদিত। এক ঘন্টা বা তারও বেশি আগে এই গ্রাম এবং উপসাগরটি আমরা দেখেছিলাম। আমরা নিশ্চয়ই একটি দ্বীপের চারদিকে সারাক্ষণ ঘুরে বেরিয়েছি এবং আবার ফিরে এসেছি।

আমি আমার সিটের বাঁধন খুলে সামনের কম্পার্টমেন্টের দিকে গেলাম। আমাদের নেভিগেশন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অ্যাডারসনকে বললাম, 'আপনার ম্যাপটা একটু দেখি।'

মূল ভূখণ্ড থেকে ৪০ মাইল দূরে হাতের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি দ্বীপ আছে। তার নাম সেদোভো। আমি বললাম, 'এটিই সেই দ্বীপ এবং এই গ্রামটি নিশ্চয়ই টাকাচি।'

অ্যাডারসন তাকালেন এবং সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর তিনি বললেন, 'মূল ভূখণ্ডের অন্যদিকে সবচেয়ে কাছে যে বিমানক্ষেত্র তা হল টোকিও। এখান থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। অন্ধকারের মধ্যে পাহাড় পর্বত এবং মেঘের উপর দিয়ে যেতে হবে। তেমন ভাল নয়।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এবং জ্বালানিও নেই।'

নিচে সমুদ্রের ধারে ঐ কাঁকরে ঢাকা পাথুরে সৈকতটিই হল আমাদের একমাত্র সম্ভাব্য অবতরণস্থল —ঠিক যা ডিউং বলেছিলেন — তুষার ঝড়ের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায়।

আমি ক্যাপ্টেনের কাছে গেলাম। তিনি আমার দিকে হাসিমুখে তাকালেন এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'খারাপ অবস্থা, মহাশয়। আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে আমাদের এই ফুল তটের উপর অবশ্যই অবতরণ করতে হবে। এর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। মেঘ খুব নিচুতে আছে এবং হাওয়াও খুব প্রবল।

'হ্যাঁ।'

'আপনি কিভাবে জানতে চান, চাকাগুলি তুলে নিয়ে অথবা নামিয়ে?'

আমি বললাম, 'আমার মনে হয় আপনি যদি চাকাগুলি তুলে নেন এবং বিমানের পেটের উপর দিয়ে অবতরণ করেন তাহলে আপনি গতিবেগ হ্রাসতর এবং অনেকখানি। কিন্তু যদি ঐগুলি নিচে থাকে এবং বড় পাথরগুলির উপর ধাক্কা না খায় তাহলে আমরা অবশ্যই উল্টে যাব। আর চাকাগুলি নামানো অবস্থায় তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত থেকে গতি যখন কমতে শুরু হবে তখন যদি যথাসম্ভব দ্রুত তুলে নেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়?'

ক্যাপ্টেন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন এবং জোরে দু'হাত দিয়ে কন্ট্রোল কলাম ধরলেন। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল।

বিমান কর্মিদের এবং আমার সঙ্গীদের শরীর বন্ধার জন্য অবতরণ পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার জন্য আমি পিছনে চলে এলাম। ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সকলেরই কেবিনে চলে আসা উচিত যাতে বিমানের নিচের দিকে থাকে। আমরা সেখানে বেশি নিরাপদ থাকব এবং তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারব। সবাইকে নিজেদের ভাল করে বেঁধে নিতে হবে যাতে কেউ ছিটকে না যায় এবং কম্বল জড়িয়ে পরি দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে বিচিত্র এই খেলার জন্য আমি তাদের সাজসজ্জা করে তৈরি হওয়া দেখতে লাগলাম। আমি নিজে কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম যে আমি মরতেই যাচ্ছি।

যখন আমরা তৈরি হলাম তখন মুভিং বিমানকর্মি দুলতে দুলতে পিছনে এল দরজা খোলার জন্য যাতে আমরা ভিতরে আটকে না থাকি। হঠাৎ একটা গর্জনের সঙ্গে তুষারে পরিপূর্ণ বাতাস প্রচণ্ড বেগে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পরবর্তী কয়েক মিনিটে কি ঘটতে যাচ্ছে তার ছবি গত ২৪ ঘন্টা ধরে আমার মনের মধ্যে ছিল। এখন আমি শুনতে পেলাম বাতাসের গর্জনের সঙ্গে চাকাগুলি নামানোর হিম ভুইক শব্দ। এবার সিস্টার অ্যান মাথা নিচের দিকে রেখে খাড়া পাহাড়ের উত্তর দিকে চলে এল জরুরী অবতরণের জন্য। ইঞ্জিনের গর্জন স্তিমিত হল। আমি ঘুরে ওস্তভেদের দিকে তাকালাম। তিনি ক্লান্তিতে এবং ব্যথায় জর্জরিত হয়ে আমার দিকে অকিয়ে হাসলেন। আমি জেরীটার দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটি ছিল বোজা। আমি জেরীর মুখ দেখতে পেলাম না।

নিচের দিকে অকিয়ে দেখতে পেলাম কাঁকরে ঢাকা তটভূমি ক্রত

উপর ছড়িয়ে আছে বড়ো প্রস্তরখণ্ড এবং সেগুলিকে ঘিরেছে চূড়ার মত একটি পাহাড়। আমরা সোজা নিচে নামলাম। ইঞ্জিনের শব্দ স্তব্ধ হল।

এখন আমরা সেই মুহূর্তের জন্য তৈরি।

থেকে থেকে একটা ঘনঘন শব্দ হতে লাগল। চাকাগুলি দ্রুতগতিতে ঝাঁকরে চাকা তটভূমি দৃঢ় শক্তে স্পর্শ করল। শব্দ ক্রমেই বেশি বকম কর্কশ হতে লাগল। গতি কমানো শুরু হল।

আমি প্রার্থনা করলাম চাকাগুলি ভুলে নেওয়া হোক। ক্যাপ্টেনের তাই করলেন। সিস্টের অ্যান ঘুমে ঢলে পড়ে যেতে লাগল।

ঘ্যাং ঘ্যাং কড়মড় শব্দ। ডিগবাজি খাওয়া শুরু হল। পেটে টান ধরল খেয়ে গেল। ঘড়ঘড়ানি থামল।

ওয়ার্ডেন তব সিট এবং সবকিছু নিয়ে ছিটকে এসে আমার মাথার পিছন দিকে আঘাত করল।

গতি স্তব্ধ হল। সিস্টের অ্যান ভয়ের মত নিশ্চল হল।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। এরপর তটভূমির উপর সমুদ্রের ঢেউগুলি হিস্ হিস্ শব্দ করে আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তার সঙ্গে বাতাসের বাঁশির মত শব্দ।

বাঁধন খুলতে খুলতে আমরা হাসতে লাগলাম। ক্যাপ্টেনকে যখন পিছনের দিকে আসছিলেন তখন আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমরা গ্যাংওয়েতে মিলিত হলাম এবং পরস্পরের করমর্দন করলাম।

সেই রাত্রে আমরা টাকাটুকি ছোট্ট সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম। আমি যখন বেতের উপর কম্বলের বিছানায় শুয়ে পড়লাম তখন ভাবলাম যে কম্যাণ্ডার ডিউং সত্যই আমাকে মৃত দেখেছিলেন কিনা। আমি ঠিক করলাম যে ডিউং স্বচ্ছে কি দেখেছিলেন তা জানার আগেই আমি তাকে চিঠি লিখব।

কয়েক মাস পরে আমি একটি উত্তর পেলাম :

আমি আপনার বিমান দুর্ঘটনার কথা জেনে খুব আতঙ্কিত। আমাদের সাক্ষাতের কথা আমার মনে আছে। কিন্তু সেই স্বপ্নের বিষয় আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে না, আমি বলতে পারি না যে আমি আপনাকে সত্যই মৃত অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্তু আমি প্রথমই ভেবেছিলাম যে দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। আমি অনুমিত যে সেরকম হয়নি।

পরেরবার আমার বিমান দুর্ঘটনার সময় আমি আগে থাকতে কোন খবর জানতে চাই না। এতে বিমানে ভ্রমণের আনন্দ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

□

"কেবল শুধু পুথিগত বিদ্যা ও ধারণাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বলে না। শিক্ষা বলিতে প্রাণ তথা জীবন্ত জগৎসম্বন্ধীয় বুঝায় যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে।" — ভগ্নী নিবেদিতা

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বাছানড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং - ১৫ এইচ জি তাং ১৭-৭-৫৩

গ্রাম ও পোঃ - বাছানড়ি ; ব্লক আরামবাগ

জেলা ঃ হুগলি

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, চাষের সার, বন্ধকি দ্রব্য এবং আমানত ব্যবসার স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

অমরেন্দ্রনাথ দে	পঞ্চানন কোলে	অমলমোহন মণ্ডল
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

With Best Compliments from

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Ltd.

ESTD. 1923
11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone No. : 248-9413, 248-2621, 210-4122, Telegram : SELF HELP /69

1. A premier Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
2. Provides banking facilities to members and also to Public.
3. All deposits Covered under Deposit Insurance Act.
4. Nomination under Section 45 ZA of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
5. Minor Accounts allowed as Banking Rules.
6. Premature encashment as per Banking Rules.
7. We give Loan against NSC / KVP / UNIT '64 / Fixed Deposits / Recurring Deposit etc. on easy terms & conditions.
8. Term Deposits And Re-investment Plan.
9. Rates of Interest on various Deposits as per RBI guidelines (as applicable to Co-operative Societies Banks.)
10. We allow more interest than commercial banks as per RBI guidelines as applicable to the Co-operative Banks.
11. Join with our PLATINUM JUBILEE SPECIAL SCHEME.
12. Double your money in 66 months. Annualised yield 17.39%.
13. Triple your money in 108 months. Annualised yield 22.22%

Ajoy Sankar Mitra
Managing Director

Asim Kumar Basu
Chairman

বাঙালি কি খেতে ভালবাসে ..... মাছ

বাঙালি কোথায় যেতে পছন্দ করে পাহাড়ে অথবা সাগরে

তাই

বাঙালির আপনজন বেনফিস নিবেদন করছে

ভ্রমণ বিভাগ

বেনফিসের ট্যুরিস্ট লজগুলি পাবেন
নিচের জায়গাগুলিতে
শঙ্করপুর (কিনারা)
ফ্রেজারগঞ্জ (মৎস্যকন্যা)
দার্জিলিং
ডায়মণ্ডহারবার

খাদ্য তালিকা

বেনফিসের স্টল এবং মোবাইল ভ্যানগুলিতে পাবেন
ফিস ফ্রাই ★ ফিস বাটার ফ্রাই ★ ফিস রোল ★ ফিস সিঙ্গাড়া
★ প্রণ পকোড়া ★ ফিস ফিঙ্গার ★ ফিস টিকিয়া ★ চিলি ফিস
★ ফিস তন্দুরি★ চিলি কাঁকড়া ★ ফিস কবিরাজি ★ তপসে ফ্রাই
★ ফিস বিরিয়ানি ★ ভাপা বা সর্ষে ইলিশ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন
ফোন : ৩৩৪-৪১৩১
পি-১৬১/১, ডি আই পি রোড (চতুর্থ তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪

বেনফিস
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিসারিজ
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

পাহাড় কিংবা সমুদ্রে অথবা লাল মাটির বীরভূমে

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসুন আমাদের

হলিডে হোমে

দার্জিলিং (৩টি ঘর) ✤ দিঘা (২টি ঘর)
পুরী (৩টি ঘর) ✤ শান্তিনিকেতন (২টি ঘর)
এছাড়া শীঘ্রই হলিডে হোম চালু হবে
কলকাতা ✤ গ্যাংটক

যোগাযোগ ঃ ২২৮-০৮৩৭

এন টি সি (ডব্লিউ এ বি অ্যান্ড ও) এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩

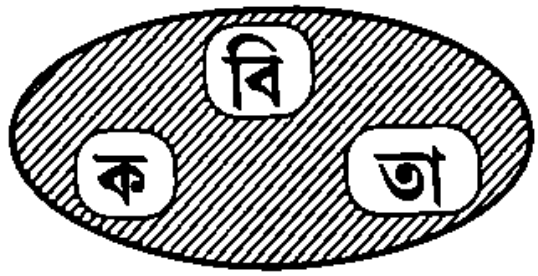

এই আঁধারে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আকাশগঙ্গা ঢেউ তুলে কার
ডুবোয় বসতবাড়ি,
আজ রাতে সে-ই আঁধার থেকে
আঁধারে দেয় পাড়ি।
এই আঁধারের কী তাৎপর্য
কেউ কি বলে দেবে,
আকাশ জুড়ে যখন হাজার
জোনাক জ্বলে-নেবে।
কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে
একলা জানালায়
দাঁড়িয়ে দেখি অন্ধকারে
প্রহর বয়ে যায়।
ওইগুলি কি জোনাক, নাকি
আকাশ-ভরা তারা,
প্রশ্ন করে লাভ কিছু নেই,
ঘুমিয়ে আছে পাড়া।

❑

পর্যটন

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

আমি তো মৃত্যুতে নয়
তোমাকেই ভালোবেসে
মৃত্যুকে এড়িয়ে চলে গেছি
বারেবারে নদী সমুদ্রের দিকে
যেখানে জীবন
জলে ভাসে
ডাউয়ের বাতাসে
নৌকো ছুটে
ঢেউয়ের নাথায় চড়ে
সিঁড়ি ভেঙে সাতরঙা ভোরের আকাশে
আলো নেমে আসে

আমি অন্ধকার নয়
তোমাকেই ভালোবেসে
আলোয় পাহাড়ে যাই
যেখানে অফুরন্ত দিন
তারো নীলতর তোমার প্রতিচ্ছবি
কোথাও রাখেনি

মৃত্যু নয় অন্ধকার নয়
আমি তোমাকেই ভালোবেসে
টানেল পেরিয়ে যাই
পৌঁছে যাই
ঝরনা শব্দের কাছে এবং তখন
নিঃশব্দের মৃদু সুর বাজতে থাকে
তোমার ভিতরে

❑

এ গান তার বড়ো প্রয়োজন

কৃষ্ণ ধর

হৃদয়ের তলানিতে এখনো কিছু গান জেগে আছে
সব দুঃখ আর কান্না ছাপিয়ে তার রেশটুকু টের পাওয়া যায়
নিসর্গের সঙ্গে মিশে থাকা মেঘ, ছায়া নদী তা জানে
গানের চাপা দেওয়া পঙক্তিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ও বাইরে।

সব কিছু এখনো হারায়নি জেনে তাই জেগে থাকা
ঘুম ভাঙিয়ে কে ডাকে ডাক দিয়ে যাবে ভোরবেলা
তখন ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
আরেকটি দিনের মুখোমুখি হওয়া।

হয়তো সবটাই নিজের মনকে ভোলাবার কায়দা
শেষটা কি হবে তা কে বলে দিয়ে যাবে?
ভবিষ্যতের গণক আশেপাশে কেউ নেই
তাসত্ত্বেও এটা জেনেই দিনযাপন থাওয়াচ্ছে বসে থাকা।

ভেতরে ভেতরে গান চলেছে যেন মুক্তধারা প্রবিবল
নিজস্ব কোনো সুখদুঃখের কথা নয়
যেন গোটা জাতিসংঘের বিষাদ ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা
সমস্ত অস্তিত্ব বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ছে ভূমণ্ডলময়
গানের সঙ্গে তা মিশে একাকার মেঘে, জলে, শস্যভূমিতে

বিশ্ববেদনা কবির গানের পঙক্তিগুলো হাত ধরাধরি করে
পৃথিবীটাকে আদরে জড়াতে চাইছে
ব্যথা ভুলতে এ গান তার বড়ো প্রয়োজন।

❑

উদ্দেশ্যহীনতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এ প্রশ্নর তপস্যার সীমা পার হবে
আরক্ত কঠিন মেঘে সন্তরণ শেষে
এ কোন উদয়সূর্য কখন জ্বালাবে এই ভোর!
এই প্রতীক্ষায় আমরা লক্ষ বছর কাল পরে
কোনো এক জাহ্নাস পাহাড়ে এসে সমাধিমন্দির
দেখে নিই নিরনডার্থাল মানুষের ;
এবং দেখেই খুব অভিভূত হয়ে ভাবি
কোনো এক রমণীর কথা।
সে হয়তো অপেক্ষায় ছিল তার পুরুষের জন্য বহুকাল
সে হয়তো বুনোফুল খোঁপায় পরেছে
তার ভালোবাসা জানাবার ভাষা
আর কিছু নেই বলে ; কিংবা হয়তো ছিল ভাষা
আমরা এখন তার চিহ্ন কিছু বাকি নেই ব'লে
বৃথাই আক্ষেপ করি।

এসব অনাদি ভালোবাসা প্রেম, এই সব কথা
এইসব প্রত্নআত্মিকতা আর প্রকৃতির গূঢ় নিশ্চলতা
অথবা এ মহাবিশ্বচলতা, পরিবর্তমান ·—
তরঙ্গবহ, প্রসারণক্ষম
সময়ের নিরেট বন্ধন ছোক আরো দৃঢ় কঠিন বন্ধনে
আমরা নিক্ষিপ্ত হই!

কবে শুরু শেষহীন আরক্ত এ তপস্যার কাল?
ভুলে গেছি পথরেখা, ভুলে গেছি বিকাশী মেঘ
আমাদের সন্তানের কথা।

অথবা, আমরা কি নিজেরাই সত্যিকার উদ্দেশ্যহীনতা?

❑

একা

নজরুল ইসলাম

ব্যস্ততায় সারা দিন কেটে যায়,
কিছুটা রাতও।
তারপর রাত গভীর হয়!
গাছ থেকে শুকনো পাতার মত
ব্যস্ততা ঝরে পড়ে।
এক সময়
সব কাজও শেষ হয়।

স্বপ্নের সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াই।
দেখি,
বিবর্ণ হৃদয় নিয়ে
নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি
আমি একাই!
কার যেন থাকার কথা ছিল'
সে নাই।

সত্যিই কি কথা ছিল?
কথা হয়েছিল কোন দিন?
কোন মধুর লগনে
সে কথা দিয়েছিল,
অথবা তার অবুঝ মন?
বোধ হয়, না'

স্বপ্ন হয়ে এসেছিল।
স্বপ্ন ছুঁয়েই চলে গেছে।
ব্যস্ততার চাপে
কথা বলার হয়নি সময়।

❑

অভিমান

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

আমাকে আগ ও ঝরঝরান দিতে পারো,
কিন্তু তুমি কোথায় দাঁড়াবে!
আকাশ আরো দূরে সরে গেলে চাঁদ তার কাছাকাছি
যাবে, এই ন্যুব্জ গাছ মাটি ছেড়ে উঠে যাবে অনেক ওপরে।
তুমি জল হবে? কিংবা নদী! ঢেউয়ের অঞ্জলি মেখে
সমুদ্রের উপদেবতাকে।
দুরন্ত হাওয়ারা উষ্ণ, লক্ষ্য ফেরারা ছুঁয়ে যেতে চায়।
অভিমানী বালকের মতো দাঁড়িয়েছে এই সৈকত, নিদারুণ একা,
তাকে কে ভালোবাসবে, কাউকে পরম আপ্ত করে তাকে।

ঝড় উঠলে উচ্ছল তারা মুছে যাবে।
দুয়িংরুমের মেঝেতে ড্রাগন আঁকা সোনালি কার্পেট,
দেয়ালে মাতিসের ছবি, জলমি ডুবছে আকাশের ছলে,
সূর্য উঠছে চিকে বালির দর্পণে।
তোমার অসুখ সেরে গেছে জেনে আমি খুশি।
গ্রেইল অক্ষরের মতো তোমাকে ছুঁয়ে বুকে নেবো
রাস্তা খুলিকেই যায়, দক্ষিণে এবং বিদর্ভীতে।
যাবজ্জীবন হাঁটা সমান্তরাল, বৃশ্চে ও আড়ালে —
অভিমানী বালক খুঁজে থাকে, আজন্ম কাঙাল।

❑

দেউল

বীরেন সাহু

চোরকুঠুরিতে রেখেছি তোমাকে
আখির উঠোন ছাড়িয়ে,
ধূপদীপে হৃদয় তরল
জ্বেলেছি তুলির টানে —
মাটি খুব কাছাকাছি আছে,
তবু তুমি সুখী নও?
লীলাশহ ব্যবহারে ভরা
হাওয়ায় ভাসে ভিনদেশি ঘ্রাণ,
এমন গভীর সময়ে জানি জানি
বড় দূর সুখের ঠিকানা
খুব শক্ত নির্জন দাঁপ মনা
অনেক দেখার হাতছানি ডিঙ করে মেকে
আছই কথা —
সংবাদ পরতে পরতে মাখা,
চোরকুঠুরিতে তুমি একা নও
বন্দী আমিও
দৃশ্য ও বাণীর দেউলে
খুঁজি যন্ত্রণার বিনম্রকরণী —
আনন্দের পরিভাষা।

❑

এক নড়বড়ে টেবিল

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

এই নড়বড়ে টেবিল
যুগে একটা পা খেয়ে নেয়
কামটের কামড়ে যেমন
একটা পা-কাটা লোক জল থেকে উঠে আসে
আমরা কি সে-রকম নই
টুকরো-টাকরা জোড়াতালি-দেওয়া
ওপাশের পোষা কাকটা সব জানে
কালো মাথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্যাখে
এ-বাড়ির ত্রিসীমানা কিছুতে ছাড়ে না

টিভি গল্প কাড়ছে, লোকে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে
খবরের বিভ্রান্ত বটিকা শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ে
এইসব নিয়ে আমরা একরকম আছি
ছুরজারি হয়, সেরে উঠি
দোকানদারই এখুন বাংলায়
ছট সব বদলে গেলেও সব ও একই আছে
যে বদলাবার ব্রত নিয়ে আসে
তাকেই বদলাই আমরা
আমরা ভারত নামক বিশ্বয়-নীলতায়
সকলকে আপন করে নিই
অহো! এম এন সি কি ভাবাসঙ্গমে হাত দেবে
কিন্তু নড়বড়ে টেবিল
সর্বদাই কাঁপছে এবং কাঁপছে

❑

সেই দিন

কিরণশঙ্কর মৈত্র

সেই পুরনো আকিম এখনও বিলিয়ে রাখে
আগুন পুড়িয়ে খেয় ঘর-সংসার আপনজন,
ছোটবড় নানা পাথরের তলে পিষ্ট হয়
নিজের নিজের সীমায়।

তদুপরি ভাষা আছে বিভিন্ন বুলির,
এমন বিষের পুঞ্জ সতত ছড়িয়ে দেয়, ভেঙে
ফেলে, কিছুতেই নয় কাছাকাছি
আপন গণ্ডিতে দাম্ভিক স্বার্থপর সিদ্ধির মৌতাত।

তুমি উদাসীন বুলিতে পথে-ঘাটে-ওরণ্যে
নিশীথে বৃথাই ডাক দিয়ে যাও,
হামাগুড়ি খেতে থাকো খানা-খন্দ গলিতে-গলিতে,
অনর্থক মুরাগত পথিকের চোখে পাহাড়ি সূর্য
সমুদ্র-বাতাস খেলা করে

হায়, স্বপ্নের ক্লান্তি নতুন দিনের

❑

ভ্রমণকাহিনী

গৌতম হাজরা

পাঠের গুরুত্ব আজ অপরিসীম।

পঠন-পাঠনের শেষে এসো যাই ভ্রমণের দেশে
দেখে আসি সম্পূর্ণরূপ মানুষের, ভ্রমের ভিতর
কতোটা কুসুম কিংবা যৌন অভিজ্ঞান।

দিন আজ চলে যায় দিনের ভিতরে
রাত আজ চলে যায় রাতের ভিতরে
তাই খোলামেলা আলোচনা নিয়ে
চলো যাই চায়ের টেবিলে
দেখি, দিগন্তকাননে কেমন করে ফোটে
ঘুমঘামিনী
ফেরে আসে অতল গভীরা।

❑

কে কোথায় নিদ্রামগ্ন

অপরাজিতা গোয়ালী

চারিদিকে ঘন কুয়াশার আস্তরণ —
অবরুদ্ধ কান্না —
অবচেতনের লৌহ আবেষ্টনী ভেঙে
মুক্তি প্রতীক্ষায় অধীর —

যৌবন ঘিরে কারাগারের লৌহ আবেষ্টনী
পথ অবরুদ্ধ —
দৃষ্টি বিভ্রান্ত
প্রতি পদক্ষেপে —

ঘন কুয়াশার উত্তীর্ণ আলোর সন্ধানে
প্রত্যাশিত আলোর সন্ধানী
ভবে ভবে হাঁক দিয়ে ফেরে
শৃঙ্খলিত বন্দীর পদধ্বনি
কারাপ্রাচীরের আবেষ্টনী ভেদ করে
ছড়িয়ে পরে
দূরান্তর আকাশে

অসহায়, বিভ্রান্ত মানুষের
গোপন অন্তরে
শৃঙ্খলিত বন্দির আর্তনাদ
যেন বলে ওঠে
'আর নয় আর নয়'
এবার আমার পালা —

তবে এসো একসঙ্গে
লৌহ কপাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই —
আকাশে বাতাসে অনুচ্চারিত দ্বিধায়
সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে
বলে — ওগো অন্ধ বধির অদৃষ্টবাদীর দল
অন্ধ ওহায়, কে কোথায়
এখনো রয়েছো নিদ্রামগ্ন
ওঠো - জাগো - চেয়ে দ্যাখ

দূরে তমিস্রা রাতের বুক চিরে
প্রত্যুষের সূর্যালোকে
শিশিরসিক্ত দূর্বাঘাস
আলোয় উদ্ভাসিত।

এই বেলা হাতে হাতে তুলে নাও মশাল —
প্রজ্বলিত মশাল
দুর্গম কণ্টকিত গিরিপথ
অতিক্রম করে
প্রসারিত কর —
ছড়িয়ে দাও আলোর বন্যা
সমুদ্র উত্তাল
ঘন অন্ধকারের বুকে। ❑

রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

তুমি কেমন যেন নিজস্ব নিয়মে
আকাশ দ্যাখো

আকাশের ওদ্ধত্য বুকে নেবে নিয়ে
কেমন যেন আকাশ হয়ে যাও

তোমার ওড়নীল চাহনিতে
আকাশ ডানা মেলে উড়ে যায়
অন্য আকাশে
মেঘ থেকে মেঘে
যেখানে রহস্যময় স্বপ্নলীন অতঃপর
সমুদ্র হয়ে ঢেউ তোলে বুকে

তুমি নিজস্ব নিয়মে আকাশে
হে নারী, আকাশ সমুদ্র দলিলাস্ত
কেমন যেন একাকার হয়ে যাব

নিজস্ব নিয়মে তবু তুমি
আকাশে চোখ রাখলে
নীলের অরূপ ধূলি
রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়
লীলায়িত ছুঁয়ে যাক সীমাহীন
স্বপ্নের আকাশ।

❑

অনেক কথা বাকি

ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও কি আছে কোন কথা বাকি
জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে
যা আজও বলা হয়নি?
না, বোধহয় আর কোন কথা বাকি নেই,
তবু জীবন আজও বহমান
চিরসবুজ অশ্বত্থের মত
অথবা কখনও কোন বার্ধক্য-ন্যুব্জ দেহে
হাঁটতে থাকা একলা বৃদ্ধের মত
কিংবা যৌবনমত্ত বিদ্যুৎগতির রোলার্ডিনোয়ে
মাঠ মাপিয়ে, বেড়াতে বেড়াতে বেড়াতে
শেষ মুহূর্তে সাইকোম্যাটিক এপিলেপ্সিতে আক্রান্ত হয়ে
সারা বিশ্বের হৃৎপিণ্ড থামিয়ে
পরাভূত লোকমন্থ ব্রাজিলকে
অতলান্তিকের নির্জন বালুকাবেলায়
বিসর্জন দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপথিক হয়ে উঠা
জিনেদাইন জিদান!

ছন্দের নাটাইতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
কিংবা সেই মহা তেজস্বিনী বোয়ান অব আর্ক!
আহা উপমাটা সেদিন কি
যৌবনদুষ্ট না ছিল!

কিন্তু এখনে এখন ভাবতে
তুমি কি কেবল আস্তাকুঁড় খুঁজে যাবে
রোমওয়া সারমেয়র মত জীবনকে রক্ষণ যোগাতে
এটাও চলক হে
না হলে মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে আজ

কিভাবে পরস্পর কথা বলছি বলছি বলছি
অথচ এমনতো হবার কথা নয় —
স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্বার্ধশতকের
মধ্যোৎসব সারতে সারতে সারতে
চুপিসারে কখন পৃথিবীর মানচিত্রে
'আমার ভারত অমর ভারত'
কেমন বিশ্বজোড়া ঘৃণা আর অবিশ্বাস নিয়ে
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে —
(ওঃ, ঠিক যেন হিরোশিমার আকাশে
ভেসে থাকা ৬ অগাস্টের মেঘ।)
তুমি বলবে — হাঁ নিশ্চয় বলবে — দেশের নিরাপত্তা,
চারিদিকে শত্রুর বেড়া
তাই কিছু কাজ করা গেছে গোপনে।
ঠিক! তুমিই ঠিক।
তবুতো বিশ্ব জানল — ভারতে জীবন আছে — জীবন,
টাটকা, তাজা — টগবগে
গিনিপিগের মত পরীক্ষাগারে যারা প্রাণ দিতে
সদা উৎসুক।

হায় জীবন! তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো
কিংবা একথাও আমরা ভাবতে পারি
আমরা জীবনকে নিয়ে যাচ্ছি কোথায় — কোন নিরুদ্দেশে?
আসলে আমার ধারণাটাই ভুল :
জীবন সম্বন্ধে এখনও অনেক — অনেক কথা বাকি
অকথিত সে-কাহিনী শোনার জন্যে
তুমি পাশে থাকবে তো — জেগে থাকবে!

বৃষ্টির জানলা

অজিত বাইরী

বৃষ্টির জানলা দিয়ে দেখছি
দূরের দৃশ্যাবলী :
গাছে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
গাছগুলি, ঘাসের কাছে নেমে এসেছে
ঘুনো গেরিলা মেঘ।
বিদ্যুতের ফলা র‍্যাডিয়েটরদের সড়কির মত
লক্‌লক্ করছে। দেখছি, লাল টালির
ফুলঝাড়ি, ওজ্ব নৌকো
ঘাটে, প্রতিবাদ নক্সেল নোলকের মত
আকাশ থেকে ঠিক্‌রোচ্ছে বেলাশেষের চিল্‌তে রোদ।
মন ভাসে নিরুদ্দেশে, আছো কি তুমি ঠের দূর দেশে?
সেখানে পৌঁছুনো অসম্ভব। আজ
এই মেঘবাদলার দিনে সব দূরত্ব
ঘুচে যায় নিমেষে।
আমি দেখছি, ঘাটের কিনার থেকে
তুমি একটি ঘাসফুল হয়ে হাসছো।

❑

ফিরে দেখা

উর্মি দে

ফেলে আসা সময়কে কাটা ছেঁড়া করা
কোনো এক হলুদ বসন্তের দিন —
হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা
এক মুঠো শিউলি-সুগন্ধ ঝরানো রাত.

স্মৃতির বাঁশে বাজে বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্।
সেই মুহূর্তের সেই বিশেষ একজন
একান্ত আপন :

অথবা কোনো মত মুহূর্তের
জমে থাকা মেঘ,
এখানে ওখানে বজ্রপাত, ছোটখাটো
কত শত সংঘাত —

ছড়ানো ছেটানো দৃশ্যাবলী মিলিয়ে
জীবনের ধারাপাতে এ এক অদ্ভুত কোলাজ্!

❑

সান্নিধ্য

বাসুদেব চ্যাটার্জি

দুতলার বারান্দা থেকে নির্নিমেষ চোখে
চেয়ে দেখি নীলাভ আকাশ,
যেখানে মিশেছে দূরন্তপ্রবাহে সমুদ্রের সনে,
বালুকাবেলার ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে
বিরামহীন ক্লান্তিহীনভাবে।

সামনের বিস্তীর্ণ পাঁচিল ঘেরা বাড়ির
সাজানো বাগানের এক কোণে —
রাঙার গাছের ছায়ায়
দুটি পাথরের উচ্চশিখরে ব'সে
এক প্রৌঢ় মহিলা —
সংযোগ রক্ষা করেন বাইরের সাথে।
জল, বায়ু, খাদ্যের মতো যা
জীবন-ধারণের এক অপরিহার্য শর্ত।

পুত্রের বন্ধু ভ্রমণে বারান্দায় দাঁড়াতে
পর্দার ছবির মতো একইভাবে বাঁধা
পাথর দুটি ছেড়ে পড়লো।
কিন্তু মহিলা —
সঙ্কল্পহীন।

বিকেলে বিস্মিত চোখ ফেরে গেল —
শূন্যতা ঘুচে গিয়ে বসে এক সুশ্রী যুবতী।

সমুদ্রের অবিশ্রান্ত ওঠা সকেনে —
হারিয়ে যায় পুরাতন পদচিহ্ন যত,
খুঁজে ফেরে হৃদয় সতত
একটু উষ্ণতার স্পর্শ।

❑

জন্মদিন

কাজী মরশিদুল আরেফিন

একটি সরলরেখার মতো সময় পেরিয়ে যাচ্ছে
ঘন্টার পর ঘন্টা বাজছে বুকের মধ্যে,
রক্তের চঞ্চলতা না কি উচ্চ রক্তচাপ
তাও বুঝি না আমি,
ক্যাকটাসের কাঁটা ভেদ করে তবু ফোটে ফুল
আজ রাতে ফুলের জন্মদিন পালন হবে
আমাদের ঘরে আলো জ্বলে থাকবে সারা রাত।

একটি সরলরেখার মতো ছুটে যাচ্ছে নদী
দুই প্রান্তে দুটি বিন্দুর সঙ্গে দেখা হবে না কোনদিন,
তবু বেঁচে থাকি, বুকের টিপ টিপ শব্দ শুনি একা,
আজ শুধু নীলিমায় জেগে থাকবে চাঁদ
সপ্তর্ষি নক্ষত্রমালা।
আমি আজ তোমাকেই ডাকি,
সেই নীল শাড়ি পরে তোমার পদধ্বনি হবে
কেউ জানবে না কখন ফুটেছে ফুল
কেউ দেখবে না কেমন করে তুমি এলে।

এইখানে শ্মশানগামী এক রাশ অভিমান
পুড়তে পুড়তে আলোর মতো নীল হয়ে যাবে,
হেডলাইন কলম সুর বাজবে না মধ্যরাতে
শুধুমাত্র একটি সরলরেখা হেঁটে যাবে বহু দূর,
এমন করেই আজ উৎসবে মেতে উঠবো আবার
হৃদয়ের গভীর ক্ষত ভেদ ক'রে
ক্যাকটাসের একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে বুকে।

❑

উপেক্ষা

প্রবীরকুমার সামন্ত

কথাগুলো কেন হেঁয়ালিতে ভরা,
জ্যোৎস্নার আলো কেন ঘরা ঘরা
আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত
জানা-শোনা প্রান্তর —
চালাকির খেয়া পাড়ি দিতে কেন
ঘুরে ঘুরে থাকা পর!

হৃদয়ের কাছে লুকোচুরি খেলা
দিন চলে যায় —ফুরোয় তো বেলা
উৎসব কাছে, তবু লোকারণ্য
জীবনের নেই সুর —
ওপারে দাঁড়ালে পশ্চাৎ ফিরে
চলে গেছে বহুদূর।

এখানে জীবন ব্যথার প্রদীপ
জ্বলে মিটিমিটি ভরসার দীপ
অসহ্যের যাঁতা তবু তো জীবনে
একলার শুধু চলা —
থাক্ উপেক্ষা, যত অনাদর
পড়ে থাক্ হেলাফেলা।

❑

আজো আমার পায়ে বেড়ি হাতে শেকল

অমিতাভ দাস

মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি শুনে যে শিশু ঘুমোতো খেলা
ভোরের আজান জেনে যে বালক খুলেছিল
নিশ্চিন্ত চোখ
সে আজ অসেতু-শোকে স্তব্ধ মূক নিঃস্ব একেলা
চারিদিকে ৬-৭ জন পাহাড়প্রতিম কালো ঢেউ
ঠিকানা হারানো পথ-ভেসে যাওয়া বাড়িঘর
দেখালো না কেউ
সমীপে দাঁড়িয়ে হাসে সারিবদ্ধ কেউ

না আমাকে বড়ো করে জন্ম নিয়ে চলন্ত ট্রেনের মতোন
৬-৭ ভরে কেঁদে কেঁদে চলে গিয়েছিলো
আমার হাতে শেকল আমার পায়ে কঠিন বেড়ি
আমার কানে কানে চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে
শেকল খোলার মন্ত্র দিয়েছিলো
স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের অসম্ভব সিঁড়িগুলি
ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহিমাগুলি
সততা ও নিষ্ঠার মন্ত্রপাঠ শিখিয়েছিলো

আমি এই উজ্জ্বল সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে
পায়ে বেড়ি হাতে শেকল
অন্ধকারা অনর্গল বুকের ভেতর পরাধীনতার গ্লানি-প্রবাহী
জন্ম-অন্ধ উত্তরসূরির সিঁড়িগুলি আজো খুঁজি
৫০ বছর

অন্য এক সূর্যের শপথে

সৌম্যেন্দু রুদ্র

এখন কবিতা লিখি না আমি
কেন যে লিখি না বুঝি না তো
মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু লিখি,
কিছুই আসে না মনে —

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় কত কিছু।
স্বপ্নেরা ঘোরে ফেরে
প্রজাপতি মেঘ হয়ে উড়ে যায়
দূরের মাঠের শেষে —
সোনাডাঙা মাঠ পার হয়ে —
গোধূলির রঙীন আলোয়।

নদী, মাঠ, ঘাট বনের সবুজ নিয়ে
প্রান্তরের বটগাছে দোলা বেঁধে একদিন
একটি কিশোর দোল খেয়েছিল,
পাখিদের বাসায় ঘুরে ঘুরে —
শালিকের ছানা নিয়ে করেছিল খেলা —
সন্ধ্যা হলে বাতাবি লেবুর গন্ধে ভরা —
সুগন্ধ বাতাসে
ঘ্রাণ নিয়ে কাজলা দিদির
স্নেহে সব মনটুকু দিয়ে
আকাশের চাঁদ দেখেছিল।

আজ স্বপ্ন বলে — মন বলে যেন কিছু নাই —
দিন রাত — রাতদিন পাড়ার মাইকে বাজে শুধু হিন্দি
অশ্রাব্য গানে আনন্দ সদাই —
মনে মনে আজ তাই পলাশডাঙী হয়ে আছি —
সংবাদপত্রের পাতা খিঁচে খুনের খবর পড়ে —
অমানুষ মানুষের কথা শুনে পাথরের মত
হয়ে গেছি।

তাই আজ কবিতা লিখি না আমি,
মন বলে, ভালোবাসা বলে যেন
আজ কিছু নাই।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় লিখে যাই
ঈশ্বরের দীপ্ত নাম নিয়ে —
লিখে দিয়ে যাই —
মানুষ মরে না কোনদিন —আকাশের
বুক থেকে শত শত ঝঞ্ঝারা এলেও
আশের ধারার মত মানুষেরা বেঁচে থাকে
'অন্য এক সূর্যের শপথে'। ❑

পঞ্চায়েত ঃ গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তফসিলি সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে।

স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম-সংসদ। সভ্য বুনিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩০২১

CALCUTTA RESERVE BANK EMPLOYEES' CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD

13, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001

CATERING TO THE NEEDS OF THE RESEPVE BANK EMPLOYEES' FOR SEVEN DECADES

NOW OFFERS

Loans	Max Amt	Rate of Intt.
★ Long Term Long	Rs. 54,000/-	6% p.a
★ Short Term Loan	Rs 3,000/-	6% p.a.
★ Festival Loan	Rs. 3,000/-	9% p.a.
★ Consumer Loan	Rs. 21,000/-	10% p.a.
★ Emergency Loan (instant payment)	Rs. 20,000/-	10% p.a
★ Long Term Loan (for housing and related works)	Rs. 50,000/-	10% p.a.

Accepts

★ Fixed Deposits (Minimum Deposit Rs 10,000/-)

★ Interest on F.D. : From 1 year to 2 years — 10% p.a.
Above 2 years upto 3 years — 10.75% p.a.
Above 3 years — 11.75% p.a.
Interest payable half-yearly

★ Recurring Deposit Accounts with Rs. 100/- or more in multiple of Rs. 100/- for 1 year @ 8.5%

★ Savings Deposit Accounts with facilities for collection of Drafts, Cheques, Interest/Devidend Warrants etc

And Ruls

★ Holiday Homes for its members and their families at

DARJEELING DIGHA PURI RAJGIR SIMULTALA HALUDPUKUR GANGTOK

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত - ১৯২৩

৬৬, জি টি রোড (পশ্চিম), কোন্নগর, হুগলি - ৭১২ ২০৫

দূরভাষ : ৬৭৪-০৬৬৯

শাখাকেন্দ্র : ৩৫৬ এবং ৩৫৬, এ/১, ক্রাইপার রোড, কোন্নগর - ৭১২ ২০৫

দূরভাষ : ৬৭৪-৫৪৯৬

সমবায়ের আদর্শে

আসুন আমরা

হাতে হাত মিলিয়ে

এগিয়ে যাই

(পুরীতে হলিডে হোমের সুযোগ গ্রহণ করুন)

গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জি
সভাপতি

অনিলকুমার ব্যানার্জি
সম্পাদক

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

The Electro Urban Co-operative Credit Society Limited

CESC HOUSE

CALCUTTA - 700 001. PHONE 225 6040/49

Serving More Than 13,000 Employees of The CESC Limited For More Than 87 Years

Honesty, Sincerity & Integrity Is Our Motto

Enjoy Your Holidays
at
Our Holiday Home
at

PURI

(Opposite Bharat Sevasram Sangha)

For Booking Contact

SECRETARY

POSTS & TELEGRAPHS ACCOUNT CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD

Yogayog Bhawan (12th Floor)
P-36, Chitta Ranjan Avenue
Calcutta - 700 012
Phone : 26-6351 - Ex-41

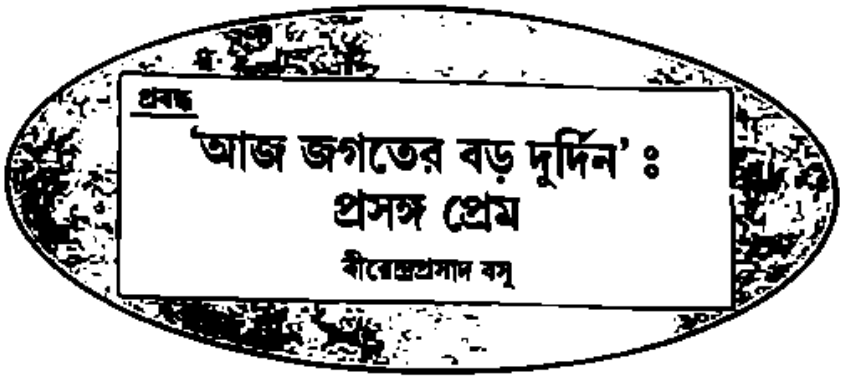

প্রবন্ধ

'আজ জগতের বড় দুর্দিন' ঃ প্রসঙ্গ প্রেম

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

'আজ জগতের বড় দুর্দিন' বলেছেন বিবেকানন্দের স্বনামধন্য) সপুত্র দিলীপকুমার রায়। একথাটুকু বলেই থেমে থাকেননি। তিনি আরও বলেছেন, "নাস্তিকতার রোগজন্তু দিন দিন বেদবাক্য বলে গণ্য করা হচ্ছে। এ বিজ্ঞানবাণী বস্তুতান্ত্রিকতা ও নিষ্ঠুর বিক্রমবাণী ব্যাপারিকতার আপবিক বোমার দুর্দিনে আমাদের কাছে ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে ইন্দ্রিয়বাণী ঐহিকতা ও বুদ্ধিবাণী ক্রুর জাঠীয়তা-যার অন্তিম পরিণতি-স্বার্থান্ধ নরমেধ-যজ্ঞে সর্বসৃষ্টি।" এ বিশ্বসংসারে আমরা নিরন্তর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। আমরা চাই 'অর্থ-যশ-স্ত্রী-সম্পদ-যৌবন-সুস্বাস্থ্য'। আমরা এটাও জানি কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না। অর্থ উপার্জনে আমরা কত কিছুই না করি, কিন্তু তার বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা জগতের দুর্দিন সম্পর্কে নেই। আমরা প্রতিনিয়ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন করি, ইচ্ছাশক্তিকে কল্যাণমুখী করতে শিখিনি।

জগতের এ দুর্দিন কেন? পণ্ডিত ব্যক্তিরা এর জবাব দেবেন। আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বিবেচনায় এটুকু বুঝি যে, সাধারণের জনজীবন আজ রাহুগ্রস্ত। তারা দিশেহারা, শান্তিহারা। আপবিক ও নৈতিক আদর্শ আজ অবহেলিত, উপেক্ষিত। এর কারণ কি? কেন মানুষে মানুষে আত্মঘাতী সংগ্রাম? কেন এ হিংসাবৃত্তি? কেন গোটা পৃথিবীতে এ নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য?

জগতের সকল মানুষই শান্তি চায়। কেহই দুঃখের প্রার্থনা করে না। জীবনের মধ্যে দুঃখ আছে, আছে ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণা, আছে ক্ষুধা। রয়েছে ভোগবিলাস। সে কারণে আমরা প্রার্থনা করি, "আমার যেন দুঃখ না আসে, সুখ যেন পাই।" অন্যেদের মন্ত্রে আছে, "দুঃখং মে মাস্তু সুখং মে ভূয়াৎ"। এত দুঃখ কেন, কেন এত সমস্যা?

এছাড়া সমাজে বা জীবজগতে আরও সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা হল মানুষের ভেদ। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু, বাসনা-বঞ্চনার ভেদ আছে। আমাদের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী থাকে থাকে সাজানো আছে। একথা সকলেই মানেন যে, শ্রেণী বিভাগ আজকের একটা অভিশাপ স্বরূপ।

এসব কারণে পৃথিবী জুড়ে চলছে অশান্তির তাণ্ডব। বহুবিধ অশান্তি-দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতীয়-সর্বত্রই উদ্বেগ বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতা। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ বিধান করছে। মানুষের যাওয়া-আসা কিংবা গমনাগমন অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশন এবং সংবেদের আদান-প্রদান অর্থাৎ কমিউনিকেশন-এ বিবিধ বিষয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে গোটা পৃথিবী আজ 'ড্রইং রুমে' বাঁধা পড়েছে। পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে। এটাই আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করেছে - এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, বিজ্ঞান 'আপনজনকে' পর করেছে। মানুষের সাথে মানুষের কী বিরাট ফারাক। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকী মা-বাবার পর্যন্ত খবর রাখে না। মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে মনুষ্যত্বহীন।

এ যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বেড়েছে। আত্মিক ক্ষুধার মৃত্যু হয়েছে। এখন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাগিদই প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্ণাশ্রমের কঠিন দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গতি মানুষে মানুষে বিস্তর ফারাক গড়ে তুলেছে। জাতির এ দুর্দিনই আজকের যুগ সমস্যা। দেশে বাপ্পী, রাজনৈতিক নেতা ও পণ্ডিতের সীমাহীন প্রাচুর্য। তবুও আত্মিক সৈন্য ও হৃদয়ের দারিদ্র্য কেন?

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "মানব জীবনে যত প্রকার অশান্তি আছে, সবেরই মূল কারণ এই দেহ ও আত্মার বৈষম্য। যত প্রকার উদ্বেগ, অশান্তি, গণ্ডগোল সবই ক্ষুধার্ত আত্মার আর্তনাদ।" মনুষ্যত্ব অর্জনই জীবনের মহাব্রত-এ সত্য আমরা ভুলে গেছি। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। পশু পশুত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মনুষ্যত্বের ভিত্তি পাঁচটি। শাস্ত্রকারদের মতে অহিংসা, অচৌর্য, সংযম, শৌচ ও সত্য-এই পাঁচটি গুণের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব ব্যক্ত হয়। মনুষ্যত্ব পথ হারিয়েছে। জীবনে আনন্দ নেই; তবুও আমরা সকলে বেঁচে থাকতে চাই। কেন না আমরা সকলেই নিজ নিজ সত্তাকে বড় বেশি ভালবাসি। নিজেকে কোন কিছু বড়র সাথে যুক্ত করতে না পারলে 'আনন্দ' নামক বস্তুকে পাওয়া যাবে না। 'আনন্দ' বাজারে বিক্রি হয় না। আমাদের এত অসন্তোষ কেন? তিনি সর্বত্র শিক্ষা মানুষ তৈরি করে না। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাইনি। আমাদের 'Will' বা ইচ্ছাশক্তি যা একান্তই নিজস্ব তা নিষ্ট। এটাই 'এষণা'। এই 'এষণা' শক্তির উপযুক্ত অভ্যাস ও সাধনায় মানুষ তথ্য দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার ওপরে জয়ী হতে পারে।

এই যুগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হলে একটা বড় কেন জিনিস অথবা বৃহৎ-এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা। আমরা কেবল নিতে শিখেছি, দিতে শিখিনি। উপযুক্ত শিক্ষা বা এষণার মাধ্যমে মানুষ অন্তরের ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে। যা আনন্দময় সেটাই প্রাণের অবিনাশী সত্য। 'চেতনার ওপারের লক্ষ্য' বলেছেন শ্রী অরবিন্দ। এ চেতনাটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি হারিয়ে ফেলেছি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। শুধু নিজের জন্য লড়াই।

দিলীপকুমার রায় একথাটা সুন্দরভাবে বলেছেন যে, ভগবানকে ভালবাসতে না পারলে মানুষকে ভালবাসা যায় না। তিনি আরো বলেছেন 'নাস্তিকতার রোগজন্তু দিন দিন বেদবাক্য বলে গণ্য করা হচ্ছে। তিনি একথাও বলেছেন, "এ পৃথিবীকে স্বর্গভূমি করতে হলে সর্বজীবে করুণা সুন্দর প্রেমের বাণীকে বরণ করতেই হবে-নতুবা পশু বিলাসে অধোগতি-আনন্দের নিভালোকে, প্রেমের দীপ্তালোকে, শান্তির সুধালোকে উত্তরণের এছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।"

জগতের এ দুর্দিনে বাঁচার একমাত্র পথ 'প্রেম চাই'। প্রেমের গতি দুর্মুখ-উভয়মুখী। ভক্ত যায় ভগবানের দিকে, ভগবান নেমে আসেন ভক্তের দিকে।' প্রেম নিতে গেলে দাতা হতে হয়। রেখে ঢেকে যিনি দান করেন তিনি দাতা নন। অর্থাৎ 'দান করলেই দাতার হয় না।' যারে তারে অবিচারে-অকাতরে যিনি দান করেন তিনিই দাতা শিরোমণি। আমরা ভগবান মানি না। বলপূর্বক ঘোষণা করে বাহবা নিই 'ঈশ্বর নেই'। অথচ 'প্রেম' ব্যাখ্যার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। আলোচনার 'আলভাল' বিস্তৃততর না করেও আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করব।

অনেকে মনে করেন মানুষ একান্তভাবেই

অর্থনৈতিক জীব। অর্থ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মানুষের পুরুষার্থ পাঁচটি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম। পুরুষার্থ অর্থ সাধনীয়, সম্যক চেষ্টা দ্বারা লভ্য। ভিন্নবাদীদের মনে অর্থ মানে শুধু টাকা পয়সা মনে হয়। 'ধর্ম' অর্থ যা সত্য। 'কাম' অর্থ কাম্য বস্তু। 'অর্থ' বলতে শুধু ধন বোঝায় না। মান-ঐশ্বর্য-যশ-খ্যাতি সবই অর্থ। সকল বন্ধন থেকে মুক্তির আকুতিই 'মোক্ষ'। ওপরের চারটি পুরুষার্থ সুস্পষ্ট। এছাড়া আরও একটি পুরুষার্থ আছে তার নাম 'প্রেম'। ওপরের পাঁচটির চারটিকে উপেক্ষা করা কি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত হবে? অর্থই একমাত্র জীবনের নিয়ন্ত্রক পুরুষার্থ একথা কি বাস্তবিকই সঠিক? ভিন্নবাদীদের এটা একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রেমের ধর্মই বিশ্বধর্ম। প্রেমের ধর্মই মৃত্যুকে জয় করতে পারে। কারণ প্রেম সাম্প্রদায়িক নয়, বিশ্বজনীন। ভোগ মানুষের লালসা বাড়ায়। ভোগ্য বস্তুও সীমাবদ্ধ। প্রেম অসীম। আমরা আধুনিককালের মানুষরা কথায় কথায় সাম্যবাদ বলি — অর্থাৎ সব মানুষ সমান। প্রাচীনকে গ্রন্থ বেদেও সাম্যবাদের কথা আছে। ইসলাম-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সব ধর্মে সাম্যের কথা বলেছে। প্রাচীনকালের সাম্যবাদ ও বস্তুবাদীদের আধুনিক সাম্যবাদ এক কথা নয়। প্রাচীন সাম্যবাদের মূল নীতি বা ভিত্তি হল ঈশ্বর, ব্রহ্মপুরুষ ও আত্মা। অর্থাৎ এর মূলে রয়েছে প্রেম, প্রীতি। সকলেই ভাই ভাই আপনজন। বস্তুবাদীদের সাম্যবাদ হল স্বার্থপরতা, সমতা, মিত্রতা।

বেদে ধর্মের অর্থ কেন সাম্প্রদায়িক অর্থে নয়। বেদের ধর্মের অর্থ 'মানবধর্ম'। মনুর গ্রন্থের নাম 'মানব ধর্মশাস্ত্র'। মানবধর্মের মূল ভিত্তিগুলি নৈতিক বিধান-অহিংসা, অস্তেয় ও সত্য। এই তিনটি মূলত মানবধর্মের ভিত্তি। এই ধর্মকে মেনে নেবার প্রান্ত হওয়া যায়। সে কারণে একটা বিষয় খুব সাথে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। আমরা সকলেই পরমপুরুষের সন্তান। বেদ বলেছেন -

'সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম।

সমনো মন্ত্রং সমিতির সমানী

সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম।'

"সংগচ্ছধ্বং সহচিত্তমেষাম।"

(তোমরা) সম্মিলিত হয়ে চল, সমান কথা বল, তোমাদের সংহত মনকে জানতে হবে। তোমাদের সকলের মনন এক হউক সকল সমবায়ের সংগঠন সমানসম্পন্ন হউক, তোমাদের মন এক হউক। তোমাদের চিত্তসমূহ একত্ব ভাবনায় সম্মিলিত হউক।

এটাই ভারতাত্মার বাণী। যা নিত্যকাল আমাদের সঞ্জীবিত করেছে। আজও করবে। এটাই মিলনমন্ত্র। মানব ধর্মই জাতির দুর্দিনে বাঁচার একমাত্র উপায়।

[সূত্র : নিলীপকুমার রায়, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও যোগেন্দ্রকুমার সরকারের গ্রন্থসমূহ।] ❑

নারুগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং - ৫৪, তারিখ - ১৮/৫/২৯

গ্রাম - পো: — নারুগ্রাম, জেলা — বর্ধমান

নারুগ্রাম ও বাসুদেবপুর মৌজা সমিতির এলাকা

কার্যাবলী :-

১। স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ বন্টন (১৯৯৭-৯৮) বর্ষে ১০ ১৭ লক্ষ।

২। ১২টি লাঙ্গলবিহীন এর মাধ্যমে ৩০০ বিঘা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা।

৩। বন্যা বীজ ও সার বন্টন।

৪। বর্ধমান জেলা - ১ সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত সমিতি হিসাবে নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সক্রিয় করে তোলার ফলে ব্যাপক ব্যবসা করার পরিকল্পনা গ্রহণ।

শুভকান্তি ব্যানার্জি
সভাপতি

জগন্নাথ ঘটক
সম্পাদক

সল্টলেক মাল্টিপারপাস হ্যাণ্ডিক্র্যাপট
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

সুভাষনগর, সেক্টর - ৪, সল্টলেক, কলি - ৯১ রেজি: নং - ৬ উত্তর ২৪ পরগণা

সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের জিনিস (কাঁথা স্টিচের শাড়ি, ব্লাউজপিস, সাইড ব্যাগ) ও মেশিনের তৈরি সাজা, সাইটি, বেডশিট, ফ্রক, হাউজকোট তৈরি ও বিক্রয় করা হয়।

বস্ত্র সহকারে বিভিন্ন ধরনের গুঁড়ামশলাও তৈরি হয় (হলুদ, লংকা, জিরা, ধনিয়া, গোলমরিচ, গরমমশলা, সাদা ভেসল)।

ভাস্বতী দে
সম্পাদক

কৃষকের
সেবায়

মহাদেবপুর
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাঃ + পোঃ - মহাদেবপুর, মালদা

দুলাল চৌধুরী
সভাপতি

ব্রজেন মিত্র
ম্যানেজার

রঞ্জিত বিশ্বাস
সম্পাদক

শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
জানাই

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ী
মেহনতী জনগণের উদ্দেশ্যে

রামরাজা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১, ১/২, চৌরঙ্গী [illegible]
[illegible]
ফোন

অবসর বিনোদনের জন্য
চলে আসুন

পুরীতে

মনোরম পরিবেশে বাথ-রুম সংলগ্ন
চার শয্যা বিশিষ্ট
দুটি ঘর পাওয়া যায়।
সমুদ্র থেকে দু'মিনিটের পথ।
(কার্যালয়ের পাশে)

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

কলিকাতা ডক লেবার বোর্ড স্টাফ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
২০বি, আব্দুল হামিদ স্ট্রিট (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রিট)
(২য় তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

মহাসংঘের বিশুদ্ধ তালমিছরী
সর্দি ও কাশি নিরাময় করে

মঃ জানে আলী সেখ
চেয়ারম্যান

সমীর সরকার
[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ
৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬
দূরাভাষ : ৪৬৪-১৯২৪

পুরীর সমুদ্রতীরে এবং দিঘায় আমাদের
হলিডে হোম

পুরী

"সৈকতাবাস"

দিঘা

"হোটেল ড্যাফোডিল"

বিশদ বিবরণের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন

ফুড-ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

১১-এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা-৮৭

পুরীর সমুদ্র সৈকতে আমাদের হলিডে হোম

"মালঞ্চ"

আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ট্রান্সপোর্টেশন ডাইরেক্টরেট (ফুড) এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

থানা ও সরকারী বিভাগ, ব্লক-এ, (৭ম তল)

১১-এ মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা - ৮৭

ফোন : ২৪৪-৩৪৩৫, এক্সটেনশন - ৭৪ বা ৭৮

পুরীতে সপরিবারে থাকার জন্য

দে'জ মেডিক্যাল হলিডে হোম

★ *সমুদ্রের ধারে* ★ *বিছানা বাসন সবই আছে*

★ *পরিচ্ছন্ন* ★ *খরচ বেশি নয়*

যোগাযোগের ঠিকানা

দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২০এ, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৮৭

With Best Compliments From :

EVERETT STAFF CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

4, GOVERNMENT PLACE (NORTH)
CALCUTTA - 700 001
PHONE 248-6295/97, 248-7038
TELEX : 021-7581 & 021-2236
FAX : 91-33-2489583

প্রবন্ধ

সত্যের সন্ধানে

পরিমল চৌধুরী

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang-II) ১২০০ কোটি বছর পূর্বে। প্রথম মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang-I) এর প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের তথাকথিত পরিচিত ব্রহ্মাণ্ড। প্রথম মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে। মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণশীল এবং সেই সম্প্রসারণ এখনও চলছে।

দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের মত আরেকটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন। দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের যে অবলোহিত আলোক ছটার সৃষ্টি হয়েছিল তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে ১৯৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। ঐ আলোকরশ্মি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে ঐ মহাবিস্ফোরণটির উৎস পৃথিবী থেকে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই গতিতে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাকে এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বলে। এই হিসাবে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব যে কতটা দূর তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একাধিক মহাবিস্ফোরণ ঘটে গেছে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উৎস ১৫০০ কোটি বছর পূর্বের তথাকথিত প্রথম মহাবিস্ফোরণ। এর আগে অন্য কোথাও অনুরূপ মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের পর আরও মহাবিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক একটি মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতি হিসাবে যদি এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা পাল্টাতে হয়। একাধিক ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকলে (যার সম্ভাবনা উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়) এই মহাজগৎকে মহাব্রহ্মাণ্ড হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।

এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মূল কারণ আনবিক বিভাজন ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ। অর্থাৎ তথাকথিত ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথম মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতি হিসাবে হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র, ধূমকেতু এবং বিভিন্ন নক্ষত্রের অগণিত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এটা এখন আমাদের জানা যে এক একটি নক্ষত্র এক একটি প্রজ্বলিত পারমাণবিক চুল্লি। নক্ষত্রগুলিতে অবিরত পারমাণবিক বিভাজনের ফলে কিছু নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু পরমাণু ধ্বংসে হয়ে তাপ ও আলোর সৃষ্টি করে চলেছে। সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র। এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। প্রতিটি নক্ষত্রেরই নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে। নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে দুইভাবে — প্রথমত মৃত্যুকালীন অবস্থায় নক্ষত্রটি স্ফীত হতে হতে তার নিজস্ব আকারের কয়েক হাজার গুণ বর্ধিত হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে সুপার নোভা এবং পরিণতিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত নক্ষত্রটির ভর যদি আমাদের সূর্যের ভরের আড়াই গুণ বা তার বেশি হয় তাহলে মৃত্যুকালীন অবস্থায় নক্ষত্রটি স্ফীত হওয়ার পরিবর্তে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সঙ্কোচনের পরিণতিতে নক্ষত্রটির আকার প্রায় একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে ব্ল্যাক হোল বলে। এই ব্ল্যাক হোলের অন্তর্মুখী আকর্ষণ এতই বেশি যে আসে-পাশের যে কোন বস্তুর এমনকী আলোকরশ্মি পর্যন্ত তবে নেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাজাগতিক নিয়মে প্রধান দুটি বিষয়ের একটি হল সম্প্রসারণ আর অন্যটি সঙ্কোচন। সম্প্রসারণের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা অনুমান করা যেতে পারে-যে প্রক্রিয়ার সঙ্কোচনের প্রভাবে একটি নক্ষত্র ব্ল্যাক হোল-এ পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়ায় যখন ব্রহ্মাণ্ডের এই সম্প্রসারণ চরম সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন সঙ্কোচনের কাজ শুরু হবে। সেই দিন শুরু হবে এই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের প্রস্তুতি। সেই মহাসঙ্কোচনের চরম পরিণতিতে ব্রহ্মাণ্ডটি মহাবিস্ফোরণের পূর্বেকার আকৃতিতে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডটি একটি মহা কৃষ্ণ গহ্বরে (বিগ ব্ল্যাক হোল) পরিণত হবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে উল্লিখিত বিরাট মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রা কে বা কি! প্রশ্নটি তুলেছে এই মহাজগতের একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অধীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবী নামক গ্রহের বলিষ্ঠ প্রজাতির প্রাণী অর্থাৎ মানুষ। মানুষ মনে করে তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হলেন ঈশ্বর এবং মানুষ ঈশ্বর বা দেবতার কৃপা লাভের জন্য তাঁকে উপাসনা করে। এবার একটু খোলা মনে ভাবা প্রয়োজন যে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কত পরে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে যে পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বছর পূর্বে। তার বহু পরে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর বলিষ্ঠতম প্রজাতির প্রাণী এবং মানুষের সৃষ্টি আজ থেকে মাত্র ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে। তাহলে মানুষ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এই যে মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড চলে আসছে তার নিয়ন্ত্রা মানুষের কল্পিত ঈশ্বর হতে পারেন না। আসলে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যে কল্পনা করতে পারে, ভাবতে পারে এবং তার কল্পনা বা ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষমতা রাখে। আদিম মানুষ তার চারিদিকে প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক বাধাবিপত্তি অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে যে অসুবিধার পড়ত তাকে দূর করার জন্য তার কল্পনাপ্রবণ মন ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করে। এই থেকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রচলন শুরু হয়। যেমন অগ্নি-দেবতা, বরুণ দেবতা ইত্যাদি।

ক্রমক্রমে মানুষ, বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। গত দুশ বছরে মানুষ সভ্যতার বিভিন্ন দিকে চরম উন্নতি ঘটেছে। এই নিবন্ধে উল্লিখিত ঘটনাবলী তার সাক্ষী। কিন্তু এখনকার সভ্য মানুষের মনেও সেই ঈশ্বর উপাসনার প্রচলন রয়ে গেছে।

মানুষের জন্মের পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাকর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রা যিনি ছিলেন এখনও

তিনিই আছেন অর্থাৎ নেচার বা প্রকৃতি। প্রকৃতিই ভগবান। ভগবান বলে আলাদা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে পারে না। আর এটা মনে করারও কোন কারণ নেই যে ভগবান বা প্রকৃতি তার সৃষ্ট অন্যান্য সকলকে উপেক্ষা করে শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যই চিন্তা করবেন। আমাদের দেশের ঋষিরা (আসলে তাঁরা এক একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন) এই সত্য জানতেন। তাই তাঁরা বলে গেছেন ঈশ্বরের কোন আকার নেই, তিনি নিরাকার এবং সর্বত্রই বিরাজমান। তবে তাঁরা এটাও জানতেন যে এই সত্য আপামর জনসাধারণকে জানালে তাঁদের সুশৃঙ্খল নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই ধর্মীয় শৃঙ্খলের জালে তাদের আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখার স্বার্থে। মানুষের বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব জন্মলগ্ন থেকে মানুষ সত্যের সন্ধানে যুদ্ধ করে চলেছে। কখনও পিছিয়ে আসেনি। যা নাকি পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীই করতে পারেনি। এই সত্যের জয়যাত্রা নিয়ে মানুষ আজও এগিয়ে চলেছে আরও সত্যের সন্ধানে যে "Winners never quite.quiters never win" এই প্রবচনকে সত্য প্রমাণ করার জন্য। ❑

"দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর -
ইহারাই তোমার দেবতা হউক।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

বেত ও বাঁশের উন্নতমানের সকল প্রকার দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়।

সৌজন্যে — বিবেকানন্দ সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতি লিঃ

স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর

কলিকাতা - ৭০০ ০৩২

(বাঘাযতীন স্টেশন/বাসস্টপের নিকটে)

দূরভাষ - ৪১২-৩৯৪৯

ছয় দশকের অধিককাল জনসেবায় নিযুক্ত

দি শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৭৩,১৭৪ নং শিবপুর রোড

হাওড়া - ৭১১ ১০২

ফোন - ৬৬০-২০৫৮

আমাদের কল্যাণমুখী প্রকল্পের কয়েকটি ঃ

★ বোটানিকাল গার্ডেন অঞ্চলে শাখা অফিস
★ সভ্যদের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণ।
★ গৃহ নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।
★ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ।
★ অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য সহজ শর্তে ঋণ।
★ মূল্যবান সামগ্রীর সুরক্ষায় লকারের ব্যবস্থা।
★ প্রায় সকল প্রকার জমার ক্ষেত্রে অধিকহারে সুদ।
★ সকাল সন্ধ্যায় ব্যাঙ্কিং-এর সর্বাধিক সুবিধা।
★ বকখালি, পুরী, দিঘা, দার্জিলিং এবং বেনারস সর্বস্বাচ্ছন্দযুক্ত হলিডে হোম।
★ সর্ব সাধারণের জন্য সহজ শর্তে এক্সুলেন্সের ব্যবস্থা।

প্রবন্ধ

জন্মশতবর্ষে নজরুল

শ্যামল মৈত্র

ডাকনাম ছিল দুখু মিঞা। সত্যিই তো, যার জীবন যার মুখেই কেটেছে তাকে দুখু ছাড়া আর কি নামেই বা ডাকা যায়! মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে যাঁকে বাল্যকাল কেটেছে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে, রুটির সন্ধানে যাঁকে মাত্র এগারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে, পরিণত যৌবনেও যিনি পেয়েছেন পুত্রবিয়োগ এবং প্রিয়তমা পত্নীর পক্ষাঘাতজনিত শোক, তাঁর দুখু নাম তো সার্থক।

এ বছর ২৬ মে অর্থাৎ সেই দুখু মিঞা অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের শততম জন্মদিন পার হয়ে গেল। এখন এই সাধাটা বছর ধরেই এপার বাংলা ওপার বাংলায় সর্বত্র নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় কবির জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। নজরুল যে বছর জন্মেছিলেন অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখটা ছিল ২৪ মে বুধবার। পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন, সাত ভাই দুই বোনের মধ্যে চার ভাই জন্মের একমাসের মধ্যেই মারা যায়। আগেই বলেছি, দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল বাল্যকালে। এই সময় লেটো দলে গান লিখে গান গেয়ে যখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন তখন আসানসোলের দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে যান। তিনি নজরুলকে ময়মনসিংহে নিয়ে যান এবং স্বগ্রাম দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন নজরুলের বয়স ১৪ বছর। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় প্রথম বছরেই তাকে প্রমোশন পেয়ে যান। কিন্তু সেখানে তাঁর থাকা হল না। ফিরে এলেন আসানসোলে, ভর্তি হলেন সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ; এখানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর শিক্ষক ছিলেন। সকলে যখন আশা করছে নজরুল এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করবেন, এরকম একটা সময়ে ১৯১৭ সালে নজরুল সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ যুদ্ধে চলে গেলেন। কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে ফিরে আসেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ প্রভুদের হয়ে যুদ্ধে যেত পরাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী গোর্খা রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্ট ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মানেই বাংলা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল ইংরেজ সরকারের খাতায় ; তাই সেই দুর্নাম ঘোচাতে বাংলার আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃত্ব ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করলেন যে বাঙালীদেরও যুদ্ধে পাঠানো হোক। সরকার সেই আবেদন মেনে নিয়ে বেঙ্গলি রেজিমেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলার নেতারা যুবকদের ঐ সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য আহ্বান জানালেন। নজরুল তাতে সাড়া দিলেন। ইংরেজ প্রভুদের সেবা করার মনোভাব নিয়ে কি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন? মোটেই না। নজরুলের বন্ধু শচু রায়ের জবানীতে আমরা জানতে পারি যে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে অস্ত্র চালনা শিখে এসে সেই অস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে ধরার বাসনা ছিল তাঁর।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নজরুল অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঠিকই। কিন্তু সে অস্ত্র বন্দুক বেয়নেট নয় সে হল তাঁর ক্ষুরধার লেখনী। সেই অস্ত্রের কনকন-এ মাঝে মাঝেই ইংরেজ সরকারের সিংহাসনের ভিত কেঁপে উঠেছে। তাঁর সেই লেখনী সজ্জাত অস্ত্রগুলিকে হাতিয়ার করে লাখো লাখো মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আজও, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা ও জাত-পাতের বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আমরা তাঁরই রেখে যাওয়া হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করে চলেছি। আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটির কাছ থেকে আমরা, বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে পথ চলার দিকনির্দেশ যে দুটি বিষয়ে সবচেয়ে জরুরি হিসেবে পেতে পারি তার একটি হল সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আর অপরটি হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আলোচ্য নিবন্ধে এই দুটি প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

কতকগুলি সুবিধাবাদী ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জোড়াতালিতে কেন্দ্রে, একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ায় আজকের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক লড়াই। সেই সংগ্রামের দুর্গ প্রতীক কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র জীবনটাই ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। কুন্দিলাল নেহরু প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিয়ে করার পর প্রথম পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। তবে অকালমৃত্যুর পরে পরবর্তী দুই পুত্রের হিন্দু নামকরণ করেছিলেন, সব্যসাচী ও অনিন্দ্য। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ধূমকেতুর প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। "ধূমকেতু তো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় যে কোনখানে তা বেরিয়ে এর পথ দূর করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।" ধূমকেতু প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী (আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু) মাথায় নিয়ে পথ-চলা শুরু করলেও তার বিরুদ্ধে একদিকে ছিল রাজরোষ, অপরদিকে স্বজাতিবিদ্বেষে গোড়া মুসলমানেরা নজরুল এবং ধূমকেতুর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অবশ্য নজরুলকে দমাতে পারেননি।

মুসলমান হয়েও নজরুল শাস্ত্র-পুরাণ, তন্ত্র-মন্ত্র, আচার-বিচার ইত্যাকার হিন্দুধর্মের খুঁটিনাটি ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায় খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন।। "আমাদের গভীর বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে ছোঁয়াছুঁয়ির এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাই। ধর্ম কখনও এত সঙ্কীর্ণ, এত দুর্বল হইতে পারে

না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। হিন্দুধর্মের মধ্যে এই ছুৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না। কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত এক বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারে জোর করিয়া বলিতে পারি। বাঙালীর মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে ভারতে যেদিন হইতে এই 'ছোঁয়া' লক্ষটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মনুষ্যকে এত ঘৃণা করিতে শেখায় যে ধর্ম, সে আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার সেই ধর্মেই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় এই ছুৎমার্গবিধি। কি ভীষণ অসামঞ্জস্য! যাহারা অন্য মানুষকে বা অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে বা নীচভাবে তাহারা নিজেরাই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেদেরও কোন ধর্ম নাই। [ধূমকেতু/ছুৎমার্গ]

পাশাপাশি, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তিনি নির্ভীক বিবেচনা। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা তিনি সমানভাবেই করেছেন। "আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলেই বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া ধরে, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়ে সহিতে পারি। কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।..... 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরও লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া জারী ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ত ইহাদের জানিল হাতড়াইলে দুই দল পাওয়া যাইবে। ..... এখন উপায় নাই। যে হাত বন্ধে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই: অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এইসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি টুপি নিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে .... তরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও তাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই এবং কুফরী ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল। তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের মুসলমানের সামনের বেড়া চট যে কবে উঠিবে বোধা জানেন। কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ তাহা মনেও করিতে পারি না। শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।"

কাজী নজরুল ইসলাম বুঝেছিলেন যে হিন্দু যদি শুধুই মুসলমানের সমালোচনা করে আর মুসলমান যদি হিন্দুর নিন্দা করে যায় ক্রমাগত তাহলে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির ক্ষেত্র কোনদিনই প্রস্তুত হবে না। আবার জাগাতে হলে শুধু আইন করে এই সম্প্রীতি রচনা করা যাবে না। তাই 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নিয়ে তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি, "বদনাগাড়ুতে গলাগলি করে নব প্যাক্টের আল নাই। মুসলমানের হাতে ছুরি নাই, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।" দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করতে হলে হিন্দুকেই হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, কুআচার সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং মুসলমানকেও মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। শুধু বক্তৃতায় নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নজরুল সারা জীবন ধরে তাই করে এসেছেন। ঐ একই নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন। "আমি জানি যে বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজও রুদ্ধ। হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। এ আমিও জানি। একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর করতে পারি। ... ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা অবমাননা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের সংস্কারে আঘাত করার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।" (সওগাত, ডিসেম্বর ১৯২৭) নজরুল তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে "হিন্দুরা ভাবে, কাজী শুধে কবিতা লেখে ও পাত নেড়ে" আবার হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ তাঁর অসংখ্য রচনায় স্বাপকভাবে রয়েছে বলে "মৌলভী বড় মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে/দেব-দেবী নাম মুখে আনে। সবে যাও পাজিটার জাত মেরে।" (আমার কৈফিয়ৎ)।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বারে বারে আক্রমণ করেছে। ঐসব কুৎসিত আক্রমণেও নজরুল বিচলিত হননি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে এলবার্ট হলে তাঁকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাতে চেষ্টা করেছি। গলাগলিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে।" ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি বারে বারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান রেখেছেন। স্বধর্মীদের প্রভুসোহাগীপনার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছেন, "হবে হাশাম, ধরে হোসেন বলে মিথ্যা চিৎকার আর মা ফতেমার পুত্রশোকাতুর আঘাতে পীড়িত করে তুলো না। তোমার স্বাধীনতাকে, তোমার সত্যকে, তোমার ধর্মকে যে তক্কিদের বংশধরেরা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমার ভূলুণ্ঠিত শির উঁচু করে তোমার সত্যকে রক্ষা কর।" (মোহরম : বর্ষ ১, সংখ্যা ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২)।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে নজরুল শ্রেণীচেতনায় উন্নীত করেছেন 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' কবিতাটিতে। "কেহ কেহ হয় চির-দরিদ্র, কেহ চির ধনী হয়/কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময়?/কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা বলো জেনেছে তাহার কেন?/গাধার মতন রয়েছে ইহারা কোরাণ, শাস্ত্র বেদ।" এই কবিতার শেষের দিকে এসে নজরুল যে রাজনৈতিক সত্যের কথা উচ্চারণ করেছেন তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ। "যাহারা ধর্ম, তও তারাই ধর্মের আবরণে/স্বার্থের লোভে ক্ষ্যাপাইয়া তোলে অজ্ঞান জনগণে।/জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি/আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত চায় এরা পয়তানী/ধর্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত/বলে, এরা হবে মন্ত্রী করিবে স্বধর্মীদের হিত।" সাম্প্রদায়িকতার, আঞ্চলিকতার, জাতপাতের, বিভেদের বিষবাষ্প যখন এদেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলেছে সেই ঘোর দুর্দিনে নজরুলের জীবন ও কর্মধারা আমাদের সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেমন, ইংরেজ শাসকদের বিতাড়নের প্রশ্নেও তেমনি, নজরুল ছিলেন এক আপোষহীন যোদ্ধা। ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ। এর মধ্যে আর কোনো দ্বিতীয়

চিন্তা থাকতে পারে না। স্বাধীনতার স্বপ্নে তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলেন, "রাজো রাজো যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, তুমিস ন্যায়/দেবে মেরে যারা ভাবিছে অমর-অক্ষিবে না কভু বৃত্ত। যায়/তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়।/চেয়ে দেখ ঐ ঘুমচূড় অসন্তোষের নেত্র-গরুড়/সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়।/ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীস-প্যারী সেই পথে অস্ত যায়/ওদের সূর্য, দেখছি আমি।/.. এবার মাথায় ঢুকেছে সাপে, তাদের আর কোথা বাঁধবে বল?/আপনার পেছা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।/ওরা ডেকে আর বল কি হল?" (যা শঙ্খ পরে পরে)

১৯২২ সালের মার্চ-এপ্রিল দেখা গেল গান্ধীজির নিরঙ্কুশ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ একেবারে মিনিয়ে পড়েছে। এই নিথর, শীতল আবহাওয়ায় ধূমকেতুর পাতায় অগ্নিবর্ষী লেখার মাধ্যমে নজরুল তাপ ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলেন আর সেই উত্তাপ সন্ত্রাসবাদীদের মিনিয়ে পড়া দেহে মনে গর্জনোন্মুখ গতিবেগের সৃষ্টি করেছিল। "একটা কুকুরকে গুলি মারিবার সময় একটু আধটু ভয় হয়, যদি কুকুরটা আসিয়া কোন গতিকে গাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়! কিন্তু আমাদের এই কালা আদমীকে গুলি করিবার সময় সাদা বাবাজিদের সে ভয় আদৌ পাইতে হয় না; কেননা, তাহারা জানে, আমরা পশুরও অধম।" এইভাবে ক্ষোভের ও বিদ্রূপের চাবুক মেরে মেরে তিনি সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, "সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা অনুনয়-বিনয় করলে তাঁরা শুনবেন না; আমাদের এই প্রার্থনা করাও, ভিক্ষা করাও কুরুক্ষেত্রে সুর বন্ধ করতে হবে।" (সম্পাদকীয় ১৩।১০।২২)। এর পরেই বলেছেন, "আর আমরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের বক্ষ এইসার পাষাণ হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর। আর আমাদের হাজার লোককে পাঁচাকাটা করিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারিব না।"

সেই সময়ে 'বিজলী', 'সন্ধ্যা', 'শঙ্খ' প্রমুখ কয়েকটি পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য দেবার কাজে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যেটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা-দোদুল্যমানতা ছিল, তাকে সবলে ঘুরে ঠেলে ফেলে দিয়ে 'ধূমকেতু' আবির্ভূত হয়েছিল অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের চাবুক মেরে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে। সেকালে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা সহজ ছিল না, পত্র-পত্রিকার পাতায় তো নাই। গান্ধীজিও অনেক কষ্টে ১৯২২ সালে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দাবি তুলেছেন, তখন নজরুল তাকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, "রাজা তুই রাজা রবেন/পগার পারে নির্বাসনে/রাজা নেবে দু-ভাই মিলে দুর্যোধনে আর দুঃশাসনে।/ ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক, আর/আঁতাড়া-ভাই তোলায় জল/তাই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক/ফানও পাবি অতঃপর।

বন্দিনী মা ছিলেন আধা/আজ দিয়েছে মুক্তি যে/বাজাও ধনা নামের নামে/বক্ষ ঢালো বুক চিরে।" (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস) আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন 'বাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স' ব্যঙ্গ করিয়ে, 'ব্যাণ্ড বাজে, ইংলণ্ডে ঐ চলল লিডার্স এণ্ড কোং/শকুন মারুল, কালনেমী-ভণ্ড সাউথ পিকার্স জোং।/ ঘুমতে তুলো কাপড় ঠাই/ডোমিনিয়ন ডোমরা ঘরে/ বাঘ মেরে পাঠ বেলাতের বি-লর্ড সব পুরুতরা যায়।" ইংরেজ শাসকদের কাছে মুসলিমলিগ ও কংগ্রেসের আপোষকামী নেতৃবৃন্দ বারে বারে আবেদন করে বুটের লাথি খেয়েছেন। এঁদের প্রতি নজরুলের ঘৃণা ছিল অপরিসীম বিদ্রোহীর বাণী কবিতায় বলছেন, "তোরাই তোদের এবার তোরা সত্য করে সত্য বল/পেটের ভেতর ছুপাই নপাই, মুখে বলিস, স্বরাজ চাই।/'স্বরাজ' কথার মানে তোদের জানেই হচ্ছে স্বরাজ চাই।/"ভারত হবে ভারতবাসীর' — এই কথাটাই বলতে ভয়!/সেই বুড়োদের বলিস নেতা — তাদের কথায় চলতে হবে।/বলবে ওরা বল নবীন,/চাই না এমন জ্ঞান প্রবীণ/স্বরাজলাভে দেখছে এরা করছে ঢুঁদি সিনকে সিন।/চাস না এরা হই স্বাধীন।/ভণ্ড হবার লক্ষ সবারই, স্বরাজ-টরাজ মুখ ভেংচে 'ফক' ছেলের ফুসমন্তর, মুখ সবল অন্তর কই?"

তাই বলি, নজরুল শুধু একজন কবিতার বা একজন বিদ্রোহী কবি নয়, তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দূত প্রতীক এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সৈনিক। তিনি হৃদয়ের সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে হৃৎকম্প জাগিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত কৃষকের রাজ করেন অবর জন্য কল বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের যে লড়াই হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে আমাদের চেতনার অফুরন্ত সম্পদ নজরুল ইসলাম। এই হতভাগা ভারতবর্ষে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে তিনি আমাদের পথের দিশারী হয়ে অনেকদিন অনেক অনেক দিন ধরে অনেক দেখাবেন।

ইস্টার্ন রেলওয়ে সেক্রেটারিয়েট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

ইস্টার্ন বিল্ডিংস, কলকাতা - ১
ফোন : ২৩৫-৭৫৩২

এবং **পুরী ও দিঘায়**

মনোরম পরিবেশে হলিডে হোম

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With Best Compliments From

The Postal Co-operative Credit Society of Calcutta Ltd.

(Regn. No. 115 of 1915)

Estd. 1915

G.P.O. BUILDINGS
CALCUTTA-700 001

Phone : 210-5337 (Direct)
210-5601 (Ext 26)

"সমবায় আন্দোলনকে
গ্রাম শহরের
জনজীবনে
প্রসারিত
করার লক্ষ্যে
আমরা
অঙ্গীকার বদ্ধ"

ক্যাসতাটা টেলিফোন্‌স ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড

৮, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২৪৮-০০১১

বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করার জন্য
হলিডে হোম। হলিডে হোম। হলিডে হোম।

সমুদ্র সৈকত

পুরী

সমুদ্র টাইপেই বাজারের কাছে নতুনভাবে পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা সহ
সকল সুযোগ ও আরামদায়ক পরিবেশে নির্মিত ৩ টি ব্লকে পৃথক সুট

দিঘা

সমুদ্রের কাছে পুরোনো ডরমিটরি পরিবর্তে নতুন স্বাচ্ছন্দ ও
আসবাবপত্র সহ ... পৃথক সুট

বুকিং ও আরো জানতে যোগাযোগ করুন

দি ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১৫, স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ ২২০-৩৪৫১ (এক্সটেনশন-২৭৮/২৭৯)

এখানে মূল্যবান
কাঠের খাট, আলমারি,
ড্রেসিং টেবিল, সোফাকাম বেড,
কাঠের যাবতীয় আসবাবপত্র
এবং প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল
যাবতীয় আসবাবপত্র
অতি যত্ন সহকারে ও
সুলভমূল্যে
সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ- অরুন মান্না

প্রবন্ধ

ইন্টারেস্টিং

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

১৮৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডে বাৎসরিক মাত্র ১০ পাউণ্ড ভাড়ায় ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল "দি রচ্‌ডেল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি"। ২৮ জন তাঁতির প্রচেষ্টায় গঠিত এই সমিতিটি কিন্তু সমবায় আইনে নিবন্ধীকৃত হয়নি, কারণ ১৮৫২ সালের আগে ইংল্যাণ্ডে সমবায় আইন বলে কিছু ছিল না। সমিতিটি "ফ্রেণ্ডলি সোসাইটিস এ্যাক্ট" — এ নিবন্ধীকৃত হয়।

এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম নয় — এর আগেই ১৭৬০ সালে সেখানে প্রথম সমবায় মডেল চালু হয় তবে তা স্থায়ী হয়নি। "রচ্‌ডেল"কেই পথিকৃৎ বা পাইওনিয়ার বলা হয় কারণ : ১। তাঁরাই এ ব্যাপারে স্থায়ী সাফল্য অর্জন করেন ; ২। তাঁরাই এটিকে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসাবে চালু করতে সক্ষম হন এবং এর প্রভাব শুধু ইংল্যাণ্ডে সীমাবদ্ধ না থেকে পরে পরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ; ৩। সমিতির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না-এঁদের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর ; এবং ৪। এঁরাই সর্বপ্রথম সমবায়ের নীতি রচনা করেন এবং সেগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

★

সুইডেনে সমবায় প্রচেষ্টায় গঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠান হল District Commodity Buying Company। এটি চালু হয় ১৮৫০ সালে। কানাডায় প্রথম সমবায়-Dominion Grange গঠিত হয় ১৮৭৭ সালে। ডেনমার্কে সমবায় আন্দোলন চালু করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন H. C. Sonne নামে এক সমাজসেবী। তাঁর প্রচেষ্টায় ডেনমার্কের প্রথম সমবায় "Thisted Workers Society" চালু হয় ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি। ভারতের প্রথম সমবায় "Triplicane Urban Cooperative Society" গঠিত হয় মাদ্রাজে ১৯০৪ সালে। চিনে ১৯১৯ সালে গঠিত হয় "Sanghai National Cooperative Savings Bank"। ইস্রায়েলের সমবায় আইনে নিবন্ধীকৃত প্রথম "Hevrat Ovdim"-এর জন্ম ১৯২৫ সালে।

★

রচডেল পাইওনিয়ার্সের ২৮ জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। স্বভাবতই তাঁকেই প্রথম মহিলা সমবায়ী বলা যায়।

ভারতে ১৯১৫-১৬ সালে মহিলা সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৮,১৭১টি এবং সদস্যা ছিলেন ৬,৯২,৬৫১ জন।

মহিলা সমবায় বা সমবায়ীদের কথা বলতে গেলে পোল্যাণ্ডের কথা বাদ দেওয়া চলে না। পোল্যাণ্ডের মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা এখন কতজন সে পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই তবে ২৫ বছর আগে ('৭৩ সালে) ঐ সংখ্যাটি ছিল ভারতের বর্তমান মহিলা সমবায়ীর সংখ্যার প্রায় ৮ গুণ-৫৪,৪৪,০০০ জন। পোল্যাণ্ডের শহরাঞ্চলীয় ক্রেতা সমবায়গুলির মধ্যে শতকরা ৬১ জন মহিলা সদস্য। সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে নেই-সে বেলে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে শতকরা ২২ জনই হলেন মহিলা। আরও আছে, কর্মীদের মধ্যে মহিলা-পুরুষের অনুপাত হল ৫০ : ৫০।

★

সমবায় আদর্শ ও ভাবধারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তিনটি মাধ্যম হল : ১। সরকারি আধিকারিকবৃন্দ, ২ ক্রিশ্চান মিশনারিবৃন্দ, এবং ৩। কিছু সমাজসেবক। সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় স্যার হেনরিক্ব নিকলসনের। জার্মানির সমবায় আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে ফিরে এসে ১৮৯৬ সালে তিনি যে প্রতিবেদন পেশ করেন তার ভিত্তিতেই শুরু হয় ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন।

সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে সি এফ স্ট্রিকল্যাণ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন প্যালেস্টাইনে ভারতবর্ষ থেকে সমবায়ের আদর্শ বহন করে নিয়ে যান।

কানাডায় সমবায় আন্দোলনের প্রচারে কুইবেক-এর এক সাংবাদিক অলফন্সো ডেস্ জার্ডিন্স-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইওরোপের সমবায় আন্দোলন জার্ডিন্সকে মুগ্ধ করেছিল।

বোস্টনবাসী এক বণিক-এডওয়ার্ড ফিলেন ভারত ভ্রমণকালে সমবায় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করে উৎসাহিত বোধ করেন এবং পরবর্তীকালে ডেস্ জার্ডিন্স-এর সহায়তায় ম্যাসাচুসেটসের আইন সভাকে প্রভাবিত করে সেখানকার ক্রেডিট ইউনিয়নকে আইনসঙ্গত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করেন (১৯০১ সাল)।

★

শুধু ভারতবর্ষই নয় — ইতালি এবং জাপানের কথাও আন্দোলন ও জার্মানির কাছে ঋণী। ইতালির সমবায় আন্দোলনের কাণ্ডারি হিসাবে দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য — Luigi Luzzatti এবং Dr. Leone Wollemburg Luzzatti ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। বেনেডেনীর সংস্পর্শে বিচলিত হয়ে এবং জার্মানির সমবায় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন এবং অবশেষে গভীরভাবে জানার জন্য জার্মানি যান। ফিরে এসে তিনি শহরাঞ্চলের শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৮৪ সালে মিলান শহরে প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক চালু হয়।

Wollemburg এর কিন্তু পছন্দ ছিল Raiffeisen ধরনের আন্দোলন। Dr. Wollemburg এর উদ্যোগে তাঁর নিজের গ্রাম Loreggia তে ১৮৮৩ সালে প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক চালু হয়।

১৯০০ সালে জাপানে "Industrial Cooperative Law" পাশ হয়। এই আইনটি জার্মানির আইনের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়

★

ছাত্র সমবায় গঠন করার ব্যাপারে ফ্রান্স হল পথ-প্রদর্শক। ফ্রান্সে "স্কুল কো-অপারেটিভ" চালু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে। এর নামটিও খুব সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ "The

Little Bees।"

ক্রাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ। তবে এ ব্যাপারে আর এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় "স্কুল কো-অপারেটিভ" কে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয়েছে। এল্ সালভাডরে ১৯৫২ সালে এক আইন পাশ করে সমবায় শিক্ষাকে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ করে তোলা হয়েছে এবং 'স্কুল কো-অপারেটিভ'গুলির উন্নয়ন ও পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়েছে দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকের হাতে।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমবায় শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিরোধিতা করে মাকলাগান কমিটি। তাদের বক্তব্য ছিল "It has been urged that in order to instill cooperatives into the minds of the rising generation, the subject should be taught in primary schools. To this we are opposed....." সমবায় আইনে সমবায় শিক্ষার সংস্থান সর্বপ্রথম রাখা হয় Greek Act of 1915 এ।

★

জার্মানির মোট পশমের (wool) ৮০-৯০ শতাংশ বিক্রয় হয়ে থাকে সমবায়ের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে জার্মানির মোট চিজের (cheese) ৬০-৭০%, ডেনমার্কে মোট গমের ৮০-৯০%, এবং সুইডেনে মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রায় ৯০% শতাংশ বিক্রি হয়ে থাকে সমবায়ের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে বিমা ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রায়ত্ত কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত কিছু উন্নত দেশে সমবায় আন্দোলনের মেরুদণ্ড হল বিমা সমবায়। আমেরিকার কৃষি সংস্থাগুলির প্রায় ৫০ শতাংশ সমবায় বিমা ব্যবস্থার সুরক্ষাধীন।

ভারতবর্ষে সমবায় বিদ্যুৎ সংস্থার ইতিহাস মাত্র এক দশকের মত, সংখ্যা মাত্র ৫২টি এবং ১৪-১৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬,৩০৯ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাটি বেশ পুরানো এবং ৪০ লক্ষেরও বেশি কৃষি খামারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

ভারতবর্ষে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৪.৫ লক্ষ, সদস্য সংখ্যা ২০৪ মিলিয়ন। দেশের মোট চিনি উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে সমবায় চিনিকলগুলি থেকে। হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনে সমবায়ের অবদান মোট উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ। ৮৫ হাজার প্রাথমিক আবাসন সমিতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ ইউনিট বাসস্থান নির্মিত হয়েছে এবং আরও ৫ লক্ষ ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলছে। সর্বোপরি মোট কৃষিঋণ প্রদানের মধ্যে সমবায়ের অংশ ৬০.০৫%।

★

সক্রিয় সদস্যতা সমবায়ের মূলমন্ত্র। তাদের এই সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিউজিল্যান্ডে নিষ্ক্রিয় সদস্যদের টাকা বাধ্যতামূলকভাবে ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। ডেনমার্কে সমবায় সমিতিগুলিকে ২০ বছর অন্তর ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং উৎসাহী সদস্যদের নিয়ে নতুন করে গঠন করা হয়।

তবে এ ব্যাপারে এল সালভাডোরের পদক্ষেপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনও সদস্য পরপর দুটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ খারিজের সংস্থান আছে ঐ দেশের আইনে।

★

সমবায়ের প্রতি সভাদের অনীহা শুধু যে আমাদের দেশের সমস্যা তা নয়। 'রচডেল পাইওনিয়ার্সের দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও এটি একটি বিশেষ সমস্যা। এক সময়ে সে দেশের সমবায় ভাণ্ডারগুলির সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার নেমে যায় শতকরা ০.২৩ ভাগে। বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ অনুযায়ী "with regard to attendance in meetings there appears to be no organisation with such low rate of member participation" — অর্থাৎ মিটিংয়ে উপস্থিতির বিচারে এরকম আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই যাতে এত কম সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করে। ঐ একই সূত্র থেকে জানা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির প্রায় ২১ শতাংশ সদস্য তাঁদের সমিতির একজন ডাইরেক্টরের নাম জানেন না এবং প্রায় সম-সংখ্যক সদস্য "রচডেল পাইওনিয়ার্স" কাদের বলা হয় তাও জানেন না। (Ostergaad and Halsey Power In Cooperatives)

★

সুইডিশ হোলসেল সোসাইটি K.F. নামেই নামেই বেশি পরিচিত। K.F. এবং তার প্রাথমিক সমিতিগুলির সম্মিলিত কর্মী সংখ্যা এত বেশি যে নিয়োগকারী হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয় – দেশের সরকারের পরেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল K.F. এবং তার কর্মীদের সম্পর্ক খুবই ভাল এবং কর্মিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে তারাই দেশের পথিকৃৎ। ১৯০৬ সালে K.F. তার কর্মিদের জন্য ৮ ঘন্টা কাজের বেওয়াজ চালু করে। সুইডেনে দিনে ৮ ঘন্টা কাজের জন্য আইন পাশ হয় ১৩ বছর বাদে – ১৯১৯ সালে। ১৯০৭ সালে K.F. সপ্তাহে ২ দিন ছুটির যে নিয়ম চালু করে সেটিই পরে আইন হিসাবে পাশ হয় ১৯৩৮ সালে।

★

শোষণ ও বঞ্চনার পটভূমিকায় এবং শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ হিসাবেই যে আন্দোলনের জন্ম তার মধ্যেও আবার দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে উঠবে – এটা অনভিপ্রেতই নয়, কিছুটা স্ব-বিরোধীও। কিন্তু তাও ঘটেছে এবং তাও আজ নয়, বহুদিন আগেই। সমবায় কর্মচারিদের প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে লন্ডন ও বল্টনে ১৮৮৭ সালে। পরে এর থেকেই গঠিত হয় Amalgamated Union of Cooperative Employees - ১৮৯৫ সালে।

★

ফিজি দ্বীপ এবং আফ্রিকার কিছু দেশে 'অবেক্ষাধীন সমিতি' (probationary societies) বলে একটা ব্যাপার আছে। অবেক্ষার সময়কাল সাধারণত ২ বছর। এই শিক্ষানবিশির সময়ে ভালভাবে কাজ করতে পারলে এবং উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখতে পারলে তবেই নিবন্ধীকরণে ইচ্ছুক সমিতিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

★

'রচডেল পাইওনিয়ারস্' নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে কারবার ওটানোর সময় সমিতির নিট সম্পদ সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে না – ঐ সম্পদ অন্য কোন সমিতিকে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দান করা হবে। পরবর্তীকালে এই নীতিটি অবশ্য সমর্থন লাভ করেনি। যাইহোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমিতির উপবিধিতে এ বিষয়ে কর্তব্য-করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভাল এবং চালু সমিতির কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা শুনেছেন কি? হ্যাঁ, তার উদাহরণও আছে। সমিতির সম্পদ সদস্যদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে মূলধনী লাভ (Capital Gains) হিসাবে মোটা টাকা লাভের জন্য অরিগন প্রদেশের "Olympia Veneer

Cooperative" এর সদস্যগণ সমিতিটির কারবার গুটিয়ে ফেলেন।

★

যুগোস্লাভিয়াতে সমবায় কৃষি বিপণন সমিতি গড়তে হলে একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার ও কৃষিবিদসহ অন্যান্য পরিচালন ও কারিগরী কর্মী থাকা বাধ্যতামূলক।

★

"আমরা একটি বিপণন সমবায় সমিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। নামফলক অনুসারে সমিতিটি পরপর বেশ কিছু বছর যাবৎ 'এ' শ্রেণীভুক্ত। যদিও ঐ সমিতির বেশ কিছু সদস্য উৎপাদক তথা বিক্রেতা সমিতি কিন্তু তাদের থেকে মাল কেনে না, কেনে সরাসরি ফড়িয়াদের থেকে।" - কমিটি অন কো-অপারেশন (১৯৬৬)।

★

ডেনমার্কের সমবায়গুলি খুবই শক্তিশালী। কোন কোন পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই সমবায় সমিতিগুলি এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন যে ইচ্ছা করলে তারা কনুইয়ের এক ঠোক্কর বাণিজ্যলিকানা ক্ষেত্রকে হটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তারা তা চায় না। তারা চায় বাণিজ্যলিকানা ক্ষেত্রও থাক। সমবায়ের সাথে সহাবস্থানের জন্য তাদেরও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

★

সমবায় আন্দোলনের দ্বিতীয় নীতিটি হ'ল সভ্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝে থাকি 'এক সদস্য, এক ভোট।' কিন্তু কোন কোন দেশের আইন ও প্রচলিত ব্যবস্থা অন্যরকম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমবায় কৃষি বিপণন সংক্রান্ত Capper Valstead Act of 1922 অনুযায়ী 'এক সদস্য, এক ভোট' -- এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয় ; শুধু মূলধনের ওপর ৮ শতাংশের বেশি লভ্যাংশ না দিলেই হল। ৯টি প্রাদেশিক আইনে 'এক সদস্য, এক ভোট' ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে 'মূলধনের আনুপাতিক ভোটাধিকার' বাধ্যতামূলক। আবার ১৪টি প্রদেশে "প্রক্সি ভোট" অনুমোদিত।

সোভিয়েত্যুনিয়নের তামাক বিপণন সমিতি Tobacco Cooperative Company of Brenersdorb এর কাছে সকল তামাক-চাষীকেই তাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রি করতে হয় কিন্তু ঐ তামাক-চাষীদের না আছে সমিতির ব্যবস্থাপনায় কোনও অধিকার, না আছে সদস্য হওয়ার অধিকার।

★

ডেনমার্কের হোলসেল কো-অপারেটিভের সদস্য তালিকায় আছে বেশ কিছু প্রাইভেট কোম্পানি। এরা 'N' শ্রেণীভুক্ত সদস্য। এরা হোলসেল থেকে জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু এদের কোন ভোটাধিকার নেই। যাতে বিক্রি বাড়ে অথচ সমবায়ের পরিচালন ব্যবস্থায় বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ না থাকে সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

★

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সমবায় নেতৃত্ব সম্বন্ধে এক সমীক্ষায় জানা যায় :

১। সভাপতিদের অধিকাংশই বড় জমিদার,

২। সকল সভাপতিই প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের (dominant caste) লোক,

৩। সভাপতি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হয় -- সভাপতি নির্বাচন একটি অনুষ্ঠান বা প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে,

৪। পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যের রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে।

(V. Mahta National Institute of Coop. Management Cooperative Perspective)

"১৯২৯ সালে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের একজন সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মীরা যখন এই ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করতে যাই, তখন খুব কৌতূহলী হয়ে প্রথমেই দেখার রেজিস্টার দেখেছিলাম। দেখে মনে-প্রাণে শিহরণ জেগেছিল। সভ্য তালিকায় অনেকের নাম ছিল -- রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও আরো অনেকের। স্বাক্ষরের জায়গায় সবাই সই করেছিলেন। কেবল রবীন্দ্রনাথের কোন সই ছিল না। অডিট করতে গিয়ে কোনও এক সরকারি অডিটর স্বাক্ষরের এই ত্রুটি জানিয়ে লাল পেন্সিল দিয়ে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন অর্থাৎ সই নেই কেন! আইনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সই করা সত্যিই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন এই সরকারি কর্মচারির লাল পেন্সিলটাকে অত্যন্ত মূল্যহীন, অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল। যে সমবায়ের প্রতিটি নীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিঃশ্বাস আজও রয়েছে, সমবায় নববিধানের প্রতিটি পাতায় যাঁর স্বাক্ষর, তাঁরই স্বাক্ষরের জন্য সরকারি লাল পেন্সিল "

(রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় আন্দোলন
– মিহির চৌধুরী : তাওয়া-ডিসেম্বর, ৭৬)

নবোদয় তাল-খেজুর গুড় শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : বাগালিয়া ✱ পো: কলাতলাহাট ✱ থানা - ডায়মণ্ডহারবার
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা

উন্নতমানের তালগুড়, খেজুর, পাটালি প্রস্তুতকারক। সুরুচিসম্পন্ন তালপাতার পাখা, টুপি, ফুল ও তাল আঁটির মুখোশ উৎপাদিত ও ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়।

প্রসাদ দাস
সম্পাদক

দিলীপকুমার সামন্ত
সভাপতি

With Best Compliments From :

JALPAIGURI CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPEMENT BANK LTD.

THANA ROAD, JALPAIGURI

A Leading Long Term Lending concern in Jalpaiguri Sadar Sub-Division

K. K. HORE	G. P. SINGHA	S. BASU CHOUDHURY
Chairman	*Vice-chairman*	*Chief Executive Officer*

For Grace Beauty and Elegance
Buy
Bengal Silk
From
Resham Shilpi

PASCHIM BANGA RESHAM SHILPI SAMABAYA MAHASANGHA LTD

Under C & S.S.I. Department, Govt. of West Bengal & Certified by Khadi & Village Industries Commission

Please step in :—

- 12/1, Hare Street, Calcutta- 700 001
- 11/A, Esplaned East, Calcutta-700 029
- 159/1A, Rash Behari Avenue, Calcutta-700 029
- 93, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-700 007
- 156, Bidhan Sarani, Calcutta-700 006
- G-24, DS-III Manicktola, Civic Centre, Calcutta-700 054
- Colony More, Barasat, 24 Parganas (North)
- P-122, Raja S. C. Mullic Road, Garia, 24 Parganas (South)
- Baruipur Super Market, Baruipur, 24 Parganas (South)
- Nachan Road, Benachiti, Durgapur-13
- 30, Raha Lane, Asansol
- A-2/14, Netaji Market, P.O. & Dist. Malda
- G-19, Durgachak Super Market, Haldia, Dist.-Midnapore

Contact Executive

SHRI U.S. CHOWDHURY (Managing Director)
Phone (O) 248-2833, (R) 321-9735, Fax . 0732185700

Wishing Every Success
of
Cooperative Movement

THE NEW PROGRESSIVE LABOUR COOPERATIVE CONTRACT AND CONSTRUCTION SOCIETY LTD.

OODLABARI, P.O. - MANABARI
DIST. - JALPAIGURI

With Best Compliments From :

Cellular	9831026279
Off	220-5655
Resi	468-7203
Godown	337-8102

EXPO CONSTRUCTION

Dealers of Government Disposal Materials' (Ferrous & Non-ferrous) & used contaminated Oil

Official Correspondence
13, Beni Master Lane
Behala
Calcutta-700 061

City Office
5, Clive Row (Dr. Rajendra Prasad Sarani)
3rd Floor, Room No. 75,
(Sarva Mangala House), Calcutta - 700 001

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM

❀❀❀❀
❀❀❀
❀❀
❀

Lokenath Bastralay

DURGAPUR ● BALLY ● HOWRAH

With
Best
Compliments
From :

▲
▲▲
▲▲▲
▲▲▲▲

M/S. DYNAMIC MOULDERS

BALLY ┐ HOWRAH

প্রবন্ধ

হাতিপাওয়ার সবুজায়ন

দীপালি ঘোষ

বছর চল্লিশের আগেও মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া শহরের কাছে হাতিপাওয়া অঞ্চলের ছোট পাহাড় ও টিলাগুলি ছিল ন্যাড়া। মরুভূমির মত শুষ্ক, জঙ্গলহীন। এই অঞ্চলটি সংরক্ষিত জঙ্গলের মধ্যে পড়লেও অত্যাধিক পশুচারণ ও আগুন সমস্ত জায়গাটিকে গাছপালা লাগানো বা জঙ্গল গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। ঝাবুয়া শহর থেকে মাইল খানেকের মধ্যে অবস্থিত টিলাগুলি পরিবেশ রক্ষণে বিশেষ উপযোগী। প্রায় দশটি জলাধারের জন্য এটি ক্যাচমেন্ট বা জলবহন নালা বা শহর। ঝাবুয়ার জলধারাটির জলও এখান থেকে আসে।

আজ কিন্তু হাতিপাওয়া একটি আদর্শ অববাহিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে, সাধারণভাবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে জলসঞ্চয় হচ্ছে এবং ঘাসের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতিপাওয়া ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির পরিবেশ পুনরুদ্ধার অনেকাংশে সফল হয়েছে জঙ্গল ও নদী অববাহিকার যৌথ পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে।

যদিও উক্ত জেলাটির এক-চতুর্থাংশে জঙ্গল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তবু প্রায় প্রাপ্তি শতাংশে জঙ্গলের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বৃক্ষহীন। ১৯০৮ সালের রাজ্য সেটেল্ট জানাচ্ছে, ঝাবুয়া একটি পাহাড়ী অঞ্চল, গভীর বনে ঢাকা। পরিবেশ বিশারদের মতে মাটির উপরিভাগের প্রতিনিয়ত ক্ষয় এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছপালা কেটে ফেলা ঝাবুয়াকে বিভিন্ন আকারের নুড়ি পাথরে ভর্তি কতকগুলো নগ্ন টিলাতে পর্যবসিত করেছে। প্রতিনিয়ত ক্ষয় এবং ঘাসের স্বল্পতার জন্য এই জেলাটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে যৌথ জঙ্গল পরিচালন ব্যবস্থা স্থানীয় গ্রামীণ অধিবাসীদের গ্রাম কমিটির মারফত জঙ্গল বৃদ্ধি, রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থায় অংশ নিতে বাধ্য করতে পেরেছে। গ্রামের ৩৪৪টি কমিটি প্রায় ষাট শতাংশে জঙ্গলের দেখাশোনা করছে। এই কমিটিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৭২,৬৫৩ তার মধ্যে ২৯,৭০৩ জন মহিলা।

পরিকল্পনা মাফিক গবাদি-পশু বিচরণ ঘাস উৎপাদনের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছে। এই প্রথম এ বছরে (১৯৯৭) ঝাবুয়া জেলায় হাতিপাওয়া অঞ্চল ঘাস উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত ঘাস পাশাপাশি জেলাগুলিতে রপ্তানি করছে। কমিটিগুলি নিয়মিতভাবে জঙ্গল পরিদর্শন করে, ফলে বে-আইনি গাছ কাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৭৫০০০ হেক্টর ধ্বংস জঙ্গলকে কোন অর্থ ব্যয় না করে শুধুমাত্র 'সামাজিক বেড়া' দিয়ে অর্থাৎ সজাগ দৃষ্টিতে রক্ষণাবেক্ষণ করে জঙ্গল পুনরুদ্ধারে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে।

এরপর জাটরোবা গাছ বা চিরসবুজ গাছের বীজ রোপণ ফল দিতে শুরু করেছে। জাটরোবা বীজ নিষ্কাশনে একধরনের তেল বের হয় এবং সেটা দিয়ে সাবান তৈরি হয়। ওই বীজের বাষ্পায়নিক পদার্থ পেট্রোল-সদৃশ যা খনিজ পদার্থ থাকার ইঙ্গিত দেয়। জাটরোবা উদ্ভিদ ভূমিক্ষয় রোধ করে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁশ, নিম, আমলা ইত্যাদি গাছের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মাটির ওপর অঞ্চলের জলধারণ ক্ষমতার ক্রম অবনতি বন্ধ করা হল প্রচুর পরিখা কেটে, পাথরের বাঁধ দিয়ে, বড় বড় পাথর ফেলে জল আটকে এবং ঘাস ও গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন করে। পরিবর্তনশীল অঞ্চলগুলোর চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করা হল জলবাহি নালা, বাঁধ, পরিখা তৈরি করে ও নালা গাছপালা রোপণ করে। যে সব জায়গা দিয়ে জল না দাঁড়িয়ে চলে যায়, সে সব জায়গায় বাঁশিচা, ওপর চাষ ও কৃষিজ জঙ্গল তৈরি ও নালা দিয়ে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধায়নের চেষ্টা চলছে।

১৯৮৭ সালে বিজ্ঞান সেন্টার অব সায়েন্স এণ্ড এনভায়রনমেন্টের সুনীতা নারায়ণ ও অনিল আগরওয়ালা ঝাবুয়া পরিদর্শনে এসে খুব হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'সব কিছু একেবারে শেষ হয়ে গেছে।' যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী অনিল আগরওয়ালাকে মন্ত্রী পরিষদের সামনে সব কিছু খুলে বলতে বললেন ১৯৮৮ সালে উনি বলতে বলেছিলেন, ঝাবুয়াতে যে সর্বনাশ ঘটে গেছে, সেটার পুনরাবৃত্তি যাতে সমস্ত দেশে যদি সমস্তোচিত ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালে ঝাবুয়া পরিদর্শনের পর ওই অঞ্চলের অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে সুনীতা নারায়ণ ও অনিল আগরওয়াল একেবারে মুগ্ধ।

সুনীতা নারায়ণ বলেন, ১৯৮০ সালে বেশিরভাগ জল অববাহিকা অঞ্চলের উন্নতি এবং ক্ষয়িষ্ণু জায়গাগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা সেরকমভাবে কার্যকরী হয়নি। বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা কৃতকার্য হয়নি। সাহায্য যা পাওয়া গিয়েছিল ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য সেগুলো কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু ঝাবুয়ার যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি খুবই কার্যকরী হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, টাকা সরাসরি ব্যবহারকারীদের পকেটে গেছে। ওদের জঙ্গল ও প্রশাসন অন্যে বসবের ওপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সুনীতা আরও বলেন, ঘাস ও গুল্মলির চাষ আর্থিক সহায়তা করেছে। এই ঘাস-ওয়ের বিনিময় চাষের ফলে গবাদি পশুর ঘাস ও জমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। ঝাবুয়ার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার অভূতপূর্ব দিক হচ্ছে সরকার এমনভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যেগুলো সাধারণত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে।

সুনীতা নারায়ণ মনে করেন, ঝাবুয়ার পরীক্ষামূলক প্রকল্প হয়ে থাকা উচিত। যেহেতু স্থানীয় লোকেরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাই সেটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং সেটা হবেও। যথার্থ রাজনৈতিক বার্তা এবং অনুপ্রেরণা নিয়েই পরিকাঠামোর পরিবর্তন আসবে।

স্থানীয় জনসংখ্যার অধিকাংশে উদাস এবং তাঁদালা সম্প্রদায়ের। এই পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে রয়েছে একই ধরনের সামাজিক

জীবনযাত্রা। কারণ তারা একইরকম সামগ্রিক সুযোগ সদ্ব্যবহারের সুবিধা পেয়েছে, সাফল্য এসেছে তাই হাতে হাতে। জেলা বন আধিকারিক এ বি গুপ্ত দাবি করেছেন ১২,৮০০ হেক্টর কমাঞ্চল ঘরে রাখা সম্ভব হয়েছে জমির নীচের জলকে ধরে রেখে। তাঁর মতে, এই প্রাকৃতিক পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় দশ লক্ষ গাছ হাতিপাওয়া ও প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে বেড়ে উঠেছে। শ্রী গুপ্ত কেন্দ্র থেকে 'বৃক্ষমিত্র' উপাধি পেয়েছেন।

কিছুদিন আগেও কাবুয়া অপরাধপ্রবণ এলাকারূপে চিহ্নিত ছিল। আজ কাবুয়ার সুদিন। আদিবাসীরা সবাই মিলিতভাবে অপরাধ করার হাতিয়ার একসময়ের কুঠার যার নাম 'কুলাড়ি' নষ্ট করে ফেলেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি শিশুরা স্কুলে যায় এবং স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা অনেক বেশি সংখ্যায় "মেরা নি কুলাড়ি" নামে একটি ব্যাঙ্কে যায়। ব্যাঙ্ক মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থা সবই মহিলাদের হাতে। পনেরো থেকে কুড়ি জন মহিলা প্রতিদিন গ্রামে মিলিত হয়ে একটি করে টাকা সংগ্রহ করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ স্বল্প সুদে উৎপাদন ও অনুৎপাদনশীল বিভিন্ন কাজে ধার স্বরূপ দেওয়া হয়। ঐ জেলায় এখন ৩৫৮টি অনুরূপ ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি অতীতে আদিবাসীদের আর্থিক পীড়ন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক গ্রামীণ শিল্প, সবজি উৎপাদন, মাছচাষ, মালা তৈরি ইত্যাদি উৎপাদনশীল কাজে সাহায্য করে।

হাতিপাওয়ার সাফল্যের আলোতে আরো অনেক অনুন্নত খরাপ্রবণ এলাকা সফলতার আলোকিত হতে পারে।

● *কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭*

জনতা কো-অপারেটিভ এগ্রিঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি : নং - বিড- ৪৫ ● তাং - ৩০-১-৫১

গ্রাম - ভোলসারা ● পোঃ - অমৃতবেড়িয়া ● শাখা - কেলবপুর

এখানে সকলপ্রকারের আমানত স্কীম চালু রহিয়াছে। স্বল্পমেয়াদি লোন ছাড়া ও মধ্যমেয়াদি লোন দাদন করা হয়। বাড়ি চাষের জন্য (মর্গেজ) লোন দাদন করা হয়। এছাড়া কনজিউমার্স ব্যবস্থা রহিয়াছে। জনসেবামূলক প্রকল্প হিসাবে আগামী নভেম্বর '৯৮ এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হবে।

নিমাইচাঁদ পণ্ডা	জিতেন্দ্রনাথ নায়ক	পঙ্কজকুমার মাইতি
ম্যানেজার	সম্পাদক	সভাপতি

হলিডে হোম সংক্রান্ত

ক) দার্জিলিং ঃ গেস্ট হাউস - স্থান - হোটেল ম্যাজেস্টিক, ১৬, এম সি রোড, দার্জিলিং

৪টি ঘর দৈনিক হার ১৫০ টাকা, ১৬০ টাকা, ১৭০ টাকা ও ১৮০ টাকা।

ঘরের বিবরণ ঃ

বিঃ দ্রঃ - রান্না করে খাবার কোন ব্যবস্থা নাই, তবে ঐ গেস্ট হাউসে সুলভ হাতে সকলের জন্য খাবার থেকে রাত্রিতে আহারের ব্যবস্থা আছে।
খ) পুরী ঃ স্বপ্নপুরী গেস্ট হাউস - (পুরী হোটেলের কাছে-সী বিচের উপর)। ৩টি ঘর। দোতলায়। ঘরের বিবরণ - প্রতিটি ঘরে ৪ জন করে থাকতে পারবেন। সংলগ্ন বাথরুম ও রান্নাঘর আছে। দৈনিক হার - প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ১৫০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।
গ) দিঘা ঃ গৌরী কুঞ্জ - শিবাজিক রোড, ওল্ড দিঘা। ২টি ঘর। দৈনিক হার - প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ৭০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।

হলিডে হোম বুকিং সমবায় অফিস হতে করতে হবে

ঠিকানা : পি-৪১-৪২, উইলিয়ম কেরী সরণি, (ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস)
লালবাজার সমকল কেন্দ্র (দ্বিতীয় তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : ২২৫-৩৯১৮

With Cooperative Greetings

M/s. Sumit Aluminium

&

Engineering Industries

Bally ★ Howrah

With Best Compliments From

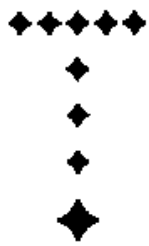

ASHIM MEDICAL CENTRE

NISCHINDA 1 NO. GOVT. COLONY

GHOSHPARA, BALLY, HOWRAH

With Best Compliments From :

Chatterjee Associates

BALLY ● HOWRAH

Prop.. Sudip Chatterjee

With Co-operative Greetings

M/s. Sushil Industries

HOWRAH-711 201

চাঁদের আড়াল

দীপ ভট্টাচার্য

গত দুমাসের মতন একই ঘটনা দেখল শঙ্খ। সে-প্যাকেটটা হাতে পাবার পরেই মাধব মুখুজ্জে টাইপ রাইটারটাকে যত্নে বন্ধ করল। টাইপ করা কাগজগুলো একজায়গায় গোছ করে নিয়ে কার্বন পেপার আর বাকি সাদা কাগজগুলো ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর কাগজ আর নিজের হাতলাওলা পুরনো চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে গেল বড়বাবুর টেবিলের দিকে। সেখানে কাগজগুলো জমা দিয়ে কী যেন বলে চুপচাপ এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

এতসব করার ভেতর ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট মাধব মুখুজ্জে একটিবারও কারও দিকে তাকাল না। একটা বেশি কথা বলল না। একবার একমুহূর্তের জন্যেও থামল না। কেন রিমোট কন্ট্রোল চালানো একটা রোবট। যার কাছে মাপা কাজ, মাপা নড়াচড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

মাস তিনেক হল শঙ্খ এখানে চাকরিতে এসেছে। বড় কোম্পানি, ভাল মাইনে। এয়ারপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ ভাল। বোনাস। তাই অফারটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করবার মতন কারণ দেখায়নি। সোজাসুজি এবং সহজেই রাজি হয়ে গেছে।

ফস্ট ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরবার পর ওর প্রোমোটার পিসেমশাই কনগ্রাচুলেশনস জানাতে এসে এটা-ওটা কথা বলার পর চোখ নাচিয়ে জিগেস করেছিল : তারপর মিস্টার? এবার কী করা হবে?

সদ্য ভাল রেজাল্ট করতে পারার চাইটুকুর বুকে শঙ্খ ঠিক তেমন ভবে কী করবে না করবে কিছু ভাবেনি। তাছাড়া বাড়ির অবস্থাও এমন নয় যে তড়িঘড়ি কিছু একটা না জোটাতে পারলে সংসারটা ঝুরঝুরে পড়বে।

তাই হালকাভাবেই জবাব দিয়েছিল : কী আর করব। ঘর-দার আর দিকে দিকে কাগজে ডিক্লেপত্র পাঠাব : ইন রেসপন্স টু ইওর কাইণ্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার এটসেটেরা, এটসেটেরা। নয়ত বাবা-কাকা-দাদা-মামার সোর্সের ফুটোয় লগি গলিয়ে হ্যাঁচকা টান মারব : অ্যাওরেস্টাটিং ফ্রম এ রিলায়েবল সোর্স .. ব্যাস্, এই পর্যন্তই।

ওর কথা বলার ধরনে মজা পেয়ে পিসেমশাই হা-হা করে হেসে ফেলেছিল। তারপর হাসি থামিয়ে একটু নাটুকে টংয়ে বলেছিল : ইউউউ ..., চাকরি করবার ইচ্ছে থাকলে একটা চাল পেলেও পেয়ে যেতে পার। অবশ্য সেখানে ডিক্লেপত্র হিসেবে নয়। একটা কাগজে তোমার ইচ্ছেটি জানিয়ে মোটামুটি বাঁধা গৎ-এর চিঠিটা মারলেই হবে।

সেই চাকরি। প্রোমোটার পিসেমশাইয়ের গলায় গলায় দোস্ত প্রকাশ বাজোরিয়ার এয়ারপোর্ট-ইমপোর্টের বিরাট ব্যবসায়িক সংস্থা পি বি ইন্টারন্যাশনালের-এ সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

অফিসের বড়ঘরের একদিকে কাচের কিউবিকলটার ভেতর ওর বসার জায়গা। উঁচু পদ। ধাবিত্বের কাজ। কোম্পানির আয়-উন্নতির ভর খানিকটা ওর ওপরেও রয়েছে। তাই সাধারণ কর্মচারিদের থেকে সরিয়ে রাখতে ওর চারদিকে এই কাচের গণ্ডি।

এসব ব্যাপারে যেকোন মানুষের বুকের ভেতরটা চাপা অহঙ্কারে টুইটুম্বুর করে। নিজেকে কেন যেন তার অন্য পাঁচটি কর্মচারিদের থেকে আলাদা রকম মনেও হয়। কিন্তু শঙ্খ অন্য ভাবনার মানুষ। মানুষের পরিচয় ওর কাছে মানুষই। তাই কাচের ঘরে থেকেও অবসর পেলেই চোখ রাখে বাইরের লম্বা ঘরটার কাজ করা প্রতি সাধারণ আরও ফুড়ি-পঁচিশ জন ব্যস্ত মানুষের ওপর।

প্রাইভেট ফার্ম। কাজ অনেক বেশি। বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে দুজনের কাজ করতে হয় একজনকে। তুলনায় মাইনে অনেক কম। এমন আকালের দিনে তা দিয়ে হা-হা সংসারের হাঁ-যোজাতে যোজাতে সবটা চলে গিয়েও কাঁক থেকে যায় অনেকখানি নিরুপায় জীবনে নিজেদের সমস্ত শখ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দেয় পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে।

এত অভাব। এত দারিদ্রের পাঁড়ন, তবু এদের বুকের ভেতর ফল্গুধারার মতন রসবোধ অনন্ত প্রবাহিত. সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি বাঁধা গৎ-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই রসধারা মাঝে মাঝে চলকে উঠলে শঙ্খ খুশিই হয়।

টিফিনের সামান্য অবসরে এরা সুখ-দুঃখের গল্প করে। এ-ওর পেছনে লাগে। অকারণে ঝগড়াটি করে। তখন ছেলেছোকরা সহকর্মীরা কেউ পেছনে লাগতে হাসি-মস্করা করলে, কিংবা ব্যক্তিগত কোনও মুহূর্তের নকল করে দেখালেও মাধব মুখুজ্জে কোনও সত্তা ভবে না। শঙ্খ। পাবার ভান দেখিয়ে ভবের কাগজটা মেলে ধরে নিজেকে আড়াল করে। কী যেন ভাতে খোঁজে অতিপাতি করে

কাচের গণ্ডির ভেতর থেকে শঙ্খ এইসব দেখে। মজা পায়। মাধব মুখুজ্জের নিত্যদিনের রহস্যময় আচরণে কৌতূহল হয়। কখনও ভবার অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারে না। স্বভাবগত লজ্জা আর পর্দানসিন টানিয়ে রেখা ওকে দূরেই সরিয়ে রাখে। ফলে ভবার ইচ্ছে হত বাড়ে, তত্তই না পারার আফশোসে মনে মনে ছটফট করতে থাকে।

পর দু-মাসের মতন আজও মাইনে পাবার পর বাঁধা ছকে মাধব মুখুজ্জে চুপচাপ টাইপের কাগজগুলো জমা দিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রিক্লেপত্র নিয়ে শঙ্খও কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এসে পাছে কেউ কিছু বুঝতে পারে, তাই কোনও তাড়া দেখাল না। সহজ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে মাধব মুখুজ্জের পিছু নেবে। অফিস ছুটি হয়ে যেতেই আলাপ করে ফেলে এমন কবার পেছনে আসল রহস্যটা কী?

শঙ্খ'র বেরতে বেরতে মাধব মুখুজ্জে তড়ক্ষণে রাস্তায়। খুব সতর্কে নিজেকে আড়ত রাখল শঙ্খ। প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে সাবধানে। কেননা কোম্পানির গাড়িতেই ওর যাতায়াত। এভাবে একজন হেঁটে যেখলে হয়ত সে কিছু সন্দেহ করে সাবধান হয়ে যেতে পারে।

তখন আর রহস্যটা জানা যাবে না।

একটা নিরাপদ দূরত্বে এগোতে এগোতে শঙ্খ দেখল মাধব মুখুজ্জে একটা ব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে। দেখে একটু অবাক হল। মানুষটা যা মাইনে পায় তাতে সারামাস ভালভাবে সংসার চলাই কথা নয়। তাহলে মাইনেটা পেয়েই ব্যাঙ্কে যাচ্ছে কেন? তাহলে কি কোনও গোপন বিলি ব্যবস্থার জন্য আয়ের রাস্তা আছে?

রহস্যের গন্ধ পাওয়া শঙ্খ দরজার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। মাধব মুখুজ্জে কাজ সেরে বেরিয়ে আসার মুখে দেখা হবার সময় এমনভাব করবে যেন নিজের দরকারে ব্যাঙ্কে এসেছে বলেই দেখাটা হয়ে গেল। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

মিনিট পনেরোর ভেতরেই মাধব মুখুজ্জে বেরিয়ে এল। বাইরে দাঁড়ানো শঙ্খ'র একবারে মুখোমুখি পড়ে যেতেই থমকাল। শঙ্খ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বলতে গেলে ওপরওলা। তার মতন সামান্য মাইনের মানুষ মাইনের টাকা পেয়েই ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে দেখলে সততা সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ আসতে পারে ভেবে দেঁ দেঁ করতে করতে পান খাওয়া দাঁত দেখিয়ে কাঁচুমাচু হেসে সামলে দেবার চেষ্টায় বলল : এই . এসেছিলুম ....।

মাধব মুখুজ্জের সচেতনতা দেখে আরও সাবধানী হল শঙ্খ। একবারে সহজভাবে হেসে বলল : দরকার ছিল বুঝি?

— না . ..মানে কিছু টাকা

মাধব মুখুজ্জে ঠোক গিলল। ঠিক কী বলে যে এই অবস্থাটা সামলে দেবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। শঙ্খ সেটা বুঝে নিয়ে আগের মতই সহজভাবে জিজ্ঞেস করল : তুললেন বোধ হয়?

এবার স্থিরভাবে মাধব মুখুজ্জে শঙ্খ'র দিকে চাইল। মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে কোঁচায় খুঁটে চোখ দুটো মুছল। তারপর আবার চশমাটা পরে, গলায় দুঃখের একটা অদ্ভুত শব্দ করে মুচকি হাসল : স্যার, আমাদের মতন লোকের পক্ষে হয়ত এটা অস্বাভাবিক। তবু বলি, কিছু টাকা জমাই দিলাম।

সহজ ধাঁচারে শঙ্খ মনে মনে খুশিই হল। অন্য যাই হোক, মানুষটা জালিয়াৎ নয়। ঝুঁকি তাকলেও ছলনা করেনি। তবু মনের ভাবনা গোপন করে একটু মজা করবার চেষ্টা করল : তাহলে একবারে মাইনের দিনেই? সামনে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে বুঝি?

— আজ্ঞে না।

— তবে নিশ্চয়ই ছেলের পড়াশোনার ব্যাপারে?

— আজ্ঞে তা-ও না।

— ও

এবার শঙ্খ নিজেই মুশকিলে পড়ল। সম্ভাব্য দুটো প্রশ্ন করে স্বাভাবিক উত্তর জানা করেছিল। কিন্তু এখন এই অবস্থায় ওর পক্ষে সহজ আলাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা। সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্য অন্য কোনও প্রসঙ্গে যেতে গিয়ে দেখল, মাধব মুখুজ্জে ওর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে আছে।

চাকরি-জীবনের শেষবেলায় মাধব মুখুজ্জে সংসারের ঘানি ঠেলতে ঠেলতে দেখেছে যত, ঠকেছে তারও অনেক বেশি। অভাব আর বঞ্চনার সাঁড়াশি চাপে নিষ্ঠুর সত্যিকে চিনতে তার বাকি নেই। জানতে বাকি নেই মানুষ নামের অদ্ভুত জীবনের মুখোশের আড়লে গোপন করে রাখা লোভ-ঈর্ষা আর চতুর্বের নমনমাল।

এমন একটা অবস্থায় যে শঙ্খ'র সঙ্গে দেখা হবে ভাবে, সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি। হয়ত তাও স্বাভাবিক থাকত। কিন্তু কৌতূহলের প্রশ্ন তার মনের গভীরে সন্দেহের ঢেউ তুলেছে বুঝেছিল। তার মানুষ চেনা মন এই মুহূর্তে শঙ্খ'র প্রকৃত পড়বার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে সে এটা জানে শঙ্খ আর পাঁচ জন ওপরওলার মতন নয়। কাচের ঘেরাটোপে বসেও কোনওদিন বাইরের ঘরে প্রাণপাত করে যাওয়া অভাবী মানুষগুলোকে উপেক্ষার চোখে দেখেনি।

স্থিরভাবে চেয়ে থাকা মাধব মুখুজ্জের সামনে শঙ্খ নিজে মতন অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তার চোখে চোখ রেখে হাসতে চেষ্টা করল : কিছু বলবেন?

মাধব মুখুজ্জের যেন চমক ভাঙল। একটু ইতস্তত করে পাল্টা জিগ্যেস করল : আপনার কি স্যার খুব তাড়া আছে?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নে শঙ্খ ঘাবড়ে গেল। মাধব মুখুজ্জে কি ওর মুখে কিছু উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে? পেলে প্রবৃত্তির এই দীনতায় হয়ত সে মনে মনে ওকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখবে। তবে শঙ্খও এমন কিছু ছোট ছেলে নয় যে অত সহজে ধরা দিয়ে দেবে। তাই ধরা না দেবার ইচ্ছেতে যথাসম্ভব সহজ থেকে সামলে দেবার চেষ্টা করল : কিছু দরকার আছে না কি? আইডেন্টিটি কিরকম লাগবে?

মাধব মুখুজ্জে হাসল। হাসিতে কীসের যেন এক রহস্যময়তা। শঙ্খ'র এই প্রথম মনে হল, লোকটা চালাক। পোড়খাওয়া জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের প্রতিমুহূর্তের গতিপ্রকৃতি চেনার ক্ষমতা এখন তার সহজাত।

শঙ্খকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখেও সে যথা সম্ভব বিনীতভাবে স্পষ্ট সোজাসুজি বলল : দেখুন স্যার, আমি জানি এখানে আপনার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। তবে কেন এসেছেন সেটা আন্দাজ করতে পারছি।

এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে শঙ্খ রীতিমতন লজ্জায় পড়ে গেল। ওর কুণ্ঠা আর ইতস্তভাব দেখে মাধব মুখুজ্জেই হেসে ব্যাপারটা হালকা করে দিল : মিথ্যেই লজ্জা পাচ্ছেন স্যার। অন্যায়তো আপনি কিছু করেননি। যেকোন মানুষেরই আমার মতন লোকের প্রতি কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমি হলে এটাই করতাম। তবে দয়া করে একটিবার যদি গরিবের ঘরে পা রাখেন তো আপনার যা যা জানবার সবকিছুরই উত্তর পেয়ে যাবেন।

শঙ্খ এতটা ভাবেনি। মাধব মুখুজ্জের রহস্যময় আচরণের কারণটা জানতে ওর ইচ্ছে আছে সত্যি। কিন্তু তার জন্যে একবারে বাড়ি বয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখে আসতে নিজেকেই কেমন যেন ছোট ছোট লাগছে।

তাই অকপটে নিজের উদ্দেশ্য স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বলল : নেহাতই জানার ইচ্ছাতে এসেছিলাম মুখার্জিবাবু। জানি, এটা অনধিকার চর্চা। অন্যায়ও, তবু দয়া করে ব্যাপারটা খারাপভাবে নেবেন না।

কথাগুলো বলেই শঙ্খ আর দাঁড়াল না। বাবার জন্যে ফুটপাতে নেমে পড়ল। শঙ্খকে ওভাবে যেতে দেখে মাধব মুখুজ্জে হনহন করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বিনীতভাবে অনুরোধ করল : বিশ্বাস করুন স্যার, আপনাকে আমরা অন্য চোখেই দেখি। কোনও রাগ থেকে বলছি না। খোলা মনেই আপনাকে যেতে বলছি স্যার।

যেতে গিয়েও শঙ্খ ফিরল। মাধব মুখুজ্জের মুখের ওপর ওর চোখ স্থির। অনেক অনেক দিনের দুঃখ দারিদ্র্য আর বঞ্চনার ইতিহাস লেখা সেই মুখে কোনও ছলনা নেই। বরং তার সহজ চাউনিতে একটা অদ্ভুত মেশানো আকুলতা।

শঙ্খ আর এড়িয়ে যেতে পারল না। হোক দৃষ্টিকটু হোক অযাচিত। তবু যাবে। অভাব অনটন আর হতাশার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়া মানুষগুলোর বেঁচে থাকার রহস্য ওকে জানতেই হবে। দেখতে হবে, টিকে থাকার লড়াইয়ে কোন পাতালের সুধাসবতা তাদের বুকের গরল মুছিয়ে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার রসদ জোগাচ্ছে।

সেই ইচ্ছেতেই ও রাজি হয়ে গেল। মুখে চোখে কোমল হাসি ছড়িয়ে বলল : ঠিক আছে। চলুন কোথায় যেতে হবে।

২

মধ্য কলকাতার একটা আদ্যিকালের বাড়িতে মাধব মুখুজ্জেদের বসত। ঘড়, কিন্তু জীর্ণ। মুখুজ্জেরা ছাড়া আরও চার-পাঁচটা পরিবার আছে। নামমাত্তর ভাড়ায় বংশ পরম্পরায় এদের থাকাথাকি। তাই বাড়িওলা চেয়েও দেখে না। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসা। জল-নিকাশী নর্দমা খসে পড়া চুন-সুড়কি আর নোংরার বোঝা। জমে থাকা জলে ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী মশারা নিশ্চিন্তেই বংশ বাড়িয়ে যায়।

উঠোনে কলের চাতাল ফুটিফাটা। ইলেকট্রিকের ওয়ারিং মাঝেমাঝে দেয়াল থেকে খসে এসেছে। অনেকদিনের পুরনো কয়েকটা ফটো একধারের পেরেক খুলে পড়ায় তারসাম্য হারিয়ে বেঁকে ঝুলছে। তাদের সর্বাঙ্গে ধুলো আর ঝুলের পলেস্তারার চারদিকে একটা অদ্ভুত নোনা গন্ধ।

তবু এর ভেতরেও মাধব মুখুজ্জের দিকটা পরিষ্কার। দেয়ালের পুরনো আমলের ফটোগুলো ঝকঝকে। বিদ্যাসাগরের পরিপাটি। চেয়ার-টেবিলের পালিশ চটা হতশ্রী দশার ওপর সুতোর ফুলতোলা ঢাকনা। বিশেষ একটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর নিখুঁত ফুলকপির কাজ করা লেস বসানো কাপড়।

একদিকে কর্ণার টেবিলের মতন একটা পুরনো কাঠের টিপয়ে নক্‌শাপাড়ের ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। দেয়াল-আলমারিতে থরে থরে কাচের বাসনপত্তর। মাটির খেলনা। উল কিংবা সুতোর বোনা নানান মাপের পুতুল আর টিয়াপাখি। সারাঘর ম ম করছে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ, নিশ্চয়ই ধামি ধুপ।

চোখ চারিয়ে দেখতে দেখতে শঙ্খ'র মনে হল, এরা গরিব। কিন্তু মনের গভীরে একটা সূক্ষ্ম রুচির জন্মুধারা এদেরকে আর সবাইয়ের থেকে আলাদা করে রেখেছে। অর্থের অভাব স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধকে গ্রাস করতে পারেনি।

শঙ্খ করেই ঘরে ঢুকল মাধব মুখুজ্জে। শঙ্খকে বসিয়ে রেখে বোধ হয় জামাকাপড় ছেড়ে পরিষ্কার হতে গিয়েছিল। এখন দরজার দিকে চাইতে দেখল, মাধব মুখুজ্জের পেছন পেছন ছোদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। হাল আমলের এবং শৌখিন।

সেগুলো সামনের টেবিলের ওপরে রাখতে বলে মাধব মুখুজ্জে সহজ খুশিতে হাসল : স্যার, আপনার বোদা এ-বাড়িতে কিছুই নেই। তবু আপনি যে সবকিছু মানিয়ে নেলেন সে ভরসা আছে।

কথার পরিপাটো মেজন-ভদ্রতার বদলে আন্তরিক সুরই ছিল। তাই ওর ওপর এতখানি আস্থার শঙ্খ এবার লজ্জা পেল। প্রসঙ্গটাকে পা-টাবার জন্যে ঘরের চারদিকটায় একবার চোখ চারিয়ে নিতে জিগেস করল : আচ্ছা, এই যে অনেকরকম হাতের কাজটাজ দেখছি, এগুলো সব কার করা?

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে মাধব মুখুজ্জে চাপা গর্বে গলগল হাসল : আজ্ঞে এই সবই শিউলির মায়ের হাতের। আমার মেয়ে। ও বলে, মানুষের অর্থের অভাবে কেন রুচির অভাব ঘটবে? রুচিহীন মানুষের আর যত কিছুই থাক, তাকে অন্তত সভ্য বলা যায় না।

মেয়ের গর্বে গর্বিত মাধব মুখুজ্জের দিকে চাইতেই সে লাজুক হাসল : আমার পক্ষে তো ওসব করা সম্ভব নয়। নিজের টিউশনির পয়সা-টয়সা বাঁচিয়ে নিজেই যতটা পারে করবার চেষ্টা করে।

শিউলির রুচির আরও পরিচয় শঙ্খ পেল চায়ে চুমুক দিয়ে। দামি চা। চমৎকার বানানো। এদের আয়োজন সামান্য হোক, তার ভেতর কোন ফাঁকি নেই, সস্তায় বাজিমাতের মানসিকতাও নেই। এই যে পরিপাটি ঘর-দোর রজনীর গন্ধ। টেবিল-চেয়ার ঝাড়নের ঢাকনা। সুগন্ধি ধূপ। এতো শুধুই শঙ্খ'র জন্যে নয়। ওর আসার কথাই তো কেউ জানত না। আসলে এসব হল এদের নিত্যদিনের অভ্যাসগত রুচি। পরিচ্ছন্নতার নিদেনপক্ষে আত্মনিয়োগ।

শাড়ির খস খস শব্দে শঙ্খ চোখ ফিরিয়ে দেখল, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। অভাব অনটন আর সংসারের ঘানি ঠেলা শরীরের স্বাভাবিক লাবণ্য মরে গেছে ঠিকই। কিন্তু বয়সের ভার মুখখানাকে ছুঁতে পারেনি। যেমন কোমল। তেমনই মমতাময়ী। মা বলে ডাকতে বুকের ভেতরটা যেন আনচান করে ওঠে।

মাধব মুখুজ্জে এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল : ইনি হলেন শিউলির মা। আমার সহধর্মিনী।

শঙ্খ সাধারণত যা করে না এবার তাইই করে বসল। অদ্ভুত একটা আবেগে প্রণাম করে ফেলল শিউলির মাকে।

মাধব মুখুজ্জে একবারে হাঁ হাঁ করে উঠল : করলেন কী স্যার! আমরা কি আর আপনাদের মতন মানুষের প্রণামের যোগ্য?

শঙ্খ হাসল। চোখ ফিরিয়ে মাধব মুখুজ্জের দিকে চেয়ে বলল : ভোগ্যতা কী সে হল মুখার্জিদাদু? চাট্টি টাকা থাকলে? মনুষ্যত্ব আন্তরিকতা আর ভালবাসার কোনও মূল্যই নেই?

মাধব মুখুজ্জে মুগ্ধ। লজ্জা আর সঙ্কোচ একধারে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে থাকা শিউলির মায়ের দিকে চেয়ে সে গদগদভাবে হাসল : বলেছিলাম না, স্যার আমরা অন্য ধাঁচের মানুষ!

উত্তরে ঘোমটার ভেতর থেকে শিউলির মা কিছু একটা বলতেই মাধব মুখুজ্জে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল : স্যার, আপনাকে নিয়ে আর আমাদের কোনও সঙ্কোচ নেই। যৎসামান্য যা আয়োজন করেছি, তা সেবার আগে শিউলি মায়ের একটু গান শুনুন।

বলে ঘরজার দিকে ইসারা করতেই ছেলেটা বিছানার ওপর একটা হারমোনিয়াম এনে রাখল। আর তারপরেই যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে শঙ্খ হাঁ।

শিউলি তো সত্যিই শিউলি। যেমন ঝরঝরে রঙ। তেমনই মেয়ের গড়ন। যেন নিপুণ শিল্পীর ভাস্কর্য। ঘরোয়ি শাড়ের একখানা টাপা ফুলের রঙের শাড়ি পরিপাটি করে পরা। মাথিং টাপা ফুলের ব্লাউজ। এক ঢাল কোমরী চুল আলতো করে বাঁধা। আর কোনও প্রসাধন নেই। আস্তে আস্তে সে বিছানার ধারে হারমোনিয়ামটার পাশে বসল। তার চেহারার যেমন সৌন্দর্য, চলায় ফেরায় তেমনই ব্যক্তিত্ব। সাবধানে পা মুড়ে বসে শঙ্খ'র দিকে চেয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে হারমোনিয়ামটা টেনে নিল।

চকিতের দৃষ্টি বিনিময়ে শঙ্খ'র মনে হল যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া। শিউলির কাঁধের মতন ধবধবে ছোট্ট কপালে মাঝারি একটা খয়েরি টিপ। তার চারদিকে ছড়ানো দু-চার গাছি কোঁকড়ানো এলোমেলো চুল। পানের মতন মুখখানায় ছোট্ট চিবুক। ভাসাভাসা চোখ দুটোর সরলতা আর স্বপ্নময়তার অন্তর্দেশে কোথাকোথি কিন্তু....

ঈশ্বরের এমন অকৃপণ সৃষ্টির মাঝখানে নিষ্ঠুর একটা ত্রুটিতে ওর মনের ভেতরটা যেন হায় হায় করে উঠল। এমন নিখুঁত সৌন্দর্যের ভেতর ছন্দপতনের মতন শিউলির নকটা এমনই চাপা যে তার সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ব্যক্তিত্ব, রুচি এক নিমেষে ধসকে গেছে।

মাধব মুখুজ্জের চোখ এবার শঙ্খ'র অবাক মুখের ওপর স্থির। ঘোমটার ভেতর দিয়ে শিউলির মা-ও বোধহয় চেয়ে আছে শঙ্খ'র দিকে। কিন্তু যাকে ঘিরে এতক্ষনের মনের উথাল-পাথাল, সে চোখ বুজে একমনে গেয়ে চলেছে : আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে

শঙ্খ আবার মুগ্ধ। এমন গলা। এমন তার এমন রূপ। এমন ব্যক্তিত্বময় চলাফেরা। একজন নারী যেকোনও পুরুষেরই সাধনার ধন পাওয়ার গর্ব। অথচ একটা অতি তুচ্ছ কারণেই

তাকে থাকতে হচ্ছে সকলের করুণার পাত্রী হয়ে। নিজেকে প্রকাশ করবার লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে হচ্ছে মনে মনে।

গান শেষ হয়ে গেলে হারমোনিয়ামটা বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে রইল শিউলি। এইরকম অবস্থিকর অবস্থায় শঙ্খ কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে মাধব মুখুজ্জের রহস্যময় চলাফেরার সঙ্গে যে শিউলির কোথাও একটা যোগ আছে এটা বুঝতে পারছে।

অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে মাধব মুখুজ্জেই প্রথম কথা বলল। শঙ্খ'র দিকে একটু এগিয়ে এসে কিঞ্চিতভাবে জানাল : স্যার, এই হল আমার রহস্য। শিউলি মায়ের এই খুঁতখুঁতুনি সারাবার জন্যেই হাজার কষ্ট হলেও মাসের প্রথমেই কিছু করে ব্যাঙ্কে জমা রেখে দিই। যত দিনেই হোক, ওটা না করতে পারলে মাকে যে আমার কেউ ধরে নেবে না স্যার!

চেপে রাখা কষ্ট মাধব মুখুজ্জের গলা বুজে এল। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল জল। লজ্জায় বেঁকানো শিউলির মাথা নিচু। জানলার দিক ধরে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে শিউলির মা। তার এক আশ্চর্য নির্মম রহস্যের আবিষ্কারে শঙ্খ নির্বাক।

শুধু নির্বাকই নয়, বুদ্ধও। গোটা মুখুজ্জে পরিবারটার এ এক অদ্ভুত লড়াই। আশ্চর্য সহনশীলতা। লজ্জায় বাইরে যেতে না পারলেও শিউলি ঘরে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। গান শিখেছে। ঘরে থেকেই টিউশানি করে বাপের অসুখের সময়ের সাধ্যমতন অর্থ দিয়ে সাহায্য করবারও চেষ্টা করেছে।

তার ওপর বিপরীত লিঙ্গে বিকলাঙ্গ মেয়ের লজ্জা, গোপন কষ্ট, সব থেকেও তার শূন্যতার হাহাকার অনুভব করে সার্জারির টাকা জোগাড় করতে মাসের অনেকগুলো দিনের অর্ধাহার-অনাহারকে হাসিমুখে মেনে নিজে বাকি তিনজন

সময় পেয়ে সামলে নিল মাধব মুখুজ্জে। তারপর গলাটা ঝেড়ে শঙ্খ'র দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হাসল : আমার চলাফেরায় অনেকেরই কৌতূহল আমি জানি স্যার। কিন্তু কী করব, ওদের সঙ্গে হাসি-মশকরার যোগ দিতে ইচ্ছে হলে চোখের সামনে আমার শিউলিমায়ের অসহায় মুখখানা ভেসে ওঠে। তখন যে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয় স্যার!

মাধব মুখুজ্জের বুকের গোপন হাহাকার যেন ঘর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল চরাচর জুড়ে। মাথা নিচু করে ফেলল শঙ্খ। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় ছোট, বড় অসহায় লাগছে। কৌতূকে মাধব এখানে না এলে হয়ত এ রহস্য কোনওদিনই জানতে পারত না। কিন্তু তা যে এমন দুঃখের, এমন লজ্জার, তাতো স্বপ্নেও ভাবেনি!

ঘরের ভেতর এখন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রহস্যের আড়ালে লুকানো বেদনাময় সত্যির প্রকাশে ওরা কুণ্ঠিত। আর অজান্তে মুখুজ্জে পরিবারের মনে আঘাত দেবার অনুশোচনায় মাথা নিচু শঙ্খ'র। শিউলির হাহাকারে ওর মনজুড়ে এখন এক নামহীন সহানুভূতির কীর্তন বেদনাবোধ। বুকের গোপনে কিছু করবার ইচ্ছের ক্রমাগত উথাল-পাথাল।...

ইচ্ছের সেই প্রাবল্যে মন স্থির করে শঙ্খ প্রথমে চাইল শিউলির দিকে। লজ্জায় বেদনায় তার মাথা নিচু আগের মতন। অক্ষম বাপের মনের কষ্ট অনুভব করে সে কেন কুঁকড়ে এতটুকুন হয়ে গেছে।

শিউলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মাধব মুখুজ্জের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে শঙ্খ ওর সিদ্ধান্তটা জানাল : ধরুন, সার্জারির বাকি টাকাটা যদি আমি দিয়ে দি আপত্তি করবেন?

থমকে গেল মাধব মুখুজ্জে। এ প্রস্তাব তার কাছে স্বপ্নেরও বাইরে। এর জন্যেই তাদের পরিবারের অনেকদিনের লড়াই, এটা সত্যি তবু এই দেওয়া তাদের কাছে লজ্জার। অভাবনীয় অপমানের।

মনের এই উত্তেজনা সামলে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই মাধব মুখুজ্জে উত্তর দিল : স্যার, আমরা গরিব ঠিকই। তবে আমাদেরও একদিন ছিল বাপঠাকুর্দার দানধ্যানও নেহাত কম ছিল না। এখন হয়ত সেসব দিন আর নেই। কিন্তু সম্মানটুকুন বড়ে রক্ষে করি। দানের আড়ালে আপনার এই অনুগ্রহ নিতে পারব না স্যার. আমাদের মাপ করবেন।

উত্তরটা যে এমন হবে শঙ্খ তা আন্দাজ করেই ছিল। তাই মাধব মুখুজ্জেকে একটু অন্যভাবে বাঙ্কা দিতে অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে বলল : মধ্যবিত্ত জাতটার সব গেছে। তবু অতিতে ধরে রেখেছে তার ঐনকো। আভিজাত্যকে কিন্তু যা হারিয়েছে, তা হল বিশ্বাস। ক্রমাগত মার খেতে খেতে এদের বুকের ভেতর যে অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছে, তার থেকেই কিন্তু পতনের শুরু!

একটু মাধব মুখুজ্জের অবাক চোখ শঙ্খ'র দিকে। তার মুখে বিশ্বাস-অবিশ্বাস। যন্ত্রণা অভিমান। আনন্দ লজ্জা।

খুব নিচু গলায় সে আস্তে আস্তে জিগেস করল : কিন্তু এই হাজার হাজার টাকা আপনিই বা দেবেন কেন, স্যার? কোন অধিকারে?

'অধিকার' কথাটা কানের ভেতর খট্ করে গিয়ে লাগতেই থমকে গেল শঙ্খ। সবদিক দিয়েই সক্ষম ওর মতন একজন যুবক শিউলির মতন সুন্দরী রুচিশীলা মহিলার প্রতি যে অধিকারে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে পারত, তার কোন উপায়ই রাখেনি পাঞ্জালী।

পাঞ্জালী। বড়লোক বাপের উগ্র আধুনিকা আর খেয়ালি, সুন্দরী, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের তাপে স্নিগ্ধতা নেই। আছে দহন। মুলিনের খেয়াল মেটাতে শঙ্খ'র সৌজন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ জানতে পারেনি। পাঞ্জালীর সমস্ত খেয়ালপনা আর উগ্রতাকে মেনে নিয়েও শঙ্খ তাকে নিয়ে সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না।

আসলে পাঞ্জালী অন্য ধাতুর। অন্য জগতের। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি আর মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ তার কাছে হাস্যকর পাগলামো। তাই আরও আকর্ষণীয় অন্য একজন পুরুষের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যে সে ডিভোর্স চেয়েছে শঙ্খ'র কাছে।

যে ঘটনা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাকেই সে টেনে এনেছে আদালতের কাঠগোড়ায়। ছিন্ন ভিন্ন করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সংসার তলিয়ে গেছে উচ্ছৃঙ্খলার দরিয়ায়। শঙ্খ নামের সেই রুচিবান, শান্ত-সৌম্য মানুষটার ভবিতব্য আজ নির্ণয় করছে কিরকের কটা কথার ওপর।

শঙ্খকে বিহ্বলভাবে চুপ করে থাকতে দেখে মাধব মুখুজ্জে একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে জিগেস করল। স্যার আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

বুকের গোপন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শঙ্খ এবার মাধব মুখুজ্জের চোখে চোখ রাখল। সেখানে এক আশ্চর্য আন্তরিক আকুলতা। ওর বুকের ভেতরে অনেকদিনের জমাট- এ পাথরটা কী এক আবেগে যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সেই আকুলতার চাউনিতে।

প্রাণপনে সেই উথলে ওঠা আবেগটা সামলাতে সামলাতে আবার চোখ গেল জানলার কাছে দাঁড়ানো শিউলির মায়ের মুখের দিকে। সে মুখে উছলানো মাতৃত্বের চিরন্তন স্নেহ আর মমতা খইখই করছে।

শঙ্খ'র বুকের ভেতরের জমাট পাথরটা এবার দুলে উঠলো আরও জোরে। জীবনের প্রথম ঝরন ফুলের বুকে রক্তের আজনা আকাঙ্ক্ষার অসহায় অক্ষমতা বুকে নিয়ে ওর ভালবাসার ওক পাখিটা মাথা কুটে যাচ্ছে পাঁজরে পাঁজরে। শিউলির মায়ের মমতাময় চোখে চোখ রেখে সেই ওক পাখিটা যেন চরাচর কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল : মাগো ....।

একটুখানির নিস্তব্ধতা। চোখ বুজে শুধু একটুখানির আত্মসংবরণ। তারপর চোখ খুললেই লিউলির স্তব্ধ চোখ। কিছুটা বিহ্বল আর গোপন কৌতূহলে টানটান। তার কালো গভীর তারার অতল থেকে কী যেন এক মর্মীতা ভেসে ভেসে উড়ে আসছে শঙ্খ'র অনন্ত হাহাকারের আকাশ ছুঁতে।

অনেক-অনেকদিনের অসহায় যন্ত্রণা বয়ে বেড়ানো শঙ্খ'র বুকের জমাট কষ্ট গোপন সহানুভূতির এমন হলুদ ছোঁয়া উত্তাপে গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। তারই উত্তাল ধারা গলা বেয়ে বেয়ে আছড়ে পড়ছে দু চোখের তারায় তারায়।

শঙ্খ বুঝতে পারছে বুকের গভীরে এতদিনের হাহাকারের কঠিন অস্তিত্বটা আলগা হয়ে হয়ে ভিজু যেন পাবার আকাঙ্ক্ষায় এক পরম শূন্যতা সৃষ্টি করে চলেছে।

ভু, ভু অবচ্ছ-অবচ্ছ হয়ে যাওয়া মাধব মুখুজ্জের মুখের দিকে চেয়ে বুকের গোপন ছেঁড়া শঙ্খ চিৎকার করে বলতে পারল না : আমার হাৎপিণ্ড থেকে পাঞ্জাবির খাবাটা সরিয়ে নিয়ে লিউলির গন্ধে ভরিয়ে দিন মুখার্জিবাবু!

সেই অক্ষম অনুশোচনার অবাক্ত হাহাকারের শুধু ওর চোখ কাঁপল। ঠোঁট কাঁপল। থরথর করে উঠল শরীরের স্নায়ু শবনায়ু: তারা কেউ জানল না: কেউ বুঝল না। কেউ অনুভব করতেও পারল না শঙ্খ'র ভালবাসার শুভ পাখিটা কী গভীর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কঠিন ভর্ৎসনার সামনে আড়ে আড়ে মাথা খেতে দিল ❑

"সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।"

— স্বামীজি

শারদীয়া শুভেচ্ছা সহ

কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

আকিলপুর, কনুইবাঁকা, হুগলি

রেজিঃ নং - ২৭ ✱ তারিখ - ২৩-৪-৬২ ✱ ফোন নং - ৫৫৩৮৩

বিনোদবিহারী পাল	প্রশান্ত পাত্র	হারাধন দাস
সভাপতি	সম্পাদক	অনেকজন

পুরী সমুদ্রতটে সর্বসুবিধা সমন্বিত ১১ কামরা

১ তল/দ্বিতল/ত্রিতল

হলিডে হোম

যোগাযোগ

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কর্মীদের সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড

১২, আর এন মুখার্জি রোড (দ্বিতল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

With

Best

Compliments

From :

North Bengal State Transport Employees' Co-operative Credit Society Limited

— SECRETARY

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে পড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ-সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে, নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩০২১

মুদিয়ালী ফিসারমেন্স কো-অপঃ সোসাইটি লিমিটেড

কিউ ১৬৭/১, সন্তোষপুর রোড, কলিকাতা-২৪
রেজিঃ নং - ৭১/ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) ১৯৬১
দূরভাষ : ৪৬৯-৫৫৫৫

"সমবায়ের মাধ্যমে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মাছ ধরা, মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।"

- মৎস্য চাষের জন্য উপকরণ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টেশনারি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ
- উন্নতমানের বিভিন্নপ্রকার চারাগাছ সরবরাহ

মৎস্য খামার ✣ নেচার পার্ক

তারাতলা রোড, কলিকাতা - ৮৮

দূরে নয় কলকাতার বক্ষে পিকনিক/প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় আমাদের সৃষ্টি মনোরম পরিবেশের প্রকৃতি উদ্যান।

পথ নির্দেশ

তারাতলা হইতে ৪২বি, ১২, ১বি, ২৪১এ, রামনগর ও আকড়াগামী অটো। ধর্মতলা হইতে ১৩বি ও ২৪১এ।

পরিচালকমণ্ডলী

অষ্ট মণ্ডল, সভাপতি
নেপাল মান্না, সম্পাদক
অষ্ট পাত্র (২), পরিচালক
সমীর বেরা, সহ-সভাপতি
কিশোর মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ
গুণধর পাখিরা, পরিচালক

রামকৃষ্ণ সরদার
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

প্রবন্ধ

সঠিক নেতৃত্বই উন্নতির চাবিকাঠি

প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

বিগত দুই দশক পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণপ্রাপকদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যে সংখ্যায় সমবায় থেকে ঋণের সুবিধা পেয়েছে অন্য কোন রাজ্য তা পায়নি একথাটা গর্ব করে বলা যায়। কিন্তু শহর অঞ্চলের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা সকল বিষয়ে পিছিয়ে আছি। এক্ষেত্রে আমরা গুণগত কোন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারিনি, সেই সঙ্গে এদের সংখ্যা ও কার্যক্রমও সীমিত। সারা ভারতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগ ব্যাঙ্কই মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও দক্ষিণের চারটি রাজ্যে অবস্থিত।

এই জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিবিড়ভাবে, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে, মোটামুটি এলাকার সব মানুষকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি ও সমর্থন নিয়ে স্বল্পবিত্ত মানুষদের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। মধ্য ও নিম্ন আয়সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থই আর্থিকভাবে আরো দুর্বল ও অন্য মানুষ যাদের নানা কারণে অর্থের প্রয়োজন আছে তাদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে। পরিচালক ও সভ্যদের মধ্যে পরিচয় ও যোগাযোগের ফলে পরিচালনা ও ঋণ আদায়ের কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

কিন্তু এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেনই বা এই অসম বিকাশ ও বৃদ্ধির মাত্রা পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের মতো নয় তার কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভৌত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলতে হয়। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই কম, কিন্তু যেটুকু আছে তা এক অর্থে খুবই শক্তিশালী — রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকমণ্ডলীকে ভেঙে দেবার (অবশ্যই আর বি আই-এর অনুমোদন সাপেক্ষে) অধিকারী। আর বি আই আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তা হিসাবে গণ্য। তাই পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সেক্টরের বিষয় যখনই কোন আলোচনা হয় তখনই এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত পরিচালকমণ্ডলী বা তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনের সরকারী নেতৃবৃন্দ আর বি আই-এর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হন।

যেহেতু আর বি আই দেশের সার্বিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ অধিকর্তা এবং তাদেই নির্ধারিত নীতি অনুসারে স্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও নন ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আর্থিক সংস্থাগুলিকে চলতে হয় তাই আর বি আই-এর বিষয়ে আলোচনা তথা সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক। এবং আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির স্বার্থের প্রশ্নে তাদের প্রসার, বিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর বি আই-র ভূমিকা যে সাহায্যকারী নয় তার বিষয় বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ হাজির করা যায়। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি বহু আলোচিত তাই পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত হয়ে আর্বান ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তৃতীয় বিশ্বের যথা পরিচালকমণ্ডলীর দায়দায়িত্বের কথা আলোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আর বি আই-এর কারণে যদি পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি পশ্চাদপদ হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া রাজ্যের সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উপর পড়া উচিত। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানেন যে আর বি আই-এর নীতি ও নির্দেশ সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও এবং এই প্রতিকূলতার মধ্যেও বেশ কিছু আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে উন্নতির পথে চলছে। অপরদিকে কিছু আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শুধু বয়সই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে আর এক শ্রেণীর আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে যাদের শ্রীবৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের আর্থিক ভিত শক্ত নয়। সুতরাং এই বিভিন্নতার কারণ নিশ্চয়ই আর বি আই নয় — কারণ বর্তায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিচালকমণ্ডলীর উপর।

পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সভ্য, আমানতকারী, ঋণগ্রহীতা ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বর্তমানে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মফস্বল শহরে ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ দেবার অনিচ্ছার কারণে কিছু কিছু ছোট ব্যবসায়ী বেকারদের সমবায়েরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের বেশির ভাগের কাছে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে উচ্চমধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মানুষরা অনেক আগে থেকেই যুক্ত আছেন বলে জাতীয়-স্তরের বড় ৩৫ ছোট ব্যবসায়ীরা নয় মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের ব্যাঙ্ক হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গুণগত পার্থক্যও আছে। পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যেসব কিছু ব্যাঙ্কের পিছিয়ে থাকার এটি একটি কারণ বলে মনে করেছি তা ভুল হবে না

ঋণের চাহিদার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ফর্মুলা বলে দেওয়া হয় না এলাকাগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঋণের চাহিদার পার্থক্য হয় মেট্রোপলিটন কলকাতা এলাকার ঋণের চাহিদার সঙ্গে হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার ঋণের চাহিদার মিল নেই, আবার হাওড়ারই শিবপুর এলাকার ঋণের চাহিদার সঙ্গে বাঁকড়ার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই যে এলাকার মধ্যে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কাজ করছে সেই এলাকার অর্থ-সামাজিক অবস্থা, বসতিবাসের ধরন, আয়ের ধারা, কাদের কি কি বিষয়ে অর্থের চাহিদা আছে তার সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলীর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার। এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ঋণ বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণকে বাড়াবে

অনেক সময় পরিচালকমণ্ডলীর রক্ষণশীল মানসিকতার কারণে সাম্প্রদায়ের অজুহাতে নতুন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না, ফলে বিকাশের গতি হয় রুদ্ধ। এলাকার অবস্থা ও চাহিদা অনুসারে এলাকার মানুষের স্বার্থে, বিচার বিবেচনা করে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পথে যেতেই হবে। নচেৎ উদ্বৃত্ত অর্থের বোঝা ব্যাঙ্ককে দায় মেটাবার ক্ষেত্রে দুর্বল করবে।

ঋণের টাকা অনাদায়ী হবার ভয়ে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্বিধা ও অনীহার সৃষ্টি হয়। তাই ঋণের টাকা অনাদায়ীর কারণগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করা দরকার। ঋণের আবেদন বিবেচনা করার সময় আবেদনকারীর সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য বা সদস্যাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে আবেদনকারীর ঋণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিশোধের আর্থিক সঙ্গতি আবেদনকারীর আছে কিনা তা বিবেচনা না করেই আবেদন মত ঋণের পরিমাণ মঞ্জুর করা হয়। ফলে কিস্তিমত সঠিক পরিমাণ টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা অপারগ হন। আবেদনকারীর আয় অনুসারে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অনুপাতে ঋণ মঞ্জুর করার সময় আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে চান না পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা। জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে অনেক সময় জেনে শুনেও পরিচালকমণ্ডলী আবেদনমত অর্থ মঞ্জুর করে ঋণগ্রহীতা সভ্য ও প্রতিষ্ঠান উভয়কে দুর্বল করে দেন। যোগ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের মনস্তিকতা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন আছে। অনাদায়ীর আর একটি কারণ ঋণের টাকা পরিশোধের দিকে দৃষ্টি ও তাগিদের অভাব। জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবার মানসিকতা ত্যাগ করে এবং অন্য কোন চাপের কাছে নত না হয়ে লাগাতার তাগিদের প্রয়োজন আছে। অনাদায়ী টাকার পরিমাণকে আড়ালে রেখে কেবলমাত্র বিনিয়োগের বার্ষিক পরিমাণ সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

সহজ করার ব্যাঙ্কি ব্যবসা বলতে বোঝায় টাকা কেনাবেচার ব্যবসা। সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন প্রকার আমানতে দেয় সুদই টাকা কেনার দাম। কিন্তু কোন অবস্থায়ই এটা টাকা কেনার মোট দাম নয়। হিসাব রক্ষণের জন্য কর্মচারিদের বেতন প্রভৃতির জন্য খরচ, অনুষঙ্গিক বইপত্রের খরচ টাকা কেনার দাম হিসাবে যুক্ত করতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আমানত ও ঋণ বিনিয়োগের উপর সুদের হার এখন আর বি আই-এর নির্দেশে চলে না। আমানত সংগ্রহের বাজারে প্রায় সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেই বাড়তি সুদ দেবার ব্যবস্থা করে থাকে। কোন কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কম মূল্যে মূলধন সংগ্রহ করার চেষ্টায় এজেন্ট মারফৎ কমিশন দিয়ে দৈনিক জমা প্রকল্প চালু করে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর মূলধন কম মূল্যে হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাছাড়া একদিকে স্থায়ী আমানতে ব্যাঙ্কির হার অপেক্ষা বেশি সুদ দেওয়া (যা বাস্তবানুগ নয়) অপরদিকে নানারকম জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা যুক্ত দৈনিক জমা প্রকল্প মারফৎ মূলধন সংগ্রহ অর্থহীন বলেই মনে হয়। ব্যাঙ্কির হার অপেক্ষা বাড়তি সুদ না দিলেই মূলধন কেনার দাম কমাতে পারে। বিশেষ করে যেখানে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির বেশির ভাগই উদ্বৃত্ত অর্থের ভারে নত হয়ে আছে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে এমনকী বিদেশি ব্যাঙ্কে যারা জাতীয় আর্থিক ক্ষেত্রে কোন সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে না সেখানেও বিনিয়োগে বাধা হয়, সেখানে সস্তায় মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা উদ্বৃত্ত অর্থের ভারকে যে আরো বাড়াবে সেটা বিবেচনায় রাখা দরকার। মূলধন কেনার গড় সঠিক মূল্য নির্ধারণ পরিচালকমণ্ডলীর একটি বড় কাজ। সেই সঙ্গে যে মূলধন প্রত্যক্ষভাবে ঋণে বিনিয়োগের সুযোগ নেই সেই মূলধন সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ প্রয়াস ও বাড়তি সুদ দেবার প্রয়োজনের বিষয়ও চিন্তা করা উচিৎ।

ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট বা অর্থব্যবস্থার সঠিকভাবে পরিচালনা করার উপর ব্যাঙ্কির প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বহুল অংশে নির্ভর করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিচালক-মণ্ডলীর অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অর্থ-ভাণ্ডার সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। ফলে সম্ভাব্য লাভ থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয় ও অন্যান্য অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধের অপেক্ষা নিতে পারে, তাই অর্থভাণ্ডার পরিচালনার লক্ষ্য কি এবং কি কি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত তাই উল্লেখ করা হচ্ছে মাত্র।

ক) প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নগদ অঙ্কে রাখা উচিৎ নয়, কারণ ঋণে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত বা অন্য ব্যাঙ্কে রাখা অর্থের বিনিময়ে সুদ যাবে আর হয় কিন্তু নগদ অর্থের থেকে কোন আয় আসে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে আমানতের ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের দিন থেকেই উক্ত অর্থের উপর সুদ দেবার দায় সৃষ্টি হয়।

খ) কোন সময় বিভিন্ন খাতে আনুমানিক মোট কত টাকা জমা হবার (cash inflow) সম্ভাবনা আছে এবং কোন সময় বিভিন্ন খাতে টাকা বিনিয়োগ বা আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দেবার (cash outflow) দায়বদ্ধতা আছে সে বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

গ) সেই কারণে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের সময় লগ্নিকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও সুবিধাজনক আয়ের বিষয় বিবেচনা করার সময় বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে যে কত পরিমাণ অর্থ কত সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা যাবে। লক্ষ্যটা সর্বোচ্চ লাভ এবং সেই কারণে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ দীর্ঘমেয়াদি আমানতে লগ্নি করা নয়। সুবিধাজনক আয় নিরাপত্তা ও প্রয়োজনে টাকা যোগানের ক্ষেত্রে (cash inflow) যাতে কোন অসুবিধা না হয় এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায় পরিচালকমণ্ডলীর উপর।

ঘ) C.R.R. ও S.L.R.-এর নিয়ম অনুসারে টাকা গচ্ছিত রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঙ) এই কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তখনই সম্ভব হয় যখন হিসাব ও অন্য খাতাপত্রের কাজ হাল অবস্থায় থাকে। হিসাব ও খাতাপত্রের কাজ বকেয়া থাকলে সামগ্রিকভাবে আর্থিক অবস্থাটা বেহাল হয়ে পড়ে।

আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব যথাযথভাবে এবং হাল অবস্থায় রাখা, আর বি আই-এর নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন রিটার্নগুলি সময়মত দেওয়া প্রভৃতি কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হয় যদি উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী সেই ব্যাঙ্কে থাকে। এখানে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব ব্যাঙ্ক পরিচালকদের। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি পরিচালকদের মনগড়া হওয়া উচিত নয়। ক্রেডিট সোসাইটি স্তরে কর্মচারিদের যে দক্ষতার প্রয়োজন হয় ক্রেডিট সোসাইটি ব্যাঙ্ক স্তরে উন্নীত হবার পর কর্মচারিদের কর্মদক্ষতার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক। তাই একদিকে

বর্তমানে কর্মরত কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দ্বারা মান উন্নয়নের চেষ্টা করা দরকার অপরদিকে যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরিচালকরা প্রশিক্ষণের বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। দুঃখের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিতে এমন কিছু কর্মী আছে যাদের শিক্ষার মান ও জ্ঞানবৃদ্ধি এমনই স্তরে আছে যে প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের ব্যাঙ্ক কর্মচারীর যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা খুবই কঠিন। আর নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাজের মান উন্নয়নের বিষয়কে গুরুত্বাধিকার না দিয়ে পরিচালকদের নিজেদের স্বার্থ বা নিজেদের গোষ্ঠিস্বার্থের বিষয়টি যদি বড় করে দেখা হয় তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর পরিবর্তে যোগ্যতা যাই হোক না কেন পরিচিত প্রার্থীরাই কাজের সুযোগ পাবে। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মচারী নিয়োগে ভুল ও স্বার্থান্বেষী নীতির ফলে ব্যাঙ্কের খরচই বাড়ে, কাজের মান উন্নয়ন হয় না।

সুষ্ঠুভাবে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার বিষয়টি খুব সহজ কাজ নয়। আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু আইন জড়িত। State Co-operative Acts and Rules, B. R. Act as applicable to Co-operative Societies, Payment of Wages Act, Provident Fund Act, Bonus Act, Gratuity Act, Negotiable Instrument Act, Income Tax Act, Limitation Act, Land Ceiling Act প্রভৃতি আইন ও বিভিন্ন প্রকার ঋণ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অন্যান্য আইন ও নির্দেশের বিষয় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের বিশেষ করে সভাপতি ও সম্পাদকের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নিজের জীবন জীবিকার সমস্যা মিটিয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছাড়া অন্যদের পক্ষে সুচারুরূপে এই দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন কাজ। এই কারণে আর বি আই মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সারাক্ষণের বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এই সূত্রেই সমস্ত কাজকর্মকে পেশাদারী করার কথা ইদানিং আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু কর্মচারিদের যোগ্যতার মান যদি সামগ্রিকভাবে উন্নত না হয় তবে একটি দুর্বল পরিকাঠামোর উপর একজন এম কম, সি এ বা এম বি এ পাশ ব্যক্তিকে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক পদে নিয়োগ করলেই কাজকর্মের উন্নতি হবে বা তা পেশাদারী পরিচালন ব্যবস্থা হয়ে যাবে এমন ধারণা করা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। একথাও স্মরণে রাখা দরকার যে পরিচালকদের যোগ্যতা ও ভূমিকা যদি সঠিক না হয় তবে যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের পক্ষে ব্যাঙ্কের কাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী, যোগ্যতাসম্পন্ন নির্বাহী আধিকারিক ও পরিচালকদের যৌথ পরিচালনা এই ত্রিধারার সম্মিলিত প্রয়াসেই ব্যাঙ্কের কাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব। কিন্তু পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে গোড়ার কথা।

বহু ধারায় বিভক্ত সমবায় ব্যবস্থায় শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা আছে এবং এই বাবদ বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সাধারণ সদস্যদের জন্যেও শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সেইসঙ্গে পরিচালকদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্যও রাজ্য এমনকী সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিচালকদের মধ্যে এই বিষয়ে অনীহা ও উদাসীনতাই বেশি। এর কারণ হয়তো সমবায় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা বর্তমানে পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তাঁরা কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা সমর্থনে এই দায়িত্বে আসেন। এঁদের সামাজিক পরিচিতি ও প্রভাব থাকে, অনেকে হয়তো অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। ফলে এঁদের সামাজিক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার কারণে এঁদের মধ্যে হয়তো সুপ্তভাবে নেতাবলে এক অহংবোধ থেকে যায়। এঁরা হয়তো মনে করেন যে আমরা তো সাধারণ মানুষের থেকে বেশি বুঝি, বেশি জানি, আমাদের আবার জানার বা শিক্ষার কি আছে। এই মানসিকতার কারণে এরা নিজেরা যেমন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ থেকে দূরে থাকেন তেমন কর্মচারিদেরও প্রশিক্ষণের জন্য সচেষ্ট হন না। এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করার প্রয়োজন আছে। কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেখানে পরিচালকরূপে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন।

সঠিকভাবে ব্যাঙ্ক পরিচালনার একটি বড় বিষয় কর্মচারিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সচল সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। অনেক সময় দেখা যায় পরিচালকদের পরিচালকসুলভ অহং বোধের ফলে কর্মচারিদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কর্মচারিদের অভাব অভিযোগের বিষয় সৃষ্টি না দেওয়া, তাদের মতামতকে উপেক্ষা করা ও তাদের আত্ম-সম্মানের প্রতি মর্যাদা দেওয়ার অভাবে কর্মচারিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তা ক্রমে বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকরা সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ন্যায্য ও অন্যায্য বিচার না করেই সব দাবি মেনে নেন এবং এমন সব অনুচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে তার ফলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শৃঙ্খলা যে নষ্ট হয়ে যায় এই বোধ হারিয়ে ফেলেন। এই দুই ধরনের প্রবণতা ভুল এবং এর থেকে নিজেদের মুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কর্মচারিদের ন্যায্য দাবি যথাসম্ভব পূরণ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং তাদের আত্মমর্যাদার বিষয়টি স্মরণে রেখে কর্মচারিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় কর্মচারিদের অসাধু সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের নামে হঠকারী কাজকর্ম প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ হয়।

আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাধারণ সভা সকল সভ্যদের উপস্থিতিতে পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক সভ্যদের প্রতিনিধি মারফৎ অনুষ্ঠিত হয়: বিরাট সংখ্যক সাধারণ সভ্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়গুলি ভালভাবে আলোচনার সুযোগ কম থাকে। বিভিন্ন সভ্যের বিচ্ছিন্ন মতামতে আলোচ্য বিষয়ের মূল কথা হারিয়ে যায়। তাছাড়া বিরোধী অংশসংক্ষুব্ধ সভ্য ইচ্ছা করলে সাধারণ সভা ভণ্ডুল করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সকল বিষয় সুষ্ঠু আলোচনার সুযোগ থাকে। তাই আইনে এই ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কারণে সাধারণ সভ্যরা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, ভালমন্দ কোন সংবাদই পান না বা ব্যাঙ্ক বিষয় কোন মতামত দেবার সুযোগ পান না। ফলে পরিচালক ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন যতটা না ব্যাঙ্কের কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তার থেকে বেশি নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রভাবের উপর। তাই

পরিচালক ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তেই থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের সমবায় চরিত্র তথা সভ্যদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ পরিচালক ও সভ্যদের মধ্যে যোগাযোগ, সহমর্মিতা ও মত বিনিময়ের অভাব দেখা দেয়। ক্রমশ সাধারণ সভ্য ও পরিচালকরা যেন দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যান।

সাধারণ সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালকদের উচিৎ আইনের ব্যবস্থার অতিরিক্ত কিছু কিছু পন্থা অবলম্বন করা যাতে সাধারণ সভ্যদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। সাধারণ সভ্যরা যতক্ষণ অন্তর থেকে অনুভব করবেন যে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানটি তাদের এবং পরিচালকরা যতক্ষণ বিশ্বাসভরে মনে রাখবেন যে তাঁরা সাধারণ সভ্যদেরই প্রতিনিধি ততক্ষণই প্রতিষ্ঠানের সমবায় চরিত্র বজায় থাকবে।

আলোচনার শেষ পর্বে আশা করি লেখকের সঙ্গে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকরাও একমত হবেন যে শুধুমাত্র আর বি আই-এর সমালোচনার দ্বারা আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উন্নতি সম্ভব হবে না — দর্পণে নিজেদের আলেখ্য দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। পরিচালকরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার উপর আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উন্নতি বহুল অংশে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নয়, যে কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিচালকদের ভূমিকাই প্রধান — তার প্রমাণ আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য নেতৃত্বের পরিবর্তে সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালিত হবার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার এসেছে তা জাতীয়স্তরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। □

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ৩৫ এইচ. জি তাং ১৬-২-৬০

গ্রাম ও পোঃ - খড়ুয়া জেলা : হুগলি

পাঁচুগোপাল ব্যানার্জি	কমলচন্দ্র কর	নীলকণ্ঠ দাস
ম্যানেজার	*সম্পাদক*	*সম্পাদক*

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

যদুপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(মিনি ব্যাঙ্ক)

রেজি নং ৮৮ তাং- ২৯-৬-৭৭

মাধবনগর, ইংরেজবাজার, মালদহ

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে সমিতি বদ্ধপরিকর

ব্যবসা :

নিজস্ব শেয়ার আমানত	১,৪০,০০,০০০.০০ টাকা
ঋণদান	২৫,০০,০০০.০০ টাকা (১৯৯৭-৯৮)
রাসায়নিক সার	৭,৯১,০০০.০০ টাকা (১৯৯৭-৯৮)
গ্রামীণ মানুষ	এলাকার চারটি গ্রামের ৮০ জন চাষিভাইদের ঋণ সরবরাহ করা হয়।

নবীন সরকার	অনিলকুমার মণ্ডল	আমিনুল ইসলাম
চেয়ারম্যান	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

সাফল্যের পথে

সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি

(আই সি ডি পি)

এন সি ডি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ সহায়তায়, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা রূপায়ণাধীনে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১লা মার্চ, ১৯৯৪ এবং সমাপ্ত হবে ৩০শে জুন ১৯৯৯।

জেলার - আরামবাগ, জাঙ্গিপাড়া, ধনিয়াখালি, হরিপাল, পাণ্ডুয়া ও সিঙ্গুর – এই ছটি ব্লক এই প্রকল্পের অন্তর্গত।

এ যাবৎ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ :

- ★ ৪৯টি ১০০ মেট্রিক টন গো-ডাউন নির্মাণ,
- ★ ৬৭টি আমানত কাউন্টার ও লৌহ সিন্দুক প্রদান,
- ★ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিকে ৪০ লক্ষ টাকার মার্জিন মানিসহ ১ কোটি টাকার ব্যবসায়ের মূলধন প্রদান,
- ★ ২টি সমবায় হিমঘর সমিতির হিমায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা এবং ড্রাইং শেডের জন্য মোট ৩৬ লক্ষ টাকা প্রদান,
- ★ ৪টি সমবায় বিপণন সমিতিকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ের মূলধন প্রদান,
- ★ ১০টি সমবায় তন্তুবায় সমিতিতে ১৪ লক্ষ টাকার রাজ্য সরকারি অংশগত মূলধন প্রদান,
- ★ মোট ৮০টি সমবায় সমিতির কর্মচারিগণকে ৮ লক্ষ টাকা উৎসাহভাতা প্রদান, এবং
- ★ সকল সমিতির কর্মচারী পরিচালক এবং সদস্যগণকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান; মোট ৭০০০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

এ যাবৎ এই প্রকল্পে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে (অগাস্ট '৯৮ পর্যন্ত)

ঘরের বাইরে ঘর

পরিবেশ পরিবারের ★ স্বাচ্ছন্দ্য হোটেলের

পুরী

দার্জিলিং

দিঘা

(দিঘাতে কর্মী সমবায়ের নিজস্ব ভবন)

উটি

মানালি

পঞ্চগনী (মহারাষ্ট্র)

আমাদের হলিডে হোমের দরজা খোলা সকলের জন্যই

যোগাযোগ

স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া

এম্‌প্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন : ২২১-১৪৫৮, ২২০-৮১২৯ (সরাসরি), ২২০-২৩৭১

এক্সটেনশন : ৩২৫, ৩৯৮

আপনার, আমার সকলের ব্যাঙ্ক

বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

৩১৬, জি টি রোড, বালি, হাওড়া

দূরভাষ ঃ ৬৫৪-২১০৮

- সকাল ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই লেনদেনের সুযোগ, এমনকী রবিবার সকালেও।
- বিভিন্ন জমা প্রকল্পে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক সুদ।
- সহজ শর্তে এন এস সি, আই ভি পি, কে ভি পি এবং স্বর্ণ বন্ধকি অগ্রিমের সুবিধা।
- গিফ্‌ট চেক, পে-অর্ডার, লকার-এর সুবিধা আছে।
- একটা পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণে আজই আসুন।

মনে রাখবেন
এই এলাকার আমানত
এলাকার আর্থিক মানোন্নয়নেই ব্যয়িত হয়।

দেবকুমার বসু	নিরঞ্জন গুপ্ত	সুবীরকুমার ব্যানার্জি
সভাপতি	সম্পাদক	চিফ এক্সিকিউটিভ

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা

আয় রে আয়।

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র – "সমবায় সমবায়"

– কাজী নজরুল ইসলাম

বালি জুট মিলস্ এমপ্লয়িজ কো-অপরেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৫ নং, শ্রীচরণ সরণি
বালি, হাওড়া
পিন : ৭১১ ২০১

শিশির চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

ধনঞ্জয় বণিক
সম্পাদক

অন্য পথের খোঁজে

প্রদীপকুমার ভাদুড়ি

বাবা ঘরে ঢুকতেই হ্যাঙ্গারে ঝোলানো পাঞ্জাবির পাশ পকেটে হাত ঢোকালো সে, উইলস ফিল্টারের একটা প্যাকেট বেরিয়ে এল। খুলে দেখল একটা মাত্র সিগারেট। তা'হলে ধরা পড়ে যাবে। বাবা মাকে বলবে, দ্যাখো, বাপের পকেট মেরে কেমন সিগারেট খাচ্ছে তোমার সুপুত্তুর।

মা টিপ্পনী কাটবে, যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে। নিজে একসময়ে বাপের পকেট মেরে বিড়ি টানতে। ছেলে তোমার পকেট মেরে সিগারেট টানছে। অপরাধ কি হল?

পাঞ্জাবির বুক পকেটে হাত গলালো সে। পেল কয়েকটা দশ আর পঞ্চাশ টাকার নোট। ঘুশো নবাই। শালা নিশ্চয়ই হারামের টাকা। একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাকিটা পকেটে রেখে দিল।

নিজের ঘরে গিয়ে স্টিরিওতে বরদাতের ক্যাসেট চালিয়ে বিছানায় লম্বা হল। বরদাতের গানগুলো ভালো লাগে সুজিতের — 'লাভ তুঝে লাভ ম্যায় করতা।'

মন দিয়ে গানটা শুনলো। পত্রের গান — 'হামকো প্রিফ তুমসে প্যার হ্যায়'। গানটা শুনতে শুনতে গোপার কথা মনে হল তার। দারুণ হট পাররা। মীনাক্ষী।

তপনটা এখনও লাইন করে দিতে পারলো না! ওদের বাড়িতে নাকি যাতায়াত আছে। শালা, নিজেই-না! তাহলে তপন বলতো, ও তো জানে সুজিতকে।

আজ একবার চেষ্টা করবে।

ড্রয়ারে একটা প্যাকেট তখন রাখা ছিল। একটা সিগারেট আছে। ঘরিয়ে মাথার পিছনে বাঁ হাত রেখে আরাম করে টানতে লাগলো। দেওয়ালে মীনাক্ষীর বড় পোস্টার। তার পাশে শচীন আর সৌরভের।

গোপার মুখটা মনে পড়লো। একদম মীনাক্ষী। চোখ, কপাল, ঠোঁট। শালা দারুণ। চড়াক, করে উঠে মীনাক্ষীর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে ফিরে তাকাতেই দরজায় মাকে দেখলো।

ওই করো তুমি! যত সব অসভ্যতা!

ও! মা! মীনাক্ষী দারুণ হট। আমার জীবন প্যালাল। তোমরা এসব বুঝবে না। দশটা টাকা দাও।

বা! কথা ঘোরাতে কি রকম পারিস।

কথা ঘোরানো কি আছে! আই লাইক মীনাক্ষী। দশটা টাকা দাও।

এখন আবার টাকা কি হবে! পাশু তোর বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিলি! কিসে এতো খরচ করিস?

দশটা টাকার জন্যে এতো কৈফিয়ৎ। থাক লাগবে না।

কোথা থেকে পাবি?

সে তোমায় দেখতে হবে না।

দিচ্ছি বাবা। সব কথাতেই ছেলের তেজ। প্রতিমা ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

সিউড়ি বাস স্ট্যাণ্ড হাফ রাউণ্ড করে মাদ্রাসা রোডের কোণে সাইকেল দাঁড় করালো সুজিত। মীন ভবনের পাঁচিলের গায়ে কয়েকটা গুমটি। সেরেরটা পান-সিগারেটের। সিটে বসেই পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করলো। টাকাটা এগিয়ে দিয়ে দোকানীকে বললো, এক প্যাকেট চারমস।

হাসপাতালের কাছে সতুর চায়ের দোকান। দু'পাশে বেঞ্চি পাতা। সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সুজিতদের ঠেক। সতুকে এক কাপ চায়ের কথা বলে সিগারেট ধরালো সে। এখনো শালারা কেউ আসেনি। পল্টু তো ন'টার আগে বিছানা ছাড়ে না। পল্টুর মালটার কেন কি নাম? শ্রীপর্ণা। সুজিত কয়েকমাস আগে তনিতার পিছনে লাইন লাগিয়েছিল। এক জায়গার সাইকেলে পিছন পিছন গিয়েছে। একদিন বিকেলের দিকে বরদাতের সেই গানটা গেয়েছিল — হামকো প্রিফ তুমসে প্যার হ্যায়। ওনে ঝিম ঝিম চোখে তাকিয়ে হেসেছিল তনিতা।

এর মাসিন দিন পর গোপাকে চোখে পড়ে গেল। ফ্যান্টাস্টিক, একদম মীনাক্ষী। ঠোঁট, চোখ, কপাল। তনিতার পেছন ছেড়ে দিল। সেই থেকে তনিতা আসছে দেখতে পেলে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানে। তনিতা হাত ফিরিয়ে নেবে, হঠাৎ পিছনে যাবার কারণ বুঝতে পারে না।

ডাইরেক্ট কোন কথাবার্তা হয়নি। লাভ-টাভ কিছু হয়নি। চার্জ করার সুযোগ নেই তনিতার। প্রসূনকে একদিন সুজিত বললো, তুই ওটার পিছনে লেগে যা।

ভাট্। ওটা তো তোর পাবরা। একটা ভালো মাল আসছে তনিন থেকে। একদম মীনাক্ষী বলালো।

ওটা আমার, গম্ভীরভাবে বললো সুজিত, ওদিকে হাত গলালে তোর হাত কেটে নেব।

কটা নিবিরে তুই। তনিতার পিছনে লাইন লাগিয়েছিস। আবার এখন নতুন পাররা।

বললাম তো। তনিতাকে তুই নিয়ে নে।

তোর এঁটো মাল আমি নেব কেন? ক্ষুব্ধস্বরে প্রসূন বললো।

নিবি না তো অন্য কোন একটা বেছে নে কিন্তু ওটার দিকে হাত বাড়ালে ভালো হবে না সুজিত হুমকি দিল।

সুজিত আর প্রসূনের মধ্যে লিডারশিপের টাসেল একটা রয়েই গেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই ঘটনা ওদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ালো। দুদিন পর প্রসূন এই ঠেক ছেড়ে দিল। এখন ও মনজিত মোড়ের কাছে নতুন ঠেক করেছে একদিন ফাটাফাটি হবে যাবে সুজিতের সঙ্গে

কোয়ার্টারের দিকে মুখ করে বসে আছে সুজিত। পল্টু তার জুনুর এসে সাইকেল স্ট্যাণ্ড করাচ্ছে। তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিল সুজিত। সিগারেট প্যাকেটটা পল্টুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইণ্ডিয়া-সাউথ আফ্রিকার খেলা কটায় স্টার্ট?

রাত নটা থেকে হেল নাইট। পল্টু উত্তর দিল।

আজ তোর বাড়িতে খেলা দেখতে যাব।

গ্র্যাণ্ড, বাড়ি ফাঁকা। আজ ফিস্ট হয়ে যাক। পল্টু বললো।

ফাইন। হাত বাড়িয়ে সুজিত পল্টুর হাতে তালি দিল। যেমনটা খেলার মাঠে ভিকট্রির পর

হাসি দেখে প্রেয়সীরা।

তপন কখন এসে বসেছে। বললো, আমাদের চারজন আর প্রবীর।

সুজিত বললো, ও আমাদের সঙ্গে ঠিক ফিট করবে না।

পল্টু বললো। প্রবীর কিন্তু ভালো রাঁধতে পারে। আর মালটাল আনা। কি নিবি আজকে? রাম?

তপন বললো, হেভি লেগে যাবে। পরে হেভ একদো।

ভাট্। সুজিত বললো, ঘাট-সত্তর এনাফ, পল্টু, তোর পারুরা।

শ্রীপর্ণা একটু গোলগাল। পুষ্ট শরীর। সাইকেলে তাকে আসতে দেখে পল্টু উঠে দাঁড়াল, তাহলে ওই প্রোগ্রামই রইল, ফাইনাল!

সুজিত বললো, ঘুরে আয়, এস্টিমেট করতে হবে।

শ্রীপর্ণার সাইকেল এগিয়ে গেল। পল্টু প্যাডেলে পা লাগালো।

তপনকে কাছে ডেকে নিয়ে সুজিত জিজ্ঞেস করলো, পারুরাকে বলেছিস?

বলেছি তো। কিন্তু শালার মেয়ে বড্ড চালু। কিছুতেই ঘাড় কাত করে না।

ভাট্ শালা।

জয়িতা আসছে সাইকেলে। মুখটা ঘুরিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো সুজিত। জয়িতা পাশ দিয়ে গেলে তপনকে জিজ্ঞেস করলো, খুব কাঁট আছে না মেয়েটার?

তপন রাস্তার দিকে একমনে মেয়ে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলো কার?

গোপার। এতদিন রাস্তায় ঘাঁড় করিয়ে গাইয়ো চুমা, চুমা দে। ওর বাবা হেভি জিনিস, তপন মাথা না ঘুরিয়ে বললো, যা করবি সামলে শুরু।

আমার চাই ওকে, বেঞ্চের ওপর ঘুঁষি মেরে বললো সুজিত, সেজন্যে আমি যে কোন রিস্ক নিতে রাজি।

সে তোর ব্যাপার। লাভ সব সময়ে অত জোর-জবরদস্তি করে হয় না!

তবে কি শালা ভেজলার মতো পায়ে পড়তে হবে।

ধীরেসুস্থে বস। মুভমেন্ট ওয়াচ করতে হবে। কিন্তু ট্যাকটিক্যাল অ্যাকশন নিতে হবে। লাভ ইজ এ ওয়ার। আসছে তোর পারুরা।

সুজিত দেখতে পেল গোপাকে। সাইকেলে মরালীর মত গ্রীবা উঁচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে গোপা। সুজিত তার সাইকেল নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। গোপা পাশ দিয়েই প্যাডেলে চাপ দিল সে। দ্রুত গোপার পাশাপাশি এসে গেল। এবার একটু এগিয়ে গিয়ে হ্যান্ডেলটা বেঁকিয়ে দিল। দ্রুত নিজের সাইকেল ঘুরিয়ে বাঁদিকে সরিয়ে নিয়ে বাগড় চোখে তাকালো সুজিতের দিকে। একটু এগিয়ে সুজিত আবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে গোপার রাস্তা অবস্ট্রাকশন করলো।

কেলা ইস্কুল পার হয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের আধাআধি সুজিত আবার সাইকেল ঘুরিয়ে গোপার রাস্তা আটকে দিল। বাধ্য হয়ে সাইকেল থেকে নেমে ক্ষুব্ধস্বরে গোপা জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাকে ডিসটার্ব করছেন কেন?

সুজিত মুচকি হেসে বললো, একটা কথা ছিল ডার্লিং।

অসভ্যের মত কথা বলছেন কেন? রাস্তা ছাড়ুন, কি চান আপনি?

মুচকি হেসে সুজিত ভঙ্গী করে বললো, ঘোড়া প্যার চাহিয়ে।

চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে গোপার। ক্ষুব্ধস্বরে বললো, অসভ্য, ইতর ছোটলোক কোথাকার?

লোকজন যাতায়াত করে এই রাস্তায়। কয়েকটা স্টল আছে। পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। একজন মাঝবয়সী লম্বা মত লোক গোপাকে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মা?

দেখুন না, ইস্কুলে যাচ্ছি। এ আমাকে রাস্তা আটকে নোংরা নোংরা কথা বলছে।

চেনো একে?

না কাকু। ক'দিন ধরে দেখছি সাইকেল নিয়ে আমার পিছনে আসে। রাস্তা আটকে নোংরা হিন্দি গান গায়। আজকে — ক্ষোভে কথা বলতে পারে না গোপা।

লোকটা সুজিতের কলার ধরে পাশে সরিয়ে দিয়ে হনহনিয়ে। মেয়েদের পিছনে লাগছিস কেন?

সুজিত লোকটার হাত টানতে টানতে বললো, কলার ছাড়ুন।

আবার পালে চড় কষিয়ে লোকটা বললো, কলার ছাড়ুন! রোমিওগিরি হচ্ছে?

এটা আমাদের প্রাইভেট ম্যাটার। আপনি মস্তানি মারছেন কেন? কলার ছাড়ুন।

আরে ওদেরও বাচ্চা, আমার মস্তানি তো দেখিসনি এখনো। অ্যাই নিত্য, শালার সাইকেল কাড়ো তো। মস্তানি কাকে বলে একটু দেখিয়ে দিই।

নিত্যকে চেনে সুজিত। পুলিশের কনস্টেবল। এ তাহলে পুলিশের অফিসার হবে। সুজিত বুঝতে পারলো যে ফাঁদে পড়ে গেছে। কিন্তু গোপার সামনে ওর প্রেস্টিজ পাচের হয়ে যেতে বসেছে। বললো, ও মিথ্যে বলছে।

আর তুই যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা। চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নিচে নামিয়ে দুম দুম করে পিঠে কিল বসালো দারোগা। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল সে। চল থানায়, একটু ভালো করে ধুনিয়ে দিই। রোমিওগিরি তাহলে ঘুচে যাবে। গোপার দিকে চেয়ে বললো। তুমি না ইস্কুলে যাও। তোমার নাম ঠিকানা বলতো?

ভিড় জমে গেছে। তার মধ্যে তপুনও আছে। নিত্য লোকটা ওর কলার ধরবে। এত হেনস্তা। এত অপমান! রাগে, দুঃখে, অপমানে ওর চোখ দুটো জড় জড় করছে। মাথাটা জ্বাম হয়ে গেছে। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে। ভেতরটা ওর শুকিয়ে যাচ্ছে।

থানা থেকে ছাড়া পেল বিকেল বেলা। ওর মন আর শরীর বিধ্বস্ত। সারাটা দিন প্রায় থানার বেঞ্চের পাশে উবু হয়ে বসে থাকতে হয়েছে। বন্ধুরা বাইরের গেটে উঁকিঝুঁকি মেরে ওর সাহস জুগিয়েছে। কৌতূহলী মানুষ রোমিওর বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে কৌতুক আর বাড়িয়েছে।

বিকেলের দিকে বাবা এল। সব শুনে নিজেও দু-চারটে থাপ্পর দিয়ে অফিসারকে বললো, বেশ করেছেন স্যার, ভাবতেই পারি না আমার ছেলে এমনটা হবে।

ঠাণ্ডা চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে অফিসার বললো, কি করেন আপনি?

কলেক্টরেটে কাজ করি।

এস ডি ওকে দিয়ে কোন করিয়েছিলেন আবার আমাকে বলছেন বেশ কাজ করেছি? ছেলে মস্তানি করছে, রোমিও হয়ে উঠেছে-লক্ষ্য রাখেন না কেন?

আজকালকার ছেলেদের ক্যারেক্টার ওইরকম স্যার। বাবা মা কাউকে মানতে চায় না।

ছেলেমেয়েদের ওপর দোষ চাপানোর আগে নিজেদের চরিত্র আর দায়িত্ব নিয়ে ভালো করে ভাবুন। ওদের সামনে যে রকম রাস্তা দেখাবেন ওরা সেই পথেই হাঁটবে।

সুজিতের বাবা চুপ করে রইল।

অফিসার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো, নিন সই করুন। পি আর হতে ছেড়ে দিচ্ছি। ছেলেকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আপনার। এরপর এসব করতে দেখলে সোজা চালান করে দেব।

বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে সুজিত দরজা বন্ধ করলো। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরালো। অপমানে আর গ্লানিতে ও বিধ্বস্ত। এরকম অপমানিত যে হতে পারে

কল্পনা করতে পারেনি। চিন্তা-ভাবনা সব ব্লাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে।

দরজায় টোকা। মা ডাকছে, দরজা খোল সুজিত।

কোন জবাব দিল না সে।

দরজার বাইরে থেকে মা বলছে, কিছু খেয়েনে সুজিত। সারাটা দিন না খেয়ে আছিস।

রুক্ষস্বরে সুজিত বলকালো, এখন যাও তুমি। একদম জ্বালাবে না।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে সে। উঠে বসেছে। মীনাক্ষীর পোস্টারের দিকে তাকালো। রাগে থুথু ছিটিয়ে দিল সে। তাকিয়ে আছে হাসি মুখে। গোপার কথা মনে পড়ল। দেমাক। সুন্দর মুখের দেমাক। আজ পর্যন্ত সুজিতকে কেউ রিজেক্ট করেনি। কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা না করলে এই অপমানের জ্বালা সে ভুলতে পারবে না।

আবার তাকালো সে মীনাক্ষীর পোস্টারের দিকে। মীনাক্ষীর মতো দেখতে! শালির এই মুখ আমি — হ্যাঁ। অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। সোজা হয়ে বসলো সে। এতোক্ষণে ঠিক ঠিক প্রতিশোধের উপায় খুঁজে বার করতে পেরে অপমানের জ্বালা একটু প্রশমিত হল।

ভোলা আর তনুময় সন্ধেবেলা এসে দেখা করে গেল। শান্তনা দিল সুজিতকে। একটি কথাও সে বললো না। তপন এল। পল্টু এল। গোপার সম্বন্ধে নানা অশ্লীল কথা বললো। খিস্তি দিলো। সুজিত কোন কথা বললো না।

তপন বললো, আজকের কিস্ট তাহলে বন্ধ থাক।

সুজিত হ্যাঁ না কিছুই বললো না।

ওরা চলে গেল ঘরের দরজা বন্ধ করে, সিগারেট ধরিয়ে নিজের স্থান নিয়ে ভাবতে লাগলো।

পরদিন সকালে সুজিত ঠেকে গেল না। বাজারে খোঁজ নিয়ে এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড কিনে ব্যাগে পুরে বাড়িতে এল। বইয়ের তাকের পিছনে লুকিয়ে রেখে বিছানায় শুয়ে থাকলো খানিক। পা নাচালো। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করলো। তারপর উঠে সাইকেল নিয়ে বেরোল স্পট ঠিক করতে।

পাইকপাড়ার ভেতর ওভ্রদের বাড়ির কাছেই গোপাদের বাড়ি। গোপা আর ওভ্রদের বাড়ির মাঝামাঝি যে বাঁক আছে ওই জায়গাটাই স্পট হিসেবে ঠিক করলো সে। এখানে লোকজন কম যাতায়াত করে। কিন্তু গোপা ওকে চিনতে পারলে? এই ব্যাপারটার সমাধান কিভাবে করা যায় ভাবতে ভাবতে ওভ্রদের দরজায় কড়া নাড়লো সে।

ওভ্রই দরজা খুললো কি খবর সুজিত? আয় ভেতরে আয়। সুজিত হেসে বললো, বহুদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তা বেশ করেছিস, ওভ্র হাসল, মা সুজিত এসেছে।

ছোটবেলায়, তখনো ইস্কুলে ভর্তি হয়নি, সুজিতরা এই পাড়ায় ভাড়া থাকত। ওভ্রদের পাশের বাড়িতে। সারাটা দিনই কাটতো ওভ্রদের বাড়িতে-ওভ্র আর ওর ভাই বোনদের সঙ্গে খেলা করে। তারপরে ইস্কুলে ভর্তি হল একই সঙ্গে, একই ইস্কুলে।

কবে থেকে ওভ্রদের সঙ্গে সম্পর্ক খণ্ডিত হল? ক্লাস সিক্স-এ পড়ার সময়। সুজিতদের বাড়ি তৈরি হল। ওরা উঠে এল ভাঙ্গালপাড়ায়। ওদের পারিবারিক জীবন-যাপনের পদ্ধতিটা কেমন যেন পাল্টে গেল। সুন্দর সাজানো বাড়ি, ফার্নিচারে আর আধুনিক উপকরণে সাজানো। সন্ধের পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবার মদের আড্ডা। বাবার বন্ধুদের সঙ্গে মায়ের হাল্কা চটুল রসিকতা। কেব্‌ল লাইন লাগানোর পর রাত জেগে সিনেমা দেখা।

বেপরোয়া বন্ধনহীন জীবনযাপনের স্বাদ পেতে আরম্ভ করলো সুজিত।

এখানেই ওভ্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেটে যেতে আরম্ভ করলো। ওভ্র শান্ত, ধিমতী, মেধাবী। পরিচ্ছন্ন চকচকে ছেলে সে, স্বভাবতই দুজনে দুদিকে দুধারায় বয়ে যেতে শুরু করলো।

ওভ্র নিজের ঘরে এনে বসালো সুজিতকে। বললো, কাল রাতে এসেছি কলকাতা থেকে। কেমন আছিস তোরা?

ভালো, সুজিত হাসল। অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বেশ করেছিস। মাকে ডাকি। তোকে দেখলে মা খুব খুশি হবে। মা বোধ হয় ঘুমুতে পারেনি তুই এসেছিস।

ওভ্র গিয়ে মাকে ডেকে নিয়ে এল। ওকে দেখে ওভ্রর মা বললেন, হ্যাঁরে সুজিত! এমন রুক্ষ লাগছে কেন তোকে? শরীর-টরির খারাপ নাকি?

সুজিত প্রণাম করে বললো, না ঠিক আছি মাসীমা।

ওভ্রর মা বললো, হ্যাঁরে তোর সম্বন্ধে যে নানারকম কথা শুনি? পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস তো? কতদিন যে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না!

আপনি চলুন না আমাদের বাড়ি? সুজিত বললো।

এই সংসারের ঝামেলা! পেরে উঠি না সময় করে। যাব একদিন সময় করে দেখিস!

হ্যাঁরে, লেখাপড়া ঠিকমতো করছিস তো? দেখ বাবা, জীবনে এই সময় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, একে অপচয় করলে আর পাবে না। আর ঠিকমতো কাজে লাগালে জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারবে। হ্যাঁরে, তোর বাবা মা সব কেমন আছে? একদিন আসতে বলিস মাকে?

এখন ওভ্রর জ্ঞান মারবে। সুজিত উঠে দাঁড়াল, আমি আসি মাসীমা।

সে কিরে! কতদিন পর এলি! ওভ্রর সঙ্গে গল্প কর। তোকে একটু মিষ্টি খাওয়াই। হ্যাঁরে, চানটান করে খেয়েই যা।

পরে একদিন খাব মাসীমা।

সুজিত বেরিয়ে এল। তার মাথায় এখন গোপা আর নাইট্রিক অ্যাসিড। ওভ্রর সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা যাবে না। মাসীমা জানে মেরে যাবে। গোপার বাড়ির পাশ দিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল সে।

এত তাড়াতাড়ি যে ওভ্রকে দেখতে হেতে হবে ভাবতে পারেনি সুজিত।

একটু আগে ঠেক ছেড়ে যে তার বাড়ি চলে গেছে। সড়ে নটার ভালো সিনেমা টিভিতে। নটায় একটু পরে তপন এল, লিগগির হাসপাতালে চল, তোর বন্ধু ওভ্র স্টাবড্ হয়েছে।

সে কিরে! আশ্চর্য হয়ে গেল সুজিত, আজ সকালে ওর সঙ্গে দেখা হল। ও তো কোন ঝামেলায় থাকে না! ওকে স্টাবড্ করবে কে?

সে সব অনেক কথা হাসপাতালে গিয়ে শুনবি।

হাসপাতালে ছুটলো সুজিত।

ওভ্রর সঙ্গে ছোটবেলা থেকে মিশছে সুজিত। এমনিতে সে শান্ত, ধিমতী, ধীর এবং ধৈর্যশীল। কিন্তু কাপুরুষ নয়, সামনে অন্যায় দেখলে মাথা নিচু করে পালিয়ে পথ খোঁজে না। মাসীমা সে জন্যেই ওকে গাড়ে তুলেছেন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে মাসীমার মধ্যে। কখনো অহেতুক প্রশ্রয় দেননি। কখনো কোন ব্যাপারে আদিখ্যেতা দেখাননি। কোন সমস্যা বা বিপদের মধ্যে পড়লে হাত বাড়িয়ে টেনে তোলেননি। অথচ বোঝা গেছে পরোক্ষ উৎসাহ বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে। অন্যায় করলে তীব্র ধিক্কার করেছেন, আবার ভালো কাজে তার সমর্থন জুগিয়েছেন সমস্তরকম অসুবিধা সত্ত্বেও। এমন সুস্থ সবল চরিত্র ওভ্র তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

আজ সন্ধেবেলা লালকুঠি পাড়া দিয়েছিল ওভ্র এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যেতে যেতে তপন সংক্ষেপে বলল, ফেরার পথে শর্টকাট করতে বাস স্ট্যান্ডের কাছে ফাঁকা গলি দিয়ে

আসছিল সে। ওখানে চোখে পড়ে একটা কোপের আড়ে একটা মেয়েকে টানাটানি করছে দুজিনটে লোক। জায়গাটা জনবিরল। মেয়েটা চিৎকার করছে। ব্যাপার দেখে ওত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানেই ও স্ট্যাবড হয়।

একটু আগে ও টি থেকে বার করে আনা হয়েছে ওত্রকে। নাকে অক্সিজেন নল। ব্লাড আর স্যালাইন চলছে। ওত্রর মা, বোন আর কয়েকজন ডেকে কাছে। নিচে একটা জমায়েত দেখে এসেছে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে। ওরা ওত্রর জন্যে আসছে।

সুজিত জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছে এখন ও?

ওত্রর মা বললো, আছ সুজিত, সকালে ডেথ সার্টে দেখা হল আর সন্ধেতে এই ঘটনা।

উর্দি/কুড়ির একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে মাসীমার পাশে। মুখে চোখে আশঙ্কা, অনুরোধের ছাপ। তখন বললো, এই মেয়েটি।

সুজিত বলে ফেললো, আপনার জন্যে ওত্রর এই দশা।

কেন ওকে এ কথা বলছিস? ওত্রর মা ধমকে উঠলো, ওর কি দোষ? একটা মেয়ে বাড়ির বেরিয়েছে সন্ধেবেলা, কাজে হোক আর যেকারণেই হোক, তার একটা নিরাপত্তা থাকবে না? অতগুলো জন্তু-জানোয়ারের কলকাইসি দেখে ছাড় ওটিয়ে পালিয়ে আসতে হবে না কি?

সুজিত বললো, কিন্তু এইরকম বিপদ মাসীমা।

বিপদ তো জীবনে যেকোন সময়েই হতে পারে সুজিত। এই মেয়েটা না হয়ে যদি আমার মেয়ে নন্দিতা এইরকম অবস্থায় পড়তো আর তুই যদি দেখতে পেতিস তাহলে? পালিয়ে আসতিস? আসতে পারতিস পালিয়ে?

সুজিত বললো, না মাসীমা।

তাহলে? তাহলে তুই বল্ সুজিত? আমাকে তো তুই দেখছিস এতদিন ধরে, আমার ছেলেমেয়েরা ভেতরার মত, কাপুরুষের মত জীবন কাটাবে এই আমি কখনই চাইবো না। এতবড় একটা অন্যায় চোখের সামনে ঘটছে আর ওতো মুখ লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে — এ যদি জানতাম তাহলে ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিতাম না।

ওত্রর মা একটু থেমে আবার বললো, আমার ছেলে মরে যেতে পারতো, না হিসেবে আমার ভিতরটা কি পাথর হয়ে যেত না, কোন মায়ের তা না বায় বল? কিন্তু ভাবতাম আমার ছেলে একজন বীরের মত, মানুষের মত কাজ করতে গিয়ে মরে গেছে। অনেক মেধাবী ছেলে আছে, তারা শুধু নিজের জন্যে, স্বার্থপরের মত বাঁচে। অন্তত ওতো সেরকম নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

সুজিত ভাবলো, সোপাকে ও টিজ করছে বলে, ওত্র যদি ওখানে থাকতো, তাহলে? মাসীমা কি জানে সোপাকে ও টিজ করছে?

নিজের ভেতরটা গ্লানি আর সঙ্কোচে ভরে গেল। অনেক বড় মনে হল ওত্রকে। ওর শান্তিত দেহ হাসপাতালের এই বেড। ওর মা। এতগুলো মানুষ ওর মঙ্গল কামনা করছে। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে যে ভীড় দেখে এসেছে ওরা তো সবাই এসেছে ওত্রর জন্যে, একজন মানুষের মত কাজ করেছে ওত্র এই ভেবেই তো, তার মহানতার প্রতি আন্তরিক টানেই তো এসেছে।

নিজের কথা মনে পড়ল সুজিত। সেদিন যখন পুলিশের দারোগা কলার ধরে হেঁচড় নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে তো অনেক লোকের ভীড় জমেছিল। কোন্ ভাবনা নিয়ে তারা দেখছিল সুজিতকে, ঘেন্না নিয়ে? একটা জন্তুকে দেখছিল তারা? নিজের ভেতরটা অসুচিতায় ভরে গেল তার। এই পরিবেশের মধ্যে থাকার কোন অধিকার নেই।

জীবনকে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় ওত্র তা জেনেছে, শিখেছে। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেই তো সে শিখেছে? ওর মা হয়তো সাহায্য করেছে। আর সে? পাশাপাশি তো প্রায় বড় হয়ে উঠেছে। অথচ নিজের জীবনকে কী তুচ্ছ কদর্থে নিয়ে চলেছে। কত কৃপণভাবে ব্যবহার করছে জীবনকে। এই বিভেদ রেখা তাকে আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলল। ❑

'শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে'

—রবীন্দ্রনাথ

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ

বারুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম- পোঃ - বারুল, জেলা - হালি

রেজিঃ নং - ৩৮ এইচ জি ; তারিখ - ১৬-৩-৬০

গৌরহরি পাল
সভাপতি

জয়ন্ত চক্রবর্তী
সম্পাদক

পতিতপাবন চৌধুরী
প্রবন্ধক

With

Co-operative

Greetings

M. R. Plastics

MANUFACTURER OF

FIBRE GLASS REINFORCED PLASTICS PRODUCTS

WORKS :

147/A, DAWANGAZI ROAD
BALLY, HOWRAH-711 201
PHONE 654-3048

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED

10. NELLIE SENGUPTA SARANI. (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 087
TELEGRAM CENTSAMABA

- *Share Capital* — *More than one Crore*
- *Working Capital* — *More than Eleven Crores*
- *Serves more than 7,500 members in Eastern India.*
- *Offers Loan Facility Rs. 40,000/- (maximum)*

Runs Eight Holiday Home at — ★ *Bakkhali* ★ *Calcutta* ★ *Digha* ★ *Puri* ★ *Rajgir* ★ *Darjeeling* ★ *Santiniketan* ★ *Varanasi*

Extends many more facilities under social benefit scheme.

প্রবন্ধ

প্রকৃতির নির্বাচন

তরুণ সান্যাল

টুকুমার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অন্তত কিছুটা খাদ্য। 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'— মনে পড়ে। প্রকৃতির শীত-গ্রীষ্মের নরম বা চরম অবস্থা সইবার জন্য জীব তার ইন্দ্রিয়গুলিকে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে। কিন্তু পেট না ভরলে পিঠে সইবে কেন ঐসব চরম ঋতু ও পরিবেশের আক্রমণ?

কিন্তু জন্ম নিয়েছে এমন সব প্রজাতি, সবারই হয়তো প্রকৃতির যোগান দেওয়া কোন উপকরণটিই বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। এ-প্রজাতি ও-প্রজাতির মধ্যে প্রথমে চলে শান্ত প্রতিযোগিতা, পরে দাঁতে রক্ত, নখে রক্ত চলে এ ওকে ঠেলে বের করে দেবার দৈরথ। ঐ মরণপণ দৈরথে কত প্রজাতিই নাকি পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এক দল খাবে তো অন্য দল খেতে পাবে না। যারা অঞ্চল ছেড়ে ভিন্ন অঞ্চলে যাবার সুযোগ পেল, সেখানকার ঘাসপাতায় যদি সে বাঁচল তো বাঁচল। সেখানেওতো রয়েছে প্রতিযোগিতা। এই প্রক্রিয়ার নামই হেরবার্ট স্পেনসারের কথায় সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। 'যোগ্যতমেরই টিকে থাকার' প্রক্রিয়ার অন্তঃসার। খাবার যেখানে যথেষ্ট নয়, নানা প্রজাতিও যেখানে নেই, একটি-দুটি প্রজাতিই প্রকৃতির যোগান দেওয়া ঘাসপাতার পরিমাণের সঙ্গেই তখন তারা নিজেদের মিলিয়ে দেয়। ব্রিটেনের খুব কাছের দ্বীপ সেটল্যাণ্ড। সেখানে ছোট্টখাট্ট, প্রায় আমাদের দেশি কুকুরের মাপের ঘোড়া পাওয়া যায়। একসময় বলা হত সেটল্যাণ্ডের ঘোড়া নূন ঘোড়ার প্রজাতির থেকে ভিন্ন। কিন্তু সেটল্যাণ্ডের ঘোড়া অঢেল ঘাস যোগানের তৃণভূমি প্রেইরির চারণভূমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল দু-তিন প্রজন্মেই তারা সাধারণ মাপের ঘোড়ার রূপ ও গড়ন পেয়েছে। ঐ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার যোগানের ওপর ভিত্তি করে কোন জীব কোন প্রজাতি টিকে থাকবে একে ডারউইন নাম দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন, ন্যাচারাল সিলেকশন। ন্যাচারাল সিলেকশনই বলি, আর সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্টই বলি, দুটি অভিধার লক্ষ্য প্রজাতি, কোন প্রজাতির অংশবিশেষ নয়। অংশবিশেষ বদলেই তবে নেবে স্বপ্রজাতি বিশিষ্ট প্রজাতির আত্মহত্যার পথ।

মানুষের সভ্যতার শুরু তো বেশি দিনের নয়। সম্ভবত দু-সাত হাজার বছর মাত্র। মানুষের জন্ম নাকি প্রজাতি হিসাবে দশ লক্ষ বছরের আগে পরে। নয়লক্ষ তিরানব্বই বা চুরানব্বই হাজার বছর মানুষ অসভ্য ছিল। কিন্তু কিছু প্রকৃতির উপকরণকে বদলাতে শিখেছিল। পুরানো পাথরের যুগে, নতুন পাথরের যুগে, মানুষের সভ্যতা-পূর্ব বর্বরতার পর্যায়ে। এসব পর্যায়ে মানুষের অস্তিত্ব ছিল বাঘ ভাল্লুক, বুনো ঘোড়া-গরু-মোষের মতো প্রকৃতিতে যেমনটি পাই তেমনটি খাই গোছের। বর্বরতার পর্যায়ে চাষ আবাদ, পশুপালনের একটু আধটু মুখ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতিকে মানুষের শ্রম আর মানুষের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করে মোহন করা তেমন হয়ে ওঠেনি। যেমন যেমন হাতিয়ার ব্যবহারের কলাকৌশল উন্নত হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, উৎপাদিত সামগ্রীর নানান রকম দেখা গেছে। ভোগ করার পরেও উৎপন্ন সামগ্রীর অনেকটাই বেঁচে গেছে। পরিকল্পনা মাফিক ঐ সঞ্চয় ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রাম-শহর-রাস্তা-ঘাট। গড়ে উঠেছে রাজা-প্রজা-লোকলস্কর-শিক্ষক-ছাত্র-ওস্ত নানান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। ঐ যে সঞ্চয় গড়ে ওঠা সমাজে নানা রকমের কাজকর্ম, জীবিকা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠল ঐ ব্যবস্থারই নাম সভ্যতা। ইউরোপে শহর গড়ে উঠেছিল এভাবে, আর শহরগুলিতেই ছিল সমাজে দলবদ্ধতা গড়ে তোলার নিয়মকানুন। ঐ সিভিটাস বা শহরের নিয়মকানুন মেনে চলা সংস্থার সভ্য বা সদস্যরাই গড়েছে নগরভিত্তিক সভ্যতা, সিভিলাইজেশন। ভারতের মতো দেশে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রথম শহরে নয়, গ্রামে। সিভিলাইজেশনের আমরা অনুবাদ করেছি 'সভ্যতা' শব্দ দিয়ে। যেমন রিলিজিয়নকে ধর্ম দিয়ে। কিন্তু সভ্যতা নিশ্চিত সিভিলাইজেশনের দূরতম প্রতিধ্বনি হলেও হতে পারে। কিন্তু রিলিজিয়নের প্রতিশব্দ ধর্ম? কখনও নয়। হয়তো সিভিলাইজেশনের ভারতীয় রূপ ছিল 'সদাচার'. কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সদাচার কালচারকে বোঝায়। শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা মহারাষ্ট্র থেকে ধার করে এনেছে কালচারের প্রতিশব্দ হিসাবে সংস্কৃতি।

সদাচার-সভ্যতা-সংস্কৃতির কচকচি থাক। আমরা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরি। ঐ যে কোন্ প্রজাতি টিকে থাকবে, কোন্ প্রজাতি টিকতে পারবে না — এই বিষয়টি দুর্জনেরা সমাজেও প্রয়োগ করার কথা ভেবেছে। এতে নানা নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ে মতবাদ তৈরি হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে একদল পশ্চিমী পণ্ডিতেরাই বললেন উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষাগুলির মিল রয়েছে। একসময় এদের ভাষার উৎস ছিল একটিই নৃগোষ্ঠী। তারা সেখান সেখান ছড়িয়ে পড়েছে। একজন পণ্ডিত তো বলেই ফেললেন, বাঙালি একজন ইংরেজ বা ফরাসী এবং ইংরেজ ফরাসীরা বঙ্গসন্তান, দু-জনের পূর্বপুরুষ কয় প্রজন্ম পেছিয়ে গেলে হয়তো একজনই ছিলেন। ব্যস, সদ্ভাবনায় তাতে খুব গোসা হল। বাজার জাত বাদে কথা বাজার জাতে ভাষা-রক্ত-নৃগোষ্ঠী সব কিছুই ভিন্ন। প্রয়োজনে ইংল্যাণ্ডে চালু আইন বিকৃত করে নয়ারাজ্য নরকুমারের ফাঁসি দেওয়া চলবে। কিন্তু ভারতীয় ও ইংরেজের একই ভারতীয় আইনানুগ বিচার হবে? সে ইচ্ছাটা বিল কভি চলেগে নেহি।

এমনিতেই শাদক-শোষক জাতি, শাসিত ও শোষিত জাতি তো ডারউইনের মূল্যায়নের আগে থেকেই ছিল। ডারউইনতো মানুষে মানুষে ভেদ দেখেননি, কালো-সাদা-হলদে-বাদামি সব মানুষ নিয়েই উঁর কাছে ছিল 'মানব প্রজাতি'। স্বয়ং তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল প্রধানে আফ্রিকাতেই। মানব হিটলার ডারউইনের মতো বিকৃত করে পৃথিবীতে বাকলিটি ও পণ্ডিতি করা বর্ণবেষী ব্যক্তিদের অভাব নেই। ইউরোপেই ভাগ করে দেখা হয়েছে আংলো-স্যাকসন, লাতিন, গল, টিউটন, নর্ডিক, স্লাভ — নানা নৃগোষ্ঠীর মানুষকে। হিটলার এই বিভাজন লুফে নিয়েছিলেন। হিটলার তো

আর্য জাতির মানুষ বলে জার্মানদের ঘোষণা করে গল (ফ্রান্স), অ্যাংলো-স্যাকসন (ব্রিটেন), লাতিন (স্পেন-ইতালি-রুমানিয়া), স্লাভ (বিশেষকরে রুশ) নানা নৃগোষ্ঠীকে নানাভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের লোকজনের ধমনীতে যেহেতু স্যাকসন রক্ত আছে, তাই তারা জার্মানদের আপনজন হতে পারে। গলরা হল মেধেলি জাত। লাতিনদের সঙ্গে জার্মানদের বৈর সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্লাভরা দাসের জাতি। এই নীচু জাতের মানুষজনের ভবিতব্য জার্মান টিউটনদের দাস হওয়া। ওদের কতজনকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, কতজনকে খতম করা হবে, সবটাই নির্ভর করছে 'বাঁচার জায়গা' বা লিবেন্সরাউমের সম্ভাব্য বিস্তার ও পরিধির উপর। তাই ১৯৪১ সালের ২২ জুন কোন ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা না করেই তিন হাজার কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে নাৎসি জার্মানি অপারেশন বারবারোসা নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। হিটলার ডারউইনকেই গুরু বরেছিলেন স্লাভদের খতম করতে। ছাঁ লক্ষ ইহুদিকে খতম করেছিলেন। ইহুদিদের মানুষ প্রজাতির মধ্যেই প্রায় গণ্য না করে। ইহুদিদের খতম করার নাম ছিল নাৎসিদের কাছে 'স্থায়ী সমাধান', পার্মানেন্ট সলিউশন।

মার্কস ছিলেন মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান. তিনি সমাজ বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। বিশেষ সঙ্কটের কালে শোষিত শ্রেণী শোষকদের ব্যবস্থা বলপ্রয়োগ করে ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু তখনই বলেননি পরাস্ত শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষগুলিকে খতম করো। বলেননি, বিপ্লবের বিজয় নিশ্চয় করতে গেলে প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরোধীদের খুন করো। কিন্তু মার্কসের নাম করেই কত খুনেরই না বীভৎসতা ঘটেছে। কাম্বুচিয়ার পলপটের শাসন তার জলন্ত সাক্ষী।

আমাদের নীরদ সি চৌধুরী তো খুবই পশ্চিমের ভক্ত। তাঁর লেখা একটি বই আছে 'দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি'। সার্সি ছিল প্রাচীন গ্রিক উপকথার এক মায়াবিনী। সার্সি তার ইচ্ছামতো অন্য কাউকে শুওর-ভেড়া বা কিছু বানাতে পারতো। নিজেও ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো। পথ হারানো ওদেসিউস-এর জাহাজের নাবিকদের সে বানিয়েছিল ভেড়া। নিজে সেজেছিল ওদেসিউসের বৌ পেনিলোপি। আর ওদেসিউসের মাথাও করেছিল জোরবার। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাই মনে করেছেন, ভারতে ক-হাজার বছর আগে আগন্তুক 'আর্য'রা এদেশের জল হাওয়ায় ভেড়া বনে গেছে। ব্রিটিশদেরও নাকি দুশো বছরেই হাড়ে নোনা ধরে গেছে। ভারতীয় আর্যবংশ অবতংশদের আর যেমন দাপট নেই, তেমনি ইংরেজরাও শেষ পর্যন্ত দাঁতে কুটো নিয়ে ভারত ছেড়েছে। এই ধরনের রচনা আসলে বর্ণবৈষম্যবাদের ভিত তৈরি করে। নীরদবাবু আক্রমণকারী বহিরাগত আর্যদের কথা ভেবেছেন। এদেশে তার আগেও তো (মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা) যে সভ্য মানুষ ছিল। ছিল আদ্যিক-মেডেলয়েড দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। তাদের ওপর দাপট দেখানোটাই ছিল আর্যদের। নীরদবাবুর মনে রইল না এই ভারতে জেট-মোঙ্গল-অস্ট্রিক-নরগোষ্ঠীও আছে। আছে সারাসেন-নেগ্রিটোরও ছিটেফোঁটা। রয়েছে বিপুল দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। এদের মিশ্রণেই নানা রঙের মানুষ গড়ে তুলেছে এক মোজাইক।

দেশে দেশে এই যে নৃগোষ্ঠী অনুযায়ী উঁচুনীচু ধারনা তৈরি করার জন্য প্রচার ও আন্দোলন কার্যত এরেই কোন বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর শোষক-শোষিতের মধ্যে বিভাজন তুলিয়ে নিতে চায়। হিটলার জার্মানিতে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখেছেন, বলেছেন সব জার্মান ভাই ভাই। ইহুদি, জিপসিদের বাদে মানবতাবাদী যে কোন মানুষকেই শেষ করে দাও। ভিন্ন জাতির মানুষকে দাস বানাও। তাতে জার্মানদের নিঃশ্বাস ফেলার ঠাঁই বাড়বে। ইজ্জৎ বাড়বে। ওদিকে একচেটিয়াপতিদের মুনাফা বাড়ছিল দাস মজুর ব্যবহার করে। তাদের বাজার বাড়ছিল পরাজিত দেশগুলিতে। বিভিন্নবাটা বাড়িয়ে ও ফাঁচানাল আর দাসশ্রমিক সংগ্রহ করে। খুনি এস এস বাহিনীকে লাগানো হয়েছিল এই কাজে। জার্মান সৈন্য কেন রুশক্ষেত্রে মরছিল? জার্মান কোটিপতিদের স্বার্থে। কোটিপতিদের প্রতিক্রিয়া নেতা হোজেনবার্গ, প্রয়োগকর্তা হিটলার-হিমলার-গোরেরিং-গোয়েবেলস। এমনি ইতালির ফ্যাসিস্ট স্টেটের প্রধান মুসোলিনি। এই ফ্যাসিস্তরা একটি সঙ্কীর্ণ শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থে জাতির অন্তর্গত সব মানুষকে তাদের নিজ স্বার্থ বিসর্জনের ডাক দেয়।

ইউরোপে তবু ভাল। এক একটি অঞ্চলে এক এক জনগোষ্ঠীর বাস। তারা এক একটি জাতি। এই এক একটি জাতির মাথা মুড়িয়ে পরজাতি বিদ্বেষীরা নানা যাদুকরী কথার প্রভাবে ধনী-নির্ধন-শোষক-শোষিতদের এক কাতারে সামিল করে। এরা ভিন্ন জাত বিদ্বেষী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী। সন্ত্রাসমূলক হয়ে উঠে যখন এক চেটিয়া পুঁজিপতিদের পুষ্ট করে। তারা হয়ে পড়ে ফ্যাসিস্ত। আবার যারা শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, তারা এক জাতির মধ্যে বিপরীত স্বার্থের মানুষ দেখতে পায়। শোষিতদের নিয়ে তারা দল গড়ে। এদেশ সেদেশ নানা দেশের নানা জাতির শোষিত মানুষদের মিলিয়ে দিতে চায় তারা। এরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। এরা প্রজাতিবাদের বিকৃত ডারউইনবাদীদের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ। এরা শোষক পুঁজির প্রতিপক্ষ হিসাবে শোষিত ও দুর্বল মানুষজনকে সবরায় আন্দোলনেও সমবেত করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, নানা জাতির শোষক-শাসকেরাও নিজের দেশ নিয়েও ডারউইনেরই দোহাই দেয়। বলে, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা হেরে গেছে তারা বাতিল মানুষ। তাদের কাজ জয়ী শ্রেণীগুলিকে সেবা করা। নিতান্ত অর্থনীতিতে গণ্ডি বলেই মজুর মজুর হয়েছে। পুঁজিরা নিরিখের ধনী ধনী। পুঁজিপতি পুঁজিপতি। সুতরাং মিলন করার উপায় কোথায়?

এই ধরনের চিন্তা কিন্তু ভয়ঙ্কর ভবিতব্যের কথা বলে। যদি বলি 'রণবাদ্য বাজি জয়গান গাহি উল্লাস কলরবে / তেমি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল' — তারা নানাভাবে মিলেমিশে গেলেও সমাজে তবু নানাভাবে বৈপরীত্য রয়েই গেছে। উচ্চবর্ণ রয়েছে, নিম্নবর্ণের মানুষ আছে হিন্দু সমাজে। উচ্চবর্ণের মানুষজনই এতদিন নানা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে বা আপোষে নেতৃত্ব দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের নাম করে যে বিরোধ ভারত-পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল, সেখানে ধর্মের নামাবলী জড়ানো নেতাদের মধ্যে ছিল শোষক-শোষিতের এক কাতারে বসানোর অভিসন্ধি। ছিল ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলা বিদ্বেষ। বিকৃত ডারউইনবাদ। মুসলিম লিগের কাছে ছিল হিন্দু আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ভিন্ন রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য। আসলে তা ছিল ডারউইনবাদের বিকৃতি। বর্তমান ভারতে এই যে মুসলমান-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নানা আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে, ভারতীয় সংস্কৃতির পবিত্রতার নামে, এও এক বিকৃত ডারউইনবাদ। ফ্যাসিজমই এর অন্তর্বস্তু। এই বিকৃতি জাতিকে দুর্বল করে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পঙ্গু করে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষে একদল হিন্দুত্ববাদী তবু বর্ণভিত্তিক ধর্মই দেখছেন, দেখছেন না

রাজনীতি করা ভোটবাগিশ উচ্চবর্ণের নেতাদের প্রতিপক্ষ হবে আসন্ন তফসিলি ও অন্য পিছড়ে বর্গের ভোটলোভী নেতারাও। ভারত ঘটতে চলেছে ভারতভূমিতে উচ্চনীচ সামাজিক অবস্থানের মানুষদের মধ্যে সম্ভাব্য জাতভিত্তিক লড়াই। ডারউইনবাদের ঘা বিকৃতি। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কব্জা করার জন্য লড়াই। যেন এক 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র অঙ্ক খেলা।

উচ্চবর্ণের হাতে এখন বিচার বিভাগ-প্রশাসন-সমরযন্ত্র সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ছবিটি বদলে যেতে কতক্ষণ। ফ্রান্সিস্কো উচ্চজাতের নেতাদের যেমন চিন্তার ভিত্তি, নীচুজাতেরও ভিত্তি হতে তা বাধা নেই। আর এই অবস্থায় কিন্তু উচ্চনীচ দুই সমস্তরের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের এক কাতারে নিলতে হবে। তাছাড়া গতি নেই। উচ্চজাতের হাতে যে সরকার রয়েছে, তারা পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে, তাদের সামর্থ্য দেখাতে। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল কাদের হাতে নিশ্চিন্ত হবে এখনো তা স্পষ্ট নয়। মনে রাখা দরকার, ভারতে কেবল বাঙালি-ওড়িয়া-অহমিয়া-পঞ্জাবি-গুজরাটি প্রভৃতি জাতিই নেই, রয়েছে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের ভারতব্যাপী অনুভূমিক সমাজ (নাকি শোষিত পরিচয়ের নরগোষ্ঠী), আর রয়েছে আর্য অধ্যুষিত উত্তর ভারত, দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণ ভারত। রয়েছে উত্তর-পূর্বে নানা জাতি অধ্যুষিত নানা রাজ্য ও অঞ্চল। তাদের ভাষা না ইন্দোইউরোপীয় না দ্রাবিড়। এবং নানা ধর্ম ও ভাষা অনুগত ছোটবড় জনগোষ্ঠী এদেশে কোন ভাষা বা গোষ্ঠীর প্রাধান্যের কথা ভাবলেই মনে পড়বে, বিকলাঙ্গ ডারউইনবাদ। হিন্দুত্ব বা হিন্দিভাষা প্রচারের ব্যাপারেও এই সত্য ভুলে যাবার নয়। যে রাস্তায় দেবদূতেরাও পা ফেলতে ভয় পায়, আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসেই ঘাড়েগর্দানে ভয় স্বভাবে পেয়েছি যে নির্বিকারভাবে আমাদের এই দুর্মিত ব্যবস্থার চীনামাটির বাসনপত্তরগুলোকে ঠুকে পড়েছি আর ওঁতোচ্ছি ও লাথি ছুঁড়ছি।

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

জেরুড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ১১২ তাং ২৬-৭-৬৩

গ্রাম - বালিডাঙা পোঃ খানপুর জেলা : হুগলি

বেচারাম সাঁতরা
সভাপতি

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক

নিতাইচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক

আপনাদের সেবায় —

হরিনারায়ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং ৮ নিড-১ তারিখ ২৫-৭-৬৪

: - মালিঘাটা, থানা : ডেবরা, জেলা : মেদিনীপুর

আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় প্রকল্প (ব্যাঙ্কিং বিভাগ) সঞ্চয়ে গোপনীয়তা, অধিক সুদ, নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি।

কৃষকদের প্রয়োজনে কৃষিঋণ দাদন করা হয়।
এবং বাড়ি তৈরির কাজে অরগেট সাঁট ও সিমেন্ট বিক্রি হয়।

বন্ধকি কারবার আপনার জানবেন বন্ধু কাঁসা, পিতল, কৃষকদের উৎপন্ন ধান-চাল-বাসন চাকুরিজীবীদের চাকুরি বন্ধক ও ছোট ছোট দোকানদারদের দোকান বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়

বৈচিত্র্যে ভরা বস্ত্র বিভাগ, মনের মতো শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি পাওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রসাধনি ও স্টেশনারি, বেবিফুড, কাড়াই কৃষিমাল ও ডেলিভারি পাইপ পাওয়া যায় এবং রেশন দোকান রহিয়াছে।

কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় ডিজেল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, মহুয়া খইল ও চুন বিক্রয় হয়।

কৃষকদের মধ্যে বীজ আলু, বীজ বাদাম, বীজ ধান সরবরাহ করিয়া থাকি

শাখা অফিস : পটিনা বাজার ও জাল বাঁধ, ডেবরা মার্কেটিং এ ইজকো ওয়ার হাউস

অফিস সময় : সোম, মঙ্গল ও শনিবার সকাল ৮-১২টা, দুপুর ২-৪টা, রবি ও বুধবার ১০-৪টা, বৃহস্পতিবার ৮-১২টা (অর্ধদিবস) ও ৩রবার বন্ধ

সভাপতি - কানাইলাল মাইতি সম্পাদক - রতনচন্দ্র জানা ম্যানেজার - কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল হিসাবরক্ষক - রাজকৃষ্ণ বুঁদ্রা

Enjoy

Holiday

at

our

☆ **Digha** ☆

☆ **Rajgir** ☆

☆ **Darjeeling** ☆

HOLIDAY HOME

Please Contact with

C. S. I. C. EMP. COOP. CREDIT SOCIETY LTD.

45, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA - 700 013
PHONE : 27-1217

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন...
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩০২১

ময়নাপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : গ্রাম ও ডাকঘর : ময়নাপুর, জেলা : বাঁকুড়া
শাখা কার্যালয় : গ্রাম ও ডাকঘর : আসুরালী, জেলা : বাঁকুড়া
রেজিঃ নং : ১৬ বি কে, তারিখ : ১৬.২.৭৩
(অন্যতম অংশীদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

- ✧ বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম সমবায় সমিতি।
- ✧ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বারা শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত।
- ✧ ২.৫ কোটি টাকার তামানত সংগ্রহ।
- ✧ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দাদনের সুব্যবস্থা।
- ✧ নিজস্ব দ্বিতল গৃহে সকাল-বিকাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা।
- ✧ কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার কৃষকের প্রয়োজনে সরবরাহ।

  ফসল বন্ধকি ঋণ, স্বর্ণবন্ধকি ঋণের ব্যবস্থা।
- ✧ সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সদস্যদের বিনাপয়সার চিকিৎসা এবং দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের পঠনপাঠনে সবরকমের সাহায্য।
- ✧ প্রতিবছর পঞ্চায়েতের সাথে যৌথ উদ্যোগে কৃষিমেলার আয়োজন।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী
সভাপতি

সামিদ জমাদার
সম্পাদক

ড়া জ গ
ক্রী ৎ

টোটাল ফুটবল এবং এবারের বিশ্বকাপ

অর্ণব ঘোষ

আর মাত্র বছর আবার হবে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে সবাই এই বলে ধনি দেবে — আসছে বছর আবার হবে। শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপের ওপর যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের ভাঙা হাটের মধ্য দিয়ে শুরু হল একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বের পূর্বতম দেশে জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ায়। অবশ্য আসছে বছর নয়, চার বছর পর ২০০২ সালে। তবে সুরটা মূলত এক — একটা সমাপ্তির বাজনার ভেতর থেকে আর একটি আবাহনীর সানাই-এর শব্দ ভেসে আসে।

দলগুলোর বিগত চার বছর ধরে তিল তিল করে চারা গাছ থেকে মহীরুহ তৈরি করার পিছনে যে নিবিড় আত্মনিয়োগ, অনুশীলন এসবের শেষ হল। পাড়ায় পাড়ায় রোনাল্ডো, ওর্তেগা, রিভাল্ডো, আওয়েন, বাতিস্তুতা, বার্গক্যাম্প, জিদান, সুকেরদের বাঁধভাঙা উল্লাসের সমাপ্তি ঘটল। আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে হবে নতুন প্রজন্মের, আগামী শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপের জন্য। এর মধ্যে কত তারকা চলে যাবে বিশ্বকাপের আঙিনা থেকে জার্মানির ক্রিস্টেন কোলকে, লোথার ম্যাথিউস, বুরগেন ক্লিনসম্যান, কলম্বিয়ার ভালদেরামা, অস্ট্রিয়া, রুমানিয়ার জিওর্জে হাজি, ব্রাজিলের দুঙ্গা, বেবেতো, ইতালির বার্গোমি, রবার্তো ব্যাজিও, ক্যামেরুনের ঙ্কনেয়ো বিহ্নি, ডেনমার্কের মাইকেল লাউড্রুপ, পিটার স্কিমিকেল, স্পেনের জুবিজারেতা — আরও কত কে? এবারের বিশ্বকাপ ট্রফি জিতল ফ্রান্স আর হারল কে? কেউ না। আসলে কেউ হারে না, জেতেও না কেউ, প্রকৃত জিৎ ফুটবলের।

শারিস্থকাপ গত দুটো বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারেনি চিলি। এবারে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত — শুধু তাই নয়, দুই মূল্যবান ফুটবলার উপহার দিয়েছে — মার্সেলো সালাস ও জামোরানো। ফ্রান্স গত দুই বিশ্বকাপে ফাইনাল রাউন্ডে আসতেই পারেনি। আর এবারে একেবারে চ্যাম্পিয়ন। তবে এবারের ফাইনাল সবাইকে হতাশ করেছে। 'ব্রাজিল' 'ব্রাজিল' করে ভক্তদের পারদটা অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল, সেখান থেকে একেবারে ধরাশায়ী। এটা ঠিক, ব্রাজিল দলের অন্তর্কলহ দলটার সর্বনাশ করে দিল। দুটো ম্যাচ সত্যিই খুব ধাক্কা দিয়েছে আমাদের — কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির মুখে যাওয়া ক্রোয়েশিয়ার কাছে তিন গোলে, আর ফাইনালে ব্রাজিলের কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ।

বিশ্ব ফুটবলে চমক দিয়েছে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হল কোন স্ট্রাইকার ছাড়া। ফ্রান্সকে প্রকৃত লড়াই করতে হয় দ্বিতীয় রাউন্ডে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে। একশ চোদ্দ মিনিট খেলার পর জয় আসে সঁলার লম্বা শটে গোল্ডেন গোলে, ইতালির বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জিতে। সেমিফাইনালে দুটি গোলই করেন উইংবোক থুরাম। ফাইনালের তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি আসে জিদানের হেড থেকে, আর শেষটা করেন আর এক মাঝমাঠের খেলোয়াড় - পেতি। স্ট্রাইকারের দুর্বলতাটা পুষিয়ে দিয়েছে জন্যরা। রোনাল্ডো, সুকেরের মত স্ট্রাইকার পেলে ওরা গোলের বন্যা বইয়ে দিতে পারত।

হল্যান্ডের পূর্বতন জাতীয় ফুটবল কোচ রেনাস মিশেলস 'টোটাল ফুটবল' চালু করেন সত্তরের দশকে। এবারের বিশ্বকাপে দুটি দলের মধ্যে টোটাল ফুটবলের ছোঁয়া দেখা গেল। হল্যান্ড ৫-০ টাইব্রেকারে ব্রাজিলের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল। আর ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাত্রা শেষ করল।

এখানে উল্লেখ করা ভাল, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপ — দুই মহাদেশের দলগুলো দুটো ভিন্ন ধরনের ফুটবল খেলে। লাতিন আমেরিকান ফুটবল সবার কাছে জনপ্রিয়, কারণ ওদের খেলায় মানবতা থাকে — থাকে ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলী ছিল। জয় ওরা একটু গোলের গোল খেলে। গোল হয় বেশি। আর কোকে গ্রে গোল দেখতেই আসে। আর্জেন্টিনা গ্রুপ এইট লিগ ম্যাচে জামাইকাকে ৫-০ গোলে পর্যুদস্ত করে, বাতিস্তুতা রেকর্ড কম সময়ে হ্যাটট্রিক করেন। কিন্তু ইউরোপীয় দলগুলি টিম গেম বা দলগত খেলার ওপর জোর দেয় বেশি। রক্ষণকে মজবুত রেখে প্রতিআক্রমণে বিপক্ষ রক্ষণকে বিপর্যস্ত করতে চায়। লাতিন আমেরিকার আমরা যেমন দেখেছি পেলে, গ্যারিঞ্চা, জিকো, নবাগলো, কানিজিয়া, রোমারিও — হাইলে রেনাল্ডো, ওর্তেগা, বাতিস্তুতা ইত্যাদি তেমনি ইউরোপে আমরা দেখেছি জর্জ বেস্ট, ইউসেবিও, তারও আগে পুসকাস, তারপর যোহন ক্রুয়েফ, বেকেনবাওয়ার, মিশেল প্লাতিনি, গ্যারি লিনেকার, পাওলো রসি, রবার্তো বাজ্জিও, ক্রিশ্চিয়ান ও বর্তমান প্রজন্মের মাইকেল আওয়েন, বার্থক্যাম্প, সুকের, জিদান প্রমুখ। টোটাল ফুটবলের কনসেপ্টটা ইউরোপীয় ধারার সঙ্গে বেশিরভাগ মেলে যায়

টোটাল ফুটবলের জনক রেনাস মিশেলস বর্তমানে উরোগুয়ের টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান এবারে বিশ্বকাপ চলাকালীন হঠাৎ উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থ হবার আগে উনি কয়েকটি কথা বলেছেন যেগুলি অনেক সত্যিরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। উনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে দলের ট্যাকটিক্যাল একিনিয়েন্সি আছে অর্থাৎ টেকনিক ছাড়াও ট্যাকটিক্স-এর দিক থেকে যে দল টক্কা দিতে পারবে সেগুলই '৯৮-বিশ্বকাপ জিতবে। অবশ্য ছেড়ে বলা যায়, বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে মোটামুটি সব দলের খেলোয়াড়দের টেকনিক অর্থাৎ পাসিং, ওটিং, রিসিভিং ইত্যাদি মূল জিনিসগুলির সমান জ্ঞান আছে। অর্থাৎ এলোপাথাড়ি ওটিং, ভুল পাস, রিসিভ করতে গেলে বল পা থেকে বেরিয়ে যাওয়া — এইসব ভুলগুলো হয় না, সেজন্য ট্যাকটিক্স-এর ওপর এত জোর। অর্থাৎ কিভাবে খেলবে তিনজন ডিফেন্ডার,

পাঁচ মিডফিল্ডার আর দুই অ্যাটাকার, না একজনকে আক্রমণে রেখে (যেমন নরওয়ের টোরে-আন্দ্রে-হ্লো) পাঁচজন মাঝমাঠে ও চারজন রক্ষণে। রক্ষণের একজনকে সুইপার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আর মাঝমাঠের দুজন একটু ওপরে থাকবে অ্যাটেকিং মিডফিল্ডার হিসেবে। এইভাবে কোচ তার খেলোয়াড়ের শক্তি অনুযায়ী মাঠ সাজাবেন।

মিশেলস খেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন — ডিফেন্স অর্থাৎ রক্ষণ ভাগ, মিড-ফিল্ড অর্থাৎ খেলা তৈরির জায়গা, যাকে আমরা বলি মাঝমাঠ আর অ্যাটাক বা আক্রমণ। সারা মাঠকে তিন ভাগে ভাগ করে ইংরেজি পরিভাষায় বলা হয় ডিফেন্সিভ জোন, মিডফিল্ডার জোন আর অ্যাটাকিং জোন। উনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে দলের এই তিন বিভাগের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া আছে সেই দলই জিতবে অর্থাৎ আক্রমণে ওঠার মুখে মুইপার সহ তিন রক্ষণকেই সমান জ্ঞান থাকা দরকার বল বিপক্ষের পায়ে চলে গেলে প্রতিআক্রমণে রক্ষণ ভাঙতে তাদের কার কি ভূমিকা হবে। অর্থাৎ বল বিপক্ষের দখলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল কেড়ে নেওয়ার লড়াই শুরু হওয়া উচিত। আর এটাই হওয়া উচিত ফুটবলের সহজাত প্রবণতা। এই জ্ঞানটা তো হঠাৎ একদিনে হবে না। প্রতিটি খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা শিক্ষা দেওয়া থাকবে। বছরদিনের অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলো রপ্ত করা দরকার। খেলার প্রকরণগত দিক থেকে যারা শক্তিশালী তারাই সফল হবে। মিশেলস-এর কথাই ঠিক, প্রকরণগত দিক থেকে ফ্রান্স অন্য দলগুলোর থেকে অনেক উন্নত এবং শক্তিশালী, সেজন্য ওরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে দলগত খেলার দিকেই ওদের নজর ছিল বেশি। উনি স্পষ্ট বলেছেন, নাইজেরিয়া-কলম্বিয়ার মত দলগুলি কখনই এই পর্যায়ের খেলায় সাফল্য আনতে পারবে না, যদি না তারা এই দলগত খেলাটা অর্জিত করতে পারে। ব্যক্তিগত ছিল থাকলেও এই পর্যায়ে সব সময় জয় আনতে পারবে না। সমস্ত দলটির একসঙ্গে ওঠানামা করতে হবে।

উনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন, 'টিম ট্যাকটিক্যাল এক্সিকিউশন' কথাটা শুধু ফাঁকা বুলি নয়। এটা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই নয়, ফুটবল খেলার সঙ্গে ওটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং খেলার সঙ্গে সঙ্গেই এর উন্মেষ হয়। একজন ফুটবলারের স্কিল আছে, সেটা নিয়ে সে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে ভুল করবে। কারণ স্কিল ক্রীড়াশৈলী খেলোয়াড়ের কেবল একটা গুণ। দলগত গুণ, ট্যাকলিং বা কভারিং সামর্থ্য না থাকলে তার সেই শৈলীর স্ফুরণ ব্যাহত হবে। মিশেলস-এর মতে, অনেক ভাল ভাল গেমমেকার মুছে গেল কারণ তাদের জন্য গুণগুলো ছিল না। প্রকৃষ্ট উদাহরণ কলম্বিয়ার জর্জে হাজি। কেবল একটা গুণ নিয়ে সতর্ন ফুটবলে কিছু করা যায় না। শীতিত ওভারের ক্রিকেটে যেমন অলরাউণ্ডার, ফুটবলে তেমনি 'ইউটিলিটি প্লেয়ার'। শুধু গেমমেকার বা ভাল স্ট্রাইকার হলেই চলবে না, প্রয়োজনে ডিফেন্স করার ক্ষমতা অর্থাৎ রক্ষণের কলাকৌশল জানতে হবে। যেমন ট্যাকল্ বা কভার করার ক্ষমতা থাকা চাই। তেমনি ডিফেন্ডারকেও উঠে প্রয়োজনে গোল করতে হবে। ফ্রান্সের ব্লাঁ, থুরাম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইতালি-আর্জেন্টিনা ম্যাচে দেখা গেছে বার্গক্যাম্প দুটিনবার দ্বিতীয় গোল করা ছাড়াও ট্যাকল্ করতেও সক্ষম। ফ্রান্সের উইং ব্যাক থুরাম সুটো গোল করে ফ্রান্সকে ফাইনালে তুলে দেখিয়ে দিলেন রক্ষণকে মজবুত রাখা ছাড়াও গোল করতে কত পটু ও। বোঝা গেল, মিশেলস-এর 'টোটাল ফুটবল' কতটা উজ্জ্বল এখনও।

সত্তরের দশকে মিশেলস্-এর খেলার প্রকরণ অনুসরণ করে খেলোয়াড়রা সমানে স্থান ও অবস্থান পরিবর্তন করে খেলতে শুরু করল প্রতিপক্ষকে বোকা বানাতে এবং এই ধরনের খেলাটারই নাম হয়ে গেল 'টোটাল ফুটবল'। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা শুধু ডান বা বাঁ প্রান্ত বরাদ্দ করত না তারা তাদের অবস্থানও পরিবর্তন করত। যেমন, রক্ষণের খেলোয়াড় যে ট্যাকল্ করতে পারে, সে আবার তক্ক করে দু-তিনজনকে কাটিয়েও নিয়ে যেতে পারে এবং শটও্লো গোলের তিনকাঠির মধ্যেও রাখতে পারে। অর্থাৎ যে যেখানে খেলছে সে সেখানকার খেলোয়াড়, আলাদা করে রক্ষণ মাঝমাঠ বা আক্রমণের কোন খেলোয়াড় থাকল না। মিশেলস-এর 'টোটাল ফুটবল' পরিকল্পনা সার্থক হয়েছিল যেহেতু উনি যোহান ক্রুয়েফ, যোহান নিসকেন্স, রুদ গ্রোল প্রমুখ প্রতিভাশালী ও ফুলালী ফুটবলার পেয়েছিলেন। একটু অন্যভাবে বলতে বলা যায় এই ধরনের উচ্চমানের প্রতিভাবান ফুটবলার পেয়েছিলেন বলেই মিশেলস্ তাঁর ওই 'টোটাল ফুটবলের' কনসেপ্ট মাঠে নামাতে পেরেছিলেন। বার্গক্যাম্প, ভান্ডিজন্, জিনল, দের্শ, ইয়ানুয়েল পেতি, লদ্রুপ ব্লাঁ, সুকের ইত্যাদি এই ধরনের প্রতিভাধর খেলোয়াড়। সাম্প্রতিক প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণে উঠছেন আবার প্রতিআক্রমণ ঠেকাতে রক্ষণে নেমে আসছেন।

মিশেলস্-এর মতে প্যারাগুয়ে ও মরক্কো যদিও দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠতে পারেনি, ওরাই কিন্তু আসল খেলাটা খেলছিল। বিশ্বকাপ দলগুলির মধ্যে প্রকরণগত ও সামর্থ্যগত অনেক পার্থক্য আছে। যেমন ডিউনিসিয়া ও কলম্বিয়া দল দুটি টেকনিকের দিক থেকে খুবই সাধারণ মানের। ওদের দুজন অ্যাটাকার ও একজন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ছিল যারা ওরকমই রক্ষণের জন্য নীচে নামত না। বিপক্ষের পায়ে বল জমা পড়ে গেলে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করত না। "কিন্তু ওসব দিন চলে গেছে" মিশেলস্ বলেছেন। "আমরা যে যুগে বাস করছি এখন ফুটবল খেলতে হলে ওই বাবুয়ানি চলবে না। কোচেদের একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে এর মোকাবিলা করার জন্য, কারণ সেই টিমই প্রকৃত আক্রমণে যেতে সক্ষম যে দলের রক্ষণ মজবুত বা যে দল বল দখলের লড়াই-এ বেশ পটু।"

'গোল্ডেন গোলে' ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়ে প্যারাগুয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে বিদায় নিল, কিন্তু তাদের খেলা খুব উঁচু পর্যায়ে উঠেছিল কারণ তাদের রক্ষণের বাঁধুনি অটুট ছিল। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় তার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং সেটা পরিপূরণে সচেষ্ট ছিল। মিশেলস্ যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন অধিনায়ক-গোলকিপার চিলেভার্ট সমেত সমস্ত রক্ষণ ভাগের।

ওঁর মতে মাঝমাঠ যেখানে খেলা বেশি তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে আসল জায়গা যার সম্পর্কে প্রতিটি কোচের গাইডলাইন ঠিক করা উচিত। প্রতিটি কোচের তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার, তিনি কিভাবে খেলা তৈরি করতে চান, প্রতিআক্রমণ — কাউন্টার অ্যাটাক না পুরো আক্রমণ বা ওপেন অ্যাটাক — কি তাঁর লক্ষ্য। সেইভাবে তার দলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং ওঁকে দেখতে

হবে প্রতিটি খেলোয়াড় তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং পালনে সচেষ্ট।

মরক্কো সম্পর্কে পূর্বতন ডাচ কোচ মুখ ফসকে বলেছেন, ওরা একটুর জন্য দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারল না। অথচ তাদের মাঝমাঠের খেলায় অদ্ভুত বৈচিত্র্য ছিল। ওদের কোচ ব্রাজিলের আঁরি মিশেল মডার্ন ফুটবলের চাহিদা সম্বন্ধে সজাগ। হয়তো সব জায়গায় প্রয়োজনমত খেলোয়াড় পায়নি, তাই প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হল। সত্যি কথা, মরক্কোর বিদায় বড় দুঃখের। গ্রুপ শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৩-০ হারানোর পর মরক্কোর ফুটবলাররা ধরেই নিয়েছিল তারা পরের রাউন্ডে যাচ্ছেন। কিন্তু বিধি বাম। ওই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠতে গেলে নরওয়েকে শেষ ম্যাচে হারাতে হত ব্রাজিলকে। তার নরওয়ে তাই করল শেষ মুহূর্তের পেনাল্টিতে গোল দিয়ে।

ডিফেন্সিভ থার্ড অর্থাৎ নীচে গোলমুখ থেকে এক-তৃতীয়াংশে জায়গা যেটা রক্ষণভাগ, অ্যাটাকিং থার্ড বা উপরে আক্রমণের এক-তৃতীয়াংশ আর বাকিটা হচ্ছে মাঝমাঠ যেটাকে বলা হয় বিল্ড-আপ জোন বা অর্গানাইজেশন জোন। উনি বলেছেন, হল্যান্ড এই বিশেষ জায়গাটার কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। বলটা ওদের সবার পায়ে নড়াচড়া করে, ওরা অনেকগুলি পাস খেলে এবং প্রতিআক্রমণে লোক বাড়ায়। উনি জাপানের মিডফিল্ডার হিদেটোসি নাকাতার প্রশংসা করেন একজন নিপুণ গেমমেকার হিসেবে। কিন্তু ও সতীর্থ ফরওয়ার্ডের কাছ থেকে সাহায্য পায়নি।

জার্মানিও মাঝমাঠের সমস্যায় ভুগছে। ওদের কোন সৃজনশীল হাফব্যাক নেই। ওদের রক্ষণে ও আক্রমণে যথেষ্ট ভাল খেলোয়াড় আছে, কিন্তু মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার লোকের অভাব। সম্ভবত এটাও একটা কারণ ওদের শোচনীয় পরাজয়ের।

তিনি বারবার কেকেয়ানের দৃষ্টান্ত তুলে বলেন, ওরকম নির্বোধের মত কি কেউ লাল কার্ড দেখে? ওরা কি দলের জন্য খেলে! বর্তমান ফুটবলে জিততে গেলে তোমার দক্ষতার শীর্ষে তোমাকে পৌঁছতে হবে। তুমি এরকম কাজ করতেই পার না। দলগত খেলায় তোমার ভূমিকা সম্বন্ধেই তুমি সচেতন নও।

উনি অস্বীকার করেন, মডার্ন ফুটবলে একজন ফুটবলারকে রক্ষণের উৎকর্ষে আসতে হলে রোবার্টস মত হতে হবে। অনুযোগ উঠেছে এত চাপ খেলোয়াড়ের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁর অভিমত, প্রতিটি খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণের কঠিন নিগড়ে বাঁধলেও তাদের ছিল ও সৃজনশীলতার ওপরও জোর দেওয়া উচিত। একজন ফুটবলারের মধ্যে যদি ছিল ও উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতা থাকে এবং ট্যাকটিক্সে সে যদি উন্নত হয় তখন সে তার উন্নত টেকনিক বা ক্রীড়াশৈলী আরও ভালভাবে দেখাতে পারবে। ট্যাকটিক্যাল গভীরতা যাদের নেই, ছক-কৌশল মিলিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে যারা মানানসই হয়ে উঠতে পারে না, তাদের সাফল্য পাওয়া খুবই কঠিন। ওপেন স্ট্যাটাক বা শুধু আক্রমণে গেলেই হল না — তাতে আক্রমণের ফাঁকফোকরগুলো ঢেকা দেওয়া যায় না। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল-ডেনমার্ক ম্যাচে মাঝমাঠের রাশ ডেনরা কখনই হাতছাড়া করেনি। কিন্তু ওইখানে আধিপত্য রেখেও শুধু ট্যাকটিক্যাল বৈচিত্র্যের অভাবে তারা ২-৩ গোলে হেরে গেল।

ব্রাজিলকে তার স্বমহিমায় দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় রাউন্ডে চিলির বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জেতার সময়। ব্রাজিল দলে তারকা সমাবেশ ছিল কিন্তু কোন সময়োত্তা ছিল না খেলোয়াড়দের মধ্যে। দুই স্ট্রাইকার আলভেস ও জুনিয়র বাইয়ন্সের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল না, মাঝমাঠে রিভালডোকে শুধু খেলা তৈরির চেষ্টায় দেখা গেছে। সেনিক থেকে ফ্রান্স ও হল্যান্ড অনেক বেশি 'টোটাল ফুটবল' খেলার চেষ্টা করেছে। হল্যান্ড স্ট্রাইকার ব্লুইন্ট যদি অত সুযোগ অপচয় না করত তাহলে সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে বিদায় নিতে হত।

দেখা হলেই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে — এবারের বিশ্বকাপ কিরকম দেখলেন? ফাইনালে ব্রাজিলের অবস্থানে থেকেই সম্ভবত এই ইতালো। আমারও আপনাদের কাছে প্রশ্ন, সত্যি কি কিছু নেই? ম্যারাডোনা, লাতিনো, মিথাল ছাড়া ডিফেন্ডারদের কেরা বলিয়ে মাইকেল আওয়েনের সেই দৃষ্টিনন্দন গোল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, বলকানস্কোর সেই অসাধারণ জয়সূচক গোল কোয়ার্টার ফাইনালে, ডান পায়ের ইনসাইড দিয়ে রিফিত করে ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে বলটা নিয়ে ডান পায়ের আউট সাইড দিয়ে গোল, ডানের সুকোরের ওই ধরনের বাঁ পা, লাইনেকারের ইতালিয়া, প্রথম ম্যাচেই ইতালির বিরুদ্ধে চিলির জোড়া ফলা সা-জার লম্বা, বলিভিয়ার রেকর্ড সমরে হ্যাটট্রিক, ওয়েগার পায়ের কাজ, ডিফেন্স রেনল্ডোর কিছু টাচ-প্লে, কলম্বিয়ার — অনেক কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নগণ্যকোর মত এবং সর্বোপরি ফ্রান্স-হল্যান্ডের 'টোটাল ফুটবল'। আপনাদের উত্তরের আশায় রইলাম।

পরিসংখ্যান

বিশ্বকাপের পূর্ববর্তী খেলার ফল

সাল	জায়গা	ফল
১৯৩০ -	উরুগুয়ে —	উরুগুয়ে (৪) : আর্জেন্টিনা (২)
১৯৩৪ -	ইতালি —	ইতালি (২) : চেকোস্লোভাকিয়া (১)
১৯৩৮ -	ফ্রান্স —	ইতালি (৪) : হাঙ্গেরি (২)
(বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন খেলা হয়নি)		
১৯৫০ -	ব্রাজিল —	উরুগুয়ে (২) : ব্রাজিল (১)
১৯৫৪ -	সুইজারল্যান্ড —	পঃ জার্মানি (৩) : হাঙ্গেরি (২)
১৯৫৮ -	সুইডেন —	ব্রাজিল (৫) : সুইডেন (২)
১৯৬২ -	চিলি —	ব্রাজিল (৩) : চেকোস্লোভাকিয়া (১)
১৯৬৬ -	ইংল্যান্ড —	ইংল্যান্ড (৪) : পঃ জার্মানি (২)
১৯৭০ -	মেক্সিকো —	ব্রাজিল (৪) : ইতালি (১)
১৯৭৪ -	পঃ জার্মানি —	পঃ জার্মানি (২) : হল্যান্ড (১)
১৯৭৮ -	আর্জেন্টিনা —	আর্জেন্টিনা (৩) : হল্যান্ড (১)
১৯৮২ -	স্পেন —	ইতালি (৩) : পঃ জার্মানি (১)
১৯৮৬ -	মেক্সিকো —	আর্জেন্টিনা (৩) : পঃ জার্মানি (২)
১৯৯০ -	ইতালি —	জার্মানি (১) : আর্জেন্টিনা (০)
১৯৯৪ -	আমেরিকা —	ব্রাজিল (০) : ইতালি (০)
		টাইব্রেকার (৩) (২)
১৯৯৮ —		ফ্রান্স (৩) : ব্রাজিল (০)

সর্বোচ্চ গোলদাতা

১৯৩০ — গিলারমো স্টাবিলে (আর্জেন্টিনা) — ৮ গোল
১৯৩৪ — নেজেদলি (চেক) — ৫ গোল
১৯৩৮ — লিওনিদাস (ব্রাজিল) — ৮ গোল
১৯৫০ — আলসিবিয় (ব্রাজিল) — ৯ গোল
১৯৫৪ — সান্দোর কোসিস (হাঙ্গেরি) — ১১ গোল
১৯৫৮ — ঁ ফঁতে (ফ্রান্স) — ১৩ গোল
১৯৬২ — ড্রাজন জাকোভিচ (যুগোস্লাভিয়া) — ৯ গোল
১৯৬৬ — ইউসেবিও (পর্তুগাল) — ৯ গোল
১৯৭০ — গার্ড মুলার (পঃ জার্মানি) — ১০ গোল
১৯৭৪ — জোহান ক্রাইফ (নেদারল্যান্ড) — ৭ গোল
১৯৭৮ — মারিওভেন্সোস (আর্জেন্টিনা) — ৬ গোল
১৯৮২ — পাওলো রোসি (ইতালি) — ৬ গোল
১৯৮৬ — গারি লিনেকার (ইংল্যান্ড) — ৬ গোল
১৯৯০ — সালভাতোরে স্কিলাচি (ইতালি) — ৬ গোল
১৯৯৪ — ওলেগ সালেঙ্কা (রাশিয়া) — ৬ গোল ও
হিস্টোস্তোইচকভ (বুলগেরিয়া) — ৬ গোল
১৯৯৮ — ডাভর সুকের (ক্রোয়েশিয়া) — ৬ গোল

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ

কবিলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৬৫ এইচ জি তাং১৫-৫-৬১

চিনাগোড়ী, ভাণ্ডারহাঠী, হুগলি

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	অশোককুমার পাল	অলোক সামন্ত
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নর্থ বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

মাদারী

দূরভাষ

এস টি ডি - ০৩৫১২

সভাপতি সম্পাদক

শারদ সম্ভাষণ গ্রহণ করুন ঃ–

ফোন : ৫২৪০২ (হেড অফিস)
৫১৩২৩ (সেভিংস ব্রাঞ্চ)

"উন্নয়ন ভবন"

মালদা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

১৭/এ, রবীন্দ্র এভিনিউ (৪র্থ তল), মালদা

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ চাঁচল ব্রাঞ্চ, সামসী; সেভিংস ব্রাঞ্চ, মালদা, গাজোল ব্রাঞ্চ, গাজোল (প্রস্তাবিত)

সাব-অফিস ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, কালিয়াচক, পাকুয়াহাট, বুলবুলচণ্ডী

সময়মত ঋণ পরিশোধ করুন, বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুযোগ গ্রহণ করুন।

দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে ঃ প্রচলিত প্রকল্প ছাড়াও ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার, ট্রাক (LPT), মিনিট্রাক, নার্সিং হোম, কম্পিউটার সেন্টার, গৃহনির্মাণসহ বহুমুখী ঋণের সুযোগ।

ব্যাঙ্ক আমানত প্রকল্পে ঃ সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট। (যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদ) এবং লকারের ব্যবস্থা।

(একমাত্র এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডিপোজিটের উপর অর্জিত সুদ আয়কর থেকে রেহাই পাবে)

অমরকুমার দে
চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার

রণজিৎ চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মুখ্য কার্যালয় : মাচানতলা, বাঁকুড়া

দূরভাষ : (০৩২৪২) ৫০৩০২/৫১০৯০/৫৩৪৫৮

☆৭৫ বছরের গৌরবোজ্জ্বল উত্থানের ইতিহাস ☆
☆৭৫ বছরের নিরলস সংগ্রামের স্মৃতি ☆

- জেলাবাসীর সেবায় নিয়োজিত বৃহত্তম লগ্নিকারী একমাত্র ব্যাঙ্ক।
- ১৫টি শাখা দ্বারা সমগ্র জেলাবাসীর স্বার্থে নিবেদিত সুষ্ঠু পরিষেবা।
- ১০০ কোটিরও বেশি টাকার মূলধন।
- যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রদের সুদেয় চেয়ে প্রদত্ত সুদের হার বেশি।
- সমবায়ের সুবিশাল পরিকাঠামোর সাহায্যে প্রতিটি পরিবারের সুখদুঃখের অংশীদার।

মানুষের গভীর আস্থার ফলশ্রুতি আমাদের শ্রীবৃদ্ধি,
তাকে মানুষের সেবায় পুনর্নিয়োজিত করাই
আমাদের লক্ষ্য।

প্রবন্ধ

শিশু শ্রমিক

গৌরহরি বসু

"I am a Child.
All the world waits for my coming.
All the earth watches with interest
to see what I shall become.
Civilisation hangs in the balance.
For what I am, the World of
tommorrow will be.
I am the Child.
You hold in your hand my destiny.
You determine, largely, whether
I shall succeed or fail.
Give me, I pray you, these things
that make for happiness.
Train me, I beg you, that I may be a
blessing to the world."

১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি কুলদীপ সিংহ, বি এল হানসারিয়া এবং এস বি মজুমদার সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী আনীত এম সি মেহতা বনাম তামিলনাড়ু সরকার ও অন্যান্যদের মামলায় রায় দান শুরু করেন Marmal Gene Cole-এর এই বিখ্যাত কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, "'Child is the father of man'. To enable fathering of a valiant and vibrant man, the child must be groomed well in the formative years of his life. He must receive education, acquire knowledge of man and materials and blossom in such an atmosphere that on reaching age, he is found to be a man with a mission, a man who matters so far as the society is concerned."

শিশু শ্রমিকদের নিয়ে বিচারপতিদের এই ঐতিহাসিক মামলায় যে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন তাই আজকে সারা ভারতের শিশু শ্রমিকদের রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে শিশু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সাংবিধানিক রক্ষাকবচ সহ প্রচুর আইন থাকা সত্ত্বেও কোন আইনেরই সঠিক প্রয়োগ হয়নি। শোষিত অবহেলিত শিশুরা দিনের পর দিন সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেলেও কেউই এ সম্পর্কে ইতিবাচক কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেন।

"তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও, আমি তোমাদেরই সন্তান" — এটা শুধু একটা পোস্টারের ভাষা নয়, এ সারা পৃথিবীর শিশু শ্রমিকদের অন্তরাত্মার এক করুণ মর্মবাণী। ১৯৫৯ সালের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ২৫৯ অধিগৃহীত নীতিতে বলা হয়েছিল, "The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities by law and by other means to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in condition of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration". ৯নং অধিগৃহীত নীতিতে বলা হয়েছিল, "The child shall be protected against all form of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic in any form. The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age. He shall, in no case,be caused or permitted to engage in any occupation or employment which would prejudice his health or education or interfare with his physical, mental or moral development"— কিন্তু আজও শিশু শ্রমিকদের অবস্থানের কোন হেরফের হয়নি। জনসংখ্যার সাথে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। এই সিদ্ধান্তের পর ৫০ বছর পার হয়ে গেলেও অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

শিশু শ্রমিকের সংজ্ঞা কি ও কাদের শিশু শ্রমিক বলা হবে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মতভেদ থাকলেও মোটামুটিভাবে শিশুদের সমস্যা গোটা বিশ্বে একই রকম। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৩৮তম Minimum Age Convention-এ গৃহীত প্রস্তাবে শিশু বলতে ১৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের ধরা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৯ সালের United Nations Convention of Human Rights of the Child অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ভারতে ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা যদি নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে তাদের শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশুরা যদি নিজের পরিবারে কাজ করে এবং তা যদি তার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তবে তারাও শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে সব শিশুরা স্কুলে যায় না তাদেরও শিশু শ্রমিক হিসাবে ধরা হবে। এটা ধরে নেওয়া হবে, যে শিশু স্কুলে যায় না সে নিজের বাড়ি বা অন্য কোথাও কিছু না কিছু কাজ করে সেটা তার বাঁচা ও বাড়ার পক্ষে সহায়ক নয়।

শিশু, কাজ ও শ্রম-এর সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম থাকলেও এটা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে ৬/৭ বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে যা পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় এবং যার মাধ্যমে সে অর্জিত বংশপরম্পরা, কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতার ধারক ও বাহক হিসাবে পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে। এই কাজকে শ্রম হিসাবে গণ্য করা হয় না। শিশু শ্রম অন্য অর্থ বহন করে। শিশুদের শ্রমের মূল্য না দিয়ে শোষণ করা, শিশুদের দিয়ে বেশি সময় কাজ করানো, শিশুর সংবিধানে বর্ণিত ও আইনে প্রদত্ত

অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা নষ্ট করা, তাদের দিয়ে গতর খাটিয়ে ব্যবসা করানো ইত্যাদি থাকলেই তার ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের শ্রম হিসাবে গণ্য করা হবে।

সমগ্র বিশ্বে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা কত এ নিয়ে মতভেদ আছে। যেহেতু মাপকাঠি বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিতে এক নয় সেই হেতু সব দেশের পরিসংখ্যান একত্র করে কোন সর্বসম্মত সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আই এল ও-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তাদের পাঠান প্রশ্নপত্রটি বিশ্বের ৪০টি দেশ পূরণ করে পাঠায়নি। বহু দেশ শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখেই না। তবুও তাদের হিসাবমতে বিশ্বে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ কোটি। এর মধ্যে সব সময়ের ১২ কোটি এবং আংশিক সময়ের ১৩ কোটি। ১ থেকে ৫ বছর এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের এতে ধরা হয়নি। আই এল ও ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের মতে ১৯৯০ সালে সারা বিশ্বে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ শিশু কোন শিক্ষার সুযোগ পায়নি, অথচ এদের শিশু শ্রমিক হিসাবে ধরা হয়নি। এদের সংখ্যা বিশ্বের সমস্ত শিশুর অন্তত ২০ শতাংশ।

বেসরকারি সমীক্ষকদের মতে, পৃথিবীর শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা ২০ থেকে ৪০ কোটি যার শতকরা ৯৮ ভাগ বাস করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। আবোসবাণী ২১-৬-৯৬ তারিখের এক সমীক্ষায় জানিয়েছে ১০ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সমস্ত বিশ্বে ৬ কোটি ৩ লক্ষ। এর অর্ধেকেই বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়। এই শিশুদের ১৫ শতাংশ বাস করে ভারতে আর ১০ শতাংশ পাকিস্তানে।

১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৬৮.৩০ কোটি এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১.৩৬ কোটি। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ৮৪.৬০কোটি। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ সেন্সাস অপারেশনের কাছ থেকে এখনও জানা যায়নি। ১৯৮১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে শিশু শ্রমিকের হার ধরে ১৯৯১ সালের জনসংখ্যায় শিশু শ্রমিক নির্ধারণ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১.৬৯ কোটি।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। এ থেকে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নেওয়া যায়।

১। I.L.O's Global Labour Force, Report, 1975 — ১.৫১ কোটি

২। National Sample Survey 1977-78 — ১.৬২ কোটি

৩। Census Report 1981 — ১.৬৬ কোটি

৪। The Planning Commission 1983 — ১.৭৪ কোটি

৫। Operational Research Group, Boroda, 1983 — ৪.৪০ কোটি

৬। The Balai Data Bank, Manila — ১১.১০ কোটি

৭। Labour Minister, Govt. of India - 1994 — ২.০০ কোটি।

উল্লিখিত তথ্যগুলির মধ্যে অপারেশনাল রিসার্চ গ্রুপ, বরোদার সংখ্যাটিকে তথ্যভিত্তিক সংখ্যা হিসাবে গৃহীত হয়। এছাড়া অনেক রাজ্য সরকারও আলাদাভাবে এ ব্যাপারে সমীক্ষা করেছেন। উড়িষ্যা সরকার ১৯৯১ সালে এক সমীক্ষা করে জানিয়েছেন উড়িষ্যায় ৬ লক্ষ শিশু শ্রমিক আছে এই সংখ্যা মোট শ্রমজীবী মানুষের ৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী বিগত এপ্রিল ১৯৯৭-এর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ।

১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে শিশু শ্রমিকের ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ শীর্ষে ছিল। এ সংখ্যা ছিল ১৯,৩৬,৮৭৩। পশ্চিমবঙ্গে ছিল ২,৯১,৮৪৫। ১৬ বছর পর এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ। মোটামুটিভাবে উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে এ কথা প্রমাণিত সারা বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে।

ভারতে শিশু শ্রমিকের কাজের ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংগঠিত ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নেই। অসংগঠিত ক্ষেত্রের একমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেই ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ শিশুশ্রমিক কাজ করে। এছাড়া আছে খনি, দোকানে, রেস্টুরেন্টে, হোটেল, গ্যারেজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। এছাড়া বিপজ্জনক শিল্পে কাজ করে অন্তত ২০ লক্ষ শিশু।

কতকগুলি বিশেষ সুবিধার জন্য মালিকেরা শিশু শ্রমিক পছন্দ করেন। সেগুলি হল (১) শিশুকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হয় না, সীমাহীন শোষণ করা যায় (২) কাজের সময়সীমা নেই, যত খুশি খাটান যায় (৩) ট্রেড ইউনিয়ন বা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ঝুঁকি নেই (৪) সামাজিক নিরাপত্তার ধার ধারতে হয় না (৫) প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ছাড়িয়ে দেওয়া যায় (৬) মা বাবার ঋণের জন্য শিশুকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটান যায় (Bonded Labour) (৭) আইন থাকলেও আইনী বাধ্যবাধকতা নেই ইত্যাদি।

শিশু শ্রমিকের উৎপত্তির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দারিদ্র্য একটি প্রধান কারণ। এছাড়া অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবার কারণে শহরে কাজের টানে যাওয়া ও বংশপরম্পরা পারিবারিক ধ্যান ধারণার কারণে শিশু শ্রমিকের যোগান বাড়তে থাকে। আই এল ও-র এক সমীক্ষায় জানা গেছে একটি দরিদ্র পরিবারের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ শিশু শ্রমিকেরা পূরণ করে। শিশু শ্রমিক সমস্যা আলাদা কোন সমস্যা নয়। সব সমস্যার আবর্তে পড়ে শিশু শ্রমিকের উৎপত্তি। অর্থনীতি বিপন্ন হওয়া, অল্প বয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা না মেনে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া, বেকারি, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, সীমাহীন দারিদ্র্য এগুলি চক্রাকারে পরিবারকে দরিদ্রের আবর্তে ঠেলে দেয়। তাই পরিবারের অভাব পূরণে শিশুকেই বলি দেওয়া হয় তার শিক্ষা, কৈশোরের বাঁচা ও বাড়ার আনন্দময় পরিবেশ থেকে উৎখাত করে।

শিক্ষার সাথে শিশু শ্রমিকের একটা সম্বন্ধ আছে। শিক্ষিত বাপমায়েরা যত দরিদ্রই হোন না কেন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান। আই এল ও-র এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ভারতে কেরালা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের সমান হলেও শুধু শিক্ষার হার বেশি থাকায় ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে ওই রাজ্যে শিশু শ্রমিক নেই বললেই চলে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যেও এই তথ্যের প্রমাণ মেলে। অর্থনীতিতে একই রকম অবস্থান হওয়া সত্ত্বেও বহু দেশ শুধু শিক্ষার কারণে শিশু শ্রমিক সমস্যা অনেক কমিয়ে এনেছে। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এর নজির।

সংবিধানে সব শিশুর শিক্ষার অধিকার ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সংস্থান থাকলেও পরিকাঠামোর অভাব, রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছা ও অন্যান্য কারণে আজও কোটি কোটি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিশুকে পড়াশুনার সুযোগ দিলে সে পরবর্তীকালে শিশু শ্রমিকের মাতা পিতা হিসাবে সমাজে অবস্থান নেবে না।

বিপজ্জনক শিল্পে শিশুদের কাজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আইনে বিপজ্জনক শিল্পগুলি হল (১) বিড়ি তৈরি (২) কার্পেট তৈরি (৩) সিমেন্ট উৎপাদন (৪) কাপড় বোনা, ছাপা ও রং করা (৫) দিয়াসলাই, বিস্ফোরক ও বাজি তৈরি (৬) অভ্র কাটা ও বিভক্তিকরণ (৭) লাক্ষা উৎপাদন (৮) সাবান তৈরি (৯) চামড়া প্রস্তুতকরণ (১০) উল পরিষ্কার (১১) নির্মাণ শিল্প (১২) গ্লেট পেনসিল তৈরি ও প্যাকেটজাত করা (১৩) Agate কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন (১৪) সীসা, পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেনজিন, কীটনাশক ও অ্যাসবেসটস তৈরি (১৫) ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে বর্ণিত বিপজ্জনক কার্যক্রম (১৬) কাজু বাদাম ছাড়ান ও তৎসংক্রান্ত কাজ (১৭) ইলেকট্রনিক শিল্পের কিছু কাজ। এছাড়া বিভিন্ন কাজকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) রেলওয়েতে যাত্রী ও মাল পরিবহনের কাজ (২) রেলওয়ের বাড়ি তৈরি ও পরিষ্কার রাখার কাজ (৩) স্থান পরিবর্তনশীল ক্যাটারিং-এর কাজ (৪) রেলওয়ে স্টেশন বা লাইনের ধারের নির্মাণ কাজ (৫) পোতাশ্রয়ের কাজ (৬) সাময়িক অনুমোদনভিত্তিক বাজি বিক্রয় (৭) কয়াইখানার কাজ। আকাশবাণী কলকাতার ২৫-৭-৯৭ তারিখের এক খবরে জানা গেছে ভারত সরকার আরো একটি পেশা ও ৩৬টি কাজ শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছে।

বিপজ্জনক শিল্পে ও কাজে শিশুদের নিয়োগ করলে শিশুদের দেহ, হাড়, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, কিডনি, হৃৎযন্ত্র, জননক্রিয়া সংক্রান্ত ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় তন্ত্র, ত্বক, ফুসফুস ও অন্যান্য পদ্ধতিগত দিকের যে বিপুল ক্ষতি হয় তাতে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ হতে থাকে। এর সঙ্গে অপুষ্টি, অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ মিলিয়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাতে সে যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশ জাতির পক্ষে সে একটি সম্পদ সৃষ্টি না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

বিপজ্জনক শিল্পে শিশুরা কাজ করে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয় তার খবর দিনের পর দিন দেখলেও আমাদের মনে দাগ কাটে না। ১২-১-৯৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার খবরের শিরোনাম "বাসনাগে বিস্ফোরণ - বাজি কারখানায়, মৃত ১২, জখম ১৭"। আতসবাজির এই কারখানায় বিস্ফোরণে যারা মারা গিয়েছে তারা সবাই শিশু। এরা জানত না কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তাদের। বেআইনী এই কারখানার মালিকের নামে পুলিশ কেস করে। বেশ কিছুদিন এ নিয়ে খুব উত্তপ্ত আলোচনা, সংবাদপত্রে খবরাখবর বেরোয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব আগের মত চলছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে পুলিশী ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। আগের মালিকেরা ফাঁকে ফোকরে বাজির কারখানা চালাচ্ছেন, আর দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েরাই সেখানে কাজ করছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে, সচেতনতার অভাব থাকলে ক্ষুধা-দারিদ্র-অপুষ্টি থাকলে ঘুরে ফিরে একই আবর্তে ফিরে আসতে হবে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ভারতের রপ্তানী কার্পেট শিল্পের পণ্য রপ্তানি খুব অসুবিধায় পড়ে। রপ্তানি করতে হলে ঐ শিল্প শিশু শ্রমিক মুক্ত এই সার্টিফিকেট দিতে হবে। এ সম্পর্কে অনেকে বলেন, শিশুদের আঙুল কার্পেট তৈরির খুব উপযুক্ত। শিশুদের নিযুক্তির ফলে উৎপাদন খরচ কম, তাই প্রতিযোগিতার বাজারে ভারত টিকে আছে। অন্যথায় ভারত বাজার হারাবে। সে যাই হোক, আন্তর্জাতিক চাপে শিশুদের এই বিপজ্জনক কাজ থেকে মুক্ত করতে পারলে শিশুরা উপকৃত হবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কথা ধরা যাক। বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ যোগায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। আই এল ও ভারতের মত বাংলাদেশেও পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ঐ শিল্প শিশু শ্রমিক মুক্ত এই সার্টিফিকেট দাবি করে। বাংলাদেশ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এই সমস্যার মোকাবিলা করেছে। আইন করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান শিশু শ্রমিক নিয়োগ করবে তার শাস্তি হবে ৪০০০ ডলার। এছাড়া আই এল ও-র কাছ থেকে ১ লক্ষ ৭ লক্ষ ৫০ ডলার পুনর্বাসন তহবিল নিয়ে ঐ শ্রমিকদের স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র প্রতি মাসিক ৩০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সার্টিফিকেট দিয়েছেন পোশাক তৈরি নিয়ে বাংলাদেশে কোনশিশু শ্রমিক নেই — এ খবর ১-১১-৯৬-এর বাংলাদেশ বেতারের। বাংলাদেশ যা পারে ভারত তা কেন পারবে না এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।

সারা বিশ্বে শিশুদের নিয়ে যৌন ব্যবসা আজ রমরমা। খুব সংগঠিত শক্তিশালীচক্র এর আন্তর্রাজ্য ও আন্তর্রাষ্ট্র কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত। এর স্বাদ শিশুরা পায় না, পায় আত্মীয়-স্বজন ও পাচারকারী সম্প্রদায়। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৯৬ সালের বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে এশিয়াতে ১০ লক্ষ শিশু এর শিকার। নেদারল্যান্ড এশিয়ার সব দেশই এই কাজে জড়িত।

ভারতে শিশু যৌন কর্মীর সংখ্যা কত তা সঠিক বলা সম্ভব না হলেও নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু আঁচ পাওয়া যায়। ২৯-৭-৯৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় এক খবরে বলা হয়েছে "শিশু যৌন কর্মীর সংখ্যা সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি ভারতে।" এক চাইল্ড প্রস্টিটিউশন ইন এশিয়ান ট্যুরিজম (একপেট) নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে এশিয়ার ১০ লক্ষ শিশু যৌন কর্মীর মধ্যে ৪/৫ লাখই ভারতীয়, আড়াই লাখ আছে থাইল্যান্ডে, ফিলিপিনে ৬০ হাজার। এই সমীক্ষায় জানা গেছে খুব কম শিশুই নিজের ইচ্ছায় এই ব্যবসায়ে নেমেছে। এদের এক-তৃতীয়াংশ এইচ আই ভি বহন করছে। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৫-১০-৯৫ তারিখের একটি 'হটলাইন' খবর ধার হয় তার শিরোনাম ছিল " Children in flesh Trade"। শৈলেন সেনের এই প্রতিবেদনে জানা গেছে হৃদয়বিদারক সব ঘটনা। নেপালের এক শিশুকে বোম্বাইয়ে বিক্রি করা হয়। প্রথম দিনে তাকে আট জন খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করতে হয়। পুলিশের সাহায্যে তাকে আট মাসের মধ্যে দুবার বিক্রি করা হয়েছিল। প্রতিবেদকের মতে, বোম্বাইয়ের কামাথিপুরা 'রেডলাইট এরিয়ায়' দশ হাজার শিশু যৌনকর্মী আছে, কলকাতায়

এর সংখ্যা কম করে ৫০ হাজার। বিহারে ৩০ হাজার, বাংলাদেশে কম করে ৫০ হাজার। বাংলাদেশের এক সমাজসেবীর কথার মধ্যে গেলে, "you may not get food but a teen aged girl if you have money."

একটি এন জি ও সংস্থা মেয়েদের সম্পর্কে সমীক্ষা করে জানিয়েছে শতকরা ৮০ জন মেয়েই শিশুকালে 'Sexually abused' হয়, এর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ির ভেতরের পরিবেশে। এই ঘটনা হয় স্বাভাবিক শিশুদের পরিস্থিতি সেখানে শিশু শ্রমিক বা শিশু যৌনকর্মীদের কি অবস্থা তা কল্পনার বাইরে।

শিশু শ্রমিকদের আইনী সুরক্ষার জন্য স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। লর্ড রিপন, গভর্নর জেনারেল ও ভারতবর্ষের ভাইসরয়, শিশু শ্রমিকদের প্রতি মালিকের আচরণ, শোষণ ও অপব্যবহার দেখে ১৮৮১ সালে প্রথম কারখানা আইন পাশ করান। ঐ আইনে ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুদের দৈনিক ৯ ঘন্টার বেশি কাজ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৩৮ সালের শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইনের ৩নং ধারায় শিশুদের দিয়ে বিপদ জনক কাজ করানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিল। ভারতীয় সংবিধান রচনার পর বহু আইন রচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৪ বছরের নীচের শিশুদের শ্রমিকের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ১৯৫১ সালের খাদিচা শ্রম আইন, ১৯৫২ সালের খনি আইন, ১৯৬১ সালের শিক্ষানবিশ আইন, দোকান এবং সংস্থা আইন-১৯৬১, বিড়ি, চুরুট শিল্পে নিয়োগ সর্ত সংক্রান্ত আইন - ১৯৬৬, বোনাস দান আইন - ১৯৬৫, ভারতীয় চুক্তি আইন - ১৯৭২, ঠেকার শ্রমিক ভর্তা চুক্তি আইন - ১৯৭৬, অভিভাবক ও নগরক্ষক আইন - ১৯৯০ ইত্যাদি। তদুপরি সরকার ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শিশু শ্রম বিল পাশ করেন। ঐ বছরই মোটামুটি সব আইনগুলির সমন্বয়ে শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন - ১৯৮৬ কার্যকরী হয়। এই আইন কার্যকরী করার নিয়মাবলী ১৯৮৮ সালে প্রণীত হয়।

১৯৮৬ সালের শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ঐ আইনে বিপজ্জনক ও বিপজ্জনক নয় এমন সব কাজ ও পেশায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আইনে বিপজ্জনক তালিকাভুক্ত শিল্প, পেশা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোন মালিক ঐ ধারা লঙ্ঘন করে শিশু শ্রমিকদের ঐসব কাজে নিয়োগ করে তাহলে তার তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তিই একসাথে হতে পারে। কোন মালিক দ্বিতীয়বার এই অপরাধ করলে তার ৬ মাস থেকে ২ বছর জেল হতে পারে।

অবিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে এই আইনে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা ও সর্ত আরোপ করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) কোন শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো যাবে না। (২) একটানা তিন ঘন্টা কাজের পর এক ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে (৩) কাজের সময়সীমা বিশ্রামসহ ছয় ঘন্টার বেশি হবে না (৪) কোন শিশুকে দিয়ে সকাল ৭টার আগে বা রাত ৮টার পর কাজ করানো যাবে না (৫) কোন শিশুকে অতিরিক্ত সময় (ওভারটাইম) খাটানো যাবে না (৬) একই দিনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে খাটানো যাবে না (৭) শিশুকে সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে ছুটি দিতে হবে (৮) বয়স নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে পরিদর্শক শিশুকে বিধিবদ্ধ চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন।

ঐ আইনবলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি প্রণয়ন করেছেন। তাতে শিশুদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা, কাজের জায়গায় স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন মালিক আইন না মানলে শিশুদের পক্ষে যে কোন ব্যক্তি, পরিদর্শক বা পুলিশ অফিসার মামলা রুজু করতে পারবেন।

এই আইন ও নিয়মাবলী থাকা সত্ত্বেও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তার প্রধান কারণ পরিদর্শকের অপ্রতুলতা, আইনানুগভাবে মামলা দায়ের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, সচেতনতার অভাব, শিশুদের পরিবার-পরিজনের অনীহা ইত্যাদি। কিন্তু শাস্তি দিতে না পারলেও এই আইন থাকায় বহু মালিক শিশুদের বেশরোয়াভাবে নিয়োগ ও শোষণ থেকে বিরত থাকছেন। বহু রাজ্য সরকারও এগিয়ে এসেছেন আইন তৈরি করে তাদের কর্মচারিদের ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা ও সচেতনতা থাকলে যে ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা কমতে থাকে এবং এর ফল শিশু শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে বাধ্য।

১৯৯৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেন ২০০০ সালের মধ্যে বিপজ্জনক শিল্প থেকে শিশু শ্রমিক প্রথার অবসান ঘটানো হবে। এজন্য ন্যাশনাল অথরিটি গড়ে তাদের মাধ্যমে তহবিল যোগানের ব্যবস্থা ও প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি স্থাপিত এবং এর শীর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রি। অন্যান্যরা হলেন শিক্ষা প্রামোন্নয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সচিব। এছাড়া থাকবেন যোজনা কমিশনের একজন সদস্য, আই এল ও ও ইউনিসেফ-এর একজন করে প্রতিনিধি ও শিশু শ্রমিকের উপর কাজ আছে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। এই কর্তৃপক্ষ শিল্পপতি, মালিক, বাজেট, স্বেচ্ছার দান ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে কাজ চালাবেন।

বাজেটে এই কাজের জন্য মোট ৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে '৯৫-৯৬-এ ৮৫ কোটি, '৯৬-৯৭-এ ১৭০ কোটি, '৯৭-৯৮-এ ২৫৫ কোটি, '৯৮-৯৯-এ ২৫৫ কোটি ও '৯৯-২০০০ সালে ৮৫ কোটি। শিশু প্রতি খরচের হিসাব বছরে ধরা হয়েছে ৪২৫০ টাকা এর মধ্যে শিক্ষার জন্য ৩২ টাকা, স্বাস্থ্যের জন্য ৩২০ টাকা, সচেতনতার জন্য ৩২০ টাকা, কর্মী ও মূল্যায়নের জন্য ৩২০ টাকা ও বিবিধ খরচ বাবদ ৮০ টাকা। এই টাকা খরচ করা হবে প্রথা বহির্ভূত স্কুল পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য ব্যবস্থা, শিশুর পিতামাতা, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের আয় বৃদ্ধি ও এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শক্তিশালী ও যোগ্য করে তোলার জন্য।

এই কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে পরবর্তীকালে National Child Labour Policy-1987 তৈরি হয় যার মূল কাজগুলি ছিল যেখানে শিশু শ্রমিকের অবস্থান বেশি সেই এলাকায় National Child Labour Project তৈরি করে প্রোজেক্টের

মাধ্যমে কাজ করা। এই প্রোজেক্টের মূল কাজ বিভিন্ন বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রমিকের কল্যাণে কাজ করা, শিশু শ্রমিক আইন বলবৎ করা, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দেওয়া, বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া, পরিবারের আয় ও চাকরি বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকর করা, বিশেষ ধরনের স্কুল পরিচালনা, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ ও সমীক্ষা ও মূল্যায়ন।

এই এন পি এল প্রোজেক্ট কার্যকরী করার জন্য জেলায় জেলায় জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি করে একটি সমিতি গড়া হয় সমিতি নিবন্ধন আইনে। উল্লিখিত কাজগুলি এই সমিতির মাধ্যমে করার জন্য ব্যাপক নিয়মাবলী প্রণীত হয়। এই কাজের অংশ হিসাবে জেলায় জেলায় স্পেশাল স্কুল গড়া হয়। এই প্রোজেক্টে একমাত্র উত্তর ২৪ পরগনাতেই ৩৩টি স্পেশাল স্কুল গড়া হয়।

এই স্কুলগুলিতে যেসব শিশুকে নেওয়া হয়েছে তারা সত্যিকারের শিশু শ্রমিক কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাধারণ স্কুলের ছেলেরা যেহেতু ১০০ টাকা অনুদান ও অন্যান্য সুবিধেরা পায় না, তাই সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল ছেড়ে স্পেশাল স্কুলে এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। এর স্বার্থান্বেষী চক্রের কাজ ও যথাসময়ে কেন্দ্র থেকে অনুদানের টাকা না মেলায় এই স্কুলগুলি উঠে যাবার পথে। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের অবতারণা করছি। খবরের শিরোনাম "সাহায্য বন্ধ, শিশু শ্রমিকদের ৩৯টি স্কুলে তালা বর্ধমানে"। খবর হল — "কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায় বর্ধমান জেলার শিশু শ্রমিকদের জন্য তৈরি ৩৯টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। ওই স্কুলগুলিতে প্রায় ২০০০ শিশু শ্রমিককে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিশুরা এখানে বিনামূল্যে দুপুরে খাবার পেত। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিশু শ্রমিকদের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। বর্ধমানের জেলাশাসক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর টাকা না দিলে ঐ স্কুলগুলি আর চালানো সম্ভব নয়।" এটা শুধু বর্ধমানের চিত্র নয়, সারা দেশে এই একই অবস্থা। ২০০০ সাল তো আর কদিন পরে আসবে, প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা, রাজ্যসভা ও লালকেল্লার দেওয়া প্রতিশ্রুতির কি হবে।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশবলে সারা ভারতে বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রমিকের নিয়োগ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। আদেশে ১০-৬-৯৭-এর মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ করতে বলা হয়। প্রতিটি রাজ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়। কিন্তু এই সমীক্ষার রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা আসল তথ্যের ধারেকাছেও নেই। এ সম্পর্কে স্টেটসম্যান পত্রিকার ৪ঠা মে ১৯৯৭-এর একটি খবরের উল্লেখ করছি, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খবরটা এই — " Teams conducting a survey to identify children working in various factories in the industrial belt of Barrackpur in North 24 Parganas have found that most of the employees have given them leave and asked them to resume duty after the survey is over". ● ● "A senior official of the Labour Department said that the survey could not be conducted because of shortage of time. He said that the survey team has been asked to submit reports stating that few child labourers had been engazed in the hazardous factories in the State and situation was not alarming"

এ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১১ নভেম্বর ১৯৯৭-র একটি খবরের উল্লেখ করছি। খবরের শিরোনাম "দেশের প্রায় অর্ধেক শিশু শ্রমিক উড়িষ্যায়"। খবর হচ্ছে — "সারা দেশে মোট শিশু শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক উড়িষ্যাতেই কাজ করছে। এই রাজ্যে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার ২২২। অর্থাৎ সারা দেশের শিশু শ্রমিকের ৫০ শতাংশই এরাজ্যে নিযুক্ত। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর রাজ্যে শিশু শ্রমিকদের সনাক্তকরণ ও সংখ্যা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেছে"।

অথচ ভারত সরকারেরই এক রিপোর্টে জানা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র এই সাতটি প্রদেশে ভারতের মোট শিশু শ্রমিকের ৭০ শতাংশ বাস করে। উড়িষ্যা এদের ধারেকাছেও নেই। সুতরাং কি সমীক্ষা হয়েছে তা এই তথ্যগুলি থেকেই প্রমাণিত। গোটা দেশে ঐ সমীক্ষার সময়ে শিশু শ্রমিকদের তালিকারা পরিষ্কার দিয়েছিলেন এটাই হচ্ছে এক সত্য। সমীক্ষার পর তারা আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

শিশু শ্রমিক প্রথার বিলুপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রোগ্রাম International Programme for Elimination of Child Labour সংক্ষেপে I.P.E.C. ভারতে শুরু হয় ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক Memorandum of Understanding (MOU) স্বাক্ষরের পর। ২০ জানুয়ারি ১৯৯৩ ভারত পক্ষে ঐ চুক্তি-তে স্বাক্ষর করেন শ্রম সচিব এ কে মেহেতা। জার্মান সরকার ও আই এল ও-র এক চুক্তি বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রোগ্রাম চালু হয়। জার্মান সরকারই এর যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। এই প্রোগ্রামের কাজ হল শিশু, তার পরিবার, সমাজ ও সরকার সর্বস্তরে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, হিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজ, বিপজ্জনক কাজ থেকে শিশুদের রক্ষা, শিশুদের জন্য আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ১৯৯৩-৯৬-এর মধ্যে ভারতে মোট ১১৮ প্রোগ্রাম এই সময়ে নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ৫৮টি ছিল IPEC বাকিটা CLASP অর্থাৎ Child Labour Action And Support Project. দুটি প্রোগ্রামই আই এল ও ও ভারত সরকার গঠিত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত, যার শীর্ষে আছেন ভারত সরকারের শ্রমসচিব। সারা পৃথিবীর ২০টি দেশে এই প্রোগ্রাম চলছে। এর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ চলছে ভারতে। ভারতই হচ্ছে সর্বপ্রথম দেশ যে আই এল ও-র সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৯৩-৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতে এই প্রোগ্রাম বাবদ ৫১ লক্ষ ২৬ হাজার ৩২৫ ডলার বরাদ্দ করা হয় যার মধ্যে খরচ হয়েছে ৪১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৫ ডলার। পি এ সাংমা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে জার্মান প্রধানমন্ত্রীর এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারত সরকারের সাথে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আই এল ও ও জার্মান সরকারের সাথে মতবিরোধ ঘটে। ফলে ভারতে আই এল ও-র প্রোগ্রামগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে কোন সরকারই এই প্রোগ্রামগুলি সুষ্ঠুভাবে চলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে

সক্ষম হননি।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে আই এল ও ভারতে সরকারের সাথে আলোচনা করে ভারতে আই এল ও-র প্রকল্পগুলির কাজকর্ম মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেন যার শীর্ষে ছিলেন এ পি ভার্মা, উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রধান সচিব। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন — এই কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারি আধিকারিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। এই কমিটিকে ভারতে আই এল ও-র IPEC এবং CLASP প্রোগ্রামগুলি (Child Labour Action Support Programme) খতিয়ে দেখে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারিত হবার কথা।

কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্ট ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে দাখিল করেন। চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। ভারতে আই এল ও / আই পি ই সি প্রোগ্রামগুলি এখন কার্যত বন্ধই আছে। এতদিন ধরে তৈরি সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নতি ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী কাজে লাগানো আর সম্ভব হচ্ছে না। কবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারছে না।

শিশু শ্রমিক প্রথার জন্য শিশু, শিশুর পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার এক হিসাব দিয়েছেন মিঃ এস পি হোসেন, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, আই পি ই সি / আই এল ও প্রোগ্রাম ইন ইন্ডিয়া এবং গৌতম ঘোষ, শ্রমিক নেতা তাদের "Trade Union and Elimination of Child Labour" প্রবন্ধে। প্রতিটি কর্তব্যরত শিশু শ্রমিকের জন্য একজন বয়স্কের চাকুরি হচ্ছে না। এরা বেতন কাঠামোকে স্তব্ধ করছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অপরিসীম ক্ষতির কারণ এরা। একজন শিশু শ্রমিক শিশু শ্রমিক থাকা অবস্থায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সৃজনশীলতা, পরিবেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়ে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার জন্য তার কর্মক্ষমতা ও আয় কমার ফলে সে অন্ততঃ টাকার অঙ্কে ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশের বর্তমান শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবথেকে কম ১ কোটি ৭০ লক্ষ ধরলে এরজন্য পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কম করে ১৬০০ কোটি টাকা। আর্থিক ক্ষতি ছাড়া সামাজিক অবক্ষতি আরও বেশি।

শিশু শোষণে মালিক শ্রেণী এবং আধিকারা এত সংঘবদ্ধ যে সংগঠিতভাবে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ছাড়া প্রতিরোধ সম্ভব নয়। শিশুদের পক্ষে প্রতিবাদ করা খুবই কঠিন। শিশুদের নিয়ে যথা ব্যবসা করে তারা যে কত নির্মম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'ইকবাল মাসী'। ১২ বছরের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিস্টান শিশু শ্রমিককে ১৮-৪-৯৭ তারিখে ইসলামাবাদে গুলি করে মারে কার্পেট মালিকরা। এর অপরাধ সে সুইডেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক সম্মেলনে কার্পেট মালিকদের দ্বারা শিশুদের শোষণের এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেয়। বস্টনের এক বিশ্ববিদ্যালয়-এর জন্য তাকে স্কলারশিপ দেয়। U.S. Shoe Company তাকে 'Reebok Youth in Action Award'-এ ভূষিত করে যার অর্থমূল্য ১৫০০০ ডলার। এই টাকা সে শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের কথা ঘোষণা করে। শিশু শ্রমিকের স্বার্থে কাজ করতে গিয়ে এই শিশুটির নির্মম মৃত্যু বিশ্বের ইতিহাসে সভ্যতার মৃত্যু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬-র শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত মামলায় যে ঐতিহাসিক রায় দেন তাতে সরকারকে কতকগুলি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশগুলি হল :

(১) বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত সমস্ত শিশুদের কাজ থেকে সরিয়ে আনতে হবে (২) যে সমস্ত মালিক শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন- ১৯৮৬, লঙ্ঘন করে বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেক শিশুর জন্য ২০,০০০ টাকা করে 'শিশু শ্রমিক কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিলে' জমা দিতে হবে : তারা ঐ কাজ থেকে শিশু শ্রমিকদের ছাড়িয়ে দিতে চাইলেও ঐ টাকা দিতে হবে। (৩) প্রতিটি শিশু শ্রমিকের পরিবারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক বেকারের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে, অন্যথায় প্রত্যেক শিশুর জন্য রাজ্য সরকারকে ঐ তহবিলে ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে (৪) উক্ত তহবিলে দের ২০,০০০ বা ২৫,০০০ টাকা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ আয়সম্পন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যে সুদ পাওয়া যাবে তা ঐ সব শিশুর ভরণপোষণের জন্য তাদের অভিভাবকদের দিতে হবে (৫) ঐসব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে, তবে শিশুরা অভিভাবকরা যদি শিশুকে পড়াশোনা করতে না পাঠান তবে এই শর্ত বলবৎ হবে না (৬) অবিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি হবে না এবং (৭) প্রত্যেক শিশু শ্রমিকের জন্য প্রতিদিন অন্তত ২ ঘন্টা করে পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে ; আর তার ব্যয় বহন করতে হবে ঐ মালিককেই। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর শিশু শ্রমিকদের ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন। আশামিদিনে এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে বহু শিশু শ্রমিক ও তার পরিবার উপকৃত হবেন এটা আমরা ধরে নিতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথমমন্ত্রী শান্তি ঘটক শিশু শ্রমিক সমীক্ষার আবেদনে বলেছেন "যেসব হতভাগ্য শিশু কৈশবেই রুটি রোজগারের তাগিদে শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তারা অন্যান্য শিশুদের মত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। তারা মা-বাবার স্নেহ-মমতা, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও শিক্ষালীকার সুযোগ থেকে হয় বঞ্চিত। তাদের অনেকেই মালিকের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়। তারা বড় হয় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে। তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সম্যকভাবে হতে পারে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি দেশে সৃষ্টি হয় একশ্রেণীর স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, নীতিবোধহীন নাগরিক। সমাজ, দেশ ও জাতির উপর এর পরিণাম কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।"

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভিভাবক ও বর্তমান প্রজন্মের শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। কিন্তু বর্তমানে শিশুরাই চরম উপেক্ষিত। শিশুদের আনন্দের ধনি একান্নবর্তী পরিবার আজ ছেড়ে চুরমার। পরিবার ছোট হচ্ছে। নিঃসঙ্গ শিশুরা বাড়ছে এক ভয়াবহ শূন্যতার মাঝে। বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার গড়ার চাইতে একসাথে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে প্রবৃত্তির তাড়নায় জন্ম নেওয়া শিশুদের দায়িত্ব কে নেবে। বাবা না মা? এই শিশু ভবিষ্যতে

নিরাপত্তাহীন হয়ে সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না কে বলতে পারে। কলম্বিয়ায় এরকম ২০টি শিশুকে রাস্তায় গুলি করে মারা হয়েছিল শুধু এই কারণে যে তারা ভবিষ্যতে চোর-গুণ্ডা-বদমাইস হয়ে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে।

শিশু শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এটা উপলব্ধি হয়েছে সমস্যার গভীরতা অনুযায়ী পরিকল্পনা, অর্থের যোগান ও কার্যকরী করার জন্য বেচ্ছাসেবী রূপায়ণকারী তৈরি করতে না পারলে শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক সরকারি কর্মচারী দিয়ে এ কাজ কোন দিনও সম্ভব হবে না। শিশু শ্রমিক উৎপত্তির মূল কারণগুলি মূলে কুঠারাঘাত করলে এবং যোগান বন্ধ হতে বাধ্য। যোগান বন্ধ হবার ব্যবস্থার সাথে সাথে বর্তমান ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকদের দুঃখকষ্টের সামর্থ অনুযায়ী লাঘব করার চেষ্টা চালালে আগামী ৮ বছরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য, কেননা ততদিনে বর্তমান শিশু শ্রমিকেরা বয়স্ক হয়ে যাবে। হয়ত এর জন্য একটা প্রজন্মকেই মূল্য দিতে হবে। শিশু শ্রমিকের নতুন যোগান বন্ধের জন্য পরিবারের কল্যাণ, আয় বৃদ্ধি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ৫ বছরের শিশুরা যাতে কাজে না গিয়ে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক স্কুলে যেতে পারে তার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে করতে হবে। তাহলে নতুন শিশু শ্রমিক যোগান বন্ধ হবে। বর্তমানে যারা স্কুলে আছে তারা যাতে ছেড়ে না যায় এবং ছেড়ে গেলেও তাদের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ঘুরেফিরে তারাই শিশু শ্রমিক হতে বাধ্য।

দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত পরিবারই শিশু শ্রমিক যোগানের উৎসমুখ। অল্প বয়সে বিয়ে করে বংশবৃদ্ধি সন্তান উৎপাদনের ফলে পরিবারের স্বনির্ভরতা নষ্ট হয়। শিশুদের কাজে লাগিয়ে অন্নের পেটভাতের ব্যবস্থা বা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হয়। ভোটের রাজনীতি ত্যাগ করে বিবাহ সংক্রান্ত আইন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এদের জন্য কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যদি আইন নাও থাকে তবে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের পথ অবলম্বন করে পরিবার সীমিত করার ব্যবস্থা নিতেই হবে। এজন্য চাই নিবিড় পরিকল্পনা ও প্রয়োগের নিষ্ঠা।

কিন্তু কে করবে এই কাজ? বর্তমানে রাষ্ট্রনায়কেরা নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের গোষ্ঠীর ও নিজের দলের স্বনির্ভরতা নিয়ে ব্যস্ত। অন্ন নেই, চাকরি নেই, অথচ কে কত অন্ন পাবে, চাকরি পাবে তাই নিয়ে রাজনীতি করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে অপরিণত স্বার্থান্বেষী ধান্দাবাজের দল তারা কি বুঝবে শিশু শ্রমিকের মর্মবেদনা। একটা অপরিচিত বোমার খরচে কত লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষার উপায় হতে পারে তা কি তাদের জানা আছে? দেশের সুরক্ষার নামে বর্তমান প্রজন্মের এই বলিদান আগামী দিনে কাদের সুরক্ষা দেবে, যারা বেঁচে থেকেও মৃত থাকবে তাদের জন্য?

কবি জীবনানন্দ সাগর একটি কবিতা বারবার মনে পড়ে —

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি
আজ তারা দেখে সবা'

*

তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত

ধনিয়াখালি ❐ হুগলি

পাকা রং, নিখুঁত বুনন, আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইনের শাড়ি ও ধুতি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

অফিস ও গোডাউন : ধনেখালি বি ডি ও অফিসের সামনে।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র : ধনেখালি রূপবাণী সিনেমাতলা (বাস স্টপেজ)

পথ নির্দেশ : হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে শিবাইচণ্ডী স্টেশন থেকে তিন কিমি পথ।

হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ১৭নং বাসে ধনেখালি সিনেমা স্টপেজ।
তারকেশ্বর হইতে ১৭নং বাসে ধনেখালি সিনেমাতলা স্টপেজ।

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

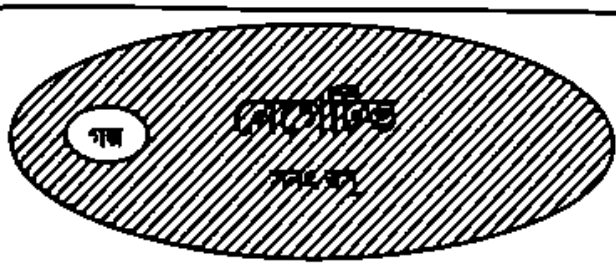

রেলাইনের ধার ধরে সাইকেলে বাড়ি ফিরছি। শেষ বিকেলের প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর প্রকৃতি এই মুহূর্তে বস্ত্রান্ত সৈনিকের মত নিঃসাড়, নিষ্পন্ন।

রাত প্রায় সাড়ে দশ। সামনে ভরা-অমাবস্যার কনক্রিট অন্ধকার। নির্জন। এতরাতে ভুলেও কেউ এ পথ মাড়ায় না। ছিনতাই রাহাজানির ভয়। বছর দুয়েক আগে জোড়া লাশ মিলেছিল সিগন্যাল পোস্টের নিচে।

ডাইনে মাথা-সমান উঁচু ঘুলো রোপ। তার পিছনে কচুরিপানায় ঢাকা নিকাশি নালা। নালার পশ্চিমপাড়ে নেতাজি কলোনী। একটানা অনাহ্য গরমের পর প্রথম বর্ষার ঠাণ্ডায় আমেজে নেতাজি কলোনীও যেন ঘুমে অসাড়।

একমাত্র পিছনের স্টেশন চত্বরে লোকজনের কিছু আনাগোনা। রেল ব্রিজের নিচে বসা হকারদের হাঁক-ডাক। অন্ধকারের সমুদ্রে যেন ছোট্ট এক প্রণময় আলোক-দ্বীপ।

আমার খুব তাড়া। মাকে বলেছি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। ও নিশ্চয়ই জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনতেই যা নার্ভাস ও।

তপনকে কত করে বললাম, আজ থাক, আরেকদিন এসে তোর গল্প শুনব। কিছুতেই শুনল না। একটু বসে যা, বেশিক্ষণ লাগবে না। আর একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কী? তাতে বৌ-এর কাছে দর বাড়ে বই কমে না।

তপনের মুখকে আমার ঘরাবরের ভয়। একবার শুরু করলে কোথায় গিয়ে থামবে ও নিজেই জানে না।

অগত্যা বসতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চা তেলেভাজা আসে। তপন পড়া শুরু করে। কিন্তু এ যে গল্প নয়, ছোটখাটো উপন্যাস। শেষ আর হতে চায় না। আমাকে উসখুস করতে দেখে তপন পড়ার গতি বাড়ায়। গল্প শেষ হয় কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।

আবার চা। এবং তপনের পীড়াপীড়িতে গল্প সম্পর্কে আমার মতামত। তার ফলে আরো পনেরো মিনিট। এরপর 'চলি' বলে সটান সাইকেলে উঠে পড়া এবং মাইলখানেক পথ ঠেঙিয়ে স্টেশনের লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে নামা।

লেভেল ক্রসিং পেরোতেই দৌ চেপে বসে। লাইন ধারের রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে কলোনীর ভিতর দিয়ে শর্টকাট বাড়ি ফিরব। কারণ বড় রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরতে হয়, মিনিট সাত আট বেশি লাগে।

ভাবা মাত্রই কাজ। লাইন পেরিয়ে সাইকেল সোজা না গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যায়।

এবড়ো-খেবড়ো পায়ে চলা পথ, লাইন বরাবর দক্ষিণে বেশ খানিকটা গিয়ে ডাইনে একটা কাঠের কালভর্ট পেরিয়ে কলোনীর ভিতর ঢুকছে।

কাঁকুনি খেতে খেতে সাবধানে এগোই। এমন অন্ধকার যে দুহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

স্টেশন পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ সামনের ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে আসে কোন যুবতীর কণ্ঠ, 'ছেড়ে দেন আমাকে ছেড়ে দেন'।

পরমুহূর্তেই ধস্তাধস্তির শব্দ। উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ, 'জল করে চেপে ধর, একদম ছাড়বি না'

অর্থাৎ একাধিক পুরুষ।

আমার শরীরে হাই-ভোল্টেজের বিদ্যুৎ শিহরণ। একুনি বাধা না দিলে চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে মেয়েটার।

দু'পা এগিয়েও থমকে দাঁড়াই। ওরা নিশ্চয়ই নিরস্ত্র নয়। তবে কি চিৎকার করে উঠব? চিৎকার শুনে যদি লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু তার আগেই তো ওরা আমার

এবার ডুকরে কান্না। কাচের চুরি ভাঙার চুনঠান শব্দ। তার মানে মেয়েটির সমস্ত প্রতিরোধ শেষ হয়ে আসছে।

আমার মাথা ঝিমঝিম করে। হাত পা কাঁপতে থাকে। জীবনে কোনদিন এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। উঃ। অন্ধকারের দেওয়ালটাকে যদি এই মুহূর্তে হটানো যেত।

হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলক। ছুটন্ত আলোটা ক্রমে বড় হতে থাকে।

আপ লাক্সিপুর লোকালের চলমান আলোর আমার চোখে ভেসে ওঠে এক অভাবিত দৃশ্যপট।

নিমেষে সাইকেল থেকে ছুটে যাই। তিনজন পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস ট্রেনের চাকার নিচে দুবার থেকে বাঁচিয়ে আনে বেপরোয়া মেয়েটাকে।

ট্রেন চলে যেতে আবার জমাট অন্ধকার।

— রমেশদা, এত রাতে?

ছেলেটির গলা বড় চেনা মনে হয়।

— এই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে ঠিক

— আমি হিমাংশু। মৌচাক ক্লাবের বাইট বাক। সঙ্গে আপনার পাড়ার অশোক। মিতালী সংঘের ফরওয়ার্ড।

— দু'জনকেই চিনতে পেরেছি।

আসলে দীর্ঘদিন ধরে জেলা ফুটবল কেতাবেলনের সদস্য থাকার সুবাদে এলাকার বিভিন্ন ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার ভালই পরিচয়।

— কি ব্যাপার বল তো? এ কে? কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করি।

— চিনি না। আমরা খাওয়া সেরে ক্লাবের সিঁড়িতে বসে এসে বসেছি, দেখি ইনি কাঁদতে কাঁদতে লাইনের দিকে ছুটছেন। সন্দেহ হওয়ায় চুপি চুপি পিছু নিলাম। দেখি দু'মস্কর রেল লাইনে উপর টলটল ওয়ে পড়লেন। আমরা টেনে না আনলে একটু আগের ডাউন নৈহাটি লোকালেই কাটা পড়তেন। হিমাংশু স্মিত ভঙ্গিতে বলে।

মেয়েটাকে ভাল করে দেখবার জন্য মোবাইট জ্বালাই। আলো দেখে মেয়েটিও নতমুখ তুলে আমাদের দিকে তাকায়।

ঝলকের আলোতেই বাসন্তীকে চিনতে পেরে আমি চমকে উঠি। বছর দেড়েক আগে আমার বাড়ি ঠিকে কাজ করত। ছেলে হবার পর কাজ ছেড়ে দিয়েছিল।

ওর স্বামীর নাম শঙ্কর। স্টেশন বাজারে অমাজ বিক্রি করে। শুনেছিলাম আমাদের পাড়াতেই বগেন সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকে।

বাসন্তীও আমাকে চিনতে পেরেছে। পা জড়িয়ে কাঁদে। 'আমারে কেন বাঁচালে দাদাবাবু, মরা ছাড়া গতি নেই আমার।'

— লজ্জা করে না কোলের বাচ্চা ছেলে মরতে আসতে? আমি ধমকে উঠি।

— কি করব! আমারে যে ওরা বাঁচতে দেবে না। রাতদিন বলে টেনে গলা দেও। জলে ডুবে মরো

বাসনার ধরা গলা।

কথা না বাড়িয়ে বাসনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরমুখো করেই। আমাদের পাশাপাশি মুখে আঁচল চেপে কাঁদতে কাঁদতে চলে বাসনা।

কথায় কথায় জানা হয় বাসনার বাপের বাড়ি সুন্দরবন। গাঁয়ে আপন বলতে কেউ নেই। এক দূরসম্পর্কের মামা পাঁচশো টাকা খেয়ে তাকে শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সেই যে ভেগেছে আর দেখা নেই।

শঙ্কর ওকে ভালবাসত। খেতে পরতে দিত। কিন্তু স্টেশনের উপর দিয়ে ওভারব্রিজ হবে বলে পুলিশ রাস্তার বাজারটা তুলে দিল। পাটি থেকে নতুন যে জায়গায় বাজার বসালো, সেখানে শঙ্করের জায়গা হল না।

বাধ্য হয়ে শঙ্কর জায়গা নিল এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের কোণে। তারজন্য রোজ পুলিশের সঙ্গে দৈনিক পাঁচ টাকার ফয়সলা। কিন্তু নতুন জায়গায় কেরোসিন কম। তিনটি প্রাণীর পেট চালানোই দায় হল।

গোল বাঁধল এক্স অনটনের দিনে শঙ্করের মা নলীবালা ছোট ছেলে বিমলের গলাধাক্কা খেয়ে এ সংসারে এসে পড়ায়।

ছোট্ট এক চিলতে ঘর। তিনজনের বেশি শোবার জায়গা হয় না। তাই নলীবালাকে বারান্দায় শুতে হয়। নলীবালার তাতে ঘোর আপত্তি। ছেলে জোয়ান বৌ নিয়ে ঘরে সোহাগ করবে, আর বুড়ি মা বাইরে পড়ে কষ্ট পাবে — এ কোন ধর্মে লেখা আছে?

খাওয়া নিয়েও অশান্তি। বৌ ভাত বেড়ে দিলে শাশুড়ির পেট ভরে না। আবার শাশুড়ি হাঁড়ি থেকে নিজে ভাত নিয়ে খাবে। বৌ-এর তা একদম না পছন্দ।

নলীবালা বৌ-এর বিরুদ্ধে নালিশ করে ছেলের কাছে। ছেলে চুপ করে থাকে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিমলের কাছে পাঠিয়ে দেবার ভয় দেখায়।

নলীবালার সমস্ত রাগ তখন বাসনার উপর গিয়ে পড়ে। বাসনাকে জব্দ করার জন্য নানান ফন্দি আঁটে।

বাড়িওলার ছোট ছেলে কন্টু খুব নওড়ে। বাসনার ছেলে গোপালকে কন্টু 'চিনা' বলে ডাকে। বারান্দায় সামনে দাঁড়িয়ে 'চিনা' বলে হাঁক পাড়লেই গোপাল ও ছুটে নেমে আসে। এই 'চিনা' নামটা বাসনার একেবারেই পছন্দ নয়। কন্টুর উপর তাই মুখিয়ে ওঠে। কন্টু মজা পেয়ে বাসনার নাম দেয় 'জরাগ্রস্তা'।

টিভিতে দৌলতে হিন্দি বইয়ের নায়িকার নাম বাসনার জানা। রোজ বুধবার পাশের কুমারদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে 'চিত্রহার' তার দেখা চাই। তাই কন্টুর এবারের দেওয়া নামটায় ও মুখ টিপে হাসে। বেকার কন্টু তাতে প্রশ্রয় পেয়ে ফাজলামির মাত্রা বাড়ায়।

এই কন্টুকে নিয়েই মিথ্যে কাহিনী বেঁধে সরলমনা শঙ্করের কানে বিষ ঢালে নলীবালা। বাসনার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে। একদিন নিজের চোখে বাসনাকে কন্টুর সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখে রাখার খুন চেপে যায় শঙ্করের। ঘরে ডেকে এনে চালাকাঠ দিয়ে পেটায়।

এরপর প্রায়ই স্বামী-শাশুড়ির কিল-চড় লাথি খেতে হয় বাসনাকে। সঙ্গে অকথ্য গালাগালি।

পাড়ায় ঢুকে শঙ্করকে পাওয়া যায় যখন সরকারের বাড়ির সামনে। নর্দমার ধারে বসে অন্ধকারে বিড়ি টানছিল।

অশোক গিয়ে ঘাড় ধরে টেনে আনে ল্যাম্পপোস্টের আলোর কাছে। হিমাংশু চুলের মুঠি ধরে। স্ট্রীকে মারতে পাঁয়তারার জন্য কৈফিয়ৎ চায়।

— আমার বৌরে আমি যা খুশি করব, তোমাদের কি? তোমরা ওরে খাওয়াও, না পরাও? শঙ্কর ফুঁসে ওঠে।

— আমাদের কি? দাঁড়া, দেখাচ্ছি — বলে হিমাংশু ছুটে গিয়ে একটা বাঁশ হাতে তুলে নেয়।

আমি কোনরকমে হিমাংশুকে ঠেকাই। সেই ফাঁকে অশোক সপাটে চড় হাঁকড়ায়। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় শঙ্করের গালে। ঠোঁটের কষা বেয়ে রক্ত গড়ায়। ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে শঙ্কর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

ছেলের কান্না শুনে বাড়ির ভিতর থেকে গাল পাড়তে পাড়তে ছুটে আসে নলীবালা। দীর্ঘ কঙ্কালসার শরীর। কোটরাগত চোখ। পরনে শতছিন্ন ময়লা ন্যাকড়া। কোমরের উপর থেকে দেহের বাকি অংশ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে সামনে ঝুঁকে পড়েছে।

বাসনাকে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে দেখে মেজাজ সপ্তমে ওঠে নলীবালার।

— নিজির সোয়ামীরে লোক দিয়ে মার খাওয়াতি বুক কাঁপে না? তারপর আমাদের দিকে ঘুরে চেঁচায়, পেরীডারে বাঁচারে এইনে খুব উপকার করিছো? ইবার ঐ রাক্ষুসী আমারে যমের বাড়ি পাঠালি কিডা বাঁচাবে শুনি? শালি আমারে বলে কিনা রাস্তার ভিক্ষে কইরে খা।

আঁচলে চোখের জল মুছে এবার বাসনাও মুখিয়ে ওঠে, বেশ করেছি, শাকচুন্নি, ডাকাবুকি, আমার সোয়ামীর কানে কুমন্তর দাও। তোর মরণ হয় না, কানীবুড়ি?

— কেন্তরে ছেনালমাগী, মরব কেন? আমারে মেইরে তুই অন্য পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ করতি চাস?

— মুখ সামলে কথা বলবি বুড়ি খানকি, জিভ খসে পড়বে তোর।

এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবার আগেই দু'জনের চুলোচুলি বেঁধে যায়। সঙ্গে অশ্রাব্য খিস্তি, শাপশাপান্ত।

অনেক কষ্টে দু'জনকে দু'দিকে সরাই। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনজনকেই বকাবকি করি। আবার তিনজনের পক্ষ নিয়ে কথা বলি। যাতে আমার নিরপেক্ষতা নিয়ে ওদের মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে।

এই চালে কাজ হয়। সবকিছু ঠাণ্ডা করে একটা মিটমাটের পরিবেশ তৈরি করতে রাত বারোটা বেজে যায়।

এক বুক আশঙ্কা নিয়ে সাইকেলটা টানতে টানতে বাড়ি ফিরে দেখি তন্দ্রা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মনে মনে সন্ধ্যার ঝড়বৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে যাই।

(২)

পরদিন বিকেল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি।

পাড়ায় ঢোকার মুখে দেখি ছেলে কোলে বাসনা দাঁড়িয়ে। মাথা নেড়ে কুশল জানিয়ে সবে দুপা এগিয়েছি, পিছন থেকে বাসনার ডাক, 'দাদাবাবু'।

আমাকে থামতে হয়।

বাসনা এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। কথা বলে না।

— কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি বল। আমাকে বাড়ি ফিরেই বেরোতে হবে।

— ওরা চলে গেছে। বাসনার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে।

— ওরা মানে? আমি কিছু না বুঝতে পেরে প্রশ্ন করি।

— শান্তড়ি আর ও।

এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ায় আশ্চর্য হই।

— কোথায় গেছে বলে যায়নি?

— না। বাসনা মাথা নাড়ে। ভোর রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। এখন আমি কি করব দাদাবাবু? বাসনার বিমূঢ় কণ্ঠ। চার মাসের ঘর ভাড়া বাকি। মুদি দোকানেও তিনশো, ছেলেটার মুখে কি যে দেব ..

বাসনার আতঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠি। স্বামী পরিত্যক্তা এই যুবতী, গ্রাম্য বধূকে আমি কি করে বাঁচাব? আবার কিছু না করলে সমাজের পাঁকে ও অচিরেই হারিয়ে যাবে।

কুড়িটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বলি, 'পরে দেখা করিস'।

এরপর বাসনা প্রায়ই আসে। সাহায্য চায়। কাজ চায়। ছেলেকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবার জন্যে বলে।

বাধ্য হয়ে আমাকে পথে নামতে হয়। পরিচিত লোকজনদের বলি বাসনার একটা কাজের জন্য। খগেন সরকারকে বলে আসি বাসনাকে যেন জোর করে তুলে না দেওয়া হয়। আমার ক্লাবের ছেলেরাও চাঁদা তুলে শ'চারেক টাকা যোগাড় করে দেয়।

এভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে যায়। হঠাৎ খেয়াল হয় বাসনা আর যোগাযোগ রাখছে না তো। হয়ত ওর কোন হিল্লে হয়েছে। নয়তো কারো পাল্লায় পড়ে লাইনে নেমেছে। শেষ শেষ করেও আর খোঁজ নেওয়া হয় না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আমাকে মাস দুয়েকের জন্য গৌহাটি যেতে হয় অফিসের কাজে।

(৩)

গৌহাটি থেকে ফিরেছি দু'সপ্তাহ হয়ে গেছে।

সেদিন তপ্তার ফরমাশ মত বাজারে ডুমুরের খোঁজে বেশ কয়েকবার চক্কর মারতে হয়। কোথাও না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ শঙ্করকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। আগের মতই শালপাতা নিয়ে বসেছে নর্দমার উপর মাচা করে। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ডুমুর ওর কাছে রয়েছে দেখে এগিয়ে যাই।

হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত ডাক, 'দাদাবাবু'। ঘাড় ফেরাতেই দেখি বাসনা। এক হাতে চায়ের গেলাস, অন্য হাতে ছেলেকে টানতে টানতে আসছে।

ডুমুর দর করতে শঙ্কর না মেপেই আধ-কিলোর মত থলের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়। দাম দিতে গেলে হাত জোড় করে। 'আপনার থেকে পয়সা নিতে পারব না'। বাসনাও স্বামীর সঙ্গে গলা মেলায়।

ওদের ব্যবহারে খুশি হই। আজকাল ক'জনই বা উপকারীর উপকার মনে রাখে।

বাসনার কাছে জানতে চাই, শান্তড়ি একসঙ্গে আছে তো?

— তিনি দেওরের কাছে থাকেন। বাসনা একটু থেমে বলে।

— তাড়িয়ে দিয়েছে? মুচকি হেসে বাসনার মুখের দিকে তাকাই।

তাড়াব কেন? বাসনা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। আমিই পোষাল না বলেই তো ...। তারপর গলা নামিয়ে বলে, শুনলাম কোন আশ্রমে লাগাবে দেওর। শুধু দু'বেলা ঠাকুর সেবার বাসনগুলো মাজতে হবে।

— পারবে এই বয়সে?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে। বাসনা জোরের সঙ্গে বলে। আমরা গরিব মানুষরা দাদাবাবু জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারদের মতন। যতক্ষণ শরীরে ক্ষমতা, ততক্ষণই বেঁচে। ক্ষমতা শেষ তো আয়ু শেষ।

— এখন কোথায় থাক? আমি প্রসঙ্গ পাল্টাই।

— কেন? ঐ সরকার বুড়োরই বাড়ি। তিন মাসের ভাড়া শোধ করেছি।

যাই হোক বাসনা আর শঙ্করকে মিলতে দেখে আমি খুশি। সেদিন বাসনা আত্মহত্যা করলে এ দৃশ্য কোনদিনই দেখা হত না। ভাবতে ভাল লাগে বাসনাকে সাময়িক মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনতে আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। একটা দরিদ্র পরিবারকে চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা গেছে বলে মনে মনে ঘাষা বোধ করি। একটাই শুধু আপসোস, নদীবালাকে একসঙ্গে রাখা গেল না।

তিন বছরের পর।

কাকভোরে কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙে।

দরজা খুলে দেখি খগেন সরকার।

— কি ব্যাপার? আমার বিরক্তি ভরা কণ্ঠ।

— এক্ষুনি আমার বাড়ি যেতে হবে। বৃদ্ধের বিচলিত স্বর।

— কি হয়েছে?

— বাড়ি আসলে জানতে পারবেন। বৃদ্ধ আর দাঁড়ায় না।

মানুষের উপকার করার এই হল হ্যাপা। নিশ্চয়ই শঙ্কর আর বাসনার মধ্যে আবার লেগেছে। এখন যত ঝামেলা আমাকেই পোহাতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াই।

আবছা আলো আঁধার। ওন-গান গুমোন ভরা। পশ্চিম আকাশে উঁকি মারছে বাঁকা চাঁদ। বাতাসে হেমন্তের হিমেল ছোঁয়া।

নিসুম প্রকৃতির মনোরম সান্নিধ্যে বিরক্তি ভাবটা কখন যে কেটে গেছে টের পাইনি।

খগেন সরকারের বাড়ির সামনে এসে বেশ কটা লোক এই কাকভোরে উল্টোদিকের বিশ্বাসদের বাড়ির গেটের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে খগেন সরকার 'আসেন' বলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান।

উঠোনের দক্ষিণ দিকে একটা ঘোপ। ঘোপের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে ছিটবেড়ার ছোট্ট একটা ঘর। চালটা বেশ নীচু। ঘরের দাওয়ার কাছে থমড়ি খেয়ে পড়েছে কাঁকড় এক তেঁতুল গাছ। তাই অন্ধকারে ঠেকেছিল।

আমি মনে মনে তৈরি। আর ছাড়ব না বাসনাকে। হয় ভদ্রভাবে থাকো, নয় ভাগো পাড়া থেকে। এটাই লাস্ট ওয়ার্নিং।

খগেনবাবু কখন যে এগিয়ে গেছেন খেয়াল করিনি। ঘরের দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমাকে কি যেন দেখান। লক্ষ করি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আরো কাছে যাই। দরজার ঝাঁপা নেই বলে দাওয়ায় পা রেখেছি। তখনই দৃষ্টি আটকে যায় বাঁ পাশের অন্ধকারে।

আমার থেকে মাত্র চার পাঁচ হাত তফাতে নদীবালার ঝুলন্ত শরীর। মাটি থেকে ফুটখানেক উঁচুতে দুই পা।

মুখটা ভাল করে দেখার জন্য একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াই।

কয়েকটা মুহূর্ত।

হঠাৎই আবিষ্কার — ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো জলন্ত ঘৃণা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নদীবালা।

যেন বলতে চাইছে, বাসনাকে বাঁচাতে আমাকে মারলি তুই — তোর জন্যই আমি ...

□

With
Best
Compliments
From :

Katwa-Kalna Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

UDYOG BHAWAN

K. G. Bose Sarani
P.O.- Katwa
Dist. Burdwan
Phone - 55138; STD - 03453

Madan Choudhury
CHAIRMAN

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সমবায় সমিতি

অরুণোদয় সরকার

মেদিনীপুরে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হল এই যে মেদিনীপুরের খড়গপুর থানার খেলাড় গ্রামে অবিভক্ত বঙ্গ দেশের প্রথম সমবায় সমিতিটি স্থাপিত হয় ও সেটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কলকাতায় রেজিস্ট্রারের (Registrar of Co-operative Credit Societies, Bengal) কাছে পাঠান হয়। এর ঠিক অব্যবহিত পরেই খুলনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) রাতুলি গ্রামে গঠিত সমিতিটির কাগজপত্র রেজিস্ট্রারের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু রাতুলি গ্রাম প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি হওয়ায় এবং তাঁরা এই সমিতি সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকায় আচার্যদেবের প্রতি সম্মানার্থে রাতুলি সমিতিটির রেজিস্ট্রিকরণ নম্বর হয় ১ (এক) আর খেলাড় সমিতিটির রেজিস্ট্রিকরণ নম্বর ২ (দুই) দেওয়া হয়। অবশ্য নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে খেলাড় সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং ৯ (নয়) তং ২২-৬-১৯০৫। কাজেই এই সমিতির আগে আরও আটটি সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সমিতি দেশভাগের ফলে বর্তমান বাংলাদেশে চলে গেছে আর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাকি কয়েকটি সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সমিতিটি হচ্ছে এই খেলাড় সমিতি।

এই সমিতি, আর শুধু এই সমিতি কেন, মেদিনীপুর জেলার সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তক স্থাপয়িতা, প্রচারক এবং ধারক ও বাহক হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয় আর দুজন হলেন যামিনীমোহন মিত্র ও রতিনাথ বসু। প্রথমজন হলেন মেদিনীপুরের তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর আর দ্বিতীয়জন ছিলেন খেলাড় নিবাসী মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরির কর্মী (Record Keeper)।

১৯০৪ সালের ২৫ মার্চ ভারতে সমবায় আইনটি চালু হবার পর ঐ বছরের ২৫ অক্টোবর মিঃ ডব্লু আর গৌরলে, আই সি এস, বঙ্গদেশের (বিহার ও উড়িষ্যা সহ) রেজিস্ট্রার (Registrar of Co-operative Credit Societies, Bengal) হিসাবে কাজে যোগ দেন। তারপর তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে জেলা কালেক্টর ও অন্যান্য রাজপুরুষদের সহায়তা নিয়ে তাদের নির্বাচিত স্থানে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন তাঁর বিভাগীয় সহকর্মী ছিল মাত্র দু'জন করণিক। মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টার কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং সমবায়ের অন্তর্নিহিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ডেপুটি কালেক্টর শ্রীমিত্র মহাশয় সমবায় সমিতি সংগঠনে মনোনিবেশ করেন আর এই ব্রতের সহকর্মী হিসাবে বেছে নেন ঐ কালেক্টরির কর্মী তার ঘনিষ্ঠ পরিচিত আদর্শবাদী, কর্মঠ, পরহিতব্রতী, তীক্ষ্ণধী কর্মী রতিনাথ বসু মহাশয়কে। তাই একাজের জন্য প্রথম বেছে নেওয়া হয় খেলাড় এলাকাকে। এরা দুজন অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেলাড় এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি সমিতি গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালের মে-জুন মাসের মধ্যেই বলরামপুর, খেলাড় ইত্যাদি গ্রামে সমিতিগুলি রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে কাজ শুরু করে দেয়। মেদিনীপুর জেলার প্রথম সমিতি 'বলরামপুর কমার্শিয়াল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' নামে রেজিস্ট্রিকৃত হয় ১৯০৫ সালের ২৮ মে তারিখে। এরপর ঐ সালের ৯ জুন ঝাঁকড়া ও রাধানগর গ্রাম দুটিতে আরও দুটি সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এই সমিতিগুলির বর্তমানে অস্তিত্ব নেই।

অতঃপর রতিনাথ বসুর নিজ গ্রাম খেলাড় ও পার্শ্ববর্তী ১১টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠল খেলাড় সমিতি।

সমিতির অফিসে ও মেদিনীপুর ১নং ব্লকের সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী রেজিস্ট্রি অফিসে খেলাড় সমিতির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্রথম উপবিধি ইত্যাদির ছবিসহ মেলেনি। তবে সমিতির অফিসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি অতি পুরাতন উপবিধি পাওয়া গেছে। অবশ্য এটিতে রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারের সইসাবুদ নেই। উপবিধিখানির ওপর এক অস্পষ্ট সীলছাপ থেকে বোঝা যায় ১৯০৫ সালের ৩০ মে তারিখে সমিতি রেজিস্ট্রিকরণের কাগজপত্রাদি সহিত জমা হয়েছিল। এটি সাক্ষিপ্রমাণিত উপবিধির অবিকল নকল, প্রতিটি ধারাকৃতির নির্ভুলতা সমেত সমিতির অফিসে (অফিস কপি হিসাবে) রাখা আছে। তৎকালে সমিতি রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় কাগজপত্র জেলার কালেক্টরের অফিসে জমা দিতে হত। কালেক্টার সম্মতি দিয়ে কাগজপত্রাদি কলকাতায় রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি সমিতির রেজিস্ট্রিকরণ করতেন।

উক্ত উপবিধিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল আট, হাত ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে সমবায় কর্তৃক ছাপান। যে নিয়মের চার পৃষ্ঠায় ইংরেজি আর চারপৃষ্ঠায় তার অনুবাদ বাংলায় ছাপান।

সমিতিটি স্থাপনের জন্য ৪৬ জন ঐ উপবিধিতে আবেদনকারী হিসাবে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে প্রথম থেকে পনের করেক ব্যক্তির নাম দেওয়া হল :

শ্রী চৌধুরী গিরীন্দ্রনাথ সংপর্থী
পিতা ৺চৌধুরী ব্রজমোহন সংপর্থী।
শ্রী কমলমোহন মিত্র
পিতা ৺ভবকমল মিত্র।
শ্রী চৌধুরী যোগেন্দ্রনাথ সংপর্থী
পিতা ৺চৌধুরী বৈদ্যনাথ সংপর্থী।
শ্রী চৌধুরী আশুতোষ সংপর্থী
পিতা ৺চৌধুরী হিজলাথ সংপর্থী।
শ্রী চৌধুরী মণীন্দ্রনাথ সংপর্থী
পিতা ৺চৌধুরী বৈদ্যনাথ সংপর্থী।

উক্ত উপবিধিতে প্রথম পঞ্চায়েত কমিটির (Committee of Management) সদস্যদের নাম হিসাবে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে নিম্নে দেওয়া ব্যক্তিগণের নাম :

শ্রী রতিনাথ বসু, পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তি।
শ্রী কৈলাসচন্দ্র সংপর্থী, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী চৌধুরী আশুতোষ সংপর্থী, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী গোপালচন্দ্র মান্না, পঞ্চায়েতের সভ্য।

শ্রী দ্বারকানাথ দে, পঞ্চায়েতের সভ্য।

আর আছে তিনজন 'সুপার-বাইসরের' (Supervisor) এর নাম :

শ্রী: নিত্যচন্দ্র পাহাড়ি, সুপারবাইসর।

শ্রী: ঠাকুরদাস মিশ্র (ছোট), সুপারবাইসর।

শ্রী চন্দ্রমোহন মিশ্র, সুপারবাইসর।

উক্ত উপবিধির ললাটে লেখা রয়েছে —

Registered Name Khelar Rural Co-operative Credit Society.

Vill. Khelar

Post Benapur

District Midnapur

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালের প্রথম সমবায় আইনের বিধান অনুযায়ী সমস্ত সমিতিকে গ্রাম্য (Rural) বা শহরাঞ্চলীয় (Urban) এই দুভাগে ভাগ করা হত আর সমিতির নামের সঙ্গে এই শ্রেণীবিভাগ লিখে রাখা আবশ্যিক ছিল।

সমিতিটি গঠিত হবার সময় থেকেই এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে দারুণ উন্মাদনা ও অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়। পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও চৌধুরী শ্রী গজেন্দ্রনাথ সংপথী ছিলেন এই সমিতি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। এদের নেতৃত্বে ও অক্লান্ত চেষ্টায় একেকটি বিরাট কর্মীবাহিনী তৈরি হয়। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ দাস, সৃষ্টিধর সংপথী, ব্রজনাথ আচার্য, প্রভাকর প্রহরাজ। ফলত এই সমিতিকে কেন্দ্র করে সমবায়ের ঢেউ পার্শ্ববর্তী নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি ও খড়্গপুর থানায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের ও বলরামপুরের উৎসাহী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় খড়্গপুরে 'খেলাড়-বলরামপুর ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ১৯০৯ সালে।

স্থাপনকালে সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সুদযুক্ত ঋণ (loan on interest) প্রদান এবং সুদযুক্ত আমানত (deposit on interest) গ্রহণ। অবশ্য উক্ত উপবিধিতে সরাসরি সমিতির উদ্দেশ্যের উল্লেখ নেই। সম্ভবত সংশ্লিষ্ট আইনটির নাম (Co-operative Credit Societies Act) ও সমিতির নাম, কারা ঋণ পাবেন, কি উদ্দেশ্যে ঋণ পাবেন ইত্যাদিতে উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকাই এর কারণ। সমিতির সভ্য নন এমন ব্যক্তি ঋণ পাবেন না একথা স্পষ্টভাবে উপবিধিতে উল্লেখিত রয়েছে। সভ্য (member) হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির (Committee of Management) কোন অধিবেশনে আবেদন করতে হত। তাকে কমিটির পরবর্তী সভানুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত কারণ সেখানেই তার আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য যে বিধি অনুযায়ী সভ্যগণের এক-চতুর্থাংশের বেশি ব্যক্তি সভাপতি প্রস্তাবিত সভ্য সভ্যভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করলে তিনি সভ্য সভ্যভুক্ত হতে পারবেন না। আবেদন মঞ্জুর হলে সভ্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এক টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হত। অবশ্য শেয়ারের (share) বা অংশগত মূলধনের (share capital) ব্যবস্থা ছিল না।

সমিতিতে প্রথম বছরেই (৩১ মার্চ, ১৯০৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৫-০৬ সাল) ১৪৮ জন সভ্য হয়েছিল। এদের কাছ থেকে ১৪৮ টাকা ভর্তি ফি বাবদ পাওয়া গিয়েছিল। কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় মূলধন হিসাবে হ্যামিল্টন সাহেবের তাঁত থেকে ৩৫০ টাকা ঋণ পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোড়ার দিকে কাজ চালাবার মূলধন সংগৃহীত হত স্থানীয়ভাবে সমিতি কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণ বা আমানত ও রেজিস্ট্রার কর্তৃক দেওয়া ঋণ থেকে। রেজিস্ট্রার সহৃদয় রাজা, জমিদার, অন্যান্য ব্যক্তিগণের কাছ থেকে ঋণ বা আমানত হিসাবে টাকা সংগ্রহ করতেন আর তা থেকে সমিতিগুলিকে মূলধন জোগাতেন। স্যার জানিয়েল হ্যামিল্টন রেজিস্ট্রারকে শতকরা ৬ টাকা সুদে দশ টাকা দিয়েছিলেন। মিঃ কি ডি পাইন, কৈলাসেশ্বরী তাঁত, ডোমপাড়া ওয়ার্ড এস্টেট, বেতিয়ার রাজা, শঙ্করা ওয়ার্ড এস্টেট, মিদ্দিন তহবিল ইত্যাদি থেকেও রেজিস্ট্রার অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া ১৯০৪ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখের ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্তমূলে (Resolution No. 1-63 ও Land Revenue, Paragraph 26) সরকার প্রত্যেক সমিতিকে তার সভ্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা) টাকা বার্ষিক কিস্তিতে (সর্বোচ্চ ২০টি) পরিশোধযোগ্য ঋণ দিতেন। তিন বছর পর্যন্ত কোন সুদ দিতে হত না। তারপর থেকে শতকরা বার্ষিক ৪ (চার) টাকা হারে সুদ দিতে হত। অবশ্য কিস্তি খেলাপ করলে খেলাপি কিস্তির ওপর শতকরা ৬ (ছয়) টাকা হারে সুদ দিতে হত (Notification No. 2446 LR dated Calcutta the 29th August, 1905)। এছাড়াও (১৯০৫-০৬) জন্য সরকার এককালে ৪৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

বছর (১৯০৫-০৬) শেষ হবার পর সমিতি ৫০০ টাকা আমানত সংগ্রহ করতে সমর্থ হওয়ায় উপরিবর্ণিত সমপরিমাণ সরকারি ঋণ পেয়েছিল। এই টাকা থেকে সমিতি হ্যামিল্টন সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া ঋণ শোধ করে দেয়।

সমিতি কাজ শুরু করে প্রথম বছরে (১৯০৫-০৬) ১১০টি ঋণ দিয়ে। ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ৪ (চার) টাকা আর সর্বোচ্চ ১০০ টাকা। সব ঋণই দেওয়া হয়েছিল কৃষিকাজের জন্য। বছর শেষে (৩১-৩-১৯০৬ তারিখে) ৬৮টি ঋণ পাওনা ছিল। অবশ্য এর সবটাই ছিল হাল (current) ঋণ, কোন ঋণই খেলাপি (overdue) হয়নি। ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক সাড়ে বার টাকা। প্রথম বছর সমিতির লাভ হয় ২২ টাকা ৩ আনা ৪ পাই।

সমিতির প্রথম বছর (১৯০৫-০৬) শেষে ৩১ মার্চ তারিখে উদ্বর্ত পত্র (Balance Sheet) ছিল এরকম :

দায় (Liabilities)	টাকা	আনা	পাই	সম্পত্তি (Assets)	টাকা	আনা	পাই
রিজার্ভ ফান্ড	১৪৮	০	০	সভ্যের কাছে পাওনা ঋণ		০	০
সভ্যের আমানত	৩৫২	০	০	সভ্যের কাছে পাওনা সুদ	৭	১২	৪
ধার	৩৩০	০	০	হাতে নগদ মজুত	১২৮	১৪	৬
মহাজনকে দেয় সুদ	১৫	৭	৬				
মোট	৮৪৫	৭	৬				
লাভ	২২	৩	৪				
সর্বমোট	৮৬৭	১০	১০	মোট	৮৬৭	১০	১০

সমিতির কাজ চালাবার ভার ন্যস্ত ছিল কার্য নির্বাহক কমিটির ওপর। উপবিধি অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হত। অবশ্য এই সমিতিতে ৬ (ছয়) জনকে নিয়ে প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল। এদের নাম পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হতেন। কমিটির সভাপতি সাধারণ সভায় নির্বাচিত হতেন। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হতেন। এদের কাজ ছিল নতুন সভ্য নির্বাচন করা, কর্জের দরখাস্ত বিবেচনা করা, সুপারবাইসর (Supervisor)-গণের রিপোর্ট গ্রহণ করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি। আর সুপারবাইসরদের কর্তব্য ছিল সময়ে সময়ে কার্যপরিচালক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত হিসাব পরীক্ষা করে দেখা, প্রদত্ত কর্জের উপযুক্ত হয়েছে কিনা দেখা, কর্জ গ্রহীতাগণকে টাকা দেবার সময় উপস্থিত থাকা ইত্যাদি। (পাঁচ) টাকা পর্যন্ত কর্জের জন্য একজন জামিন আর এর বেশি হলে দুজন জামিনদার দিতে হবে।

সমিতির উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, সদস্য ও গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা আর রতিনাথবাবুর ন্যায় সুযোগ্য, দূরদর্শী, আত্মনিষ্ঠ পরিচালকমণ্ডলের নেতৃত্বে সমিতিটি কি নীতির দিক দিয়ে, কি কর্মধারার দিক দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ক্রমোন্নতির অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। প্রায় গোড়াতেই (১৯০৬-০৭) এর কর্মধারা ও সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে বঙ্গদেশের রেজিস্ট্রার তাঁর বার্ষিক বিবরণীতে সানন্দে লিখলেন যে খেলাড় সমিতিটি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সমিতি ("Khelar Society is the best society in the province")। পরের বছর (১৯০৭-০৮) তিনি আবার লিখলেন যে খেলাড় এলাকার সমিতিগুলি যে কোন দেশের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ ("these societies would bear comparison with similar institutions in any country)। ১৯০৯-১০ সালের বিবরণীতে তিনি পুনরায় সানন্দে উল্লেখ করলেন যে সারা বঙ্গদেশে খেলাড় এলাকাটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এখানকার সমিতিগুলির কার্যধারা ইউরোপের সমিতিগুলির সমকক্ষ। ১৯১০-১১ সালের কার্যবিবরণীতে তিনি আবারও খেলাড় সমিতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমিতি ঘোষণা করে লিখলেন যে এই সমিতি এখনও প্রথম স্থানটি নিজের দখলে রেখেছে ("Khelar society sull holds the first place in the province")।

ধীরে ধীরে সমিতির কর্মধারা বহুমুখী বিস্তার লাভ করে। সরাসরি কৃষিকাজের খরচ যেমন বীজ কেনা, সরঞ্জাম, লাঙ্গল ইত্যাদির খরচ মেটানো ছাড়াও বলদ খরিদ, জমির উন্নয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ন্যায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ঘর-বাড়ি মেরামত, ভরণপোষণ ইত্যাদি ব্যয়েও ঋণ দেওয়া হত। এছাড়া চড়া সুদে নেওয়া মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্যও সমিতি থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হত। ভারত সরকার এক নীতিগত সিদ্ধান্তে জানিয়েছিলেন যে মূলত মহাজনের কবল থেকে গরিব চাষিদের বাঁচানোর জন্য সমবায় ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। তাই চাষীর সবরকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঋণ না দিলে চাষী আবার মহাজনের কাছে বাধ্য হয়ে চলে যাবে আর তার ফলে সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সরাসরি ঋণ দেওয়া ছাড়াও সমিতি সদস্য ও গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৩ (তিন) টি গোলদারী দোকান খুলেছিল। অনেক সময় নানা কারণে দুর্দশাগ্রস্ত সভ্যদের তলালারী টাকা ছাড় দেওয়া হত। দণ্ড সুদ (penal interest) ঋণ করে দেওয়া হয়। সুদের হার ১৯৩৪-৩৫ সালে কমিয়ে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা ১৫ আনা করা হয়। ১৯৪১-৪২ সালে আরও কমিয়ে সুদের হার ধার্য হয় ৯ টাকা ৬ আনা। এছাড়াও কিস্তি মোতাবেক সময়মতে ঋণ শোধ করলে শতকরা ১ টাকা ১৪ আনা হারে ছাড় (rebate) দিয়ে সাড়ে সাত টাকা হারে সুদ নেওয়া হত। অন্যান্য জনহিতকর কাজেও সমিতি হাত বাড়িয়েছিল। যেমন গ্রামের ডাকঘরের পিওনের ব্যয় সমিতি জোগাত। গ্রামের মধ্যে ইংরেজি স্কুলকে মাসিক ১০ টাকা করে সাহায্য দিত। পরে সেটা বাড়িয়ে মাসিক ২৫ টাকা করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের পানীয় জল সরবরাহের জন্য সমিতি জল দিয়ে স্কুলে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করে দেয়। একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রও চালাত সমিতি। গ্রামবাসীদের সমিতির ওপর এমন দৃঢ় আস্থা এসে যায় যে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ফয়সালার জন্য আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে সমিতির কাছে আসত আর সমিতির পঞ্চায়েতদের মীমাংসা সুস্থ মনে মেনে নিত। এতে যেমন হাঙ্গা ও জেরা দুপক্ষের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হত না তেমনি আদালতের প্রভূত খরচাদির হাত থেকে রেহাই পেত।

ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মধারার বিস্তার ঘটায় সমিতির নিজস্ব অফিস ঘরের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। তখন গ্রামের বাসস্ট্যান্ডের সমিতির অফিসবাড়ি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমিটির মালিক ঈশ্বরচন্দ্র প্রহরাজ কিং বাংলা ১৩২৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯১৮ সালের মে মাসে) রেজিস্ট্রি দলিলমূলে সমিতিকে জমির মালিকানা হস্তান্তরিত করে দেন। সেখানে একটা আটচালা ও একটা ছোট টিনের ঘর বানিয়ে সমিতির অফিস নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪২ সালের প্রথম ভূমিকম্পে অফিসবাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে হয়ে যায়. বর্তমান দোতলা অফিস ও গোডাউনঘর এবং তৎসংলগ্ন ৩২,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় ১৯৮৫ সাল নাগাদ। জানোয়ার মেলা সমিতির মেসোবন্যান ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং জেলার সমবায় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রতিনাথ বসুর বাংলোসহ অফিসকমপ্লেক্স বসু ভবন সরকার দিয়েছিল ১০,০০০ টাকা, যার দরুণ ৭,৫০০ টাকা ঋণ আর বাকিটা অনুদান।

১৯১২ সালে নতুন সমবায় আইন (Co-operative Societies Act. 1912) চালু হবার পর সমিতির উপবিধি সম্পূর্ণ সংশোধিত হয় ১৩-১১-১৯১৩ তারিখে। এই সময় সমিতির নাম কিছুটা বদল করে করা হয় "খলার গ্রাম্য সমিতি"। আর উপবিধির ৩নং ধারায় বলা হয় "সমবেতভাবে ঋণ করিবে এবং স্বাবলম্বন ও মিতব্যয়িতার উৎসাহ দিয়া সভ্যদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য"। সমিতির এলাকায় ১১টি বলে চতুঃসীমাবর্তী ১৮টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১-৪-১৯৬৫ সালে সমিতি আবারও নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম "খেলাড় গ্রাম্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড" গ্রহণ করে। ১৯১৩ সালের সংশোধিত উপবিধিতে বলা হয় যে কার্যনির্বাহক কমিটি (পঞ্চায়েত) অন্যূন ৫ এবং অনধিক ৯ জন সভ্য নিয়ে গঠিত হবে। বর্তমানে ঐ কমিটিতে সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয় জন, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এক জন প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন। সমিতির ক্রমবিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়া হল:

বৎসর	সদস্য সংখ্যা	অংশগত মূলধন (টাকা)	কার্যকরী মূলধন (টাকা)	সভ্যদলের নিকট পাওনা (টাকা)	অনাদায়ী ঋণ (টাকা)	লাভ (+) ক্ষতি (-) (টাকা)
১৯৫৪-৫৬	২৭৯		৩০,৪০৭			+ ৪৭৫
১৯৫৬-৫৭	২৬৭		৩১,৭১৮			+ ১,০১৯
১৯৫৭-৫৮	২৫৮		৩২,৬৬৮			+ ১০৯৮
১৯৫৮-৫৯	২৫৯					+ ৬২২
১৯৫৯-৬০	২২৩	২,৯১৪	৩৪,১৯৬	৩৫,৫৩৯	১৪৪	+ ১,০১৬
১৯৬০-৬১	২২২	২,৯৫০	৩০,৪৬৮	৩২,৭৪৩	১৪৪	+ ১,৯৫০
১৯৬১-৬২	২৩০	৩,১৭১	২৯,৫৪৮	৩৩,০১৮	১৪৪	+ ১,৫৬৮

ব্যক্তির জীবনের ন্যায় সমষ্টির বা প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ জীবনেও উত্থান-পতন আছে।

গৃহবিবাদ, অন্তর্কলহ, নেশার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির ফলে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশের দশকের শেষভাগ অবধি সমিতিকে যথেষ্ট দুঃসময় ঘিরে ধরে। অতঃপর পুনরায় অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে।

বাংলা ১৩২৬ সালের ১২ আষাঢ় (ইং ১৯১৭ সালের জুন মাসে) অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে একজন সভ্যকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে, অবশ্য স্থানীয় জমিদারবাবুকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া বর্তমানে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ১৫,০০০ টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে।

বেশ কিছুদিন আগে সমিতির অফিসে প্রবীণ (৭২ বৎসর) সদস্য আশুতোষ দাস বলেন যে তার বাবা মারা যাওয়ার পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি বাবার নমিনি (nominee) হিসাবে সমিতির সদস্যভুক্ত হন। তিনি বলেন যে সমিতিতে গোড়ার দিকে ঋণ দেওয়া হত ৫ টাকা করে, অবশ্য যাদের বেশি জমি আছে তারা হয়ত আরও ঋণ পেতেন। তখন ঋণের জন্য জমি বন্ধক দিতে হত না। ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ জমি বন্ধক নেওয়া শুরু হয়। সাধারণত আষাঢ় অর্থাৎ জুলাই মাসে বৃষ্টির পর ঋণ দেওয়া হত। আদায়ের মরশুমে একবার সমস্ত সদস্যকে বলে দেওয়া হত ৮ মাস ঋণ শোধ করে দিতে হবে। প্রায় সকলেই সময়মত ঋণ শোধ দিয়ে দিত। তিনি আরও বলেন যে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ঋণ আদায় কমতে থাকে। ধীরে ধীরে অনাদায়ী ঋণের বোঝা বাড়তে শুরু করে। আর এর ফলশ্রুতিতে সভ্যদের কাছে পাওনা ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে সমিতির দেনার মধ্যে ভারসাম্য (imbalance) বাড়তে থাকে। ৩১-১২-৮৯ তারিখে সদস্যদের কাছে আসল বাবদ পাওনা ছিল ৩,৫৬,০৮৮ টাকা আর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে আসল বাবদ দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৭,৯৬,০০০ টাকা। অবশেষে ১৯৯০ সালে এল কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ মকুব প্রকল্প। বকেয়া অনাদায়ী ঋণ মকুব হল ২,৭৩,৮১২ টাকা। ঐ টাকা দিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দেনা শোধ (adjust) করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ঐ টাকা থেকে আগে তার পাওনা সম্পূর্ণ সুদ কেটে নিয়ে বাকিটা সমিতির দেনার আসলে ওয়াশিল দেয়।

সমিতির এলাকার জনসংখ্যা ১১,০১৮ জন। এর মধ্যে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১০১৯ জন। আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার ৫৮৬টি, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক পরিবার ২২৩টি, অন্যান্য কৃষক পরিবার ৫২টি আর অকৃষক পরিবারের সংখ্যা হল ১৫৮। ৩১-৩-৯৬ তারিখে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০১৯। অর্থাৎ এলাকার প্রত্যেক পরিবারই সমিতির সদস্য।

সমিতির কাজ চালাবার প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হয় শেয়ার, আমানত ও ঋণ নিয়ে। স্থাপনাকালে সমিতিতে শেয়ার বা অংশগত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল না। কুড়ির দশকের শেষের কিছু আগে থেকে শেয়ার প্রথা চালু হয়। ৩১-৩-১৯৯৫ তারিখে সমিতির মোট অংশগত মূলধন (share capital) ৮৯,৪৮০ টাকার মধ্যে সরকারের দেওয়া শেয়ারের পরিমাণ ছিল ২৯,০০০ টাকা। বিগত কয়েক বছরের আমানতের চিত্র নীচে দেওয়া হল :

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বৎসর	বৎসরান্তে আমানতের পরিমাণ			আমানত কার্যকরী মূলধনের কত শতাংশে
	সভ্যদের কাছ থেকে	সভ্য নন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে	মোট	
১৯৮৬-৮৭	৯.৩	১৫.৪	২৪.৭	৩
১৯৮৭-৮৮	৯.৮	১৪.৩	২৪.১	৩
১৯৮৮-৮৯	৬.১	১২.৩	১৮.৪	২
১৯৮৯-৯০	১২.৬	১২.১	২৪.৭	৩
১৯৯০-৯১	৫.৭	১৮.৬	২৪.৩	৩
১৯৯১-৯২	৫.৬	১৭.১	২২.৭	৩
১৯৯২-৯৩	৮.২	১৫.৬	২৩.৮	৩
১৯৯৩-৯৪	*	*	১৫১.৭	১৭
১৯৯৪-৯৫	*	*	২৪৬.০	২২
১৯৯৫-৯৬	*	*	৪৬৬.৪	২৯

* আলাদাভাবে হিসাব রাখা হয়নি।

আগের সারণি থেকে এটা প্রকট যে আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে সমিতির সৈলব ও কৈশোরের গৌরবময় ঐতিহ্য অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ফলে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১৫ অগাস্ট থেকে মিনি ব্যাঙ্কিং চালু করেছে। আর এতে বেশ খানিকটা সুফলও ফলেছে। তবু এখনও কার্যকরী মূলধনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশেই আসছে অনের মাধ্যমে। সমিতিকে তাই বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে দেওয়া হল :

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বৎসর	ঋণ গ্রহণ (টাকা)	ঋণ পরিশোধ (টাকা)	বৎসরান্তে বাকি (টাকা)	বৎসরান্তে বাকির মধ্যে খেলাপি (টাকা)	খেলাপির হার (%)
১৯৮৬-৮৭	১৭৬.০	১০৭.৩	৭২৮.৮	৫৫২.০	৭৫
১৯৮৭-৮৮	১৩৪.৬	১৫১.৮	৭৩১.৬	৫৯২.০	৮৯
১৯৮৮-৮৯	১৩৬.৭	১১১.০	৭৫৭.৩	৬২০.০	৮২
১৯৮৯-৯০	৫০.০	—	৮০৭.৩	৭৫৭.৩	৯৪
১৯৯০-৯১	—	১৭০.০	৬৩৭.৩	৬৩৭.৩	১০০
১৯৯১-৯২	—	৮.০	৬২৯.৩	৬২৯.৩	১০০
১৯৯২-৯৩	১৫৬.৩	১৩৬.২	৬৪৯.৪	৪৮২.৩	৭৪
১৯৯৩-৯৪	২০১.৪	২৪৬.০	৬০৪.৮	২৫৭.৪	৩৩
১৯৯৪-৯৫	৪৭৪.০	৩২৭.৮	৭৫১.০	২৬৬.০	৩৫
১৯৯৫-৯৬	৭২২.০	৫১৭.৯	৯৫৫.১	২৩৩.০	২৪

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণ ফেরতের নৈরাশ্যজনক চিত্রের কারণ হল ঋণী সদস্যদের কাছ থেকে ঠিকমত আদায় না হওয়া। এ বিষয়ের চিত্র নিচে দেওয়া হল :

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বৎসর	স্বল্পমেয়াদি ঋণ দাদন (টাকা)	ঋণ আদায়ের দাবি (Demand) (টাকা)	আদায় (collection) (টাকা)	বৎসরান্তে বাকি (Balance) (টাকা)	আদায়ের হার (%)
১৯৮৬-৮৭	১৬৬.০০	৪০২.৭০	১৭৭.৮০	৩৯১.২০	৪৪
১৯৮৭-৮৮	১৩২.০০	৫২৩.২০	১৭৭.৫০	৩৪৫.৭০	৩৩
১৯৮৮-৮৯	১৩৪.৫০	৪৮০.২০	১৬৬.১০	৩৩৪.১০	৩৫
১৯৮৯-৯০	৫০.০০	৩৮৪.১০	৯.৮০	৩৭৪.৩০	৩
১৯৯০-৯১	—	৩৭৪.৩০	১৫৮.৬০	২১৫.৭০	৪৫
১৯৯১-৯২	—	২১৫.৭০	৮৯.৯০	১২৫.৮০	৪৬
১৯৯২-৯৩	১৩৬.৫০	২৬২.৩০	১৬৪.১০	৯৮.২০	৬৪
১৯৯৩-৯৪	২০০.৯০	২৯৯.১০	২৭০.৫০	২৮.৬০	৯০
১৯৯৪-৯৫	৪৭৬.১০	৫০৪.৭০	৩৫৬.৭০	১৪৮.০০	৭১
১৯৯৫-৯৬	৭২২.১০	৮৭০.১০	৪৪৪.০০	৩২৬.১০	৬০

আলোচ্য চূড়ান্ত অবনতি ঘটল ১৯৮৯-৯০ সালে। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির কারণ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এটা অত্যন্তিক সর্বভারতীয় সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ মকুব প্রকল্প এর সাক্ষ্য বহন করে। তবু ঋণ সময়মত শোধ করার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য তো সদস্যদেরই। ফলে বেশ কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। অবস্থার আরও উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে সদস্যদের।

সমিতির ঋণী সভ্যদের কাছ থেকে পাওনা ও ব্যাঙ্কের কাছে দেনার মধ্যে ফারাক ৩১-৩-৯৫ তারিখে ছিল ৬,১২,৬৯৩ টাকা। এটা নিশ্চিতই এক বিপজ্জনক অবস্থা। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত মহান ঐতিহ্যবাহী এই সমিতিকে বিলয়ের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই বিশেষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কি এই অবস্থাতেও সদয় না হলেও বেশ কিছু অংশ মকুব করে দিতে পারেন না? রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কি এই সমিতিকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে বাকি টাকা দিতে পারেন না? রাজ্য সরকারও অবশ্য একটি বিশেষ এবং মহৎ উদ্দেশ্যমূলক ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করতে পারেন না ঐ কারণে দিইয়ে নেবার জন্য!

ঋণ ব্যবসা ছাড়াও সমিতি অন্যান্য অনেক ব্যবসাও করে। এই কাজের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেওয়া হল।

দুঃখজনক না হলেও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নানাকারণে সমিতির ঘাড়ে এক বিরাট অঙ্কের পুঞ্জিভূত লোকসানের বোঝা চেপে রয়েছে।

সমিতির পাঁচজনের কর্মীবাহিনী সমিতির কাজে সতত বহুবান। এদের নেতৃত্বে আছেন অভিজ্ঞ ও কর্মঠ ম্যানেজার গোষ্ঠবিহারী দাস।

সমিতিটি বর্তমানে চুয়ান্নই বছরে পদার্পণ করেছে। স্বল্প পরিসরে এই সুদীর্ঘ জীবনের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। আশা করি সমিতি সাড়ম্বরে শতবর্ষ উদ্‌যাপন করবে। একটি সমিতির জীবনে এটি মহাগৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়, একটি দুর্লভ সম্মান। পরিচালকগণ, কর্মীগণ, সদস্যগণ এবং

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বৎসর	সার ক্রয় (লক্ষ টাকা)	সার বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	ভোগ্যপণ্য বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকা)
১৯৯০-৯১		—	২.৮৫		২.৬৩
১৯৯১-৯২	৬.২৭	৬.৩৬	২.৯৬		৮.৮২
১৯৯২-৯৩	৩.৭৮	৩.৮১	৩.৩৭		৭.১৮
১৯৯৩-৯৪	১.৬৯	১.৩৩	৩.৮২	—	৫.১৫
১৯৯৪-৯৫	১৫.৩৮	১৫.৩৮	৩.৪৭	০.৩২	১৯.২৭
১৯৯৫-৯৬	৮.২১	৮.৫৪	৪.৩৩	০.৬৬	১৩.৫৩

এলাকার সমস্ত গ্রামবাসী তাদের অতি আদরের প্রতিষ্ঠান, এরাজ্যের ও সমগ্র ভারতের জনগণ গৌরবের ধন এই সমিতিকে প্রম, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও সমিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা আবার এর গৌরবোজ্জ্বল দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এই আশা রাখি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(১) কিঙ্করচন্দ্র বসু ও গোষ্ঠবিহারী দাস যথাক্রমে খেলাড় সমিতির সম্পাদক ও ম্যানেজার

(২) অমিতেন্দু চৌধুরী, হিমাংশুকুমার মাইতি ও স্বর্ণেন্দুকুমার বসু, সকলেই মেদিনীপুর ১নং ব্লকের সমবায় উন্নয়নে আধিকারিক।

(৩) ৩০ মার্চ, ১৯৫৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগার (The National Library)।

(৫) Annual Report on the working of Co-operative Societies in Bengal for the years from 1904-05 to 1911-12.

(৬) West Bengal State Archives.

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

বরদ্বারী অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং - ১৩

গ্রাম ও পোঃ - বুধীয়া

ইংরেজরাজার ব্লক

মালদা

আবুল সাত্তার
সভাপতি

মঃ আলাউদ্দিন
সম্পাদক

জমিরুদ্দিন আহমেদ
ম্যানেজার

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পোঃ - গোপগন্তার ★ জেলা - বর্ধমান

রেজিঃ নং - ৪০ ★ তাং - ১২/২/১৯৪৯

পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে
এগিয়ে চলেছে আমাদের সমবায়।

জনসাধারণের জন্য আমাদের প্রকল্পসমূহ -

গো	স্বল্প সুদে সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষি ও ঋণ দেওয়া হয়।
প	সকল প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ও খইল বিক্রয় করা হয়।
গ	সকল প্রকার বস্ত্র, কন্ট্রোল, নন্-কন্ট্রোল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
স্তা	সমিতির নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে কম খরচে চাষিদের জমি কর্ষণ করা হয়।
র	সমিতির এলাকায় বিভিন্ন মৌজায় ৩২টি মিনি ডিপ-টিউবওয়েল সেচের কাজে নিয়োজিত।
ইউ	পিতল কাঁসার দ্রব্য অল্প সুদে বন্ধক নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
সি	**আমানত প্রকল্প**
এ	সেভিংস - টাইম-ডিপোজিট — ফিক্সড-ডিপোজিট — রেকারিং-ডিপোজিট।
সি	আমাদের সমিতিতে সুদের হার অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি।
এস	*ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত*
লিঃ	*শিখে যা আয়রে আয়।*
	দুঃখ জয়ের নীবন মন্ত্র সমবায় — সমবায়।

নিমাইচরণ দে	তারকনাথ দত্ত	ভবানীপ্রসাদ ঘোষ
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

Burdwan Co-operative Agriculture & Rural Developement Bank Ltd.

Old Court Compound
P.O. & Dist.-Burdwan

বর্ধমান জেলার কৃষকভাইদের সেবায় সতত নিয়োজিত
একমাত্র প্রাচীনতম সমবায় দীর্ঘমেয়াদি সমবায় প্রতিষ্ঠান

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা অফিস ঃ ১) সেহেরবাজার, বর্ধমান
২) ১নং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (দ্বিতল), দুর্গাপুর, বর্ধমান

অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে কৃষি, অকৃষি, গৃহনির্মাণ ও সেবামূলক উদ্যোগে ঋণ দানের একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান।

এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য জাতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, স্বল্পমেয়াদি জমা প্রকল্প চালু আছে।
তাই এই ব্যাঙ্ক প্রকল্পগুলিকে মজবুত করতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

বিশদ বিবরণের জন্য হেড অফিস, শাখা অফিসগুলি ও ব্লক সুপারভাইজারদের সহিত সারসরি যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ – ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা আছে।

সুকুমার সিন্‌হা
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

গদাধর পাল
সভাপতি

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন ঃ ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	শাখা সংখ্যা সহ	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬					১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৭	৩৯০৪.৫৯	(+) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংঙর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

With Best Compliments Of :

THE SHIPPING CORPORATION CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"SHIPPING HOUSE"

13, STRAND ROAD, CALCUTTA - 700 001

ENJOY OUR HOLIDAY HOME AT PURI, DARJEELING

তমলুক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

পোঃ তমলুক

জেলা : মেদিনীপুর

ফোন নং ৬৬৪৯৮, ৬৬০১১

শাখা অফিস :

পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, ময়না

তমলুক ও কাঁথিতে মহকুমার দীর্ঘমেয়াদি ঋণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান

- যে কোন কৃষিক্ষেত্রে পানচাষ, ফুলচাষ, মাছচাষ ও পাওয়ার টিলার / ট্রাক্টর ও কৃষিজাত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ঋণ দেওয়া হয়।
- মালবাহী ট্রাক, ট্রেকার, প্রাইভেট ট্যাক্সি ও কুটিরশিল্পে ঋণ দেওয়া হইতেছে।
- গৃহনির্মাণ ও পুরাতন গৃহসংস্কার প্রকল্পে ঋণদান করা হইবে।

বিকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
সি ই ও

গোপালচন্দ্র মাইতি
চেয়ারম্যান

"আশ্বিনে বেণু বাজিল ওপারে বনের ছায়ে"

পুজো তো এসে গেল। কী ভাবছেন ? বাইরে বেড়াতে যাবেন ? কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দূরপাল্লা রুটের সার্ভিসে আরামে ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন। আমাদের বাসে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে পুজোর ছুটি কাটিয়ে আসুন।

সিঙ্গি, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটী, তালডাংরা, মুকুটমণিপুর (বাত্রিকালীন সার্ভিস), তারাপীঠ, পুরুলিয়া, বহরমপুর, কল্যাণী, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া, তমলুক/হলদিয়া, আড়ান্তা, নানুরনা, তালডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, বায়নাদিঘি, বাসন্তী, বালুরঘাট, হাজারদুয়ারী, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরী, শান্তিপুর, ফুলিয়া, রাজগীর, সিঙ্গি (বাত্রিকালীন সার্ভিস), বাঁকুড়া, খাতড়া, মেদিনীপুর, শিলিগুড়ি, পূর্ণিয়া, মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বীরসিংহ, ঝিলিমিলি (বাঁকুড়া), রাধানগর (হুগলি), চন্দনেশ্বর (উড়িষ্যা)।

এবং জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার বাস সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান :
দূরপাল্লার বাস স্টেশন :
এক্সটেনশন ফোন নং - ২৪৮-১৯১৬
সিঙ্গি বুকিং অফিস
ফোন নং - ৬৬-২১৭

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

STATE GOVERNMENT EMPLOYEES' CONSUMERS CO-OPERATIVE STORES LTD.

OFFICE STATIONERY & GENERAL ORDER SUPPLIER

COURT COMPOUND :: BURDWAN
REGISTRATION NO - 111 OF 73/74
PHONE 63331

With

Best

Compliments from

THE SANTRAGACHI CO-OPERATIVE BANK LTD.

REGISTERED UNDER ACT. 11 OF 1912

ESTD-1931

KONA ROAD, SASTITALA, SANTRAGACHI, HOWRAH - 711 104

A FULL LICENSED URBAN BANK BY RESERVE BANK OF INDIA

Branch at Buxarah (opposite Buxarah High School)

SAILIENT FEATURES

- Deposits are covered by deposit Insurance Scheme
- Attractive Deposit Scheme with higher rate of interest than Commercial and Nationalised Banks.
- One of the leading Co-operative Banks in Howrah District.
- Safe Deposit Locker facility is available.
- Holiday Home at Puri & Digha

চর্মজ

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লেদার ইণ্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি সংস্থা)

নিজস্ব (পঞ্চমতল)

২ এবং ৩, ব্ল্যাক বার্ন লেন

কলিকাতা - ৭০০ ০১২

'চর্মজ'র জিনিস বাংলার কারিগরী দক্ষতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সুলভে ও গুণগতমানে চামড়ার জুতো, ব্যাগ এবং অন্যান্য বস্তুসামগ্রী পাওয়া যায় 'চর্মজ'তে।

ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপণ, গড়িয়াহাট মার্কেটের ত্রিতল, কলেজ স্ট্রিট (প্রেস সিনেমার পাশে), হাওড়া সাবওয়ে এবং শ্যামনগর স্টেশনের পাশে আছে 'চর্মজ'-র নিজস্ব শো-রুম

'চর্মজ' তার অসংখ্য গুণগ্রাহী ক্রেতা পৃষ্ঠপোষকদের জন্য বাজারে হাজির করেছে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বস্তু সম্ভার।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

দি সম-হিতিকা সমবায় বিপণি লিমিটেড

রেজি নং : ৪- এইচ জি /১৯৬৯
১২, শক্তিনগর রোড, ভদ্রকালী
হুগলি, পিন - ৭১২ ২৫২

গ্রাহকদের সেবায় - রেশন, ভোগ্যপণ্য, বস্ত্র, দুগ্ধ ও কেরোসিন তৈল বিপণন।

Space Donated by

HASAMPURIA TRADING COMPANY
12 No Lock Gate Road
Sodaghar Patty, Calcutta - 2

Wholesellers and Retailers of Cattle feed)

Phone No.: 557 - 8312 (O)
244 - 3872 (O)
246 - 0422 (R)

With Best Compliments from

B. S. ENTERPRISES

Calcutta

Space Donated by

United Engineers' Co-operative Society Ltd.
Regn. No. 30 of Dec. 71
Kadamtala, Jalpaiguri

CPWD, PWD & I & WD Contractors

ভ্রমণ

মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ

নবকুমার ঘোষাল

শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। সমুদ্র সমগ্র দ্বারকাপুরী গ্রাস করে ফেলল। মুক্ত পুরুষ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে চলে গেলেন হিমালয়ের নারায়ণ তীর্থে। সেখানে শান্তি পেলেন। তাই নারায়ণ তীর্থ শান্তির নীড়। গাড়োয়ালের বদ্রীনাথ এইরকম এক নারায়ণ তীর্থ। আর এক নারায়ণ তীর্থ হল নেপালের মুক্তিনাথ।

মুক্তি পর্বতের মাঝখানে ব্রহ্মা জলের উপর আগুনকে ডেকে ঘোর তপস্যা শুরু করলেন। সেই আগুনে হোম করলেন চরু সিদ্ধ করে। যদিও জল আর আগুনের মধ্যে চিরশত্রুতা, তবুও সেদিন থেকে তারা সেখানে এক দেহে লীন হয়ে আছে। বিষ্ণুর স্বরূপ জল, আর রুদ্রের মূর্তি আগুন — একই জায়গায় দু'জনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘি মেশানো ক্ষীর দিয়ে হোম করলেন ব্রহ্মা। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা — এই তিন রকম অনুষ্ঠানই স্বীকৃতি পায়। জগতের সর্বসাধারণের মুক্তির জন্য ব্রহ্মা এই যজ্ঞ করেন ; তাই পুণ্যভূমির নাম হল মুক্তিক্ষেত্র। এখানেই শঙ্কর আছেন আগুনরূপে, বিষ্ণু জলের আকারে অমৃত হয়ে আর ব্রহ্মা আছেন হোতারূপে। মুক্তিকামী মানুষ তাই ছুটে যায় এই মুক্তিনাথে।

এই মুক্তিক্ষেত্র বা মুক্তিনাথ নেপালের উত্তর সীমান্তে। বিষ্ণুতীর্থের অন্যতম তীর্থ। কিন্তু পথ বড় দুর্গম। খুব কম যাত্রীই এই তীর্থে পৌঁছতে পারে। প্রচণ্ড মনোবল আর পাহাড়ে চড়ার অদম্য উৎসাহ থাকলে আপনিও পৌঁছতে পারেন মুক্তিনাথে।

ভারত-নেপাল সীমান্ত সোনৌলি। সেখান থেকে বাসে চেপে সিদ্ধার্থ রাজমার্গ হয়ে পোখরা পৌঁছলাম। ১৮০ কিলোমিটার লম্বা এই রাজপথটি ভারত ও নেপাল সরকারের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। পথটি খুব সুন্দর। নওডারা থেকে মচ্ছপুছারে ও অন্নপূর্ণা গিরিশিখর হাতছানি দেয়। তারপর কিছুদূর গিয়েই পোখরার উপত্যকাভূমি শুরু হয়েছে। পথে পড়ল ফেওয়া হ্রদ। নেপালের বৃহত্তম হ্রদ। বিদেশি পর্যটকরা এর খুব প্রশংসা করেছেন। এখানে ট্রাউট মাছের চাষ হয়। পর্যটকরা নৌবিহার করেন।

পোখরা এয়ার স্ট্রিপের কাছে এসে বাস থেমে গেল। তখন সকাল দশটা। বেশ রোদ উঠেছে। সামনেই দেখা গেল মচ্ছপুছারের উন্নতি শিখর (২৩,০০০ ফুট) ; যা পথে আসতে আসতে দেখেছি। এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার পাশে অন্নপূর্ণা গিরিশিখর কখনও ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছে, আবার কখনও মেঘের আস্তরণ সরিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ছে। বাস থেকে নেমেই এই নান্দনিক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াবার কথা। আমরাও কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছিলাম।

পোখরার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কোনও এক বিদেশি পর্যটকের একটা কথা মনে পড়ছিল। " Pokhara in the West possibly the most dramatically sited air strip in the world — with the 23,000 feet fishtail mountain called Macha Puchare towering over the rutted landing ground." পোখরার এই নিসর্গ সৌন্দর্যের জন্যে একে বলা হয়েছে The Switzerland of the East.

এয়ার স্ট্রিপ থেকে দু'মাইল দূরে মহেন্দ্রপুল। পৌঁছতে আরও কিছু সময় লাগল। মহেন্দ্রপুল পোখরা শহরের প্রাণকেন্দ্র। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে শ্বেতীনদী। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকান, হাটবাজার, লোকবসতি — সবই এখান থেকে শুরু হয়েছে। এখানকার ধবলগিরি হোটেলে আমাদের থাকার জায়গা হল। জিনিসপত্র কেনাকাটি ও কুলি যোগাড় করতে আরও দুটো দিন পোখরায় কেটে গেল। তৃতীয় দিন সকালে মুক্তিনাথের পথে যাত্রা শুরু হল। আলো ঝলমল, পরিষ্কার সকাল। পোখরা শহর বেশ জমে উঠেছে। দোকানপাট সব খুলে গেছে। সার বেঁধে আমরা হাঁটতে লাগলাম। কুলি ও গাইড চলল পেছন পেছন। পোখরা শহর পেরিয়ে গেল। গ্রাম এসে পড়ল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ। গ্রাম শেষ হতে পড়ল বিরাট চষা জমি। এ জমির যেন আর শেষ নেই। কোথাও আবার ক্ষেত আলো করে আছে সোনালি ফসল। তার ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। দূরে দূরে পাহাড়ের সারি। বিদেশি যাত্রীদেরও পথে দেখা গেল। তারা জোমোসোম পর্যন্ত যাবে। তাদের মুক্তিনাথ যাবার অনুমতি নেই।

● *দৃষ্টিনন্দন অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণী* *আলোকচিত্র : লেখক*

সমতল পথ শেষ হয়ে গেল। এবার সামনে পড়ল একটা পাহাড়ি নদী। নদী পেরিয়ে ওপারে গেলাম। এর আগে পোখরার শ্বেতীনদী পার হয়ে এসেছি। নদী পার হতেই চড়াই শুরু হল। সারাদিনে প্রায় ১৩ কিমি পথ হাঁটা হয়েছে। এখনও ৩ কিমি চড়াই ভাঙতে হবে। আজকের পদযাত্রায় এটাই প্রথম চড়াই। সঙ্গীসাথীরা সব এক এক করে এসে পড়ল। চড়াই ভেঙে সন্ধ্যের একটু আগে পৌঁছলাম নৌদন্দা। এখানে আমাদের রাত্রিবাস হবে। আগেই বলে রাখি, মুক্তিনাথ পদযাত্রার প্রত্যেকটি পড়াউতে হোটেল, রেস্তোরাঁ আছে। গৃহস্থদের বাড়িতেও থাকা খাওয়া

যায়। সঙ্গে টাকা পয়সা আর নিতান্তপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস থাকলেই হবে। বিছানাপত্র নেবার দরকার নেই। তবে স্লিপিংব্যাগ থাকলে ভাল হয়। এইসব জিনিস বইবার জন্যে দলে একজন কিংবা দুজন কুলি থাকলেই হবেই। সীমান্ত পেরোবার সময়ে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে নেপালি টাকা নেওয়া একান্ত জরুরি; নইলে নেপালের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধের পড়তে হয়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হল। ৪,০০০ ফিট উপরে উঠে এসেছি। তার উপর অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়। শীতবোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া নেপালের এলিভেশান একটু বেশি। বাই হোক জিনিসপত্র গোছগাছ করে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। বাইরে তখন আলোর বন্যা বইছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত অন্নপূর্ণা গিরিশিখর কত পরিবেশ দেখাচ্ছে এখান থেকে। জানা ছিল, ঐ দুটি শিখরকে বিনা বাধায় দেখা যায় মৌলালা থেকে। এখন তা সত্য হয়ে উঠল।

যেতে যেতে উপর থেকে পোখরার কেওরা হ্রদ চোখে পড়ল। ছবির মত সুন্দর। উপর থেকে সব কিছুই সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গাছপালা সব কিছুরই কেমন একটা আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ পায়। বিশেষ করে নেপালের এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না। সারাপথই সৌন্দর্যসম্ভারে মোড়া। একটানা পথ চলে চন্দ্রকোট পৌঁছলাম। চন্দ্রকোটের ক্লান্তিকর উতরাই পথ পেরিয়ে কালবি নদীর উপকূল ধরে চলা শুরু হল। বেশ সুন্দর আবহাওয়া। চারপাশের সুন্দর দৃশ্য। নদীর উপর ঝুলা পুল পেরিয়ে ওপারে ধীরেঘাটি গ্রাম। এখানে বিশ্রামের জন্য থামা হল।

ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে আবার চলা আরম্ভ হল। যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। উলেরির আগে তিরকেডুঙ্গা পৌঁছতে সকলে হিমসিম খেয়ে গেল। পথে একটা চড়াই ছিল। দিনের শেষে চড়াই ভাঙতে যে কি কষ্ট, মুক্তিনাথের পথে বেরিয়ে তা বারবার বুঝেছি। যাই হোক, তিরকেডুঙ্গায় রাত কাটিয়ে সকালে উলেরির সেই বহুশ্রুত চড়াই-এ উঠতে লাগলাম। এমন প্রাণান্তকর চড়াই জীবনে কখনও দেখিনি। দু'মাইল চড়াই ভাঙতে হাঁপ ধরে গেল। অসহ্য ব্যথায় হাঁটু টন্‌টন্ করতে লাগল। সঙ্গীসাথীদেরও সেই অবস্থা। চার ঘণ্টা ধরে হাঁটার পর চড়াই পথ শেষ হল। বেলা এগারোটায় পৌঁছলাম উলেরি। তখন কারো শরীরে আর এতটুকু শক্তি ছিল না। মালপত্র রেখে যে যার বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করা গেল না। সন্ধ্যের মধ্যে ঘোরেপানি পৌঁছতে হবে। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বনের পথ দিয়ে আবার হাঁটা শুরু হল। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে রোডেডেনড্রনের ঝোপ। সেখানে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কেমন ভিজে ভিজে আবহাওয়া। পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। কষ্ট থাকলেও উলেরির মত কষ্ট নয়। এই অরণ্যপথে একটি মার্কিন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। সে জোমোসোম থেকে ফিরছে। তার হাতে একটা জাল। তা দিয়ে সে প্রজাপতি ধরছিল। সারাপথই সে নাকি প্রজাপতি ধরেছে। প্রজাপতি ধরা ও পালন করা তার নাকি শখ। এই কথা বলে জাল ঘোরাতে ঘোরাতে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও চলতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বনের পথ শেষ হল। গাছের ফাঁক দিয়ে একটুখানি সমতল জায়গা দেখা গেল। এটাই ঘোরেপানি। আমাদের রাতের আস্তানা। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। গোধূলির আলোতে গাছপালা ঘেরা ঘোরেপানি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঘোরেপানি থেকে শিখা পর্যন্ত পথটি ভারি সুন্দর। পথ চলার কোন ক্লান্তি নেই। ধবলাগিরিশ্রেণী কখনও বাঁদিকে, আবার কখনও ডানদিকে। তুষার গিরিশিখরের এমন চোখ ধাঁধানো রূপ নেপালের এই অঞ্চলে না এলে বোধহয় দেখা যায় না। ধবলাগিরি নামের সঙ্গেও কেমন মিল আছে। গিরিশ্রেণীর চারদিকে কেবল সাদা ধবধবে তুষার ; যেন ঢেউ খেলে খেলে এগিয়ে আসছে। আর পথের ডানদিকে ওক, পাইন, জুনিপার ও সাইপ্রেসের ছড়াছড়ি। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে তুষার শিখরের হাতছানি। সে এক অদ্ভুত কালার কম্বিনেশন। মুক্তিনাথের পথে ধবলাগিরির এই রূপ তুলনায় নয়।

শিখা পেরিয়ে তাতপানির পথটি নিচে নেমে গেছে। একেবারে নদীর কূলে। পুল পার হয়ে ওপারে যেতে পড়ল কালীগণ্ডকী। এ অঞ্চলের প্রধান নদী। দামোদর কুণ্ড থেকে নেমে আসছে। এর উপকূলে বা গর্ভে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। এখন থেকে কাকবেণী পর্যন্ত কালীগণ্ডকী পথের সঙ্গী। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এই নদীর তীরে তাতপানি গ্রাম। এখানে এক রাত থাকা হল। উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করে শরীরের ক্লান্তি দূর হল। হাঁটুর ব্যথা কমল। উষ্ণ প্রস্রবনে শরীর ডুবিয়ে গা-হাত-পায় ব্যথা কমানোর জন্যেই যাত্রীরা এখানে এক রাত কাটায়। তাছাড়া এখানে খাওয়া-দাওয়ারও বেশ মজা আছে। তাতপানির মজা লুটে নিয়ে আবার মুক্তিনাথের পথে যাত্রা শুরু হয়। এরপর কালীগণ্ডকীর সেই গুনগুন রব আর নেই। তার রূপ হয়েছে ভয়ঙ্কর। ক্ষুধার্ত সিংহের মত গর্জন করতে করতে যেন সে এগিয়ে আসছে। তারই বাঁ তীর ধরে সরু পায়ে চলা পথ। একটু অসাবধানতার মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বাসা পর্যন্ত এ রকম উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। তবে সবুজ পলস মোড়া পাইন অরণ্য আগাগোড়াই মন ভরিয়ে রেখেছে।

বাসার পর লেতে। পথ মায়াবরক না হলেও একেবারে সহজ নয়। লেতেতে ঢুকতেই টুকুচে পর্বতশিখর ঘোমটা খুলে তার অপরূপ রূপরাশি আমাদের সামনে মেলে ধরল। তার একদিকে নীলগিরি শিখর, অন্যদিকে মানাপাঠি। এ নীলগিরি কিন্তু ভারতের গাড়োয়াল হিমালয়ের নীলগিরি নয়। লেতে থেকে টুকুচে পর্যন্ত কেবল নদীর উপর দিয়ে পথ। জল শুকিয়ে গেছে। রাশি রাশি পাথর পড়ে আছে। তারই উপর দিয়ে কোনরকমে হেঁটে যেতে হয়। মাঝে মাঝে জলেও নামতে হয়েছে। টুকুচে পৌঁছে মনে হল অন্য জগতে এসে পড়েছি। আবহাওয়া তিব্বতের মত। চারদিকে ধূসর বৈরাগি পাহাড়। তার নিচে কিছু পাইন, সাইপ্রেস, জুনিপার ও অন্যান্য গাছপালা। থাকালি লোকবসতিই বেশি। তারা তাদের বিচিত্র বেশভূষা পত্রে ঘোরাফেরা করছে। নেপালি ভাষা বদলে গেছে। বদলে গেছে লোকসংস্কৃতি।

ধবলাগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতের মাঝখান দিয়ে নেমে আসছে কালীগণ্ডকী। তারই বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে টুকুচে জনপদ। এখান থেকে দুই পর্বত শিখরেই অভিযান করা যায়। ১৯৫০ সালে ফরাসি অভিযাত্রীদল এই টুকুচে থেকে অন্নপূর্ণা গিরিশিখরে অভিযান করেছিলেন। তাঁদের দলনেতা ছিলেন মরিস হার্জোগ। পর্বত অভিযান শেষ করে ফেরার পথে

হিমানী সন্তপাতের সামনে পড়ে তিনি ফ্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হন। হাতের ও পায়ের আঙুল কেটে তাঁকে বাঁচান হয়। টুকুচের একটি দোতলা বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় তিনি কিছুকাল ছিলেন। সেই থেকে মরিস হার্জোগের নাম টুকুচে গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

● *মুক্তিনাথ মন্দির* *আলোকচিত্র : লেখক*

টুকুচে ছেড়ে কালীগণ্ডকীর বাঁ ধার ধরে এগিয়ে চলা। মারফৎব গ্রামে কোন লোকবসতি চোখে পড়ল না। চারদিকে কেমল রিক্ত প্রকৃতি আর ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। এরপর থেকে মুক্তিনাথ পর্যন্ত আর সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। মারফলায় পৌঁছে কিছুটা গ্রামের সাড়া পাওয়া গেল। পাহাড়ে তখন ফসল কাটার সময়। মেয়ে পুরুষ সকলে ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। তাদের হাসি, ঠাট্টায়, গল্পগুজবে মাঠ মুখর হয়ে উঠছে। ফসল কাটা হচ্ছে ; আবার কোথাও বা ফসল ঝাড়াই চলছে। দেখতে দেখতে মারফলার সীমানা শেষ হয়ে গেল। এসে পড়ল জোমোসোম। বেশ বড় জায়গা। অনেক ঘরবাড়ি। এখানে না থেমে কাকবেণীর দিকে এগিয়ে চললাম।

জোমোসোম থেকে কাকবেণী কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এই পথটুকুতে কষ্ট সবচেয়ে বেশি। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া সূচের মত গায়ে এসে বিঁধছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ছোট-বড় পাথর ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কোনরকমে এগোতে হচ্ছে। তার উপর পথের কোন সঠিক নির্দেশ নেই। খাম্পা অধিবাসীদের সাহায্য ছাড়া এ পথে চলা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে প্রকৃতি একেবারে বিরূপ হল না। মাঝে মাঝে দু-একজন খাম্পাকে পথে দেখা যায়। তারাই পথের ঠিক ঠিক হদিশ দিয়ে দেয়। অবশেষে কষ্টমত পথ চলে সন্ধ্যের সময়ে ক্লান্ত শরীরে কাকবেণী পৌঁছলাম। টোবচে নামে এক খাম্পা যুবকের ঘরে সেদিন রাত্রিবাস হল। সে-ই থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল। পরদিন সকালে চা জলখাবার খেয়ে আবার পদযাত্রা শুরু হল। যাবার আগে টোবচের পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দেওয়া হল।

আজই মুক্তিনাথ পৌঁছব। একটানা বারোদিনের পদযাত্রা আজ শেষ হবে, এই ভেবে দলের সকলে নতুন উদ্যমে পাহাড়ে উঠতে লাগল। দুপুর নাগাদ পড়ল কাকবেণী গ্রাম। মুক্তিনাথের পথে এটাই শেষ গ্রাম। এখানেও তিব্বতী খাম্পাদের বসবাস। গ্রামে ঢোকার মুখে মণিপ্রাচীর, ছোটেন ও প্রার্থনা পতাকা দেখা গেল। এই গ্রামের মাঝামাঝি দিয়া ভেয়রজের ঘরে মালপত্র রেখে তক্ষুণি মুক্তিনাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললাম। মাইল দেড়েক চড়াই উতরাই করে পৌঁছলাম মুক্তিনাথ তীর্থে। বেলা তখন তিনটে।

মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১২,৫০০ ফিট। চারদিকেই উঁচুর পাহাড়। তার মাঝখানে বার্চ গাছে ঘেরা খানিকটা নালভূমির মত জায়গা। আকাশ এখানে সব সময়ে মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা থাকে। কখনও সখনও সূর্যের আলো দেখা যায়। এখানে পৌঁছে বেশ শীত শীত বোধ হল। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, ঠাণ্ডায় বুঝি জমে যাব। মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। মিনিট দশেক হাঁটার পর মুক্তিনাথের মন্দির দেখা গেল। একটি পাগোডা ধরনের মন্দির। এরকম মন্দির নেপালে আকছার দেখা যায়। পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন — 'চিত্তর আইয়ে, দর্শন কিজিয়ে।'

মন্দিরের ভেতরে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি। সামনে রয়েছে তাঁর বাহন গরুড়। ধাতুর তৈরি মূর্তিটি ভারি সুন্দর। মুখে যেন হাসিটি লেগে আছে। এরকম জীবন্ত মূর্তি আর কোথাও বিশেষ দেখিনি। আশ্চর্যের ব্যাপার মন্দিরে ঢুকে বিষ্ণুর দর্শন করামাত্র দেহে মনে যেন নতুন বল ফিরে এল। পথ চলার ক্লান্তি ও অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে মূর্তি নারায়ণের অনুপম মূর্তি দেখতে লাগলাম। এতদিনের পরিশ্রম, পথ চলার কষ্ট, মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ — সবই যেন সার্থকতার ফুল হয়ে ঝরে পড়ল দেবতার পাদপীঠে।

প্রায় দুশো বছর আগে মুক্তিনাথের এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। নেপাল সরকার এই মন্দিরের দিকে একেবারে নজর দেন না। এটি একটি অবহেলিত মন্দির। পশুপতিনাথ মন্দিরের মত পুজোর আড়ম্বর এখানে নেই। কেবলমাত্র ফুল ও তুলসীপাতা দেবতার চরণে নিবেদন করা হয়। এখানে যাত্রীও আসে কম। এই মন্দিরের সামনে রয়েছে বাসুকিমন্দির। এটি জমাট পাথরের তৈরি। গায়ে বাসুকীর মূর্তি খোদাই করা আছে। এর পূজারি এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে শেষে তিনি এসেছেন মুক্তিনাথে। রামমন্দিরের পুরোহিত হয়ে এখানেই থেকে গেছেন। তাঁর কিছু জমিজমা আছে। একটা চালাঘরও আছে। কোনরকমে দিন কেটে যায়। যাত্রীরা এলে মুক্তিনাথ মন্দিরের নেপালি পুরোহিতের মত তিনিও কিছু প্রণামী পান।

ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছে। বার্চ গাছের পাতাগুলি ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। অক্টোবরের শেষ। আর কিছুদিনের মধ্যে গাছগুলি সম্পূর্ণ নিরাভরণ হয়ে উঠবে। তারপর বরফে ঢাকা পড়ে যাবে এদের শরীরের অবশিষ্ট অংশ। তখন এখানে কেউ থাকবে না। পুরোহিত পুজো করে নিচে নেমে যাবেন। প্রহরীর মত জেগে থাকবে শুধু দামোদর হিমালয়ের তুষারশিখিরশ্রেণী।

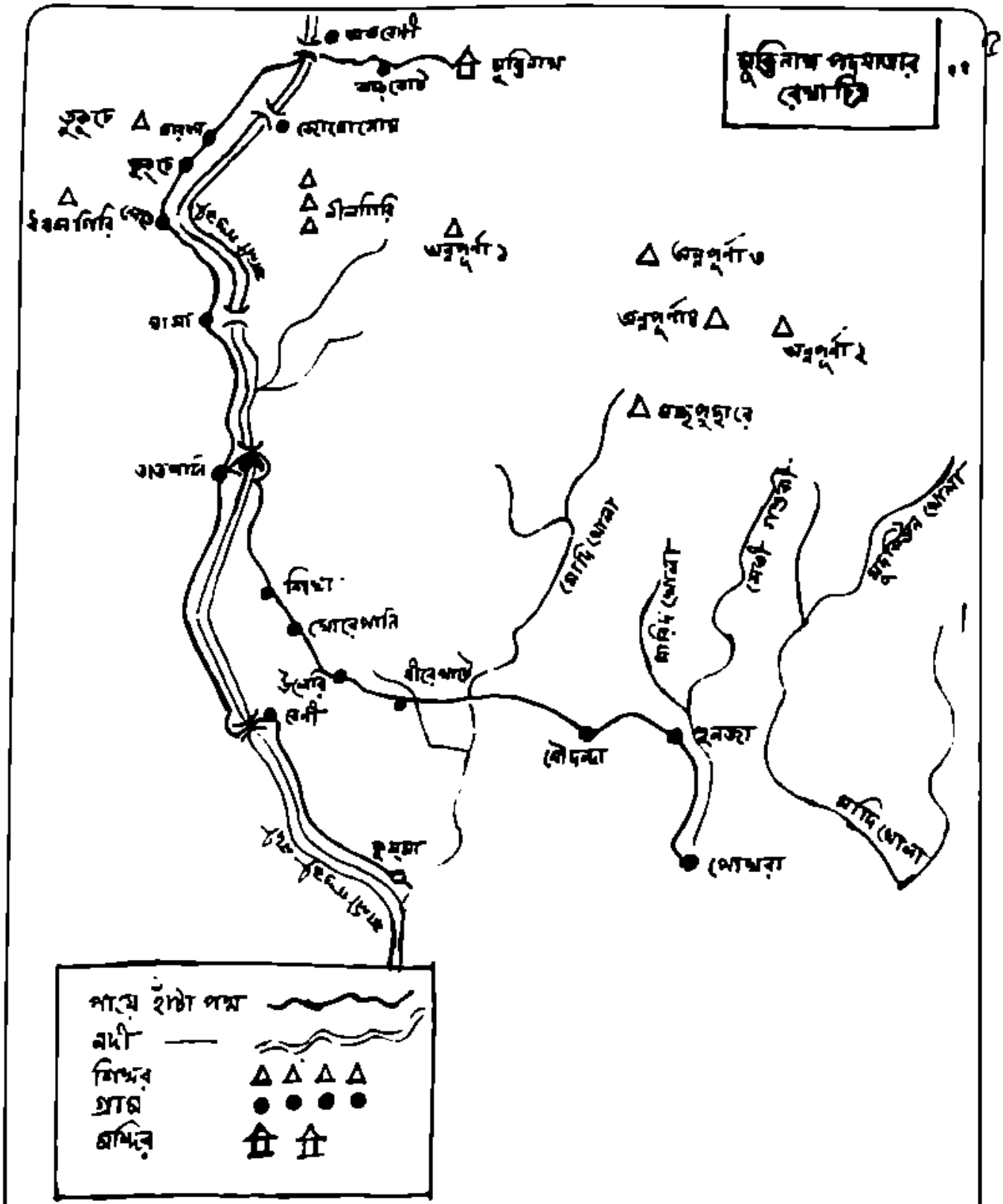

ডওলা দেবীর মন্দির মুক্তিনাথের আরেকটি আকর্ষণ। মুক্তিনাথ মন্দির থেকে কয়েক পা দূরে একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরের ভেতরে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে তিনটি বিভিন্ন জায়গা থেকে। একটা শিখা মাটি থেকে, একটা পাথর থেকে, আরেকটা জল থেকে। তিনটি শিখা একইসঙ্গে বেরিয়ে এসে ধোঁয়া হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এক নেপালি মহিলা এই মন্দিরের পূজারিণী। তিনিই এর দেখাশোনা

করেন। যাত্রী এলে মন্দির খুলে তিনি সব কিছু দেখিয়ে দেন। তাঁকেও কিছু প্রণামী দিতে হয়।

মুক্তিনাথ মন্দিরের পেছনদিকে একটা পাকে চলা পথ উপরে উঠে গেছে। মন্দির দেখা শেষ করে অনেকে সেই পথ ধরে উপরে উঠতে লাগল। এই পথ ধরে দিন চারেক হেঁটে গেলে নাকি দামোদর কুণ্ডে পৌঁছনো যায়। তবে এখন সে যাত্রার সময় নয়। ভীষণ ঠাণ্ডা। পথও দুর্গম। আর তারজন্য বিশেষ প্রস্তুতিও দরকার। ১৪,০০০ ফিটের মত উঠে সকলে এক এক করে নীচে নেমে এল। তখন ঠাণ্ডা বেলজাকিয়ে বসেছে। হাত পা জমে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প রোদের আভা এসে পড়ছে। দামোদর হিমালয়ের বিরাট গিরিশ্রেণী বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলাম সে অপূর্ব দৃশ্য। মনে হল এই বিরাট, মহান, সুন্দর গিরিশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও তার একটা অংশ হয়ে গেছি। আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই বিরাটত্বের কাছে।

আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে নীচে নামতে লাগলাম। সন্ধের একটু আগে পৌঁছলাম জারকোট। এখানে খিমা দোরজের দোকানে জিনিসপত্র রেখে যাওয়া হয়েছিল। রাত্রিবাস এখানেই হবে ঠিক ছিল। পরদিন সকালে আবার কেরার জন্য তাড়াহুড়ো। জারকোট থেকে জোমোসোম হয়ে সেই একইপথে দিনের পর দিন হেঁটে তাতপানি; তারপর সহজপথে বেণী ও কৃষ্ণা হয়ে নওডাঙ্গা। এখান থেকে নেপাল সরকারের বাসে নেপাল-ভারত সীমান্ত সোনৌলি। সোনৌলি থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের বাসে চড়ে গোরখপুর। এরপর হাওড়া।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কিভাবে যাবেন : হাওড়া থেকে গোরখপুর এক্সপ্রেসে (৫০৪৯ আপ) গোরখপুর। এখান থেকে লোক্যাল ট্রেনে বা বাসে নওতনুয়া। এখানে ভারত সরকারের চেক পোস্ট আছে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ হয়। নওতনুয়া থেকে বাসে ভারত-নেপাল সীমান্ত সোনৌলি। এখানে নেপাল চেক পোস্টে জিনিসপত্রের প্রাথমিক চেকিং। ভারতীয় টাকার বদলে নেপালি টাকা করে নিতে হয় এখানে। তারপর নেপালের বাসে চেপে ভৈরবা-বুটওয়াল হয়ে পোখরা। পৌঁছতে মোটামুটি দেড়দিন লাগে। পথে জনসেন বা তার কাছাকাছি কোন জায়গায় এক রাত থাকতে হয়। পোখরায় দু'একদিন থেকে সবকিছু গোছগাছ করে পদযাত্রা শুরু করা দরকার।

কাঁকরভিটা থেকেও বাসে চড়ে পোখরা পৌঁছতে পারেন। প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে শিলিগুড়িপৌঁছে সেখান থেকে বাসে পানিট্যাঙ্কি হয়ে কাঁকরভিটা। কাঁকরভিটার একদিন থেকে বাসের সিট রিজার্ভ করে পরদিন পোখরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন। এপথে পোখরা পৌঁছন অনেক সহজ। তবে দীর্ঘ বাসযাত্রার ধকল সইতে হয়।

প্রথম দিন	পোখরা - নৌমন্দা (১৪৫৮) মিঃ
দ্বিতীয় দিন	নৌমন্দা - তিরকেডুঙ্গা (১৪৩৯)
তৃতীয় দিন	তিরকেডুঙ্গা - ঘোরেপানি (২৮৩৫)
চতুর্থ দিন	ঘোরেপানি - তাতপানি (১১৮৯)
পঞ্চম দিন	তাতপানি - মাসা (২০১২)
ষষ্ঠ দিন	মাসা - লেতে (২৪৩৮)
সপ্তম দিন	লেতে - টুকুচে (২৫৯০)
অষ্টম দিন	টুকুচে - কাকবেণী (১৭০০)
নবম দিন	কাকবেণী - মুক্তিনাথ (৩৭৯৪)

পোখরা থেকে আরেকটি পথে বাগলুঙ পর্যন্ত বাসে গিয়ে সেখান থেকে হাঁটাপথে বেণী, টিপলিঙ হয়ে তাতপানি। তারপর প্রচলিত পথ ধরে মুক্তিনাথ।

কখন যাবেন : শরৎকালই মুক্তিনাথ পদযাত্রার উপযুক্ত সময়। এ সময়ে উঁচু এলাকাগুলিতে বরফ থাকে না। সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রা শুরু করা দরকার। নভেম্বরের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। কারণ নভেম্বর থেকেই নেপালের উঁচু জায়গাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। তখন অনেক জায়গায় পথের কোন চিহ্ন থাকে না।

কোথায় কোথায় থাকবেন : পদযাত্রার প্রত্যেকটি পয়েন্টে হোটেল, ডেরোরী আছে। টাকার বিনিময়ে থাকা ও খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কিছু কম খরচে গ্রামের বাড়িতেও থাকা যায়।

কি কি সঙ্গে নেবেন : ভারি ভারি পশমের পোশাক। শুকনো খাবার-দাবার, সাধারণ অসুখবিসুখের জন্য ওষুধপত্র, ক্যামেরা, জলের বোতল স্লিপিং ব্যাগ থাকলে ভাল হয়।

কি কি দেখবেন : সারা পথই নিসর্গ সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। অসংখ্য ঝোলা (পাহাড়ী নদী) পেরোবেন। দেখবেন অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি, টুকুচে, নীলগিরি, মনাপাতি ও দামোদর হিমালয়ের তুষারধবলতা। নেপালি, থাকালি ও তিব্বতি ধাঁচের সঙ্গে পরিচিত হবেন। তাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি আপনাকে বিস্মিত করবে। হিমের কয়েকটি নামকরা গিরিশিখর তো নেপালের এই দিকেই পড়ে যেমন, মন্নপুছরে (২৩,০০০ ফিট), অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪ ফিট), ধবলগিরি (২৬,৮১০ ফিট), টুকুচে (২২,৭৪৩ ফিট)। ❐

কর্মজীবনের গতানুগতিকতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে কলকাতার সন্নিকটে আপনার সু-স্বাস্থ্য
পুরীর হলিডে হোমে আপনার সবান্ধব অবসর বিনোদন কামনা করি।

যোগাযোগ করুন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রাজবাটি : বর্ধমান - ৭১৩১০৪

With
Best
Compliments
From :

DUKE & CO.

BALLY, HOWRAH

PIN - 711 201

With Best Compliments From :

M/S. MONDAL STORES

RAJCHANDRAPUR, DEWANCHAK
HOWRAH

Prop. - Bidhan Mondal

পুরীর সমুদ্র সৈকতে মনোরম পরিবেশে
আমাদের হলিডে হোম ব্যবহার করুন

যোগাযোগ :

বালি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৩৮৪, জি টি রোড, বালি, হাওড়া

দূরভাষ : ৬৫৪-২২৩৬

নীলমণি ঘোষ
সভাপতি

চিত্তরঞ্জন সরকার
সম্পাদক

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

E. & N. F. RAILWAY CO-OPERATIVE BANK LTD.

34 A&B, Sashi Bhusan Dey Street, Calcutta-12
Telephone Enercept. Phone 225-2906/27-4733

÷ A premier Railway Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
÷ Provides banking facilities for members and public also.
÷ All Deposits covered under Deposit Insurance Act.
÷ Our Branch at E. Rly. Sealdah main station 1st. floor near reservation counter & KPA Rly Workshop
÷ We have Camp Offices at Maligaon, Alipurduar Jan., Katihar, Tinsukia & Lumding of N. F Rly Zone
÷ We have holiday home at Puri, Darjeeling and Digha.

Rate of Interest :

Savings Bank	5%
F. D. Interest 46 days	8.25%
6 months	8.25%
1 Year	9%
2 Years	10.5%
3 Years	11.25%
4 Years	12.25%
Double benefit deposit scheme 66 months	13%

Recurring Deposit for One Year	8%
for Two Years	10%
for Four & Five Years	11.50%

N. K. GANGULY
Chief Executive

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ভহরকুণ্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ - ভহরকুণ্ডু ※ ব্লক - আরামবাগ

জেলা হুগলি ※ রেজি ঃ নং - ২২ ※ তাং - ২২-৩-৫৩

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, ভোগ্যঋণ, চাষের সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং আমানত ব্যবসার মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

শম্ভুনাথ বেরা	চণ্ডী সামন্ত	নিতাই ভৌমিক
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬৮, তেঁতুলবাগান রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৩১, দূরভাষ - ৪১৫৮৫৭৫/৪০৫৫

কলিকাতার একমাত্র কম্পিউটার চালিত সমবায় ব্যাঙ্ক

সঞ্চয় প্রকল্প ঃ সেভিংস ব্যাঙ্ক, মান্থলি ইনকাম স্কীম, রেকারিং ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, ফিক্সড ডিপোজিট, ফেস্টিভাল ডিপোজিট, কলকেক ডিপোজিট সার্টিফিকেট।

ঋণ প্রকল্প ঃ

স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ, মধ্যমেয়াদি ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ, গৃহনির্মাণ, জমি ক্রয় ও ব্যবসারের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, ছাত্রদের সঞ্চয়, হিসাব বিকাশ পত্র, ডিফেন্সবন্ড প্রভৃতি বন্ধকি ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রসার ঋণ, যানবাহন ক্রয় ঋণ, ডি সি অর্ব, ডি সি পি, ওভারড্রাফট, লেটার অফ ক্রেডিট, ট্রাস্ট রিসিট, ফার্নিচার প্রভৃতি ক্রয় ঋণ, মেয়াদি আমানত জমা ঋণ

অন্যান্য সুবিধা ঃ

এসোসিয়েট মেম্বারশিপ, সঞ্চয় প্রকল্পে নমিনেশন, জয়েন্ট একাউন্ট, সেফ ডিপোজিট লকার, গিফ্‌ট চেক

সেভিংস ব্যাঙ্ক ও মেয়াদি আমানত প্রকল্পে জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে সুদের হার অর্ধ শতাংশ বেশি

সমস্ত সঞ্চয় ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের আওতায় সুরক্ষিত।

সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তু তে।।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

কলিকাতা প্রধান শাখা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৯৪ সালে বিশেষ উৎসাহবর্ধক দ্বিতীয় পুরস্কারের প্রাপক

এই অঞ্চলের মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার

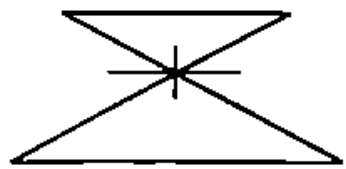

দক্ষিণ শহরতলী মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড

"মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সংগ্রামের নিরলস সৈনিক"

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

পশ্চিমবাংলার মহিলা সমবায়ের একমাত্র শীর্ষ শিল্প সমবায়

আমাদের তিনটি বিক্রয় কেন্দ্র

সমবায়িকা মল্লিকতলা সিভিক সেন্টার।

হেমন্ত ভবন, ১২ বি বা দি বাগ কলিকাতা - ৭০০ ০০১।

"এ ই" মার্কেট, বিধাননগর, সপ নং - ৭১।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

১২, বি বা দি বাগ, ৪র্থ তল, হেমন্ত ভবন, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

রেজিস্টার্ড নং ১/সিটি, তারিখ - ২৯.৩.১২৮১

ফোন : ২১০-৪৩৬৩

আরতি ভট্টাচার্য

চেয়ারপার্সন

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

THE NABAPALLI CO-OPERATIVE BANK LTD.

P.O. : NABAPALLI. BARASAT.

NORTH 24 PARGANAS.

PIN-743 203. TELEPHONE : 552-3376

(All types of Banking transactions as permitted to Urban Co-operative Bank with lockers facilities are undertaken.)

Interest Deposit : from 01.01.98

Fixed Deposit : 91 days to 180 days	6.75%
181 days to less than 1 year	7.25%
1 year but less than 2 years	10.25%
2 years but less than 3 years	11%
3 years but less than 5 years	12%
5 years and above	12.75%
Kalpataru Prakalpa	Double
Recurring Deposit	10.25% to 12.25%
Savings Bank Deposit	5% P.A.

৩০ হাজার সদস্য

৮০ হাজার আমানতকারী

এবং

ব্যাঙ্কের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের

পক্ষ থেকে জানাই

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা

ও

সংগ্রামী সমবায়ী অভিনন্দন

দি ব্যাঁটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দূরভাষ : ৬৬৭-৪১৭৫, ৬৬৭-১২৭০, ৬৬৭-২৭৫৮

বর্ধমান শহরে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য প্রথম মহিলা সমবায় সমিতি

বর্ধমান মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ১/৯৪ তারিখ - ১০/৩/৯৪

হেড অফিস : ৩৩, পার্কাস রোড, বর্ধমান - ১

ব্রাঞ্চ অফিস : গুসকরা, গলসি, ফোন - ৬৫৪৬২

মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সহজ কিস্তিতে ঋণ দানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য জাতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে বিভিন্ন ধরনের আমানত প্রকল্প চালু আছে।

আমানত প্রকল্পগুলিকে মজবুত করতে সকলের সহযোগিতা কাম্য। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাদের সহিত যোগাযোগ করুন।

বকুল মুখার্জি	**আশা বসুমা**	**মধুশ্রী রায়**
চেয়ারপার্সন	*সেক্রেটারি*	*ম্যানেজার*

বিঃদ্রঃ - অল্প সুদে মেয়াদি ভিত্তিতে ঋণের মাধ্যমে বহু দুঃস্থ বেকার মহিলা উপকৃত।

প্রবন্ধ

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন

অমিয় মজুমদার

প্রায় শতবর্ষ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। শহরাঞ্চলে সূচনায় সমবায় সংগঠনে উৎসাহী হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তবেই গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জর্জরিত কৃষিজীবী মানুষের জটিল আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপশমের তাগিদে। স্বনির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি পোষকতায় এই সাংগঠনিক শক্তিকে গড়ে তোলার জন্য সেদিন প্রশাসনিক প্রয়োজনেই সমবায় উদ্যোগের জন্ম। স্বাধীন ভারতে নিজ সংবিধিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও স্বাধীনতার পরই অগ্রাধিকার শক্তিরূপে আজ ভারতীয় অর্থনীতিতে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের প্রথাত অর্থনীতিবিদরা এ আন্দোলনকে প্রশংসাই নয়, দেশের সর্বস্তরীয় আর্থ-সামাজিক জীবনধারায় উদ্যোগী হতে প্রেরণা দিয়েছেন। উৎপাদন, বিপণন, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে বাসস্থান সমস্যা সমাধানেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভূমিকা উপেক্ষা রহিত নয়। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামের ৬৫% পরিবার আজ কোনও না কোনভাবে আন্দোলনে সামিল। প্রায় ২০০০ মিলিয়ন সদস্য এ আন্দোলনে জড়িত। নতুন পরিবেশনার প্রেক্ষাপটে আশা করা হয়েছে বছরে ৮/৯ মিলিয়ন কর্মসংস্থানে সাহায্য করবে সমবায় উদ্যোগ। অবশ্য এ কারণে গ্রামীণ এলাকার এ পর্যন্ত অব্যবহৃত সম্পদকে সুসংহত করতে হবে। সুসমন্বিত সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সাংগঠনিক রূপে সফলতা অর্জন করলেই হবে না, সমবায় নীতি-নির্ভর সার্থক প্রয়াস দ্বারা সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করাই হবে এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এজন্য তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে বহুধা ব্যাপ্তি (diversified) প্রয়োজন

প্রসঙ্গক্রমে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান চিত্র পরিসংখ্যান মাধ্যমে উপস্থাপন প্রয়োজন। ১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান মত দেশের ৯২.৫% গ্রাম তখন সমবায় আন্দোলনের আওতায়। দেশের সর্বমোট কৃষিঋণ সরবরাহের প্রায় ৫৮.৯৭%, রাসায়নিক সার বণ্টনের ৩৩.৫%, চিনি উৎপাদনের ৫৯.১%, গম সংগ্রহের ৩৪%, ক্ষুদ্রে উচিৎ মূল্যের বিপণী সরবরাহ ১৭%, তাঁত শিল্পের ৫৫%, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনের ২১%, মৎস্যজীবীদের সমবায় মুক্তি ২১%, গ্রামীণ গৃহসহ অন্যান্য প্রায় সবক্ষেত্রে সুযোগ ৬১%। বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভর কর্মোদ্যোগে সমবায় আজ কর্মসংস্থানে সক্ষম ১২.৪ মিলিয়ন মানুষ।

সমবায় আন্দোলনের শতবর্ষের নিরিখে সর্বভারতীয় উদ্যোগ প্রশংসাজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কৃষি সমবায় সংগঠন সেই ১৯০৪ সালে যার প্রাথমিক উদ্যোগের শুরু আজ যে ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রভাব। প্রায় প্রতিটি গ্রাম একক এর আওতায় এর মধ্যে ৬১.৪% গ্রামীণ সমবায় স্বনির্ভর বলা চলে। আজ এদের সদস্য সংখ্যা ২০.৬ মিলিয়ন যাদের ২৭.৬% স্বল্পজোতের কৃষক, ৪২.৫৪% প্রান্তিক চাষী। এদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে ১,০৭,৯৪৭ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে ৮৮.১% স্বল্পমেয়াদি, ১১.৮% মধ্যমেয়াদি। কিন্তু অনাদায়ের চিত্রটাও কম নয়। আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদি ঋণের ৩১.৪% ও মধ্যমেয়াদি ঋণের ৪৯.০% অনাদায়ী। আর কর্মসংস্থানে প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতির কৃতিত্ব কম নয়। ১২৫৭৫৮ জন বেতনভোগী কর্মী সুযোগ পেয়েছে।

আজ সারা দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৬১ যাদের মোট অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১৪,৩৪৪.৫ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ মোট অংশগত মূলধনের ১৮.১%। এসব ব্যাঙ্ক থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৩৩৪৭০০.৮ মিলিয়ন টাকা যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি পরিমাণ স্বল্পমেয়াদি ঋণ; অবশ্য এর মধ্যে অনাদায় মোট আদায়যোগ্য ঋণের ৩১.৫২%। এইসব ব্যাঙ্কে নানাস্তরে কর্মরত ১০০৪১২ জন।

সারা দেশে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮টি, যার শাখা সংখ্যা ৭৪২, অংশগত মূলধন ৩৬৪০.৫ মিলিয়ন টাকা যার ১০.৪% সরকারি বিনিয়োগ। এসব ব্যাঙ্ক কৃষিঋণ সংস্থানে যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে 'নাবার্ড' থেকে যথাযথ্রোজনীয় অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ। ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের ৭৮.৭৬% নাবার্ড থেকে পাওয়া। আলোচ্যবর্ষ শেষে এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রদত্ত ঋণ ২২১৪৫০.৭ মিলিয়ন টাকা। স্বল্প-মেয়াদি কৃষি-অকৃষি খাতে মোট প্রদত্ত ঋণের ১০.৭৩% অনাদায়ী ছিল।

দেশে ভূমি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে দীর্ঘ-মধ্যমেয়াদি ঋণ দানের প্রসার ঘটায় সম্পদ-সৃষ্টি সহায়ক করতে গ্রামীণ মানুষ অনুপ্রাণিত বোধ করছে। দেশে ১২টি ব্যাঙ্ক তাদের ১০৪৮টি কার্যকর শাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে নিযুক্ত। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৫১৮৩.৪৩ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি বিনিয়োগ ১৯%। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৫১৩৯.৭২ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে গ্রামীণ কৃষি-সহায়ক প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কারণে প্রদত্ত ৮৩%। এদের সূত্রে গ্রামীণ গৃহনির্মাণেও ঋণ প্রদান শুরু হয়েছে ১.৯%।

সারা দেশে প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৭৩২। অবশ্য অনাদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট উদ্বেগময়, রাজ্যস্তরের ব্যাঙ্কসমূহের ক্ষেত্রে ৩৭.৭%, প্রাথমিক স্তরে ৫৭.৪%।

শহরাঞ্চলে সংগঠিত সমবায় ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে এজন্য যে এক্ষেত্রে সরকারি অংশীদারিত্ব নামমাত্র। ১৭১৫টি ব্যাঙ্কের অংশগত মূলধন ৫৬১১.৫ মিলিয়ন টাকার মধ্যে মাত্র ০.৫%। মোট সদস্যের ৬৯গ্রহীতা সংখ্যা ৪৫.৮%। সর্বাধিক উল্লেখ চিত্র শহরাঞ্চলীয় অকৃষি ঋণদান সমিতি ক্ষেত্রে। দেশে ৪০,৫৮৫টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৯.৮৮ মিলিয়ন। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১২৩৫৮.৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে সরকারি অংশের পরিমাণ মাত্র ০.৫%। ঋণ প্রদত্ত হয়েছে ৩৯৪৩০.৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে অনাদায়ের পরিমাণ ৩.৬%। সমবায় সামগ্রিক আন্দোলনে এই ক্ষেত্রে সরকারি প্রভাব যৎসামান্য। নিজ যৌথ শক্তিতে এবং সাংগঠনিক কৃতিত্বে এ আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে।

কৃষি বিপণন সমবায় অবশ্য সারা দেশে সরকারি পোষকতার প্রসার লাভ করেছে। এই বিপণন সমবায় মাধ্যমে কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৯৫,০৩৮.৪ মিলিয়ন টাকা। কৃষি প্রযুক্তি ও উৎপাদন সহায়ক ভারসে ও গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের প্রয়োজনে বিতরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। প্রাথমিক স্তরের বিপণন সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৮৮০৬, যার সঙ্গে সদস্যভাপে যুক্ত ৫.০৯ মিলিয়ন মানুষ। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ২৩১৩.৪ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি বিনিয়োগ ৬৫.৫%। এসব সমিতির ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫৭১৪৫.৯ মিলিয়ন টাকা। গুদামঘরের সংখ্যা ৮৬২২ যাদের সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ৩৩৯৮৬৩২ হাজার টন। ক্ষেত্রক ফসল বিক্রয় ১৮৩২৮.২৩ মিলিয়ন টাকা, কৃষি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ৮২৩৪৯৪৯ মিলিয়ন টাকা, ভোগ্যপণ্য ১১৭৭৭.৭৮ মিলিয়ন টাকা। রাজ্যস্তরের শীর্ষ সমিতির সংখ্যা ২৯ এবং জেলাসহ কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ৫৪৫। অংশগত মূলধন ৬৩৪৮.৬ মিলিয়ন টাকা যাদের ৮৮% সরকারি বিনিয়োগ।

ভোক্তা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৩১৩৭ তৎসহ শাখা ও বিভাগীয় বিপণী মিলে রয়েছে ১২৮৭। অন্তর্ভুক্ত উচিত মূল্যের দোকান ২০,০৭১ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ৯১৮৮ মিলিয়ন। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৫৫৪.২ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি অংশ ১৭.৫%। মোট বিক্রয়ের আর্থিক পরিমাণ ৯৩৩০৩৯ মিলিয়ন টাকা। বিক্রিত সামগ্রীর মধ্যে কন্ট্রোল সামগ্রী ৫৩.৬% অন্যান্য ৪৫.৪%। রাজ্যস্তরে ভোক্তা সমবায় সংঘ ২৯ যার বিভাগীয় বিপণী ১৭৬, মুচরো দোকান ৭৭৯ এবং শাখা সংখ্যা ২৪০। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৭১৯.৮৯ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি অংশ ৭৪.৭%। এই সব শীর্ষ সংঘের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাইকারি সমিতি (হোলসেল সোসাইটি) ৬৬৬।

প্রক্রিয়াকরণ (প্রসেসিং) উদ্যোগে সমবায়ের ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য বিশেষ করে চিনি উৎপাদনে। সমবায় চিনি কলের সংখ্যা ২৪৪টি যার মধ্যে নিয়মিত চালু সমিতির সংখ্যা ২৩১টি। এই সব সমিতির ইক্ষু উৎপাদক সদস্যের অনুপাত ১০.২%। সারা ভারতে মোট আখ মাড়াই পরিমাণের ৫৬.৯২% সমবায়ের মাধ্যমে হচ্ছে এবং চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৬,৯৬৬ মিলিয়ন টন। দেশের মোট চিনি উৎপাদনের ৬০.২% সমবায় চিনি কলে।

বুনন উৎপাদন ক্ষেত্রে সমবায় উদ্যোগের ক্রমশ প্রসার ঘটছে। ৭২৭৪৪টি বুনন সমবায়ের সদস্য সংখ্যা ৯০১৪ মিলিয়ন, অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১২৪৫.৪ মিলিয়ন টাকা, টার্ন ওভার ৪১৭০৬.০ মিলিয়ন টাকা। সমবায় মাধ্যমে প্রতিদিন ১৯৫৯ হাজার মিটার বুনন সরবরাহ হচ্ছে। মেয়েদের ভাগেরির সংখ্যাও বাড়ছে। সহকে সংখ্যা ৭২৫ এবং গ্রামীণ ১৯১৮।

মৎস্য চাষে দেশে সমবায় সমিতি সংখ্যা ১০৩৬৫ যার ২০% সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহে নিযুক্ত। মোট ১১২২ মিলিয়ন মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৫৫% সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে যায় এবং এদের মাধ্যমে প্রায় ছাট হাজার টন মাছ ধরা হয়েছে (১৯৯৫ হিসাব মত)

শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁত শিল্প সমবায় ১৮৩৯৮ টির মধ্যে হস্তচালিত সূতা বস্ত্র উৎপাদনে রত ৪৯৫০। প্রায় ১৮৯৪ মিলিয়ন সদস্য এদের সঙ্গে যুক্ত। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১০৮৬.১ মিলিয়ন টাকা যার ৪৫.৫% সরকারি। বিক্রিত সামগ্রীর পরিমাণ ৪৭৫৬.০ মিলিয়ন টাকা।

সূতাকল সমবায় সংখ্যা ৫১৩ যাদের ১০৭টি তুলাচাষীদের ৬৭৭টি তাঁতশিল্পী নিয়ে। স্পিনিং মিলগুলি ১০৭টি উৎপাদনেরত, সদস্য সংখ্যা ০.৫৫৯ মিলিয়ন, তুলাচাষী ৬৮.১%, তাঁতশিল্পী ৬.৫% পাওয়ারলুম তাঁতি ৪.০% মোট অংশগত মূলধন ৩৮৭৭.৯ মিলিয়ন টাকা যার ৮৬.১% সরকারি।

গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রেও এ আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত। দেশে ২৫টি শীর্ষ আবাসন সমবায় সংঘের থেকে প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদত্ত হয়। সমবায় মাধ্যমে ১৯৭১৪২৩টি গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং ১৯৫.০৮০টি নির্মীয়মান। শীর্ষ সমবায়ের অংশগত মূলধনের পরিমাণ ২৬২২.২৩ মিলিয়ন টাকা যার ৫০.০% শেয়ার সরকারি। শীর্ষ আবাসনের অর্থসংস্থান সূত্র মূলত জীবনবিমা কর্পোরেশন ৬৬.৭% হাউজো ১০.৯% রাজ্য সরকার ৪.৯% অর্থপ্রদায়ী ঋণ ৮.৬%।

ধীরে ধীরে সংগঠিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, হাঁস-মুরগি পালন, শ্রমিক সমবায়, অবসর শ্রমিক সমবায়, বিদ্যুৎ বন্টন সমবায় প্রভৃতি (পরিসংখ্যান সূত্র : Indian Co-operative Movement : 4 profile-Natural Resource Centre of NCUI)

সমবায় আন্দোলনের উজ্জ্বল চিত্র পরিবেশিত পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। প্রায় শতবর্ষের সমবায় আন্দোলন আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসারিত। সরকারি অনৌদার্যিত্ব এ প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। প্রথমাবধি সরকারি পোষকতা অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে সরকার সজাগ। বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালপর্ব থেকে সপ্তম পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঠিকই যষ্ঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই প্রত্যাশা হঠাৎই যেন থমকে যায়। ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘদিনের নীতিগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। মনমোহন সিং যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী তখনই প্রথম জাতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণের উদ্যোগ দেখিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে সরকার পরিবর্তন হলেও এই উদারনীতির কাল প্রায় অপরিবর্তিত থাকায় সমবায় আন্দোলনের প্রসারে এর নিশ্চিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম পরিকল্পনার সময়ে কর্মসূচি হিসেবে কোন পৃথক অধ্যায় সূচিত না হওয়ায় এই আন্দোলন যুক্ত সর্বজনমানসে জোরের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সমবায় আন্দোলন এক নিজশক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে না পারলে বিকল্প পথ প্রায় রুদ্ধ। প্রতিযোগিতার সমবায় বাজার অর্থনীতিতে এই আন্দোলনের অনুকূল প্রসার সম্বন্ধে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ হয়েছে। গত ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় সমবায় সম্মেলন (13th National Cooperative Congress. 21-22 January '97) এই উদারনীতিই আলোচ্য সূচিতে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই সম্মেলনের প্রেক্ষিতে যে মুভেনির প্রকাশ করে তাতে ঐ ইউনিয়ন সভাপতি বি এস বিষ্ণোরাও তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

"To day Cooperative movement has become more conseous of its role as a system for ensuring integrate

development of Community rather than funtioning merely as an economic organisation. The Cooperatives aim at inculcation of cooperative values and attitudes that strengthen the social base of the country and also undertake diversified activities for socio-economic development of the people belonging to those sectors of the community which have been bypassed by the process of economic and social development'.

মূল কথা হল সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমবায় নীতি নির্ভর পদ্ধতিতে বিকাশ পথে সার্বিক সমাজ উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। আর এজন্য সমবায়কে তার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বহুতর কর্মসূচি গ্রহণ ভিন্ন দুর্বল শ্রেণীর মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে জাগে প্রায় শতবর্ষের এই আন্দোলনের বিকাশপথ কি খুবই মসৃণ ও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমবায় ও নিত্য দ্রব্য সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সজাগ সচেতন, সমবায় সংগঠনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্নমন্ত্রী মোহন ধারিয়া। ঐ সুত্রেলিরেই সম্প্রতি প্রবন্ধে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন এভাবে, " Though Co-operative Movement has made considerable mark in several area, it has to be conceded that glaring defects have developed in the movement which virtually defeat the very objectives of the noble movement. Powerful societies like Sugar Cooperatives, Spining Cooperatives or Banking Cooperatives have unfortunately fallen prey to political parties or leaders and this politicisation has taken a heavy toll of the system."

তাঁর কথায় এ আন্দোলনে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব যাঁরা সমবায়ের সামগ্রিক স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশ আজ অনেক অগ্রগতি করলেও দেশের ৫০% মানুষ আজও দরিদ্র অথবা দারিদ্রসীমার নীচে। আজও মোট কৃষিযোগ্য জমির অর্ধেক হয় উষর অথবা পতিত। ভোক্তা সমবায় এদেশে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও এ পর্যন্ত যথাপ্রয়োজনীয় প্রসারে সক্ষম হয়নি। এখনও উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর উপযুক্ত (remunaration) মূল্য পায় না। অন্যদিকে ভোক্তা সাধারণ উচিৎ দামে তাদের চাহিদা সমগ্রে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে সমবায় সংগঠনমুখী করে তোলার অবকাশ আছে।

তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, দেশ আজ প্রতিযোগহীনভাবে মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে। ভারতের পক্ষে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তন ও প্রভাব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব না হলেও পুরোপুরি এই বাজার অর্থনীতির সামিল হওয়া বিপজ্জনক।

I must state with all emphasis at my comand that free entry to multinational without any discrimination shall destroy the very fibre of the socio-economic structure of the country and may endanger our freedom itself. "

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রকের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, অষ্টম পরিকল্পনায় সমবায় উদ্যোগ বিষয়ে কোন ইতিবাচক উল্লেখই ছিল না। " The 8th Five Year Plan document does not even mention the name of the cooperative structure which has taken deep roots in many areas like credit, distribution, lift-irrigation, processing, marketing etc."

ডাঃ আর সি দ্বিবেদীও মুক্ত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছেন, সমবায়ের চরিত্র ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা আর সম্ভব হবে কি না? উত্তরে নিজেই বলেছেন এই স্বাতন্ত্র্য বলতে তিনি কি বোঝেন?

It is an organisation of persons, autonomus and independent, controlled democratically by members themselves based on values guided by a set of cooperative principles..... It is with these characteresitics and identity that a cooperative becomes cooperative. If these features do not exit a cooperative ceases to exist in its real, genuine form. "

তাঁর মতে আজ এ আন্দোলন এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ব্যর্থ, সমবায় আন্দোলন স্বশাসিতও নয়, স্বাধীনও নয়, ' They are highly bureaucratised officialised and politicalised .... the value base of cooperation in extremely weak. Govt. intervention and interference is all pervasive."

এতৎসত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস নতুন অর্থনীতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম যদি সুসংহত প্রচেষ্টায় সব ধরনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দূর করতে পারি। তাঁর প্রধান শর্ত হল বিশ্বাসযোগ্যতা। গুণগত বিচারে, সার্থক পরিষেবার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করা গেলে এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অস্বীকার করার বোধহয় কোন সঙ্গত কারণ নেই যে সরকারি হস্তক্ষেপ সর্বস্তরীয় সমবায় আন্দোলনে সদা পরিদৃশ্যমান। প্রতি রাজ্য সমবায় আইনেই প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকার অথবা সমবায় নিবন্ধককে দেওয়া হয়েছে সমবায় সমিতির আভ্যন্তরিক পরিচালন গত জটিলতা, অব্যবস্থাপনা, বিধি বহির্ভূত ত্রুটি বিচ্যুতি যখন সদস্য সাধারণের সমূহ বিপদের কারণ বলে অনুমিত হয় তখন এই প্রশাসক নিয়োগ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে অতত রাজনৈতিক প্রভাবের ছায়াও প্রত্যক্ষ করা হয়। এই অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণের জন্যই প্রয়োজন প্রশাসন নিয়োগের অব্যবহিত পর থেকে সংশ্লিষ্ট সমিতির পরিচালনা ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনার যথাবিহিত সঠিক মূল্যায়ন। যদি দেখা যায়।

প্রশাসকের কার্যকালে সংশ্লিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনার ভারও অবনতি ঘটেছে বা তাদের লক্ষ্যোত্তীর্ণ ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সমিতির ব্যবসায়িক ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বা পরিচালনার স্বচ্ছতার পরিবর্তে অধিকতর জটিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তবে সেই প্রশাসকদের শুধু অপসারণই নয় জবাবদিহি সহ উপযুক্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা বর্তমান আইনে প্রায় নেই বললেই চলে।

সমবায় আন্দোলনে সরকারি পোষকতা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। তবে শুধু এ কারণেই অকারণ অযাচিত স্বাভাবিক প্রশাসনিক দক্ষতাকে খর্ব করে, স্বাধীন বুদ্ধি বা বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনা সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়তা আনে। সেজন্যই এক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত অথচ সুপ্রতিষ্ঠাবক স্বরূপ হলে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন-পরিচালনা ক্ষেত্রে যথা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে। অকারণ হস্তক্ষেপ বা তার অসঙ্গত ভূমিকার পরিবর্তে গঠনমূলক, সংশোধনমূলক পরামর্শ সমবায় আন্দোলনের ক্রমগত প্রসারে সহায়ক হবে।

এই সূত্রে প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরের সমিতির কার্যধারার নিয়মিত মূল্যায়ন ও তার বিচারে যথা প্রয়োজনীয় উন্নয়নমুখী কার্যক্রম পরামর্শ ও action programmes রচনায় সাহায্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমাদের রাজ্যে কর্মচারী কল্যাণ সমবায়ের অসামান্য অগ্রগতি। কিন্তু নগর জীবনে সাধারণ মানুষের উদ্যোগে শহরাঞ্চলীয় কল্যাণ সমিতির বিকাশ তেমন ঘটেনি। নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকা ভিন্ন। কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে এর আশানুরূপ প্রসার লক্ষ্য করা যায়নি। সাম্প্রতিককালে সমবায় দপ্তরের ও রাজ্য সমবায় মন্ত্রকের পরামর্শ ও প্রভাবে বছর পাঁচ-ছয় পূর্বে কলকাতা শহরের সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকটি শহরাঞ্চলীয় কল্যাণ সমিতি সংগঠিত করছে যার মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা দ্বারা সংগঠিত সমবায়ও আছে। এ খুবই আনন্দের কথা কারণ পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান শহরগুলিতে এ ধরনের সমিতি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের রাজ্যেও এমন না হওয়ার কারণ নেই। মনে হয়, এই কয় বছরে সংগঠিত সমিতিগুলির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনযোগ্যতা, অর্থ সংগ্রহ ও লগ্নি, সদস্য সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা, ঋণ গ্রহীতাদের শ্রেণী বিন্যাস ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের মানসিকতা প্রভৃতি নিয়ে এখনই সহায়ক সমীক্ষার প্রয়োজন, কারণ কোন কোন দুর্বল সমিতির সংগঠনের প্রথম অবস্থায় যদি সংশোধনমূলক পরামর্শ দেওয়া যায় তবে অন্তত ভবিষ্যতে অধিকতর জটিলতার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। প্রয়োজন সময়মত সুপরামর্শ, পুলিশি ভয় প্রদর্শনমূলক অনুসন্ধান নয়। ইতিবাচক পরামর্শই সদ্য গঠিত অথচ অনুপ্রবিষ্ট সাময়িক দুর্বলতা প্রতিহত করে তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। এমনি উদ্যোগ বিভিন্ন স্তরের সমবায় ক্ষেত্রেই সমবায় দপ্তর বা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেষ্টার নিতে পারলে আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে নিজ শক্তিতেই তা প্রসারিত হবেই। মুক্ত অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনগত সিদ্ধান্তকে ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আনতে হতে পারে; পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সরকারি আনুকূল্য নির্ভর না হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার উদ্যোগেও সামিল হতে হবে। তাই বলে আন্দোলনকে কখনই বন্ধ্যা বলে অভিযুক্ত করার অবকাশ নেই। আন্দোলনের উষাকালে যে সরকারি পোষকতার কথা তা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অব্যাহত এবং তা কখন হওয়ার কারণ থাকতেই পারে না। আজ মুক্ত অর্থনীতির যুগে এ আন্দোলন বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সেজন্যই সাংগঠনিক পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনাগত ও পরিচালন সংক্রান্ত যে সব পরিবর্তন সময়োপযোগী ও আন্দোলন প্রসার সহায়ক বলে মনে হবে তা গ্রহণে দ্বিধা করা দেখি না। সেই সঙ্গে এ পরিবর্তন যাতে দ্রুত কার্যকর হয় তার নির্দিষ্ট সূচি সময়ভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রস্তুতি ও রূপায়ণের দিকে আন্দোলনের প্রবক্তা ও নেতৃত্বের মুক্ত মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি সমৃদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ❑

সখ ও সখা

আমার এক বন্ধু তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দ্বিধান্বিত' প্রকাশ করেছেন। আমাকে বইটির একটি কপি উপহার দিয়ে বিনিময়ে চেয়েছেন কবিতাগুলির সার্বিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আমার ভালো লাগার একটি ছোট্ট স্মারকপত্র। যে চিঠিটি লিখেছি তা আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি। কবিতার বইটি আপনাদের কাছে হাজির করতে না পারলেও সাধারণভাবে কবি ও কবিতা পরস্পরের মুখোমুখি এসে কোন প্রশ্নে পরিণত হয় তা জানবার চেষ্টা করেছি চিঠিটিতে।

প্রিয় সুধীর,

তোমার 'দ্বিধান্বিত' পড়লাম। তোমার সৃষ্টির আনন্দ-ভাগ নিলাম। কবিতা ভালোবাসি কিন্তু নানা কারণে কবিতা পড়ার অভ্যেস আমার নেই। তাই তোমার কবিতা নিয়ে দু-এক কথা বলতে গিয়ে কতটা ভুল হ'ল সে ভয় আমার থাকল।

কবি যখন অভিনয় করেন তখন আমার প্রশ্নেরও অবধি থাকে না ; কারণ আমি অসহায় বোধ করি।

কবি যখন তাঁর কথা বলেন তখন আমি বিহ্বল হই ; কারণ তাঁর কথা সহায়-সম্বল মানি। আমি খুঁজে পাই আমার হারানো সুর।

কবি যখন প্রশ্নটা হন আমার 'মৃদু হাসি' উপহার দিয়ে তাঁকে সমাদর করি।

কবি যখন আলোর সন্ধানী হন তখন আমি তাঁকে দেখি আলোর ভিখারী।

কবি যখন উত্তত হন তখন বুক দুরু দুরু করে, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে চিন্তাগ্রস্ত হই।

কবি যখন স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য তৈরী করে আয়োজন করেন তখন আমি কিছু লাল ফুল সংগ্রহ করে আনি।

তোমার কবি জীবনে উত্তরণ, অনুভূতি ও প্রতিশ্রুতির নিবিড় মিলনে, সার্থক হোক।

ইতি —
বিনয়

নবদ্বীপ থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ

পরিচালিত

নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাটে

আধুনিক ডিজাইনের সর্বপ্রকার তাঁতের ও ছাপা শাড়ি, নবদ্বীপ শাড়ি, লুঙ্গি,
গামছা ও রেডিমেড পোশাক সস্তা দরে পাওয়া যায়।

প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র ও রবিবার হাট বসে।

স্থান :

তাঁত কাপড় হাট ভবন

উত্তরাণ রোড, নবদ্বীপ

ফোন : (০৩৪৭২) ৪০৬৪৮

For the Interest of Co-operative Movement

Space Donated By

BURDWAN C. M. S. HIGH SCHOOL EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

B.C. Road
Burdwan
Phone : 66210

With Best Compliments From

CHINSURAH WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Pearabagan Road
P.O. & Dist. : Hooghly
STD CODE NO. 033
Phone 80-2433 / 80-2537

Nripen Chatterjee
Vice-Chairman

Ramsundar Ramani
Chairman

রামপুরহাট সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রামপুরহাট ● বীরভূম

ফোন : ৫৫-১৮৪

শাখা অফিস : কোটাসুর ব্রাঞ্চ (মল্লারপুর)

সাব-অফিস : নলহাটী, মুরারই

"আমরা কাজ করি ক্ষেতে-খামারে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে,
গৃহে এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে"

এছাড়াও আমরা চালু করেছি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

গৌরাঙ্গ মণ্ডল
সহ-সভাপতি

দুর্গাদাস ঘোষ
সভাপতি

With Best
Compliments From

PHILIPS EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

7, Justice Chandra Madhab Road
Calcutta - 700 020

তুমি শোষকের ত্রাস, মহাজনের ফাঁস
তুমি সমবায়, তুমি সমবায়।

এ্যাসোসিয়েশন অব হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স

হুগলি ইউনিট, সেকো

রবীন্দ্রনগর সুপার মার্কেট (দ্বিতীয় তল)
পো:-রবীন্দ্রনগর, হুগলি

With Best Compliments From

KULTI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.

Gram-Kulti (Burdwan)

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

দি বাকসাড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজিঃ নং ৬-৮০/৮১(হাওড়া)

প্রধান কার্যালয়

এল এম সি সরণি

পোঃ-বাকসাড়া, হাওড়া - ৭১১ ৩০৬

ফোন নং : ৬৫৮-৬৩৮২

জগাছা এক্সটেনশন কাউন্টার

জগাছা হসপিটাল রোড,

পোঃ- ডি আই পি কলোনি

হাওড়া - ৭১১ ৩২১, ফোন নং ৬৫৩-৩৬৯০

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

তুমি হতাশার ভাষা, বেকারের ত্রাতা
তুমি সমবায়, তুমি সমবায়

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

বর্ধমান ইউনিট, সেকো

সমন্বয় ভবন
৩৮, কাঞ্চনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩ ১০১
দূরভাষ ৬৬৬৩০

যেদিন শিউলি বকুলের পবিত্র পরশ
গায়ে মেখে চিৎকার করে বলবো
বন্ধু সমবায়ই মুক্তি, সমবায়ের জয়ডঙ্কা বাজাও
সেইদিন শান্তি

মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

মুর্শিদাবাদ ইউনিট, সেকো

অভয়
২০/৪, চিত্তরঞ্জন দাস রোড
বহরমপুর - ৭৪২ ১০১

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন —

গুড়াপ তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৮ এইচ ডি তাং ১৫-২-৭৩

গ্রাম ও পোঃ - গুড়াপ, জেলা - হুগলি

(ভারত সরকারের হস্ততাঁত বিকাশ কেন্দ্র ও উন্নত রন্ধনশালা প্রকল্পে সহায়তাপ্রাপ্ত)

★ ধনিয়াখালি তাঁত শাড়ি, ধুতি উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

★ নিজস্ব রং কারখানায় সুতার উপর উজ্জ্বল ও পাকা রং করা হয়।

অফিস ও গোডাউন ঃ গুড়াপ, নাগপাড়া

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ গুড়াপ, সিনেমাতলা

পথনির্দেশ ঃ ট্রেনে — হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে গুড়াপ স্টেশনে নেমে। বাসে - চুঁচুড়া-সপ্তগ্রাম ২৩ নং ও কামারপুকুর-গুড়াপ ১১ নং বাসে গুড়াপ বেলতলা স্টপেজে নেমে যাওয়া যায়।

তারকচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক

অশোককুমার গাঁ
সম্পাদক

কৃষি ও কৃষকের সেবায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

(সরকারি সংস্থা)

উন্নত মানের ও জাতের সার্টিফায়েড ধান, পাট, গম, আলু, ডালশস্য, তৈলবীজ, শংকর জাতের বীজভুট্টা (প্রিন এক্সপ্রেস, বেবিকর্ন) টমাটো (বেঙ্গল হাইব্রিড-১) ও শাকসব্জি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান

রাজ্য বীজ নিগমের বীজই বাজারের সেরা বীজ

উত্তম বীজ ☆ অধিক ফলন ☆ বাড়তি লাভ

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের জেলা দপ্তর ঃ

কোচবিহার ঃ রাজমাতা স্ট্রিট, সুভাষ পল্লী। উত্তর দিনাজপুর ঃ উকিলপাড়া, বায়রাজ। মালদা ঃ অভিরামপুর, রতনপুর। মুর্শিদাবাদ ঃ পঞ্চানন্দতলা, বহরমপুর। নদীয়া ঃ কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন। বর্ধমান ঃ শ্রীপল্লী, কালাইলাট, সদর বাহারমপুর। বাঁকুড়া ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা। মেদিনীপুর ঃ কড়িডাঙ্গা আবাস। উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ২১ কে এন সি রোড, বারাসাত। পুরুলিয়া ঃ অনিলাভবন কে পি লেন, দুলমি নডিহা। হুগলি ঃ বিবেকানন্দ রোড, পিপুলপাতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ নিউ টাউন, ডায়মণ্ডহারবার।

সদর দপ্তর ঃ ৪, গঙ্গাধরবাবু লেন (ষষ্ঠতল), কলিকাতা - ৭০০ ০১২

ফোন ঃ ২২৫-৯০১১, ২৭-৪৩৬৯ , ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৭৫৫৯১

ছোট গল্প

সমুদ্রযাত্রী

শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলাই আকাশটা কেমন যেন ভাঙছে। গোয়ালঘরে ঘুলো দিলে যেমন হয়। কুয়াশা-কুয়াশা, ঘোলাটে-ঘোলাটে ভাব। সূর্যদেব যে উঠেছে বোঝাই যাচ্ছে না। তবে কি মেঘ নামবে, ঝড়-বৃষ্টি হবে? আকাশ যেরকম মুখ ভার করে বসে আছে, বলা যায় না। মানুষটা আবার সাত-সকালেই শহরের হাসপাতালে গেছে। ওর কী যে ব্যামো হয়েছে, মোটেই সারছে না। দিন-কে-দিন শুকিয়ে একেবারে ন্যাড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে। এত যে খাচ্ছে-দাচ্ছে, তা মোটেই গায়ে লাগছে না। সারাটা দিন ধরে কিমোয়, কাশে, হাঁপায়। শরীরটাও দুর্বল। সুধীর ডাক্তার এতদিন চিকিৎসা করেও কিছুই হল না। তাই শাজাহানকে সাথে করে শহরে গেছে। ফিরে আসতে আসতে সে-ই সন্ধ্যা। টিকিট কাটানো, ডাক্তার দেখানো, ওষুধ নেওয়া — এসব কি কম ঝক্কি? লাইন, লাইন লম্বা লাইন। শরীর খারাপ বলে যে তাড়াতাড়ি হবে — তা তো হবার নয়। পৃথিবীতে যে কতরকম লোক আছে, কত রকমের যে রোগ, হাসপাতালে না গেলে তা বোঝাই যায় না।

মেয়ের পরাণ হবার সময় গিয়েই বুঝেছে এই জায়গাটা — যে, হাসপাতাল তো নয়, যেন নরককুণ্ড। ঘুপা, ঘুপা। কুকুর-বিড়াল পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। ওখানে গেলে অসুখ সারবে কি, বরং বাড়বে। আর মানুষ মরবে। যে একবার ভর্তি হবে সে আর ফিরে আসবে না।

বাসনী নদীর ঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে নানা কথাই ভাবছিল রাধা। কে যে এই নাম রেখেছিল, তাকে এখন পেলে দেখাতো মজা। রাধার কি এত দুঃখ ছিল? রাতদিন সংসারের ঘানি ঘোরাও। একটুও বিশ্রাম নেই। বিছানা থেকে উঠেই কাজ আর কাজ। কাজের যেন আর শেষ নেই। একটার পর একটা লেগেই আছে লাইন দিয়ে — উনোন ধাঁট দাও, গোবর-জল ছিটোও, ঘরের চারপাশ লেপো। বাসি কাপড় ছাড়ো, বাচ্চাদের চেক, সকালের খাবার তৈরি করো — এইসব করতে করতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। কোনমতে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজে একমুঠো খেলা: তারমধ্যে ছোটটা কাঁদে, বড়টা চেঁচায়। এই কাণ্ড, সেই কাণ্ড এই করে, সেই করো। — নাঃ আর ভাল লাগে না। এই সংসার থেকে মুক্তি পেলে বাঁচি। কিন্তু মুক্তি কি অত সহজেই মেলে? ছোটটার কথা ভেবে কোথাও তাব যাওয়া হয় না। কি করেই বা যাবে? সংসারের টান বড় টান। মায়া — এ-সবই মায়া। মায়াতেই সব শেষ করে দিল। শরীর থেকে এই মায়া ত্যাগ করতে না পারলে তার আর মুক্তি নেই। মানুষটার নাম আবার হরিগোপাল। যে-ই হরি, সে-ই কৃষ্ণ। রাধার সঙ্গে শুধু এই নামেই মিল। পোড়ামুখে প্রেম নেই। সারাটা দিন শুধু কাঁসি বাজছে — এটা হয়নি কেন? ওটা হয়নি কেন? এটা কি করলে? বাপের বাড়িতে কোন কাজই দেখেনি, করওনি। এইভাবে কেউ সজনে ডাঁটার ওজো বানাবে? ছিঃ ছিঃ, এই পাঁচন খাওয়া যায় না কি?

— "বেশ তো, তা ফেলে দিতে গেলে কেন? আর ভাল না লাগলে খাবে না। খিট খিট করবে না। আমি যা পেরেছি, তাই করেছি।"

— "কি বললি বজ্জাত মাগি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? কালনাগিনী ফোঁস করে ওঠে। যেন একদিন বিষদাঁত ভেঙে।

— "ভাঙলেই হল!" রাধা ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্র পাল্টে যায়। হরিগোপাল ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে যায় যেন। রাধা তখন হেসে ফেলে। লোকটাকে কি বলবে? কঞ্চির মতো চেহারা। ওকে দেখলে মায়া হয় রাধার। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। বিয়ের সময় যা ছিল, রোগে-রোগে এখন আরও খারাপ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আগে যারা দেখেছি, তারা এখন দেখলে আর তাকে চিনতেই পারবে না। মানুষটাকে এখন কালরোগে ধরেছে। এ ব্যামো সারবার নয়।

মাতব্বর শাজাহান কিন্তু অন্য কথা বলে। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে আবার রোগ সারে না, এ হয় না কি? সুধীর ডাক্তার আসলে রোগই ধরতে পারেনি। কি ওষুধ দেবে? তাছাড়া হোমিওপ্যাথিতে হবে না। অ্যালোপ্যাথ দেখাতে হবে। হাসপাতালে যাবে না। খুব ভয়। হাসপাতালে দেখালে যদি ভর্তি করে নেয়। আর যদি কোনদিন বাড়িতে না ফেরে। ওঃ, মৃত্যুকে কি ভয়! মৃত্যু তো একদিন আসবেই। কারো একদিন আগে, কারো বা একদিন পরে। মানুষ তো এই সংসারে চিরকাল বাঁচতে আসেনি। শাজাহান আবার এই বাড়ির মিস্ত্রি। যা কাজ-কারবার দুজনে মিলেই করে। যেন মনে হবে একই মায়ের গর্ভে দুজনে জন্মেছে। ওদের দুজনের এত মিল, সহজে কোথাও অন্য কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। দুজনকে দেখতেও প্রায় একই রকম। পটলচেরা চোখ, টিকালো নাক, অলুক্ষেতের মতো চওড়া কপাল। বেঁটে-খাটো। চেহারায় যে এত মিল হতে পারে, সহজে ভাবা যায় না। অনেকেই বলে যমজ ভাই। কিন্তু নাম বললে আঁতকে ওঠে। আরেকটা অমিল আছে। লিকলিকে ন্যাড়াকাঠির মতো হলে কি হবে, শরীরে কোন রোগ নেই মাতব্বর শাজাহানের।। হরিগোপাল লেখাপড়া জানে। হাইস্কুল পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেয়নি। সেই সময় বাড়িতে কি একটা যেন অঘটন ঘটেছিল। সেকথা রাধাকে বলেওছিল একবার, কিন্তু সেকথা এখন আর রাধার মনে নেই। মাতব্বর না থাকলে ওকে আর শহরে নিয়ে যেতে পারত না। যা অলস। দিনে-রাতে বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি খায়। একটা বিড়ি ধরালেই আবার একটা। কিন্তু বললেই ভাঙা কাঁসির মতো খেঁকিয়ে ওঠে। যেন —

— "তোর বাপের কি? আমি কিভাবে টানুম, কিভাবে বিড়ি ধরামু তাতে তোর কি? তুই কি বিড়ি খাস? বিড়ি নিয়ে মেয়েছেলে কথা বলবে কেন? দুনিয়া উল্টে গেল নাকি?"

— "মুখ সামলে কথা বলো। মেয়েছেলে হয়েছি বলে মুখে যা আসে তা-ই বলবে নাকি? তুমি কি পেরেছটা কি? মাতব্বর কি বলে জানো? আজকাল মেয়েছেলে আর বেটাছেলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সবারই সমান অধিকার।"

— "জানি, আইন দেখাবে না। আমার কাছে এসব আইন দেখিয়ে কথা বলবে না।"

— "কি করবে শুনি। মারবে নাকি আমাকে? গায়ে হাত তুলে দেখো একবার। দেখাবে মজা।" বলেই রাধা উঠে দাঁড়াল।

হরিগোপাল চুপ হয়ে গেল। রাধা জানে একবার ধমক দিয়ে উঠলেই, চোখ রাঙালেই মানুষটা একেবারে জিজেবিড়াল। মাথা নীচু করে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে নেবে! তখন রাধা মনে মনে হাসে। এই লোকটা মাতব্বর দেখে কিছু শিখে না। মানুষ তো পাল্টায়। এই মানুষটা একইরকম রয়ে গেল। পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটে গেল, এত কাণ্ডকারখানা, এরা

কালীপুজোয় মণ্ডপ কি হয়েছিল। কত লোক এসেছিল এক মাস ধরে। সেসব খবর জানে না। মাতব্বরের সঙ্গে মেলায় গিয়ে ঝুড়ো ছেলেছিল। তারপর বিড়ি, গাঁজা টেনে বাসায় ফিরেছিল। কি লোকরে বাবা! একে নিয়ে যে কী করবে, সন্ধেবেলার দিকে মন নেই। জমিজমা সব ঐ মাতব্বরই চাষ দেয়। সঙ্গে থাকে দুই-একদিন। আবার কোনদিন থাকেও না। একেবারে ঘরকুনো স্বভাব। উঠোনেতে বসে একটার পর একটা বিড়ি ধরাবে। তার মাঝে মাঝে শব্দ করে বিকট চিৎকার করে উঠবে — 'আল্লা'। 'ভগবান' বলবে না। এই 'আল্লা' বলা নিয়ে কতদিন রাধা বলেছে। তেগেলেগে চিৎকার করে বলে

— "আমি যা বলি, তাতে তোর কি? তোর মুখের কথা বলবো? মালি, আমি যা ভাল বুঝেছি বলেছি। খবরদার, মুখের ওপর কথা বলবি না।"

রাধার বলে — "এ আবার কোন নিশি কথায় ছিরি? মাতব্বরের সঙ্গে থেকেও বুলি পাল্টায়নি। আসুক আজ মাতব্বর। তাকে না বলেছি তো, আমার নাম রাধা-ই নয়।"

— "মাতব্বর দেখাবি না আমায় বলছি। তোদের জাতে সে মাতব্বর হতে পারে, আমার নয়। আমি ওকে ভোট দিইনি। তোরাই দিয়েছিস।"

— "বেইমান, তুমি দেবে কেন? তুমি ওধু নেবে। দেবে না কিছুই।"

— "কি নিইছে, হারামজাদি? কি নিই? আমি ওরটা খাই? আমারটা ও খায়।"

— "খবরদার, ও কথা বলো না" রাধা চারপাশে তাকাল। মাতব্বর আসছে না। মাতব্বরের আসা-যাওয়ার সময় নেই। আসলে বাজারে যেতে এই পথেই যায়। আসা-যাওয়ার পথে কাজে-অকাজে একবার হাঁক দেয়। কোনদিন ইচ্ছে হল তো এক গ্লাস জল খেল। একটা বিড়িতে টান দিল। নয়তো, চলে গেল। কাজের কথা থাকলে বসলালিয়তো এবার-ওবার কথা বলে কাজে ছুঁলে।

এই মাতব্বর অজল-প্রধান। এদের সঙ্গে জানাশোনা আছে বলে অন্যরা কিছু বলতে সাহস পায় না। বরং সমীহ করে চলে। দু-চারজন অবশ্য সন্দেহের কথা বলে। কিন্তু রাধা জানে লোকটা ভাল। সাচ্চা-মানুষ। বাইরে-ভিতরে একইরকম মানসিকতা। মনে কোন ঘোরপাঁচ নেই। কুদৃষ্টি থাকলে মেয়েরা বুঝতে পারে। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে। একবারের জন্যও মনে হয়নি যে লোকটার কোন কুমতলব আছে। সোনার মানুষ। একপক্ষে ভাল যে হরিমোপাল সন্দেহ করে না। অবশ্য ওর কি অতসব বোধ আছে? ওসব ব্যাপার কেন কত বোঝে! নিজের পাওনাটুকু পেলেই হল। ওসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। আসলে মুখ ভাল না হলেও, মনটা সরল। এইজন্য রাধা মানুষটার ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। মায়া হয়। কাছে টেনে নেয়। এসব ব্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। নিজের কাছ হয়ে গেলে, মানুষটার আবার যে-কে সেই রূপমূর্তি। এসব দেখে লোকে বলে — ওরা সালার করে কিভাবে? কেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মজাটা এখানেই। এ একধরনের মানুষ। রাধা নিজের মনেই হাসে।

— "কি লো হাসছিস যে?"

রাধা মুখ ঘুরিয়ে দেখে বামুনদিদি। বামুনদিদি বলে — "কার কথা মনে করে হাসছিস?"

— "আবার কার কথা।"

— "হাসপাতাল থেকে ফিরেছে?"

— "না।"

— "আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বোশেখ মাস, ঝড় উঠবে। দেখছিস, আকাশটা মুখ গোমরা করে রয়েছে। তোর কি কোন ভয়-ডর নেই? একা একা এই ঘাটে কতক্ষণ বসে আছিস?"

— "এই তো হয়ে গেছে। যাচ্ছি।" রাধা বাসন-কোসন সব গুছিয়ে নিয়ে উঠল। আকাশের দিকে একবার তাকাল। সত্যি আকাশটা থমথম করছে। ওমোট গরম ভাব, তার মানে ঝড় উঠবে।

রাধা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতেই দেখল হওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে। কেল কোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। চারপাশে শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সুপারি গাছগুলো দোল খাচ্ছে। উঠোনে কাপড়-চোপড় তুলে নিতে নিতেই মুষলধার শব্দ। টিনের চাল ভেঙে যাচ্ছে। কেল বড় বড় আকারের শিল পড়ছে। সেইসঙ্গে কী চড়বড়-চড়বড় শব্দ। চারপাশে চিৎকার-চেঁচামেচি। রাধা ছেলেমেয়েদের নিয়ে চৌকির নীচে ঢুকে গেল। আকাশটা ভেঙে পড়ছে। এলোমেলো বাতাস। সঙ্গে বৃ-এক ফোঁটা বৃষ্টি। উঠোনে সাদা ধবধবে শিলের পাহাড় হয়ে গেল। চৌকির নীচ থেকেই দেখছে রাধা। ঘর-সমান শিলের পাহাড়। এখন একটু কমেছে। রাধা চৌকির নীচ থেকে বেরিয়ে এলো। চারপাশে কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখার উপায় নেই।

রাধা শীতে কাঁপছে। আকাশ যেন আরো কালো হয়ে ভেঙে পড়ছে। পাশের বাড়ি থেকে কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদছে কেন? কি হল আবার? ঘরের কোণ থেকে রাধা একটা কোদাল নিয়ে এল শিলের পাহাড় সরাবার জন্য। যদিও তা রাধার একার পক্ষে সম্ভব নয়। চিৎকার-কান্নাকাটি যেন বেড়েই চলেছে। শিল অবশ্য এখন আর পড়ছে না। প্রত্যেক বাড়িতেই লোকের জটলা। এদিক-ওদিক-চারিদিকেই লোক ছোটাছুটি করছে।

কী চিৎকার করছে। 'রাধা' বলে ডাকছে। রাধা মুখ বাড়িয়ে দেখল বামুনদিদি এই দিকেই ছুটে আসছে।

— "রাধা সব্বোনাশ হইসে।"

— "বামুনদিদি, বল না কি হইসে।"

— "পাড়ার কোন ঘর ভাল নেই। শিল পইড়্যা, ভাইঙা চুরমার হইয়া গেসে। কত লোক হাসপাতালে গেসে। কিরণপাড়ার ভেড়া জানি মরা গেসে। মাথা ফাইট্যা চৌচির। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই আকাশ থিক্যা পড়ত্যাসে।"

— "ওর বাবার তো অহনও শহরের থিক্যা ফিরে নাই।"

— "বড় রাস্তার বলে জোড়া লাগে।"

— "কি কও বামুনদিদি, কই?"

— "হু, হাস্তা কথা, কত লোক দেখতে গেসে।"

— "আমার পরাণডাতো ভাল লাগে না। মাতব্বর জোর কইর‍্যা নিয়া গেল তবে। যাইতে তো চাইছিল না।"

বামুনদিদির সঙ্গে রাস্তায় বেরোল রাধা। রাস্তার ওপরে কি পা রাখা যায়? একে ঠাণ্ডা, আবার তার পিচ্ছিল। চারপাশে জটলা। কারো মাথা ফেটেছে। কারো পায়ে লেগেছে। হাত ভেঙেছে। কোন বাড়িই ঘর ঠিক অবস্থায় নেই। সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। বামুনদিদির সঙ্গে রাধা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সেই সময় পুবপাড়ার দিক থেকে মাতব্বরের বউ ছুটে আসছে। — "হায় আল্লা, কি হইল। আমার কি হইল।"

রাধাকে দেখে জয়নাবিবি থমকে দাঁড়াল। বলল — "দিদি, ওনছিস লো শহর থিক্যা আসবার সময় শিল পইড়্যা সব শেষ। দিদি লো, আমি অহন কি করুম।"

জহরাবিবির সঙ্গে সঙ্গে রাধাও গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল। — "আমার কি হইল গো। কেন গেল শহরে। হাসপাতালে যাইতে চাইছিল না। দিদি গো, কি করুম।"

— "চলো দিদি।"

জহরাবিবির সঙ্গে আরও দুজন মহিলা রয়েছে। রাধাও বামুনদিদির সঙ্গে। আরও অনেকেই ওদের সঙ্গে হাঁটছে। রাধা তো চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে জোর করে বলছে — "আমার কি হল গো। কেন গেল লোকটা।"

জহরাবিবিও কম যায় না। সেও চিৎকার করে বলছে — "আমার কি হইল গো।"

দলে দলে লোক ছুটছে। রাধার আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। জহরাবিবিরও তাই। গ্রামের কাছে আসতেই জটলা। চারপাশে লোক। পুলিশ কাউকেই লাশ ঘাটের কাছে যেতে দিচ্ছে না। থানার বড়বাবু এলে শহরে নিয়ে যাবে। লাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা। ঠেলেঠুলে সামনে গিয়ে রাধা চিৎকার করে বলছে — "আমাকে যেতে দাও।" পুলিশ যেতে দিচ্ছে না। জহরাবিবিও দেখবার জন্য পাগল। নিজের পুরুষমানুষটিকে দেখবার জন্য পাগল। পুলিশ কাউকেই কাছে যেতে দিচ্ছে না। কড়া হুকুম। বামুনদিদি রাধাকে ধরে রাখতে পারছে না। চুল সব এলোমেলো। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। জহরাবিবিরও সেই একই অবস্থা। দুজনেই কাঁদছে।

ওদের কান্না শুনে কেউ এগিয়ে আসছে না। কাছেও যেতে দিচ্ছে না। রাস্তা ফাঁকা করে পুলিশের ভ্যান এল। তারপর লোকজন সরিয়ে দিয়ে পুলিশ লাশ ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল শহরের দিকে। রাধা আর জহরাবিবি দুজনেই রাস্তায় শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউই ওদের দুজনকে থামাতে পারছে না। ওদের কান্না শুনে পুবপাড়া থেকে আরও লোকজন ছুটে এল। পশ্চিমপাড়া থেকেও লোকজন এল। কিন্তু কেউ ওদেরকে থামাতে পারছে না। ওদিকে বেলা রাত হয়ে গেছে। বহু লোকই যে যার নিজের নিজের কাজে চলে গেছে। এদিকে রাধা আর জহরাবিবি দুজনেই চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। তাদের পাশে বামুনদিদি ছলছল চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গ্রামের লোকেরা একরকম জোর করেই ওদেরকে বাড়িতে নিয়ে এল। নিয়ে আসা তো নয়, যেন একটা যুদ্ধ জয় করা। ওদের কান্নায় গ্রামের সকলেই কাঁদছে। এইভাবেই ক্রমশ রাত শেষ হল। জহরাবিবিও তার নিজের বাড়ি যায়নি। রাধাদের ঘরেই রয়েছে। দিল সবই গলে জল হয়ে গেছে। আকাশ এখন ঝকঝকে পরিষ্কার। সূর্য খুব তেজ ছড়িয়ে আকাশে উঠেছে। অন্যান্য গ্রামের লোক বাড়ির বাইরে এসে ওদের দুজনকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ওদের দুজনের কান্নারই কোন ছাঁদ নেই। যেমন ঘরে পড়ে আছে। গোঙাচ্ছে আর বিলাপ করছে। বলছে — "ওগো, কই গেলা গো! আমারে নিয়া যাও।" ওদের বিলাপ শুনে সব কাজ ফেলে দিয়ে হরিগোপালের উঠোনে সব লোকই ভিড় জমিয়েছে।

বামুনদিদি বলল — "আর কাঁদিস না বোন। ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েও অন্তত এবার ক্ষ্যামা দে রে তোরা। তুই যদি অমন করিস, তাহলে ওরা যাবে কোথায়? গতকাল থেকেই ওদের পেটে কিছুই পড়েনি। চুপ কর, একটু ধৈর্য ধর।"

রাধা কিন্তু সেকথা শুনতেই চায় না। বামুনদিদিকে ধরে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। জটলার মধ্যে থেকে কে একজন যেন বলল —

— "ঐ তো মাতব্বর আর হরিগোপাল দুজনেই ফিরছে।"

বামুনদিদি যেন তা দেখে ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল। বলল — "সত্যি, নাকি মিছা কথা।"

লোকটা বলল — "শিলপাড়ার জন্য গতকাল রাতে ওরা ফিরতে পারেনি।" কথাটা শুনে বামুনদিদি ছুটছে। জহরাবিবি রাধাকে ধরে বলল — "চল বোন, ওঠ। ও তো ওরা দুজনেই আসছে।"

রাধার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। জহরাবিবির চোখেও যেন বন্যার পানি। দুজনেই দুজনকে ধরে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। চোখের জলে নিজের মানুষটাকে ঝাপসা দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে জল সরে গিয়ে ক্রমশ মানুষটা চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তবুও রাধার চোখে জল। রাধা জহরাবিবির বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

জহরাবিবির চোখেও জল। দুজনের চোখের জলে সমুদ্র হয়ে গেল নদী। □

শেষ সন্ধ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে।

সেবার সিপাহী যুদ্ধের বছর। বারুদের গন্ধে ম ম করছে ভারতবর্ষ। সেকালের ভারতবর্ষে না ছিল রেলগাড়ি, না মোটরগাড়ি। দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন নৌকা করে। জলপথে। আগ্রা কোর্টের তলা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক অপরূপ দৃশ্য তিনি দেখলেন। দেখলেন — শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা-কে। কেল্লার বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। সানন্দে সপারিষদ। চোখে মুখে সাম্রাজ্য হারের খুশি। তৈমুর-বাবরের বংশধর সেদিন ঘুড়ি খেলাতেই তৃপ্ত। ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি অতীতের স্মৃতিমাত্র।

কয়েক মাস পরে ডালহৌসি পাহাড় থেকে যখন নেমে আসছেন, তখন আর এক ছবি দেখলেন দেবেন্দ্রনাথ। কানপুরের কাছ দিয়ে চলেছেন তিনি। মিউটিনির পর্ব সমাপ্ত। আগে-পিছে সশস্ত্র পাহারা। বাহাদুর শা-কে ধরে নিয়ে চলেছে ইংরেজেরা। শেষ মুঘল যুগের অবসান ঘোষণা করে। ঘুড়ি ওড়ানোর পালা শেষ করে পা-পা করে চলেছেন কারাগারে। নির্বাসনে।

মুঘল-মহিমা এইভাবেই একদিন অস্ত গেল। ঐ অস্ত সন্ধ্যার দুর্লভ লগ্নটির সাক্ষী হয়ে রইলেন কলকাতার এক বাবু। ইতিহাসে এ আরেক আশ্চর্য ঘটনা। বড়োই বিস্ময়ে ভরা! — দেবেন্দ্রনাথকে এ-দৃশ্যও দেখতে হয়েছিল।

● কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বাবু যৌবনের কলকাতা' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

WATER WING CIVIL DEFENCE EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Regd. No. : 11/Cal-1992

81/2/2/. PHEARS LANE
CALCUTTA-700 012
PHONE : 27 8033 (EXTN. 37)

সমবায় একমাত্র মুক্তির পথ। সমবায় মানুষের
অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির একটি অংশ

বর্ধমান হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

মনিমার্ট, জি টি রোড, বর্ধমান
দূরভাষ : ৬২৩৭০

কৃষ্ণগোপাল বসু
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

দীপক পাল
চেয়ারম্যান

কাটোয়া ব্লক-১ তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৪ কে টি তাং-২৩-২-৭৯
গ্রাম+পোঃ - পানুহাট, ভায়া-কাটোয়া, জেলা-বর্ধমান
দূরভাষ : ৫৫-৩৩৫/৫৫-২৯১

সমিতির নিজস্ব কারখানায় শিল্পী দ্বারা উৎপাদিত শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, ছাপা শাড়ি, উলের তৈয়ারি যাবতীয় বস্ত্র, পলিয়েস্টার সার্টিং, টাওয়েল, জামদানি শাড়ি, তসরের কাথা স্টিচ শাড়ি, কটন সার্টিং, গৃহস্থালী ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র তৈয়ারি হয় এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে অর্ডারকৃত বস্ত্র সামগ্রী সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়।

★ দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আমাদের ব্যাঙ্ক ★

রঞ্জন দেবনাথ
সম্পাদক

তাঁত-বস্ত্র উৎপাদন ও বিপণনের
ঐতিহ্যবাহী সমবায় প্রতিষ্ঠান

কাটোয়া শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং ২২৪৬, তাং : ১৬.১০.১৯৫৬

প্রধান কার্যালয় ও উৎপাদন কেন্দ্র
ঘোষহাট, পোঃ কাটোয়া, জেলা : - বর্ধমান

বিক্রয় কেন্দ্র :
★ শিল্প সমবায় - কাটোয়া বড়বাজার উপকণ্ঠে
★ শিল্প সমবায় - কাটোয়া সর্বোদয় ভবনে
★ শিল্প সমবায় - ৮ নং জি টি রোড,
পূর্বস্থলী, কুসুম মার্কেট, বর্ধমান

পাইকারি বিক্রয় :
ঘোষহাট, কাটোয়া, বর্ধমান

শারদীয়া পূজায় ও দেওয়ালীতে বিশেষ আকর্ষণ

২০% বিশেষ ছাড়

শারদীয়া শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :-

আরাম্ভী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাঃ-পোঃ - আরাম্ভী, জেলা - হুগলি

(আই সি ডি পি সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

এলাকার চাষিদের সুলভ মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া স্বল্প সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়া হয় ও ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা আছে।

কার্তিক ভুঁইয়া	শক্তি মণ্ডল	তারাপদ বাগ
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শারদীয়া

অভিনন্দন

সহ

পূর্বশিবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম - পূর্বশিবপুর, পোঃ মধুরপুর

জেলা - হুগলি

মানিকমোহন মাল	রাধাগোবিন্দ রায়	সুকুমার রায়
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শুভ বিজয়ার

অভিনন্দন

গ্রহণ করুন

পূর্ব হরিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং - ৬৪, তাং - ১৭-৫-৬২

গ্রাম - পূর্ব হরিপুর, পোঃ - বাছ্যনড়ী,

ব্লক-আরামবাগ, জেলা - হুগলি

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	ওমর রায়	হারাধন মালিক
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

শুভ বিজয়ার

অভিনন্দন

গ্রহণ করুন

মলয়পুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম-পোঃ - মলয়পুর, ব্লক - আরামবাগ

জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৬০ এইচ জি তাং - ০২/০৫/৬১

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, বন্ধকি দ্রব্য। আমানত বিভাগ, কৃষি সার ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পাওয়ায় ট্রিলার ইত্যাদি স্বল্প সঞ্জয়ে উৎসাহী করার প্রয়োজনে নিয়োজিত।

চণ্ডীচরণ দলুই	আনোয়ার আলী মিঞা	সুকুমার চ্যাটার্জি
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

With Best Compliments From :

লোহাচুর বড়গাছী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম : বড়গাছী, পোঃ - মোয়াইল, বর্ধমান

সমিতি কৃষি কাজের ব্যাবহারের জন্য সার, বীজ, অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করে। সেচের ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আছে।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

জগন্নাথ মণ্ডল

ম্যানেজার

বড়েয়া নতুনপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি

আমাদের নিজস্ব তাঁতে উৎপাদিত কাপড়

১০০×১০০

জামদানি ও শাড়ি যত্ন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

দুলাল দেবনাথ

সম্পাদক

শারদীয় ভাণ্ডার পত্রিকার গ্রাহকগণকে

জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

কেতুগ্রাম থানা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম+পোঃ - নিরোল, বর্ধমান

সমিতির নিজস্ব উৎপাদিত বস্ত্র

১০০×১০০ শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ও সার্টিং।

জয়তু সমবায়

সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

ধনঞ্জয় ওঝা

ম্যানেজার

With Best compliments From

আমাদের সমিতিতে কাপড়, গামছা ও জামদানি শাড়ি উৎপাদন হয়।

জয়তু সমবায়

ঘোষহাট তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম - ঘোষহাট, পোঃ - কাটোয়া, জেলা - বর্ধমান

সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

হিরানন্দ দেবনাথ

সম্পাদক

WITH BEST
COMPLIMENTS FROM

বাগনাগরা বাগটোনা এস কে ইউ এস লিঃ

আমাদের কৃষি ঋণ দাদন করে।
কনজিউমার্সের ব্যবসা করে।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

জয়তু সমবায়

সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

বরু সাহা
ম্যানেজার

বিনয় সাহা
সম্পাদক

সমিতির নিজস্ব সভ্য ও শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত
তাঁত বস্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রভাপ্রভূপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

আমাদের সমিতির নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র
কাটোয়া সার্কাস ময়দান
দুর্গাপুর, বেনাচিতি

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

জয়তু সমবায়

সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

বিনোদবিহারী দেবনাথ
সম্পাদক

তামাঘাটা টাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

পোঃ মাজিদা, জেলা - বর্ধমান

শারদীয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে,
তাঁতের গ্রাহকগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের সমিতির উৎপাদিত (নিজস্ব) শিল্পীদের
১০০×১০০ জামদানি শাড়ি উৎপাদন করা হয়।
১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত।
সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে
বাদলচন্দ্র কুণ্ডু
সম্পাদক

With
Best
Compliments
from

Paharhati 'O' Uttar Memari Co-operative Agricultural Marketing Society Limited

Business of : Fertiliser & Seeds Cloth, Agricultural Implements, Pesticides & Insecticides, Potato cold Storage Capacity Unit - I 4000 Mt, Unit - II 8000 Mt

নদীয়া কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সহজ শর্তে এবং অপেক্ষাকৃত কম সরল সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে।

"ভূমিশ্রী"

দূরভাষ : ৫২২৪৭ ও ৫২১৪৭
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শাখা অফিস : মেইন ব্রাঞ্চ (কৃষ্ণনগর), তেহট্ট, করিমপুর, রানাঘাট, বেথুয়াডহরি।

দূরভাষ : ৫৪০৪৬, ৫০২৩১, ৫৫৯৭৮, ৫৫০০৭, ৫২৩৫২।

উপরোক্ত শাখাগুলিতে বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

শারদীয়া শুভেচ্ছা সহ

রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং : ১৮ এইচ ডি * তারিখ - ১৪-২-২২
রাধানগর, পো: - গোবীনগর, হুগলি

নিত্যানন্দ হাইত	বাদলচন্দ্র ঘোষ	বিকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

দীর্ঘ ৪৫ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে খানো ও বড় সেনার চাষিভাইদের উন্নতিতে নিয়োজিত।

খানো কুণ্ডপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পো: - খানো, জেলা - বর্ধমান

এলাকার কৃষক ও চাষী ও কৃষিজীবী মানুষের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উন্নতমানের বীজ, নলকূপ ও অগভীর নলকূপের পাইপ ও সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

* সমিতির হিমঘরে যত্ন সহকারে আলু সংরক্ষণ করা হয়

স্নেহপরম সাহা
সভাপতি

প্রবন্ধ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও রিও-র উইল

ভোলানাথ ভক্ত

১৯৯২ সালের জুন মাসে রিও-ডি-জেনিরোতে "বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক" অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপরে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "পরিবেশভিত্তিক সহনশীল বিশ্ব অর্থনীতি" বা "সহনশীল উন্নয়ন"। মূল্যায়নে দেখা যায় যে এই বৈঠকের পরে এই ধরায় ৪৫০ মিলিয়ন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা গ্রীন হাউস সৃষ্টির সহায়ক, তা অতিমাত্রায় বেড়েছে এবং বায়ুমণ্ডলের গঠনকেও বদলে দিয়েছে। উপরন্তু পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে ভাবনাদের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ, চিন প্রভৃতি দেশে জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব হয়ে দাঁড়াবে। জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ উপাদানগুলি ক্ষিপ্রতার সাথে ও পরিবর্তিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। পুরনো জঙ্গলকে কেটে ফেলা হয়েছে, উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। জীব সম্পদে সমৃদ্ধ জলাভূমি ও প্রবাল-প্রাচীরের অবস্থাও তথৈবচ। অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ১-৩ বিলিয়ন মানুষ এখনই ধরিত্র যে তারা আশের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য বা বাসস্থানের সংস্থান করতে পারছেন না।

আশা ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল আশানুরূপ নয়। বহু যুগের সঞ্চিত অব্যবস্থা মাত্র ছয় বছরের মধ্যে শোধরানো যাবে তা ভাবা উচিত নয়। খুব কম সংখ্যক সরকার সহনশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে অগ্রণী হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করেছেন। ছয়-সাতটি দেশ উপকরণ ও শক্তি ব্যবহারে অসহনীয় পথে যাওয়ার বাধা সৃষ্টিতে কর আরোপের ব্যবস্থা চালু করেছেন। বহুদেশ জনাধিক্য রোধে, অথবা শক্তি ব্যবহারে, জল ও খনির সদ্ব্যবহারে অনেক দেশই উদ্যোগী হয়েছেন। রিও বৈঠকের একটা ভাল দিক হল পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় সরকারি ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি নজর দিচ্ছে। সেই বৈঠকে অনেক রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থমন্ত্রী, পরিবেশমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে যেহেতু সর্বকালীন সময়ে এত বড় শীর্ষ বৈঠক এর আগে কখনও সংগঠিত হয়নি তাই "মার্শাল প্ল্যানে" পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরিবেশ তহবিলে ন্যূনতম চাঁদা সংক্রান্ত দেশগুলি না দেওয়ায় অর্থকষ্ট থেকে গেছে। এছাড়া ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মধ্য ইউরোপের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাশিয়া ও ইউক্রেন ইত্যাদি দেশের অবস্থানের পরিবর্তন সূচিত হয়।

আর একটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, সেটা হল দারিদ্র্যই হল পরিবেশ অবনয়নের অন্যতম কারণ। এই বৈঠকের পরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের অবনতি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকার তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করতে পারেনি। অনেক দেশের পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যা জাতিসত্ত উদ্বাস্তুর সংকটে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সৃষ্টিতে ও সময় সময় ভয়ঙ্কর সংঘর্ষে লিপ্ত করছে। এতসব সত্ত্বেও বেশির ভাগ সরকার চিরাচরিত পথে অসহনীয় উন্নয়নে অগ্রণী কেননা দীর্ঘমেয়াদি সহনশীল পথে অনেক নিয়ন্ত্রকানুন মেনে চলতে হয়।

সহনীয় উন্নয়ন প্রাপ্তিতে বসুন্ধরা বৈঠকের অ্যাজেণ্ডা-২১তে ৪০টি চ্যাপ্টার প্ল্যানের উল্লেখ আছে। জীবিকার ভগ্ন ব্যতিরেকে প্রকৃতিজ সম্পদ রক্ষণ ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলাভূমি ও মরুভূমি রক্ষার্থে, বায়ু ও জল দূষণ রোধে, শক্তি ও কৃষি প্রযুক্তির উন্নতিকল্পে, রাসায়নিক বিষ ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় এবং রোগ ও অপুষ্টি কমানোর ব্যবস্থাদি অ্যাজেণ্ডা-২১তে অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ক্ষমতা সীমিত। বৈঠকের সিদ্ধান্তানুসারে ইউনাইটেড নেশনস্ কমিশন অন সাসটেনেবল্ ডেভেলপমেন্ট সংস্থা গঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে ১১৭টি সরকার এই উদ্দেশ্যে জাতীয় কমিশন গঠন করেছে যাতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধসমূহ রূপায়ণ করা যায়। বহু স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা এই কাজে সরকারি সংগঠনের সঙ্গে সাথে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। জীব প্রযুক্তির নিরাপত্তার নির্দেশাবলী রচনায়, জাতীয় জলসীমানার মধ্যে মাছের রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উপরন্তু একটি নতুন মরুভূমি সংক্রান্ত কনভেনশনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তাতে স্বাক্ষর করেছেন। উন্নয়নশীল দেশে বিপদসঙ্কুল বর্জ্য পদার্থ রপ্তানিতে বাধা আরোপিত হয়েছে এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে ভূমিজনিত দূষণের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশ্ব অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণে পরিবেশ পরিচালনা কৌশলসমূহের সমন্বয় সাধনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এখনও অপারগ।

রিও-র অ্যাজেণ্ডায় অধিকতর আর্থিক সুবিধার নিমিত্তে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটির (GEF) জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম এবং ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট ফণ্ড-এর তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তহবিল পরিচালিত হতে থাকে। এই তহবিল থেকে জলবায়ু ও জীব-বৈচিত্র্য কনভেনশনের জন্য খরচ করা হয়েছে। এছাড়া দেশে দেশে জাতীয় উদ্যান স্থাপনে, বিরল প্রজাতি রক্ষণে, সৌরশক্তি ব্যবহারে, শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহারে, জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প নির্ধারণের জন্য এই তহবিল থেকে খরচের সন্ধান রয়েছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে মানুষের পরিবেশের উপর নজর দেওয়া হয়েছিল, ফলে বেশির ভাগ শিল্প উন্নত দেশের বায়ু ও জলের যে দূষণ সেইসময় দেখা গিয়েছিল তা বর্তমানে খুবই কম। ১৯৯২ সালে দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে (১) জলবায়ু পরিবর্তনে কনভেনশন ও (২) জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন। ১৯৯৪ সালে মরুভূমিকরণ অ্যাকশন প্ল্যান।

বর্তমান বিশ্বে আটটি পরিবেশগত হেভিওয়েট দেশ আছে, তাদের 'ই-৮' নামে ডাকা হয়। চারটি শিল্প-উন্নত ও চারটি উন্নয়নশীল দেশ। তথা চিন, রাশিয়া, জার্মান, জাপান, ইউনাইটেড স্টেটস্, ভারত, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়া। এরা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ, অর্থনৈতিক উৎপাদনের শতকরা ৫৯ ভাগ, কার্বন ত্যাগের শতকরা ৫৮ ভাগ এবং বনাঞ্চলের শতকরা ৫৩ ভাগ ধারণ করে। জনসংখ্যায় চিন, অর্থনীতি ও কার্বন ত্যাগে ইউনাইটেড স্টেটস্, জীব-বৈচিত্র্যে ব্রাজিল প্রথম স্থান দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বঅর্থনীতি জি-৭দেশের কব্জায় এসে পড়ে কিন্তু পরিবেশগত বিশ্বে ই-৮ দেশগুলি ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে। পরিসংখ্যানগত ই-৮ দেশগুলির চিত্র হল :

দেশের নাম	১৯৯৬ সালের জনসংখ্যায় অংশ	১৯৯৪ সালে গ্রস ওয়ার্ল্ড প্রোডাক্ট-এ অংশ	বিশ্বে কার্বন ত্যাগে অংশ ১৯৯৫ %	বিশ্ব বনাঞ্চলে অংশ ১৯৯০	বিশ্বে তপ্তপ্রস্তর উত্তোলনের প্রভাতি অংশ ১৯৯০
ইউনাইটেড স্টেটস্	৫	২৬	২০	৬	৮
রাশিয়া	৩	২	৭	২১	৯
জাপান	২	১৭	৫	০.৭	২
জার্মানি	১	৮	৪	০.৫	১
চিন	২১	২	১৩	৪	১২
ভারত	১৭	১	৪	২	৬
ইন্দোনেশিয়া	৪	০.৭	১	৩	৮
ব্রাজিল	৩	২	১	১৬	২২
ই-৮	৫৬	৫৯	৫৮	৫৩	—

ই-৮-এর অনেক দেশই জি-৮-এর সদস্য। জি-৮-এর সদস্যরা মাঝেমাঝেই নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন, কিন্তু পরিবেশের ব্যাপারে ই-৮ দেশগুলি নিয়মিত বৈঠক করলে ভাল হত।

জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বনের নির্গমন, ই-৮ (১৯৯৫)

দেশ	মোট নির্গমন (মিলিয়ন টন)	কার্বন নির্গমনে বিশ্বের মোট অংশ (শতকরা)	নির্গমনে পার ক্যাপিটা (টন)	নির্গমনের বৃদ্ধি শতকরা:
ইউনাইটেড স্টেটস	১৩৯৪	২২.১	৫.৩	৬.২
রাশিয়া	৪৩৭	৭.২	২.৯	
জাপান	৩০২	৫.০	২.৪	
জার্মানি	২৩৪	৩.৮	২.৯	
চিন	৮০৭	১৩.৩	০.৭	
ভারত	২২৯	৩.৮	০.৩	
ইন্দোনেশিয়া	৫৬	০.৯	০.৩	৩৮.৮
ব্রাজিল	৬২	১.০	০.৪	১৯.৮
ই-৮	৩৫২১	৫৭.৯	০.৯	—

বনাঞ্চল কাটার জন্য প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ অঞ্চলে বার্ষিক ১.৬ বিলিয়ন টন অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হচ্ছে। সি এফ সি গ্যাস নির্গমন গ্রীন হাউস গ্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকারী উপাদান, তবে বর্তমানে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমের দিকে যাচ্ছে, যেহেতু ওজন স্তর রক্ষার্থে কিছু ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে। এটা দেখা গেছে যে গ্রীন হাউস গ্যাসে হাইড্রোফ্লুরো-কার্বন ও মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে।

সংরক্ষিত এলাকা এবং বিরল প্রজাতি, ই-৮ দেশসমূহ বিশ্বের দশকে

দেশ	সংরক্ষিত এলাকার জমি ১৯৯৪ (মিলিয়ন হেক্টর)	সংরক্ষিত এলাকার জমির অংশ (শতকরা)	বিরল প্রজাতি উদ্ভিদ (সংখ্যায়)	বিরল প্রজাতি প্রাণী (সংখ্যায়)
ইউনাইটেড স্টেটস্	১০০	১০	১৮৪৫	২৮১
রাশিয়া	৭১	৪	১২৭	৫৯
জাপান	৩	৭	৭০৪	৭৯
জার্মানি	৯	২৬	১৬	১১
চিন	৫৮	৬	৩৪৩	১৫০
ভারত	১৪	৪	১২৫৬	১০৭
ইন্দোনেশিয়া	১৯	১০	২৮১	২৪২
ব্রাজিল	৩২	৪	৪৮৩	১৬৭
ই-৮ মোট	৩৩৬	৭	—	—

ব্রাজিলে আমাজন বেসিনে পৃথিবীর বৃহত্তম একক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। ব্রাজিল জীববৈচিত্র্য রক্ষার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ৩৪ শতাংশের অধিক বনাঞ্চল কাটা হয়েছে। ব্রাজিলের পরে জীববৈচিত্র্যে স্থান ইন্দোনেশিয়ার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম জাতীয় উদ্যান স্থাপন করে।

জনসংখ্যার গতিরোধ কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। বাটের দশকে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১ শতাংশে যেটা ১৯৯৬ সালে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশে। ফার্টিলিটি রেট ভারতের ৪১ শতাংশে, ইন্দোনেশিয়ার ৩৬ শতাংশে, ব্রাজিলের ৫৫ শতাংশে ও চিনের ৪১ শতাংশে বাটের দশক থেকে কমে দাঁড়িয়েছে। বিবাহিত মহিলারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ব্রাজিলে ৬৬ শতাংশে, চিনে ৮০ শতাংশে, জার্মানিতে ৭৫ শতাংশে ও রাশিয়ায় ২২ শতাংশে। ইন্দোনেশিয়া জনসংখ্যা বোধে গ্রামভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ভারতও অনুরূপ কর্মসূচি নিয়েছে। চিনে মহিলারা দুটির বেশি সন্তান প্রসব করতে পারবেন না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানির জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সীমারেখার মধ্যে বিরাজ করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুষম জনসংখ্যার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক তথ্য, ই-৮ দেশসমূহ

দেশ	জনসংখ্যা ১৯৯৬ (মিলিয়ন)	বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৯৯০-৯৫ (শতকরা)	মোট ফার্টিলিটি রেট ১৯৯০-৯৫ (মহিলা প্রতি শিশুর সংখ্যা	জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার রেট ১৯৮৮-৯২ (শতকরা)	মেটারন্যাল মর্টালিটি রেসিও ১৯৮৭-৯১ (১লক্ষ জন্মের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৬৫	১.০	২.১	৭৪	২২
রাশিয়া	১৪৮	-০.১	১.৫	২২	৭৫
জাপান	১২৬	০.৩	১.৫	৬৪	১৮
জার্মানি	৮২	০.৬	১.৩	৭৫	২২
চিন	১২১৮	১.১	২.০	৮৩	৯৫
ভারত	৯৫০	১.৯	৩.৮	৪০	৫৭০
ইন্দোনেশিয়া	২০১	১.৬	২.৯	৫০	৬৫০
ব্রাজিল	১৬১	১.৭	২.৯	৬৬	২২০
ই- ৮ মোট	৩,১৪১	১.৩	—	—	—

বিশ্ব শীর্ষক বসুন্ধরা মহাবৈঠকের পর পরিবেশ সম্পর্কে জনচেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম মাধ্যম এ-বিষয়ে তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে। ৫১টি দেশের ১৫০০ শহরে অ্যাজেন্ডা ২১ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে বসুন্ধরা বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও ২০,০০০ ব্যক্তিবিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে এক হাজার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ভারতে দশ হাজার সংগঠন পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করতে চলেছেন।

গত শতাব্দীতে উন্নত ও উচ্চ প্রযুক্তসম্পন্ন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। ফলে পরিবেশগত নানান সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে যা পূর্বপুরুষের একেবারে অজানা ছিল। এই সমস্ত সমস্যার স্বরূপ জানার চেষ্টা চলেছে বর্তমান শতাব্দীতে। আশা করা যায় পরবর্তী সময়ে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। ❑

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

ধনিয়াখালি থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

(রেজিঃ নং - ৭৯ তাং ঃ ১৯-১২-৬২)

পোঃ - ধনিয়াখালি জেলা ঃ হুগলি

সমস্ত রকম রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধাদি, কৃষি সরঞ্জাম, বস্ত্র, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোল, ডিজেল, মোবিল ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডিলার ঃ

পারাদ্বীপ ফসফেটস্ লিমিটেড

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন

সেখ আব্দুল জলিল	**বিশ্বনাথ লাহা**	**সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়**
সভাপতি	সহ-সভাপতি	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

আমাদপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজিঃ নং ২৩৪৭ তাং ঃ ২৮.২.৫৭

এখানে সমস্ত রকম ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা আছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে .৫% সুদ বেশি দেওয়া হয়। এছাড়া, চাষের ঋণ ছাড়াও বহু রকমের ঋণ দেওয়া হয় এবং রাসায়নিক সার, ঔষধ, বীজ বিক্রয় হয়।

মহাদেবপ্রসাদ চন্দ্র

চেয়ারম্যান

বেগুনী-নীল-আসমানী

হতাশা নয়, শোন জীবনের বাণী,

সবুজ হলুদ কমলা লাল

সমবায়ের আঙ্গীনায় কঠোর মনোবল

হবে বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা

বে নী আ স হ ক লা

স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল

(সেকো)

৮, কালনা রোড, বাদামতলা, বর্ধমান - ৭১৩ ১০১

দূরভাষ ঃ ৬২৩৩৩

আঞ্চলিক কার্যালয়

বাঁকুড়া ★ বহরমপুর ★ কৃষ্ণনগর ★ শিলিগুড়ি

ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

ঝাড়গ্রাম মহকুমার একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক যা শুধু ঝাড়গ্রামের জনগণের সেবায় নিবেদিত।

এই ব্যাঙ্ক কৃষি ও অকৃষির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দাদন করে।

কৃষি	ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট, স্যালো, বলদ ও বলদগাড়ি, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি, ডেয়ারি, ফিসারি, বনসৃজন।
অকৃষি	১৬.২ টন পর্যন্ত ট্রাক, মিনি ট্রাক, বাস, মিনি বাস, ট্রেকার, জিপ, কার, ত্রিচক্র যান (ডিজেল ও পেট্রোল চালিত) শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য।
গৃহ নির্মাণ	HUDCO এবং NHB-র নিয়ম অনুযায়ী গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্প।
ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প	DIC অনুমোদিত সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণ।

বিশদ জানার জন্য ব্যাঙ্কের ঝাড়গ্রামস্থ অফিসে যোগাযোগ করুন।

অবনী মাহান্ত	**মানিকচন্দ্র দাস**	**নিমাইচন্দ্র মাতি**
সভাপতি	সহ-সভাপতি	চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

দি প্রণবানন্দ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বর্ধমান

রেজিঃ হেড অফিস - "শীলা সদন"

৬৩, আর বি ঘোষ রোড

বর্ধমান - ৭১৩ ১০১

(বর্ধমান জেলার কুড়িটি শাখা ও ১টি কালেকশন্ সেন্টারের মাধ্যমে বর্ধমান জেলাবাসীকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়।)

সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করুন
শহরের টাকা শহরে রাখুন

প্রবন্ধ

পান বৃত্তান্ত

[illegible], মুলাদলের সেন

বিখ্যাত গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস, বিন্দু মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় এসেছেন। বিদেশি দূত বলে কথা। অতএব তাঁর আপ্যায়নের যাতে কোনওরকম ত্রুটি না হয় সেইজন্য সম্রাট তাঁর যথাযথ দেখাশোনার জন্যে কয়েকজন সুন্দরী তরুণীকে আপ্যায়নকারীরূপে তাঁর কাছে পাঠান। সুসজ্জিতা রূপসীদের টুকটুকে লাল ঠোঁট দেখে মেগাস্থিনিস বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যান এবং পরে কথা প্রসঙ্গে সম্রাটের কাছে এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি জানান যে পানের সঙ্গে চুন, খয়ের, সুপুরি ইত্যাদি দিয়ে খাওয়ার ফলেই ওদের ঠোঁট ওরকম রক্তিম হয়ে ওঠে। ব্যস, সেই থেকে মেগাস্থিনিসও পানের প্রতি এমন অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে দেশে ফিরে পানের গুণপনা প্রচার করতে লাগলেন। এভাবে আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই বিদেশেও পানের প্রচলন শুরু হয়ে যায়। আমাদের মনে, বঙ্গু সাহেবের পানগাছের সন্ধান না পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে কিন্তু এর উল্লেখ আছে।

শুদ্ধ বাংলায় পানকে তাম্বুল বলা হয়। এর ইংরেজি নাম বিটেল লিফ (betel leaf)। আর পানের বৈজ্ঞানিক নাম হল সত্ত্বশিরা। প্রত্যেক পানেই সাতটি স্তরে প্রধান শিরা বিদ্যমান। এজন্যেই সম্ভবত পানকে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। তাতে বিভিন্ন ধরনের পান পাওয়া যায়। রকমভেদে এদের স্বাদ, গন্ধ ও সাইজের তারতম্য ঘটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত তিন রকম পানের চাষ হয়। যথা বাংলা, সাঁচি ও মিঠে। বাংলা পান আবার অনেক রকমের হতে পারে। যেমন কড়ে বাংলা, ভবানী বাংলা, কালি বাংলা প্রভৃতি। এই পানে বাল বেশি। এবং এর একটা ঝাঁঝ থাকে। সাঁচি পানে একটা সুন্দর গন্ধ থাকে এবং এই পানের ঝাঁঝ বাংলা পান অপেক্ষা কম। সাঁচি পান সাইজেও বাংলা পানের থেকে ছোট হয়। সাঁচি পান খেতে বেশ মোলায়েম লাগে। এই পানের প্রায় সবটাই আজকাল বিদেশে চালান যায়। এবার আসা যাক মিঠে পাতার পানের কথায়। বাংলা পানের ন্যায় মিঠে পানও নানা রকমের হয়ে থাকে। যেমন মিঠে বাংলা, বাকাশালা মিঠে, গাঁঠশালা মিঠে ইত্যাদি। নাম শুনেই বোঝা যায় যে এই পান স্বাদে মিষ্টি এবং এতে বাল কম থাকে। এই পানকে সেইজন্যে অনেক সময় মিষ্টি পাতার পানও বলা হয়ে থাকে। এর সুন্দর স্বাদের জন্যে এই পানের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তবে পানের যতই রকমফের থাকুক না কেন, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে কিন্তু সব পানই *Piperaceae* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পানের বৈজ্ঞানিক নাম *Piper betel Linn.*।

পান গাছ লতানে সুষি গাছ। এই গাছ রোদ একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই গাছের জন্যে জলও প্রচুর লাগে। এটা এক ধরনের লতান গাছ। রোদুর সহ্য হয় না বলে, পান চাষ হয় ছায়া জায়গাতেই করা হয়। পান চাষের জায়গাকে পানের বরজ বলা হয়ে থাকে। এই বরজ দেখলেই বোঝা যায় পান গাছকে কত যত্নে লালন-পালন করা হয়। পানের আর একটা বড় দোষ হল যে এরা খুব দ্রুত পচনশীল। একটা পচা পান-পাতা অনেকগুলো ভাল পান পাতাকে সঙ্গে নষ্ট করে দিতে পারে। সেইজন্যে মুড়ে পান পাঠানোর সময় সাবধানে, কায়দা করে পান প্যাকিং করা হয়ে থাকে।

পান নিয়ে আমাদের গ্রামবাংলায় আজও নানা সরস লোককথার প্রচলন আছে। এদের মধ্যে কয়েকটা এখানে তুলে ধরা হল। যেমন (১) পান থেকে চুন খসলেই বিপদ, (২) ছগলের মুখে পড়ল পান, পান বলে মেয়ে গেল জান, (৩) পানের খিলে হেজেছে নয়ান, খয়ের মুখে কি শোভে পান? (৪) ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমনি চুন, বেশি হলে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে কাল।

বাঙালিদের মধ্যে 'বারুজীবী' এবং অবাঙালিদের মধ্যে 'চৌরাশিয়া' নামে দুই সম্প্রদায় বিরাজমান, যাদের পূর্বপুরুষের জীবিকা ছিল মূলত পান চাষ।

আগেকার অনেক নবাব, বাদশারা পর্যন্ত পানবিলাসী ছিলেন। পান খাওয়া যেমন কারও কাছে বিলাস, কারও কাছে অভ্যাস, তেমনি কারও কারও কাছে এটা নেশার সামগ্রীও বটে। যারা রোজ ২-৩টে করে পান খায় তাদের পান খাওয়া অভ্যাসের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যারা সমস্তদিন ধরে জাবর কাটার ন্যায় পান চিবিয়ে যাচ্ছে এবং রোজ বাদের ১৫-২০টা পান না হলে চলে না, তাদের কাছে পান নেশার সামগ্রী ছাড়া আর কী? আর পান খাওয়া ভাল না খারাপ? এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। যাই হোক, আপনাদের জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

পুষ্টিগুণ

অধিকাংশ মানুষ পানকে নিছক এক মুখশুদ্ধি বা নেশার সামগ্রী বলে মনে করেন। তাদের ধারণা পুষ্টিগুণের বিচারে পানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু একটা নেই। কিন্তু এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ বিশ্লেষণ করতে করতে দেখা গেল যে পান ক্যারোটিনের (অর্থাৎ ভিটামিন-এ-র প্রাক অবস্থার) বিশাল এক ভাণ্ডার। হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ গ্রাম পানে প্রায় ৫৭৬০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বর্তমান। আর পান নিজেও ক্যালসিয়ামের ভাল উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম পানে ২৩০ মিলিগ্রাম হতে ক্যালসিয়াম মজুত থাকে। এছাড়া প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, ফসফরাস এবং আয়রনের পরিমাণ ও পানে কম নয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পানে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.১ গ্রাম, ২.৩ গ্রাম, ৬.১ গ্রাম, ৪০ মিলিগ্রাম, এবং ৭.০ মিলিগ্রাম। এদের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় ফাট, ফাইবার, ভিটামিন-এ, বি, সি এবং নিয়াসিনও পানে উপস্থিত থাকে। আর ১০০ গ্রাম পান হতে আনুমানিক ৪৪ কিলো ক্যালোরি এনার্জি বা শক্তিও মেলে। পানে জলীয় অংশের পরিমাণ থাকে শতকরা ৮৫.৪ ভাগ।

ঔষধিক গুণ

আয়ুর্বেদিক মতে পান নানা ঔষধিক গুণের অধিকারী, যেমন :

কান কামড়ানোতে : যদি কারও কান কামড়ায়, সে বাচ্চা হোক অথবা বুড়ো যেই হোক না কেন, তাহলে পান ছেঁচে তার রস নিয়ে গরম করে সহনীয় অবস্থায় ওই রস দু-তিন ফোঁটা করে কানে দু-তিনবার দিলে উপকার পাওয়া যায়।

উকুনের সমস্যায় : আপনার মাথায় যদি উকুন থাকে, তাহলে পান পাতার রস মাথায় কয়েকদিন লাগালেই দেখবেন উকুন আপনার মাথা ছেড়ে পালিয়েছে।

দাদ ও চুলকানিতে : কারও দাদ বা চুলকানি হয়ে থাকলে, যেখানে হয়েছে তার উপরে পানের রস ঘষে দিলে, কয়েকদিনের মধ্যেই আরাম পাওয়া যাবে।

হাত-পায়ের জ্বালায় : এক্ষেত্রে পানের রস গরম করে মাখতে শুতে যাবার আগে লাগিয়ে রাখুন। দিন কয়েকের মধ্যেই উপকার টের

পাকেন। তবে কারণটা পরিত্যাগ না করলে, ওটা আবার হবে।

জ্বেল্লাতে : পুরনো পান পাতা খেলে, জ্বেল্লা কিছুটা কমে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নতুন পান হলে সেটা আবার জ্বেল্লা বৃদ্ধি করে।

মধ্য কুনিতে : যারা এতে কষ্ট পাচ্ছেন, তারা পানের রস গরম করে দিনে তিন থেকে চার বার নখের কোণে দিলে ব্যথার উপশম হবে। তবে নখের অতিরিক্ত বৃদ্ধিটুকু কিন্তু কেটে ফেলতেই হবে।

মাড়ির ঘায়ে : আজকাল প্রায় লোককেই দাঁতের রোগে ভুগতে দেখা যায়। কেবল মানুষের মাড়িতে ঘা হয়ে পুঁজ জমাতে শুরু করেছে, তারা যদি পানের রসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল মিশিয়ে কয়েকদিন বারকয়েক করে কুলকুচি করেন, তাহলে ঘায়ে পুঁজ জমা বন্ধ হবে এবং ঘাও ক্রমশ শুকিয়ে যাবে।

গর্ভনিরোধ : পানের শিকড় বেটে খেলে যে গর্ভনিরোধকরূপে কাজ করে, একথা প্রাচীন কবিরাজদের জানা ছিল। বর্তমানের প্রামাণ্য গ্রন্থেও একথা স্বীকার করা হয়েছে।

পোড়া ত্বকে : কোনও কারণে ত্বক পুড়ে গেলে পানের রস পোড়া ত্বকের উপর লাগালে জ্বালা কমবে।

কোঁড়াতে : কোঁড়া হলে পান পাতার সোজাপিঠে পুরনো ঘি মাখিয়ে কোঁড়ার উপর লাগিয়ে দিলে কোঁড়া পেকে ওঠে ও ফেটে যায়। এখানে আর একটা কথা, পানপাতার মধ্যে যে উদ্বায়ী তেল আছে, সেটা কোঁড়াকে মিলিয়ে না যেতে সাহায্য করে।

হজমে : খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যহ দুবেলা একটা করে পান খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কারণ এটা হজমে সাহায্য করে। আসলে পান চিবোনোর সময় আমাদের মুখের মধ্যে যে লালা বা রস নিঃসরণ হয় সেটা হজম শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে। তাছাড়া পান চিবোনোর ফলে পাকস্থলির দেওয়ালের সংকোচন ও প্রসারণের গতি বৃদ্ধি পায়, যার ফলে খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

পানের অপকারিতা

রোজ দুটো করে পান খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তেমনি বেশি পান খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। অধিক পান খেলে শরীরে একাধিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে । যেমন :

★ মুখের জড়তা এবং অরুচি বাড়িয়ে দেয়।
★ দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে।
★ ক্যানসারের সম্ভাবনা থাকে।
★ হজমের ব্যাঘাত ঘটায়।
★ পানের রস শরীরের ত্বকে জ্বালা ধরায়।
★ দাঁতে লাল-কালো ছোপ ধরে ও সৌন্দর্যের হানি ঘটে।
★ নতুন পান জ্বেল্লা বৃদ্ধি করে।
★ শরীরের শক্তি হ্রাস পায়।

পানের আর তিন প্রধান দোষ হল চুন, সুপুরি ও খয়ের। এই তিনের কোনও একটা অনুপস্থিত থাকলেই পান খাওয়ার আনন্দ ও আমেজই যেন মাটি হয়ে যায়। এদের সাথে প্রায়ই আবার নানা রকমের সুগন্ধি জর্দা মিশিয়ে পানকে আরও মনোলোভা করে তোলা হয়। বলাবাহুল্য সেটাতে বহু নিরীহ মানুষ এর ফাঁদে পা দেন। প্রথম প্রথম দু-একটা সাজা পান মুখে দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে ওই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে পান খাওয়া তখন নেশার পর্যায়ে চলে যায় তখন পানের সঙ্গে তার সাকরেদদের উপস্থিতিও হয়ে ওঠে একান্ত জরুরি। এবং ক্রমশ তারা অতিমাত্রায় শরীরে প্রবেশ করে, নিঃশব্দে আমাদের অজান্তেই শরীরের নানা ক্ষতি করে থাকে। যেমন :

★ অনবরত চুন এবং জর্দা মেশানো পান পাতা চিবানোর ফলে মুখের মধ্যে এক ধরনের ঘা-র সৃষ্টি হয় যেটা সহজে সারতে চায় না। পরবর্তীকালে এই ঘা-ই ক্যানসাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে কেবল পান খাওয়ার জন্যেই ভারতে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গলার ক্যানসারে ভোগেন।

★ সুপুরির মধ্যে 'অ্যারাকোলিন' নামে এক রাসায়নিক উপাদান থাকে যেটা কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া সুপুরিতে উপস্থিত 'ট্যানিক অ্যাসিড' কোষের মধ্যে অবস্থিত জিনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে শরীরিক বিকৃতি ও নানা জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। উপরন্তু অধিকাংশ সুপুরিই 'অ্যাফলাটক্সিন' নামে এক ধরনের বিষাক্ত ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সুপুরি শরীরে বেশি খেলে লিভারে ক্যানসার হতে পারে। বাজারে বিক্রিত বেশির ভাগ মিষ্টি সুপুরিও এই দলেই পড়ে। আবার মিষ্টি সুপুরিতে যে লাল বা সোনালি রঙ ব্যবহার করা হয় তার কোনও গুণ তো নেই-ই, এমনকী মানেও তারা অতি নিকৃষ্ট।

★ পানের সঙ্গে সুপুরি বেশি খেলে চুলকানি হতে পারে।

★ খয়েরের মূল উপাদান হল ট্যানিন। অধিক ট্যানিন শরীরে গেলে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং প্রজনন ক্ষমতাও কমে যেতে পারে।

★ অতিরিক্ত খয়ের খেলে ফুসফুস ও অন্ত্রের রোগ দেখা দেয়।

পান আবার সব সময় সবার খাওয়াও ঠিক নয়। আয়ুর্বেদিক মতে পান কখন কাদের খাওয়া উচিত নয়, সেদিকে এবার একটু তাকানো যাক।

❒ বেশি লেখা করার পর ❒ রোগা ও দুর্বল মানুষের ❒ মূর্ছা যায় যেসব ব্যক্তি ❒ রক্তপিত্তে যারা কষ্ট পাচ্ছেন ❒ যক্ষ্মা রোগীর ❒ যাদের চোখ উঠেছে।

বাণিজ্যিক মূল্য

পানের বাণিজ্যিক মূল্যও নেহাত কম নয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পান সবচেয়ে উত্তম। বছরে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার পান এরাজ্যে উৎপন্ন হয়। এখান থেকে পান নেপাল, ভুটান, চিন, আরব, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। এর মাধ্যমে বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রাও আয় হয়। প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

পানের তেল : পান থেকে তেলও নিষ্কাশন করা হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রায় ৫০ হাজার পান পাতা থেকে ১ ডেকি মতো তেল পাওয়া যায়। এক ডেকি এই তেলের মূল্য ২০ হাজার টাকার উপর। এই তেল নানা ধরনের কসমেটিক ও আলোকশিখা ওষুধ তৈরি করতে লাগে। এছাড়া বিভিন্ন সুগন্ধি বানাতেও কাজে লাগে।

পানের মধ্যে আবার হাইড্রক্সিক্যাভিকল (hydroxychavicol) নামে এক রাসায়নিক যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেটা তেল, ঘি বা স্নেহজাতীয় পদার্থকে বহু গন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কারণ ওই হাইড্রক্সিক্যাভিকলের মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ধর্ম নিহিত রয়েছে।

পান চাষ করে প্রতি বছরে অনুমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৩৪ কোটি টাকারও বেশি অর্জন করে। অতএব পান যে এক ভাল অর্থকরী ফসল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আফসোসের বিষয় এই যে পান অর্থকরী ফসল বলে গণ্য হলেও কৃষিক পণ্য হিসেবে এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। ❒

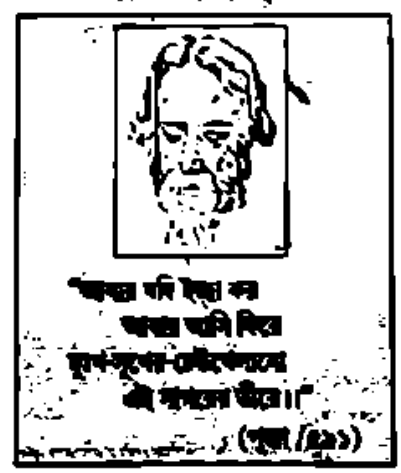

চাগ্রাম নোয়াড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ — গ্রামচন্দ্রপুর
জেলা - বর্ধমান

সমিতিতে এলাকার চাষিভাইদের সুবিধার্থে নন-কন্ট্রোল, কন্ট্রোল কনজিউমার্স দ্রব্যাদি সুলভে বিক্রয় করা হয়।

ইহা ছাড়া চাষের সুবিধার্থে সার, কীটনাশক ঔষধ, ভাল বীজ সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া ট্রাক্টর ভাড়া পাওয়া যায় এবং চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয়, মিনি ডিবটিউবওয়েল-এর মাধ্যমে। সমস্তরকম ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা আছে। বিভিন্ন প্রকার কৃষিঋণ চাষিদের দেওয়া হয়।

With Best Compliments from

Visit **DIGHA** and stay in our
HOLIDAY HOME

* Attractive Location (Old Digha)
* Newly constructed Building (1st Floor)
* Sophisticated amenities

for Details
Please contact

COAL MINES AUTHORITY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"COAL HOUSE"

13, R. N. Mukherjee Road
Calcutta - 700 001
Phone 248 - 6266

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৪ নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ - ২২০-০৮৪১

অশোককুমার ঘোষ
চেয়ারম্যান

অপূর্ব মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার ছুটি ও বেড়ানোর দিনগুলি আনন্দময় হয়ে উঠুক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের হলিডে হোমগুলিতে :
পুরী, দিঘা, দিল্লি, হরিদ্বার, মুসৌরী, রাজগীর, ঘাটশিলা, দেওঘর, গ্যাংটক, দার্জিলিং, পেলিং এবং কলকাতা।

চেন্নাই-এ আমাদের হলিডে হোম খোলার পথে।

বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

সিউড়ি, বীরভূম

"আজ ভারতবর্ষের জীবিকা যদি সমবায় নীতির
উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি
গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-এ রাখিবেন কেন?

যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা যে কোন আমানতে অধিক সুদ দেওয়া হয়।

জেলার টাকা জেলার উন্নয়নের স্বার্থে বিনিয়োগ করা হয়।

৩। সংশ্লিষ্ট DICGC দ্বারা আপনার অর্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

৪। জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনার অবদান, আপনার ও জেলাবাসীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়।

৫। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্র এই জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শশাঙ্কশেখর মণ্ডল
সভাপতি

রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
ডি ভার সি এস

খাজুরডিহি সমবায় হিমঘর লিমিটেড

রেজিঃ নং - ৩৯/৬৫ গ্রাম • পোঃ — খাজুরডিহি
জেলা - বর্ধমান
ফোন - ৫৫-১২৬ কাটোয়া

স্থানীয় চাষিভাইদের উৎপাদিত আলু সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ; প্রয়োজনে বিপণনও করা হয়।

এছাড়া উন্নতমানের আলু বীজ ও সার যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাষী ভাইদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয়

চন্দ্রনাথ মুখার্জি
সভাপতি

কালনা ২ নং-সি এ ডি পি ফার্মার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড নং — ১৩ ● কাটোয়া — ১২৭৬ ● পোঃ — বৈদ্যপুর ● জেলা : বর্ধমান —৭১৩ ১২২
ফোন: এস টি ডি — ০৩৪৫৪
অফিস : বৈদ্যপুর ৫২ ২৩১, হিমঘর : বৈদ্যপুর ৫২ ২৭১

আমাদের মূল পরিষেবা

* উন্নতজাতের শংসিত আলু বীজ, ধান বীজ উৎপাদন ও বিপণন।
* মরশুমে কৃষি উপকরণ দাদন ও বিক্রি।
* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ১/২% অতিরিক্ত সুদে জমা প্রকল্প।
* হিমঘরে চাষিভাইদের বীজ সংরক্ষণ।

অন্যান্য পরিষেবা

* অভাবী মরশুমে নামমাত্র সুদে ঋণভিত্তিক সহায়তা।
* ৭৭টি ডিপ নলকূপ মাধ্যমে জল সেচ।
* মুরগি পালন।
* কলকব্জার্সে মাধ্যমে কাপড় জামা বিপণন।
* উন্নতমানের ফল গাছের চারা সরবরাহ।
* অন্যান্য

এগরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

এগরা : পূর্বমেদিনীপুর ◆ পিন : ৭২১ ৪২২
এস টি ডি - ০৩২২০ ◆ ফোন : ৪৪৩৫০
রেজি : নং : ৬৬ মিড ◆ তারিখ : ১৩-১-৫৮

কার্যকারী মূলধন : ১০ কোটি টাকার অধিক ; তন্মধ্যে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ : ৯.২৫ কোটি টাকা

সদস্য সংখ্যা - ৩৬০০

কর্মচারী সংখ্যা - ২৫

ব্যবস্থাপনা : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বোর্ড

* পাল্স হিসাবে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর কাছে এ এক গর্ব।
* সার্বিক চিন্তা-ভাবনা এবং সমবেত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাই আমাদের সাফল্যের একমাত্র হাতিয়ার।

* সমিতিতে "EARN AND SAVE POLICY"-র মাধ্যমে সকলকে সঞ্চয়ে ব্রতী করার কাজ ছাড়াও কৃষি ও অকৃষি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষেবা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই তো আমাদের আহ্বান

আমাদের সঞ্চয়ের মাধ্যম হোক সমবায়

- আপনার সুখ দুঃখের সঙ্গী হোক সমবায়
- সমবায় দীর্ঘজীবী হোক

কানাইলাল মাইতি	তপনকান্তি কর	দিলীপকুমার সাউ
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

- *বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।*
- *৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।*
- *ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।*
- *মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।*
- *সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।*

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

পরিচালনায় বাণী সংঘ, ইউনিভার্সেল প্রেস থেকে প্রকাশ রায় কর্তৃক ২০এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং অরোরা প্রিন্টার্স, ১৮৩ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৪১-৭৫৫০। মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

"গাহি সাম্যের গান —
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে
সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে
হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।"

ভাণ্ডার

ডিসেম্বর, ১৯৯৮

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩ এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ওরে নিশীথিনী, ওরে ঘোর ঘন
নিয়ে যা তোর সে মায়া
নূতন ভারতে নবীন মন্ত্র - সমবায় সমবায়

দুখের আঁধার সরিয়া
সুখের প্রভাত ফুটিবে ঘরে
দরিদ্র, ধনী, আপনার হয়ে
যা চিরে পরস্পরে।
মিলিত হইবি তবে ভাতৃভাবে
দুর্গতি যাবে দূরে
সেই দুর্গতি পূর্ণ চরমে সমবেত প্রচারে

মিলি পরস্পরে পর্বত হব
সিন্ধু বিন্দু মিলে
মানুষ ওধুই মিলিবে না কিবে
মিলনের এ নিখিলে।
ভাঙবে দুয়ারে বিপুল শক্তি
কুবেরীরা মিলে মিলে
আসবে পরিবর্তন নতুন সৃষ্টিরই সমবেত সংকল্পে
নূতন ভারতে নবীন মন্ত্র - সমবায় সমবায়

— [illegible]

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

ভাণ্ডার

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ; ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
নিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য

সম্পাদক : বিনয়গোপাল মিত্র
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

"আর যাঁরা এখানে ছাত্রদের কাজ করতে আসেন তাঁদেরকি, শিক্ষাদানের ব্যাপারে যেন একথা মনে রেখে না করা হয় যে এরা প্রবেশার্থী, এদের প্রয়োজন অল্প, এদের মনের মত করে যা হয় একটা গোছা বেধে দিলেই চলবে। এদের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, একে যত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তী, কি নাবে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, সর্বসাধারণের কাছে সুলভ করে দিতে হবে। তাদের ছেলেরা যেকুক তাদের ভূত থেকে ওঠা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরন্নতা নিয়ে, তাদের ঠকা শিক্ষার একটুখানি যে কেন রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট-এ রকম অপমান যেন আমরা না করি।"

— রবীন্দ্রনাথ

তাঁহার (রবীন্দ্রনাথ) জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে আমিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন এদেশের বড় শত্রু ইংরেজ নয়, এদেশের প্রধান শত্রু — অন্ধতা, কর্মবিমুখতা, অনৈক্যজনিত দুর্বলতা এবং স্বার্থপরতা। আমরা নিজের ভাগে কাজ করিব না, কিন্তু যদি কেহ করিতে চায় তবে তার সঙ্গে আমরা নিজেরা উপরে উঠিতে পারি না, কিন্তু যদি কেহ উপরে ওঠে আমরা তাহার পা ধরিয়া নীচে টানিয়া নামাইতে চাই। আমরা নিজের সমস্ত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে ইতস্তত করি না। আমাদের অমনুষ্যত্বই আমাদের শত্রু।

— বনফুল

ডিসেম্বর, ১৯৯৮

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়			৩
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে	:		৫
অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সমাজচিন্তা	:	ধনঞ্জয় মিত্র	৭
সমবায় ও নেতৃত্ব	:	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	১১
পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সমবায় আন্দোলনে নতুন দিগন্ত	:	কৃষ্ণা কর	১৭
স্বল্পতর দোষ্ঠী-দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি হাতিয়ার	:	কল্যাণী সান্যাল	১৯
'প্রাণী সম্পদ' – একটি অর্থসংস্থানের উৎস	:	মিত্রা দাশগুপ্ত	২৩
বনসৃজন – একটি সামাজিক দায়িত্ব	:	অসিতবরণ নাথ	২৫
সমবায় সমাচার	:		৩৩

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১

(দূরালাপন ঃ ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫১	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬					১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(-) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৩৯০৪.৫৯	(-) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

সম্পাদকীয়

সমবায় সমিতিতে আমরা অর্থনৈতিক ও আর্থিক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ করে চলেছি। সভ্যদের জীবিকার মানোন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছি আন্তরিকভাবে। সমিতির সাথে সভ্যদের যোগাযোগ গড়ে উঠুক, সমিতি ও সভ্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বাঁধা পড়ুক তাও আমাদের লক্ষ্য। বাস্তবে তা হচ্ছে কই! সমবায় সমিতি সভ্যদের সাথে যে শিথিল সম্বন্ধ নিয়ে চলছে তা আজ আর কারুর অজানা নয়। সারা বিশ্বজুড়ে সাধারণভাবে নাকি একই অবস্থা। আর্থিক দিক দিয়ে একটু অগ্রসর হলে সমিতিতে নাকি এরকম একটা অবস্থা চেপে বসতে পারে।

সভ্যের শুধু জীবিকার মানোন্নয়নের কথা ভাবলেই চলবে না। সভ্যের সংসারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির সাথে সমিতির আর্থিক কর্মসূচির আলাপ না হলে, ডাঃ পিটার ডেভিসের ভাষায়, সাধারণ মানুষ কেবল ভোট দেওয়ার জন্য আর ম্যানেজমেন্টে থাকার জন্য সমবায়ে বেশিদিন আটকে থাকতে পারে না ; সে সমিতির কাছে আশা করে পরিষেবা, আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা, লাভ ও সামাজিক সুবিচার। সমষ্টির জন্য ভাবনা তাই ভাবতেই হয়। একজন গ্রামবাসীকে তার সমমাত্রিক অন্যান্য প্রয়োজন ও চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার কেবল চাষের সামান্য অংশে সাহায্য করলেই তাকে সাথে পাওয়া যাবে না। সংগঠনগত যোগসূত্র তো দূরের কথা! সভ্য দূরে সরে যাচ্ছে — এ-ঘটনা অস্বাভাবিক নয় এবং এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে দেশে দেশে। এ ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কি না, আমাদের নজরে পড়ছে কি না সেটাই বড় কথা। যদি আমাদের নজরে আসে তাহলে ডাঃ পিটার ডেভিসের কথায় বলা যায় হয় আমরা এমন আচরণ করা, যাতে মনে হবে যেন কোথাও কিছু ঘটেনি কিম্বা চেষ্টা করব কি করে সভ্যদের সম্মিলিত শক্তি আহরণ করে, তাদেরকে সমিতির কর্মসূচির সামিল করে নিয়োজিত রাখা যায়। সভ্যকে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করা অবশ্যই তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অপেক্ষ শ্রেয়।

With Best Compliments from

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Ltd.

ESTD. 1923
11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone No. : 248-9413, 248-2621, 210-4122, Telegram : SELF HELP /69

1. A premier Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
2. Provides banking facilities to members and also to Public.
3. All deposits Covered under Deposit Insurance Act.
4. Nomination under Section 45 ZA of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
5. Minor Accounts allowed as Banking Rules.
6. Premature encashment as per Banking Rules.
7. We give Loan against NSC / KVP / UNIT '64 / Fixed Deposits / Recurring Deposit etc. on easy terms & conditions.
8. Term Deposits And Re-investment Plan.
9. Rates of Interest on various Deposits as per RBI guidelines (as applicable to Co-operative Societies Banks.)
10. We allow more interest than commercial banks as per RBI guidelines as applicable to the Co-operative Banks.
11. Join with our PLATINUM JUBILEE SPECIAL SCHEME.
12. Double your money in 66 months. Annualised yield 17.39%.
13. Triple your money in 108 months. Annualised yield 22.22%

Ajoy Sankar Mitra
Managing Director

Asim Kumar Basu
Chairman

বাঙালি কি খেতে ভালবাসে ..... মাছ

বাঙালি কোথায় যেতে পছন্দ করে ..... পাহাড়ে অথবা সাগরে

তাই

বাঙালির আপনজন বেনফিস নিবেদন করছে

ভ্রমণ বিভাগ

বেনফিসের ট্যুরিস্ট লজগুলি পাবেন
নিচের জায়গাগুলিতে
শঙ্করপুর (কিনারা)
ডেজারগঞ্জ (মৎস্যকন্যা)
দার্জিলিং
ডায়মণ্ডহারবার

খাদ্য তালিকা

বেনফিসের স্টল এবং মোবাইল ভ্যানগুলিতে পাবেন
ফিস ফ্রাই ★ ফিস বাটার ফ্রাই ★ ফিস রোল ★ ফিস সিঙ্গাড়া
★ প্রণ পকোড়া ★ ফিস ফিঙ্গার ★ ফিস টিকিয়া ★ চিলি ফিস
★ ফিস তন্দুরি★ চিলি কাঁকড়া ★ ফিস কবিরাজি ★ তপসে ফ্রাই
★ ফিস বিরিয়ানি ★ ভাপা বা সর্ষে ইলিশ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন
ফোন : ৩৩৪-৪৯৩১
পি-১৬১/১, ভি আই পি রোড (চতুর্থ তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪

বেনফিস
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিসারিজ
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাদের 'ভাণ্ডার' পত্রিকার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। তৎকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ ও লেখা 'ভাণ্ডার'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হত। সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ফল অতীত দিনের 'ভাণ্ডার'-এর পৃষ্ঠায় আমাদের জন্য তাঁরা রেখে গিয়েছেন। সমকালীন সমস্যার সমাধান সূত্র আছে যেসব লিখ, জ্যেষ্ঠী বর্তমানকালের সমবায় কর্মীদের নিকট তা আরও আলোর দিশারী হয়ে বেঁচে আছে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে এমনই একটি প্রবন্ধ আবার ছাপা হল।

সমবায়ের প্রসার ও প্রাথমিক শিক্ষা

ডঃ সুধাময়রঞ্জন দাশ, এম এ, পিএইচ ডি

কিছুদিন হইল বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির কেন্দ্রীয় সমিতির এক অধিবেশনে বাংলার সমবায় বিভাগের রেজিস্ট্রার বাহাদুর সমবায়ের প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাব যে দিলের সময়োচিত হইয়াছে ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জর্নাল ও ভাণ্ডার পত্রে এই বিষয়ে দুই-তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ইহার সম্বন্ধে আন্দোলন ও আলোচনা আরম্ভ করিতে চেষ্টা করি পরে এই বিষয়ে নানা আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। মোট কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে সমবায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের একান্ত প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মান দেশেই সর্বপ্রথমে সমবায় সমিতির উৎপত্তি হয়। রোচ্ডেল্ ও সুলজ্ ডেলিৎজ নামক দুইজন মহানুভব জার্মান ব্যক্তি দরিদ্র কৃষক ও শিল্পগণের সুবিধার জন্য পরস্পর পৃথকভাবেই ঋণ আদায় পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করেন। বহু দিন পর্যন্ত ইহার সেরূপ কোন উন্নতি হয় নাই, কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জার্মানিতে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় এবং তদবধি ইহার বিশেষ উন্নতি ও প্রসার হইতে থাকে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও সমবায় প্রথার বেশ আদর হইয়াছে, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে সমবায় যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সে সকল দেশের অধিবাসীরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে সমবায় প্রথার এই সুফল দেখিয়াই স্যার উইলিয়ম ওয়েডেরবর্ণ, স্যার হেনরিক মিডলটন, মিঃ ডুপারনে প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারিগণ এদেশে উহার প্রবর্তন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্যমের ফলস্বরূপ ১৯০৪ সালে এদেশে প্রথম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সেই বৎসরেই গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ সৃষ্টি হইল।

যে যেরূপই হউক না কেন, হঠাৎ কোন নূতন জিনিস সমাজের সম্মুখে ধরিলে কেহ উহা প্রথমে গ্রহণ করিতে চাহে না, এমনকি বুঝিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করে না। তবে যে জাতির মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার প্রসার হইয়াছে সেখানের মতো নিরক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা পাঁচজনেরও কম তাহারা সেই নূতন জিনিসটি বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে চাহিবে। এবং ভাল বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেও চাহিবে কিন্তু যে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প, সে দেশের লোকে বিদেশাগত সমবায় প্রথা বুঝিবেই বা কি প্রকারে এবং তাহার প্রসারই বা হইবে কি প্রকারে? সেজন্য, যতদিন পর্যন্ত না পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহার প্রতি কেহই লক্ষ্য করে না এবং যাহারা লক্ষ্য করে তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুতরাং পরে সমবায় প্রথা যখন প্রথমে এদেশে প্রবর্তিত হয়, তখন দুই-চারিজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভিন্ন কেহই উহার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, কাজে কাজেই তখন ইহার সেরূপ আদরও হয় নাই পরে যখন এই বিভাগের ভার শিক্ষিত কর্মচারিদের হস্তে ন্যস্ত হইল এবং তাঁহারা ইহার মূল মন্ত্রগুলির প্রচার করিতে ও কার্যে ক্ষেত্রে ইহার উপকার দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই সমবায় প্রথার আদর ও সমবায় সমিতির বিস্তার হইতে লাগিল আজ কিঞ্জিধিক বিংশতিবর্ষে সমবায় পদ্ধতি অনুসারে বহুবিধ সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট সমিতিগুলি প্রায় সকলগুলিই সহরে স্থাপিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত। গ্রাম্য সমিতিগুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে এবং উহাদিগের পরিচালনারও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। ইহার কারণ শিক্ষার অভাবে পল্লীর লোকেরা সমবায়ের প্রণালী উত্তমরূপে বুঝিতে পারে নাই এবং উহা কার্যে পরিণত করিবারও তাহাদের যথোচিত শিক্ষা নাই। অথচ পল্লী সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি না হইলেই বা কেবলমাত্র দুই চারিটি সহরের সমিতি উন্নতি হইলেই সমগ্র দেশের উন্নতি হইবে কি প্রকারে?

উপরুক্ত শিক্ষা পাইলে যে পল্লীবাসীরা সমবায় প্রণালী যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাও নহে। গ্রামে সালিসি এবং নিষ্পত্তি করিবার পদ্ধতি যে আমাদের দেশে এবং বিদেশে তাহা পল্লীগ্রামে যে ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে হয়ত তাহা অধুনা প্রচলিত সমবায় নীতির নায় এতটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না পূর্বকালের সেই রাজা নাই, সেই দিন নাই, সেই রাজ্য নাই, সেই রাজা নাই, এখনও প্রচলিত কিন্তু পূর্বকালের মতো নিয়ম যে আজ নাই, তাহা প্রায়ই বারোয়ারীর আমোদ-প্রমোদ, যে দুই একটি পুষ্করিণী খনন, ধর্মগোলা স্থাপন বা রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহার মূলে ব্যক্তিগত বা জনহিতে উন্নতির ইচ্ছা কিছু কিছু থাকিলেও তাহার সঙ্গে দিলের কোন চেষ্টা হইত না ইহার কারণ আমাদের এই হতভাগা দেশে শতকরা ৯০ জন লোক অনুন্নতি, একজনের উন্নতি হইল কিনা, তাহা লইয়া অন্যে মাথা ঘামাইতে চাহে না যাহার উন্নতি হইবার, তাহার উন্নতি আপনা হইতে হইবে এবং যাহার কপালে উন্নতি নাই, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাকে টানিয়া তোলা সম্ভব নয় — এই যে ধারণা হইবে, তাহা হইবেই, এমন সংস্কার বহুকাল হইতে আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে কতিপয় কেতাবে হইলেও শিক্ষার প্রয়োজন ডেনমার্ক, আমেরিকা, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিবিশারদগণও প্রতিদিন সমস্যে একটু আধটু লেখাপড়া করিয়া থাকে চাষের ছুটা পেলেই কৃষিবর সময়ে তাহার পূর্বে একখানি পুস্তক রাখিয়া দেয় এবং যখন তখন অবসর পাইলেই দুই-এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলে তাহার এইরূপে লেখা-পড়ার চর্চা করে বলিয়াই, তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হয় এবং তাহারা অনেক অল্প ব্যয়েতে উন্নতি করিতে পারে ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঘরে ও অধ্যবসায়ের গুণে উচ্চশিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে আমাদিগের দেশেও পূর্বকালে এইরূপভাবে বিদ্যাশিক্ষার প্রথা ছিল, এক হাতে লাঙ্গল ধরিবার জন্য হাতে বেশী লইয়া পড়া করিবার রীতি ছিল। আজ সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া আধুনিক কৃষক সম্প্রদায়ের কি শোচনীয় অবস্থা! তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, যে চাষ আবাদ করে, তাহাকে বোধ হয় অন্য কোন কাজই করিতে নাই। তাহাদের অবস্থার উন্নতির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বুঝাইতে গেলে তাহারা

বলে, "মশাই, আমরা ছোটলোক, আমাদের অবশ্য উন্নতি আমাদের চাষ করে খেতে হবে, লেখাপড়ার সময়ই বা কোথায়, আর তার দরকারই বা কি? আমরা ত আর অফিসে চাকরি করতে যাচ্ছি না।" কি সুন্দর যুক্তি। যে কেবল চাকরি করিবার জন্যই লেখাপড়া শিখিতে হয় কাজেকাজে উত্তরপুরুষ করিয়া সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করাই যেন ইহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আশা নাই, উদ্যম নাই, যেন একটি সঙ্কীর্ণ যন্ত্র গ্রীষ্মে রৌদ্র, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে তুষার উপেক্ষা করিয়া এক একটি মুরগীর ছানার মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই যেন ইহাদের জন্ম ইহারা না পায় দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে, না পায় একখানা ভাল কাপড় পরিতে এবং না পায় জীবনে নৈতিক উন্নতি করিতে।

দরিদ্র কৃষকের অবস্থা উন্নত করার জন্য তাহাদেরকেই সর্বাপেক্ষা অধিক দরকার। পাছে স্বাস্থ্যের গ্লানি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্য ত্রুটি হয় এই ভয় তাহারা হুমকি পল্লীগ্রামের তথাকথিত অভদ্র কৃষিজীবীদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। ফলে পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অশিক্ষিত লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আপনার উন্নতি আপনি ত কখনও করিতে পারিবে না, আর যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য যত্নবান হয়, তাহাও তাহারা সন্দেহের চোখে দেখিবে উহার নিশ্চয়ই কোন গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাহা না হইলে তাহার এত মাথা ব্যথা কিসের? কিন্তু কি যে সেই উদ্দেশ্য এবং কেন যে এত মাথাব্যথা, তাহা কেহই বুঝিবার চেষ্টা করিবে না সুশিক্ষা পাইলে তাহার এইরূপ মন্তব্য করিবার পূর্বে অন্তত একটিবার ডিমিসটা বুঝিবার চেষ্টা করিত। আর একটি কথা চিরস্থায়ী অভাবের মধ্যে পড়িয়া পল্লীবাসীদের নৈতিক অবস্থা যে কত হীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয় শহরের লোকের পল্লীবাসীরা শিক্ষিত, তাহাদের চরিত্রবল খুব বেশি। তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া সমাজের ও স্বজাতির উন্নতি করিতে পারে এবং যাহারা উপকৃত হয়, তাহারাও বুঝিতে পারে যে, নিজের ক্ষতি না করিয়াও অপরের উপকার করা সম্ভব।

শহরে উদার ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা পল্লীর লোকেরা সমবায় প্রচারের জন্য ইহা যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাহা পল্লীগ্রামের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের পক্ষেও যে প্রযোজ্য হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নয় শহরে শিক্ষার বিস্তার অধিক, সুতরাং লোকের চরিত্র বেশ উন্নত, রীতিনীতি মার্জিত ও মন উদার। তথায় কোন হৃদয়বান ব্যক্তি সাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি কোন কাজ করিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে লোকে চারিত্রিক দুর্বলতা তাহাকে সাহায্য করিতে আসে। কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। তাই যখন সমবায় বিভাগের কর্মচারিগণ বাসিন্দাকে গাড়ীর্য লইয়া বলিলেন, "একটি ক্রেডায় ছয় মাসে ৩৬টি নূতন গ্রাম্য সমিতি গঠন কর। অল্প ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক চালাও। কেন হইবে না? এ সমস্তই ত লোকের উপকারের জন্য।" তখন সেই গার্হস্থিক তত্ত্ব বুঝে কে? সভাই ত তাঁহারা সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ মতামত লিখিয়া দিলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য এত উদ্যম তাহাদের মধ্যে এ-সমস্ত শোনেই বা কয়জন, আর বুঝেই বা কয়জন? প্রায় সব পল্লীগ্রামের লোকেই বলে, "প্রবেশ কি দিয়ে, টাকা জমাই যদি দিতে হয়, আমাদের টাকা ধার করবার দরকার কি? অন্য লোকে ত আমাদের অমনিই টাকা দেবে।" যাহাদের জন্য এত চেষ্টা, তাহারাই যদি না বুঝিল, তবে সমস্তই ত অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল যদি প্রকৃতই পল্লীবাসীদের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অন্তত সমবায়ের মূলনীতি বুঝিবার মত শিক্ষার বিস্তার করিয়া, তাহাদের অজ্ঞতা দূর করা চাই, তাহাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দেওয়া চাই, তবে তাহাদের মন উন্নত ও উদার হইবে।

এই সকল কথা হইতে ইহা নিশ্চিত যে, সমবায়ের প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং এই শিক্ষার প্রচলন না হইলে দেশে সমবায়ের উদ্দেশ্য অনেকটা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। সুতরাং পল্লীগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনের চেষ্টায় আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অবসাদ দূর করিয়া তাহার স্থলে উৎসাহের বীজ বপন করিতে হইলে চাই শিক্ষা, চাই শিক্ষিত উদার মন।

□

১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইড্‌স দিবস

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্‌স্টিটিউট-এর সমীক্ষা অনুসারে আগামী ১৯৯৯ সালে কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই এইড্‌স রোগাক্রান্তের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক হবে।

* **এইড্‌স সম্পর্কে জানুন, সাবধানতা অবলম্বন করুন।**
* **অন্যকে জানান, অযথা আতঙ্কিত হবেন না।**

ভুল সংশোধন

গত নভেম্বর ৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত "ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট" প্রবন্ধটির লেখক পরিচিতি (পৃ-২০) হিসাবে 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজার' লেখা হয়েছে। "জোনাল ম্যানেজার" পড়তে হবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

সম্পাদক, ভাতার

বিগত ১ই নভেম্বর ১৯৯৮ সন্ধ্যা ৬টায় অধিরকুমার বসু, এ আর সি এস কলিকাতা, চাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কম্পিউটার পরিষেবার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় পৌরপিতা পান্নালাল সিকদার উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অশোক কুমার দত্ত।

ইফকো ৪৬.৩৪ কোটি টাকা ডিভিডেন্ড দিল

ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ (ইফকো) সরকারকে তার প্রদত্ত অংশের মূলধনের উপর ৪৬.৩৪ কোটি টাকা লভ্যাংশ দিল। বৃহত্তম এই সমবায় সংস্থা সরকারকে এ পর্যন্ত মোট ২৬৫.৮৫ কোটি টাকা ডিভিডেন্ড প্রদান করেছে

এছাড়া কর হিসাবেও সরকারি তহবিলে ১৪৩১.৭২ কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

[সূত্র ঃ দি ইকনমিক টাইমস ১০-১১-৯৮]

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সমাজচিন্তা

ধনঞ্জয় মিত্র

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর নামকরণ করেছিলেন, তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের দৌহিত্র। যাঁর পিতৃদেব আশুতোষ সেন যিনি দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় নির্বাচন সংস্থা (ইউ পি এস সি)-র সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন, সেই অমর্ত্য সেন অর্থনীতির সর্বোচ্চ পুরস্কার 'নোবেল' পেয়ে ভারত তথা এশিয়াবাসীকে গর্বিত করেন। আজ একথা সবাই জানেন যে অমর্ত্য সেন শান্তিনিকেতন (তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন) থেকে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে প্রথম হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথমে বিজ্ঞান শাখাতে ভর্তি হন, পরে শাখা পরিবর্তন করে অর্থনীতি বিভাগে চলে আসেন। তারপর তাঁকে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। ক্রমশ সাফল্যের চূড়া থেকে চূড়ায় ওঠা: ইংল্যান্ড-আমেরিকার সর্বোত্তম শিক্ষালয়গুলিতে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত এবং পরে শিক্ষাদান। পরিশেষে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের 'মাস্টার' অমর্ত্য সেনের অমর্ত্য কীর্তি।

অমর্ত্য সেনের 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে বহুল আলোচনার ত্রুটি প্রতিভাত হয়েছে যে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গবেষণার মূল তত্ত্বটি যেটি ছিল, তা সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'কল্যাণমূলক অর্থনীতি' (Welfare economics)। কিন্তু একদিনে তো আর এই ধারণার সৃষ্টি হয়নি। ছোটবেলায় অমর্ত্য'র যখন মাত্র নয়-দশ বছর বয়স তখন তিনি দেখেন তেরোশ পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ, তিনি দেখেন শান্তিনিকেতনের কাছেই সাঁওতাল পল্লীবাসীদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কার। বিজ্ঞানের সাধনা তাঁকে ঘিরেছিল পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, অন্যান্য শিশুকে মিষ্টি নিরহঙ্কার স্বভাব তাঁকে ঘিরেছিল সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেশার ক্ষমতা। তাই তো অর্থনীতির মাধ্যমে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের উন্নতির সূত্র। কবির ভাষায় 'জীবনে জীবন যোগ' করতে। রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অমর্ত্য'র এই কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে।

সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার অমর্ত্য ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে কি কি করা উচিত ছিল অথচ উন্নয়নের জন্য। এইখানে অমর্ত্য সেন অর্থনীতিবিদের ভূমিকা ছাড়িয়ে যেন এসেছেন সমাজকর্মীর ভূমিকায়। এ সম্পর্কে লক্ষণীয় যে দেশ ও বিদেশ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তবু তিনি তাঁর মূলটিকে তিনি ভোলেননি এখনও।

অমর্ত্য সেনের কল্যাণমুখী অর্থনীতির পরিচয় বহু কথায় দেওয়ার চেষ্টা মূর্খামিতে হবে। অমর্ত্যবাবু তাঁর জ্ঞানের বিস্ফোরণী শক্তির প্রয়োগে বিভিন্ন বিষয় প্রঞ্জল করে দিয়েছেন। আমি এখানে শুধু তাঁর উন্নয়ন সম্পর্কিত (relevant) লেখাগুলির সংক্ষিপ্তসার করে দেব। আশা করব এই দৃষ্টিতে অমর্ত্য হবে।

ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর দেশের উন্নতির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন যে, ভারতে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজিক বৈষম্য দূর করার প্রয়াস বিফল হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় যে অবস্থা ছিল তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এখনও খুব কম সংখ্যক লোক চিকিৎসার সুযোগ পান। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বিশ্বের ও স্বদেশের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার প্রতি অসম্পৃক্ত থাকেন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা বঞ্চিত থাকেন। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন : নিরক্ষরতা, জনস্বাস্থ্যে অবহেলা, ভূমিসংস্কারের অভাব, শ্রমের ন্যায্য জনসের ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা আর লিঙ্গ বৈষম্য যাতে পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাপক বিভেদ থাকে। অমর্ত্য সেন এও লক্ষ্য করেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি যে সাফল্যতার দিক দিয়ে, যে অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়ে, সব দিক দিয়েই ভারতের থেকে এগিয়ে। অথচ তারা শুরু করেছিল ভারতের থেকে অনেক পরে। অমর্ত্যবাবু দেখিয়েছেন এই দেশে অত্যাবশ্যক উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হয়। ভারতের অর্ধেক জনসাধারণই নিরক্ষর এবং মহিলাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই অক্ষরজ্ঞানহীন। আবার মহিলাদের প্রতি সামাজিক অবহেলাই তিন-চার কোটি মহিলার অকালমৃত্যু ঘটায়।

এবার ত. সেন লক্ষ্য দিয়েছেন ভারতের তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে। তাঁর মতে এই অগ্রগতি হয়েছে ঘিঁড় গতিতে মাঝে মধ্যে হলেও উন্নয়ন অবশ্যই আছে। বর্তমানে এই হার ছয় থেকে সাত শতাংশ যা সন্তোষজনক বলে ধরা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে, উন্নয়নের সুফল কিন্তু সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। উন্নয়নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু এও বলেছেন যে বিশ্বাসের সুফল যেন মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সমাজের সবাই যেন এর দ্বারা উপকৃত হন।

অমর্ত্য সেন রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি করে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র তাই ভারতকে শুধুমাত্র 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে তোলার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অমর্ত্য সেন এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে ভারতের বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা (প্রায় নয় কোটি) পাকিস্তানের প্রায় সমান, আর বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। ত. সেন এই বিষয়ের ১২-তে বর্ণিত অংশের প্রসঙ্গ এনে দেখিয়েছেন যে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা আজ কঠিন বিপদের সম্মুখীন এবং তিনি এর কারণ হিসেবে প্রধান তিনটি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন : যেমন (১) সাম্প্রদায়িকতার যুক্ত জাতিবাদ (২) সহিষ্ণু ও উগ্র জাতীয়তাবাদ, ও (৩) জাতি ধর্মের মনোভাব। তবে হিন্দু রক্ষণশৈলিক দলসমূহকেই (যেমন বিজেপি) তিনি ফাসিস্ট আখ্যা দেননি। কিন্তু মুম্বাই দাঙ্গার ক্ষেত্রে বিজেপি ও শিবসেনা জমতাসীন কংগ্রেস দলের নিষ্ক্রিয় থাকার ঘটনাটি তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন।

অমর্ত্য সেন সম্বন্ধে বলা হয় তিনি মার্কসীয় অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট

নন তাই বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা দুটিই স্থূলে ধরতে তিনি দ্বিধা করেননি। বামফ্রন্ট সরকারের সর্বাধিক কৃতিত্ব হল আমূল ভূমিসংস্কার, যার ফলে গরিব চাষীরা উপকৃত হয়েছিল, ও পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্তন, যার ফলে সামাজিক বৈষম্য অনেকটা দূর হল আর গ্রামীণ অর্থনীতির খুলিয়ে শক্ত হল। এছাড়াও কৃতিত্বের আরো নিদর্শন হচ্ছে — সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কৃষি-কাইলিন সময়ের কাজের ব্যবস্থা করা ; মজুরি বাড়ানো ; কৃষির শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের রোজগারবৃদ্ধি ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি হয়নি। পঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছে।

ড. সেন এই উন্নয়ন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ জাতীয় আয়, জাতীয় স্তরে কর্মসংস্থান দ্রুত বাড়িয়ে ফেলে দরিদ্র দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান (Living Standard) অনেক উন্নত করেছে। এই রীতিটির নাম দিয়েছেন তিনি 'প্রোথ পাথ'। পক্ষান্তরে, মুখ্যত কমিউনিস্ট দেশগুলি যেমন, চিন, ভিউবা, ভিয়েতনাম (আবার কিছু অকমিউনিস্ট দেশ যেমন, শ্রীলঙ্কা, কোস্টারিকা ইত্যাদি) কঠোর সরকারি অনুশাসনে থেকে (প্রধানত জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে) প্রভূত উন্নতি করেছে সমাজের দরিদ্র অংশের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে। ড. সেন এই দ্বিতীয় রীতি-পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন 'পাবলিক প্রভিশনিং পাথ'। এই দুই রীতি কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক নয়, বরং বলা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক। কিন্তু দুটিরই লক্ষ্য একই অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন করা। অর্থাবাবু বলছেন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা মূলত এই দুটি রীতির সার্থক প্রয়োগ না করা। কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা হয়তো এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী, তবু ড. সেন মনে করেন যে রাজ্যস্তরে যথেষ্ট উন্নতি করা যেত। ড. সেন আরো বলছেন যে ভূমিসংস্কারের ফলে সাধারণ অর্থনীতির সূত্র অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিষয় দুটিতে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়াকে, কৃষিক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চফলনশীল বীজ না ব্যবহার করাকে, নলকূপ বা অন্য ধরনের সেচ না বাড়াকে, কৃষি ছাড়া অন্য পেশায় নিযুক্ত মানুষজনের পেশায় যথেষ্ট উন্নতি না আনাকে ইত্যাদি। নলকূপ বা অন্যান্য সেচের ক্ষেত্রে, ড. সেন মন্তব্য করেছেন যে কৃষিভূমির খণ্ডবিখণ্ডতা হয়তো এই ব্যবস্থার পরিপন্থী। অন্যত্র তিনি মন্তব্য করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এখনও সেই আদ্যিকালের চাষ-বাসের রীতিই চলছে। তবে কৃষিমজুরদের বেতন নিশ্চয় বেড়েছে এবং তা সংবেদিতও হচ্ছে।

অর্থাবাবু সেন লেখাটি শেষ করেছেন এই বলে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলিতে চিন্তা-ভাবনা করার দরকার আছে। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের যথেষ্ট সমর্থন পায়, বিশেষত গ্রামে। এটি নিশ্চয় একটি ইতিবাচক দিক। এখন দেখতে হবে ভারতের মত দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতটা উন্নতিলাভ করতে পারে?

ড. সেনের বক্তব্যগুলি থেকে এটিই প্রতীয়মান যে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে শুধু উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা নয়, সেচের সুবিধাভোগ করতে হলে, আধুনিক প্রযুক্তিগত সাহায্য পেতে হলে, জমির ক্ষুদ্র মালিকানা ত্যাগ করতে হবে, সমবেদ্ধ হতে হবে। অন্য কথায়, সমবায় প্রথা প্রচলন করতে হবে। এ ব্যাপারে 'পাবলিক প্রভিশনিং পাথ'-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য। পঞ্চায়েত আইনে সমবায় গঠনের ব্যবস্থা আছে, দরকারে তা নিশ্চয় আরো সংশোধন করা যাবে।

সমবায়-এ গণতন্ত্র বহাল করার পথ্যাটি নির্ধারণ করার জন্য পঞ্জাব সরকার ১৯৯৮-এর ১৫ এপ্রিল অর্থ দপ্তরের তৎকালীন কমিশনার রঞ্জন কালাণ-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। 'কালাণ কমিটি' ১১ই মে ১৯৯৮-তে রেকর্ড সময়ে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেন।

কমিটির সুপারিশগুলি সরকার কর্তৃক বিবেচিত ও গৃহীত হবে। মুখ্যমন্ত্রী কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করে যত শীঘ্রসম্ভব তা কার্যকরি করার প্রয়াস নেবেন বলে জানিয়েছেন এবং সমবায়-এর উপর থেকে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক চাপ কমাবার উদ্যোগ তাঁর সরকার গ্রহণ করবেন বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

সুপারিশগুলির দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হল :

- ★ সরকারের সঙ্গে সমবায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সরকারি স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আইনে নিবন্ধকের যে-অবধি ক্ষমতা দেওয়া আছে তা পরিবর্তন এবং দূরীকরণ এবং একই সঙ্গে সরকারি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয় এমন আইন প্রণয়ন।
- ★ সকল সমবায় সমিতি, যেগুলি 'স্বনির্ভর এবং পারস্পরিক সাহায্যপুষ্ট' তাদের জন্য সর্বভারতীয় একটি আইন প্রণয়ন। এছাড়া সমবায় ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য কমিটি নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করেছে।

[সৌজন্য : দি সিখ ফে-ফ্রু-ফুলাই-অগাস্ট ১৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী সভাগৃহে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে ৪৫তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সভা

মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবর্গ
বামদিক থেকে - অনুষ্ঠানের সভাপতি সুশীল ঘোষ, প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অর্থমন্ত্রী ও অসীমকুমার দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অরুণেন্দু চক্রবর্তী ও ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শম্ভুনাথ বসু।

সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের সভাপতি সুধীন ঘোষ স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন।

বিভিন্ন সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে প্রবীণ সমবায়ী হরিদাস মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারকের জন্য চেক প্রদান করছেন।

বুকে সংকল্প

চোখে মোদের সোনালী ভবিষ্যৎ

দেশের কৃষিক্ষেত্রে বইছে দিন-বদলের হাওয়া। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কৃষির অগ্রগতি। কালের চাহিদা-সারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। তিন দশক ধরে মাঠে মাঠে সাফল্যের ফসল তুলছে একটি নাম—ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড, বা ইফকো। তৈরি করছে চেতনা। সবুজ বিপ্লবের তাগিদে জেগে উঠছে সারা দেশ।

নতুন দিন আনে নতুন চ্যালেঞ্জ। ইফকোও নতুন শতাব্দীর জন্য তৈরি হচ্ছে। সার্বিক বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়েছে এক ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-'ভিসন ২০০০'। সারের দুনিয়ায় ইফকো হবে শুধু দেশের সেরা নয়, বিশ্বের সেরা। বিরাট পরিকল্পনা, রূপায়ণে চাই অবাধ গতি। আরো প্রসার। আরো বৃদ্ধি। আরো বিশাল বিকাশ। নক্‌শা তৈরি। কাজও শুরু।

IFFCO

একটি স্বপ্ন, একটি সন্ধান

ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376: Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

Business of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

সমবায় ও নেতৃত্ব

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

নেতৃত্ব গণতন্ত্রের একটি আবশ্যিক পূর্ব শর্ত। যে কোনও আন্দোলনে তা সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতৃত্ব বাদ দিয়ে গণতন্ত্র বা আন্দোলনের কথা ভাবাই যায় না। কারণ, নেতৃত্বই এদের রূপ দেয়, এদের গড়ে তোলে, ও এগিয়ে নিয়ে যায়। নিঃস্বার্থ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমেই গণতন্ত্রে এবং আন্দোলনে প্রাণ আসে, গতি বাড়ে এবং জনসহযোগিতা লাভ করা যায়। অন্যদিকে নেতৃত্ব দুর্বল, নেতিবাচক এবং স্বার্থপর হলে তা দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পায়ু হতে বাধ্য।

সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব আরও বেশি কারণ সমবায় এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন। নেতা ও নেতৃত্ব বাদ দিয়ে সমবায় আন্দোলন কখনই চলতে পারে না। এ বিষয়ে কানাডার প্রখ্যাত সমবায়ী A. F. Laidlaw-র বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে —

"Wherever you find flourishing co-operatives, giving good service over a long period of years, you will always find a loyal band of devoted men and women giving leadership. They are the ones who go on with their regular occupation, in factory, office or mine, farming or fishing, or doing the daily chores of a house-wife, while at the same time and during spare hours acting on committees, serving as office-bearers and otherwise giving voluntary services for the co-operative society. These men and women are the backbone of the co-operative movement." [Extension Work in the Co-operative Movement]

সাধারণভাবে নেতৃত্ব বলতে আমরা বুঝি এক ব্যক্তির (নেতা) সঙ্গে একদল ব্যক্তির (অনুগামী) সম-স্বার্থের বা সম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত এমন এক সম্বন্ধ যার প্রভাবে ঐ ব্যক্তি (নেতা) নির্দেশিত মতে ও পথে ঐ দল চালিত হয়ে থাকে। সমবায়ের ক্ষেত্রে নেতা বলতে, বৃহত্তর অর্থে, অনেককেই বোঝায়। আন্দোলনের রীতি-নীতি নির্ধারণে, পরিকল্পনা গ্রহণে, কর্মসূচি রূপায়ণে এবং এগুলির বাস্তব রূপায়ণে যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আছে বা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যাঁরা সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করেন তাঁদের সকলকেই নেতা বলা যায়। বিস্তৃততর অর্থে দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, দেশনেতা, প্রশাসক, সমবায়ী ও সমবায় আধিকারিকরা সকলেই সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থে সমবায় নেতৃত্ব বলতে নির্বাচিত পদাধিকারী (elected office-bearers) এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের (members of the Board of Directors) বোঝায়।

নেতৃত্বের সূত্র ঃ

সমবায়ে নেতৃত্বের সূত্র প্রধানত তিনটি এবং সেগুলি হল : (১) সমবায়ের সক্রিয় সদস্যবৃন্দ যাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করে পরিচালকমণ্ডলীতে আসেন, (২) সমিতির উপবিধি অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীতে সহযোজিত (Co-opted) সদস্য, এবং (৩) সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মনোনীত পদাধিকারিক বা পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য।

প্রাথমিক সমবায় সমিতির সেই সকল সদস্য যাঁরা সমিতির সেবা-সহায়তা সদাসর্বদা ব্যবহার করেন, যাঁরা সমিতির সঙ্গেই শুধু কাজ কারবার করেন, সমিতির বিক্রি-বাট্টা যাঁদের ওপর নির্ভরশীল এবং সমিতির সকল দায়দায়িত্ব যাঁরা কাঁধে নিয়ে থাকেন সাধারণভাবে তাঁদেরই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। সদস্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত এই সকল সদস্যরাই নেতৃত্বের উৎস ও ভিত্তিমূল।

কেন্দ্রীয় স্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা প্রাথমিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত এবং প্রেরিত সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সদস্যদের। কেন্দ্রীয় সমিতির পরিচালন পর্ষদ এই সকল মনোনীত সদস্যদের দ্বারা (ঐ কেন্দ্রীয় সমিতির উপবিধি অনুযায়ী সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে) গঠিত হলে সেখানেও প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটার কথা।

বাস্তব চিত্র ঃ

কিন্তু বাস্তব চিত্র কিছুটা ভিন্ন। থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিস-এর সব সময়েই কিছু ফারাক থেকে যায়। সমবায়ের ক্ষেত্রে এই ফারাকটা বড়ই বেশি এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উদ্বেগজনকভাবে দৃষ্টিকটু।

সমবায়ে নির্বাচন প্রসঙ্গে যথার্থভাবে তথ্য বলার সময় কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রী (দলের কারণেই নাম উল্লেখ করা সঙ্গত নয়) বলেছেন, 'সৎ লোক', বা 'ভাল লোক' নির্বাচনে কাজে লাগে না — সেখানে অবশ্যই 'ভোটের' জয় জয়কার। উদাহরণ দিলেন এলাকাই এক নির্বাচিত নেতার যাঁর নামে গোটা কয়েক খুনের মামলা ঝুলছে!

প্রাথমিক সমিতির নির্বাচনে শুধু যে সক্রিয় সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন তা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক সমিতিতে জমিদার, ব্যবসায়ী বা সুদখোর মহাজনেরাও অংশগ্রহণ করেন এবং যেহেতু গ্রামের অধিকাংশ সদস্য অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত এবং যেহেতু তাঁরা তাঁদের সমিতির ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহী নন তাই সক্রিয় সদস্যের পরিবর্তে এইসব ব্যবসায়ী, জমিদার, মহাজন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হন। এঁরাই আবার কেন্দ্রীয় সমিতিতে ঐ প্রাথমিক সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেখানেও নির্বাচিত হয়ে নেতৃত্ব দানের জন্য সচেষ্ট হন।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সমবায় নেতৃত্ব সম্বন্ধে এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে (১) সভাপতিদের অধিকাংশেই বড় জমিদার, (২) সকল সভাপতিই প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের (Dominant caste) লোক, (৩) সভাপতি নির্বাচন 'সর্বসম্মতিক্রমে' হয় এবং এটি প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে, (৪) পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত (Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Mangement-Coop. Perspective)।

বিভিন্ন প্রাথমিক সমিতিতে বা কেন্দ্রীয় স্তরে অধিকাংশে সদস্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কেন যে প্রতিফলিত হয় না তা ঐ সমীক্ষার কথা থেকেই বোঝা যায়।

নেতৃত্বের দ্বিতীয় সূত্র সহযোজন (Co-option) পরিচালকমণ্ডলীতে আকস্মিক কোন কারণে কোনও পদশূন্য হলে সহ-যোজনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হয়। কিন্তু শুধু শূন্যপদ পূরণই নয় — অনেক ক্ষেত্রে এই সংস্থানটির অপব্যবহারও চোখে পড়ে। বহুক্ষেত্রেই নির্বাচনে হেরে যাওয়া ব্যক্তি বিশেষকে এইভাবে আবার নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে স্বার্থান্ধ নেতৃত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে পছন্দমত ব্যক্তিকেই সহযোজন করা হয়।

মনোনীতদের (Nominated) সম্বন্ধে বলা যায় যে এঁদের নেতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় বা আস্থাভাজন হয় না কারণ, এই নেতা তাঁদের নিজেদের একজন নন। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একজন। তাছাড়া অনেক সময় এঁদের সমবায় সম্বন্ধে কোন ধ্যান-ধারণাও থাকে না। এঁরা নেতৃত্বে আসার পর আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিবিধ কারণে নেতৃত্বে থাকতে উৎসাহিত বোধ করেন।

নেতৃত্বের অভাব ও তার কারণ :

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য আমাদের 'নেতা'র কোনও অভাব নেই- বরং ক্রমবর্ধমান। শুধু পশ্চিমবাংলার হিসাব নিলেই দেখা যাবে হাজার পঁচিশেক বিভিন্ন ধরনের সমিতিতে কম বেশি দেড়-দু'লাখ নেতা রয়েছেন। এছাড়া একটি নতুন সমিতি গঠিত হওয়া মানেই আরও ন'জন নেতা তৈরি হওয়া। নেতা তৈরির এতবড় সুযোগ সমবায় আন্দোলন ছাড়া আর বোধ হয় কোথাও নেই।

সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে অভাব না থাকলেও গুণগত দিক থেকে ব্যাপারটি কিন্তু নৈরাশ্যজনক। এ সম্বন্ধে Rural Credit Review Committee- র মন্তব্য হল : "There is paucity of leadership especially at the base. Barring exceptions, the Movement has, by and large, failed to throw up competent leadership on a scale commensurate with the considerable expansion that has taken place in its operation."

আন্দোলনের সামনে আজকে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হল প্রকৃত নেতার অভাব। এর বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :

● আজকাল কোন্ ধরনের কতগুলি সমবায় তৈরি করতে হবে তা স্থির করার পর ঐ 'টার্গেট' পরিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার পরিবর্তে পরিকল্পনা মাফিক চাপিয়ে দেওয়ার ফলে সমবায়ীবিহীন সমবায় এবং নেতৃত্ববিহীন নেতার সৃষ্টি হয়।

● নেতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া উচিত প্রাথমিক (গ্রাম) স্তরে কিন্তু গ্রামের অধিকাংশে সদস্য অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হওয়ায় এবং সমিতির কাজে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ না থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীরা নানা কলাকৌশলে তাঁদের নেতৃত্ব কায়েম করেন।

● এখনও অনেকক্ষেত্রেই গ্রামের কর্তৃত্ব সেই জমিদার বা মহাজনের হাতেই থেকে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই ঐ সকল ক্ষেত্রে গ্রামের সমিতির কর্তৃত্ব ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐসব জমিদার বা মহাজনদের ওপরে আজও নির্ভরশীল।

● সমবায় সমিতিকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা বা অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে ভুয়া সমবায় সমিতি এবং ভুয়া নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

● অধিকাংশে সমবায়ী নেতাই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত অথবা রাজনৈতিক দলেরও নেতা। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিচার বিবেচনা করে কাজ করা তাঁদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না, ফলে তাঁদের নেতৃত্ব পক্ষপাতমূলক হয়।

● নারী ও যুব সম্প্রদায়কে সমবায় আন্দোলনে অধিকসংখ্যায় সামিল করতে না পারায় নেতৃত্বে কোনও 'নতুন মুখ' দেখা যায় না।

নেতৃত্বের গুণাবলী

সমবায় আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি আসে তা হল প্রকৃত সমবায়ী নেতার কি কি গুণ থাকা দরকার? সমবায়ী নেতার গুণাবলী একটি বিস্তৃত ব্যাপার এবং এর কোন সাধারণ সংজ্ঞা নির্ণয় সম্ভবপর নয়। সাধারণ নেতৃত্বের তুলনায় এই ব্যাপারটি আরও কিছুটা জটিল। কারণ সমবায় আন্দোলনে গণতন্ত্র ছাড়াও আছে দর্শন, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষামূলক প্রয়াস। স্বাভাবিকভাবেই সমবায়ী নেতাকে :

- আচারে আচরণে একজন প্রকৃত গণতন্ত্রী হতে হবে, কারণ সমবায় আন্দোলন আবশ্যিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ;

- চিন্তাশীল হতে হবে এবং সমবায় দর্শনে বিশ্বাসী হতে হবে, কারণ তা না হলে তিনি এই আদর্শ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন না ;

- অর্থনীতিবিদ হতে হবে, কারণ তা না হলে তিনি সমিতির এবং সমিতির সভ্যদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথটি খুঁজে বার করে সেইমত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রচনা করতে পারবেন না ;

- সর্বতোভাবে পরার্থপর ব্যক্তি হতে হবে, কারণ সামাজিক উন্নতি তথা সামগ্রিক অগ্রগতি সমবায়ের মূল লক্ষ্য ;

- প্রকৃত শিক্ষাবিদ হতে হবে, কারণ সমবায় একটি শিক্ষামূলক প্রয়াস এবং আরও বেশি লোককে সমবায়ের ছত্রছায়ায় সামিল করাই তাঁর কর্তব্য ;

- সর্বোপরি সমবায়ের নৈতিকমূল্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তিনি নিজে সৎ এবং নিষ্ঠাবান হলেই চলবে না, সাম্প্রিষ্ট সকলের সততা এবং নিষ্ঠাও তাঁকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

নেতৃত্ব বিকাশের প্রচেষ্টা

সামগ্রিকভাবে নেতৃত্ব একটি বিশেষ সহজাত গুণ যা শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঐ বিশেষ গুণের বিকাশ তথা উন্নয়ন অবশ্যই সম্ভব। এ বিষয়ে এস এস পুরি-র বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"আন্দোলন শুরুর সময় থেকেই আমাদের ধারণা বেশে নেতার অভাব নেই। শুধু তাদের খুঁজে বার করে বসিয়ে দিতে পারলেই হল। যাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভারতে সমবায় আন্দোলন শুরু হল সেই স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনের স্লোগান ছিল - find Raiffeisen। কিন্তু দুঃখের বিষয় Raiffeisen-দের খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। নিবিড় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের গড়ে তোলা দরকার।" [Ends & Means of Cooperative Development]

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে নেতৃত্ব বিকাশকল্পে বহুবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমবায় শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের (সাধারণ ও মহিলা) জন্য তিনদিনের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি ছাড়া সমবায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও "নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রমের" ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রমের মধ্যে দুটি

ভাগ ছিল — সাধারণ ও মহিলা। বর্তমানে নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রম (সাধারণ) এবং নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রম (মহিলা) ছাড়াও সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যও আলাদা আলাদাভাবে নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে আছে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, মৎস্য সমবায় সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি, তন্তুবায় সমবায় সমিতি, শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক ও কর্মচারী ক্রেডিট সমিতি প্রভৃতির জন্য বিশেষ নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রম। বলাবাহুল্য এইসব ক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষণক্রম চালু হওয়ায় একদিকে যেমন পাঠ্যসূচিকে আরও নিবিড় ও বিষয়ভিত্তিক করা সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে তেমন যোগদানকারীদের পারস্পরিক মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ বিস্তৃততর হওয়ায় প্রশিক্ষণক্রমে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত হয় "ইন হাউস লিডারশীপ ডেভালপমেন্ট কোর্স"।

উপসংহার

নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় গৃহীত ব্যবস্থা অপ্রতুল বলা যায়। তাই আজ প্রয়োজন হল এ ব্যাপারে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করে পর্যাপ্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিছু কিছু ভাল সমিতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণও এই কাজে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। একইসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে একাজে সমবায়ীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা দরকার অন্যথায় সকল উদ্যোগ অর্থহীন ও বৃথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলিতে আয়োজিত বিভিন্ন পাঠক্রমে আসন সংখ্যা অধিকাংশ সময়েই পূর্ণ হয় না, যাচ্ছেতাই ৬টি ইন হাউস লিডারশীপ ডেভালপমেন্ট কোর্সের সংস্থান থাকলেও সাধারণত ২/৩টির বেশি কোর্স অনুষ্ঠিত হয় না। উপসংহারে তাই Arnold Toynbee-র মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে :

"The greatest obstacle to the success of plan of education for cooperators would be, not difficulty of finding competent teachers, nor the greatness of the expense, but the apathy of the cooperators themselves." ❑

সমবায়ের উন্নতি সাধনে

সর্বোচ্চ বিচারালয়ের পূর্ববর্তী একটি রায় সংশোধন করে আদেশের আইনে সমবায় সমিতিগুলিকে সুবিধা করের বোঝা থেকে রেহাই দিয়ে এক নজির সৃষ্টি করেছেন এবং বলেছেন যে কোর্টের পূর্ববর্তী আদেশে কিছু ভুল ত্রুটি ছিল। সর্বোচ্চ বিচারালয় আরও বলেছেন যে, যেসব সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের উৎপাদিত সামগ্রী বিপণনের কাজে নিযুক্ত তারা আয়কর আইনের ৪০ (পি) (এ) (দ্বি) ধারায় সম্পূর্ণ কর রেহাই পাবে। এই কাজে সমিতির যে লাভ হবে তা সমিতির নেট আয় থেকে বাদ যাবে। কর রেহাই পাওয়ায় সঙ্গতিহীন সমিতিগুলিতে এখন থেকে নগদ যোগান (ক্যাশ) বাড়বে এবং সমিতিগুলি তাদের ব্যবসার জন্যে বেশি টাকা লগ্নি করতে পারবে। কর ছাড়ের সুযোগ না থাকায় বিশেষত বিপণি সমিতিগুলিতে উন্নয়নের কাজে এতদিন খুব সামান্য পুঁজিই উদ্বৃত্ত থাকত।

যাই হোক, এই সংশোধনী রায় অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার একটিকে মাত্র সমাধান করেছে বটে কিন্তু অনেক কিছু এমনকী আরও কয়েকটি সমস্যারও পুরোপুরি সমাধান হয়নি। মধ্যপ্রদেশের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত অন্য একটি মামলার রায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয় বলেছেন যে সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠানগুলির বাধ্যবাধকতামূলক তহবিলের অর্থ সরকারি লগ্নিসমূহের বিনিয়োগের বিষয়টি (যে সমবায় আইনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে) ব্যাঙ্কিং ব্যবসা হিসাবে গণ্য হবে এবং সেইহেতু করের আওতায় আসবে। আয়কর কর্তৃপক্ষের এই রায় সম্পর্কিত জটের নিরসন ব্যাঙ্কার এবং ভূতাপেক্ষ (রেট্রোস্পেকটিভ) ভাবে তা চালু করার ফলে নাবার্ড ও ছোট আকারের কেন কিছু শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অনেক রাজ্যে আয়কর কর্তৃপক্ষ বিগত কয় বছরের হিসাব নিকাশ সংশোধন করে নূতন করে কর ধার্য করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে তাদের আমানতকারীদের বিষয়ে তথ্যাদি জানতে চাওয়া হয়েছে, এর ফলে আমানতকারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমানত তুলে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমানতকারীদের আস্থা ও টাকা তুলে নেওয়ার প্রবণতা এবং নোটা অঙ্কের আমানতী করের দাবির সংমিশ্রণে বহু শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে।

এছাড়া সমবায় ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের বিষয়টি ভুক্ত করলে বিস্তৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ভারতে সমবায় ব্যাঙ্ক চালু বহু আগেই "মাল্টি স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্ট" -এ নিবন্ধীকৃত হয়েছে কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স না পাওয়ার ব্যাঙ্কিং কার্যাবলী এখনও শুরু করা যায়নি। ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট-এ সামান্য কিছু সংশোধনের প্রয়োজন - তা না হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতি পত্র দিতে পারছে না। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় সরকারের সহায়তার কোন ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিলটি কেউই সংসদে উপস্থাপিত করেনি। "মাল্টি স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট"-এ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে গণতান্ত্রিক পথে চলার জন্য অধিকতর স্বশাসন ব্যবস্থা চালু সংক্রান্ত সংশোধন প্রস্তাবটির ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যত তাড়াতাড়ি সমস্যাগুলির সমাধান হয় সমবায় জগতের ততই মঙ্গল। উদারনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে একমাত্র আশার আলো হ'ল সমবায় ক্ষেত্র। একমাত্র সমবায়ের ছত্র ছায়াতেই তাদের পক্ষে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

বিজনেস স্টান্ডার্ড (মে ২০, ১৯৯৮), নিউ দিল্লি

অনুবাদ : বাসন্তী চ্যাটার্জি

তন্তুজ

পুজোর স্টক এসে গেছে

পুজোর বাজার করে নিন কিস্তিতে দাম দিন

উৎসবের সময় সকলের জন্য কেনাকাটা করতেই হয়। নিজের জন্য পছন্দ একটা তাঁতের শাড়ী পছন্দ হলো, কিন্তু বাজেটে কুলোচ্ছে না - এমনতো প্রায়ই হয়। সুন্দর একটা অভিজাত বালুচরী বা মনভোলানো জামদানী, কম্পিউটারে ডিজাইনের টাঙ্গাইল শাড়ী, তসরের উপর বাঁধা সিল্ক, হ্যান্ড পেইন্টেড মুর্শিদাবাদ সিল্ক /গরদ অথবা প্রিয়জনের জন্য ১০০% কটন শার্ট বা সালোয়ার কামিজে নজর পড়তেই মনটা ছটফট করে ওঠে, এমন হামেশাই হয়।

এখন থেকে আর মন খারাপ করে ফেরা নয়। 'তন্তুজ' এনেছে কিস্তিতে কেনার অভূতপূর্ব সুযোগ। পাঁচটি বা সাতটি মাসিক কিস্তিতে আপনি চেক্ কেটে দিন। এর জন্য বাড়তি কোন সুদ লাগবে না। কোন ডকুমেন্টেশন চার্জ লাগবে না। কিস্তিতে দাম দেওয়ার এই সুযোগ আপাতত কেবলমাত্র সরকারী/আধাসরকারী অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক ও স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য। তন্মধ্যে ২,০০০/ - সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকার তন্তুজ সামগ্রী কিনতে পারা যাবে এই প্রকল্পে।

এবার যত খুশি কিনুন, মনের মতন কিনুন।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত তন্তুজ শোরুমে এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে :-

◆ তন্তুজ ভবন (সেক্ট থেকে-টি ডি-১৮/৪-নো রিবেট দাম সহ) ◆ পার্ক ষ্ট্রীট ◆ লিডসে ষ্ট্রীট ◆ গোলপার্ক ◆ গড়িয়াহাট মার্কেট নো রিবেট দাম (ছিতলে) ◆ দক্ষিণাপন (চকুরিয়া) ◆ জৌবাজার ◆ শিয়ালদহ ◆ বাসের বাজার ◆ বেহালা (মাল্টিন সুপার মার্কেট) ◆ শ্যামবাজার (নো রিবেট দাম সহ) ◆ ডি.আই.পি. মার্কেট-মুকুন্দবাগান ◆ উত্তরাপন (উল্টোডাঙ্গা, সিক্সিক সেক্টর) ◆ বারাসাত (তালেশ্বরী মোড়) ◆ হাওড়া ময়দান ◆ কদমতলা ◆ বেলুড় ◆ উত্তরপাড়া ◆ শ্রীরামপুর (বি. পি. পে স্কুল) ◆ কল্যাণী (সেন্ট্রাল পার্ক)

অথবা টেলিফোন করুন ঃ ৪৭৪-৬৩৬৩

তন্তুজ

বাংলার ঐতিহ্যের কথা

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

তন্তুজ ভবন, ব্লক-টি ডি, নং-১৮/৪, সেক্টর-১, বিধান নগর, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪

ABC-T-98

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সমবায় আন্দোলনে নতুন দিগন্ত

কৃষ্ণা কর

গত কয়েকমাসে পরপর কয়েকটি খবর পাওয়া গেল। প্রথম, হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি অঞ্চলে অম্বিকা কুণ্ডু লেনের মহিলা বিকাল কো-অপ: ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ নিজস্ব বাড়ি তৈরি করার জন্য সাড়ে তিন কাঠা জমি কিনেছে। এই সমিতিটি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখন সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৫০০, পেড-আপ শেয়ার ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, মোট আমানত ৪৪ লক্ষ টাকা আর এ পর্যন্ত সদস্যদের মোট ঋণ দিয়েছে ১৯ লক্ষ টাকার মতো।

দ্বিতীয় খবর হ'ল, ক্যানিং মহিলা কো-অপ: ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ দাতনুখীহাট নামের গ্রামে এবছর অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে তাদের শাখা উদ্বোধন করেছে। দিনটা ছিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির। বয়ে করা প্যান্ডেল ছিঁড়েখুঁড়ে একশা। অতএব ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যেই বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হ'ল। বলার নয় বিষয়, ঐরকম ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা মাথায় দিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন এসে উঠোনে ভিড় করেছেন, সমবায় ঋণদান সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে নিজেদের সুযোগ সুবিধার জায়গাগুলো বুঝে নিয়েছেন। দিনের শেষে ঐদিন আমানত জমা পড়েছে মোট ৭৩,২০০ টাকা। ক্যানিং-এর এই সমিতিটি কিন্তু বেশিদিনের নয়। রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে ২৮-১১-৯৬ তারিখে।

তৃতীয় যে খবরের কথা এখানে উল্লেখ করবো, খবর হিসাবে তার গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক কলকাতায় গঠিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক তথ্য :

নাম - কলিকাতা মহিলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ।

রেজিস্ট্রেশন নং - ০৮-আর সি এস।

আর বি আই লাইসেন্স নং - W. B. 1629 P

রেজিস্ট্রেশন তারিখ - ২৫-৬-৯৮

এলাকা - কলকাতা মহানগর (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন সিটি)

রেজিস্ট্রেশনের সময় সদস্যসংখ্যা - ৩০০০

রেজিস্ট্রেশনের সময় পেড-আপ শেয়ার ৩৮,১৯,১২০ টাকা।

সমবায় দপ্তরে সহকারী অফের দায়িত্বে আছেন ঘূর্ণনিবন্ধক উৎপলকিশোর দাশগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, এই মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কটি শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেই নয়, এটি সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রথম মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক।

প্রথম খবরে এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আর এক প্রসঙ্গের কথা। এবছর ১৮ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী সভাঘরে সমবার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সভায় অন্যান্য ধরনের সমবায় সমিতির পাশাপাশি রাজ্যের মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতিরা মধ্য থেকেও প্রথম পুরস্কার পেল দক্ষিণ শহরতলী মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৯০০, পেড-আপ শেয়ার ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, মোট আমানত ৬৮ লক্ষ টাকা, এ পর্যন্ত সদস্যদের মোট ঋণ দিয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। সমিতি ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছিল। এই সমিতি সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে বলার আছে। তা হ'ল সুদের হার। মাত্র ১২%, যা অন্য কোন মহিলা সমিতি দিতে পারছে না।

প্রথম পুরস্কার হাতে নিয়ে যখন সমিতির সম্পাদিকা আইভি রায় আকাশবাণীর প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন, তখন মনে পড়ে যাচ্ছিল এই সমিতি গঠনের প্রথম দিনগুলোর কথা। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি গঠনের প্রথম উদ্যোক্তা এই সমিতিটি। যে কোন নতুন ধরনের সাংগঠনিক কাজেরই প্রথম দিনগুলো সবসময়ই খুব কঠিন হয়। কারণ তখন সামনে না থাকে কোন মডেল, না থাকে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা। শুধু মনের গভীরে থাকে একটা ভাবনা যাকে রূপ দেবার জন্য নিজেদেরই পথ পদ্ধতি খুঁজে এগোতে হয় শত বাধা অতিক্রম করতে করতে। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত প্রাপ্তি আশপাশের মানুষজনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

ঠিক এসবের মধ্য দিয়েই আমাদের রাজ্যে মহিলা সমবায় আন্দোলন পা বাড়িয়েছিল চেনা পথের ওপারে। একথা বলার কারণ, আমাদের রাজ্যে দীর্ঘসময় জুড়ে মহিলা সমবায় সমিতিগুলোর ঘোরাফেরা ছিল শুধুমাত্র উৎপাদনভিত্তিক কাজের জগতে। নতুন চিন্তাভাবনা কি ছিল না? ছিল। কিন্তু তা ছিল শুধু উৎপাদনের দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনে। আমাদের রাজ্যে মহিলা সমবায়ের তৈরি করা জিনিসে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। নানা ধরনের পোশাক তৈরি, বাটিক-বাঁধনি-ব্লক ছাপার কাজ, মশলা-বড়ি-পাঁপড়-আচার-জেলি-আচার তৈরি, নানারকম খোঁপার নানা জিনিস, হরেকরকম মশলা গুঁড়ো, তাঁতের শাড়ি, গামছা, চাদর ইত্যাদি বোনা, সুন্দর ডিজাইনের নকশাকরা সৌখিন ব্যাগ, জুতো, খেলাধুলোর সরঞ্জাম, মাদুর, বেতের তৈরি নানারকম জিনিসপত্র — কি হয় না মহিলা সমবায় সমিতিতে! কিন্তু উৎপাদনে বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও সব সমিতিরই লক্ষ্য এক। যৌথভাবে কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং বিনিময়ে মজুরি পাবে মজুরি। অর্থাৎ, সমবায়ে অর্থোপার্জন কিন্তু সমাজের সবস্তরের, সব ধরনের মহিলাদেরই তো আর এ ধরনের যৌথ উপার্জনে আগ্রহ থাকার কথা নয়। অনেকেই আগ্রহী নিজের মতো করে কোন ব্যবসা গড়ে তুলতে, আকারে তা বড় কিংবা ছোট যেমনই হোক। অথচ তাদের সামনে সমস্যা মূলধন জোটানো। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা কিছু কিছু সরকারি দপ্তরে এ ধরনের প্রকল্পে অর্থসাহায্য করার নীতি থাকলেও নানা অসুবিধার জন্য বেশির ভাগ মহিলারা শেষেই তা পেয়ে ওঠা আর হয় না। ব্যবসা ছাড়াও আবার অনেকেই চান তাদের পারিবারিক নানা প্রয়োজনের সময় সহজ শর্তে কিছু ঋণ পেতে। একেকেই সব চাওয়ার জগতে যেমন আছেন মধ্য ও নিম্নবিত্তের মহিলারা, তেমনই আছেন দরিদ্র, অতিদরিদ্র পরিবারের সেইসব মহিলারা যারা উদয় থেকে অস্ত পরিশ্রম করে চলেছেন শুধুমাত্র নিজের ও পরিবারের অন্যদের মুখে অন্ন জোগাতে। কারো পাশে হয়তো আছেন পরিবারের আর কেউ, আবার কেউ বা এই কঠিন পথের একক যাত্রী। শুধু বছর ঘুরে আশপাশে ঘোরাফেরা করে সুদখোর মহাজন।

ক্যানিং বা লক্ষ্মীকান্তপুর যাবার লোকাল ট্রেনের মহিলা কামরা উপচে পড়ে এদেরই ভিড়ে। কথা বললে জানা যায় আশ্চর্য সব তথ্য। যেমন বলেছিল মালতী। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে মুড়ি এনে কলকাতায় বিক্রি করে প্রতিদিন। খুবই ছোট তার ব্যবসা। অথচ তারও মূলধন নিজের নয়। আজ সন্ধ্যাবেলা মহাজনের থেকে ১০০ টাকা ধার নিয়ে মুড়ি কিনে পরদিন সকালে কলকাতায় তা বিক্রি করবে। বিকেলে ফিরেই মহাজনকে দিতে হবে ফেরৎ ১১০ টাকা। তাহলে কি ১০০ টাকায় মাসে মূল হ'ল ৩০০ টাকা! আর বছরে ১০০ টাকার মূল ৩৬০০ টাকা! সুদের শতকরা হিসাবটা তাহলে কি দাঁড়ালো? প্রথমে বিভ্রম জাগালেও এই হিসাব ঠিক একরকমই। সমস্যা আরও আছে। অল্পস্বল্প সঞ্চয় যে করবে ব্যাঙ্কে, তারও রাস্তা বন্ধ। সেখানে আবার কমপক্ষে ২৫০ টাকা না রাখলে অ্যাকাউন্টই খোলা যাবে না।

এসব কথা যে শুধুমাত্র আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই একান্ত নিজস্ব, তা নয়। ভারতের সব রাজ্যেই এই একই চিত্র। তবে মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু — এসব রাজ্যের মহিলারা বহু আগেই এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য গড়ে তুলেছেন মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি, মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক যেখান থেকে সদস্যের সহজবোধ্য মহিলারা নিজেদের নানা প্রয়োজনে অতি সহজ শর্তে, নামমাত্র সুদের হারে ঋণ নিতে পারেন প্রয়োজনমতো।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারটা শুরু হল দেরিতে। ১৯৯১ সালে বেহালা ঠাকুরপুকুর এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মহিলা বিভাগ ও সংগঠন কমার্শিয়াল কো-অপ: সোসাইটি লিঃ যৌথভাবে স্থানীয় কিছু উদ্যমী মহিলাদের নিয়ে এরাজ্যের প্রথম মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি গঠনে সচেষ্ট হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই একই উদ্যোগ শুরু হয় মধ্যগ্রামে অঞ্চলে। সেখানেও কিন্তু প্রথম আলোচনাসভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মহিলা বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তা মহিলাদের উৎসাহিত করেন। প্রথমদিকের দিনগুলোতে চারিদিকে শুধুই অবিশ্বাস আর অবিশ্বাস। মেয়েরা ব্যাঙ্কের ব্যবসা চালাবে? সম্ভবই নয়। সব এলোমেলো করে ফেলবে। সমিতি হয়ে দাঁড়াবে কিছু উন্নাসিক প্রকৃতির মহিলার 'লেডিস ক্লাব' যেখানে চলবে শুধু 'কিচেন পলিটিক্স' আর 'ফ্যাশন প্যারেড' — শাড়ি-গয়নার 'একজিবিশন'। গরিব মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য ঋণ দিয়ে সাহায্য করা? পারবে আদায় করতে একটি পয়সাও? বড় বড় ব্যাঙ্ক সব চারিদিকে ফেল খেতে যাচ্ছে —ইত্যাদি।

কিন্তু এর ঠিক পরেই হল কি, আমাদের রাজ্যের সর্বত্র মহিলারা স্বাভাবিকভাবে এই নতুন ভাবনাটার কাছের হয়ে বসলেন। মহিলাদের ঋণদান সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রি করার শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল দুটি — কমপক্ষে ৫০০ জন মহিলাকে সদস্য করতে হবে আর শেয়ার তুলতে হবে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা। প্রথমে একটু সংশয় দেখা দিল। মেয়েরা এত টাকা পাবে কোথায়! এত মেয়েকে সদস্য হতে অনুপ্রাণিতই বা করা যাবে কিভাবে! সামনে তো নেই কোন মডেল যেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলা যাবে 'তোমরা এসো, সদস্য হও। দ্যাখো, আমরা ঠিক এইরকম সংস্থা গড়তে চাইছি।' তবু, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর কঠিন পরিশ্রমের অঙ্গীকার নিয়ে নেতৃত্ব দিতে মেয়েরা এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন। আজ সবাইকেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, যেকোন কঠিন চ্যালেঞ্জেরই সামনে দাঁড়াবার নেতৃত্ব দিতে মেয়েরা শিখছে! ১৯৯১ থেকে আজ ১৯৯৮ সাল — এই ৮ বছরেই রাজ্যে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কাজ করছে মোট ২৮টি মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি, গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় ব্যাঙ্কও। এসব সমিতির একটি জেলাভিত্তিক চিত্র এভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :

কলকাতা — ৩ (এর মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক), হাওড়া — ৫, উত্তর ২৪ পরগণা — ৩, দক্ষিণ ২৪ পরগণা — ২, হুগলি — ১, মুর্শিদাবাদ — ১, পুরুলিয়া — ১, বাঁকুড়া — ১, মেদিনীপুর — ৫, বর্ধমান — ৩, বীরভূম — ২, জলপাইগুড়ি — ১, উত্তর দিনাজপুর — ২, দক্ষিণ দিনাজপুর — ১। মোট ২৯।

কিন্তু কথা হল, এই যে এত এত সমিতি হল, এদের সদস্যসংখ্যা, শেয়ার, আদায়ত, লালন করা অঙ্কের পরিমাণ — এসবের আজ লক্ষ ছাড়িয়ে কোটির ঘরে পৌঁছে গেল। বহুসংখ্যক মেয়ের সামনে সহজ ঋণ পাবার দরজা খুলে গেছে। কিন্তু সেই যে মালতী, যে মুড়ির ব্যবসা করবার জন্য আজ ১০০ টাকা নিয়ে কাল ১১০ টাকা ফেরৎ দেবার চক্রে ঘুরছে, তার কি কিছু হল? তার মতো অন্য মেয়েদের যাদের চাওয়াটা খুব ছোট? দক্ষিণ শহরতলীর মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির পরিচালিকাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই জিজ্ঞাসায়। কারণ ওরা পেরেছেন। ঐ সমিতির সদস্য আলোরাণী মিস্ত্রি, কেয়াবাণী মিস্ত্রি, বিন্দু ঘরামী এরা সব বাবুদের বাড়ি বাসন মাজে, কাপড় কাচে। তবে বড়ে বাড়ির হাল উঁড়ে গেলে, মেয়ের বিয়েতে, ছেলেমেয়েদের বইখাতা কিনতে ২০০/৫০০/১০০০ টাকা 'লোন' সমিতি থেকে নেয়। কেউ কেউ একটু সাহস বাড়িয়ে আবার ৫/১০ হাজার 'লোন' নিয়ে সবজির ব্যবসা, ছোট্ট মুদিদোকান খুলে বসেছে। বাবুদের বাড়ির কাজ আর করবে না। পার্বতী সাউ, মজনা বিবি, কৃষ্ণকলি হালদার — এরা সবাই সমিতির 'লোনের' টাকায় কেউ করছে বিড়ি বাঁধার কাজ, কেউ বা দিয়েছে ছোট্ট চায়ের দোকান, কেউ করছে জুটের কাজ। ব্যবসা ছোট, আয়ও ছোট। কিন্তু তবু তো আয় করা শুরু হয়েছে। দিনে দিনে ক্রমশ আয় আরও বাড়বে নাইবা কেন? — এই প্রত্যয় নিয়েই এরাজ্যে আজ সমাজের সব স্তরের মেয়েরা তাদের নিজেদের এই সমবায় সমিতিগুলোকে ঘিরে রেখেছে। তবে, সব সমিতিরই সাফল্য যে সমান উজ্জ্বল, তা তো নয়। তবু, তাদের কথা পাশে সরিয়ে রেখেও বলা যায়, রাজ্যের মহিলা সমবায় আন্দোলন আজ থেকে ৮ বছর আগে যে অজানা পথে পা বাড়িয়েছিল, সেই পথ আজ যে নির্দিষ্ট কিছু স্পর্শ করেছে, তার নাম নিশ্চয়ই সাফল্য।

□

কলকাতায় অমর্ত্য সেনের নাগরিক সংবর্ধনা

নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভা মিলিতভাবে নাগরিক সংবর্ধনা দেবে ২৭ ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী — দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি হাতিয়ার

কানাই সামন্ত *

প্রথাগত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় নিয়ম মেনে সমাজের দরিদ্রতম ও সংগঠিত মানুষদের ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ধরনের ঋণের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা এখনও নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই প্রচলিত ব্যাঙ্কিং নিয়মকানুন বা প্রথা ভেঙ্গে বা শিথিল করে গ্রামের গরিব মানুষদের নিয়ে "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী" গড়ে তুলে তাঁদের মধ্যে স্বল্প সঞ্চয়ের মনোভিকতা, প্রবণতা ও অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে। নিজেদের সঞ্চিত অর্থ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা কিংবা ঐ জমা টাকার দু'তিনগুণ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কোন প্রকল্প বা ক্ষিম কার্যকরী করার মাধ্যমে আয় বাড়ানো বা স্বয়ম্ভর হওয়া — এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

নাবার্ড বা জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৯৯২ সালে ব্যাঙ্কের সঙ্গে "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংযোগ" (Linking self-help groups with Banks) এই কর্মসূচির নামকরণ করে প্রথাগত ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেন। সমাজের বিভিন্ন অংশের/শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা, তফসিলি জাতি/উপজাতির মানুষ কিংবা সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষ প্রভৃতি যাঁরা প্রথাগতভাবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁরাই এই "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী"র মাধ্যমে সেই সুযোগ পাবেন।

স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য ৫ থেকে ২০ জন মিলে এক একটা "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী" গড়ে তুলতে পারেন। প্রতিটি গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত হবে। প্রতিটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। সমিতির আমানত বৃদ্ধির স্বার্থে এবং গ্রামীণ গরিব মানুষ যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে সমবায়কে গরিব মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই এ কাজের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য পেলে সমবায়কে তাদের বন্ধু বলে মেনে নিতে দরিদ্র মানুষের দ্বিধা থাকবে না।

আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় এইভাবে গোষ্ঠী গড়ে তুলে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহ ও উন্নয়নের কাজে অনেক সমিতি সাফল্য লাভ করেছে। এক্ষেত্রে কোন কোন জেলা পিছিয়ে রয়েছে। এলাকার সমিতিগুলিকেও এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পিছিয়ে পড়া সমিতিগুলি এই কর্মসূচি রূপায়ণকে একটা অভিযান হিসাবে চিহ্নিত করে কার্যকর করতে উদ্যোগী হলে সাফল্য আসবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে একদিকে যেমন এই ধরনের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি সফল হবে অপরদিকে গ্রামের মানুষকে সমবায়ের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

প্রকৃতি

সম মনোভাবাপন্ন এবং একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার লোকজনদের নিয়ে "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী" গড়ে তোলা যায়। গোষ্ঠী সকলের একই ধরনের পেশা, সামাজিক অবস্থান হওয়া দরকার। না হলে একে অপরের কাছে মনের কথা খোলাখুলি বলতে বা আলোচনা করতে পারবে না। এদিক বিবেচনা করে সাধারণভাবে পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা আলাদা গোষ্ঠী করা সুবিধাজনক।

মাসিক ন্যূনতম দুবার সদস্যদের সভা করতে হবে। নিজেদের আয় ভিত্তাবে বৃদ্ধি করা যাবে মূলত এইটাই সভার আলোচ্য বিষয়। সভায় তারা আলোচনা করে নিজেরাই স্থির করে নেবেন। কোন ক্ষিম কার্যকরী করলে তাঁদের নিজেদের আয় উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং নিজেদের অভাব দারিদ্র্য দূর করা যাবে। এছাড়াও এলাকার নানা উন্নয়নমূলক ও গঠনমূলক কাজ, সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করে স্থির করতে পারবেন।

গোষ্ঠী গড়ার পদ্ধতি

সমিতিগুলির নেতৃত্বে বা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে কিছু পুরুষ বা মহিলা স্বেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে এক একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সুপারভাইজার বা অন্য কোন আধিকারিকও অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে এ ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলা ও তাকে চালু রাখা খুবই কঠিন কাজ। সেবামূলক মনোভিকতা ও সৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই এই ধরনের সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

গোষ্ঠী গড়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সদস্যদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তাদের জানতে চাইতে হবে,

- দলগত বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুফল।
- স্ব-নির্ভরতা বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর উপায়।
- গোষ্ঠী গঠন করলে সদস্যরা কি কি ধরনের সুযোগ পেতে পারেন ইত্যাদি

পরিচালন পদ্ধতি

গোষ্ঠীর সদস্যরা সকলে মিলে নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন। সদস্যরা চাইলে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত সভাপতি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ তাঁদের উপর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। সঞ্চিত টাকার কিছুটা (বড় জোর দুই) টাকা সম্পাদকের কাছে বিভিন্ন খরচ-খরচার জন্য জমা থাকতে পারে। বাকি টাকার সবটাই ব্যাঙ্কে/সমিতিতে জমা রাখতে হবে প্রয়োজনে যে কোন সভ্য টাকা ঋণ নিতে পারেন। জরুরি ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে এবং যে কোন উদ্দেশ্যে এমনকি প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনেও ঋণ নিতে পারেন। কোন বাধ্য-বাধকতা বা

সিকিউরিটির দরকার নেই। তখন কোন একজন সদস্য ঋণ নেবেন তখন অন্য সদস্যরা নজর রাখবেন যাতে ঐ ঋণী সদস্য ঋণের টাকা যথাযথভাবে খরচ ও আদায় দেন। যদি কোন কারণে আলাদা খেলাপ করেন তখন গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্যরা মিলে ঐ খেলাপি ঋণী সদস্য যাতে টাকা শোধ করতে পারেন সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

কর্মপদ্ধতি

সভায় মিলিত হয়ে সবাই আলোচনার মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা করার নিয়ম পদ্ধতি ঠিক করবেন। সভার তারিখ, বার, সময় ও স্থান পূর্বেই ঠিক করে রাখতে হবে এবং নির্ধারিত দিনে সভা করতে হবে। মাসিক অন্তত দু'বার অবশ্যই সভা করতে হবে।

কিভাবে এবং কারা গোষ্ঠীর সদস্য হবেন তার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করে রাখতে হবে। সঞ্চয় ও ঋণের নিয়মকানুন ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারের সহযোগিতা ও পরামর্শে তৈরি করতে হবে এবং সেই নিয়ম অনুসারে সব কাজ পরিচালিত হবে। যথা সময়ে সঞ্চয় বা ঋণের টাকা জমা না দিলে খেলাপি সভ্যদের কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে অর্থাৎ সঞ্চয়ের বেলায় সভ্যরা কত টাকা কম সুদ দেওয়া হবে এবং ঋণের বেলায় সভ্যরা কত টাকা বেশি সুদ নেওয়া হবে তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে হবে। ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের পরামর্শক্রমে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা ভাল।

সঞ্চয় পদ্ধতি

সদস্যদের কত দিন অন্তর (সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক) কত টাকা জমা রাখতে হবে তা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে। কোন সভ্য যথাযথভাবে তা পালন না করলে শাস্তি হিসাবে তাকে কম সুদ দেওয়া হবে। কত কম সুদ দেওয়া হবে তাও নির্ধারণ করা থাকবে। সাধারণত সঞ্চয় আমানতের সুদের হার বার্ষিক ৬%।

ঋণ পদ্ধতি

ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ছোট ব্যবসায়, কর্ম সৃজন বা রক্ষণ, ছাগল-গরু কেনা ও প্রতিপালন, হাতের কাজ বা কুটির শিল্প, ব্যবসায়ের কাঁচামাল কেনা, চাষের কাজ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে সদস্যদের ঋণ দেওয়া যাবে। সাধারণত চিকিৎসা বা সামাজিক ব্যক্তিগত ব্যবহারে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণ দেওয়া যাবে। সঞ্চয়ের ২/৩ গুণ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে। ঋণ প্রার্থী সদস্যের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও মানসিকতা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে কোন কোন ক্ষেত্রে ৪ (চার) গুণ পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে। ঋণী সদস্যদের কত টাকা হারে সুদ দিতে হবে তা গোষ্ঠী ঠিক করবে। খেলাপি সুদের পরিমাণ ও তারা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করে রাখবেন। গোষ্ঠীগুলি সমিতি বা ব্যাঙ্ককে বার্ষিক ১২% হারে সুদ দেবে। সুতরাং গোষ্ঠীর সদস্যদের থেকে ১২% এর বেশি সুদ নিতে পারেন। কত দিনে, কত টাকা করে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হবে তাও ঋণ দানের সময় স্থির করে দিতে হবে। কোন ঋণী, টাকা পরিশোধ করতে এলে প্রথমে তার সুদের টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা আসলে জমা নেওয়া হবে।

সঞ্চিত অর্থের পুনর্ব্যবহার

আসল ও সুদের টাকা নিয়মিত ও নিয়মমত আদায় হলে তা পুনরায় অন্যদের প্রয়োজনে দাদন করা যাবে, এইভাবে গোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গড়ে উঠবে ও বৃদ্ধি পাবে।

হিসাব নিকাশ

গোষ্ঠীর সদস্যদের নাম, বাবা/স্বামীর নাম, বয়স, ঠিকানা ও স্বাক্ষরযুক্ত একটি খাতা থাকা দরকার। এছাড়া (১) হিসাব বই (২) মিটিং বই (৩) উপস্থিতি বই (৪) সঞ্চয় খাতা (৫) কর্জ খাতা ইত্যাদি থাকবে। মিটিং বইতে উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর রাখা যেতে পারে। কি কি আলোচনা হ'ল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল তা মিটিং বইতে লিখে রাখতে হবে। কে, কবে, কত টাকা দিল, বাস্তবিক বা বার্ষিক কত সুদ হল তা সঞ্চয় খাতায় লিখে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে কর্জের খাতায় থাকবে কে, কবে কত টাকা ঋণ নিল বা ঋণ পরিশোধ করল, সুদ দিল তার বিবরণ এবং সেই মতো ঋণের টাকা আদায়ও করতে হবে।

কোন সদস্য যদি যথা সময়ে তার দেয় টাকা জমা বা শোধ দিতে না পারে তবে তার উপর বার্ষিক ন্যূনতম ২% হারে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক সুদ চাপবে এবং ঋণীকে তা অবশ্যই আদায় দিতে হবে।

যোগাযোগ

গোষ্ঠীর সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সমিতির বা ব্যাঙ্কের সঙ্গে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যোগাযোগ রেখে চলবে। এই তিনজনের মধ্যে যেকোন দুইজন যৌথভাবে টাকা পয়সা লেনদেন করতে পারেন। টাকা লেনদেন করার বেন্দোবস্তি করে সমিতি বা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে যাতে টাকা তোলার ক্ষেত্রে কোনরকম অসুবিধা না হয়।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

গ্রামের লোকজনদের মধ্যে এই ধরনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও কর্জের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা আনা ও তাঁদের বিষয়টি অবগত করানোর ক্ষেত্রে "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী" গঠন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সঞ্চয়ভিত্তিক ঋণ দানের মাধ্যমে এলাকার গরিব মানুষের আয় বাড়ানো ও তাঁদের অভাব অনটন দূর করাই এই প্রথা বহির্ভূত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার লক্ষ্য। দলগতভাবে ঋণ গ্রহণ ও সঞ্চয় সংগ্রহ এবং সুদসহ আসল ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে না। অনেক কম সময়ে অনেক বেশি লোকের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় এই "স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী"।

জীবন আবাদ

আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্যও গোষ্ঠী কাজ করতে পারে। সাক্ষরতা ও সার্বিক রোগ প্রতিরোধক অভিযানে, সাংস্কৃতিক ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানা সমাজ সেবামূলক ও সমাজ সচেতন কাজেও তাঁরা উদ্যোগী হতে পারেন। শুধু আর্থ সামাজিক বিষয় নয়, ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় নিয়েও সদস্যরা পারস্পরিক আলাপ আলোচনা করতে পারেন যার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে আন্তরিক, দৃঢ় ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। গান-বাজনা, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি চর্চা করার মধ্য দিয়ে সদস্যরা সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় যেমন যুক্ত হবেন তেমনি অসামাজিক অনৈতিক ও অশোভন কাজ থেকেও তাঁরা বিরত থাকতে পারবেন বলে এক সুখী, সমৃদ্ধশালী সচেতন সমাজ গড়ে উঠবে।

জাতীয় ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অবস্থান

১৯৯২ সালেই "পাইলট প্রজেক্ট" হিসাবে এই প্রকল্প চালু হলেও এর কার্যকারিতা দেখে ১৯৯৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একে এক স্থায়ী ব্যবস্থাপনার রূপ দেয় এবং বর্তমান গ্রামীণ গরিব মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক বেশি।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই ধরনের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণ দানের সংযোগ ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং বর্তমানে রাজস্থান ও উড়িষ্যাতেও খুবই জনপ্রিয় ও সফল হয়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই অভিযান সাফল্য লাভ করেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণে জোয়ার এসেছে। বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং নদিয়া জেলাতে এই গোষ্ঠী গড়ার কাজ বর্তমানে গতি পেয়েছে। অন্যান্য জেলাতে এই ধরনের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ার কাজ এগোচ্ছে। সমবায় সমিতিগুলি যদি এই উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা যদি সচেষ্ট প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন তবে আমরাও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারবো এবং সাফল্য লাভ করব। গ্রামীণ গরিব মানুষকে সংগঠিত ও সচেতন করার জন্য গ্রাম স্তরে এই বিষয়ের উপর আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের কয়েকটি স্লোগান

- ঋণ পাবার জন্য গোষ্ঠী নয় — স্বনির্ভর হওয়ার জন্যই গোষ্ঠী
- মুনাফাখোর মহাজনদের শোষণের হাত থেকে মুক্তির হাতিয়ার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী।
- স্বাক্ষরতা মানে সচেতনতা, মানে স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী শক্তি মানসিকতা।
- মহিলাদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা ও সঞ্চয় করার প্রবণতা বেশি। তাই পরিচালনায় মহিলাদের এগিয়ে আসা দরকার।
- স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী স্বয়ংচালিত। গোষ্ঠীর ভাবনা সর্বব্যাপক। তার প্রচার চাই।
- আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া, দুর্বল মানুষ, অনুন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নের হাতিয়ার এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। মানুষের কাছে একে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে।
- এই গোষ্ঠীর সংখ্যা যতই বাড়বে অন্ধ্রপ্রদেশ মডেল ততই ফলপ্রসূ হবে।

(লেখকের মতামতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব)

পরিবর্তিত কর্ণাটক রাজ্য সমবায় আইনের কয়েকটি দিক

★ সমবায় নিবন্ধন পদ্ধতির সহজিকরণ, ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধন এবং সমবায় হিসাবে গণ্যকরণ।

★ বাই-ল সংশোধন পদ্ধতির সহজিকরণ, তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধন এবং সংশোধিত বলিয়া গণ্যকরণ।

★ বাধ্যতামূলক বাই-ল সংশোধনের ক্ষমতা বাতিলকরণ।

★ জনস্বার্থে একত্রিকরণ, বিভাজন, পুনর্গঠন সম্পর্কিত আদেশদানে নিবন্ধকের ক্ষমতা বাতিলকরণ।

★ শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে সংখ্যাগত দিকের উর্ধ্বসীমা উত্তোলন।

★ নতুন একটি ধারা এই বিলে দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিচালক কমিটি নির্বাচন-এর আয়োজন করতে পারেন।

★ 'স্পেশাল অফিসার নিয়োগ' — সর্বাপেক্ষা ৬ মাসের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

★ সরকারি সাহায্য পায় না এমন সমিতিগুলি চার্টার্ড একাউন্টান্ট দ্বারা তাদের হিসাব পরীক্ষা করাতে পারবেন।

★ সংশোধনী বিলে নতুন ধারা যুক্ত হয়েছে যাতে নিবন্ধক কর্তৃক অনুসন্ধান (Enquiry) এর কাজ ৬ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে আরও ৬ মাস বাড়ান যাবে।

সৌজন্য : ডি লিঙ্ক

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ঐক্য, মনে ও পরিবেষণে প্রথম। কলকাতা পত্তনাধিকী হলে ২০ নভেম্বর আয়োজিত ৪৪তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিকাশনের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত অর্থনীতির গুরুত্বের হিসাবে সমবায় স্পর্শ ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে

হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713204
Phone : 0343 / 56-2393. 0343 / 56-4722

"প্রাণী সম্পদ" — একটি অর্থসংস্থানের উৎস —

শিপ্রা দাশগুপ্ত

গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে 'প্রাণী সম্পদ'-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আদিম মানুষ চাষের পরই শিখেছিল পশুপালন করতে। মানুষ পরম্পরাগতভাবে প্রাণী সম্পদের সঙ্গে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে নিজেরই প্রয়োজনে। বর্তমান যুগে এই প্রয়োজন আরও অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

ভারতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ পৃথিবীর ১১.২%। ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যা ২.৪%, গরু ও মহিষের সংখ্যা ১৮.৫%। প্রাণী সম্পদের সর্বমোট সংখ্যা ৪৩.৩ কোটি। হাঁস-মুরগি রয়েছে ৪১.৬ কোটি।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, গ্রাম-সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষরাই বেশি প্রাণী সম্পদের সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে এই প্রাণী সম্পদের একটি অন্যতম বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রাণী পালন বৃত্তি কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটি মানুষের কাছে কর্মসংস্থান ও অর্থোপার্জনের এক অন্যতম বড় উৎস। প্রাণী সম্পদ হল "গ্রামের গরিব মানুষের সম্পদ"। গ্রামের ৭০ শতাংশ প্রাণী সম্পদ পালিত হয় দরিদ্র, প্রান্তিক চাষী এবং কৃষি মজুরদের পরিবারে। কাজেই প্রাণী সম্পদের উন্নতির মাধ্যমেই সম্ভব গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষদেরও উন্নতি ঘটানো। 'সবুজ বিপ্লব' দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গ্রামের সম্পন্ন চাষীরা এর ছটা উপভোগ হয়েছেন, সাধারণ গরিব মানুষ ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা তেমন পাননি। তার প্রধান কারণ সম্পন্ন চাষিরা নিজস্ব চাষের জমিতে বিভিন্ন প্রকার আধুনিক চাষের উপকরণ ব্যবহার করতে পেরেছেন যা গরিব চাষী বা ভূমিহীনরা পাননি। জমির উন্নতি, চাষের উন্নতি এবং ফসলের উন্নতির জন্য উন্নত প্রযুক্তি এঁদের কাছে লাগেনি। কারণ আমাদের দেশের মোট জমির ৫০ শতাংশেরও কম জমি আছে এঁদের মালিকানায়। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা এক প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছে গেছি। বর্তমান চাষযোগ্য জমি কোনভাবেই আর বাড়ানো সম্ভব নয়। লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে এই পরিমাণ দিন দিন আরও কমবে। এছাড়া ভূসম্পদের আরও বিভিন্ন ব্যবহারে, যেমন নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, ঘরবাড়ি তৈরি ইত্যাদির ফলেও চাষযোগ্য জমি কমবে। কাজেই আমরা দেখি, কৃষি উৎপাদন বাড়লেও সমাজের দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে জমি না থাকলেও হাঁস, মুরগি বা গরু, মোষ কিছু না কিছু প্রাণী রয়েছেই। দেশের মোট প্রাণী সম্পদের প্রায় ৭০% এদের অধিকারে আছে। প্রাণী সম্পদের মাধ্যমে এরা যা পেতে পারি তা হল দুধ, মাংস, ডিম, উল এবং অন্যান্য পদার্থ। প্রাণী সম্পদ পালনে যে উন্নত প্রযুক্তি আছে তা আমাদের দেশে যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু এই প্রযুক্তি প্রয়োগের অনেক সুযোগ আছে। উন্নত দেশে গরুর দুধ দেবার ক্ষমতা বছরে গড়ে প্রায় ৫০০০ কেজি এবং আমাদের দেশি গরুর ক্ষমতা গড়ে ৪০০ কেজি যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে বৃদ্ধি ঘটিয়ে, গড়ে ২০০০ কেজিতে অন্তত সম্ভব।

আমাদের দেশি হাঁস যেখানে গড়ে এক বছরে ৫০/৬০টি ডিম দেয় সেখানে খাকি ক্যাম্পবেল এক বছরে ২০০/২৫০টি ডিম দেয়।

আমাদের দেশি ছাগল (ব্রিড বেরল গোট) একসঙ্গে দু-তিনটি বাচ্চা দেয় — কিন্তু এদের দেহের ওজন খুব কম। অপরদিকে 'যমুনা পারি', 'বিটল' জাতীয় ছাগলের দেহের ওজন বেশি। তাছাড়া এদের উন্নতমানের সঙ্করায়নের মাধ্যমে উন্নত জাতের প্রাণী পাওয়া সম্ভব।

প্রাণী সম্পদকে যুক্ত পরিকল্পনা মাফিক প্রতিপালন করা গেলেই এর মাধ্যমে অর্থসংস্থান সম্ভব।

১লা জুন ১৯৯৫-তে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাণী সম্পদ বিকাশ কর্মসূচি রূপায়ণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপের সূচনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু ও প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ, দুগ্ধ প্রযুক্তি বিভাগ, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের মাধ্যমে নিয়মিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজের মাধ্যমে এরা দেশে 'প্রাণী সম্পদ বিকাশ' কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার দিকে অনেক কার্যোদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই বৎসরই মার্চ মাস থেকে এঁরা এদের গবেষণালব্ধ বিষয়গুলিকে সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে পৌঁছে দিতে শুরু করেছেন। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি 'গ্রাম প্রতিপালন' (Village adoption) -এর মাধ্যমে কাজের শুরু। প্রতিপালিত গ্রামটির একটি সমীক্ষার দ্বারা তার জনসংখ্যা, জনপ্রতি জমির পরিমাণ, চাষ ব্যবস্থা, প্রাণী সম্পদ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ, প্রাণীসম্পদজনিত উৎপাদন, বিপণন ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি আছে কিনা বা গড়তে আগ্রহী কিনা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদেরই তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ দিয়ে এই সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হয়। সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে গ্রাম ভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ। প্রশিক্ষণের জন্য এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন নির্দিষ্ট প্রাণী পালন সম্পর্কিত হাতেকলমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (শিক্ষানুক্রম গ্রহণ একেকটি দিনের জন্য) দিয়ে শিক্ষা চলে। শিক্ষান্তে নির্বাচিত/উৎসাহী শিক্ষার্থীকে প্রাণী পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ (বাচ্চা) দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। সম্প্রতি এঁরা বারাসত ২নং ব্লক ও মেদিনীপুর জেলায় সং-এ কাজ করেছেন। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকে ৪টি জোনে ভাগ করে এঁরা সম্প্রসারণ কাজের জন্য কর্মশালা করার কথা ভেবেছেন। এর জন্য যে জায়গাগুলি তাঁরা বেছেছেন সেগুলি হল সাগরদীঘি এলাকায়- মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম এলাকায় — ঝাড়গ্রাম/পুরুলিয়া, সমতল ক্ষেত্র — মুর্শিদাবাদ, পার্বত্য এলাকায় — কালিম্পং। তিন মাস অন্তর অন্তর এইসব জায়গায় কর্মশালা করার প্রস্তাব আছে।

প্রাণী সম্পদ প্রতিপালনে উন্নত প্রযুক্তির বা অন্য কোন সহায়তার জন্য যে কোন সময়ে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। সাহায্যের জন্য এঁরা সর্বতোভাবেই সচেষ্ট এবং আগ্রহী। যোগাযোগের ঠিকানা —

অধিকর্তা
গবেষণা, সম্প্রসারণ ও খামার পরিষেবা
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
৩৮, খুদিরাম বসু সরণি
কলিকাতা -৭০০ ০৫৭
দূরভাষ -৫৫৬-৩৩১৬

এ বৎসর সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন "গ্রামাঞ্চলে প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্যচাষ, ফল প্রভৃতির কাজ কিছু কিছু হচ্ছে, কিন্তু সংগঠিতভাবে হচ্ছে না। সমবায় ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে সমবায় গঠনের মাধ্যমে এইসব কাজে বেকার যুবকরা এগিয়ে আসতে পারেন।" পরম্পরাগতিক চাষ বাসের সুযোগ কম এবং তাতে বর্তমান যুবকদের তেমন আগ্রহ বা ইচ্ছা নেই। সেক্ষেত্রে তাঁরা সমবায় করে পশুপালন, মৎস্যচাষ করতেই পারেন। প্রতিপালনের বিষয়টি যদি যথাযথভাবে শিখে নেন তবে কাজের অনেক বেশি সুবিধা হবে।

❑

[তথ্যসূত্র : ডঃ ডি এন জানা, ডিরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়।]

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে
গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, শেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

ফোন : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ ★ ফ্যাক্স : ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয় — কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহণের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭.২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হতে — সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা

১) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ১১৭.২৫ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৬১.৬৭ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে, ৪৬.০৮ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৯.৫০ কোটি।

২) কৃষি, অকৃষি ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে গত বছরের সর্বমোট লগ্নি ৬৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ও পরিবহণে গত চার বছরে আমাদের লগ্নি ৫৮ কোটি টাকা।

৩) গ্রামে কিংবা শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ দানে আমরাই অগ্রণী — এখনও পর্যন্ত লগ্নির পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

৪) আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য কোন ঋণ দাবি করি না, কারণ আমাদের ঋণ গ্রহণের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে না।

৫) সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না। আয়কর আইনের ১৯৪ ধারা অনুযায়ী স্বল্প সঞ্চয় পত্র ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে এই সুযোগ নেই।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ	প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য	সরল দেব
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	*ভাইস-চেয়ারম্যান*	*চেয়ারম্যান*

বনসৃজন — একটি সামাজিক দায়িত্ব

অসিতবরণ নাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"দাও ফিরে সে অরণ্য ___'

আমরা নগর ছেড়ে অরণ্য সভ্যতায় ফেতে পারব কিনা জানি না, তবে আমাদের রাজ্যে কিন্তু প্রতি বছর জুলাই-আগাস্ট মাসজুড়ে ব্যাপক হারে গাছ লাগানো হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি, জনসাধারণ, গ্রাম পঞ্চায়েত, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ-গ্রহণ করে থাকে। তথাপি দেখা গেছে যে, পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবজনিত সমস্যায় গ্রামীণ বা সামাজিক বন তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারছে না।

তাই এসবক্ষেত্রে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি যদি সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামাঞ্চলে স্থিত সমবায় সমিতিগুলি সচেষ্ট হয় ও সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করে তাহলে, গ্রামীণ বন প্রকল্প অচিরে সার্থক হয়ে উঠবে বলেই আমার ধারণা।

গ্রামীণ বা সামাজিক বন বলতে কী বোঝায় । নিজেদের প্রয়োজনে রাস্তার দু ধারে গাছ লাগানো কিংবা সেচখালের দু'ধারে, অনাবাদী পতিত জমিতে, পুকুরের কিনারে, নদীর দুপাড়ে, স্কুল, কলেজ ও চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণে নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে কিংবা পতিত জমিতে, জমির আলে, প্রতিবেশীর পতিত জমি ইত্যাদিতে গাছ লাগিয়ে যে বন তৈরি হয়, সেই বনকেই গ্রামীণ বন বা সামাজিক বন বলা যেতে পারে।

প্রকল্পের লাভজনক দিক । সমবায়ের মাধ্যমে তৈরি এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের জনসাধারণ ও চাষিদের জন্য কয়েক হাজার শ্রম দিবস তৈরি করা সম্ভব। যে সকল ব্যক্তি নার্সারির মাধ্যমে চারা তৈরি করেন, যেমন নদিয়া, বেলিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তারা আর্থিক লাভের মুখ দেখতে পাবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো বন সম্পদ তৈরি করে ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানির ব্যবস্থা সংরক্ষিত করতে পারে। তাছাড়া গ্রামীণ বন পতিত জমিকে ও অর্থকরী জমিতে রূপান্তরিত করে। এছাড়া সামাজিক বন (Social Forestry) পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে ও তুলিক্ষয় নিবেধ করে।

প্রকল্পে অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা । সমবায়ের মাধ্যমে বন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক চাষিভাইদের জন্য প্রকল্প তৈরি শুরু করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, পরিবর্ধন এবং সরল সুদে ঋণদান দিয়ে থাকেন। জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD) ও এ বিষয়ে প্রকল্প তৈরি ও রূপায়ণে সহায়তা করে থাকেন।

কী কী গাছের চারা লাগানো যেতে পারে । এই প্রকল্পে সাধারণত ইউক্যালিপটাস আকাশমণি, সুবাবুল, অর্জুন, বাবলা, শিশু, গামার, সজিনা ও কাঁঠ গাছের কয়েকটি প্রজাতি মাটির রকমফের অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো যেতে পারে। তবে কিছু কিছু সংশয় এখনও অনেক মানুষের মনে রয়ে গেছে যেমন জমির আলে গাছ লাগালে ফসলে ছায়া পড়বে, ধান-গম ইত্যাদি ঠিকমত বাড়বে না ও ফলন কমে যাবে। তাছাড়া বড় গাছের শিকড় জমির উর্বরতা ও জল শুষে নেবে, ডালপালা ফসল নষ্ট করবেও পাখিরা উপদ্রব সৃষ্টি করবে।

এক্ষেত্রে একটু ভেবে দেখলেই কিন্তু অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব। জমির আলে এমনভাবে গাছ লাগাতে হবে যাতে তা পাশের ফসলে ছায়া ফেলতে না পারে। এমন প্রজাতির গাছ লাগাতে হবে যারা শিকড় মাটির গভীরে চলে যায়। এছাড়া গাছের পাতা, পাখির বিষ্ঠা প্রভৃতি জমিতে পড়লে জমির কোন ক্ষতি হয় না, কারণ ওগুলো তাড়াতাড়ি সহজেই পচে যায় ও Farmyard manure-এর রূপে মাটির জৈব পদার্থ বাড়িয়ে জমিকে উর্বর করে তোলে।

গাছ কীভাবে লাগাবেন । এইসব গাছ যদি জমির আলে লাগানো হয় তাহলে দুই থেকে তিন মিটার অন্তর অন্তর লাগালেই শ্রেয়। গাছের শিকড় 'প্রধান মূল' জাতীয় এবং অনেক দূর বিস্তারী হয়। অপরদিকে ধান, গম, পাট ও অন্যান্য ফসলের শিকড় 'গুচ্ছ জাতীয়' হয় এবং তা উপরের মাটির ৩০-৪৫ সেমি থেকেই খাদ্যরস আহরণ করে। সেইজন্য দেখা গেছে যে জমির ফসলদের যে টনিকোজেন সৃষ্টির জন্যে আমরা সার দিয়ে থাকি তা এক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। সুবাবুল, বাবলা, অর্জুন গাছের পাতাও খুব নরম ও সহজেই পচনশীল, যা পড়ে গিয়ে জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে ও মাটির উর্বরতা বাড়ায়। গাছের ছায়া জমিতে যাতে না পড়ে তার জন্য গাছ একটু দূরে দূরে লাগালেই হয় আর প্রয়োজনে অধিক ডালপালা ছেঁটে দিলেই আর ছায়া পড়ে না। মনে রাখতে হবে — গাছ ফসলকে প্রখর রৌদ্রতাপ, ঘূর্ণো ও ঝড় থেকে রক্ষা করবে এবং গাছের পাখিরা ফসলের পোকা মাকড় খেয়ে ফসলের অনিষ্টকারী কীট কমল ও নির্মূল করে থাকে

একটি আনুমানিক পরিকল্পনা । এবার একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে আনুমানিক সম্ভাব্য লাভক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এক হেক্টর জমির আলে মোটামুটি যদি চারশত মিটার ধরা হয় আর যদি দুই মিটার অন্তর অন্তর গাছ লাগানো হয়, তাহলে ২০০টি গাছ লাগানো সম্ভব যদি আকাশমণি, সুবাবুল, ইউক্যালিপটাস কিংবা শিশু ইত্যাদি গাছ লাগানো হয়, তবে প্রথম বৎসর কোন লাভই পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় বৎসর থেকে ডালপালা ছাঁটাই করে জ্বালানি কাঠ বিক্রিবাবদ কিছু আয় পাওয়া যাবে। তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে অঙ্ক নিম্নলিখিত হবে —

বৎসর	হার	পরিমাণ	আনু. মূল্য (টাকা)	মন্তব্য
প্রথম	—	কোন আয় হবে না	০.০০	চারাদির -
দ্বিতীয়	গাছ প্রতি ৫ কিলো	১,০০০ কিলো	১০০০.০০	মূল্যমূচকে
তৃতীয়	গাছ প্রতি ১০ কিলো	২,০০০ কিলো	২০০০.০০	পরিবর্তিত
চতুর্থ	গাছ প্রতি ১৫ কিলো	৩,০০০ কিলো	৩০০০.০০	
			৬০০০.০০টা	
পঞ্চম	টা. ১০ হিসেবে দুইশত খুটির মূল্য		১৮০০০.০০	
		সর্বমোট আয়	২৪০০০.০০টা.	

এই আয় কিন্তু মূল কৃষি কাজের থেকে পাওয়া আয় নয়। এটা হচ্ছে মূল কৃষিকাজের বাইরে অতিরিক্ত আয়। তবে বর্তমান বাজার ও পরিস্থিতি অনুযায়ী লভ্যাংশের পরিমাণে তারতম্য হতে পারে। সেটা বড় কথা নয়। যদি সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনকে কাজে লাগিয়ে, সমবায়ের সাথে সাথে অধিক হারে শ্রমনিবিড় বৃদ্ধি, পতিত ও অনাবাদী জমি চাষ, জ্বালানি সমস্যার সমাধান, পরিবেশের উন্নতি-সাধন ও শস্যের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ নির্মূল ইত্যাদি করা যায়, তবে কৃষি ঋণ কিংবা গ্রামীণ ঋণ প্রকল্প নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সার্বিক উন্নয়ন মানেও কিন্তু তাই। আর সব কিছু নিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নে এগিয়ে যেতে হলে সমবায় ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

□

খরা-বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা

এ বছর পশ্চিমবঙ্গে উত্তরাঞ্চলের ৪টি জেলা বন্যা ও পশ্চিমাঞ্চলের তিনটি জেলা খরার কবলে পড়ায় চলতি খরিফ মরশুমে চাষে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ টন যার মূল্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১২০ কোটি টাকা এবং বাকী অংশ খরাজনিত। শস্যের মধ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শীতকালীন আমন ধান যা টাকার অঙ্কে দাঁড়ায় প্রায় ১৭০ কোটি। ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য শস্যের মধ্যে আছে পাট, বিভিন্ন ডাল, সব্জী ও নানা ধরনের অন্য শস্য।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও কুচবিহার জেলায় প্রায় ২.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে বন্যার সকল ধানচাষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতির পরিমাণ সব থেকে বেশি মালদা জেলায় যেখানে ১.৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যান্য জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ চাষ জমির পরিমাণ মুর্শিদাবাদে ৪৬,০০০ হেক্টর, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪৫,০০০ হেক্টর ও কুচবিহারে ২০,০০০ হেক্টর।

অগাষ্ট মাসের শেষ দিকে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্যে এবছর উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে বন্যার জল নামায়। কিন্তু অংশে বৃষ্টির অভাবে ধানচাষ করা সম্ভব হয়নি। এই অনাবাদি জমির পরিমাণ ১০.৬৬ লক্ষ হেক্টর যা মোট ধানচাষের জমির প্রায় ৫০ শতাংশ।

এইসব অঞ্চলে পরবর্তী সময়ে বর্ষা নামলেও ফসল বুনতে ইতিমধ্যে দেরী হওয়ায় অঞ্চলে চাষ করা সম্ভব হয়নি, সেসব অঞ্চল চাষের আওতার বাইরেই থেকে গেছে।

ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ নদিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কিছু অংশে নতুন করে বন্যা দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন শস্যের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বছরের তুলনায় এ বছর শীতকালীন ধান চাষের পরিমাণ ২০ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে এ রাজ্যে উৎপাদিত শীতকালীন ধানের পরিমাণ হ'ল ১৩৩.৭ লক্ষ টন যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ৫ লক্ষ টন বেশি। ১৯৯৮ সালের খরিফ মরশুমে ৫২.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমি ধান চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল।

চলতি মরশুমে উৎপাদিত বিভিন্ন শস্যের যে সম্ভাব্য পরিমাণ ধরা হয়েছে তা হ'ল, আউস ধান ১০ লক্ষ টন, ডাল ৬৯,০০০ টন ও তৈলবীজ ১২,০০০ টন। এই সময়কার তৈলবীজ হ'ল তিল ও বাদাম। এ রাজ্যে মোট তৈলবীজ ও ডালের ৭০ শতাংশে উৎপাদনই হয় মার্চ-এপ্রিল মাসে।

পাট পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান ফসল। এই মরশুমে সম্ভাব্য পাট চাষের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫২ লক্ষ বেল (১ বেল = ১৮০ কিলোগ্রাম)। গত বছর এই পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ বেল। গত ২ বছর যাবৎ কাঁচা পাটের ভাল ভালো দাম পাওয়ায় পাট চাষের দিকে ঝোঁক বাড়ছে। ফলে ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে পাট চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৬.২ লক্ষ হেক্টর, সেখানে পরবর্তী বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৫ লক্ষ হেক্টর।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল ১.৫ লক্ষ টন ধানবীজ চাষের জন্য বিতরণ করা হবে। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন অংশে খরাজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় এই পরিমাণ ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

উচ্চফলনশীল ধান চাষের জমির পরিমাণও এরাজ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর এই বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ শতাংশ। চলতি মরশুমে শীতকালীন ধান চাষের মোট জমির ৭৫ শতাংশই এই উচ্চফলনশীল ধান চাষের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আউস ধানের ক্ষেত্রে এই উচ্চফলনশীল ধান চাষের পরিমাণ প্রায় ৯৮ শতাংশ।

১৯৯৮ সালের খরিফ মরশুমের জন্য নির্দিষ্ট ইউরিয়া সারের পরিমাণ ছিল ৪.৬ লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বছরে এই পরিমাণ ছিল ৪.৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে ইউরিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ১৩ শতাংশ। অন্যান্য সারের ব্যবহার হ'ল, ডি এ পি ১.৫ লক্ষ টন, এস এস পি ১.৫ লক্ষ টন ও এম ও পি এক লক্ষ টন। পূর্ববর্তী বছরে এই সারের ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১.২৭ লক্ষ টন, ১.০৬ লক্ষ টন ও ৭০,০০০ টন। এম ও পি সারের ব্যবহার ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ৪০,০০০ টন এম ও পি সারের ঘাটতি এই সময় থেকে যায়।

১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত এরাজ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৫৪.৫০ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ১৩.৮৭ লক্ষ হেক্টর জমির সেচ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে চলতি মরশুমে। কিন্তু এই সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার হয়েছে ১২.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে যার অর্থ চাষ করা হয়েছে এমন মোট জমির মাত্র ২২ শতাংশে জমিতেই সেচের পূর্ণ সুযোগ মিলেছে।

[সূত্রঃ দি ইকনমিক টাইমস্- ১৩-১১-৯৮]

গণতন্ত্রে দাবি আদায় করার জন্য আন্দোলন করার অধিকার আছে। আন্দোলন করার যতগুলি পদক্ষেপ আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অবরোধ। পথ পরিবহন অবরোধ করে তার পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া। অবরোধের ফলে সত্যিই কি কোন উপকার পাওয়া যায়! যতটা উপকার হয় তার বহুগুণ বেশি অপকারই হয়। হঠাৎ অবরোধের ফলে মানুষ হয়রানির শিকার হয়। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে যাবতীয় অবরোধ নিষিদ্ধ করার আর্জি জানিয়ে জনস্বার্থের মামলা হয়। অস্থায়ী বিচারপতি সমীরকুমার মুখার্জি এবং ডি পি সরকারের এজলাসে মামলাটি দায়ের হয়। ৯ই নভেম্বর এর প্রথম শুনানী হয়েছে।

সূত্র ঃ আজকাল ৬-১১-৯৮

জানা দরকার

আয়োডাইজড লবণ — স্বাস্থ্যকর জীবন লাভের উপায়

আয়োডিন একটি অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান। এই মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টটি মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিকাশে অতি অল্প পরিমাণে (দৈনিক ১০০-১৫০ মাইক্রো গ্রাম) প্রয়োজন। দেহে থাইরয়েড হরমোন প্রস্তুতিতে তা ব্যবহৃত হয়। ভ্রূণস্থ অবস্থা থেকে পরিণত জীবনের বিভিন্ন সময়ে আয়োডিনের ঘাটতি মানুষের শরীরে নানা বিকৃতি জন্ম দেয়।

আমরা যে খাবার খাই মোটামুটিভাবে তার থেকেই ১০ শতাংশ আয়োডিন পেয়ে যাই। বাকিটা আসে জলপানের মাধ্যমে। মনুষ্যদেহে কি পরিমাণ আয়োডিনের সরবরাহ হচ্ছে তা নির্ধারিত হয় মাটিতে থাকা আয়োডিন-উপাদানের পরিমাণ থেকে।

ঠিকমত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অথবা খাদ্যের আয়োডিন শরীরে ঠিকমত ব্যবহৃত না হলেও মানবের শরীরে আয়োডিনের অভাব দেখা দিতে পারে।

আয়োডিনের অভাব থেকে যেমন গলগণ্ড হয় তেমনি ঘটে গর্ভপাত, মৃত শিশুর জন্ম, স্বাভাবিক থেকে কম বৃদ্ধি, কথা বলা বা শোনায় প্রতিবন্ধকতা, বামনত্ব, স্নায়বিক ত্রুটি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়ায় বিলম্ব ও দুর্বলতা প্রভৃতি। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলিতে এ সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাদের আগে ধারণা ছিল যে কেবলমাত্র হিমালয় অঞ্চলেই গলগণ্ড বা আয়োডিনের অভাবে জনিত রোগ সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন সব অঞ্চলে এমনকী তরাই ও কেরালার সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাতেও গলগণ্ড রোগ যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যাচ্ছে। বর্তমান হিসাবমত মানবের দেশে প্রায় ২৩ কোটি লোকের ক্ষেত্রেই এই বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। এদের মধ্যে ৬ কোটি লোক গলগণ্ডে ভুগছে।

সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার ১৯৬২ সালে জাতীয় গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করে। পরে প্রকল্পটির নতুন নামকরণ হয় **ন্যাশনাল আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম** (এন আই ডি ডি সি পি)। কর্মসূচিতে প্রথম জোর দেওয়া হয় আয়োডিন বিহীন লবণের ব্যবহার বন্ধ করে আয়োডিন যুক্ত লবণের ব্যবহার বাড়ানোর উপর। এছাড়া আয়োডিন যুক্ত লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয়োডাইজড লবণ ব্যবহারের পক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। ক্রমশ আয়োডিন যুক্ত লবণ উৎপাদন বেসরকারিকরণ করা হয়। প্রতিটি রাজ্যে আই ডি ডি নিয়ন্ত্রণ সেল ও মনিটারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলিকে বলা হয়েছে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় আয়োডাইজড লবণকে অন্তর্ভুক্ত করতে। ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আয়োডিনবিহীন লবণ বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে আংশিকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কেরল এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

আয়োডিন ঘাটতি মেটানোর পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী, সুবিধাজনক ও অর্থকরীভাবেও উপযোগী হল আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহার।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতি অনুযায়ী আগামী ২০০০ সাল নাগাদ আই ডি ডি. ১০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

[সূত্র : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।
ভারত সরকার - ২৬-১০-৯৮]

কিড্‌নির চিকিৎসায় নতুন সংস্থা

কিড্‌নির নানা সমস্যায় যারা ভুগছেন, তাদের জন্য একটি সুখবর আছে। এর কাছে, তার কাছে, এই সংস্থায়, ঐ হাসপাতালে আর ছোটাছুটি করতে হবে না। আগামী বছরই কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে ওখ্‌হার্ট (Wockhardt) সংস্থার উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ওখ্‌হার্ট হসপিটাল এ্যাণ্ড কিড্‌নি ইনস্টিটিউট (Wockhardt Hospital & Kidny Institute) যেখানে কিড্‌নি সংক্রান্ত সমস্ত অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। উদ্যোগী সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি হাবিল এফ্ খোরাকিওয়ালা জানিয়েছেন, এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হবে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা এবং এটিই হবে দেশের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম কিড্‌নি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসংস্থা।

সূত্র। দি ইকনমিক টাইমস্ (১০-১১-৯৮)

ফোন নং — ২২৪৬

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১ সমবায় আন্দোলনের প্রসার
২ ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা
৩ ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৪৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১ বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রকল্প, মৎস্যচাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, মেরামতি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩ এই ব্যাঙ্ক ডাইরেক্টর বিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, মোহনপুর, ফাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই
আজ প্রার্থিত —
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের **দিঘা, পুরী, দার্জিলিং ও গ্যাংটক**-এ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ নিবাসের (হলিডে হোম) সুবিধা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭৫ বৎসর ধরে (১৯২৪-১৯৯৮) সাধারণের পরিষেবায় উজ্জ্বল নজির সৃষ্টিকারী এই ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চায়। মাখলা ও হিন্দমোটর-এ দুটি শাখা কেন্দ্র (ব্রাঞ্চ) খোলার সিদ্ধান্ত সেই আকুতিরই ফলশ্রুতি।

নন্দ গোস্বামী
সভাপতি

মদনকুমার বণিক
সম্পাদক

উত্তরপাড়া, হুগলি
পিন ঃ ৭১২ ২৫৮
ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

For Standard Quality + Correct Weight + Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET *NEAR NEW MARKET* *&* *GOVT. FOOD DEPT*	**HAZRA ROAD** *NEAR* *JATIN DAS PARK*	**MANIKTOLA** *OPPOSITE* *BIHAN SISHU UDYAN*
RASH BEHARI AVE. *OPPOSITE* *PRIYA CINEMA HALL*	**C. R. AVENUE** *OPPOSITE* *L.I.C. BUILDING*	**EKDALIA RD.** *UNDER* *BIJAN SETU*
HATIBAGAN *NEAR* *RADHA CINEMA*	**B. K. PAL AVE.** *CROSSING OF* *RABINDRA SARANI &* *B. K. PAL AVE.*	

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA - 700 026

PHONE : 475-5566 / 475-2390

সংবাদপত্রে প্রকাশিত "সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন" সংবাদ

রাজ্যের উন্নয়নে গতি আনতে পারে সমবায় ক্ষেত্র ঃ ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৮ই নভেম্বর — প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করুক সমবায় দপ্তর। বুধবার এই মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গত ২২ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য গ্রামাঞ্চলের অগ্রগতি। আর এর সিংহভাগই হয়েছে বাড়তি ফসল উৎপাদনের নজির দিয়ে। পাশাপাশি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্যচাষ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলিতেও দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু একে আরও গতি দিতে পারে সমবায় ক্ষেত্র। এবং তা সম্ভব, প্রত্যেকটি দপ্তরের উৎপাদনের প্রশ্নে যৌথ পরিকল্পনা গ্রামিক এলাকার মধ্য দিয়ে। এদিন 'সারা ভারত সমবায় সপ্তাহ পালন' উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে এক অনুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত রাজ্যের অর্থনীতিতে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকগুলি বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে উৎপাদন যে বাড়তি মাত্রা পেয়েছে, তা সমবায়ই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। আর সমবায়কে আরও গতিশীল হওয়ার কথা বলেন সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল। অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৭১ হাজার ৮২৯ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কগুলি তাদের লভ্যাংশ অর্থমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, পৃথিবীর এখন এক গভীর অসুখ। সারা পৃথিবী জুড়েই মন্দাভাব। আমাদের মতো গরিব দেশগুলিতে তা আরও প্রকট। এর উপর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বোমা ফাটিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা গরিব মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আর এই উন্নয়নে সমবায়ের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্যচাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সমবায় নিতে পারে বড় ভূমিকা। ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও এরা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তিনি বলেন, বাজারে ১৪টা জিনিসের দামই আগুন। দাম বাড়ছে সমস্ত দেশেই। অবশ্য কারো কারো ভাবখানা এমন, দাম বাড়ছে শুধু এরাজ্যেই, আর দিল্লিতে ফুলের সৌরভ বেরোচ্ছে। এ অবস্থায় শক্তিশালী সমবায় ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। সেই সঙ্গে সাধারণ, গরিব ঘেটে-খাওয়া মানুষকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে এদের কার্যকরী ভূমিকা।

অসীম দাশগুপ্ত বলেন, আমাদের যাত্রা শুরু ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমরা এখন দেশের মধ্যে প্রথম, এমনকী পঞ্জাবকে ছাড়িয়েও। সারা দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির গড় হার যেখানে ২.৮ শতাংশ, আমাদের রাজ্যে তা ৪.৮ শতাংশ আর এই উন্নতির শুরু গ্রামাঞ্চলের ঘেটে-খাওয়া কৃষকদের ঋণ দানের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি সেন কমিটির রিপোর্ট বলছে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কগুলি সংস্থাগুলির অন্তত ১০০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া উচিত। অথচ, সেনের রিপোর্ট অনুযায়ী ওরা দিয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা, যেখানে একই সময় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছে ৫০০ কোটি টাকার মতো। তিনি বলেন, কি-বছর নয় হাজার কোটি টাকা মতো শিল্প পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে এরাজ্যে এবং ৮.৯ শতাংশ হারে তা বাড়ছে। আমরা বলি, শিল্পের জন্য হচ্ছে কৃষি ধর্তে। কিন্তু এখনও এরাজ্যে ২০০টির মতো উদ্বৃত্ত চালকল রুগ্ন। প্রয়োজন আরও হিমঘরের। এর মালিক যে হবে। আমরা চাই মালিক হোক সমবায়।

তিনি বলেন, এরাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির ৪ হাজারেও বেশি শাখা ছড়িয়ে আছে। আমানত আছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এর কতটা ওরা বিনিয়োগ করছে? এরাজ্যে ওদের ঋণ আমানতের পরিমাণ মাত্র ৪৫ শতাংশ। যেখানে সারা দেশে এর গড় ৭৫ শতাংশ। তাহলে এটা বলা কি অন্যায় হবে, আমাদের টাকা ওরা অন্য রাজ্যে চালান করে দিচ্ছে? অথচ সমবায়ের ঋণ আমানতের হার ৭০ শতাংশ। পাশাপাশি এখানে আমানতের পরিমাণও বাড়ছে। ১০ সালে যেখানে ছিল ৮০০ কোটি টাকা, '১৭ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৫০০ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃপক্ষের কড়া সমালোচনা করে অসীমবাবু বলেন, ঋণবৃদ্ধি প্রকল্পগুলি নিয়ে ওরা অবহেলা দেখাচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে বিদেশিদের পর ওদের এখানে জমা রাখা সব টাকা তুলে নেওয়ার কথা আমাদের ভাবতে হবে।

ভক্তিভূষণ মণ্ডল বলেন, '৮৪ সালের সমবায় আইন সংশোধন করতে আমরা আগ্রহী। '১১ এর গোড়ার দিকেই এই আইন আমরা সংশোধন করবো। অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সভাপতি অশোক ব্যানার্জি, সমবায় সচিব বি কে বিশ্বাস, এ কে পুরকায়স্থ, শম্ভুনাথ বসু প্রমুখ।

গণশক্তি (১৯-১১-৯৮)

সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন ঋণের প্রশ্নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে একহাত নিলেন বুদ্ধ-অসীম

এই রাজ্যে সাধারণ মানুষকে ঋণ দেওয়ার প্রশ্নে ক্রমাগত বঞ্চনা ও হয়রানির অভিযোগে রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং অসীম দাশগুপ্ত একযোগে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ঘোষণা করলেন। এই রাজ্য থেকে মোটা টাকা আমানত সংগ্রহ করেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেওয়ার হার খুবই নগণ্য। মহাজাতি, ওরিয়েন্টাল, কর্পোরেশন ইত্যাদি ব্যাঙ্কের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে ঋণের প্রশ্নে সেই টাকা অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে খোলাখুলি এই অভিযোগ তুলিয়ে রাজ্যের পুলিশ এবং তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুধবার বলেছেন, একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। সমবায় ব্যাঙ্কের উচিত সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা। রাজ্যের ক্ষুদ্র চাষী, ছোট শিল্পোদ্যোগী, মধ্যবিত্ত মানুষ এবং স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে কেবল বুক-বুবটারা যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ পান তার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিবর্তে সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্য তিনি সকলের উদ্যোগ আহ্বান জানান। এই সঙ্গে উৎপাদনের প্রশ্নে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য সহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা যৌথ উদ্যোগ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন বুদ্ধদেববাবুর মতে, গ্রামাঞ্চলেরো মূল্যবৃদ্ধি করতেও সমবায়-এর একটা বড় ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে সমবায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে ভাবতে হবে।

পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুর থেকে অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে এদিন সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন , সাধারণ মানুষকে ঋণ দেওয়ার প্রশ্নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দীনা অতিক্রম করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিকেন করা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে। আর নয়। অসীমবাবু পরিষ্কারভাবে এই দিন বুদ্ধদেববাবুর উপস্থিতিতে ওই অনুষ্ঠানে রীতিমত ঘোষণা করে দেন আগামী ৩১ ডিসেম্বরের পর স্বনির্ভর প্রকল্পে রাজ্য সরকারের ভর্তুকি বাবদ যে টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে মজুত থাকে তা তুলে নিয়ে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে রাখা হবে। বুদ্ধদেববাবুর মত তিনিও সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আগামি দিনে সমবায় ব্যাঙ্কই হবে এই রাজ্যের

সাধারণ মানুষের নিজস্ব ব্যাঙ্ক। তাঁর কথায় সমবায় ব্যাঙ্কের সাধারণ মানুষের জন্য থেকে আমানত সংগ্রহ করে এই ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র চাষী, শিল্পোদ্যোগী, বেকারদের ঋণদিতরের জন্য প্রয়োজনীয় জল দেবে। সমবায়ের কর্তাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর খোলাখুলি পরামর্শ বাড়ি বাড়ি লোক পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে সমবায় ব্যাঙ্কের সুফলের কথা বোঝান। এই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী প্রত্যেকটি পুরসভায় একটি করে সমবায় ব্যাঙ্ক চালু করারও পরামর্শ দেন। ব্যাঙ্ক খোলার পরামর্শ দিয়েই অসীমবাবু থেমে থাকেননি। বেসরকারি সাক্ষর ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সমক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্ক যাতে চলতে পারে তার জন্য অর্থমন্ত্রী শনিবার রাতে ও রবিবার সমবায় ব্যাঙ্ক খোলা রাখার পরামর্শও দেন। তাঁর আরও পরামর্শ সমবায় ব্যাঙ্কে সামাজিক চুক্তিতে লোক নিয়োগ করুন। সম্ভব হলে মহিলাদের বিশেষ করে কাজে লাগান। বস্তুত, অনেক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে মহিলারা অনেক বেশি কর্মঠ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল সমবায়ের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে কিছুটা দুঃখের সুরে বলেন, ১৯৭৮ সাল থেকে কাজ করে সমবায়ের সুবিধা লিখতার মানুষকে ৫০ হাজার বেশি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এর পিছনে নানা কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। আগামী বছরে সমবায় আইনের কিছু সংশোধন করা হবে বলেও তিনি এদিন জানান।

'প্রতিদিন' - (১৯-১১-৯৮)

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করল রাজ্য

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে বুধবার এক সভায় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত জানিয়েছেন ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা হবে। এরপর ঋণমুক্ত প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ভর্তুকির যে টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে রাখে তা তুলে নিয়ে সমবায় ব্যাঙ্কে রাখবে। অসীমবাবু বলেন, বকেয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রায় চার হাজার শাখার চল্লিশ হাজার কোটি টাকা লোকে জমা রাখে। অথচ, ঋণ হিসেবে এ রাজ্যের মানুষ পান এর মাত্র ৪৫ শতাংশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদিকতা হলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও এর আগে এ রাজ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুতে প্রায় ৮০ শতাংশ ঋণ দিতে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা ৪০ শতাংশে ৪০ শতাংশে নেওয়ার তীব্র সমালোচনা করেন বুদ্ধদেববাবু। অসীমবাবু এবার বকেয়া শোধ করতে গিয়ে একেবারে তুলোধোনা করেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিষয়ে রাজ্য সরকারের পরবর্তী মনোভাব কী হবে, তা পরিষ্কার করে দেন তিনি। বলেন, ঋণমুক্ত প্রকল্পের টাকা পেতে দিনের পর দিন এইসব ব্যাঙ্ক বেকারদের ঘোরায়। টাকা দেয় না। বার বার এ বিষয়ে আমরা চিঠি লিখেছি, কোনও ফল হয়নি। প্রতি বছর প্রায় ৫০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ভর্তুকি হিসেবে এ সব ব্যাঙ্কে রাখে। ৩১ ডিসেম্বরের পর তা তুলে সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে। অসীমবাবু এদিন দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদেরও আক্রমণ করেন। বলেন, সমীক্ষে যে রিপোর্ট পেশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ঋণ নিয়ে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে এঁরা ঋণ শোধ করেন না। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি পুরসভায় নতুন করে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে। জোরের সঙ্গে বলেন, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক হবে সমবায় ব্যাঙ্ক। ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী, কৃষক এদের ঋণ দেয় সমবায় ব্যাঙ্ক। বৃদ্ধবাবু বলেন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামের রাশ টানতে পারে সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমে বণ্টন হলে এই দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এদিন সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল বলেন, ৮৪ সালের সমবায় আইনের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। '৯৯-এর গোড়ায় তা সংশোধন করা হবে।

আজকাল - (১৯-১১-৯৮)

সারে ভর্তুকি

ফসফেটিক সারের উপর ভর্তুকি দেবার ব্যাপারে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের সঙ্গে বি আই সি পি-র (ব্যুরো অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস) মত পার্থক্য ঘটেছে। বি আই সি পি-এর মতে দেশির সার উৎপাদক সংস্থা যারা ডি এ পি প্রস্তুত করে তাদের বর্ধিত ব্যয়ের কারণে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে করতে হবে টনপ্রতি ৪৮০০ টাকা এবং ফলশোধের সময়সীমা করতে হবে ১৮০ দিন। কিন্তু কৃষিমন্ত্রকের সিদ্ধান্ত হল ভর্তুকির পরিমাণ হবে টন প্রতি ৪১২০ টাকা। আবশ্যকীকৃত ডি এ পি ও এম পি সারের ক্ষেত্রে এই ভর্তুকির পরিমাণ স্থির করা হবে প্রতি দু মাস অন্তর এবং ১৮০ দিনের পরিবর্তে ফলশোধ করার সময়সীমা হবে ৪৫ দিন।

[সূত্র। দি ইকনমিক টাইমস, ৮-১১-৯৮]

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক চার দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের 'আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা' বিষয়টিকে নির্বাচিত অঞ্চলভিত্তিক মুক্ত আলোচ্য বিষয় হিসাবে।

ব্যাঙ্কের অধীনস্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে ঠাঁরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

* ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠান হয় মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়াম হলে।
* ১৬ নভেম্বরের অনুষ্ঠান কাঁথিতে দেবেন্দ্রমোহন হলে আয়োজিত হয়।
* ১৮ নভেম্বর-এর তৃতীয় অনুষ্ঠানটি হয় খড়গপুরের রবীন্দ্র ইনস্টিটিউটে।
* ২০ নভেম্বরের অনুষ্ঠান বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এবং এরজন্য নির্মীয়মান কমিটিও হলে।

প্রতিটি অনুষ্ঠানেই সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য ছোট সমাবেশও সৃষ্টি করেন করে। প্রতিটি অনুষ্ঠান শেষে সংশ্লিষ্ট এলাকাভুক্ত নির্বাচিত কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতিদের যে যে ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃতদের মধ্যে ১৯৯৭-৯৮ বর্ষে ঋণ আদায়কারি কৃষিঋণের তালিকায় রেখে কয়েকটি সমিতি।

বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্ক তার কাজের ক্ষেত্রে এলাকায় যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা নিম্নে বর্ণিত বিবৃতি থেকেই উপলব্ধি করা যায় :

১৯৯৮ এর ৩১শে মার্চের হিসাব অনুযায়ী
আমানত ১৩২,২৩,৮৯০০০ টাকা
ঋণ গ্রহণ ১৪,০৮,০৫০০০ টাকা
ঋণ দাদন ৭৭,৮৩৫,১০০০ টাকা
নিজস্ব তহবিল ২৩,৪৫,৪৮০০০ টাকা
বিনিয়োগ ৮৮,১১,৪৪০০০ টাকা
নিট লাভ ৫,৪২,৫৪০০০ টাকা

বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের ৩৩টি শাখা অফিস ও ৩টি পে অফিসের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন হয়।

অমীয় রায়

বাঙ্গুভা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অর্থমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

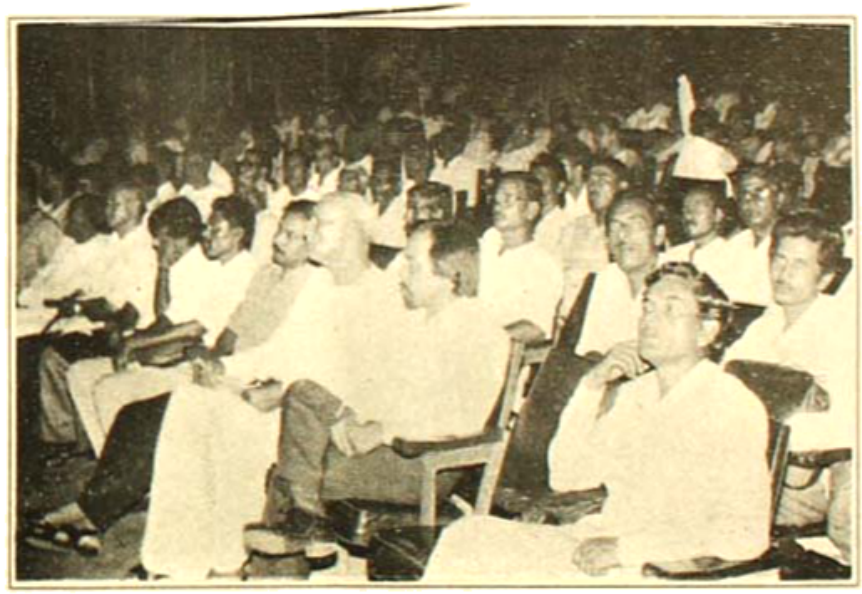

সমবেত শ্রেতৃমন্ডলীর একাংশ

সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান -১৯৯৮

১৮ই নভেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ উদ্যোগে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সভা বিকাল ঠিক পাঁচটায় স্বপন মুখার্জির উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ সকলকে স্বাগত জানান। স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে তাঁর এই সভায় প্রথম উপস্থিতিকে অভিনন্দিত করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করার আশা প্রকাশ করেন। অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করে তা আরও বৃদ্ধি পাক এই আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে সমবায়কে গুরুত্বভাবে পরিকল্পনাভুক্ত করলেও কার্যত তাতে সমবায়ের উন্নতি হয়নি। বর্তমানে জনসাধারণের ১/৫ অংশ সমবায় আওতাভুক্ত হলেও অর্থনীতির এক শতাংশে সমবায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। নয়া অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য সমবায় আইনের আশু পরিবর্তন দরকার। তিনি এও বলেন যে প্রয়োজনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে অধিবেশনের মাধ্যমে আইন পরিবর্তনের দাবি জানাব। উদ্বোধনী ভাষণে সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সমবায় ব্যবস্থাপনা সাড়া জাগালেও সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কাছে জোন, বাউড়ি, হাড়ি, মুচি এদের কাছে এখনও সমবায়কে পৌঁছে দিতে পারা যায়নি। শ্রেণী বৈষম্য এখনও দূর হয়নি। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে প্রশাসনে যে সমস্ত মানুষের দ্বারা নীচুতলার মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় তা ঠিকমত পৌঁছায় না। সমবায় দপ্তরের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দ খুবই কম। কাজেই জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ তুলে একাজে ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একদিন গোয়ালপাড়ায় বেড়াতে যাওয়ার সময় পথে কৃষককে শীর্ণকায় গরু দিয়ে লাঙ্গল দিতে দেখে বলেছিলেন যে, ঐ

সমবায় সমাচার

কৃষকটিকে কি বোঝান যায় না যে সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এলে শীর্ণকায় বলদের বদলে বলিষ্ঠ গরু ব্যবহার করতে পারবে। সেই সুবিধা পাওয়ার কথাটা বোঝানই দরকার। নীচের স্তরে মানুষের কাছে যাওয়ার দরকার এ ব্যাপারে চাই সবার সাহায্য। সমবারমন্ত্রী বলেন যে আগামী বছরের প্রথম দুই-তিন মাসের মধ্যেই সমবায় আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে।

বিশিষ্ট অতিথি স্বরাষ্ট্র (পুলিশ), তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী সমবায় কর্মকর্তাদের পৃথিবীর অর্থনৈতিক মন্দাভাবের প্রতি নজর রাখতে বলেন। ভারতে এই মন্দাভাবের উপরে আবার আরও আঘাত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ। এই সঙ্কট কাটাবার কাজে সমবায় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম বলে তিনি উল্লেখ করেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে নীচের তলার লোকের কাছে ক্ষমতা এসেছে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও ভাল কাজ করছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য চাষ খনা প্রক্রিয়াকরণের কাজে উন্নতি হলেও তা সংগঠিতভাবে হচ্ছে না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সমবায় ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এসকল কাজ সংগঠিত করা যায়।

তিনি বলেন, বর্তমান বাজারে কয়েকটি ভোগ্যপণ্যে যেন আগুন লেগেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলেই এসব ঘটেছে। সমবায় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ক্রেতা সমবায়গুলিকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি সকলকে সমবায় ব্যাঙ্কে অর্থ সঞ্চয় করার কাজে এগিয়ে আসতে বলেন। সমবায় নেতৃবৃন্দকে বলেন যে মানুষকে সমবায় ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করার কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তিনি বলেন জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির মহারাষ্ট্রে তাদের আমানতের ১০০ শতাংশেই লগ্নি করে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ করে মাত্র ৪২ শতাংশে। এই বঞ্চনা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। সমাজে দুর্নীতি আছে কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন যে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার হয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১০ বৎসরে গড় বার্ষিক উৎপাদন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২.১০ শতে বেড়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ৫.৮%। খাদ্যশস্য উৎপাদন এখন আমরা প্রথম। ১০ বৎসর আগে সমর সেন কমিটি দেখিয়েছেন যে কৃষকদের ১০০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার দরকার আছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থারই তা দেওয়া উচিত। সেই চাহিদায় জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি দিয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। যেখানে সমবায় ব্যাঙ্ক দিয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন যে কৃষি ছাড়া পশুপালন, মৎস্যচাষ, উদ্যানচাষ ইত্যাদির মাধ্যমেও অর্থ উপার্জন করা যায়। গ্রামাঞ্চলে বার্ষিক ৯০০০ কোটি টাকার শিল্প পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়েছে এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত শিল্প ৮ শতাংশে - ৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমবায় সংস্থা গঠনের অনেক সুযোগ আছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এখনি ২০০টি আধুনিক চালকল স্থাপিত হতে পারে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তাই চাই সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থা। চালের ফলের চাহিদা বাড়ছে। ফল সংরক্ষণ সব্জি সংরক্ষণের জন্য চাই হিমঘর। তিনি বলেন আগামী বৎসর সেপ্টেম্বরেই হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলের কাজ শুরু হবে। তখনই তৎসংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা খুলে যাবে। শিল্পায়নের জন্য যে ঋণের প্রয়োজন তা অবশ্যই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি এখানকার আমানত অন্য প্রদেশে চালান করছে, এখানে তারা বিনিয়োগ করতেই চায় না। পশ্চিমবঙ্গে তারা বিনিয়োগ করেছে মাত্র ৪৫ শতাংশে। যার ৮০ শতাংশে ঋণ পেয়েছে বৃহৎ সংস্থাগুলি এবং তাদের প্রদত্ত ঋণের ১০ শতাংশে অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে। অপর দিকে সমবায় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৯৩ তে ছিল - ৬০০ কোটি টাকা
১৯৯৭ তে ছিল - ১৫০০ কোটি টাকা
১৯৯৮ তে - ২০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আমানতের ৭০ শতাংশে এরা ঋণ দেয়। ৮৫ শতাংশে দেয় কৃষক ও শিল্পোদ্যোগীকে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যেভাবে জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি চলছে, তাতে ঋণমুক্ত প্রকল্পের

ভর্তুকিতে টাকা সরকার তাদের কাছে না রেখে সমবায় ব্যাঙ্কেই রাখবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখা হবে তারপর আর নয়। সব টাকা সমবায় ব্যাঙ্কে তুলে আনা হবে। তিনি সকলকে বলেন যে সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করুন। মহিলা সমবায় ব্যাঙ্ক একটি নজির সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন যে আমরা চাই প্রত্যেকটি পুর এলাকায় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হোক, প্রতিষ্ঠিত হোক বস্তি অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে। ঘরে ঘরে কর্মী পাঠিয়ে মানুষকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ করুন। তিনি ব্যাঙ্কগুলিকে বলেন যে সামাজিক চুক্তিতে কর্মী নিয়োগ করুন এবং প্রয়োজনে তাদের উৎসাহ ভাতা দিন। এর জন্য নানারকম প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে বলেও তিনি তাদের সতর্ক এবং সেইসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার মনোবল তৈরি করতে বলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পঞ্চায়েতের মত বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করার শপথ নিতে আহ্বান জানান। এরপর রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের তরফে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভিন্ন সমবায় সংগঠনকে পুরস্কৃত দেওয়া হয়।

সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্তুনাথ বসু। পুরস্কৃত প্রাপকরা হলেন —

প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি ঃ প্রথম, নাইত বৈদুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (মুর্শিদাবাদ)।

দ্বিতীয়, হানুহুএ্যা-শিব রামপুর-ঘোলপুকুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (মেদিনীপুর)

বিপণন সমবায় সমিতি ঃ প্রথম, মহিষাদল ব্লক-১ ফ্রাইমারি কো-অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ (মেদিনীপুর)।

দ্বিতীয়, বংশীহারি এগ্রিল. কো-অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ (দক্ষিণ দিনাজপুর)।

ক্রেতা সমবায় সমিতি ঃ আইহো কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিঃ (মালদা)।

কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ঃ প্রথম, দি বেঙ্গল ইনকাম ট্যাক্স কো-অপঃ সোসাইটি লিঃ (কলিকাতা)।

দ্বিতীয়, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রেলমেন্ট এমপ্লয়িজ কো-অপ্ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ (নদিয়া)।

শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ঃ প্রথম, দি ইস্টার্ন রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ব্যাঙ্ক লিঃ (কলিকাতা)।

দ্বিতীয়, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ (হুগলি)।

মহিলা কল্যাণ সমবায় সমিতি ঃ প্রথম, দক্ষিণ বহরতলী মহিলা কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)।

দ্বিতীয়, ক্যানিং মহিলা কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ঃ প্রথম, (যুগ্মভাবে) বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ ও বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

দ্বিতীয়, হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করেন যারা :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্ক - ১০ লক্ষ টাকা।

কয়েকটি সমবায় সংস্থার মিলিত অর্থ ৭৮,৮২১ টাকা।

খড়দা ব্যাঙ্ক ১,০০১ টাকা।

বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্ক ১,১০০ টাকা

রাজ্য সরকারকে লভ্যাংশ বিতরণ করেন :

বাঁকুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ৯২,৭০০ টাকা।

হুগলি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ৯৫,৭৫০ টাকা।

মালদা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ৬৬,৫০০ টাকা।

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ২,১০০,০০ টাকা ব্যাঙ্ক কো-অপ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি ১৩,৪৮৬ টাকা।

সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন — রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায় সচিব, বি কে বিশ্বাস, আই এ এস ; সমবায় নিবন্ধক এ কে পুরকায়স্থ, আই এ এস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিনয়গোপাল মিত্র।

হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও সমবায় আলোচনাচক্র

গত ৭-১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় মহাসঙ্ঘ লিঃ এর উদ্যোগে এক হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ১০ সেপ্টেম্বর '৯৮ এক সমবায় আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হয়।

বারাসাতস্থিত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসঙ্ঘের শাখা কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গুপ্ত বলেন, এদেশে মহিলারা এখনও সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। মহিলাদের আন্দোলন করে বাঁচতে হবে। সমবায় আন্দোলন বাঁচার আন্দোলন। সমবায়ে সাফল্য লাভ করতে হলে একটি মহিলাতন্ত্রের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন সমাজ সচেতন চাকরি মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। স্বনির্ভরতার জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলিকে সমবায়ের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। তিনি আরও বলেন মহিলা সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন ব্যবস্থার সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার এবং পঞ্চায়েতের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তিনি মহিলা মহাসঙ্ঘের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। পরিশেষে তিনি মহিলাদের সমবায় চেতনা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রী ঘোষ বলেন, সমবায় হচ্ছে পুঁজি বা মুনাফার বিরুদ্ধে আন্দোলন। মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধের ক্ষেত্রে সমবায়ের বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্তমান অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশে সমবায়কে পাথেয় করে এগোতে হবে। সমবায় মানুষকে আর্থিক ও সামাজিক স্থিতি দিতে পারে। তিনি লেনিন-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন সমবায় আইনই হচ্ছে পুঁজিবাদী আইনের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ আইন। তিনি বলেন দেশের ৯৫ কোটি মানুষের এক-পঞ্চমাংশ সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। সমবায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক ঋণ নীতির অভাব, কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিমাতৃসুলভ মনোভাব, রাজনৈতিক ও

আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে সমবায়কে বিকশিত করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন একদিকে দেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে অপরদিকে সমবায় ক্ষেত্রে চলছে পুরনো আইন। তিনি বলেন বিভিন্ন সমবায় বিভিন্ন দপ্তরের অধীন, সেই দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছেন মহিলা। এই বিরাট অংশকে অবহেলিত রেখে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করা যাবে না। তাই মহিলাদের বেশি সমবায়ে অংশ গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র শিল্প সমবায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুমুখী রূপ দেবার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন শুধুমাত্র সদস্য পরিষেবায় নিয়োজিত না থেকে জনসমষ্টির মধ্যে কল্যাণকর কিছু করতে হবে। পরিশেষে তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটিতে সমবায় ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বের জোরালো দাবি রাখেন।

১০ সেপ্টেম্বর '৯৮ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসঙ্ঘ লিঃ আয়োজিত সমবায় আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের বয়স্ক শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জু কর।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী কর বলেন সমাজে নারীজাতি চরম অবহেলিত। আজও বিভিন্নভাবে নারী শোষণ চলছে। নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। সামাজিক নিয়মে বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়ে অন্তরীণ থাকতে হয়েছে। তিনি বলেন সমবায় আন্দোলন বাঁচার আন্দোলন। আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হলে মহিলারা নিজেদের অধিকার বোধ সম্বন্ধে সচেতন হবেন। সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সেই সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত তিনি উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণন সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন বর্তমান অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের সামনে প্রচণ্ড সঙ্কট। অসম প্রতিযোগিতায় সমবায় টিকতে পারছে না। এছাড়া সমবায় সম্বন্ধে ধারণা, সুষ্ঠুপরিচালনার অভাবে মহিলা সমিতিগুলি পিছিয়ে পড়ছে। নিরক্ষরতাও অন্যতম প্রধান কারণ। নিরক্ষরতা সমাজের অভিশাপ। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমবায়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় সমিতি সমূহের সহনিবন্ধক সুজিত হালদার বলেন, সমাজ ব্যবস্থা যে ধাঁচে তৈরি তাতে নারীজাতিকে তার যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়নি। এটা একটা জাতীয় লজ্জা। সমাজে যারা শোষিত তাদের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তনের জন্য একমাত্র হাতিয়ার সমবায়। তিনি বলেন সমবায় আদর্শ যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে সমাজের অবক্ষয় রোধকরা যেতে পারে। আমাদের চাহিদার প্রতিটি স্তরে আমরা সমবায়কে যুক্ত করতে পারি।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সহ-সভাপতি প্রভাত ভট্টাচার্য বলেন মহিলা সমিতি চালাতে গেলে প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা বা উৎপাদনের জন্য অনুদানের ব্যাপারে খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু সমবায়ের মধ্যে বিপণন সমস্যা অন্যতম প্রধান। তিনি বলেন কোন কোন সমিতি একক প্রচেষ্টায় তার এলাকার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেও সেটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিপণন ব্যবস্থার বিস্তার এবং একটি স্থায়ী ধরণোবস্ত প্রয়োজন। তাই ও মহিলা মহাসঙ্ঘ এ কাজে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সেই ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি 'তন্তুজ' ও 'তন্তুশ্রী'-র কার্যকরি ভূমিকার অবতারণা করেন এবং পদ্ধতিগতভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের অনুসৃত একটিমাত্র প্রতিকী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখার জন্য মহাসঙ্ঘকে অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, প্রচার এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠব প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন মহিলা সমিতিকে শুধুমাত্র অনুদানের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আর একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সমবায় সমিতি একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়।

প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানপর্ব শেষে আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মহিলা সমিতি সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রতিনিধিদের আলোচনা ফলপ্রসূ করার জন্য সরাসরিভাবে অংশ নেন সুব্রত মণ্ডল, অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার, ডি ডি নাবার্ড ; ডঃ টি কে ঘোষ, জেনারেল ম্যানেজার, ইউ বি আই প্রবীর সরকার, জেনারেল ম্যানেজার, ডি আই সি ; এ কে ঘোষ, জয়েন্ট ডিরেক্টর, স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ ; শঙ্খী গুহ, সম্পাদিকা, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসঙ্ঘ ; স্বপ্নাধর, পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসঙ্ঘ ; বাসন্তী চ্যাটার্জি, মহিলা সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সঙ্ঘের সভানেত্রী অরুণী ভট্টাচার্য।

সুভাষ লাহিড়ী

সরাইতে সমবায় সপ্তাহ পালন

আজ বৈকালে সরাই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি তার সভাগণকে লইয়া নিজস্ব অফিস প্রাঙ্গণে বিপুল উদ্দীপনার সহিত জাতীয় সমবায় সপ্তাহে মহিলা সমবায়, ঘর ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস পালন করে। প্রথমে সমবায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সমবায় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তন্ময়, পশ্চিমবঙ্গ ও হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম ডাইরেক্টর গোবিন্দপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাচক্রে সমবায় সপ্তাহে আজকের বিষয়টির তাৎপর্য সহজ, সুন্দর ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মল্লিক, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পাণ্ডুয়া শাখার ম্যানেজার আলিম কুমার, পাণ্ডুয়া ব্লকের সমবায় পরিদর্শক প্রসূনকুমার কুণ্ডু, ডাই সি ডি সি-র ডেভেলপমেন্ট অফিসার সুকুমার দাস এবং হুগলি জিলা পরিষদ-এর কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল আলিম ও জেলা পরিষদ সদস্য বিজয় রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ৯১ জন মহিলা ১১টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের জন্য অর্থ জমা দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরাই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানপ্রধান এবং সমবায় সমিতির অন্যতম ডাইরেক্টর সন্তু মুখোপাধ্যায়।

❑ বিজয় রায়
সরাই এস কে ইউ এস লিঃ

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কে সমবায় সপ্তাহ পালন

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড, হাওড়া জেলার অন্যতম সমবায় ব্যাঙ্ক গত ১৪ই নভেম্বর '৯৮ থেকে ২০শে নভেম্বর ১৯৯৮ সমবায় সপ্তাহ পালন করে। ঐ উপলক্ষে ১৫ই নভেম্বর '৯৮, রবিবার তারা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ঐ আলোচনা সভার মুখ্য বিষয় ছিল "সমবায় পরিবেশ ও উন্নততর জীবন।" ঐ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্কের সভাপতি গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে কোন্নগর পৌরসভার সভাপতি স্বপনকুমার দাস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া-কোন্নগর অঞ্চলের বিধায়ক জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া অনেক বিশিষ্ট সমবায়ী ব্যক্তিত্ব সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা হবার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কোন্নগরের ৫ জন বর্ষিয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামী যথাযোগ্য আপ্যায়ন যে, সুবোধকুমার মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভাদুরী যথোচিত সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁরা তাঁদের জীবনে দেশের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে নিজেদের জীবনকে দেশমাতৃকার কাজে সঁপে দিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ আমলে তাঁরা ব্রিটিশের কত অত্যাচার সহ্য করেছেন ও সুদীর্ঘকাল জেলে বন্দী ছিলেন, সেসব কাহিনী তুলে ধরেন। আজ তারা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং এই কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক যে সম্মান জানাল এর জন্য এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ও সকল সভ্য/সভ্যাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ব্যাঙ্কের সম্পাদক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাদর সম্ভাষণ করে বলেন আমাদের ব্যাঙ্ক দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরে প্রতি বছর আন্তরিকতার সঙ্গে সমবায় সপ্তাহ পালন করে আসছে। এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতি কোন্নগরবাসীর সহযোগিতা ছাড়া কখনই সম্ভব হতো না। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির তাঁদের সহযোগিতার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। কোন্নগরের অর্থনীতিতে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। খুব আনন্দের সঙ্গে জানান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের পর্যালোচনায় হুগলি জেলার এই সমবায় ব্যাঙ্কটি এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গের সব শহরতলী ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যে যৌথ সভা গত বুধবার ১৮ই নভেম্বর '৯৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে হয়েছে সেখানে তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। ব্যাঙ্কের সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন প্রতি বছরের মতন এ বছরও ৪৫তম সমবায় সপ্তাহ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক ভবন আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে চলেছি। কোন্নগরের প্রতি লোক যাতে এই সমবায়ের সঙ্গে নিজেদের আবদ্ধ করেন সেই চেষ্টাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকের এই সভায় বহু সমবায়ী বন্ধুদের সমাগম আমাদের দারুণভাবে উৎসাহিত করছে। তিনি বলেন যে বিষয়টি আজ আলোচিত হচ্ছে। ঐ বিষয়টি ঠিক মতন অনুধাবন করা দরকার। আমরা জানি ব্রিটিশ আমলে মূলত কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সমবায় আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর এই আন্দোলন আজ দেশের অর্থনীতিতে অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন, বিপণন, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন আজ কেন কিছুটা প্রসারিত। দেশের ৬৫% পরিবার সমবায়ের সঙ্গে কোন না কোন একভাবে জড়িত। সকলেই চেষ্টা করেছেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে কিভাবে সমবায় আন্দোলনের কাজে লাগানো যায়। ঐ সমস্ত দুর্বল ব্যক্তিরা আজ আর অবহেলার পাত্র নয়। উন্নততর জীবন যাপনের জন্য সমবায় তার কর্মসূচিতে জোর দিয়েছে। যেমন সমবায় ব্যাঙ্কগুলো হস্তচালিত তাঁত শিল্প, মৎস্য চাষ, দেব পালন, মুরগি পালন। ঘরে বসে ছোট ছোট কুটির শিল্প চালানোর জন্য সহজ কিস্তিতে আর্থিক সাহায্য করছেন। এইভাবে দেখা যাবে দেশের যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা যুব সম্প্রদায়কে দারুণ চিন্তার ফেলে দিয়েছে তার থেকে উদ্ধার পাবার এই একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে স্বনির্ভর প্রকল্প। নিজেদের চেষ্টায় ও পরস্পর সহযোগিতার প্রাণে গড়ে সর্বত্র যদি ছোট ছোট সমবায় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং ব্যাঙ্কার পাবার জন্য সরকারি সাহায্যের হাতও প্রসারিত করেন তাহলে আমাদের দেশে যে পরিবেশ তৈরি হবে সেখানে হতাশা বলে কোন জিনিস থাকবে না। শতবর্ষের এই আন্দোলন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। এর জন্য চাই সকলের সমবায়ী মনোভাব নিয়ে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা। এই প্রসঙ্গে শ্রী চট্টোপাধ্যায় আরো বলেন শুধু সমবায়ের কথা আলোচনা করলেই হবে না। আমাদের ব্যক্তিগতসংসার জীবনেও সমবায়ের মূলনীতি আন্তরিকতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন আজ সারা পৃথিবীতেই কোন পরিবার সুখে নেই। নিজের পরিবারের হানাহানি, কাটাকাটি, নিজের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি অশান্তময় জীবন নিয়ে চলেছেন। বাপ-ছেলের মধ্যে, ভাগে-ভায়ের মধ্যে, আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে সদ্ভাব নিয়ে। সকলে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের সুখী হবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু প্রকারান্তে আমরা দেখছি এর ফল মারাত্মক ব্যক্তিরূপে দেখা দিয়েছে। আজ প্রতিটি লোকের মধ্যে নানা দিক থেকে টেনশন মারাত্মক বেড়েছে এবং নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মনে করি সমবায়ও এক্ষেত্রে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় নিদারুণ দুরবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে পশ্চিমী দেশের জীবনযাত্রা প্রণালী অনুকরণের দিকে ঝোঁক পড়ে অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারকে ছোট করতে গিয়ে আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারলাম। যৌথ পরিবারের মধ্যে নিহিত আছে সমবায়ের মূলনীতি অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে সম্প্রীতি সহযোগিতার মনোভাব যদি সংসারের প্রতিটি সন্তানের মধ্যে জাগ্রত থাকে যে কোন সমস্যা সামনে আসলে তার জন্য খুব বেশি চিন্তিত বা হতাশ হবার দরকার হয় না। কাজটি ঠিক উদ্ধার হয়ে যায়। তাই বলি সমবায় শুধুমাত্র আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে না। উদার সহযোগী মনোভাব তৈরি করে আমাদের উন্নততর সুখী জীবন যাপনে সহায়তা করে। তাই পরিশেষে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও স্বদেশপ্রেমিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় সমবায় আমাদের প্রতিটি সংসারকে ন্যায়ের সংসার, সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরিয়ে দিক। দেশে কোন অভাব থাকবে না। অন্যায় থাকবে না। অন্ন-বস্ত্র ও ঔষধপত্রে ভরপুর থাকবে। দেশ আমার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি ও সাহস ও অন্তরদানে পরিপূর্ণভাবে উজ্জ্বল থাকবে। দেশে কেউ নিরন্ন থাকবে না। আমরা সকলে সমবায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সকলে মিলে আমার দেশকে আনন্দমুখর ও শান্তিতে সব সময় স্নিগ্ধ করে তুলবো। বিধায়ক জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন স্বাধীনতার ৫০ বৎসর ধরে দেশের

মঙ্গলের অনেক স্বপ্ন দেখেছি। দুজন মহাপুরুষদের কথা স্মরণ করি যাদের সমবায় আন্দোলনে বিরাট অবদান আছে। একজন মহাত্মা গাঁধী এবং এবং অপরজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমবায় আন্দোলনের রূপ তাঁরাই দিয়েছেন। বলতে আমার বাধা নেই এই ৫০ বছরে সমবায় আন্দোলন যেভাবে বিকশিত হবার কথা ছিল তা কিন্তু হয়নি। আমরা জানি রাশিয়ায় সমাজবিপ্লব ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্ম নিয়েছিল। ইতালিতে দেখতে পাচ্ছি তাদের সৃষ্টি দাস সমাজ। সামন্তবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ। এদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভাল। পরীক্ষানিরীক্ষা এখনও চলছে। আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় চিন, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্র তাদের আর্থিক কাঠামোকে দৃঢ় করার জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে চেষ্টা করে চলেছে। এদের কাজের মধ্যে সমবায়ের সাদৃশ্য আছে। দেশকে তারা উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ঐ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে শুধুমাত্র অবাধ ভোটাধিকার দেওয়া নয়। ভূমিসংস্কার করে তা কৃষকের হাতে তুলে দিতে হবে তবেই দেশে উৎপাদনের উপযোগিতা সৃষ্টি হবে। ভারতে কিন্তু সেই চিন্তাধারা একদম নেই, সেই জন্য অর্থনৈতিক বিকাশ চিন প্রভৃতি রাষ্ট্র আজ যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে, আমাদের ভারতবর্ষে তা হয়নি। যদিও ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতে যেটুকু ভূমিসংস্কার হয়েছে তা কাগজে কলমে হয়েছে মাত্র, উপকার মানুষ পায়নি। দেশকে জমিদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সমবায়কে হাতিয়ার করা যেতে পারতো তা কিন্তু করা হয়নি। কেন সমবায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ অনুধাবন করলে ঐ চিত্র আমাদের কাছে ফুটে উঠে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য সমবায়ে অনেক উন্নত বলে গর্ব অনুভব করেন, কিন্তু আমি নিজে ঐ অঞ্চল ঘুরে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা কিন্তু প্রকৃত সমবায় নয়। সমবায়গুলো মুষ্টিমেয় কতকগুলি ধনীব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি সত্যিকারের সমবায়ের কথা বলতে হয় তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় পিছিয়ে থাকলেও অনেক ভাল। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা সমবায়ের চিন্তাধারা থাকা দরকার। সেই সচেতনতা প্রসারে তেমন চেষ্টা আমার রাজ্যেতেও কোথায়? এখনও অনেক ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমবায়ের কথা জানেন না। কোন্নগর একটি শিক্ষিত অঞ্চল। এখানে সকলেই সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। আমাদের দেশে আর্থ সামাজিক কাঠামো যে জায়গায় পৌঁছনো উচিত ছিল এখনও সেই জায়গাতে আসতে পারেনি। ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করছেন তারাও চাইছেন না সমবায়ের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক। সমবায়কে এখন ঠেলে দেওয়া হয়েছে বহুজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায়। তৃতীয় দুনিয়ার রাজ্যগুলি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি ভারতে নতুন বাজার তৈরি করে আমাদের দেশকে লুটেপুটে নিতে চাইছে। এতে সমবায় আন্দোলন ধাক্কা খাবে। আমি সব সময় আশাবাদী, একজন সমাজ কর্মী হিসাবে মনে করি এই আজ বিপদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারবে একমাত্র সমবায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেও এই মত পোষণ করেন। তাই আমাদের ভয় পেলে চলবে না। হতাশ হলে চলবে না। আরো লোক যাতে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেই চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন এবং কোন্নগরের অর্থনীতিতে এদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আশা করব এই ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর উন্নতি করবে এবং আপনাদের সহযোগিতার হাত আরো প্রসারিত করবেন। ডাঃ শঙ্কর সরকার ও কোন্নগর হিন্দুলালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী এই ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর প্রশংসা করেন। এই ব্যাঙ্ক যে সহরতলীর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে গর্বের ব্যাপার। তাঃ শঙ্কর সরকার বলেন এই ব্যাঙ্ক আরো উন্নতি করবে যারা ঋণ নিচ্ছেন সকলেই যদি ঠিক ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করে দেন। ঐ ঋণের টাকা আদায় করতে আমাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে যেন না হয়। তাই এই সমবায় সপ্তাহ আমাদের এই শিক্ষাই দেবে যাতে আমরা প্রত্যেক সমবায়ের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করি এবং যৌথ পরিবারের মতন আমরা সকলে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখি।

ব্যাঙ্কের সহসম্পাদক দুলাল বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আমাদের দেশের সন্তান অমর্ত্য সেন যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আমরা এতে গর্ব অনুভব করি। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় সমবায়ের কথা, সাধারণ মানুষের কথা এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের কথাও বলে গেছেন। আজকের এই সভায় ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ৯টি রিক্সা, একটি সিলাই মেশিন ও একটি সেলাই মেশিন ঋণমুক্তি প্রকল্পে ১১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিদের বিতরণ করা হল। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুরস্কার দানে উৎসাহী করা হয়েছে। এছাড়া এই বৎসর মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে আমাদের এই ব্যাঙ্ক ৫০০০ টাকা দান করেছে।

গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে ৪০টি বিল আনার সম্ভাবনা

লোকসভার আগামী শীতকালীন অধিবেশনে যে ৪০টি বিল তোলার প্রস্তাব আছে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিলগুলিও আছে

(১) পেটেন্ট বিল
(২) ইনস্যুরেন্স রেগুলেটরী অথরিটি বিল (আই আর এ)
বি জোন্সানিক বিল, ১৯৯৮
বি আরবান ল্যান্ড (সিলিং এ্যান্ড রেগুলেশন) রিমিভিল বিল।
(৫) বি অয়েল কিন্ডস (রেগুলেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এ্যামেন্ডমেন্ট বিল।
বি রেইলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স এ্যামেন্ডমেন্ট বিল।
বি কোল মাইন্স (ন্যাশনালাইজেশন) এ্যামেন্ডমেন্ট বিল।
বি কোল ইণ্ডিয়া (রেগুলেশন অফ ট্রান্সফার এ্যান্ড ভ্যালিডেশন) বিল।
(৯) ইনফরমেশন টেকনোলজি বিল।
(১০) বায়ো সাইডাসিটি বিল।

আরও যে কটি বিল পূর্বেই লোকসভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল সেগুলি হল -

(১) কমার্স এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট (কেম্ব)
বি প্রিভেনশন অফ মানি লণ্ডারিং বিল (এম এল পি বি)
বি নারকোটিক ড্রাগস এ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টান্সেস (এন ডি পি এস) বিল।
বি প্রসার ভারতী বিল।
বি জোন্সানিক বিল ১৯৯৭।

[সূত্র : বি ইকনমিক টাইমস,১২-১১-৯৮]

উদার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ রুখতে পারে সমবায় ঃ অসীম দাশগুপ্ত

আজকালের প্রতিবেদন ঃ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত মনে করেন, উদার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে সমবায়। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজের সম্মেলনে অসীমবাবুর সঙ্গে একই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী। উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ৬ থেকে ৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট সোসাইটির প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশ নেন। অসীমবাবু ও অমিয়বাবু দু'জনেই মনে করেন, ভারতের মত দেশে সমবায় এক বিরাট সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে, তবে কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্ক যেভাবে জনমত সংগ্রহ থেকে শুরু করে উন্নয়নের কাজে এগিয়ে এসেছে, তার সাংগঠনিক উদ্যোগেরও অসীমবাবু প্রশংসা করেন।

আজকাল - ৯-১১-৯৮

নিলামে হেরাল্ড

লক্ষ্ণৌ, ৯ নভেম্বর (ইউ এন আই) - বকেয়া টেলিফোন বিল ২৫ লাখ টাকা দিতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেল ন্যাশনাল হেরাল্ড দৈনিক। নেহরুর হাতে গড়া কাগজ। স্বাধীনতা সংগ্রামেও ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এহেন ন্যাশনাল হেরাল্ড আজ নিলাম করে দেওয়া হল। কাটিং মেশিন বিক্রি হল ন'য় হাজার টাকায়। ১০টি কম্পিউটার দাম পেয়েছে মাত্র ৬ হাজার।

সিট্রোনেলা

আজকালের প্রতিবেদন - ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে বাড়ির রাস্তার পাশে ফাঁকা জায়গায় সিট্রোনেলা গাছ লাগানোর পরামর্শ দিলেন কল্যাণী পুরসভার পুরপ্রধান ড. শান্তনু ঝা। সিট্রোনেলা নির্যাস প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করেন। কল্যাণী পুরসভার উদ্যোগে ৭ নভেম্বর ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মহিলা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আজকাল - ১০-১১-৯৮

রাষ্ট্রগুরুর বই

আজকালের প্রতিবেদন - রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী এ নেশন ইন মেকিং-এর দীর্ঘদিন পর পুনঃপ্রকাশ হল। এ বছর বাষ্ট্রগুরুর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত বইটির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার। কলকাতা টাউন হলে ভারতসভা ও ফেডারেশন হল আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী আলোচনাচক্রে।

আজকাল - ১১-১১-৯৮

শিশু কল্যাণে জাতীয় পুরস্কার

দিল্লি, ১৬ নভেম্বর (পি টি আই) - ২ লাখ টাকার জাতীয় পুরস্কার পেল শিশু কল্যাণে নিবেদিত ক্যালকাটা মুসলিম অরফানেজ। জন্ম যে ৪টি প্রতিষ্ঠান এই পুরস্কার পাচ্ছে: অরুণাচল ইটানগরের তোনি-পোলো বিদ্যা নিকেতন স্কুল, পোর্ট ব্লেয়ারের সেবা নিকেতন তেরারি ফার্ম, সিলঙের সেন্ট মেরিজ অনাথেন্ট এবং এরনাকুলামের এস ও এস চিলড্রেন্স ভিলেজ।

আজকাল - ১৭-১১-৯৮

ঠিকাদার নয়, হাসপাতালে খাবার দেবে সমবায় সমিতি

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে রোগীদের খাবার সরবরাহে ঠিকাদারি প্রথা তুলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তার বদলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই খাবার সরবরাহ করা হবে। ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে খাবার সরবরাহ নিয়ে অভিযোগের সংখ্যা বাড়তে থাকায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিকাদারি প্রথা তুলে দেওয়ার কথা মহাকরণের স্বাস্থ্য কর্তারা মৌখিকভাবে জানিয়েও দিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারদের। শীঘ্রই এই ব্যাপারে সরকারি নির্দেশ জারি করা হবে।

সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ০০-১১-৯৮

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে মাল্টিমিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার ঃ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকর্ম-সহ সমস্ত রচনাবলীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাল্টিমিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির কাজ শুরু করেছে বিশ্বভারতী। তাঁর রচনাবলী এই পদ্ধতিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে ধরে রাখা হবে। শুধু তাঁর সাহিত্যকর্ম নয়, গান, নাটক, নৃত্যনাট্য — সব কিছুই কম্পিউটারের সি ডি রোম-এ ধরে রাখা হবে। ইতিমধ্যে এই কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর পরিচালক পরিদর্শক ও রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনকে তা দেখানোও হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মাল্টিমিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য দিলীপ সিংহের দেওয়া প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ অনুমোদন করেছে। প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। ঠিক হয়েছে, মোট তিনটি সি ডি রোম তৈরি করা হবে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, চিত্রাবলী ও সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের লেখা অসংখ্য পত্রও এতে থাকবে। সঙ্গে থাকবে তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য। উপাচার্য চাইছেন, এমনভাবে এই সি ডি তৈরি হোক, যা থেকে অতি সাধারণ মানুষও রবীন্দ্রনাথকে জানতে পারেন।

আন্তর্জাতিক স্তরে রবীন্দ্ররচনাবলী যাতে সহজে পৌঁছয়, তার জন্য বিশ্বভারতীর নিজস্ব ইন্টারনেট সংযোগের বিষয়টিও এই প্রকল্পে থাকছে। এর জন্য অতি ক্ষুদ্র অ্যাপারচার টার্মিনাল বসানো হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনে। এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির কাজে রবীন্দ্র ভবনের কর্মীরা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেবে। রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ স্বপন মজুমদারের নেতৃত্বে এক দল বিশেষজ্ঞ এর তত্ত্বাবধান করবেন। উপাচার্য জানান, ভবিষ্যতে এই সি ডি রোম কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রি করা যেতে পারে।

আনন্দবাজার ১৪-১১-৯৮

"আমানত প্রকল্প" সংক্রান্ত আদর্শ বিধি সম্পর্কিত একটি নির্দেশ

(495-Coop/D/3R-3/92 dt 9-2-98-এর অধীনস্থ) নিম্নে মুদ্রিত হল :

Guidelines (revised) for Deposit Guarantee Scheme for PACS :

1. The PACS undertaking the programme for raising deposits, must get prior permission from the appropriate authority in terms of existing Coop. Acts and Rules in this State and this Deposit Guarantee Scheme be made compulsary for all such PACS / FSS / LAMPS granted permission for deposit mobilisation programme.

2. While the permission of the deposit mobilisation programme is accorded by the authority, the following criteria for selection of societies have to be fulfilled. Besides, other norms and regulatory measures so prescribed below should be strictly adhered to for proper implementation of the programme.

A. **Criteria for selection of PACS :**

i) Crop Loan issued during the preceding Cooperative Year is not less than Rs. 5.00 lakhs.

ii) Total overdue is not more than 25% of the total loan outstanding as on 31st March of the preceding year.

iii) Percentage of recovery to demand at PACS level at the end of the preceding year is not less than 50%.

iv) There has been no instance of fraud/ misspropriation of fund committeed either by the employee or director of the society, where no legal action was taken by the Board of Management of the Society/ concerned DCCB / SCB / Unit of SCB.

v) The PACS must be identified for Business Development Plan and it should have prepared and engaged in implementation of BDP.

vi) The PACS has full-time paid Manager. Fidelity of its concerned employee, Cash-in-transit and Cash-in-safe have to be insured properly.

vii) The PACS has democratically elected Board Management.

viii) The audit of the society is not in arrears for more than one Co-operative Year.

ix) The PACS has a separate office room of its own or hired in a pucca building. Infrastructural facilities like banking counter, Iron Safe etc. should be arranged before taking up deposit mobilisation programme.

B. **Norms for Utilisation of fund :**

1) In order that deposits raised by PACS remained safe and may be refunded to the depositors in terms of time deposit and demand deposit, 70% of the total deposit mobilisation by PACS must be invested with CCBs/Unit of the State Coop. Bank ; but the terms may be suitable relaxed, but not less than 50% in any case, by the concerned Deposit Guarantee Fund Committee depending upon the performance and business programme of the society.

ii) The balance of the deposit may be utilised by the PACS towards issue of loans to depositors for productive/ pledging pawning/ consumption purposes with proper security subject to maximum of Rs. 20,000/- per case. But, gold loan will not be allowed.

iii) There must not be diversion of deposit to areas like crop loan, creation of fixed assets, investments in such sectors where refinances is available from higher tiers at concessional rate of interest etc.

C. **Limit of amount Guaranted per depositor :** Amount guaranted per depositor may not exceed Rs. 30,000/-. The deposit shall be guaranted by the concerned CDB/Unit of SCB and they should ensure that necessary provision is made in the bye-laws of the bank for offering guarantee to its affiliated societies for deposits mobilised by the letter. The PACS shall, however, not raise daily deposits through agents for reasons of safety and security.

D. **Types of deposit to be covered :**
All types of deposits having

different durations will be covered in the same right and capacity. In order to attract deposits, PACS May offer remunarative interest on deposits @ 1% above the rate offered by the DCCB/Unit of SCB for saving deposits and at the equal rate of interest for other types of deposits.

E. **Guarantee Fee :**

Guarantee fee is to be contributed to the extent of 0.30% of the total deposits guaranted in the following ratio

i) Govt. of India	0.10%
ii) State Govt.	0.05%
iii) PACS	0.05%
iv) DCCB/ Unit of SCB	0.05%
v) W.B. State Coop Bank Ltd.	0.05%

The PACS must deposit their contribution of the fee towards deposit guarantee fund within one month from the date of closing of the Cooperative year on the Balance Sheet held on the last working day of the Cooperative Year. The DCCB/ Unit of State Coop. Bank and the State Coop. Bank shall deposit their contribution within two and three months respectively from that closing date. The Goverment's contribution stated above be available subject to payment of scheduled contribution to the crops fund by all the respective Coop. agency as well as fulfilment of other terms and conditions of this scheme.

F. **Composition of the Fund Committee :**

The modification to the formation of the Deposit Guarantee Fund Committee, as prescribed earlier, the composition of the Fund Committee will be as follows

i) The Chairman of the CCB/ Representative of State Coop. Bank (for Units) .....
Chairman.

ii) The Chief Executive of the CCB/Unit of State Coop. Bank. .....Convenor
Member.

iii) Range ARCS Member.

iv) Two representatives from two PACS which have made maximum contributions to the fund. Members.

v) One representative from FSS/LAMPS which have made maximum contributions to the Fund. Member

G. **Maintenance of Records & Audit of PACs :**

i) The concerned PACS would maintain all books and records necessary for operation and maintenance of deposit accounts properly.

ii) Audit of accounts of such PACS would be completed preferably within six months of the close of every Coop. Year. In case of societies having deposit of Rs. 50.00 lakhs and above, running audit be introduced.

H. **Supervision & Inspection of the Scheme :**

There would be joint/ concurrent inspection and supervision of such PACS by government departmental officers and field supervisor, Branch Manager of the DCCB/ Unit of State Coop. Bank in the following way

a) PACS would submit, within 10th of the next month, the monthly returns to the Block level Coop. Inspector and the Block level supervisor of the concerned Bank who would scrutinise the same and forward to the concerned Range ARCS and the Chief Executive of the bank through the concerned Branch Manager respectively, with their views, within the next ten days. Thereafter, the range A.R.C.S. and the Chief Executive of the Bank would sit together and scrutinise these returns and, take remedial measures. If the PACS does not submit the required monthly return within tenth of next month, as aforesaid, all types, of transactions of the society shall be help up.

I. **Regulatory measures for non-compliance of prescribed norms :**

If the PACS does not comply with the rules and regulations governing deposit guarantee schemes, a warning should be issued by the sanctioning authorities under rule 80 and if even after that the PACS does not behave properly, sanction under Rule 80 may be cancelled by the sanctioning authority. In that event, the PACS have to refund deposit to all depositors within a given time. Moreover, appropriate legal action taken against the management.

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone : (0342) 62-163 / 169 / 165
63-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

BHANDAR ■ Regn. No. 5451/62 ■ Dec. 1998 ■ Vol. XXXVI ■ Postal Regd. No. WB/CC-199

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর
হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর
দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪
ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
* ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
* ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
* মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
* সাক্ষ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর
সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে নিত্য ধন গুপ্ত কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (অটিতলা), কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন নং- : ২২০-৮১৯৮ থেকে প্রকাশিত এবং আরডি প্রিন্টার্স ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত মূল্য ঃ পাঁচ টা·